সুবোধ ঘোষ
রচনা সমগ্র

৭

সম্পাদনা

উত্তম ঘোষ

সমীরকুমার নাথ

নাথ পাবলিশিং

৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ❑ কলকাতা ৭০০০০৯

ভূমিকা

সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র আরো আগে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। আজ থেকে প্রায় ১৮ বছর আগে সুবোধবাবু (মার্চ, ১৯৮০) আমাদের ছেড়ে হঠাৎ চলে গেলেন। যাবার আগের দিনও আনন্দবাজার পত্রিকায় তিনি তাঁর শেষ সম্পাদকীয় লেখা লিখে রেখে গেলেন ঃ 'ওমর খৈয়াম স্মরণে'।

সুবোধবাবু সম্পর্কে আমি আমার বই 'সম্পাদকের বৈঠকে'— বেশ অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার কথা লিখেছি, যা শুধু লেখক সুবোধ ঘোষকে নয়, ব্যক্তি সুবোধবাবুকেও হয়তো অনেকটা তুলে ধরতে পারে। তাঁর মৃত্যুর পর আমি আনন্দবাজারে লিখেছিলাম ঃ 'একসঙ্গে যোগ দিই, সেই যোগ'।

এ রচনাবলীতে প্রথম খণ্ডে সুবোধবাবুর 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসটি স্থান পেয়েছে। এটা কেন জানি না বহুদিন অমুদ্রিত অবস্থায় ছিল। আমার স্পষ্ট মনে আছে—এর কভার এঁকেছিলেন, প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়। সুবোধবাবু যে সময় 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এই উপন্যাসটি লিখতে শুরু করেন তখনই পাঠকেরা বুঝে গিয়েছিল, শুধু 'ফসিল' বা 'অযান্ত্রিকে'র মতো অসাধারণ ছোট গল্প নয়, একটি নতুন স্বাদের উপন্যাস রচয়িতা এক বলিষ্ঠ লেখকের আবির্ভাব ঘটলো। সেই সময়কার রাজনৈতিক ডামাডোলের চিত্র—যা তিনি এই উপন্যাসে প্রকাশ করেছিলেন—তা পরবর্তীকালের পুস্তকাকারে বের হবার সময় একটা সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রকাশককে কেউ কেউ ভয় দেখিয়েছিলেন—এই বই প্রকাশ করলে তাকে জেলে যেতে হবে।

সুবোধবাবু তখন অসুস্থ, হাসপাতালে। তিনি প্রকাশককে আমার কাছে পাঠালেন। আমি বললাম—আপনি অনায়াসে প্রকাশক হিসেবে আমার নাম দিতে পারেন। আমি জেলখাটা লোক, জেলে যেতে আপত্তি নেই।

তাই হয়েছিল। প্রথম সংস্করণে প্রকাশক হিসেবে আমার নামই ছেপে বের হয়েছিল। অবশ্য আমাকে শেষ পর্যন্ত তার জন্য জেল খাটতে হয়নি।

১৯৪০ সালের পয়লা জানুয়ারী আমি আর সুবোধবাবু একই সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দিই।...তার আগে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে প্রুফরিডারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন, আর আমি ছিলাম যুগান্তর পত্রিকার একজন জুনিয়র সাব এডিটর। আনন্দবাজার রবিবাসরীয় বিভাগে মন্মথনাথ সান্যালের তিনি ছিলেন সহকারী আর আমাকে যোগ দিতে হল দেশ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে। সেই সময় বর্মন স্ট্রীটের পূর্ব দিকে দোতলায় একটি ঘরেই ছিল দেশ ও আনন্দবাজারের রবিবাসরীয় দফতর।

আমরা একই ঘরে বসে এই দুই পত্রিকার সাহিত্য সম্পর্কিত কাজে নিযুক্ত ছিলাম।

সুবোধবাবুকে সে সময় যেভাবে দেখেছিলাম, সেই স্মৃতি আজও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিরিশের কাছাকাছি বয়স, কিন্তু দেখে মনে হয় এখনও যেন যৌবনে পা দেননি। অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন তিনি, যাকে বলা যায় রোমাণ্টিক পুরুষ। কথা তিনি খুবই কম বলতেন। সব সময় দেখতাম, ডাকে আসা পাণ্ডুলিপিগুলো নিয়ে মগ্ন হয়ে আছেন। কখনও বিভাগীয় সম্পাদকের নির্দেশে তিনি সেই পাণ্ডুলিপি সংশোধনে নিমগ্ন থাকতেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হত, এ মানুষটি বোধহয় খুবই অভিমানী ও গম্ভীর। কিন্তু দিনের পর দিন একঘরে বসে কাজ করতে যখন মধুরভাষী মানুষটির হৃদয়ের স্পর্শ পাওয়ার সুযোগ ঘটল, তখন দেখলাম যে, মানুষটি আসলে নীরব, নিরহঙ্কার, মধুরভাষী। যাকে বলা যায় অত্যন্ত বন্ধুবৎসল এক আড্ডাবাজ মানুষ। আমাদের চাকরী জীবন শুরু একই সঙ্গে। মারকাস স্কোয়ারের সংলগ্ন মারকাস বোর্ডিং-এ একই সঙ্গে পাশাপাশি দুটি ঘরে আমাদের প্রাকবিবাহ যুগের বেশ কয়েকটি বছর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সন্নিবেশে কেটেছে। সেই সময় সুবোধবাবুকে নানা দিক দিয়ে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে জানবার নানা সুযোগ আমার ঘটেছিল।

ওঁর চরিত্রের একটি গুণ যা আমাকে বরাবরই আকর্ষণ করেছে, তা হলো বাঙালী হয়েও 'বাঙালীয়ানা'র কোন ছাপ তাঁর মধ্যে সচরাচর দেখা যেত না। তার একটা কারণ তিনি বাংলাদেশের বাইরে মানুষ হয়েছিলেন। হাজারিবাগ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃঢ়তার প্রভাব তাঁর চরিত্রেও ছিল।...

সুবোধবাবু বাংলা সাহিত্যকে যে একটি উজ্জ্বলরত্ন দিয়েছেন, সেই 'ভারত প্রেমকথা' দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর 'শতকিয়া।' অন্য স্বাদের উপন্যাস তাছাড়া ওঁর বহু গল্প—যা এই রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে—তার মধ্যে অনেকগুলোই দেশ পত্রিকায় বেরিয়েছে। তাঁর অন্যত্র প্রকাশিত রচনাগুলিও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকালীন মর্যাদা পাবে।

সুবোধবাবুর একটি গল্প সংকলন 'গল্প মণিঘর' শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল ও আমাকে উৎসর্গ করেছিলেন। লিখেছিলেন ঃ 'ভ্রাতৃপ্রতিম দুই বন্ধু—করকমলেষু...।'

প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আমরা একই প্রতিষ্ঠানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে এসেছি। আমাদের দুজনের সম্পর্ক ছিল অটুট বন্ধুত্বের, প্রগাঢ় সহমর্মিতার। আমাদের দুজনের ভাগ্য ছিল এক সুতোতেই গাঁথা। তাঁর মৃত্যুতে সেই সুতো ছিঁড়ে গেল। গেল কি? সত্যি?

সাগরময় ঘোষ

সম্পাদকের কথা

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শংকর লিখেছেন ঃ

'পঞ্চাশ দশকে যখন আমার সাহিত্য ক্ষেত্রে কুণ্ঠিত প্রবেশ তখন সুবোধ ঘোষ খ্যাতির মধ্যগগনে। চল্লিশ দশকের যে বিস্ময় সৃষ্টির মধ্যে সাহিত্য গগনে তার উদয় তার রেশ কিছুটা কেটেছে, কিন্তু বিপুল পাঠক সমাজের কৌতূহলের অভাব নেই। সকলের মুখে তখন এক প্রশ্ন, তিনি আরও বেশি লেখেন না কেন? সুবোধ ঘোষ তার উত্তর দিতেন না, কিন্তু সাহিত্য কর্মের সঙ্গে যাঁরা কিছুটা যুক্ত তাঁরা সহজেই বুঝতে পারতেন, সুবোধ ঘোষ যে ধরণের গল্প লেখেন, তা বেশি লেখা যায় না, প্রতিটা গল্পের পিছনে থাকে গভীর চিন্তার অদৃশ্য ভিত্তিভূমি।'

সুবোধ ঘোষের রচনা সমগ্র সম্পাদনার সময় আমরা এটা মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। সত্যি, বেশি লেখেন নি তিনি, তিরিশ বত্রিশটি উপন্যাস, তার মধ্যে আয়তনে বৃহৎ মাত্র তিন-চারটি (ত্রিযামা, শতকিয়া ও জিয়াভরলি), আর বাকীগুলি মাঝারি, কতগুলি তো ছোট উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে—যেমন সুজাতা, বর্ণালী, মুক্তিপ্রিয়া, কান্তিধারা, ছায়াবৃতা প্রভৃতি।

গল্পের সংখ্যাকে চার ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(ক) সেই অযান্ত্রিক, ফসিল থেকে শুরু করে সিরিয়াস আলোড়নকারী গল্প থেকে জীবন বিচিত্রার বহু দিক, ব্যক্তি ও মানসিকতা নিয়ে কাহিনীর মধ্য দিয়ে হাল্কা মিষ্টি প্রেমের গল্প যার সংখ্যা প্রায় ১৬০।

(খ) ভারত প্রেমকথা —২০

(গ) কিংবদন্তীর দেশে—৩১

(ঘ) পুতুলের চিঠি—৮

(ঙ) ক্যাকটাস (জীবজগৎ পশু-পাখি-অরণ্য)—১৪

তাই যার মাত্র তিরিশটি উপন্যাস ও আড়াইশোর কম গল্প (পেশাগত সাহিতিক জীবন মধ্য চল্লিশ দশক থেকে সত্তর দশকে শেষ, অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ বছর। তাও একটানা নয়—হঠাৎ হঠাৎ কলম থেমে গেছে—বিশেষ করে জীবনের শেষ অধ্যায়ে) তিনি অবশ্যই পরিমাণের দিক দিয়ে বেশি লেখেননি (তাঁকে ঠিক prolific writer বলা যায় না সেই অর্থে)—যার জন্য গণিতের দিক থেকে বিচার করে তাঁর সমগ্র রচনা বর্তমান বিজ্ঞানের মুদ্রণ যন্ত্রে ৬০০০ পাতার মধ্যে হয়তো সীমাবদ্ধ করা সম্ভব। এবং এর মধ্যে অবশ্যই তাঁর বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ, রম্যরচনা এবং একটি গীতিনাট্যকেও ধরা হয়েছে।

তাই আমরা হয়তো দশটি খণ্ডের মধ্যে তাঁর সমগ্র সাহিত্যিক ফসলকে গোলায় ভরে ফেলতে পারব, যা অন্যান্য সাহিত্যিকদের তুলনায় অনেক কম—পূর্বসূরী তারাশংকর,

বিভূতিভূষণ—সমসাময়িক বিমল মিত্র বা উত্তরসূরী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—যেই হোক না কেন। শংকর সুবোধ ঘোষকে মহৎ স্রষ্টাদের পুর্ণকুম্ভ মেলায় 'নিজস্ব মহিমা' নিয়ে বিরাজ করার কথা বলেছেন। তাঁর জীবনসংগ্রামও বড় বিস্ময় জাগানো জীবন কথা, কিছু লিখিত, কিছু লোকমুখে শোনা যায়। গল্প-উপন্যাস ছাড়াও নানা বিষয়ে গবেষণামূলক রচনা লিখেছেন তিনি, তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে। প্রধানত ছোটগল্প লেখক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও তাঁর কলম দিয়েই বেরিয়েছে বিভিন্ন বই যার বিষয় মনস্তত্ত্ব (ফ্রয়েড), কারুশিল্প (শিল্পভাবনা/রঙ্গবল্লী), আদিবাসী সমাজ, সামরিক বিজ্ঞান, গান্ধীজীবনী, নৃতত্ত্ব ও সমাজ বিজ্ঞানের কথা। বিচিত্রপথে যাওয়া তাঁর রচনার এই 'সর্বত্রগামী' দিকটা বহুলাংশে অজানা বলে আমাদের মনে হয়েছে। তাই বোধ হয় চিন্তামণি কর মন্তব্য করেছেন : 'গল্প উপন্যাস পুরাকাহিনী প্রভৃতি লেখার জন্য এই লেখকের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা সুবিদিত থাকলেও নাট্য, সংগীত, পুরাতত্ত্ব, রূপকথা সম্বন্ধে তাঁর আন্তরিক ও গভীর পরিজ্ঞানসম্ভূত প্রবন্ধগুলি বহুজনের প্রায় অজানা ছিল।'

সপ্তম খণ্ডে দুটি উপন্যাস স্থান পেয়েছে—'দুই গন্ধর্ব' শীর্ষক দুটি উপন্যাস—কেলি গন্ধর্ব ও চিত্র গন্ধর্ব। দুটি উপন্যাসের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্বাদও ভিন্ন, সেখানে ছোট এই উপন্যাস (নভেলেট) দুটো একটি পুস্তকের শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'দুই গন্ধর্ব' নামের তাৎপর্য গভীরতর অনুধাবনযোগ্য। বলে রাখা ভাল, নানা কারণে আমরা প্রথাগত সন-তারিখ বা কালক্রম অনুযায়ী খণ্ডগুলোকে সাজাইনি। আমাদের উদ্দেশ্য, প্রতিটি খণ্ড যেন একেকটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে বহুবিচিত্রা হয়ে ওঠে। তাই সপ্তম খণ্ডে আছে দুটি উপন্যাস, পনেরটি সামাজিক গল্প এবং 'ভারত প্রেমকথা' থেকে দুটি এবং 'কিম্বদন্তীর দেশে' থেকে পাঁচটি গল্প।

অল্পকথায়, এই রচনা সমগ্র সম্পাদনায় আমরা চেয়েছি প্রতিটি খণ্ডে সুবোধ-প্রতিভার 'কামিনী-কাঞ্চন যোগ হোক (বলা বাহুল্য—বিশেষণটি এখানে রচনাগুলোর বৈশিষ্ট্যের ঐশ্বর্যের কথা ভেবে বলা হয়েছে)। কালপঞ্জি বা অ্যাকাডেমিক পাঠক্রম হিসাবে সাজালে পরিবেশন রসলাভের দিক থেকে ততটা সার্থক হতো না বলে আমাদের মনে হয়েছে। পাঠকরা এটাই বিচার করবেন।

সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের মূল্যায়নটা আমাদের কাছে সম্পাদনার মানদণ্ড স্থির করতে সাহায্য করেছে : তিনি (সুবোধ ঘোষ) সাহিত্য করেছেন। শতকরা একশোভাগ সাহিত্য।...আছে সচেতন বিদ্রোহ, সেই কারণে তিনি এক ভিন্ন নামের নদী। স্রোত কম, অবগাহনে তৃপ্তি।...সব্যসাচী অজাতশত্রু।'

মহাশ্বেতা দেবী বলেন, 'যে লেখক পরুষ, রুক্ষ ঋজুতা থেকে সহজ সাবলীল মিষ্টিলেখা—তা থেকে সংস্কৃত কাব্যের মত্যো অলংকার ঝংকৃত বাংলায় এমন অনায়াসে যাতায়াত করতে পারেন, তিনিই সুবোধ ঘোষ।' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন—'ছাত্র

বয়সে 'দেশ' পত্রিকা পেলেই দুজনের গল্প আগে পড়ে ফেলতাম—পরশুরাম ও সুবোধ ঘোষ। বাংলার ছোট গল্পের সেই স্বর্ণযুগে কারুর সঙ্গে কারুর তুলনা চলে না। তবু এক একজন লেখক সম্পর্কে কিছু কিছু পাঠকের পক্ষপাতিত্ব থাকেই। আমার পক্ষপাতিত্ব ছিল সুবোধ ঘোষ সম্পর্কে—যাকে ব্যক্তিজীবনে তাঁর দূর থেকে দেখা।'

সন্তোষকুমার ঘোষ একটি রচনার শীর্ষনাম দিয়েছিলেন—'যে বনস্পতির নাম সুবোধ ঘোষ।'

সমরেশ মজুমদার প্রশ্ন করেছেন নিজেকেই—'এখনও নিজের লেখার পাশে ওঁর লেখা রেখে দেখতে পেলেই লজ্জা পাই...ইনি অবশ্যই আমার পূর্বসূরী, কিন্তু আমি, আমরা কতটা উত্তরসূরী?'

আশাপূর্ণা দেবী মুগ্ধ হয়ে লিখেছেনঃ তিনি এলেন, দিলেন, জয় করলেন, এই 'দিলেন' শব্দটা লেখিকার তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজন—শেক্সপীয়ারের নাটকের বিখ্যাত উক্তি 'vidi'-র (দেখলাম-এর) পরিবর্তে।

সম্পাদনা করতে করতে সম্পাদক হিসেবেই কিছু স্বাভাবিক প্রশ্ন মনে জাগে। বোধ হয় এই ধরনের প্রশ্ন পাঠকদের হয়েই আমরা উপস্থাপনা করতে পারি। সবচেয়ে ভাল, একটি জিজ্ঞাসা আমাদের ভাষায় না বলে, এক প্রসিদ্ধ প্রকাশনা সংস্থার জ্যাকেটে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচিতির উল্লেখ করলেই পরিষ্কার হতে পারে। তাঁরা লিখেছেনঃ

প্রথম গল্প অযান্ত্রিক। বন্ধুদের অনুরোধ লেখা, এরপর ফসিল। বাংলা সাহিত্যে বিস্ফোরণ জাগিয়ে আবির্ভাব। বহু গল্প-উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত। আনন্দ পুরস্কার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পদক। এছাড়া অন্য পুরস্কার পাননি। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাবের মতোই বিস্ময়কর এই ঘটনা।...

সম্পাদনার কাজ করতে করতে যখন মহাশ্বেতা দেবীর কথা স্মরণ বিশেষ ভাবে করছি (আবার হব মুগ্ধ), তখন এই 'বিস্ময়কর ঘটনাটা' পাঠকের দৃষ্টিতে একটা বিরাট প্রশ্ন চিহ্ন থেকে গেছে বলে মনে হয়েছে। রচনা সমগ্রের 'সম্পাদকের কথা'য় তাই তার উল্লেখ বা পুনঃ-উল্লেখ। উত্তরের জন্য নয়, আক্ষেপ হিসেবে নয়,—শুধু সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রশ্নটিকে স্থায়ী স্থানদানের জন্য, পরবর্তী প্রজন্মকে এই বিষয়ে সতর্ক করার দায় অনুভব করেছি আমরা।

তাই বোধ হয় শংকরের দুঃসাহসী মন্তব্যঃ 'অনেকের কীর্তন গাইবার দল থাকে, সুবোধ ঘোষের (সেসব) কিছু নেই।'

উত্তম ঘোষ
সমীরকুমার নাথ

সূচীপত্র

উপন্যাস

দুই গন্ধর্ব

কেলি গন্ধর্ব ১১

চিত্র গন্ধর্ব ৭৭

গল্প

নায়িকা মুগ্ধা ১৪৯

তিন অধ্যায় ১৫৪

অলীক ১৭০

গরল অমিয় ভেল ১৯৬

গ্লানিহর ২০৯

ঐশ্বরিক ২১৫

মনভ্রমরা ২২১

হৃদ্‌ঘনশ্যাম ২৪৩

বর্ণচোরা ২৫১

আত্মজা ২৬১

তমসাবৃতা ২৭৬

সমাপিকা ২৮৮

রূপো ঠাকরুনের ভিটে ২৯৩

চতুর্ভূজ ক্লাব ৩১১

সবলা ৩২৯

ফসিল ৩৩৯

কোটেশন ৩৫০

ভারতপ্রেমকথা

ভাস্কর ও পৃথা ৩৬৩

সংবরণ ও তপতী ৩৭০

কিংবদন্তীর দেশে

একটি বুলবুলের শিস ৩৮২

ডুমনীতলার মা ৩৮৮

মেহের হামারা ৩৯৩

দেবী উত্তরবাহিনী ৩৯৭

কহ কৌশিকী ৪০২

ক্যাকটাস

জগমোতির পাহাড়ি ময়না ৪০৮

মধুগঞ্জের সুমতি ৪২১

বাবু রতন রায়ের ঘোড়া ৪৩৫

ডায়েনা ও মালতী ৪৪৯

উপন্যাস

দুই গন্ধর্ব

কেলি গন্ধর্ব

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে ফিরেই নরু মামা চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—ভাগ্য ভাল বলতে হবে, রাজা হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গেই রানুর বিয়ে হবে।

সীতারামপুরের যে নরেশ সেন আজ পনেরো বছর ধরে ডাক্তার যতীন গুপ্তের ফার্মেসিতে কম্পাউণ্ডারের কাজ করছেন, তিনিই হলেন রানুর নরু মামা। আপন মামা নন, রানুর ছোট মামীর বড়দা নরেশ সেন, তাই তিনি রানুর নরু মামা। খুবই রোগা ও শুকনো চেহারা, চোখের দুই কোণ দিয়ে সব সময় জল গড়িয়ে পড়ছে, চোখে বোধ হয় কোনও রোগ আছে নরু মামার। দেখলে মনে হবে, নরু মামা যেন এই পৃথিবীর সব আলোছায়াকে ছলছল চোখে তাকিয়ে দেখছেন। একটি মেয়ে ও দুটি ছেলে, আর গৃহিণী; নরু মামার সংসারের সকলেই যেন এক একটি জীর্ণ-করুণ অস্তিত্বের চেহারা। বড় মেয়েটির বয়স সাত বছর; ছোট ছেলেটির বয়স দু'বছর; দু'জনের মাঝখানে যেটি আছে তার বয়স পাঁচ বছর। অর্থাৎ মিনু, টুলু আর ভুলু। ছাপান্ন টাকা মাইনে পান নরু মামা, আর বাসা ভাড়া বারো টাকা; কাজেই নরু মামার সংসারটি হল বারোমেসে দুর্দশার একটা ছবি। এমন দিন যায়, যেদিন দু'বেলার কোনও বেলাতেই উনানে হাঁড়ি চড়ে না। সেদিন দু'বছর বয়সের ওই শিশুটাও পর্যন্ত পান্তা খায়; কেউ বা শুধু দু'মুঠো আটা গুলে নিয়ে, তার মধ্যে এক টুকরো গুড় ঘষে দিয়ে তিন চুমুকে খেয়ে ফেলে আর ঢেঁকুর তোলে। আর নরু মামা? জ্যোৎস্না মামি অনেক করে আর দিব্যি দিয়ে অনুরোধ করেন; তাই নরু মামা কাজে যাবার পথে নুটুর তেলেভাজার দোকান থেকে চার পয়সার ফুলুরি খেয়ে নেন।

সেদিনটা একেবারে খাঁটি উপোস করে, সজলা উপোস বটে, বাড়ির শুধু দুটি প্রাণ। এক জ্যোৎস্না মামি, দুই রানু। মামি কিছু খান না বলেই রানু কিছু খায় না। কিংবা রানু কিছুই খেতে চায় না বলে মামি খান না।

রানু তো আর কচি মেয়েটি নয়। রানুর বয়স সতেরো পার হয়ে আঠারোয় পড়েছে। সবচেয়ে কঠোর ও বাস্তব সত্য হল, নরু মামার এই সংসারে রানু একটি অতিরিক্ত আবির্ভাব। মা মরে গেছে কবেই, বাবাও মরে গিয়েছে প্রায় সাত বছর আগে। দশ বছর বয়সের রানুকে ঠাঁই দেবার মত একটা ঘর কোথাও পাওয়া গেল না। অনেক খুঁজেছিলেন বিধুবাবু, রানুর বাবার বন্ধু, একই জুটমিলের কেরানি। ভাটপাড়া, কলকাতা, হরিপাল, মন্তেশ্বর, ক্যানিং আর গিরিডি; কত জায়গায় কত ভদ্রলোকের কাছেই না চিঠি দিয়েছিলেন বিধুবাবু। রানুর কাছ থেকে নাম শুনে যাঁদেরই রানুর কোন আত্মীয় কুটুম্ব ধরনের মানুষ বলে বুঝেছিলেন বিধুবাবু, তাঁদেরই কাছে চিঠি দিয়েছিলেন : বাপ নেই, মা নেই এই মেয়েটাকে আপনি একটু আশ্রয়

দিন। ষোলোটি চিঠির মধ্যে দশটি চিঠির কোনও জবাবই তিনি পাননি; পাঁচটি চিঠির জবাবে ছিল প্রায় একই সুর আর ভাষা—খুবই দুঃখিত; কিন্তু ক্ষমা করবেন, আমার পক্ষে কিশোর ঘোষের এই মেয়েকে এখন আশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয়; কারণ আমি নিজেই অভাবগ্রস্ত, আমার নিজেরই সংসার কোনওমতে কায়ক্লেশে চলে, চলে না বললেই চলে।

জবাব দিয়েছিলেন শুধু এই নরু মামা। ছোট মামা তো কবেই ট্রেনে কাটা পড়ে মরেছেন। বিধবা ছোট মামীও নেই, তিনি পুরীতে তীর্থ করতে গিয়ে কলেরায় মরেছিলেন। তাঁরই বড়দা নরু মামাকে জীবনে শুধু একদিন দেখেছিল রানু। বাবা তখন ছিলেন। কি যেন একটা কাজের জন্য ভাটপাড়াতে এসেছিলেন নরু মামা। খুবই আদর করে রানুর পিঠে হাত বুলিয়ে নরু মামা বলেছিলেন—আপনার এই মেয়েকে খুব ইন্‌টেলিজেন্ট বলে মনে হচ্ছে, কিশোরদা। ভাল করে লেখাপড়া শেখাবেন। এইটুকু মেয়ের হাতের লেখা কী সুন্দর!

বিধুবাবুর কাছে চিঠি দিয়েছিলেন সীতারামপুরের নরু মামা : আমার হল নিত্য অভাবের সংসার। তারই মধ্যে যদি কিশোরদার মেয়েকে রাখতে চান তবে পাঠিয়ে দিন।

শত ধন্যবাদ দিয়ে নরুমামাকে চিঠি লিখেছিলেন বিধুবাবু। আর সাতটি দিনও দেরি না করে, হরি মাস্টারমশাইকে সঙ্গে দিয়ে রানুকে সীতারামপুরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

নরু মামা বোধহয় ভুলতে পারেননি, সাত বছর বয়সের সেই মেয়ের সেই সুন্দর হাতের লেখার ছবিটি। ইনটেলিজেন্ট মেয়েকে ভাল করে লেখাপড়া শেখাতে চেষ্টা করতেন যিনি, সেই কিশোরদাও আর নেই। কাজেই নরু মামা আর দেরি না করে রানুকে সীতারামপুরের মেয়ে-স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। জ্যোৎস্না মামি বলেছিলেন—ভালই হল! যদি আত্মা বলে কিছু থাকে, তবে কিশোরবাবু এখন দেখে সুখী হবেন যে, তাঁর মেয়ে স্কুলে পড়ছে।

পাড়ার লোকে অবশ্য নিন্দা করে; নরেশ কম্পাউণ্ডার লোকটা, তার চেয়ে বেশি তাঁর গিন্নিটি, বেশ একটু নিষ্ঠুর স্বভাবের মানুষ বলতে হবে। হলই বা কোনও এক কুটুম্বের একটা অনাথা মেয়ে, তাই বলে কি তাকে দিয়ে দু'বেলা রান্না করাতে আর বাসন মাজাতে হবে?

জ্যোৎস্না মামি বলেন—শুনেছ?

নরু মামা—কী?

—নলিন দারোগার বউ কী বলেছে?

—নরু মামা হাসেন—কুটুমের মেয়েকে আমরা খাটিয়ে মারছি, এই তো কথা?

—হ্যাঁ।

—তাকে কী আসে যায়?

—কিছু না। আমি ভাবি, এ রকম একটা ডাহা মিথ্যে কথা বলে ওরা কী সুখ পায়?

—ভেবে লাভ নেই।

—কিন্তু কথাটা রানুর কানে গেলে মেয়েটা কী ভাববে?

ও ঘরের ভিতরে রানুর হাসির শব্দ কলকল করে বেজে ওঠে—আমি কিছুই ভাবছি না মামি। রাসুর মা সকাল বেলাতে পাঁচটি মিথ্যে কথা না বলে জল খান না।

জ্যোৎস্না মামি চমকে ওঠেন—ছি, ওকথা বলতে নেই, রানু।

রানু—স্কুলে আমাদের ক্লাসের সব মেয়েই ওকথা বলে। আজই জয়ন্তীকে বলেছেন রাসুর মা: আমাদের দেশে এক একটা পটোল একমণ ওজনের হয়, আর তোদের এই সীতারামপুরে এক সেরে পঁচিশটা সিড়িঙ্গে পটোল লিকলিক করে।

নরু মামা হসেন, জ্যোৎস্না মামি হাসেন। রাসুর মা অর্থাৎ নলিন দারোগার স্ত্রীর রটনা যেন একটা মজার ঠাট্টার ধূলো হয়ে উড়ে যায়।

জোর করে কাজ করতে চেষ্টা না করলে রানুকে ঘরের কোনও কাজই করতে দেন না হাঁপানি রোগের ওই রোগা মানুষটি, জ্যোৎস্না মামি। চাল-বাড়ন্ত অরন্ধনের দিনে রানু জোর করে উপবাসী হয় বলেই চুপ করে বসে থাকেন জ্যোৎস্না মামি, আর আঁচল দিয়ে চোখ মোছেন। রানুর একবার চার মাসের স্কুলের মাইনে বাকি পড়েছিল, তাই সারারাত ঘুমোতে পারেননি নরু মামা।

হ্যাঁ, পরের দিন সকাল বেলা এক বুড়ো ভদ্রলোক, স্কুলের দপ্তরি জনার্দনের বাবা, রানু যাকে নন্দ দাদু বলে ডাকে, তিনি কম্পাউণ্ডার নরেশ সেনের বাড়িতে বৈদন্যাথের প্রসাদ দিতে এসে চেঁচিয়ে ডাক দিলেন—কই গো, মহারানী কোথায়?

রানু বের হয়ে আসে—এই তো।

—বৈদ্যনাথের প্রসাদ নাও। জনার্দন কাল দেওঘর থেকে ফিরেছে। কিন্তু হ্যাঁ, তোমাকে আজকাল স্কুলে যেতে দেখি না কেন?

—আমি আর স্কুলে পড়ব না।

—কেন?

—ইচ্ছে করে না।

—সে কী কথা। নরু বাড়িতে আছ নাকি হে? কী ব্যাপার, এসব কী কথা বলছে মহারানী। এর মানে কী?

পিঠছেঁড়া আর বুকছেঁড়া গেঞ্জিটার গলার ফাঁকে মাথা গলিয়ে আর টানাটানি করে পরতে পরতে ঘরের বাইরে আসেন নরেশ সেন—হ্যাঁ, নন্দকাকা। চার মাসের মাইনে বাকি, স্কুলে এবার মেয়ের নাম কেটে দেবে।

—কত মাইনে?

—চার মাসের ছ'টাকা।

—আমি দিচ্ছি টাকা।

রানুর চার মাসের স্কুলের মাইনের টাকা তক্ষুনি দিয়ে দিলেন নন্দ দাদু; আর বলেছিলেন—কিন্তু ভাল করে পাশ করা চাই, মহারানী।

কে জানে কেন? নলিন দারোগার স্ত্রী একদিন খুবই বিরক্ত হয়ে আর মেজাজ উষ্ণ করে পাশের বাড়ির শোভনার মার কাছে অভিযোগ করেছিল—তোমাদের মেয়ে স্কুলের দপ্তরি জনার্দনের বাপ, ওই নন্দ বুড়ো খুবই অধার্মিক একটা লোক।

—একথা কেন বলছেন, দিদি?

—চোখের উপরে কাণ্ডটা দেখলুম বলেই চোখ জ্বলছে, তাই বলছি। বৈদ্যনাথের প্রসাদ বলে আধখানা একটা পেঁড়া-সন্দেশকে ওই গরীব নরু কম্পাউণ্ডারের কাছে ছ'টাকায় বিক্রি করে চলে গেল গো!

যাই হোক, ওই নলিন দারোগার স্ত্রীর চোখের উপরে দিয়েই রোজ স্কুলে গিয়েছে রানু, বছরের পর বছর পার হয়েছে আর ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠেছে!

—শুনছ শোভনার মা! আবার একদিন পাশের বাড়ির জানালার দিকে তাকিয়ে ডাক দিয়েছেন নলিনবাবুর স্ত্রী।

—কি দিদি?

—রানু তো ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠল। খুবই ভাল কথা। কিন্তু তুমি কি বিশ্বাস করো সত্যি ম্যাট্রিক পাশ করতে পারবে রানু?

—একথা কেন জিজ্ঞেস করছেন দিদি?

—আমার তো মনে হয় না যে, পাশ করতে পারবে।

ভগবান জানেন, পরীক্ষা দিতে পারলে ম্যাট্রিকটা পাশ করতে পারবে কি পারবে না ওই মেয়ে, যার নাম রানু, যার বয়স আজ সতেরো পার হয়ে আঠারোতে পড়েছে। কিন্তু ভগবান বোধ হয় চান যে, রানুর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া যেন না হয়। তা না হলে আজ হঠাৎ বাড়িতে এসেই এত চেঁচিয়ে কথাটা বলে উঠলেন কেন নরু মামা—রাজা হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গেই রানুর বিয়ে হবে? শুনছ জ্যোৎস্না?

সাধে কি নন্দ দাদু নাম দিয়েছেন, মহারানী। নন্দ দাদুর দেওয়া এই নামটা যেন রানুর ওই চমৎকার আর সুন্দর রূপেরই একটা প্রশস্তি। ওই যে শোভনার মা, যিনি প্রতি রবিবার সাবান দিয়ে মাথা ঘষেন আর জানালার কাছে চুল এলিয়ে দিয়ে বসে থাকেন, রোদে শুকিয়ে যাঁর চুলের গোছা ফুলে ফেঁপে একটা স্তবক হয়ে ওঠে, তিনিও রানুকে মাঝে মাঝে ডাক দেন—ও রানু শুনছিস, একবার কাছে আয় তো দেখি।

রানু—কী দেখবেন?

—আয় দেখি, কী রকম চুল করেছিস।

কোনওদিন রানুর বেণীতে হাত বুলিয়ে, কোনওদিন রানুর এলোচুলের গোছা দুই হাতে জড়িয়ে ধরে, আর সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধ হয়ে কথা বলেন শোভনার মা—অ্যাঁ? হ্যাঁ রে মেয়ে, কী করে এমন চুল করলি বলতো? আমলকির তেল মাখিস বুঝি?

—না না।

—তবে?

—সরষের তেল।

—কী আশ্চর্য, মুদির দোকানের ওই ছাই সরষের তেল।

—হ্যাঁ।

—তবে তো আমি আজ থেকে কেরোসিন তেল মাথায় মাখব, তোর চেয়েও আমার ভাল চুল হবে, কী বলিস?

কিছু বলে না রানু। শুধু হাসে আর চলে যায়।

সত্যি কথা, রানুর ম্যাট্রিক পাশ করার কথাটার চেয়ে রানুর বিয়ের কথাটাই এই তিন মাস ধরে সব চেয়ে বেশি চিন্তা করেছেন নরেশ সেন। খুব বেশি কথা বলেন যে নরেশ সেন, তিনি এই তিন মাস হল খুবই গম্ভীর। যখন-তখন এক হাতের পাঁচটি আঙুলকেই কপালের উপর ঠুকে ঠুকে আর চেপে চেপে একটা যন্ত্রণাকে চাপা দিতে চেষ্টা করছেন। উঠোনের পেঁপে গাছে একটাও পেঁপে ফলেনি. পেঁপে গাছের ডালে বসে কোনও শালিকও ডাকে না; শুধু দুই চোখের তারা একেবারে নিশ্চল করে দিয়ে ওই পেঁপে গাছেরই দিকে তাকিয়ে থাকেন।

তাই আজ একটু আশ্চর্য হবারই কথা। আর রানুর জ্যোৎস্না মামি সত্যি আশ্চর্য হয়েছেন; তিন মাস ধরে গম্ভীর হয়ে আছে যে মানুষটা, সে আজ যেন অদ্ভুত একটা উৎসাহে পাগল হয়ে উঠেছে।

জ্যোৎস্না বলেন—কী যে বলছ, কিছুই বুঝতে পারছি না।

—যা বলছি একেবারে জেনে-শুনে আর নিশ্চিন্ত হয়ে নিয়ে বলছি। রানুর বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলেছি।

—পাত্র কোথায় পেলে?

—ওই যে, রাজা হরিশ্চন্দর।

জ্যোৎস্না —তার মানে?

—ওই যে, নবমীর রাত্রিতে বারোয়ারি তলার যাত্রাতে যাকে হরিশ্চন্দ্রের পার্ট করতে দেখলে।

জ্যোৎস্না—সে কী? জটপাকনো চুল, মুখ ভরা দাড়ি, সে তো বেশ বয়স্ক একটা মানুষ।

—নিতান্ত অল্প বয়স্ক মানুষ। তুমি যা দেখেছ সে সব হল শনের চুল আর দাড়ি। সে ছেলের মাথায় কালো কুচকুচে চুল আর মুখে কোনও দাড়িই নেই।

জ্যোৎস্না—তোমার চেনা ছেলে?

—একরকম চেনা ছেলেই বলা যায়। ওর বাবা চরণ বসু আর আমি কাঞ্চননগর হাইস্কুলের একই ক্লাসের ছাত্র ছিলাম। ওরা হল সেই মালাধর বসুর বংশ। নদীর এপারে বীরপুরের মালাধরী গোষ্ঠীর একটি শাখা থেকে ওরা হল মাত্র ছয় পুরুষ।

জ্যোৎস্না—বুঝলাম; কিন্তু ছেলে কী করে?

—ছেলে এখন বর্ধমানে মোক্তারি পড়ছে। ছেলের বয়স হবে সাতাশ-আটাশ।

ছেলে খুব ফর্সা, যদিও একটু বেশি ছিপছিপে। ছেলের নাকটি কিন্তু বাঁশির মতন, বেড়ে নাক।

জ্যোৎস্না—ছেলের আপন বলতে কে কে আছে? ঘর-বাড়ির অবস্থা কেমন?

—ঠিক আপন বলতে কেউ নেই। তিন শরিকের খুড়ো-জেঠারা আছেন। নিজের ঘর-বাড়ি নেই বটে; তাই বলে অবস্থাটা তোমার সীতারামপুরী সংসারের অবস্থা নয়। জমি আছে ছেলের, ভাগচাষে যা পাওয়া যায়, তাতে একটি ছোট সংসারের ভাত-কাপড়ের কোনও অভাব হতে পারে না। মোট কথা, মোটা ভাত-কাপড়ে রানুর জীবনটা একরকম ভালই থাকবে।

জ্যোৎস্না—কিন্তু আর অন্তত সাত আট মাস দেরি করলে ভাল হত না কি? মেয়েটা ম্যাট্রিক পাশ করে নিত, তারপর এর চেয়ে আর একটু ভাল অবস্থার ছেলের সঙ্গে, না হয় এই হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গেই...।

—ছেলের নাম হরিশ্চন্দ্র নয়। কান্তিনাথ বসু।

জ্যোৎস্না—বেশ তো, না হয় এই কান্তিনাথ বসুরই সঙ্গে রানুর বিয়ে হবে। কিন্তু ম্যাট্রিকটা পাশ করুক রানু।

—না, আর দেরী করা চলে না।

জ্যোৎস্না—লোকে বলবে, খরচের ভয়ে মেয়েটার পড়া বন্ধ করে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে নরেশ সেন।

—তা তো বলবেই।

জ্যোৎস্না—কিন্তু বিয়ে দিতেও তো খরচ আছে?

—কোনও খরচ নেই। ছেলের দিক থেকে কোনও দাবি-দাওয়া নেই।

জ্যোৎস্না—ছেলে কি রানুকে দেখেছে?

—হ্যাঁ, নন্দ কাকা একদিন কান্তিকে সঙ্গে নিয়ে বাজার যাবার পথে রানুকে দেখিয়ে দিয়ে বলেছে, ওই, ওটি হল আমাদের মহারানী।

জ্যোৎস্না—তাতে হল কী?

—তাতে এই ফল হল যে, নন্দ কাকার কাছে একেবারে মুখ খুলে অনুরোধ করে ফেলেছে কান্তি, আপনার এই মহারানীর সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন। আর, নন্দ কাকাও বলছেন, যদি তোমাদের কোনও আপত্তি না থাকে নরু, তবে ওই কান্তির সঙ্গে মহারানীর বিয়েটা ঘটিয়ে দাও।

নরেশ সেনের এই খুব বেশি ও বাচাল উৎসাহে সায় দিয়ে ঘরের মেটে পিদিমের মৃদু শিখাও যেন ছটফট করে আর জ্বলজ্বলিয়ে কেঁপে উঠল। আর, তারপর আর মাত্র সাতদিনের মধ্যেই বিয়ে হয়ে গেল।

কান্তিনাথের দেশ থেকে মাত্র দু'জন মানুষ সীতারামপুরে এসেছে, একজন পুরোহিত, আর দক্ষিণ শরিকের বড় কাকা, শ্রী নটেশ্বর বসু। নন্দ কাকা একটা গ্যাস-বাতি পাঠিয়ে দিলেন, সেই বাতির আলোতে আঙিনার আলপনাতে আঁকা পদ্মকলি

আর চমক-তারা বেশ ভালই দেখতে পাওয়া গেল। শোভনার মা দিয়েছেন যে চাঁপা রঙের ধনেখালি, তাই পরে বিয়ের পিঁড়িতে বসল রানু, সেই সাজেই বাসরঘরে গেল। ওই তো বাসরঘর, যে ঘরের বেড়ার ফাঁক আর ফাটলগুলি ছেঁড়া কাঁথা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। টিনের একটি ছোট তোরঙ্গ, তার মধ্যে এক শিশি আলতা আর সিঁদুরের একটা মোড়ক, এই হল রানুর বিয়ের উৎসবের সব চাওয়া ও সব-পাওয়া।

বিয়ের অনুষ্ঠানের সবই যখন শেষ হল, শোভনার মা'ও বাড়ি চলে গেলেন, তখন খুব জোরে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন নরেশ সেন—আঃ, এইবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

জ্যোৎস্না চোখ মোছেন—তুমি কেমন যেন শক্ত মন নিয়ে কথা বলছ।

গলার স্বর চেপে কথা বলেন, যেন নিঃশ্বাসের শব্দটাকেও লুকিয়ে ফেলতে চেষ্টা করেন নরেশ সেন—বিশ্বাস করো জ্যোৎস্না, তোমাদের রানু বেঁচে গেল।

ও কী? আর একটু হলে বোধহয় চেঁচিয়ে উঠতেন জ্যোৎস্না। কত শক্ত করে জ্যোৎস্নার একটা হাত চেপে ধরলেন নরেশ সেন, আর চোখ দুটোও কেমন জ্বলজ্বল করছে। ঠিকই, হঠাৎ ভয় পেয়ে চমকে উঠেছেন জ্যোৎস্না।

আর, ওদিকে বাসরঘরের ভিতরে মেটে পিদিমের আলোতে কান্তিনাথের মুখটাকে হাসতে দেখে চমকে উঠেছে রানু। এ কী! এ যে একটা চেনামুখ বলেই মনে হচ্ছে। ওই নাক আর ওই চোখ যেন কোথায় একদিন দেখেছিল রানু। হারাণবাবুর দোকানের সামনে নন্দ দাদুর কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল ভদ্রলোক, সে-ই কী এই? কিংবা নবমীর রাত্রিতে বারোয়ারি তলার যাত্রাতে শৈব্যা শৈব্যা বলে করুণ গলার স্বরে ডাক দিয়ে দিয়ে কাঁদছিল যে, সেই....।

কান্তিনাথ বলে—চিনতে পারছ?

কোনও কথা বলে না রানু। কান্তি বলে—যাত্রা পার্টির সঙ্গে আমিও এসেছিলাম তোমাদের এই সীতারামপুরে। তুমি সেই যাত্রা দেখেছ?

রানু মাথা নাড়ে—হ্যাঁ।

কান্তি হাসে—তবে আমাকে চিনতে পারছ না কেন?

মুখ তুলে আর দুই চোখ বড় করে কান্তিনাথের মুখের দিকে তাকায় রানু।

কান্তি বলে—হ্যাঁ, আমিই সেই রাজা হরিশ্চন্দ্র।

॥ ২॥

যে ট্রেনের ঠিক মাঝরাতে এসে এই বীরপুর স্টেশনে থামবার কথা, সেই ট্রেন এসে যখন থামল, তখন ভোর হয়ে গিয়েছে। রানুর স্বামী কান্তিনাথ তখনও রানুর পাশে বসে তার মাথাটাকে ভাঙা গাছের ডালের মত একেবারে ঝুলিয়ে দিয়ে ঘুমোচ্ছে। ওদিকে জেগে বসে আছেন দক্ষিণ শরিকের বড় কাকা, যাঁর চোখ দুটো ঘুমোতে না পেরে লাল হয়ে উঠেছে।

রানুও ঘুমোয়নি। মাথায় আধ-ঘোমটার মত টেনে দেওয়া ধনেখালির আঁচলের

লালচে পাড়ের নক্সাটা যেন একটু কুঁকড়ে গিয়েছে। জানালার কাঠের উপর দুই হাতের উপর থুতনিটাকে অলস করে পেতে দিয়ে, সারারাত যেমন বসেছিল রানু, তেমনই বসে থেকে ভোরের বীরপুর স্টেশনের একটা গাছের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওটা নিশ্চয় একটা কচি কৃষ্ণচূড়া, তাই এখনও ফুল ধরেনি। রাতজাগা ক্লান্তির প্রলেপ মেখে রানুর চোখের কাজল আরও কালো হয়ে উঠেছে।

কী আশ্চর্য, এখনও ভাল করে জেগে ওঠেনি বীরপুরের যে ষ্টেশন, তারই প্ল্যাটফর্মের কাঁকরের উপর দিয়ে তড়বড় করে লাঠি ঠুকে ঠুকে একটা ভিখারী এসে রানুর চোখের সামনে দাঁড়ায় আর গান গায়, ক্ষুদিরামের ফাঁসির গান। গানের সঙ্গে ভিখারীর ড্যাবা ড্যাবা চোখ দুটো যেন ঠিকরে বের হয়ে আসছে। একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি—গানের চিৎকারে ভিখারীর গলার শিরাও ফুলে উঠে কাঁপছে।

কোথায় গেল সেই পণ্ডিতদা, বরপক্ষের সেই পুরুতমশাই? সীতারামপুর থেকে ট্রেন ছাড়তেই একটা হল্লা শুনে চমকে উঠেছিল রানু। স্টেশনের কোনও হল্লা নয়, ট্রেনের এই কামরার ভিতরে একটা তর্ক ও ঝগড়ার হল্লা।

চা আর বিড়ির জন্য আরও আট আনা দাবি করে কান্তিনাথের সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু করেছেন পণ্ডিতদা। পুরো একটি ঘন্টা লেগেছিল সেই ঝগড়া থামতে, তারপর আরও আধঘন্টা পরে পাঁচদীঘি নামে একটা স্টেশনে যখন নেমে পড়লেন পণ্ডিতদা, তখন শুনতে পেয়েছিল রানু, গরগর করছে কান্তিনাথের মুখে একটা রাগের ভাষা—ছোটলোকটাকে না নিয়ে এলেই ভাল হত।

অন্ধ ভিখারীর গানটা শুনতে একটুও ভাল লাগে না। তাই চোখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকায়, আর মাথা কাত করে একটা কান হাতের উপর রেখে, আর এক হাতে কপালটাকে বোলাতে থাকে রানু। ভোরের বাতাসে কপালের একপাশে ফরফর করছে সরষের তেলে চিকনকরা সেই চুলের একটা ভাঙা গুচ্ছ। সুড়সুড় করছে কপালটা।

তারপর আর বেশি দেরি হয়নি। স্টেশনের কাছে সেই কচি কৃষ্ণচূড়ার পাশের রাস্তা ধরে চলে গেল গো-গাড়ি, তার মধ্যে আবার কান্তিনাথের পাশে কুঁকড়ে একেবারে ছোট্ট এইটুকু একটা শরীর হয়ে বসে থাকে রানু। দক্ষিণ শরিকের বড় কাকার জন্য সাইকেল এসেছিল। গো-গাড়ি চলবার আগেই তিনি চলে গেলেন, কে জানে কোন পথে আর কোন দিকে!

বুঝতে পারেনি রানু, কতক্ষণ ধরে পথ চলেছে এই গো-গাড়ি, আর কখনই বা থেমে গিয়েছে। দক্ষিণ শরিকের বড় কাকিমা যখন গো-গাড়ির কাছে এসে রানুর কপালে বরণডালা ঠেকালেন, তখন দুপুর হয়ে গিয়েছে। গো-গাড়ির কাছে একটা ভিড় জমেছে। অনেক বউ-মানুষ আর অনেক মেয়ে। সবাই শরিকের কাকা আর জেঠাদের বাড়ির মানুষ নয়, বাগদি পাড়ার বউ-ঝিও আছে। দুই চোখ বন্ধ করেছে রানু, তাই দেখতে পায় না, কে আশ্চর্য হয়ে দুই চোখ বড় করে তাকিয়ে আছে, কে

তার চোখের দু'টি ভুরুকে কুঁচকিয়ে একেবারে কেঁচোর মত পাকিয়ে দিয়ে তাকাচ্ছে, আর কে-ই বা মুখ টিপে হাসছে।

বড় কাকিমার বরণডালা চলল আগে, পিছনে নতুন বউ রানু, তার পিছনে কান্তিনাথ। বরবধূকে একটা ঘরের ভিতরে নিয়ে এসে একটা হাঁপ ছাড়লেন বড় কাকিমা, তার পরেই চলে গেলেন।

কেমন ঘর? দক্ষিণ শরিকের আমবাগান পার হয়ে একটা ডোবার ধারে মস্ত বড় একটা চালতে গাছের পাশে একটি ঘর। মাটির মেঝে, কঞ্চি বাখারির বেড়া আর টিনের চালা। ওই চালতে গাছ হল দক্ষিণ শরিকের আমবাগানের সীমানার চিহ্ন, আর ওদিকে শুধু ওই ঘরটিই হল চরণ বসুর সম্পত্তির অবশেষ, পুত্র কান্তিনাথ বসুর আপন ঘর।

দক্ষিণ শরিকের বড় কাকিমা তাঁর বাড়ির ঝি বেনুর মাকে দিয়ে দু'থালা ভাত পাঠিয়ে দিলেন, সেই সঙ্গে দু'টুকরো মাছ-ভাজা, দু'বাটি ডাল আর দু'ছিটে শাক-ঘন্ট। দুপুরের খাওয়া সেরে নিয়ে নতুন বউ রানু যখন মেটে মেঝের উপর একটা মাদুরের উপর গড়িয়ে পড়ে, তখন দুই চোখ ভরে যেমন গভীর ঘুম, তেমনই স্বপ্নও নিবিড় হয়ে নেমে আসে।

কিন্তু মাঝে মাঝে এমন গভীর ঘুম আর নিবিড় স্বপ্নও ভেঙে যায়। কারণ, একের পর এক অদ্ভুত কৌতূহল আর কলরব এসে ঘরের দরজার কাছে ভিড় করছে আর চলে যাচ্ছে। বেজে উঠছে এক একটা দমকা হাসি, আর চমকা মন্তব্যের শব্দ। কে যেন বলতে বলতে চলে গেল—চুরি করেনি কান্তি, ডাকাতি করেছে। তা না হলে এমন জিনিস....।

কে যেন বলছেন—কী মেয়ে কী ঘরেই না এল!

কিন্তু রানুর স্বামী কান্তিনাথ এখন এই বিকেলে ঘর থেকে বের হয়ে কোথায় গেল? ঘুমোবে, না জেগে বসে থাকবে, নতুন বউ-এর শ্বশুরবাড়িতে আসা জীবনের প্রথম দিনের নিয়মটা কী? কে বলে দেবে, কাকেই বা সে-কথা জিজ্ঞেস করবে রানু? এই বীরপুরে কি কোনও শোভনার মা নেই? নন্দ দাদু নেই? জ্যোৎস্না মামির মত পিঠে হাত বুলিয়ে দেন, সেরকম একটি মানুষ কি নেই?

সন্ধ্যা হলে ওই দক্ষিণ শরিকের বড় কাকিমা আর একবার এসে ঘরে ঢুকলেন—কান্তি বুঝি ঘরে নেই?

এইবার কথা বলে রানু—না।

—কোথায় গেল?

রানু—জানি না।

—বুঝেছি।

নতুন বউ রানুর বুকের ভিতরে দুরু দুরু ভাবনার ভয়টাও এবার আর মনের প্রশ্নটাকে চেপে রাখতে পারে না। জিজ্ঞাসা করে ফেলে—কী?

বড় কাকিমা—নিশ্চয় আবার সেই পূবের বাড়ির হাড়-কিপটে মতি বোসের কাছে গিয়ে হাত পেতে ধার চাইছে কান্তি। মতি বোসেরই বা দোষ কী বলো? কত ধার দেবে? ধার যে কখনও শোধ করে না কান্তি।

—ঘরে বাতি আছে তো? এদিক-ওদিক তাকিয়ে যেন একটু নিশ্চিন্ত হলেন বড় কাকিমা—হ্যাঁ, একটা বাতি আছে দেখছি।

না, তার পর আর বেশিক্ষণ নয়। বাতিটাকে জ্বেলে দিয়েই চলে গেলেন দক্ষিণ শরিকের বড় কাকিমা, কারণ তাঁর ঠাকুর-ঘরে এখন ঘন্টা বাজছে, আরতি শুরু করে দিয়েছে বিশু ভট্টাচার্য।

মাদুরের উপর চুপ করে আর অনড় হয়ে বসে শুনতে থাকে রানু, দূরে কোথায় যেন শিয়াল ডাকছে। বোধহয় নদীর কিনারায় সেই কাশ ঘাসের বনে। গো-গাড়িতে বসে দেখতে পেয়েছিল রানু, সকালবেলার রোদে কত সাদা হয়ে দুলছে আর কাঁপছে সেই কাশবন।

আমবাগানের অন্ধকারের ভিতর দিয়ে একটা চাপা গলার গানের গুঞ্জন ভেসে আসছে। এই ভদ্রলোকই কি আসছেন, না অন্য কেউ? দরজার কপাটে খিল এঁটে দেওয়া উচিত। কিন্তু রানুর মনের ভয়টা আর সাহসী হয়ে উঠতে পারে না। চুপ করে বসেই থাকে রানু। ঘরে ঢোকে কান্তিনাথ।

রানু—কোথায় ছিলে তুমি? আমার যে একা থাকতে খুব ভয় করেছে।

কান্তিনাথ হাসে—তা একটু-আধটু ভয় তো করবেই হবে। এ তো আর সীতারামপুর নয়, এ হল বীরপুর।

কান্তিনাথের হাতে ছোট একটা চাঙারি। সেই চাঙারিতে গোটা দশ পরোটা, কিছু আলুর তরকারি, আর চারটে জিলিপি।

কান্তিনাথ বলে—মধু ময়রা পরোটা করে ভাল। বাদাম তেলে ভাজা নয়। ঘিয়ে ভাজা এরকম পরোটা তোমাদের সীতারামপুরে পাওয়া যায় না। গাঁ-দেশে এখনও খাঁটি জিনিস আছে। আমরাও এখনও এই গাঁ-দেশে আছি বলেই একটু খাঁটি আছি।

রানুর দু'চোখ ভাসিয়ে দিয়ে জল ঝরে পড়তে থাকে। কান্তিনাথ হাসে—মিছে কাঁদছ কেন? কেঁদে কোন লাভ নেই। এখানে শত কাঁদলেও সীতারামপুরের বায়োস্কোপের মত কোনও মজা তোমার চোখের কাছে এসে পড়বে না। বীরপুর হল বীরপুর।

চোখ মুছতে খুব দেরি করে না রানু। আর সোজা দৃষ্টি তুলে দুই চোখ অপলক করে কান্তিনাথের মুখের দিকে তাকায়। —তুমি তো শিগগির বর্ধমানে গিয়ে মোক্তারি পরীক্ষা দেবে।

—ইচ্ছে আছে। তবে ঠিক বুঝতে পারছি না; শেষ পর্যন্ত পরীক্ষাটা দেওয়া হবে কি হবে না।

রানু—তোমার তো অনেক জমি আছে; সে জমিতে অনেক ধানও হয়।

—হ্যাঁ হয়; কিন্তু জমিটা দু'বছর হল বন্ধক হয়ে পরের হাতে আছে। তাই সে জমির ধান-টান এখন আর আমার হাতে আসে না।

রানু—তবে তো তুমি খুবই কষ্টে আছ মনে হচ্ছে?

—কষ্টে আছি বইকি।

বলতে ইচ্ছে করে, তবে বিয়ে করলে কেন, আমাকেই বা এখানে নিয়ে এলে কেন? বেশ তো ছিলাম সেখানে; যখন ইচ্ছে হত আটা গুলে খেয়ে নিতাম; জ্যোৎস্না মামি তাড়াতাড়ি এসে এক-টুকরো গুড়ও সেই আটাগোলার মধ্যে ফেলে দিয়ে যেতেন। না, আমি তোমার এই পরোটা আর জিলিপি খেতে পারব না। খেতে একটুও ভাল লাগবে না।

কিন্তু ইচ্ছেটা শুধু ইচ্ছে হয়েই মনের ভিতরে যেন গুন্‌গুন্ করে কাঁদে; বলা আর হয় না।

কান্তি বলে—নাও, খেয়ে নাও এবার।

খায় রানু। খাওয়ার শেষে মাটির হাঁড়ি থেকে জল গড়িয়ে খায়। তারপর আনমনার মত হাত চালিয়ে খোঁপাটাকে খুলতে গিয়ে মনের আর একটা প্রশ্নের কথা বলেও ফেলে—কিন্তু তোমার এরকম কষ্ট করলে চলবে কেন?

—তা তো চলবেই না।

রানু—তবে?

—তবে চেষ্টা করে একটা চাকরি-বাকরি যোগাড় করতেই হবে।

রানু—চাকরি পাওয়া যাবে তো?

—যখন পুরুষ মানুষ হয়েছি, তখন একটা চাকরি পেয়েই ছাড়ব নিশ্চয়ই, সেজন্য কোনও চিন্তা করি না। কিন্তু তুমিই বা এরই মধ্যে এত চিন্তা শুরু করে দিলে কেন? না, কখ্‌খনও না, কোনও চিন্তা করবে না বলে দিচ্ছি।

কান্তিনাথের কথা বলবার ভঙ্গিটা রাজা হরিশ্চন্দ্রের সেই প্রতিজ্ঞার ভঙ্গিটার মত শোনায়। শুনতে মন্দ লাগে না। কিন্তু বুঝতে পারে না রানু, প্রতিজ্ঞার কথা শুনে বুকের ভেতরে দুরু দুরু ভাবটা দূর হয়ে গেল কিনা।

পুরুষ মানুষ কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েছে, এরই মধ্যে নাক ডাকতে শুরু করে দিয়েছে। কী আশ্চর্য, এরকম এক মুহূর্তের মধ্যে এমন করে ঘুমিয়ে পড়তে পারে মানুষ। আগে কখনও এরকম ঘুমের মানুষ দেখেনি রানু।

পুরুষ মানুষ তো বটেই, কিন্তু খুবই আশ্চর্যের পুরুষ মানুষ বলতে হবে। শোভনা ওর বিয়ের পরের দিনেই রানুকে ডেকে নিয়ে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিল : খুব ভাল লোক, আমার একটুও ভয় করেনি। খুব ভাব করে কত গল্পই না বলল, তারপর সত্যিই বিশ্বাস কর রানু, হাত বাড়িয়ে আমার একটা হাত ধরে ফেলল।

রানু—ভয় করেনি তোর? লজ্জা করেনি তোর?

শোভনা—দূর পাগল! বরের কাছে আবার কিসের ভয়, আর কিসের লজ্জা?

রানুর বর কান্তিনাথ কিন্তু রানুর হাত ধরেনি, সে দিনও না, আজও না। কে জানে, এটাই বোধ হয় বীরপুরের নিয়ম। কিন্তু ভালই হয়েছে, ভাল করে একটিও গল্প করল না যে মানুষ, সে হঠাৎ হাত ধরে ফেললে বুকটা যে সত্যি ভয় পেয়ে কেঁপে উঠত।

কিন্তু রানু যে ঘুমোতেই পারে না। ছোট ছোট কিন্তু বড় দুরন্ত এক একটা স্বপ্ন এসে ঘুমটাকে যেন আচমকা ঠেলা দিয়ে দিয়ে ভেঙে দেয়।

নরু মামা বলছেন — কী রে মেয়ে; কেমন তোদের বীরপুর?

রানু বলে—তুমি এ কী কাণ্ড করে বসলে মামা? কেন আমাকে এমন করে সাত তাড়াতাড়ি তাড়িয়ে দিলে?

শোভনা বলে—কী হল, সব কথা খুলে বল, একটুও লুকোতে পারবি না।

রানু—কিচ্ছু না। চুপ কর, কোনও কথা বলবি না।

জ্যোৎস্না মামি বলেন—খুড়ি-শাশুড়ি আর জেঠি-শাশুড়িরা কে কেমন আদর করল বল? প্রথম কে তোর মুখে পায়েস দিল?

রানু—কেউ না, কেউ না। তুমি চুপ করো মামি।

—রাগ করেছিস, মনে হচ্ছে?

—হ্যাঁ।

—কার উপর রাগ?

—মামার উপর।

—কেন?

—মামা কেন এত ব্যস্ত হয়ে আমায় দিয়ে দিলেন?

—তোর ভালর জন্যই রে। বুঝিস না, এখানে কী কষ্টে তোকে থাকতে হচ্ছে। এখন তবু মোটা ভাত কাপড়ের সুখটুকু পাবি।

—ভুল, তুমি ভয়ানক ভুল বুঝেছ মামি। মোটা ভাত-কাপড়ের কোনও ভরসার চিহ্নও সেখানে দেখলাম না।

—বলিস কী? বলিস কী? জ্যোৎস্না মামি কেঁদে ফেললেন।

মিনু টুলু আর ভুলু এসে রানুর হাত ধরে টানাটানি করে—কই দিদি, তোমার হাতে সোনার চুড়ি নেই কেন?

রানু হাসে—কে দেবে সোনার চুড়ি?

—তোমার বর।

রানু—না, দেবে না।

—কেন?

—বরের টাকা নেই। বর এখন শুধু পুবের বাড়ির কাকার কাছে গিয়ে হাত পাতে আর ধার চায়।

মিনু টুলু আর ভুলুর মুখ শুকিয়ে যায়। রানুর হাত ছেড়ে দিয়ে রানুর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

ঘুম ভেঙে যায় রানুর। সবই স্বপ্ন, মজার স্বপ্ন। তবু ভাল, সত্যি হলে খুব খারাপ হত। ওরকম শক্ত কথা শুনিয়ে দিলে কী দুঃখই না পেতেন নরু মামা। এখানেও ভাত-কাপড়ের কষ্ট; জানতে পারলে যে নরু মামার বুকটা আক্ষেপ করতে করতে ভেঙে যাবে।

না, আর পরোটা জিলিপি নয়, পরের দিন ঝুড়ি-ভর্তি করে চাল ডাল আটা নিয়ে আসে কান্তিনাথ। রান্না-টান্না না করে, শুধু একবাটি আটা গুলে আজ খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। কিন্তু ওই মানুষটি তো রান্না করে ভাত-ডালই খাবে। কাজেই রান্না করতেও হয়।

স্বামীর ঘরে নিজের হাতে রান্না করে ডাল-ভাত খেয়ে যখন মেঝের মাদুরের উপর গড়িয়ে পড়ে রানু, তখন ঘরের দরজার কাছে বসে ঢেঁকুর তোলে, পান চিবোয়, আর মাঝে মাঝে সেই বাঁশির মত নাকেতে নস্যিও দেয় কান্তি।

—কান্তি আছ হে? এদিকে এসো একবার; দেখে যাও, এ কী ব্যাপার। একটা হল্লা যেন ব্যস্ত হয়ে এই ঘরের দিকে ছুটে আসছে। কান্তি ছুটে যায়।

চমকে ওঠে রানু; উঠে এসে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ায়। আর অদ্ভুত একটা দৃশ্যও দেখতে পায়। একজনের হাতে একটা খবরের কাগজ। পাঁচজনে বার বার যেন থাবা দিয়ে সেই কাগজ কাড়ছে আর পড়ছে।

হল্লার লোকগুলি চলে গেল। কান্তিনাথ সেই খবরের কাগজ হাতে নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকেই চেঁচিয়ে ওঠে—সীতারামপুর সংবাদ। কী বিশ্রী কাণ্ড!

রানুর চোখের তারা দুটো ছটফট করতে থাকে—অ্যাঁ। সীতারামপুরের সংবাদ। কিসের সংবাদ? কী হয়েছে সীতারামপুরে?

কান্তিনাথের হাত থেকে কাগজটাকে হাতে তুলে নিয়ে নিজেই খবরটাকে পড়তে থাকে রানু। খবর এই যে, নরেশচন্দ্র সেন নামক জনৈক কম্পাউণ্ডার নিজেই ভাতের সহিত উগ্র বিষ মিশাইয়া দিয়া স্বয়ং নিজে খাইয়াছেন, স্ত্রী এবং তিনটি ছেলে-মেয়েকে খাওয়াইয়াছেন। সকলেরই মৃত্যু ঘটিয়াছে। মৃত নরেশচন্দ্র একটি চিঠিতে স্বীকারোক্তি করিয়া গিয়াছেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় সপরিবারে আত্মহত্যা করিলেন। পুলিশের তদন্ত চলিতেছে।

নরু মামা, তুমি কী ভয়ানক মানুষ। অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবার আগে শুধু এই একটি কথাই বলে রানু।

চালতে গাছের পাশে ডোবার ধারে এই ঘরটা যেন একটা কান্নাঘর। মাঝরাতে কিংবা শেষরাতে যে-ই আমবাগানের ওদিকের সড়ক ধরে যাওয়া-আসা করে, সেই শুনতে পায়, কে যেন কাঁদছে। যারা ঘটনার কথা জানে, তারা বোঝে, কাঁদছে চরণ বোসের ছেলে কান্তিনাথের বউ। যারা ঘটনার কোনও কথাই শোনেনি, তারা শুধু আশ্চর্য হয়ে ভাবে, কে কাঁদে? কেউ বা ভয় পায়, মেয়েমানুষের কান্না বলেই তো মনে হচ্ছে, কিন্তু সত্যিই কি কোনও মেয়েমানুষ এত করুণ সুরের কান্না কাঁদতে পারে! সেই রকম কোনও মেয়েমানুষের কান্না নয় তো, যাদের কায়াও নেই, ছায়াও

নেই, গত জন্মের একটা প্রতিহিংসার তৃপ্তির জন্যে অন্ধকারের মধ্যে মিশে ভয়ানক করুণ কান্না ছড়িয়ে দিয়ে সারা গাঁয়ের অমঙ্গল করে? কেউ কেউ জোরে পা ফেলে হাঁটে, কেউ বা দৌড় দিয়ে পালায়।

কিন্তু এই চালতে গাছের কাছে এসে দাঁড়ালেই শোনা যায়, ঘরের ভিতরে ওই কান্নাটার পাশে একজন ঘুমন্ত মানুষের নাক ডাকার শব্দও একটানা বেজে চলেছে। ঠিকই, চরণ বোসের ছেলে কান্তিনাথের ঘুমের কোনও ব্যাঘাত নেই, তার নতুন বউটি ঘুমিয়ে পড়ুক বা না পড়ুক।

বিছানার উপর বসে আর জেগে জেগেই শুনতে পায় রানু, নরু মামা কেঁদে কেঁদে বলছেন, রানু খুব বেঁচে গেল, জ্যোৎস্না।

বুঝতে পেরেছি মামা, তুমি কেন সাত তাড়াতাড়ি আমার বিয়ে দিলে! ওই রকম ভয়ানক কাজটি করবার জন্যে, ভাতে বিষ ঢালবার আগেই আমাকে সরিয়ে দিলে! তুমি তোমার কিশোরদার মেয়েকে মেরে ফেলতে পারবে না বলেই এই ব্যবস্থা করেছিলে, কেমন? তাই না? সত্যি করে বলো, মামা। আমিও না হয় তোমাদের সঙ্গে চলে যেতাম। তাতে দোষ কী হত? কে তোমাকে দোষী করত? তোমাকে দোষী করতে পারে, এরকম কোনও মানুষ নেই এই পৃথিবীতে। কার এত সাহস আছে যে, তোমাকে দোষী করবে?

মাত্র একটি মাসও পার হয়নি, সীতারামপুর থেকে রানুর নামে বীরপুরের ঠিকানায় একটি চিঠি আসে। চিঠিটাকে বুকের উপর চেপে ধরে অনেকক্ষণ কেঁদে নেয় রানু, যদিও চিঠিটা হল শোভনার লেখা ছোট্ট একটা চিঠি : কেউ কিছুই বুঝতে পারছে না রানু, নরু কাকা কেন এমন ভয়ানক কাণ্ড করলেন। হ্যাঁ, চন্দর মুদি সেদিন বাবার কাছে এসে একটা চিঠি দেখিয়ে গিয়েছেন, নরু কাকারই হাতের লেখা একটা পোস্টকার্ড। মরে যাবার দিনে লেখা একটা চিঠি; ভাই চন্দর, পাওনা টাকা আর দিয়ে যেতে পারলাম না, কিছু মনে করো না।

কিন্তু যাবার আগে জ্যোৎস্না মামি কি বলে গেল? মিনু আর টুলুটা ও ভুলুটাও কি কোনও কথা বলেছিল? সীতারামপুর থেকে আসবার দিনে ভুলুর প্যান্টের ছেঁড়াটাকে সেলাই করে দিয়েছিল রানু। ভুলু কি সেই প্যান্ট পরে চলে গেল?

রানুর বুকের ভিতরের এইসব নীরব প্রশ্নের আর্তনাদ কে-ই-বা শুনবে, আর জবাবই বা দেবে কে? কাজেই আর চুপ করে দাঁড়িয়ে না থেকে এঁটো বাসনগুলিকে তুলে ডোবাটার জলের কাছে গিয়ে দুটো ইঁটের উপর উবু হয়ে বসে আর বাসন মাজে রানু।

কিন্তু হাত জ্বলে, হাতের আঙুল দুমড়ে যায়, আর এঁটো থালাটা হাত থেকে ফস্‌কে পড়েও যায়। কিন্তু আবার হাত বাড়িয়ে সেই এঁটো থালা তুলে নেয় রানু। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে যায়। না, এ জীবনে আর কোনও দিনও না, জ্যোৎস্না মামি ছুটে এসে আর ধমক দেবেন না : এ কী হচ্ছে রানু, ওঠ বলছি শিগগিরি, ওঠ বলছি!

কেউ এসে রাগ করে রানুর এই বাসন-মাজা হাত দুটোকে নিজের হাতে ধুয়ে দিয়ে, আর একটা ঠেলা দিয়ে রানুকে সরিয়ে দেবে, সে সৌভাগ্য বিষ খেয়ে মরেই গিয়েছে।

কিন্তু আমবাগানের ভিতরে একটা গণ্ডগোল কেন? দক্ষিণ শরিকের বড় কাকার গলার স্বর বলেই তো মনে হয়; সেই সঙ্গে বড় কাকিমারও গলার একটা করুণস্বর—আরো দুটো দিন যেতে দাও। হতচ্ছাড়ার জন্য বলছি না, বলছি বউটার জন্য।

ধোওয়া বাসন হাতে নিয়ে আর ঘরের ভিতরে ঢুকেই দেখতে পায় রানু, কান্তিনাথের নাক-ডাকা ঘুম ভেঙে গিয়েছে, আর মাদুরের উপর চুপ করে বসে আছে কান্তি।

বড় কাকা বলছেন—আমি জিজ্ঞেস করি, জুয়ো খেলে আর লোকের কাছে হাত পেতে টাকা ধার করেই কী তোমার সংসার চলবে?

গা-মোড়া দিয়ে এদিক-ওদিক তাকায় কান্তি, কোনও কথা বলে না।

বড় কাকা—আমি জানি, তুমি কোনওদিন মোক্তারি পরীক্ষা দেবে না। মোক্তারি পড়বার নাম করে তুমি আমার কাছে থেকে এই চার বছরে যত টাকা নিয়েছ, তার সবই জুয়ো খেলে ফুরিয়ে দিয়েছ। কিন্তু আর নয়। এবার.....

বড় কাকিমা বাধা দিয়ে বলেন—না না, এখনই নয়, আজও নয়, কালও নয়; অন্তত...

বড় কাকা—বেশ তো, আরও তিন-চার দিন এখানে থাকুক। কিন্তু তার পর আমি এই ঘরের দখল নেবই নেব।

বড় কাকিমা—ঘরটা যখন তোমার কাছে বন্ধক আছে, তখন তো যখন ইচ্ছে হয় দখল নিতে পারবে। কিন্তু....

বড় কাকা—না, আর নয়। ঠিক তিনটে দিন পরে আমি গো-গাড়ি পাঠিয়ে দেব। তখন যেন তৈরি হয়ে থাকে।

বড় কাকিমা—কোথায় যাবে ওরা?

—স্টেশনে। স্টেশনে ওদের পৌঁছে দিয়ে চলে আসবে গো-গাড়ি।

বড় কাকিমা—আমি এবার জিজ্ঞাসা করি, তুমিই বা বরকর্তা হয়ে সীতারামপুর গিয়েছিলে কেন? ওর বিয়েটা সেদিনই ভেঙে দিয়ে চলে এলে না কেন? সব জেনেশুনেও তুমি সেখানে চুপ করে বসে ছিলে কেন?

চোখ পাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন বড় কাকা—বীরপুরের বসুদের অসম্মান হবে বলেই বিয়ে ভেঙে দিইনি।

বড় কাকিমা—বুঝলাম না।

—তুমি কেমন করে বুঝবে? তুমি হলে হাটনগরের দত্তদের মেয়ে। তুমি বীরপুরের বসুদের মান-সম্মানের কোনও তত্ত্বই বুঝবে না।

চলে গেলেন বড় কাকা আর বড় কাকিমা। কান্তিনাথ আবার মাদুরের উপর গড়িয়ে পড়ে। রানু বলে—এসব কী কথা বলে গেলেন বড় কাকা?

কান্তিনাথ—যা বলে গেলেন, তাই বলে গেলেন।

রানু—তার মানে?

কান্তিনাথ—তার মানে বড় কাকার গো-গাড়ি আসবে, আর আমাদের চলে যেতে হবে।

রানু—কোথায়?

কান্তিনাথ—ওই যে বললেন বড় কাকা, স্টেশনে।

রানু—তার পর কোথায় যাবে?

কান্তিনাথ—জানি না।

রানু—তবে, কে জানে?

কান্তিনাথ—স্টেশন জানে।

।। ৩ ।।

রত্না সিমেন্ট লিমিটেড। এদিকে শালবন আর পাহাড়, ওদিকেও শালবন আর পাহাড়। শুধু একদিকে একটি নদী, যে নদীর নাম কোয়েল।

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর পালামউ ভ্রমণের কাহিনীতে যে লাতেহারের কথা লিখেছেন, সেই লাতেহার থেকে প্রায় দশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কোয়েল নদীর ধারে মস্ত বড় যে নতুন কারখানাটি দেখা যায়, ওই সেটিই হল রত্না সিমেন্টের কারখানা। জায়গাটার আগে নাম ছিল ভঁইসিয়া। সে নাম আজ আর নেই। নতুন কারখানার ধোঁয়া লেগে সেই নামও ধোঁয়া হয়ে উড়ে গিয়েছে। স্টেশনটারও নাম, রত্না।

এই রত্না সিমেন্টের ওয়ে-ব্রিজের কাছে খাতা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে, সে-ই বীরপুরের স্বর্গত জমিদার চরণ বসুর ছেলে কান্তিনাথ বসু। মাইনে যাট টাকা, আর কোয়ার্টার পেয়েছে। কান্তিনাথ এখন রত্না সিমেন্টের একজন ওজন-সরকার। ট্রলিতে বোঝাই করে পাথর আসে; মোটর ট্রাকে বোঝাই হয়ে সিমেন্টের থলে-ভরা স্তূপ আসে। খাতাতে ওজনের হিসাব লিখে রাখে কান্তিনাথ।

ঠিকই, বীরপুরের সেই স্টেশনই শুধু জানত যে, কান্তিনাথ আর রানু সেদিন বিনা-টিকিটের যাত্রী আর যাত্রিণী হয়ে একটা ট্রেনে উঠে পড়ল, অনেক রাত্রে এক টিকিট চেকার এসে আর বিরক্ত হয়ে দু'জনকে অনেক দূরের একটি স্টেশনে নামিয়ে দেয়। সেই স্টেশনের নাম গোমো জংশন।

বিরক্ত চেকার জিজ্ঞাসা করেন—কোথায় যেতে চান আপনারা?

কান্তিনাথ—ঠিক বুঝতে পারছি না।

চেকার—এ কী রকমের কথা। আপনি অসুস্থ।

রানু বলে—না।

চেকার —তবে ওরকমের অদ্ভুত কথা উনি বলছেন কেন?

রানু—যেখানে চাকরি পাওয়া যাবে, সেখানে যেতে চাই।

রানুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখে, তারপর বেশ শক্ত একটা ভ্রূকুটি করে

কথা বললেন চেকার—এ যে আরও অদ্ভুত কথা বললেন। সত্যি করে বলুন তো কে আপনি? ওঁর স্ত্রী?

চমকে ওঠে রানু। ভয় পায়; আর বোবার মত শুধু তাকিয়ে তাকে।

চেকার—সত্যি করে বলুন, আপনাদের বিয়ে হয়েছে?

রানু মাথা নাড়ে—হ্যাঁ।

চেকার—এরকম অবস্থা কেন?

রানু—আমাদের হাতে এখন টাকা-পয়সা কিছুই নেই, তাই....।

বিরক্ত চেকার এইবার একটু নরম স্বরে কথা বলেন—ছি ছি! যাই হোক, এই দশ টাকা নিন। আর, চাকরি পেতে হয় তো উঠে পড়ুন এই ট্রেনে। লাতেহারে নামবেন, তারপর আবার ট্রেনে মাত্র আধঘন্টা পথ, রত্না স্টেশনে নেমে পড়বেন। সেখানে রত্না সিমেন্টের কারখানা। সেখানে এখন চাকরি পাওয়া যায় বলে শুনেছি।

রানুর হাতে দশ টাকার একটা নোট ফেলে দিয়েই চলে যায় চেকার।

ওই ওজন-সরকার কান্তিনাথ কি রত্নাতে এসে নিজের চেষ্টাতে চাকরিটা পেয়েছিল? না; চেষ্টা করার মানুষই সে নয়, সে কোনও চেষ্টাই করেনি। কারখানার স্টাফের বাঙালি ভদ্রলোকেরা ম্যানেজারকে ধরে পড়ে আর অনেক অনুরোধ করে কান্তিনাথের এই চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

ওজন-সরকার কান্তিনাথ সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ওয়ে-ব্রিজের কাছেই কাটিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে কাছের একটা দোকানের টিনের শেডের তলায় বসে চা আর পকোড়ি খায়। আর, রানু তখন একটি এক-ঘর কোয়ার্টারের ভিতর ঘুমিয়ে থাকে, কিংবা রান্না করে, নয়ত একেবারে ধীর স্থির ও স্তব্ধ হয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে কোয়েল নদীর বালিয়াড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে।

এই এক-ঘর কোয়ার্টারের দরজার ঠিক সামনে যে কুল গাছটা আজ এত বড় ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেটা সেদিন কত ছোট ছিল। এই সাত বছরের মধ্যে কত বড় হয়ে গিয়েছে গাছটা। কিন্তু কিশোর ঘোষের মেয়ে রানু তো আর গাছ নয়, তাই বোধহয় ভাগ্যটাও কোনও সুখে বড় হয়ে উঠতে পারেনি। একটুও না, কিছুই না, এই সাত বছরে প্রাণটা নিশ্চিন্ত হতে পারেনি, কোনও মুহূর্তে কোনও সুখের কোনও স্বাদ পায়নি। চাল-ডাল আজ থাকে তো কাল থাকে না। ছেঁড়া শাড়ি সেলাই করবার ছুঁচ থাকে তো সুতো থাকে না। এবেলা যদি গরম ভাত খাওয়া হয়, ওবেলা শুধু পান্তা ভাত, কিংবা ঠাণ্ডা বা গরম কোনও ভাতই না। অ্যাকাউন্টেন্ট মিত্তিরবাবুর স্ত্রী একদিন দেখেছেন, জানালার কাছে দাঁড়িয়ে পাকা ডুমুর খাচ্ছে ওজনের বউ; জংলি মেয়েরা যে ডুমুর বিক্রি করতে নিয়ে আসে, সেই ডুমুর।

ভাল শুধু ওই, রানুর বয়সটাই ভাল বেড়েছে। সীতারামপুরের মেয়ে-স্কুলে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবীর বছরে যে মেয়ের বয়স ছিল আঠারো, সে আজ পঁচিশ বছর বয়সের এক নারী। উপোস পান্তাভাত আর পাকা ডুমুরও তার বয়সের কোনও ক্ষতি

করতে পারেনি। রানু আজ ভরাট যৌবনের ছবি, পলাশের ফোটা ফুলের মত একটা পূর্ণা নারী। শুধু একা মিত্তিরবাবুর স্ত্রী বলেন না, রত্না সিমেন্টের বাঙালি অবাঙালি সব বাবুরই স্ত্রীরা বলেন ও দুঃখ করেন—ওজনের বউকে দেখলে গল্পের কথা মনে পড়ে যায়, অভিশাপ ছিল বলে রাজকুমারীকে বনবাসিনী হতে হয়েছিল।

বয়লার মিস্তিরি গিরিধারীলালের তো রাগ করেই মন্তব্য করেছে—বাঁদরের গলায় মোতির মালা! কোন কসাই বাপ এমন মেয়েকে ওই ওজনের সাথে বিয়ে দিয়েছিল?

স্টোরের জয়ন্তবাবুর স্ত্রী বলেন—খারাপ কথা মুখে আনতে নেই, তবু বলতেই হবে, কী আশ্চর্য, ওই মেয়ে কেমন চুপটি করে আর সব সহ্য করে ওজনের মত একটা অমানুষের সাথে ঘর করছে, একটুও ইদিক উদিক করছে না।

রত্না সিমেন্টের এঁরা, তা ছাড়া মোহিনী মাসি, চারুদি আর ডাক্তার-গিন্নি নয়নতারা, আরও অনেক নবীন ও প্রবীণা, আগে যাঁরা বেড়াতে বের হয়ে মাঝে মাঝে কুল-গাছটার কাছে দাঁড়াতেন আর রানুর সঙ্গে দু'চারটে কথাও বলতেন, তাঁরা কেউ আজকাল আর এ পথে আসেনই না। তাঁরা এই পথে যেতে বেশ একটু ভয় পান আর ঘেন্নাও করেন। পাগলের মত চেঁচাচ্ছে আর বউটাকে গালিগালাজ করছে ওজন। সেটা কি ভাল লাগে শুনতে?

ওজন কান্তিনাথ আজও সেই কান্তিনাথ। সপ্তাহের অন্তত পাঁচটি দিন নেপালি দারোয়ানদের আড্ডাতে গিয়ে জুয়ো খেলবে, আর মাঝরাতে ঘরে ফিরে আসবে। যেদিন জুয়াতে দু'তিনটে জিত হয়, সেদিন একটি দুটি আবগারী মদের পাইট-বোতল বুকে আঁকড়ে ধরে নিয়ে ব্যস্তভাবে ঘরে ফিরবে। এক পাইট আবগারি চার চুমুকে খেয়ে নিয়েই চেঁচিয়ে উঠবে—শিগ্‌গির করো, চটপট দুটো আলু ভেজে দাও।

রানু বলে—আলু নেই।

খালি বোতলটাকে মেঝের উপর আছড়ে দিয়ে আবার চেঁচিয়ে ওঠে ওই জির-জিরে চেহারা ওজন-সরকারের মত্ত নেশার রাগ—তবে তোর ইয়ে দুটো ভেজে দে, হতচ্ছাড়ি।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রানু। কান্তিনাথের মাতাল হুল্লোড় আরও হিংস্র হয়ে ওঠে। ঘরের কোণ থেকে একটা ভাঙা বঁটি তুলে নিয়ে লাফিয়ে ওঠে কান্তি—তবে আমি নিজেই তোর ইয়ে দুটো কাটব আর ভাজব।

বাইরে পথের উপর দাঁড়িয়ে আর ধমক দিয়ে হাঁকডাক করে মিস্তিরি গিরিধারীলাল—আরে, এ কান্তিবাবু, এ কেয়া হোতা হ্যায়? আপনি ভদ্দর মানুষ আছেন না কী আছেন?

ভাঙা বঁটিকে রানুর বুকেরই উপর ছুঁড়ে মারে কান্তিনাথ। রানুর বুকের উপর পড়ে বঁটিটা, তার পর ঝুপ করে মেঝের উপরে পড়ে যায়। রানু তার বুকের দিকে তাকায়ও না। শুধু অচল অনড় একটা পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বমি করছে কান্তিনাথ। বাইরে দাঁড়িয়ে গিরিধারীলাল সেই বমির শব্দও শোনে।

তারপর আক্ষেপ করে। হায় ভগবান! কিন্তু বাপের বাড়ি চলে যায় না কেন ওজনবাবুর বউ?

বলতে বলতে চলে যায় গিরিধারীলাল।

এত কাছে শালবন, তবু শেয়াল ডাকে না। স্তব্ধ রাত, বোধ হয় মৃত। ঝাঁকড়া-মাথা কুল গাছ একটুও কাঁপে না। শুধু ওজনসরকার কান্তিনাথের নাক-ডাকার শব্দ বাজে।

জানালার কাছে এসে দাঁড়ায় রানু। এইবার শুনতে পাওয়া যায়, কলকল শব্দ করে গড়িয়ে যাচ্ছে নদীর স্রোতে জল।

রাস্তার অন্ধকার থেকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে একটি ছায়া, আর এই জানালারই কাছে দাঁড়ায়। কিন্তু চমকে ওঠে না রানু। রানু বলে—আবার তুমি এসেছ কেন? বলেছি না, কখ্খনও আসবে না।

—কিন্তু না এসে যে পারি না।

—না, ওরকম করে কথা বলো না।

—কিন্তু তুমি বলো।

—কী বলব?

—তুমি যদি বলো, তবে....

—তবে কী?

—তবে আমি এখনই গলা টিপে ওই নাক-ডাকার শব্দ চিরকালের মত থামিয়ে দি।

—যাও, চলে যাও, কখ্খনও আর এখানে আসবে না, বলে দিচ্ছি।

—যাচ্ছি। কিন্তু তুমি খেয়েছ কি না?

—কোনও কথা নয়, তুমি যাও।

—কী খেয়েছ, ভাত না রুটি?

—চুপ। তুমি চলে যাও।

—দশটা টাকা নাও।

—না।

—কী আশ্চর্য, ট্রেনের টিকেট চেকারের কাছ থেকে দশটা টাকা নিতে পার, কিন্তু আমার কাছ থেকে দশটা টাকা নিতে পার না?

—না।

—তুমি কিন্তু খুব অন্যায় করছ। মিথ্যে আমাকে কষ্ট দিচ্ছ।

—বলছি, তুমি এখন চলে যাও।

—আচ্ছা যাচ্ছি।

চলে যায় ছায়াটা, কিন্তু রানু ভালই জানে, দু'চার দিন পরে আবার আসবে ওই ছায়া।

কোয়েল নদীর জলের শব্দ ফুরোয় না। কোয়েলের স্রোতে ক্লান্তি নেই। রানুরও অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে কোনও ক্লান্তি নেই। শেষরাতের তারা যখন নিবু নিবু হয়, কুল গাছের পাতা নতুন বাতাস পেয়ে সির সির করে, তখন বিছানা পাতে

রানু। মাদুরের উপর একটি চাদর, তার উপরে একটি বালিশ। সেই বালিশের ঢাকার উপর লাল সুতো দিয়ে লেখা তুলেছে রানু—জ্যোৎস্না মামি। আর ওই চাদরের মাথার এক কোণে লাল সুতোর লেখা তোলা হয়েছে—নরু মামা। যেন শূন্য জীবনের সঙ্গে একটা ঘরের শান্তির স্মৃতি ছুঁইয়ে রেখেছে রানু। রানু বোধ হয় এই পঁচিশ বছর বয়সেও একেবারে ছোট্ট একটি মেয়ে হয়ে নরু মামা আর জ্যোৎস্না মামির বুকের কাছে শুয়ে থাকবার একটা কায়দা তৈরি করে নিয়েছে।

রানু বোধ হয় তার এই পঁচিশ বছরের বয়সটাকে ভয় করে। নিজের এই চেহারাটাকে, এই শরীরের রক্ত-মাংসের দুরন্ত এখটা স্বপ্নকেও ভয় করে। তাই বোধ হয় চেষ্টা করে দশ বছর বয়সের প্রাণটাকে ফিরে পেতে চায়।

ওই ছায়া তো সত্যিই ছায়া নয়। ওর নাম মানিক রায়; ক্যাশ অফিসের একজন কনিষ্ঠ কেরানি। মাইনে পায় আশি টাকা। সাত বছর আগে এই রত্না স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কান্তিনাথ আর রানুকে দেখতে পেয়ে খোঁজ নিয়েছিল—আপনারা কোথায় যাবেন?

এই মানিকই সেদিন মিত্তিরবাবুর কাছে গিয়ে প্রথম খবর দিয়েছিল। এক বাঙালি ভদ্রলোক সস্ত্রীক এসেছেন, স্টেশনে বসে আছেন, চাকরি খুঁজছেন ভদ্রলোক। ইচ্ছে করলে আপনি সে ভদ্রলোককে একটা চাকরি পাইয়ে দিতে পারেন, কাকা।

মানিক তো সেদিনই জানতে পেরেছিল যে, এক টিকিট-চেকার যে দশটা টাকা দিয়েছে, সে টাকা ছাড়া আর একটি পয়সাও ওদের হাতে নেই। রানুর মুখের দিকে তাকিয়ে মানিক রায়ের চোখের চাহনিটা করুণ হয়ে গিয়েও বিস্ময়ে ভরে গিয়েছিল। কতই বা বয়েস হবে মানিকের; ওই ভদ্রলোকের স্ত্রীর চেয়ে বড় জোর দু'তিন বছর বড় হবে মানিক, কুড়ি কিংবা একুশ। ভাল ফুটবল খেলতে পারে বলে মিত্তিরবাবু ওদের দেশের গাঁ থেকে ওকে এখানে আনিয়েছেন, আর একটা চাকরিও করে দিয়েছেন।

সেই মানিকও তো এখন আর কুড়ি-একুশ বছর বয়সের ছোকরাটি নয়। সাতাশ কিংবা আঠাশ বছর বয়সের একটা হট্টা কট্টা জোয়ান। রং ময়লা, ঠাসা কোঁকড়ান চুল, ছোট কপাল, আর নাকের হাড়ের উপর একটা জখমের দাগ, তবু দেখতে মন্দ নয় মানিক। মিত্তিরবাবু বলেন—মানিকের চাকরিটা যদি একটু ভাল হত, তবে নিতাইয়ের মেয়ে পুঁটির সঙ্গে ওর বিয়ে দেবার চেষ্টা করতাম। পুঁটির সঙ্গে মানিককে ভালই মানাত।

এই মানিকই আজ তিনটি বছর ধরে রানুর জীবনের একটা সমস্যা। রানুর মিনতি ভ্রূকুটি ও ধমক, কিছুই গ্রাহ্য করে না মানিক। রোজ না হোক, সপ্তাহের অন্ত দুটি দিন এই পথে একবার আসবেই, দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াবে, এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখবে। তার পর, হয় রানুর সঙ্গে কথা বলবে, না হয় চুপচাপ চলে যাবে।

খুব সুবিধা পেয়েছে মানিক; ওজন সরকারের এই কোয়ার্টারের চারদিকটা বেশ নিরালা। পিয়ন লছমনের কোয়ার্টার ছাড়া ধারে-কাছে আর কোনও ঘর-বাড়ি নেই। এই লছমনই বা কতটুকু সময় ঘরে থাকে। সারাদিনের পর বিকেল-বেলা ঘরে ফেরে, উনুন ধরায়, রুটি বানায়, খায়, আর সন্ধ্যে হতেই তিনবার চেঁচিয়ে রাম নাম করে ঘুমিয়ে পড়ে।

জুয়াখেলার আসর থেকে বিদায় নিতে কান্তিনাথ তো মাঝরাতের আগে কখনও ঘরে ফেরে না। কাজেই কুল গাছের কাছে দাঁড়িয়ে, কিংবা একেবারেই দরজার কাছে এসে রানুর সঙ্গে কথা বলতে মানিকের কোনও অসুবিধে নেই। অসুবিধে হত ঠিকই, যদি তিন বছর আগের সেই সন্ধ্যাতে শক্ত কথা বলে আর ভর্ৎসনা করে মানিকের দুঃসাহসের ভাষা থামিয়ে দিত রানু।

সেই সন্ধ্যাতে দূরের পাহাড়ের গুহার পাশে একফাল চাঁদ যখন কুয়াশার উপর ভেসে উঠেছিল, আর কোয়েলের স্রোতের জলের শব্দটা আরও কলকলে হয়ে উঠেছিল, তখন ঘরের দরজার কাছে ছায়া দেখে চমকে উঠেছিল রানু। —কে?

—আমি, আমি মানিক। এই এমনিই এলাম। ইচ্ছে হল, আপনাকে একবার দেখে যাই।

রানু হাসে—আপনাকে তো প্রায়ই দেখতে পাই, সাইকেলে চড়ে কোথায় যেন যাচ্ছেন।

—হ্যাঁ, মিত্তির কাকা যখন-তখন বলেন, যাও মানিক, ভাল ঘি কোথাও পাওয়া যায় কিনা, একটু খোঁজ করে এসো। কোনওদিন বলেন, যাও মানিকচাঁদ, খোঁজ করে দেখো তো, কোথাও সজনে ডাঁটা পাওয়া যায় কিনা। তাই এদিকে-ওদিকে দৌড়তে হয়। কিন্তু...

রানু—কী?

—আপনি তো কোনওদিন ডাক দিয়ে বললেন না, আপনার দরকারের কী জিনিস চাই!

রানু হাসে—কিছু চাই না। ঘি খেতে আমার একটুও ভাল লাগে না, আর সজনে ডাঁটা অনেক খেয়েছি।

—কিন্তু আপনি এরকম একটা ছেঁড়া শাড়ি পরে রয়েছেন কেন?

—সেকথা আপনি জানতে চান কেন? জেনে দরকার কী আপনার?

—বেশ তো, জেনে দরকার নেই। কিন্তু আমি যদি আপনাকে একটা ভাল শাড়ি এনে দিই, তবে নেবেন তো, পরবেন তো?

—না।

—তবে কী আর বলব!

এখনই মানিককে বলে দিতে পারা যায়, তবে এখন চলে যান, সন্ধ্যাবেলাতে ঘরের দরজার কাছে এসে এরকম উপকার করবার চেষ্টা করবেন না। কিন্তু বলতে পারে না রানু, বলতে পারবে কেন রানু? তিন বছর আগে এই মানিকই যে একদিন

রানুর উপকার করবার জন্যে ছুটোছুটি করেছিল। কান্তিনাথকে মিত্তিরবাবুর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে, চাকরির কাজে বহাল করিয়ে দিয়ে তরপর স্টেশন গিয়ে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একলা বসে থাকা রানুকে ডেকে নিয়ে এই কোয়ার্টারে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল মানিক।

রানু বলে—কিছু মনে করবেন না, আমি আপনাকে বসতে বলতে পারব না, চা খাওয়াতেও পারব না।

মানিক—না না, আমি কিছুই মনে করব না। কিন্তু...

রানু—কী? বলুন?

মানিক হঠাৎ এগিয়ে এসে রানুর একটা হাত ধরে ফেলে—কিন্তু একটা চুমো দিতে তো পার!

মানিকের হাতটাকে ঠেলে সরিয়ে দেয় রানু—আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন?

মানিক—হয়েছি বোধহয়। আমি সব সময় তোমারই কথা ভাবি। স্বপ্নে তোমার সঙ্গে কত কথা বলি। বিশ্বাস করো রানু, আমি তোমার জন্য সব করতে পারি।

মানিকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে রানু। রানুর চোখে নিবিড় বিস্ময়, আরও নিবিড় রানুর সারা মুখে চমকে ওঠা একঝলক রক্তের রাঙা আভা।

দু'পা পিছিয়ে সরে গিয়ে রানু বলে—আপনি সুবিধা পেয়ে আমাকে অনেক বাজে কথা শুনিয়ে দিলেন। খুব অন্যায় করলেন।

মাথা হেঁট করে আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে মানিক। রানুও কোনও কথা আর বলে না। অনেক দূরের বাতাসে শিউরে ওঠে ছুটে চলা একটা ইঞ্জিনের বাষ্পভরা শিস। ট্রেন যায়, ছুটে চলে যাচ্ছে সেই একলা পাইলট ইঞ্জিন, যেটা রোজই ঠিক রাত আটটায় লাতেহার যায়।

চলে যায় মানিক। রানু কিন্তু দাঁড়িয়েই থাকে, ঘরের ভিতরে যে কেরোসিন বাতিটা জ্বলছে, তারই দিকে তাকায়। সারা মুখটা রাঙা হয়েই থাকে। মানিক যেন একরাশ গোলাপ ফুল রানুর বুকের উপর ছুঁড়ে দিয়ে বুঝতে পারছে না যে, সে গোলাপের সঙ্গে কাঁটাও আছে।

এই তিন বছরের মধ্যে এমন একটিও দিন যায়নি, যেদিনের সন্ধ্যাবেলায় ভেবে ভয় পায়নি রানু, মানিক আসবে। তাই দরজার কপাট আর খোলা রাখে না রানু।

কিন্তু সেজন্য মানিকের কোনও দুঃখ নেই। আসবেই মানিক। জানালার কাছে এসে দাঁড়াবে আর রানুর সঙ্গে কথা বলবে। রানু কতবার ধমক দিয়েছে, সাবধান ওসব কথা বলবে না। কিন্তু রানুর এই ধমকও যেন মানিকের জীবনে একটা মস্ত বড় প্রাপ্তি, একটা প্রিয় উপহার।

যেদিন ভুল করে রানু দরজার কপাট বন্ধ করে রাখতে ভুলে যায়, সেদিন রানুকে কী দুঃসহ একটা অবস্থাই না সহ্য করতে হয়। ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে মানিক, আর যেন মন্ত্রপাঠ করতে থাকে : তোমাকে একটি বারও বুকে জড়িয়ে ধরা হল না।

থাকগে, সে জন্যেও কোনও দুঃখ নেই। আসছে জন্মে নিশ্চয় তোমাকে পাব, আর এমন করে বুকে জড়িয়ে ধরব যে, তুমি তখন চুমো দিয়ে দিয়ে আমাকে মেরেই ফেলবে।

রানু বলে—আজ কী খেয়েছ?

মানিক—ভাত আর ডিমের ঝোল।

রানু—কে রান্না করেছিল?

মানিক—আমিই রান্না করলাম; আমি ছাড়া এখন আর কে আছে আমার?

রানু হাসে—নিশ্চয় খুব খারাপ রান্না।

মানিক—একটুও খারাপ নয়। খাবে আমার রান্না? এনে দেব ভাত আর ডিমের ঝোল?

রানু—না।

মানিক—কিন্তু তুমি আজ কী খেলে?

রানু—বলব না।

মানিক—আমি জানি, তুমি আজ একগাদা পাকা ডুমুর খেয়েছ। চার পয়সায় একগাদা পাকা ডুমুর পাওয়া যায়।

রানু দরজার বাইরের দিকে চোখ তুলে আর দুই ভুরু কুঁচকে দিয়ে তাকায়—কী আশ্চর্য, কী ওটা এখানে পড়ে আছে!

—কী? মানিক একটা লাফ দিয়ে দরজার বাইরে এসে দাঁড়ায়।

দরজার কপাট বন্ধ করে দেয় রানু। বোকা মানিক চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর ব্যস্তভাবে পা চালিয়ে চলে যায়।

বন্ধ কপাটের উপর মাথা ঠেকিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে রানু। আর আঁচল তুলে বার বার দুই চোখ মুছতে থাকে।

একদিন, যেদিন তুফান উঠল ঠিক সন্ধ্যাবেলাতেই, সেদিন বার বার জানালার কাছে এসে দাঁড়ায় রানু। পর পর পাঁচটা দিন কেটে গেল, কিন্তু মানিক একদিনও এল না কেন, আজও তো আসবে না বলেই মনে হচ্ছে।

তুফানের পর বৃষ্টি। কী তুমুল বৃষ্টি। এ বৃষ্টি যেন বন-পাহাড় আর কারখানা সবকিছুই গলিয়ে দেবে। না, আজ আর আসবে না মানিক। কী করে আসবে? আসা যে অসম্ভব।

কিন্তু দেখতে পেয়েই চমকে ওঠে আর হেসেও ওঠে রানু; জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে মানিক। ভিজে গিয়েছে, আরও ভিজছে মানিক, কিন্তু সেজন্য মানিকের মনে প্রাণে ও শরীরে যেন কোনও অস্বস্তি নেই।

রানু—বৃষ্টিতে ভিজতে বুঝি খুব ভাল লাগছে?

মানিক—মিছে জিজ্ঞাসা করছ কেন? তুমি তো আর দরজা খুলে দেবে না, আর ঘরের ভিতরে একটু দাঁড়াতেও দেবে না।

বুকের ভিতরে যেন একটা যন্ত্রণা গুমরে উঠেছে, তাই রানুর চোখ দুটো থরথর করে কেঁপে ওঠে—না, দরজা খুলে দিতে পারব না; কিন্তু সেজন্য কিছু মনে করো না।

মানিক হাসে—না।

রানু—কোথায় ছিলে এই ক'দিন?

মানিক—ক্যাশ আনতে গোমো গিয়েছিলাম। মাসে অন্তত একটি বার গোমো যেতেই হয়। বলরাজ সাহেব আমাকেই সব চেয়ে বেশি বিশ্বাস করেন, তাই উনি বলেছেন, মানিক যায়েগা ক্যাশ লানেকে লিয়ে, দুসরা কোই নেহি। গোমোর ব্যাঙ্কে গিয়ে আমি ক্যাশ তুলি, আমার সঙ্গে বন্দুক নিয়ে রণবাহাদুর থাকে, ব্যস।

মানিকের এরকম আসা-যাওয়ার উৎপাত এখন রানুর একরকম মন-সহ্য হয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু গা-সহ্য হতে পারেনি। ভাবতে গেলে রানুর পঁচিশ বছর বয়সের ওই ভরাট বুক আর নিবিড় চোখ কেঁপে ওঠে। না, অসম্ভব, দরজা খুলে দিতে পারবে না রানু। মানিকের পাগলামির বুকটার উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে গিয়ে সুখের মরণকেও গা-সহ্য করে দিতে পারবে না। তার চেয়ে ভাল কোয়েলের বর্ষার ঢলের জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে হারিয়ে যাওয়া আর মরে যাওয়া।

কিন্তু ভুল তো শাসন মানতে ভালবাসে না। সব সময়ের কঠিন সাবধানের নিষেধও যেন ভুলেরই এক অদ্ভুত জাদুর কৌশলে মিথ্যে হয়ে যায়। রানুর ভাগ্যটা যখন নির্ভুল নয়, তখন জীবনটাই বা নির্ভুল হবে কেমন করে?

ইচ্ছে করে নয়, মানিক ভুল করে। শীতের দুপুরে খোলা দরজা দিয়ে ঘরের মেঝের উপরে যে রোদ ছড়িয়ে পড়ে, সেই মাদুরের উপর শুয়ে পড়ে থাকতে বেশ ভাল লাগে, আর বেশ ভাল ঘুমোতেও পারা যায়, তাই দরজা খোলা ছিল। সন্ধ্যা হয়নি, বিকেলও ফুরিয়ে যায়নি, রানুর মাদুরের উপর তখন ছড়িয়ে পড়েছিল ঠাণ্ডা রাঙা রোদের আবির। হঠাৎ চমকে ওঠে আর জেগে ওঠে রানু। মাদুরেরই উপর বসে থেকে পায়ের একটা পাতার দিকে তাকায়। যেন একটু সুঁচ ফুটেছে, জ্বলছে পায়ের পাতা। হ্যাঁ, সত্যিই তো, সেই জ্বালার ছোট্ট একটা রক্তিম বিন্দু পায়ের পাতার মাঝখানে ফুটে উঠেছে।

কিসে কামড়াল? ঘরের চারিদিকে চাকায় রানু। হ্যাঁ, ওই তো সেই অদ্ভুত একটা পাহাড়ি পোকা, রোগা লম্বা ভোমরার মত দেখতে, কালো আর শক্ত ছুঁচের মত ছোট্ট একটা কাঁটা আছে সেই পোকার দুই চোখের মাঝখানে।

দরজাটা খোলা। কিন্তু আর বেশি সময় নেই। দরজার কপাট বন্ধ করে দিতে হবে। পায়ের পাতার সেই লালচে জ্বালার বিন্দুটার ওপর হাত বোলায় রানু। একটু নুন ঘষে দিলে জ্বালাটা বোধহয় কমবে।

চমকে ওঠে রানু। ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে মানিক। হাঁটুর উপরে তোলা কাপড়টা নামিয়ে দিয়ে আর চাপা যন্ত্রণার একটা দৃষ্টি তুলে মানিকের মুখের দিকে তাকায় রানু। এ কী! তুমি আজ হঠাৎ এরকম অসময়ে এসে পড়লে কেন?

—দেখি, কী হয়েছে তোমার পায়ে? এগিয়ে আসে মানিক। এক হাতে পায়ের পাতা চেপে রাখে রানু, আর এক হাত তুলে মানিককে সরে যেতে বলে—কিছু হয়নি, কিছু হয়নি, সরে যাও।

রানুর সেই হাতনাড়া নিষেধের বাধা এক ঠেলায় সরিয়ে দিয়ে রানুর পায়ের কাছে একেবারে লুটিয়ে বসে পড়ে মানিক। দু'হাত দিয়ে রানুর পায়ের পাতা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আর চেঁচিয়ে ওঠে—কী সর্বনাশ। সাপে কামড়েছে বলে মনে হয়েছে।

—না না, সাপ নয়। তুমি সরে যাও। তুমি এরকম বিচ্ছিরি বাড়াবাড়ি করো না, সাবধান।

দুর্দান্ত লোভীর মত রানুর পায়ের পাতার আরও কাছে মাথাটকে একেবারে ঝুঁকিয়ে দিয়ে কথা বলে মানিক—জোরে একটু চুষে দিলে সাপের বিষ বেরিয়ে আসবে।

মানিকের মাথাটাকে সব শক্তি দিয়ে ঠেলে দিতে থাকে। —না, না, সাপের কামড় নয়, তুমি জান না, এটা একটা নচ্ছার পাহাড়ি পোকার কামড়। তুমি সরে যাও।

কিন্তু কী ভয়ানক শক্ত মানিকের এই ঠাসা কোঁকড়ান চুলে ভরা মাথাটা। একটুও নড়ানো যায় না। কেঁদে ফেলে রানু—তোমার পায়ে পড়ি মানিক, তুমি সরো।

সরে গিয়ে হাসতে থাকে মানিক—তাই বলো, পোকার কামড়। আমার সন্দেহ হয়েছিল, চিতি সাপের কামড়। কিছুদিন হল চিতি সাপের উপদ্রব শুরু হয়েছে। গিরিধারীলালের ছেলেটাকে কামড়েছে। কিন্তু....।

রানু—কোনও কথা বলো না, তুমি এখন যাও।

মানিক—কিন্তু পোকার কামড়ের জ্বালাটাকেও তো সরাতে হয়।

রানু—একটু নুন ঘষে দিলে সেরে যাবে।

মানিক—তবে নুন ঘষে দাও।

রানু—আগে তুমি যাও, তারপর।

মানিক—আচ্ছা, যাই তবে।

নুন ঘষতে হয়নি। জ্বালাটাও কখন সেরে গিয়েছে, জানতে পারেনি রানু। খোলা দরজার বাইরে, পথ ঘট বন আর পাহাড়ের চেহারা ঢেকে দিয়ে আর নিরেট হয়ে জমে উঠেছে যে ভয়ানক কালো অন্ধকার, তারই দিকে তাকিয়ে থাকে রানু। বোধ হয় জাগা চোখে ঘুমিয়ে পড়েছে রানু। বোধ হয় নয়, সত্যিই ঘুমের মত একটা আবেশে পড়েছে রানু। বোধ হয় নয়, সত্যিই ঘুমের মত একটা আবেশে ভরে গিয়েছে রানুর সেই জাগা চোখ আর স্বপ্নও দেখেছে রানু, সে অন্ধকারে একটা অদ্ভুত তারা হঠাৎ এক একবার ফুটে উঠছে, আবার নিভে যাচ্ছে।

দূর ছাই, স্বপ্ন। নিজের মনে বিড় বিড় করে রানু। উঠে দাঁড়ায়, আলো জ্বালে, আর হাঁড়ির মুখের সরা তুলে দিয়ে দেখতে থাকে, কতটুকু চাল আছে, কিংবা সত্যিই আছে কিনা।

কিন্তু আর তো সহ্য হয় না মানিকের এই উপদ্রব। বুঝতে পারছে, মানিক এবার আর সময়-অসময়ের ধার ধারবে না। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় রাতে আর মাঝরাতে, শেষরাতেও হতে পারে, যখন ইচ্ছা হবে তখনই চলে আসবে মানিক। তবে কি সব সময় দরজা বন্ধ করে রাখতে হবে?

দরজার কপাট বন্ধ করে দেয় রানু। উনুন ধরায়। কিন্তু সেই মুহূর্তে দরজার বন্ধ কপাট বাইরে থেকে একটা লাথির আঘাতে ঝনঝনিয়ে শব্দ করে কেঁপে উঠে। বুঝতে দেরি হয় না রানুর, রাজা হরিশ্চন্দ্র আজ জুয়োতে হেরেছেন।

তার পর যা হবার ছিল তাও হয়ে গেল। মানুষ নয়, পুরুষও নয়, যে আজ রত্না সিমেন্টের ওজনবাবু, সে আজ চিতি সাপের বিষের চেয়েও বেশি বিষময় ভাষায় গালিগালাজ করে, বঁটি ছুঁড়ে, তার পর নাক-ডাকা কবরের গর্তে পড়ে ঘুমোতে শুরু করে। না, আর সহ্য করা উচিত নয়। সহ্য করবার কোনও মানে হয় না। রানুর মূক ধৈর্য্য আর সহ্যের জীবনটা মিথ্যে এই চিতি সাপের ঘরে পড়ে আছে।

কিন্তু মানিকের ওই ইচ্ছার ভাষাটাও কত ভয়ানক। চিতি সাপকে মেরে ফেলতে মানিকের প্রাণে কোনও আপত্তি নেই। অন্ধকারে কী ভয়ানক জ্বলছিল মানিকের চোখ দুটো। না না, মানিক যেন আর কোনওদিনও এখানে আসে না। যদি আবার আসে তবে স্পষ্ট করে বলে দিলেই হবে—তুমি আর এসো না। কোয়েল নদীর জল যখন আসছে বর্ষার ঢলে দুরন্ত হয়ে উঠবে, তখন রাতের অন্ধকারের একটি মুহূর্তে আমি নিজেই চলে যাব।

কিন্তু বর্ষা আসতে কত দেরি? এটা এখন বোশেখ মাস, তার মানে আর মাত্র দুটি মাস বাকি। তার পরেও মানিক যদি এখানে আসে, তবে ভুল করবে, ভয়ানক বোকা হয়ে ফিরে যাবে মানিক। এই ঘরের জানালাতে রানুকে আর দেখতে পাবে না। চেঁচিয়ে ডাক দিলেও রানু নামে কোনও ছায়াও আর এই ঘরের ভিতর থেকে সাড়া দেবে না।

ঘরের মেঝের উপর পাতা আর একটা ছেঁড়া মাদুর, যে মাদুরটা রাজা হরিশ্চন্দ্রের মাদুরটাকে একটুও স্পর্শ না করে, বরং ঘেন্না করে বেশ দূরে সরে রয়েছে, সেই মাদুরের উপর গড়িয়ে পড়ে আর ঘুমোতে চেষ্টা করে রানু। কিন্তু চেষ্টা করলেও কি ঘুম আসে? রানুর সারা শরীরটা যখন রত্না সিমেন্টের ওই ওজনবাবুর নাক-ডাকার শব্দে ঘেন্না পেয়ে শিউরে উঠছে, তখন ঘুমোবার চেষ্টা করাই বা কী করে সম্ভব?

ওই তো, নিবিড় ঘুমের ঘোরে নিশ্চিন্ত হয়ে যার নাক-ডাকার শব্দ ঘড়ঘড় করছে, যিনি হলেন নিদারুণ এক ওজনবাবু, তিনি নিজেই এই ঘরের ভিতরে পয়সাওয়ালা বাবুকে ডেকে এনে ও বসিয়ে রাখতে কতবার কত চেষ্টাই না করেছেন। মনে করতে পারে রানু, কবে প্রথম রানুর মাথা লক্ষ করে বঁটি ছুঁড়েছিলেন এই ওজনবাবু। একবার দুবার ও তিনবার, তিনদিনের তিন ঘটনায় আগন্তুক নতুন এক বাবুকে ওজনবাবুর সঙ্গে ঘরের ভিতরে ঢুকতে দেখে রানু সেই মুহূর্তে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে

দাঁড়িয়েছিল, আবার দৌড়ে গিয়ে গিরিধারীলালের ঘরের দরজার কছে এসে অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল। তারপর আর একদিন যখন নতুন বাবুকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন ওই ওজনবাবু; যার নিজের শরীরের রক্ত আর নিঃশ্বাস হল শূন্যতার আবর্জনা, সেদিন তখনই বঁটি-দা হাতে তুলে নিয়ে এই ঘরের মেঝের উপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল রানু। আগন্তুক বাবু ভয় পেয়ে তখনই ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। সেদিনই যখন হাতে তোলা বঁটিটাকে মেঝের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আর জানালার কাছে গিয়ে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল রানু, তখন হিংস্রস্বরের একটা চিৎকার ছেড়ে আর রানুর মাথা লক্ষ করে সেই বঁটি ছুঁড়েছিলেন এই ওজনবাবু।

ভালই হয়েছে। সাপটা সত্যিকারের পুরুষ হলেই বা কি আসে যায়? মানুষের ঘরের মেয়ের পক্ষে তার সঙ্গিনী হওয়া সম্ভব নয়। এটা একরকমের ভাল ভাগ্যি বলে মনে করতে হয় যে, সাপটা পুরুষই নয়। ওর ছায়া সহ্য করতে হয়নি, রানুর শরীরটা দূষিত হবার দূর্ভাগ্য থেকে বেঁচে গিয়েছে।

না, মানিকের চোখের ওই পুরুষ-চাহনির জন্যেও মায়া করবার কোনও মানে হয় না। আরও বড় সত্য, দু'চোখে ওরকম শুধু একটা জ্বলজ্বলে পুরুষ-চাহনি থাকলেই তো চলে না। মানিকের সামান্য মাইনের চাকরিটা তো ভাল করে খেয়ে-পরে থাকবার একটা করুণ অক্ষমতার চেহারা। মানিকও একরকমের চোরাবালি। ওর কাছে নিশ্চিন্ত হতে পারা যাবে না, প্রায় এইরকমই উপোস-করা দুর্ভাগ্যের ভিতরে তলিয়ে যেতে হবে। উনিশের চেয়ে বিশ একটু বেশি বটে, কিন্তু এমন-কিছু বেশি নয় যে, তার জন্য লোভ করে তার হাত ধরতে হবে।

না, আসছে বর্ষার কোয়েল নদীর পাগল ঢলের জলের স্রোতটাকেই বরণ করে নেওয়া ভাল। রানুর জীবনের সব তেষ্টা তখন পেট ভরে জল খেয়ে ভেসে যাবে, ডুবে যাবে, তলিয়ে যাবে।

॥ ৪ ॥

কোথায় যাচ্ছে গিরিধারীর বউ আর ছেলেমেয়েরা? সবাই হলুদ ছোপানো কাপড় পরেছে। একটা ঢাকি ঢাক বাজিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। গিরিধারীর বউয়ের মাথায় মস্ত বড় একটা ডালা, তার মধ্যে ফুল ফল বাতাসা লাড্ডু; আরও কত কী! দরজার কাছে সিঁড়িটার উপর দাঁড়িয়ে আছে আর দেখছে রানু।

গিরিধারী বউ ডাক দিয়ে বলে—চলো না, এ বাঙ্গালিন বহু, লছমিজির পূজা দেখবে চলো।

বুঝতে পারে রানু, ঠিকই বলেছিল মানিক, এখান থেকে কিছু দূরে বনের ভিতরে একটা ভাঙা মন্দিরে খুব পুরনো কালের পাথরের একটি লক্ষ্মীমূর্তি আছে। সেবাইত নেই, তাই রোজ ধূপ-দীপ জ্বলে না, আরতিও হয় না। মাঝে মাঝে এদিক-সেদিক

থেকে নানারকম মানত নিয়ে লোক আসে: লক্ষ্মীর মূর্তির পায়ে সিঁদুর মাখায়, ফুল ছোঁয়ায়, ফল কিংবা বাতাসা নিবেদন করে। একবার একটা পাগল এসে বিস্কুট নিবেদন করেছিল।

গিরিধারীর বউ আবার ডাক দেয়—যেতে চাও তো চলো। ঢের দূর নয়।

রানু—কত দূর?

—এই তো এখান থেকে হেঁটে বড় রাস্তায় উঠবে, দেখবে একটা ডাকবাংলা আছে। সেখান থেকে একটু দূরে জঙ্গলের ছোট রাস্তা ধরে হাঁটবে। দশ মিনিটের মধ্যে লছমিথানে পৌঁছে যাবে।

রানু বলে—যেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু আজ যাব না।

ঢাক বাজে, সকালবেলার রোদ গায়ে মেখে চলে যায় সেই হলুদ ছোপানো মিছিল।

কিন্তু আজ গেলেই তো ভাল হত। বর্ষা আসতে আর ক'টা দিনই বা বাকি আছে? বোশেখ ফুরিয়েছে, আজ জষ্ঠির পাঁচ কিংবা ছয় হবে। বর্ষা আসতে তো খুব বেশি দেরি নেই। লক্ষ্মীমূর্তির কাছে গিয়ে পূজো দিয়ে আসবার ভাল সুযোগ কি আর পাওয়া যাবে?

হ্যাঁ, ফুল-বাতাসা নিয়ে একটা পূজো তো দিতেই হবে, কিন্তু একবার জিজ্ঞাসা করতেও হবে, হ্যাঁ গো লক্ষ্মী ঠাকরুন, আমার এই সাত বছরের জীবনে তুমি কোন সুখটা দিয়েছ, বলো তো? আমি কার কাছে কোন অপরাধ আর কিসের অপরাধ করেছি, বলতে পার?

না না, চলেই যাচ্ছি যখন তখন আর তোমাকে ওসব কথা শুনিয়ে দিয়ে কোনও লাভ নেই। তুমি আমার পূজো নাও, আর খুশি হও।

ওই যে, মানিক আসছে। আসুক। কিন্তু কী আশ্চর্য, মানিকের চোখ দুটো কি দুরবীনের চোখ। নইলে বুঝতে পারল কী করে যে, আজ এই সকালবেলায় দরজা খুলে একেবারে বাইরে এসে সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়েছে রানু। না, মানিককে আজ আর ঘরের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। যা বলতে চায় মানিক, এখানে এই বাইরেই দাঁড়িয়ে বলে দিয়ে চলে যাক।

মানিক বলে—রোদ খুব গরম, তবু চলে এলাম।

রানু—ভাল কথা।

—আজ কিন্তু একেবারে স্পষ্ট করে বলতেই হবে রানু।

—কী বলব?

—তুমি কবে আমার কাছে আসবে বলো?

—তার মানে?

—কবে আমাদের বিয়ে হবে?

—তুমি আবোল-তাবোল কথা বলবে না। বিয়ে হবে না, বিয়ে হতে পারে না।

—হতে পারে রানু। দুজনে কালীঘাটে গিয়ে মালা-বদল করলেই বিয়ে হয়ে

যাবে। তারপর দুজনে এখান থেকে অনেক দূরে কোথাও চলে যাব। বিশ্বাস করো রানু, আমার ঘরে তুমি কোনও কষ্ট পাবে না।

—তুমি কত টাকা মাইনে পাও?

—আশি টাকা।

—মিত্তিরবাবু আছেন বলে তোমার আশি টাকা মাইনে হয়েছেঃ সত্যি কিনা?

—নিশ্চয় সত্যি। মিত্তির কাকা না থাকলে কে আর আমাকে আশি টাকা মাইনের চাকরি পাইয়ে দিত!

—গিরিধারীর বউ বলেছে, তুমি শুধু নামেই কেরানী; আসলে পিয়নের কাজ কর।

—কথাটা খুব মিথ্যা নয়। লেখাপড়া তো তেমন কিছু শিখিনি, অফিসের লেখা-জোখার কাজটা ভাল করে করতে পারি না। কাজেই....

—তবে, যেখানে মিত্তির কাকা নেই, সেখানে গিয়ে কত টাকা মাইনের কাজ পাবে?

—কত আর পাব? পঞ্চাশ-ষাটের বেশি তো নয়।

—এই তো তোমার মুরোদ।

—তা বলতে পারো।

—এই মুরোদ নিয়ে কালীঘাটে গিয়ে মালা-বদল করতে চাও?

—অ্যাঁ?

—বলছি; ঘর করবার এত সাহস কেন? ঘরের মানুষকে খাওয়াতে পরাতে পারবে? পঞ্চাশ টাকা রোজগারের মুরোদে এত বড় সুখের সাধ থাকে কেন?

—তুমি শুধু টাকার মুরোদই দেখছ, আর কিছু দেখতে পাও না?

—আর কী দেখব?

—আমার কি আর কোনও গুণই নেই?

—দেখছি না তো।

—আমার কি হার্টও নেই?

—থাকতে পারে; কিন্তু তাতে কী আসে যায়। কিচ্ছু না। তাতে ভাত হয় না।

স্তব্ধ হয়ে শুধু রানুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মানিক। ধুলো হয়ে ঝরে পড়ছে মানিক রায়ের সাত বছরের স্বপ্ন। পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে এই তিন বছরের আশার ফুলবাগান। চুপসে যাচ্ছে বুকের ভিতরের ফুসফুসটা।

মুখ ঘুরিয়ে দূরের নেড়া পাহাড়টার মাথাটার দিকে তাকায় মানিক। তারপর, যেন বহুদূর পথ হেঁটে ক্লান্ত হওয়া গরুর মত আস্তে আস্তে চলতে থাকে।

চলেই গেল মানিক। রানুর দুচোখের দৃষ্টি তবু জ্বলতেই থাকে। চিতি সাপের কাছ থেকে সরে গিয়ে ঢোঁড়া সাপের কাছে চলে এসো। উঃ, কী মস্ত স্বর্গসুখের প্রস্তাব! শৈব্যা শৈব্যা বলে চেঁচিয়ে কাঁদছেন যাত্রা নাটকের আর এক রাজা হরিশ্চন্দ্র। বুকের ভেতরে কড়মড় করে দাঁত চিবিয়ে কথা বলছে একটা রাক্ষুসে ঠাট্টা। আহা, কী কথাই না বলছেন!

মানিক আর আসবে না। খুব শান্তি, খুব শান্তি। এখন ভালয় ভালয় কয়েকটা দিন

শুধু ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় থাকতে হবে, একবার লছমিথানে যেতে হবে, তারপর একদিন খোঁপাটা খুব শক্ত করে বাঁধতে হবে, জলের তোড়ে যেন এলো হয়ে ছড়িয়ে না পড়ে এই একরাশ চুলের বোঝা। শাড়িটাকেও খুব খাটো করে পরতে হবে, আঁচলটাকে শক্ত করে কোমরে জড়িয়ে একটা গিঁটও দিয়ে দিতে হবে। ডুবো কাঁটাঝোপের সঙ্গে চুল আর শাড়ি আটকে গিয়ে ধড়টাকে যেন আটক করে না রাখতে পারে। ঢলের জলের স্রোত এক নিমেষে ধড়টাকে টেনে নিয়ে পাথরের উপর আছড়ে দিয়ে, তারপর একটা দহের গভীরে তলিয়ে দেবে।

কিন্তু কবে আবার লছমিথানে যাবে গিরিধারীর বউ; কোনও ঠিক তো নেই। লছমিথানে পুজোটা সেরে দিয়ে আসতে হলে গিরিধারীর বউয়ের সঙ্গ নেবার আশায় বসে থাকলে চলবে না। একা যাবার বাধা কোথায়? একা যেতে অসুবিধেই বা কী আছে? সকালে গেলে দুপুরেই ফিরে আসা যাবে। আজকের রাতটা শেষ হয়ে যাক।

সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত রানুর মনটা ছটফট করে, সন্ধ্যা হবে কখন; আবার সন্ধ্যা হতেই ছটফট করে মন, রাত হবে কখন? মাঝরাত হলে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে চোখদুটো আকাশের দিকে তাকিয়ে ছটফট করে, রাত শেষ হবে কখন? ঘরের ভিতরে মাদুরের উপর শব্দ করে উথলে পড়ে মাতালের বমি। সে শব্দ শুনতে পায় না রানু।

ভোর হতেই স্নান করে রানু। আর সকাল হতেই ওজনবাবু যখন সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বাইরে বের হয়, তখন তৈরি হয় রানু। পূজোর কাজের সময় মাথাতে খোঁপা মানায় না। তাই চুলের গোছা পিঠের উপর এলিয়ে ছড়িয়ে দেয়। পূজোতে ছেঁড়া শাড়ি পড়লে মানায় না। তাই তোরঙ্গ থেকে একটা অছেঁড়া আস্ত শাড়ি বের করে রানু। হায় ভগবান, এট যে জ্যোৎস্না মামির দেওয়া সেই ধনেখালি।

কিন্তু পূজোর জিনিসও তো তাই। কী জিনিস নিবেদন করলে ভাল হয়?

উঠোনের এককোণের সূর্যমুখীটার গাছ থেকে কিছু ফুল ছিঁড়ে নিয়ে বাঁশের কাঠির একটা সাজির ভিতর রাখে রানু। আর সিঁদুরের ডিবেটা। এই সিঁদুর-ডিবে লক্ষ্মীমূর্তির পায়ের কাছে রেখে দিয়ে চলে আসতে হবে; ফিরিয়ে নিয়ে আসবার কোনও দরকার নেই, কোনও মানেও হয় না। সিঁথিতে সিঁদুর দেবার অভ্যাস কবেই তো ছেড়ে দিয়েছে রানু।

মাঠের উপর দিয়ে লাল কাঁকড়ের সরু পথ এঁকে-বেঁকে চলে গিয়েছে। চলতে ভালই লাগে। মাঠের একটা শিমূল গাছের ডালের উপর বসে ডাকছে একটা পাখি। ওটা নিশ্চয় দুর্গা টুনটুনি।

বড় রাস্তার উপরে উঠেই বুঝতে পারে রানু, ওই বাড়িটাই হল ডাকবাংলা। ফটকের সামনে একটা মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু লছমিথানে যাবার ছোট রাস্তাটা কোথায়? কত দূর? এগিয়ে যায় রানু।

ডাকবাংলার ফটকের মোটর গাড়ির কাছে এসেই চমকে ওঠে রানু। কে যেন জিজ্ঞাসা করছে—কে আপনি? কোথায় যাচ্ছেন?

গাড়ির ভিতর থেকে নেমে এলেন এক ভদ্রলোক। সাহেব মানুষের মত ফর্সা রঙের চেহারা, গায়ে কিন্তু সিল্কের কামিজ আর জড়ি-পেড়ে ধুতির সাজ।

—কোথায় যাচ্ছেন আপনি? আবার জিজ্ঞাসা করেন ভদ্রলোক।

রানু বলে—লছমিথানে পূজো দিতে যাচ্ছি।

—তার মানে ওই জঙ্গলের এক ক্রোশ ভিতরে সেই সাতশো বছরের পুরনো একটা পোড়ো মন্দিরে, যেখানে দিনের বেলাতে হায়েনা ঢুকে বসে থাকে আর খরগোসের হাড় চিবোয়।

—তা তো জানি না।

—খবরদার, একা একা কক্ষনও ওই জঙ্গলের ভিতরে ঢুকবেন না। পাহাড়ি মেয়ে-ছেলেরা ঢাকের বাদ্যি সঙ্গে নিয়ে আর দলবেঁধে ওই মন্দিরে পুজো দিতে যায়। তার একটা মানে হয়। ঢাকের শব্দে হায়েনা পালিয়ে যায়। কিন্তু আপনার তো এভাবে একা একা ওখানে যাওয়া কোনমতেই উচিত নয়।

—তা হলে উপায়! এখন কী করি আমি?

—বাড়ি ফিরে যান। জঙ্গলের এই সরু রাস্তাতে আমার গাড়ি চলবে না। নইলে আমিই আপনাকে আমার গাড়িতে করে মন্দির দেখিয়ে নিয়ে আসতাম। তা ছাড়া....।

হেসে ফেলেন ভদ্রলোক—তাছাড়া, আমি হায়েনাকে ভয় করি না, আমার সঙ্গে বন্দুক থাকে, আমি শিকারি।

—আচ্ছা, তবে আমি ফিরেই যাই।

—কোথায় থাকেন, কতদূরে?

—ওই তো ওখানে।

—রত্না সিমেন্টের স্টাফ কলোনিতে?

—হ্যাঁ।

—বলেন তো, আমার গাড়িতেই আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

—না।

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

—হ্যাঁ।

—আপনার মাথায় সিঁদুর নেই, তবু সিঁদুর-ডিবে হাতে নিয়ে পূজো দিতে চলেছেন, এ কেমন ব্যাপার?

চমকে ওঠে রানু। চোখ দুটো ভীরু হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে।

—কথা বলছেন না কেন? আমি তো পুলিশ নই, এত ভয়ই বা পাচ্ছেন কেন?

রানু বলে—আমি যাই।

ভদ্রলোক এইবার রানুর খুব কাছে এগিয়ে এসে বলে আর গলার স্বর খুব নরম

করে নিয়ে প্রশ্ন করেন—সত্যিই করে বলুন তো, আপনার স্বামী আছে কি নেই?

জবাব দেয় না রানু।

ভদ্রলোক—কেউ একজন আছেন নিশ্চয়।

তবু নিরুত্তর রানু। রানুর চোখ দুটো এই জষ্ঠি মাসের আকাশটারই মত রুক্ষ ও উদাস। হয়ত জবাব দেবার ভাষা পাচ্ছে না রানু। নয়ত কথা বলার ইচ্ছে নেই। কিংবা জিভটাই আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে।

ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টি এবার বেশ তীব্র হয়ে ওঠে। —আমার সন্দেহ, কেউ একজন আছেন নিশ্চয়, তবে তিনি থেকেও নেই।

রানুর রুক্ষ-উদাস চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে যায়।

চমকে ওঠেন ভদ্রলোক—একী; আপনি কেঁদে ফেললেন কেন?

রানু—আমি এবার যাই।

ভদ্রলোক—আপনি আগে কোথায় ছিলেন? কলকাতায়?

—না।

—তবে?

—সীতারামপুরে।

—সীতারামপুরের নন্দবাবুকে চেনেন? নন্দকিশোর দত্ত। বুড়ো মানুষ, মাথায় টাক আর ঘাড়ের কাছে সাদা চুলের দু'চারটে বাবরি।

—কে? আমাদের নন্দদাদু? খুব চিনি। চেঁচিয়ে ওঠে রানু।

—তাঁর ছেলে হল সীতারামপুরের মেয়ে-স্কুলের দপ্তরি।

—হ্যাঁ, নন্দদাদুর ছেলে, জনার্দন।

—ছেলের উপর রাগ করে বুড়ো বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল। আমারই কোলিয়ারিতে হাজিরা কুলির কাজ করত। কিন্তু বেশি দিন টিকলো না বুড়ো। হঠাৎ একদিন মরে গেল।

কেঁদে ফেলে রানু—ওই নন্দদাদু আমাকে খুব ভালবাসতেন।

—কিন্তু এখানে, জষ্ঠি মাসের এই রোদের মধ্যে সড়কের উপর দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি করা কি ভাল?

—না। আচ্ছা, আমি এখন যাই।

—আমি বলি একটু জিরিয়ে নিয়ে তারপর যাবেন।

—না, আর জিরিয়ে নিতে চাই না।

—এ যে খুব জটিল একটা রহস্যের কথা বলে মনে হচ্ছে। আমি তো সব কথা না শুনে আপনাকে ছেড়ে দেব না। আমার কথা শুনুন। কোনও ভয় করবেন না। আসুন।

ভদ্রলোকের অনুরোধের কথাগুলি যেন মায়াময় সোনার শিকল। অদৃশ্য একটা পাক দিয়ে রানুর প্রাণটাকে এরই মধ্যে জড়িয়ে ধরেছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলতে থাকে রানু।

বারান্দায় উঠে ডাক দেন ভদ্রলোক—খানসামা, এক গেলাস জল নিয়ে এসো।

খানসামা জল নিয়ে আসতেই ভদ্রলোক তাঁর গলার স্বর খুব নরম করে রানুকে অনুরোধ করেন—এইবার শান্ত সুবোধ লক্ষ্মী মেয়েটির মত চোখ-মুখ ধুয়ে নিন। হ্যাঁ, এবার বলুন শুনি।

—কী বলব?

—ওই চেয়ারে আগে বসুন, তারপর কথা বলুন। আপনি ওই জংলি লক্ষ্মী-মন্দিরে কেন যাচ্ছিলেন?

—সিঁদুর-ডিবে নিবেদন করতে।

—তার মানে, লক্ষ্মীর পায়ে ওই ডিবে ঠেকিয়ে দিয়ে, সিঁদুরটাকে খুব পবিত্র করে নিতে?

—না, ওখানেই রেখে দিয়ে আসতে।

—রেখে দিয়ে চলে আসতেন? এ কেমন কথা হল? এই সিঁদুর কি আর কাজে লাগবে না?

—না।

—কেন?

—আমি সিঁদুর ছেড়েই দিয়েছি।

—কেন? আপনার স্বামী নেই?

—থেকেও নেই।

—তার মানে, আপনাকে খুব তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে?

—হ্যাঁ।

—মারধোর করে?

—হ্যাঁ।

—আর কী কষ্ট দেয়?

—সব রকম কষ্ট।

—তার মানে, ভাল করে খেতে দেয় না, উপোস করিয়ে রাখে?

—হ্যাঁ।

—লোকটা চাকরি করে না?

—করে; কিন্তু জুয়ো খেলে ফতুর হয়।

—নেশা-টেশাও করে?

—হ্যাঁ।

—মদ খায়?

—হ্যাঁ।

—দেশি মদ?

—জানি না।

—বমি-টমি করে?

—হ্যাঁ।

—স্বাস্থ্য ভাল নয়?

—একটুও না।

—রোগা রুগ্ন?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, আপনি একটু চুপ করে বসে থাকুন। বড্ড হাঁপাচ্ছেন আর হাঁসফাঁস করছেন আপনি।

চুপ করে বসে থাকে রানু। আর ভদ্রলোকও চুপ করে অপলক চোখে রানুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। রানু যেন ভদ্রলোকের চোখের কাছে একটা অকল্প-হঠাৎ আবিষ্কার।

ঠিক কথা; অমিত চৌধুরী সেদিনও প্রায় এই রকমেরই একটা বিস্ময়ের হঠাৎ আবিষ্কারে বিস্মিত হয়েছিলেন, যেদিন তাঁর নিতান্ত জঘন্য একটা কয়লা খাদের ভেতর থেকে একেবারে খাঁটি এক নম্বর কোয়ালিটি কয়লা উঠেছিল। সেই ছোট কয়লা খাদই হল তাঁর আজকের রিঠুয়া কোলিয়ারি। চারদিকে ছোট-বড় রিঠা গাছের অনেক বন; নামটা তাই রিঠুয়া। যে শালজঙ্গলটা বেরমোর কাছে গিয়ে প্রায় ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, সেই জঙ্গলটাই এদিকে বেশ ঘন হয়েছে। এককালে এই জঙ্গলের প্রায় অর্ধেকটাই অমিত চৌধুরীর বাবার জমিদারি ছিল। জমিদারি তো উঠেই যাবে, তাই সময় থাকতে, বাবা মাত্র উনিশ হাজার টাকায় রাজগোলার জমিদার লালবাবুর কাছে জমিদারি বিক্রি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু অমিত চৌধুরীর বাপ আজ আর বেঁচেও নেই যে, তাঁর ওকালতির উপার্জনের সব টাকা ছেলের শখ আর সুখের জন্য খরচ করবেন।

কলকাতার বড়লোক বাবুদের বাগানবাড়ি থাকে। অমিত চৌধুরীর বাবা একজন বড়লোক বাবু হয়েও একটা বাগানবাড়ি রাখবার শখ করেননি। তিনি শখ করে তৈরি করেছিলেন একটা জঙ্গলবাড়ি, সে বাড়ি আজও আছে, ওই রিঠাবনের ছায়া থেকে বেশ দূরে, শাল জঙ্গলের আরও ভিতরে যেখানে ওরাওঁদের একটি গাঁ আছে। আজ সেই জঙ্গলবাড়ির নাম বনবিহার, অমিতেরই দেওয়া নাম।

অজিতবিক্রম চৌধুরী, যাঁর ছেলের পুরো নামটি হল অমিতবিক্রম চৌধুরী, তিনি একটা আক্ষেপের কথা বার লাইব্রেরীতে সবার কাছে বলতেন। তাঁরা নাকি সাত-আট পুরষ আগে ক্ষত্রিয় ছিলেন, দেশ ছিল সিরোহি, রাজপুতানা। খুব দুঃখ করতেন উকিল অজিত চৌধুরী, বাঙালি ভটচাযেরা বড় করে বিরোহির রাজপুতকে একেবারে বাঙালি কায়স্থ করে ছেড়েছে। এই দুঃখের ব্যাপারটা আদৌ হত না, যদি তাঁর পূর্বপুরুষদের একটি পরিবার সিরোহি থেকে চলে এসে নদে জেলার একটা গাঁয়ে ঠাঁই না নিতেন। নদে জেলার ওই গাঁয়ের নামটাও অদ্ভুত; হেড়োডাঙা। লোকে বলে, হেড়োডাঙার চৌধুরী।

রাঁচির বার লাইব্রেরীর দত্ত, মিত্র আর বাঁড়ুজ্জেরা মাঝে মাঝে এক আধটু হাসাহাসি করেন বটে, কিন্তু অজিত চৌধুরীর ওই আক্ষেপটাকে খুব বেশি অবিশ্বাস্য বলে মনে করেন না। যেমন বাপ, তেমনিই ছেলে; অন্তত চেহারাতে ক্ষত্রিয়তার অনেক কিছু আছে। গায়ের রং খুব ফর্সা, তার মধ্যে একটা লালচে আমেজও আছে। চওড়া বুক, লম্বা হাত, খাড়া নাক। হরেনবাবু বলতেন, হাতে একটা তরবারি দিলেই অজিতদাকে সেকেলে বীরত্বের একটি রণসিংহ বলে মনে হবে।

তরবারি নেই বটে, কিন্তু বন্দুক আছে। পিতা ও পুত্র, দুজনেই বন্দুক ভালবাসেন। দুজনের শিকারশখের রকম-সকম দেখলে সত্যিই সন্দেহ হতে পারে, এ বুঝি সেই সেকেলে ক্ষত্রিয়দের মৃগয়াবিলাসের একেলে মেজাজ। উকিল অজিত চৌধুরী আদালতের ছুটির দিনে তাঁর জঙ্গলবাড়িতে এসে একটি দুটি দিন থাকতেন, আর শুধু শিকার করে চলে যেতেন। কিন্তু ছেলে অমিত চৌধুরী তার বনবিহারেই থাকে, আর শুধু পাখির শিকার করে নয়, হরিণ শুয়োর বাঘ আর ভালুক শিকার করে জীবনের দিন মাস আর বছরগুলিকে সুখেই কাটিয়ে দেয়।

অজিত চৌধুরীর মারা যাবার বছরে পরীক্ষা দিয়ে আর ভাল নম্বর দিয়ে পাশ করে বি-এ ডিগ্রি পেয়েছিল যে অমিত, সে কিন্তু উকিল হবার জন্য আইন পড়তে পারেনি। কারণ উকিল হবার জন্য অমিত চৌধুরীর মনে কিংবা প্রাণে কিছুমাত্র ইচ্ছারও চাড় ছিল না। শুধু শিকার, বনচর যত পাশব হিংস্রতাকে গুলি মেরে মেরে রক্তাক্ত করাই যেন অমিতের একমাত্র আনন্দ।

ছেলে অমিতের ভাগ্য ভাল, রিঠাবনের কাছে কয়লার খাদ করবার জন্য অমিতের নামে মাইনিং লাইসেন্স করিয়ে রেখেছিলেন পিতা অজিত চৌধুরী। সেই খাদই হল আজকের রিঠুয়া কোলিয়ারি, যার লাভের টাকাতে অমিত চৌধুরীর বনবিহারের আর শিকারের সব সুখের দাবি মিটে যায়।

বনবিহারের এই অমিত চৌধুরী বিয়ে করেনি, কিন্তু সে জন্য তার প্রাণে ও মনে কোনও শূন্যতার আক্ষেপ নেই। অনেকদিন আগে রামগড়ের বাজারে রাঁচির ট্রেজারির কেরানি সদানন্দের কাছ থেকে শহরে ভয়ের একটা গল্প শুনেছিল অমিত। উকিল চন্দ্রনাথবাবু বলেছেন, ডাক্তার বরেন পালিতের মেয়ে বনলতার সঙ্গে অমিতের বিয়ে হলে মন্দ হবে না। মেয়েটিও তো বেশ ফর্সা লম্বা চেহারা, ম্যাট্রিক পাশও করেছে। শুনে চমকে উঠেছেন বরেন পালিত। মেয়েকে জঙ্গলে পাঠাতে তিনি রাজি নন। মেয়েও ভয় পেয়ে চমকে উঠেছে। গল্প শুনে হেসে ফেলেছিল অমিত, সুতীব্র তুচ্ছতা ও ঠাট্টার হাসি—কিন্তু আমি যে সত্যিই একটা লম্বা ফর্সা আর ম্যাট্রিক পাশ মিনমিনে লজ্জার লতাকে বিয়ে করতে পারি, একথা ওদের কে বললে?

ডাকবাংলার চাকর এসে বারান্দাতে ঘাসের পর্দা ঝুলিয়ে দেয় ও জল ছিটোতে থাকে। কারণ, জষ্ঠি মাসের দুপুরের যত উত্তপ্ত পাহাড়ের জ্বালা নিয়ে গরম বাতাস বইতে শুরু করেছে। এতক্ষণ ধরে রানুর মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থেকেও

অমিত চৌধুরীর চোখের সাধ যেন মিটে যেতে পারছে না। কিন্তু চাকরটা বেয়াড়াভাবে ঘাসের পর্দার গায়ে জল ছিটোচ্ছে, রানুর এলো চুলের উপর সেই জল ছিটকে পড়ছে। দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে আর ধমক দেয় অমিত—এই মালি, একটু আস্তে করো।

চাকরটা চলে যেতেই রানুকে আবার প্রশ্ন করে অমিত—এবার চলুন, একেবারে মন খুলে আর একটুও সঙ্কোচ না রেখে বলুন, এরকম একটা অমানুষের ঘর সহ্য করতে পারবেন, নাকি, পারবেন না!

রানু—আর পারব না।

অমিত—তারপর? কী করবেন? কোথায় যাবেন?

রানু—জানি না।

অমিত—খুব জানেন, শুধু আমার কাছে বলতে ইচ্ছে করছে না বলেই বলছেন না।

রানুর মাথাটা হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়ে। চোখ লুকোতে চেষ্টা করছে রানু। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বুকের ভিতরের একটা ঝড়ের কান্নাকে আটক করে রাখতে চাইছে।

অমিত—বুঝতে পারছি, আমি আপনার কাছে নেহাতই অচেনা মানুষ বলে আপনি আমাকে স্পষ্ট করে কিছু বলতে চান না। আমি আপনার একজন চেনাজন কিংবা আপনজন হলে কিন্তু নিশ্চয়ই বলতেন।

রানুর ঝুঁকে-পড়া মাথাটা একটু কেঁপে ওঠে। রানুর দুই চোখ জলে ভরে গিয়ে ছলছল করে, সেই জলের দু'চারটে ফোঁটা মেঝের উপরেও ঝরে পড়ে। অচেনা অজানা একটি মানুষের মুখের ওই কথা যেন মায়ালোকের সোনার কাঠির মত রানুর প্রাণের গোপন দুঃখটাকে ছুঁয়ে ফেলেছে। চুপ করে থাকবার যেটুকু শক্তি শেষ পর্যন্ত ছিল, তাও গলে গিয়েছে।

দেখতে পায় অমিত, বারান্দার ধারে-কাছে কোথাও কেউ নেই। চেয়ার থেকে উঠে এসে রানুর সেই হেঁট-মাথার উপরে হাত রাখে—বলো আমাকে; আমি তো তোমার কোনও শত্রুমানুষ নই।

মাথা তুলে আর দুচোখ বন্ধ করে কথা বলে রানু—আমি আর এই জগতেই থাকব না।

কী? অমিত চৌধুরীর চওড়া বুকটা যেন গুমরে ওঠে। —আত্মহত্যা করবে তুমি? রানুর মাথাটাকে দুহাত দিয়ে চেপে ধরে ধমক দেয় অমিত। —কিন্তু তোমার সাধ্যি কী? আমি থাকতে তোমার আত্মহত্যা করবার সাধ্যি হবে না। আমি বরং গুলি করে তোমাকে মেরে ফেলব, তবু আত্মহত্যা করতে দেব না।

চমকে ওঠে রানুর জলভরা চোখ—কে আপনি?

অমিত—যে-ই হই না কেন, কিন্তু তোমার একটা শত্রুমানুষ যে হতে পারি না, সেটা বিশ্বাস হয় না, কি বলো?

—হয়।

অমিত আবার নিজের চেয়ারে বসে। —যদি বিশ্বাস হয়, তবে এ জগৎ থেকে চলে যাওয়ার ইচ্ছে-টিচ্ছে ছেড়ে দাও। একটুও দুশ্চিন্তা করো না। আর, চুপ করে এখানে বসে থাকো।

—অনেকক্ষণ তো বসেছি।

—ঠিক কথা। এবার চা আর খাবার খাও।

—আমি চা খাই না। আর, খাবার খেতে এখন একটুও ভাল লাগবে না।

—ভাল লাগাতেই হবে।

—মাপ করবেন।

—তবে একটু সরবত খাও। ওহে খানসামা, এক গেলাস সরবত নিয়ে এসো।

—আপনি খাবেন না?

—হ্যাঁ, ওহে খানসামা, দু গেলাস সরবত নিয়ে এসো।

রানুর চোখে আর জল নেই। অমিত চৌধুরীর দুর্দান্ত ভাষা শুনে ভয় পেয়ে, কিংবা মায়ার কথা শুনে একটু স্বস্তি পেয়ে, নয়ত একটা আশ্চর্য মানুষকে দেখতে পেয়ে রানুর চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে।

অমিত বলে—আমি হলাম অমিত চৌধুরী, যাকে জঙ্গলের মানুষ বলে রাঁচির অনেক ভদ্রলোক ঠাট্টা করে। সত্যি কথা, আমি জঙ্গলেই থাকি। গাছের কোটরে অবিশ্যি থাকি না। জঙ্গলের ভিতরে একটি গাঁয়ের কাছে আমার সেই বাড়ি, এই ডাকবাংলার চেয়ে ঢের বেশি আরামের বাড়ি। সে বাড়িতে একাই থাকি, কারণ আমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। তুমি নিশ্চয় কিছু লেখা-পড়া শিখেছ।

রানু—ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত, পরীক্ষা দেওয়া আর হয়নি।

অমিত—খুব ভাল হয়েছে। ম্যাট্রিক পাশ করলে মেয়েরা ভয়ানক অহংকারী হয়ে যায়।

হেসে ফেলে রানু। —আমার বন্ধু শোভনা ম্যাট্রিক পাশ করেছে, কিন্তু সে একটুও অহংকারী নয়।

অমিতও হাসে—বুঝেছি, কিন্তু আমার কথার অর্থটা তুমি বুঝতে পারনি। যা-ই হোক, আমার অহংকার হল আমার একটি কয়লাখনি, আর আমার এই বন্দুক। কয়লাখনি আমাকে সুখে রেখেছে, ভাত-কাপড়ের কোনও অভাব ভুগতে হয় না। আর বন্দুকটি আমাকে সারা বছর আনন্দ যোগায়। মাচানে বসে, গভীর রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে শুকনো পাতার উপর বাঘের পায়ের শুধু একটু খুস্‌খাস্‌ শব্দ শুনেই আমি এক গুলিতে সেই বাঘকে ঘায়েল করে দিতে পারি, এমনই পয়া আমার বন্দুকটি।

দু গেলাস সবরত নিয়ে আসে খানসামা। রানু হাত তুলে আপত্তি করে। —না না, আমি খাব না।

অমিত—কেন? এই যে বললে....।

রানু হাসে—আমি তো আপনার কথামত চুপ করে আপনার কথা শুনছি।

অমিত—শুনছ বটে, কিন্তু একটু মানছ না।

রানু—তবে একটুখানি খাই।

অমিত—না, সবটুকু খেতে হবে।

সরবত খায় রানু। কিন্তু কী একটা আতঙ্ক রানুর চোখের পাতায় থরথর করে কেঁপে উঠেছে। ঘাসের পর্দা থেকে টুপটুপ শব্দ করে জলের ফোঁটা ঝরে পড়ছে। কিন্তু রানু যেন সন্দেহ করছে, টুপটুপ শব্দ করে ওরই বুকের রক্তের ফোঁটা ঝরে পড়ছে।

অমিত চৌধুরীর দুই চোখ আবার অপলক। নীরব হয়ে শুধু দেখতে থাকে রানুর ওই আতঙ্ক-রক্তিম মুখের ছবি। দেখছে অমিত, বার বার ডাকবাংলোর ফটকের দিকে তাকাতে চেষ্টা করছে রানু। রানুর মাথার কাপড় সরে গিয়েছে। এলোচুলের গোছা দুহাত দিয়ে ঘাড়ের কাছে তুলে নিয়ে শক্ত করে একটা খোঁপা বাঁধতে চেষ্টা করছে, কিন্তু বার বার খুলে যাচ্ছে খোঁপাটা। হাত দুটো কাঁপছে, তবু আবার খোঁপা বাঁধতে চেষ্টা করছে।

অনেকক্ষণ পরে কথা বলে অমিত—বুঝতে পারছ, বিকেল হয়েছে?

রানু—বিকেল হয়েছে? হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।

অমিত হাসে—কিন্তু আমার যে দুপুরের খাওয়াটা বাদ গেল, সেটা কি বুঝতে পেরেছ?

চমকে ওঠে রানু—অ্যাঁ, ছি, এ কী কাণ্ড করলেন আপনি।

অমিত—আমি করলাম, না তুমি করিয়ে ছাড়লে?

রানু—আমার একটা কথা রাখবেন?

অমিত—বলো।

রানু—আপনি খেয়ে নিন।

অমিত—তুমি?

রানু—আমি শুধু এক গেলাস জল খাব। আপনি একটুও ভাববেন না, এক বেলা উপোসে আমি কাহিল হব না, মরেও যাব না। ওটা আমার খুব অভ্যাস আছে।

অমিত—তাহলে আমিও আজ ওটা অভ্যাস করি।

রানু—তার মানে? আপনি খাবেন না?

অমিত—না।

রানু—কেন?

অমিত—ভাল দেখায় না।

স্তব্ধ হয়ে যায় রানুর সারা শরীর। শুধু দুই চোখে একটা জীবন্ত দৃষ্টি টলমল করতে থাকে। আশ্চর্য-মানুষকে রানু যেন প্রাণের ভিতরের দুটো চোখ দিয়ে দেখতে আর বুঝতে চেষ্টা করছে।

কিন্তু অমিত চৌধুরীও যেন এক আশ্চর্য-নারীকে দেখছে, মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে তার অপলক চোখের দৃষ্টি। অমিত বলে—কার দেখা পাব বলে এখানে এলাম, আর কার দেখা পেয়ে গেলাম। একেই বলে দৈব।

রানুর মুখে একটা কুণ্ঠিত ও মৃদু জিজ্ঞাসা বিড় বিড় করে—কার দেখা পাবেন বলে এসেছিলেন?

হেসে ওঠে অমিত—একটা লেপার্ডের দেখা। সাতদিন আগে সেই লেপার্ড আমারই গুলিতে জখম হয়েছে, একটা পা-ও ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু পালিয়েছে। সাতদিন ধরে ওটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। ভেলেয়ারা জঙ্গলে ওটাকে শুট করেছিলাম। খবর পাওয়া গেল, পালিয়ে গিয়ে দানুয়া জঙ্গলে ঢুকেছে। দানুয়াতেও দেখা পাওয়া গেল না, শুনলাম চাতার জঙ্গলে পালিয়েছে। এইভাবে ওই মরীচিকা লেপার্ডের পিছু ধাওয়া করে ছুটেছি। কাল খবর পেলাম, এই ভঁইসার শাল-জঙ্গলের ভিতরে ঢুকেছে সেই লেপার্ড। চৌকিদার থানাতে রিপোর্ট করেছে, একটা খোঁড়া লেপার্ড গাঁয়ের তিনটে বাছুরকে মেরে আর খেয়ে পুরনো সড়কের একটা ভাঙা কালভার্টের তলায় ঢুকেছে। সে কালভার্ট ওই লছমিথান থেকে মাত্র আধ মাইল দূরে। আজই দুপুরে সেখানে যাবার কথা ছিল। খুব আশা করেছিলাম, এবার ওটাকে দেখতে পাব আর সাবড়ে দেব। কিন্তু হল না। কিন্তু তুমি কি বুঝতে পারছ যে, তুমি আর একটা ভুল করেছ?

—না, কী ভুল করেছি বলুন।

—একবার ভুলেও নিজের নামটি মুখে আনলে না।

রানু হাসে—আপনিও তো জিজ্ঞেস করেননি।

অমিত—ঠিক কথা। তা হলে বলো, আমিই ভুল করেছি।

রানু—হ্যাঁ। আমার নাম রানু।

অমিত—বেশ নাম। আমার ভয় ছিল, নামটা বুঝি বনলতা-টতা হবে।

রানু—সীতারামপুরের মেয়ে বনলতা হতে যাব কেন?

অমিত—তুমি হওনি, কিন্তু অনেকেই হয়ে থাকে।

আবার নীরব হয় ডাকবাংলার বারান্দা। না অমিত, না রানু, দুজনের কারও মুখে কোন কথা নেই। দুজনের কেউই বোধহয় বুঝতে পারছে না, আর কী বলবার আছে? আর, এই চুপ করে বসে থাকার পালা ফুরোবেই বা কখন? এ যেন একটা সন্ধ্যার অপেক্ষায় বসে থাকা।

বুঝতে পারা যায়, বিকেলের আলো লালচে হয়ে এসেছে। ঘাসের পর্দার ফুটোগুলো যেন লালচে রঙের বুটি। পর্দাটাকে এখন একটা উৎসবের আসরের ঝালর বলে মনে হয়।

রানুর হাতে এখনও সেই সিঁদুর-ডিবে। লক্ষ্মীর পায়ের কাছে ফেলে রেখে আসবার সুযোগ পাওয়া গেল না। সেই সিঁদুর-ডিবেটাকে, রানুর জীবনের সেই ভয়ানক মিথ্যে বস্তুটাকে এখনও কেন হাতে ধরে রেখেছে রানু?

অমিত—সিঁদুর-ডিবেটার কী গতি করবে? লছমিথানে যাওয়া তো হল না।

রানু—আর একদিন যাওয়ার চেষ্টা করব।

অমিত—যদি যেতে না পার? তবে কী করবে?

রানুর দুচোখ ঝাপসা হয়ে যায়। —কুঁয়োর জলে ফেলে দেব। আর বলব, তোমার জিনিস তোমাকেই ফেরত দিলাম। লক্ষ্মী ঠাকরুন, কিছু মনে করো না।

—না, কুঁয়োর জলে ফেলে দেওয়া হবে না, ফেলে দিতে পারবে না। বলতে বলতে চেয়ার থেকে উঠে আসে অমিত। হাতের একটানে সিঁদুর ডিবেটাকে রানুর হাত থেকে তুলে নেয়। তার পর আর দশটি মুহূর্তও লাগে না। এক টিপ সিঁদুর তুলে নিয়ে রানুর সাদা সিঁথিতে ঘষে দেয় অমিত।

—একী? আপনি এক কী অদ্ভুত, ভয়ানক, অসহ্য কাণ্ড করলেন। চেঁচিয়ে ওঠে রানু।

—স্বামীর মত কাণ্ড করেছি। তুমি চিরকাল আমার ঘরে আর আমার কাছে থাকবে।

ফুঁপিয়ে ওঠে রানু—সর্বনাশ।

রানুকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে দুহাতে জড়িয়ে ধরে অমিত। —একটুও সর্বনাশ নয়। তোমাকে সুখী করে রাখার সব দায় আমার।

রানুর মাথাটা ছটফট করতে থাকে। কিন্তু অমিতের মুখটা ছটফট করে না। রানুর কপালটাকে নিবিড় উষ্ণ একটি স্পর্শ দিয়ে চেপে ধরে। ধীর স্থির শান্ত ও অনড় একটি লুটিয়ে-পড়া স্পর্শ।

রানুর মাথা আর ছটফট করে না। কিন্তু গলার স্বরের সঙ্গে যেন খুব শান্ত একটা নিঃশ্বাসের মৃদু বাতাস মিশিয়ে দিয়ে কথা বলে রানু—ছেড়ে দাও এখন, একটু বসতে দাও। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।

কত ব্যস্ত হয়ে, আর কত শক্ত করে দুহাতে রানুর অলস দেহভার ধরে নিয়ে রানুকে চেয়ারের উপরে বসিয়ে দিল অমিত।

রানু বোধহয় ঘুমিয়ে পড়তে চায়। বার বার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ক্লান্ত হয়ে বার বার ঝুঁকে পড়ছে মাথাটা। আর মনটাও যেন ইচ্ছে করে একটা স্বপ্নের ঘোর পেতে চাইছে।

অমিত ডাকে—রানু।

মাথা তুলে চোখ মেলে তাকায় রানু—কী?

অমিত—আর মিছে এখানে সময় নষ্ট না করে এখনই রওনা হয়ে যাওয়া ভাল।

রানু আর চমকে ওঠে না। চুপ করে কী যেন ভাবে। তারপর বেশ শান্ত স্বরে কথা বলে—কিন্তু...

অমিত—কী? কিসের কিন্তু?

রানু—এখনই নয়, আজও নয়, কাল সকালে, কিংবা খুব ভোরে।

অমিত—কেন?

রানু—ওখানে একবার যেতে হবে।

অমিত—কী আছে ওখানে? কোনও ধন-রত্ন?

রানু হাসে—আছে।

অমিত—কী বললে? আছে?

রানু—হ্যাঁ। আমার একটি ছোট বাক্স আছে। সেই বাক্সের মধ্যে নরু মামা আর জ্যোৎস্না মামির ফটো আছে। মিনু টুলু আর ভুলুর ফটো আছে। শোভনার একটা চিঠি আছে।

অমিত—তবে যাও, জিনিসগুলো নিয়ে এসো।

—এখনই চলে আসতে ভয় করবে।

—কিসের ভয়?

—গিরিধারীর বউ যদি দেখে ফেলে আর জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছ, তবে কী বলব?

—বলবে...।

—না না, কী দরকার। মিথ্যে কথা কিংবা সত্যি কথা, কিছুই কাউকে না বলে চুপ করে চলে আসাই ভাল।

—তবে চলো, তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

—না, আমি একাই যেতে পারব। ওই তো ছোট্ট মাঠ, আর ওই তো শিমূল গাছ।

—আচ্ছা, মনে থাকে যেন, আমি খুব ভোরেই গাড়ি নিয়ে তৈরি হয়ে ফটকের সামনে এই সড়কে তোমার অপেক্ষায় থাকব।

—মনে থাকবে।

—রানু।

—কী?

—আর একটা ভুল করেছ তুমি। ভুলেই গিয়েছ।

বুঝতে আর ভুল করে না রানু। শাঁখ না বাজুক, রানুর জীবনের মিথ্যে সিঁদুরকে সত্যি সিঁদুর করে দিয়েছে যে আশ্চর্য মানুষটি, তার এই অভিযোগ যে পুরুষমানুষের সত্যি ভালবাসার একটা দাবির আহ্বান।

বুঝতে একটুও দেরি হয় না রানুর। রানু বলে—কাছে এসো।

ঘাসের পর্দার ফাঁকে ফাঁকে ঝিলমিল করে বুটি-বুটি লালচে রোদের আভা। রানু বলে—আসি এখন।

অমিত—এসো।

বারান্দার সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে অমিত, তার একলা জীবনের স্বপ্নটা যাকে আর যেমনটি পেলে সবচেয়ে বেশি সুখী হবে, ঠিক তেমনটি একজন চলে যাচ্ছে। মাঠের শিমূল গাছের ছায়া পার হচ্ছে।

আর, শিমূল গাছের ছায়া পার হয়েই একবার থমকে দাঁড়ায়, মুখ ফিরিয়ে

ডাকবাংলার দিকে তাকায় রানু। হ্যাঁ, যা ভেবেছে রানু তাই হয়েছে। আশ্চর্য-মানুষটি তখনও সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু ওই ঘেন্নার ঘরে ঢুকতে যে একটুও ইচ্ছে করে না। কিন্তু উপায় নেই। ফটোগুলি নিতে হবে, আর রাতটাও কাটাতে হবে।

কখন সন্ধ্যে হল আর ঘনিয়ে গেল, বুঝতে পারে না রানু। কখন ঘরের ভিতরে নাকডাকা শব্দটা ঘনিয়ে উঠেছে, তাও জানে না। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে রানু, যদিও মাঝরাতের আকাশের তারা গুনে গুনে জেগে থাকবার কোনও ইচ্ছা নেই রানুর মনে। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়বার কোনও ইচ্ছে নেই। শুধু ভাবতে ভাল লাগে আর জানতে ইচ্ছে করে, আশ্চর্য-মানুষটি এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে, না চেয়ারে বসেই রাত জাগছে। ভুল হয়েছে, বিচ্ছিরি ভুল, আসবার আগে একটু বলে আসা উচিত ছিল, তুমি কিন্তু রাত জেগে বসে থাকবে না।

জানালার কাছে, বাইরের অন্ধকারের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে একটা পথ হারানো গরু বোধ হয় ধুঁকছে। একটা অদ্ভুত নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে চমকে ওঠে রানু। কী এটা? মানুষ বলে তো মনে হয় না।

রানু বলে—কে?

মানিক বলে—আমি।

রানু—শিগগির চলে যাও।

মানিক—তুমিও চলো।

রানু—সাবধান, বাজে কথা বলবে না।

মানিক—কোনও ভাবনা করো না, তোমার কোনও কষ্ট হবে না। এই দেখো।

রানু—কী দেখাচ্ছ?

মানিক—টাকা।

হাতে ধরা একটা ব্যাগের মুখ খুলে সত্যিই কি যে দেখাচ্ছে মানিক, কিছুই বুঝতে পারে না রানু।

রানু বলে—টাকা? না, একগাদা ছেঁড়া কাগজ?

মানিক—তবে ভাল করে দেখো। পকেট থকে একটা টর্চ বার করে নিয়ে খোলা ব্যাগের ভিতরে আলো ফেলে আর ফিস ফিস করে মানিক—ছত্রিশ হাজার টাকা। আজই গোমোর ব্যাঙ্ক থেকে ক্যাশ নিয়ে ফিরেছি, কিন্তু অফিসে আর যাইনি। তোমারই জন্যে নিয়ে এসেছি এই টাকা।

—সরে যাও, এখনই চলে যাও। তুমি একটা ডাকাত, তুমি একটা মুখ্খু, তুমি একটা ভয়ানক সর্বনেশে, তুমি একটা হিংসুটে ছল। বুক-ফাটানো একটা রাগ যেন পটপট করে রানুর এক-একটা পাঁজর ভেঙে দিচ্ছে।

মানিক আবার বলে—রানু!

রানু—ভাল চাও তো, অফিসের টাকা অফিসে জমা করে দিয়ে আর ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে থাক। যাও, যাও, যাও। আর একটাও কথা নয়।

জানালা বন্ধ করে দেয় রানু।

॥ ৫ ॥

কোয়েল নদীর ঢলের জলে ঝাঁপ দিলে ভাল হত কি হত না, রানুর প্রাণে এ প্রশ্ন আর নেই। কিন্তু স্বপ্নে যার ঢেউ দেখা যায়, চোখ বন্ধ করে সেই নদীর জলে ডুব দিয়ে স্নান করেছে রানু, আর চোখ মেলতেই দেখতে পেয়েছে, একটা নতুন পৃথিবীর মাটি আর আকাশে নতুন ফুল ও নতুন তারা হাসছে।

ভালই হল, পুরনো পৃথিবীর মাটিতে গিয়ে আর দাঁড়াতে হল না। সে পৃথিবীতে শোভনা আছে, শোভনার মত আরও কত মেয়ে আছে, যারা একজনের হাত ধরে নিশ্চিন্ত হয়ে তারই কাছে থাকে। থাকুক। রানুর জন্য সে পৃথিবী শুধু ধুলো আর কাঁটা রেখেছিল। ধূলোতে ক্ষুধার জ্বালা, কাঁটাতে বিষেব জ্বালা। কারও হাত ধরে নিশ্চিন্ত হবার সুখটুকু রানুর জন্য রাখেনি। পোড়া কপালটা সামান্য একটু ভাত-কাপড়ের জন্য ভেবে ভেবে আরও পুড়েছে। কারও কাছে শান্ত হয়ে আর শান্তিতে মরে পড়ে থাকবার আশাও ছিল না।

অমিত একটু বেশি স্পষ্ট করে রানুর এই নতুন জীবনের দুটি প্রাপ্তির কথা বলে, দুটি সুখের কথা। অস্বীকার করে না রানু, অস্বীকার করে কিছু বললে যে খুব মিথ্যা বলা হবে। এ জীবনে যে দুটি সুখের কোনওটিই ছিল না, এ জীবনে অমিত চৌধুরীর ভালবাসার এই ঘরে সে দুটি সুখকে আশার চেয়েও বেশি করে পেয়েছে রানু।

যেদিন কোলিয়ারি দেখতে যায়, কিংবা রামগড়ের ব্যাঙ্ক বাজার কিংবা ডাকঘরে যায় অমিত, সেদিনের একটা-দুটো বেলা অবশ্য রানুকে একলা থাকতে হয়। কিন্তু তাছাড়া কোনওদিন আর কোনও বেলা নয়। অমিতের সঙ্গে প্রায় সারাক্ষণ এক হয়ে মিশে থাকতে হয়। একটি মুহূর্তও রানুকে কাছ ছাড়া করতে কিংবা চোখের কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চায় না অমিত।

দেখতে খুব সুন্দর এই বনবিহার। রঙিন কাঠ আর কাচের জানালা। ছোট-বড় সাতটা ঘর। মাঝের ঘরটি সবচেয়ে বড়। সে ঘরে শুধু একটি খাট আর দেয়াল ঘেঁষে একটি মিরর। সামনের দিকের ঘরে অনেক আসবাব, সোফা কোচ আর চেয়ার। কিন্তু তার পাশের ঘরটা হল একটা বোঁটকা দুর্গন্ধের ঘর। দরজা বন্ধ থাকলেও সেই দুর্গন্ধের আভাস নাকে এসে লাগে। ঘরের ভিতরে বাঘ ভালুক ও হরিণের যত চামড়া আর শিং ডাঁই হয়ে আর ছড়িয়ে পড়ে আছে। রানু কতবার বলেছে, ওগুলোকে এই খেজুর গাছের কাছে মাটির ঘরে সরিয়ে দিলেই তো ভাল হয়।

অমিত বলে—থাকুক না। তুমি বরং ওই ঘরটার কাছে যেও না।

রান্না করার লোক আছে, পাঁড়েজি। বনবিহারের কাজের উপযুক্ত মানুষ। পৈতে

আছে পাঁড়েজির; সেই পৈতে ভাল করে গলায় জড়িয়ে নিয়ে যখন মুরগি কাটে পাঁড়েজি, তখন দৃশ্যটা রানুকে হাসিয়ে দেয় বটে, কিন্তু সরেও যায় রানু। দেখতে কেমন যেন লাগে, কিংবা ভাল লাগে না।

ঘরদোর পরিচ্ছন্ন করবার জন্য ঝাড়ুদার এক চাকর আছে। এই চাকরটাকে জমাদার বলে ডাক দেয় অমিত। যে ঝাড়ু দিয়ে বাড়ির ড্রেনের জল টানে জমাদার, সেই ঝাড়ুটাকে হাতে নিয়ে ঘরের মেঝের ধুলো সরায়। রানু বলে, ওকে আর ডেকো না, ঘরদোর পরিষ্কার করতে হলে আমিই করব।

অমিত বলে—না, ওটা তোমার কাজ নয়। তোমার কাজ হল...।

ঘরের ভিতরে ঢুকে মেঝের উপর ঝাড়ু চালায় জমাদার, দেখতে ভাল লাগে না রানুর। কিন্তু অমিতের কথা শুনে রানুর চোখ দুটো হেসে ওঠে। একটা দুটো ঘন্টা কেন, দশটা মিনিটও রানুর সঙ্গ ছাড়া হতে চায় না অমিত। বনবিহারে থাকা রানুর এই জীবন যেন অমিত চৌধুরীর বুকেরই ভিতরে একটি কুঠুরিতে থাকা একটা নিশ্চিন্ততা।

সেদিন প্রথম যেদিন রানুকে নিয়ে অমিত চৌধুরীর গাড়ি জঙ্গলের রাস্তার ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছিল, সেদিন বুকের ভিতরে ছোট্ট একটু ভয়ের ছায়া শিউরে উঠতে থাকলেও, কী ভালই না লেগেছিল রাস্তাটাকে দেখতে। শাল-জঙ্গলের মাথার উপর পড়ে আছে, আর-এক হাত গাড়ি চালাবার চাকাটার উপর। রাস্তাটা যেন রানুর নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত জীবনের একটা শান্ত নীরব অভ্যর্থনার পথ।

কুঁয়ো থেকে জল তোলবারও চাকর আছে, তাকে তিন-নম্বর বলে ডাক দেয় অমিত। পাঁড়েজি বোধ হয় এক-নম্বর, জমাদার দু-নম্বর। এই তিনটি নম্বর মানুষেরও থাকবার ঘর আছে, বনবিহারের কাঠের ফটক থেকে একটু দূরে। অমিত যেদিন বাইরে যায়, সেদিন ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আর এই ফটকের কাছে এসে দাঁড়িয়ে কতবার দেখতে পেয়েছে রানু, ওই তিনজন নম্বর-মানুষের তিনটি মাটির ঘরের সামনে খোলা আঙিনার উপরে ছুটে ছুটে খেলা করছে তিন-চারটে বাচ্চা ছেলেমেয়ে। আঙিনাতে বাঁশের খুঁটো আছে, এক খুঁটোর মাথা থেকে আর এক খুঁটোর মাথার সঙ্গে বাঁধা হয়ে দড়ি ঝুলছে। সে দড়িতে ছেঁড়া শাড়ি আর আস্ত শাড়িও ঝুলে দুলে শুকোচ্ছে। বুড়িটি কে? জমাদারের মা বোধহয়। ওই কালো মেয়েটি কে? তিন -নম্বরের বউ বোধহয়। আর হেসে হেসে ঢলে পড়ছে, হাত তুলে কাকে যেন ডাকছে, যার কানে মস্ত বড় ঝুমকো দুলছে, সে মেয়ে নিশ্চয় জমাদারের বউ।

পাঁড়েজি কি শুধু মুরগি কাটে আর রাঁধে? তা তো নয়। আজ হরিণের মাংস, কাল খরগোসের মাংস। এবেলা যদি তিতিরের মাংস রাঁধে তো ওবেলা হরিয়ালের মাংস রাঁধে। বনবিহারের রান্নাঘরের আঙিনাতে পাখির পালক জমে জমে একটা ঢিবি হয়ে উঠেছে। বাতাস বইলে ফুরফুর করে, কিংবা ছটফটিয়ে উড়তে থাকে নানা রঙের পালক। মাংসের কিছু না কিছু অন্তত দু'চার টুকরো কাঁচা-কাঁচা ভাজা না থাকলে

অমিত চৌধুরী ভাত মুখে তুলতে পারে না। ভাতই বা কতটুকু খায় অমিত? বড় চামচের বড় জোর তিন-চার চামচ। ডাল-তরকারি দরকার হয় না, শুধু তেল ঝাল আর পেঁয়াজ দিয়ে কষা করে এক বড় বাটি মাংস খেতে পেলেই সবচেয়ে বেশি খুশি হয়। অমিত বলে—এই এত বেশি কষা মাংসকে তুমি কাঁচা মাংস বলছ, রানু? কিন্তু ইংলিশ স্টেক কখনও দেখেছ কি? সে তো বলতে গেলে, শুধু একটু তাতিয়ে নেওয়া মাংস, আধকাঁচারও বেশি কাঁচা।

এক একদিন শুনতে পায় রানু, পাঁড়েজির সঙ্গে কথা বলছে তিন নম্বর—আজ হাঁকোয়া আসবে।

ওঁরাওদের গাঁ থেকে লোকজন আসে। জঙ্গলের কোথায় যেন মাচান বাঁধা হয়েছে। লোকগুলো জঙ্গল ঘিরে হল্লা করবে আর জানোয়ার খেদাবে। জানোয়ারগুলো কোনওদিকে পালাবার পথ না পেয়ে মাচানের কাছের খোলা পথ ধরে ছুটে পালাবে। মাচানে বসে বন্দুক তুলে গুলি করবে অমিত, আর অন্তত একটা-দুটো চিতল হরিণকে রক্তে রাঙিয়ে দিয়ে পথের উপর লুটিয়ে দেবে।

শিকার থেকে যখন ফিরে আসে অমিত, হাঁকোয়াদের কাঁধের বাঁশের সঙ্গে দড়িবাঁধা হয়ে ঝুলতে ঝুলতে মরা জানোয়ারও আসে। অমিত ডাক দেয়—এসে দেখে যাও, রানু। কী চমৎকার একটা চৌশিঙ্গা।

ঘরের ভিতর থেকে রানু সাড়া দেয়—তুমি দেখ।

শুধুই কি চৌশিঙ্গা? এইভাবে হাঁকোয়াদের কাঁধের বাঁশে ঝুলে ঝুলে অমিতের শিকার-করা কত জন্তুই তো এল। অমিত রানুকে ডেকে ডেকে আর বলে বলে বুঝিয়ে দিয়েছে, কোনটা আসল চিতল হরিণ, কোনটা নেহাতই একটা বুড়ো সম্বর, আর কোনটা একেবারে কচি একটা কাকর হরিণ। চেঁচিয়ে ওঠে অমিত—এটা বনছাগল নয়, রানু। এটা হল কাকর, রামায়ণে যাকে মায়ামৃগ বলা হয়েছে।

পায়ে বুট জুতো, শক্ত খাকি জিনের ব্রিচেস আর চিমড়ে কাপড়ের কামিজ, অমিত চৌধুরীর শিকারি চেহারাটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে রানু, ভিন্ন সাজ পরলে মানুষের চেহারাও এত ভিন্ন হয়ে যায় কেন?

রানুর নিজের সাজও তো আর সেই সাজ নয়। কখনও কি বুঝতে চেষ্টা করেছে রানু, এই ভিন্ন সাজে তারও চেহারাটা ভিন্ন হয়ে গিয়েছে কিনা?

বুঝতে চেষ্টা করেনি রানু, মিররের সামনে দাঁড়িয়ে একদিন বুঝেই ফেলেছে। রানুকে এই সাজে আজ দেখতে পেলে শোভনা কি রানুকে চিনতে পারবে? না, বিশ্বাস করতেই পারবে না যে, রানুর আবার একরকম একটা চেহারা হতে পারে।

কিন্তু সত্যিই যে হয়েছে। রানু যদি দু'হাত দিয়ে চোখ-মুখ ঢেকে আর আঙুলের ফাঁক দিয়ে মিররের দিকে তাকায়, তবে নিজেই নিজেকে চিনতে পারবে না। গায়ে খুব ছোট চোলির মত একটা ব্লাউজ, যার হাতও নেই ঝুলও নেই। বুকের শুধু মাঝটুকু ছাড়া গায়ের আর সবই খোলা। পেট কাঁধ পিঠের প্রায় সবই খালি। রানুর

গায়ে বাজে লজ্জার কোনও রাখা-ঢাকা পছন্দ করে না অমিত। শাড়িটাও খুব মিহি সুতোর জালির মত একটি ফিনফিনে আবরণ, যেন গায়ের রঙের আভার সঙ্গে গায়ের গড়ন-ধরনের আভাসও দেখতে পাওয়া যায়, দেখতে ভালবাসে অমিত। অমিতের পছন্দের প্রায় সবই মেনে নিয়েছে রানু। সায়া হবে খুব খাটো। খোঁপা কিংবা বেণী না বাঁধলেই ভাল। শ্যাম্পু করে ফোলানো আর ফাঁপানো চুলের নরম চিকণ বোঝাটাকে শুধু এক পাক গিয়ে একটু গুটিয়ে নিয়ে আর তুলে নিয়ে কাঁধের একদিকে ফেলে রেখে দিতে হবে। আলগা চুলের সেই গোছা ঘাঁটতে আর মুঠো করে ধরতে ভালবাসে অমিত। যা বলেছে অমিত, তাই করেছে রানু।

কিন্তু এর মধ্যে ভাবনা করবার কী আছে? আলমারির ভেতরে স্তর করে সাজানো আছে কত ঢাকাই, টাঙ্গাইল, শান্তিপুরি আর বিষ্ণুপুরি। রঙিন তাঁতের শাড়ি, রঙিন সিল্কের শাড়ি। পুরো বারো হাত দীর্ঘ মাদ্রাজি শাড়ি। অমিত যখন বাড়িতে থাকে না, তখন শাড়িগুলি যত ইচ্ছে তত পরতে পারা যায়। দশ মাসের মধ্যে যত শাড়ি কিনেছে অমিত, তত শাড়ি দশ বছর ধরে যখন-তখন পরেও ফুরিয়ে দিতে পারা যায় না।

অমিতের পছন্দের যেন অন্ত নেই, সেই পছন্দের বিচিত্রতারও অন্ত নেই। পছন্দটা বোধহয় অমিতের রক্তেরই একটা তৃষ্ণার অভিরুচি। সেই তৃষ্ণাকে সুখী করে দিয়ে সুখী হয় রাণুর প্রাণ, শরীরটাও নিশ্চয়। ভুলতে পারে না রানু, এই সেদিনও যেদিন বিকাল হতেই শিকারে বের হয়ে গেল অমিত, সেদিন মাঝঘরের বিছানাতে শুয়ে এই ঘরেরই প্রথম রাত্রিটার কথা মনে পড়েছিল। অমিতের মুখের ভাষাটা একটু বেশি স্পষ্ট, শুনতে একটু কেমন যেন লেগেছিল, এই মাত্র। কিন্তু একটুও তো কেমন-যেন বলে মনে হয়নি অমিতের সেই দুই হাতের সেই আদর।

রানুর মুখের দিকে তাকিয়ে আর কী যেন ভেবে নিয়ে হঠাৎ বলে উঠেছিল অমিত—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, রানু?

রানু—বলো।

—তোমার কী ছেলেপুলে কখনও হয়েছিল?

—না।

—কেন?

—হওয়া অসম্ভব, তাই হয়নি।

—এই বয়েস পর্যন্ত তা হলে শুধু এমনিতেই...

—হ্যাঁ।

—একটা দাগও পড়েনি?

—না।

অমিতের হাত দুটো হঠাৎ দুরন্ত আবেগে ব্যাকুল হয়ে রানুকে জড়িয়ে ধরে; রানু যেন কুড়িয়ে-পাওয়া একটা খাঁটি মানিক। আর, বেশ অদ্ভুত একটা কথাও বলে অমিত—ওসব ম্যাট্রিক পাশ লতা-টতার চেয়ে তুমি অনেক খাঁটি। অনেক অনেক।

অমিতের পছন্দের উৎসবটাও শ্রান্ত কিংবা ক্লান্ত হয়নি। শেষরাতের দিকে শুধু একটু ঘুমিয়ে নেবার সময় পেয়েছিল রানু। আর সকাল বেলা ঘুম ভাঙবার পর বিছানার চাদরে রানুর এই পঁচিশ বছর বয়সের শরীরটারই প্রথম কষ্টের একটা ছাপ দেখতে পেয়েছিল। চাদরটাকে তখনি গুটিয়ে পাকিয়ে খাটের তলায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল রানু। কিন্তু তবু তো একটুও খারাপ লাগেনি, বরং ভালই লেগেছিল।

এই দশ মাসের মধ্যে আরও ভাল লেগেছে কতবার। দিনে রাতে সন্ধ্যায় ও সকালে, অনেকবার। কিন্তু সময়ের চেয়ে অসময়ই যেন অমিতের বেশি পছন্দ।

সেদিনের পর আজ, দশটি মাস পারও হয়ে গিয়েছে, অমিতের আদরের ভালবাসা আর ভালবাসার পছন্দ বরং আরও বেড়েছে, একটুও কমেনি। অমিত নিজেই স্বীকার করে আর বলে—এখন আমার জীবনের ভালবাসার বস্তু বলতে শুধু দুটি বস্তু নয়, তিনটি।

রানু—তার মানে?

অমিত—তার মানে, আমার রিঠুয়া কোলিয়ারি, আমার এই দোনলা ম্যানটন, আর তুমি। আমার কোলিয়ারি আর বন্দুক যেমন পয়া, তুমিও তেমনি পয়া।

রানু হাসে—তোমার ভালবাসার আরও একটা বস্তু আছে।

অমিত—কী?

রানু—মনে করে দেখো।

অমিত—মনে করতে পারছি না।

রানু—আধা-কষা মাংস।

হেসে ফেলে অমিত—তা বলতে পারো।

রানু—তোমার আর একটি ভালবাসার বস্তু আছে।

অমিত—আর একটিও না, অসম্ভব, থাকতেই পারে না।

রানু—আছে।

অমিত—মনে তো পড়ছে না।

রানু—ব্র্যাণ্ডি।

অমিত—ওটা তো বস্তু নয়, ওটা ওষুধ। তোমারও মাঝে মাঝে ওষুধটা একটু-আধটু...

রানু—ওষুধের পায়ে নমস্কার, আমার কোনও দরকার নেই।

অমিত—কিন্তু ওষুধ খেয়ে কি আমি চেঁচাই আর লাফাই?

রানু—না।

অমিত—তবে কেন ঠাট্টা করছ রানু? খিদে বাড়ায়, খেতে ভাল লাগে, তাই ওই ওষুধ খাই।

রানুর খুব কাছে এগিয়ে আসে অমিত, বেশ গম্ভীর হয়ে আর একটা কথা বলে—বিশ্বাস করো, ওই ওষুধ তোমাকে আদর করবার খিদেও বাড়িয়ে দেয়।

হাসতে চেষ্টা করে রানু—ওষুধের গুণ ভালই বলতে হবে।

রানুও কী কোনও ওষুধ খায় না? খায়, খেতে হয়, না খেয়ে উপায় নেই। অমিত বলেছে, ও বিষয়ে তোমার সাবধান থাকতেই হবে রানু, আমার বনবিহারকে একটা পোলট্রি করে তুলতে পারব না। তাতে যেমন আমার, তেমনই তোমারও জীবনের কোনও সুখ বাড়বে না।

এই দশ মাসের মধ্যে দু'বার সেই ওষুধ খেয়েছে রানু। ওষুধের বড়ি মুখের কাছে তুলতে গিয়ে হাত কেঁপেছে, দু'চোখ জলে ভরে গিয়েছে, বুকের ভিতর থেকে উথলে উঠেছে একটা শুকনো নিঃশ্বাস। যাকগে, খাওয়াই ভাল। বেশি স্বপ্ন দেখে লাভ নেই। অমিতের আদরের জগতে থেকে সুখী হতে হলে, অমিত যা চায়, তাই করতে হবে। অমিত যাতে সুখী নয়, তাতে রানুর সুখী হবার কোনও অর্থ হয় না। কোনও ভয় নেই, ভাবনা নেই, খেয়ে পরে নিশ্চিন্ত হয়ে অমিতের ভালবাসার কাছে জীবনের দিনগুলি পার হয়ে যাচ্ছে। পার হতে থাকুক।

এই যথেষ্ট। মাঝে মাঝে একটু অস্বস্তি বোধ করতে হবে, একটু চমকে উঠতে হবে, অমিতের দু'একটা অদ্ভুত কথার মানেও হয়ত বুঝতে পারা যাবে না। কিন্তু তাতে কী আসে যায়? রানুর ভাগ্যটাকে তো আর একেবারে নিঃসহায় হয়ে আর চারদিকের শূন্যতার দিকে তাকিয়ে কোনও জ্বালা সহ্য করতে হবে না।

পাঁড়েজি জানে, জমাদার জানে, চাকর তিন-নম্বরও জানে, বাবু শিকার করবার জন্যে কোথায় যেন গিয়েছিলেন, সাতদিন বাড়িতে ছিলেন না, তারই মধ্যে একদিন কোনও এক বাবুর বাড়িতে খুব সুন্দর একটি মেয়েকে দেখতে পেয়ে বিয়ে করে আবার ফিরে এসেছেন।

পাঁড়েজি জিজ্ঞাসা করেছে—মাইজী আপনাদের দেশ কোথায়?

রানু বলে—সীতারামপুর।

পাঁড়েজির মা জিজ্ঞাসা করে—বহুজি, তোমার বাবা আছেন? মা আছেন?

রানু বলে—না।

পাঁড়েজির মা চোখ টান করে বলে—তাই তো।

বুঝতে পারে রানু, কী বলতে চায় পাঁড়েজির মা। বাপ-মা থাকলে কি তারা মেয়েকে এই জঙ্গলে পাঠাতে রাজি হত? কখ্খনও না। বুড়ি তো জানে না, যে এই জঙ্গলই হল রানুর জীবনের একমাত্র নির্ভয় নিরাপদ আশ্রয়। এক নতুন জগৎ। পুরনো জগতের ধূলোতে দমবন্ধ হয়ে মরে গিয়ে রানুর জীবনটা এই নতুন জগতে এসে পুনর্জন্ম লাভ করেছে।

আশ্চর্য-মানুষটির ওই চওড়া বুকের ভিতরে তো কোনও ফাঁকি নেই। রানুকে নিতান্ত একটি প্রিয় সঙ্গিনী বলে মনে করে না অমিত, ঘরণী স্ত্রী বলেই মনে হয়। একদিন একগাদা কাগজ-পত্র নিয়ে কোলিয়ারির কম্পাসবাবু এসেছিলেন। অমিতের কাছে কাগজ-পত্র রেখে দিয়ে চলে গেলেন, ফটকের দিকে সাইকেলটার কাছে।

অমিতই হঠাৎ একটা ডাক দেয়। কম্পাসবাবু, একবার এদিকে আসুন। ছুটে আসেন কম্পাসবাবু—আজ্ঞে, বলুন স্যার।

অমিত বলে—আমার স্ত্রীর জন্যে কয়েকটা জিনিস কেনবার দরকার আছে। আপনি আজই একবার রামগড় বাজারে গিয়ে চক্রবর্তীর দোকান থেকে কিছু কস্‌মেটিক্‌স্‌ কিনে আজই পাঠিয়ে দিন।

কম্পাসবাবুর হাতের কাছে ফর্দ-লেখা একটা কাগজ এগিয়ে দেয় অমিত—আজই পাঠাতে অসুবিধে থাকলে কাল পাঠিয়ে দেবেন...হ্যাঁ, চক্রবর্তীকে বলবেন, আমার স্ত্রীর জন্য কিছু বই চাই, অর্থাৎ নভেল-টভেল, যে বই মেয়েরা পড়তে বেশি ভালবাসে।

সেদিনই দুপুরবেলা, যখন ঘরের ভিতরে একটা চৌকির উপর বসে অমিত তার প্রিয় পয়া দোনলা ম্যানটনের কলকব্জা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল, তখন কাছে এসে অমিতের গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে রানু।

অমিত বলে—এই তো চাই।

রানু হাসে—আমিও তো চাই; কিন্তু কেন, তা বলব না।

আমার স্ত্রীর জন্যে; অমিতের মুখের কথাটি যে রানুর জীবনের একটি সফল স্বপ্নের কলরব। কোনও কুণ্ঠা না রেখে, একেবারে মুক্তকণ্ঠে বলে দিয়েছে অমিত, জঙ্গলবাড়ি এই বনবিহার এখন স্বামী-স্ত্রীর জীবনের ঘর। নিশ্চয় সবারই কাছে ওকথা বলে অমিত, বলেছে অমিত। তা না হলে পাঁড়েজির মা কেন জিজ্ঞাসা করবে, বহুজি তোমার দেশ কোথায়? আর জমাদারের বউ বা কেন এসে বলবে, যেমন তোমার স্বামী, তেমনই তুমি, দুজনেই বড় সুন্দর। তিন নম্বরের বউ মুখ টিপে হাসে—আমি বলব, বাবুর চেয়ে বাবুর বউ ঢের সুন্দর।

মাঝে মাঝে নয়, ক্বচিৎ ও কদাচিৎ কখনও সকালে দুপুরে কিংবা বিকালে অমিত যদি বা এদিকে-ওদিকে শুধু একটু বেড়িয়ে আসবার জন্য গাড়ি নিয়ে বের হয়; তবে একাই যায়। রানু তখন অমিতের সঙ্গিনী হয় না। বাইরের চোখের কাছে গিয়ে দেখা দিতে রানু চায় না। কিন্তু গোপন হয়ে থাকবার এই দুঃখটাকে একটা দুঃখ বলেই মনে করে না রানু। অমিতও জানে, এই সতর্কতাটুকু মেনে নিতেই হবে, বাইরের আইন তার নীতি যেন বনবিহারের ঘরের সুখটাকে টানা-ছেঁড়া করবার কোনও সুযোগ না পায়। অমিত বলে—আমি কোনও ভয়ের পরোয়া করি না রানু। শুধু একটু সাবধান থাকতে চাই, যেন তোমার গায়ে বাইরের কোনও ইতরতার কামড় না লাগে।

আকাশে চাঁদ থাকুক বা না থাকুক, এক-একদিন সন্ধ্যা হবার পর গাড়িতেই অমিতের সঙ্গে বাইরে বেড়িয়ে আসে রানু। বলে—চলো না. জঙ্গলের বাইরে কোথাও বেড়িয়ে আসি।

অমিত বলে—চলো।

কখনও রামগড়ের স্টেশন পর্যন্ত, কখনও বা কোলিয়ারির অফিসের সামনের

রাস্তা পার হয়ে বস্তির কাছে গিয়ে গাড়িটা থামে। বস্তিতে কিসের যেন উৎসব, খোলা মাঠে নাচ আর গান চলেছে, মাদল বাজছে।

গাড়ির ভিতরে অমিতের বাসে বসে সে উৎসবের আলো-ছায়ার খেলা দেখতে থাকে রানু। ফোলানো-ফাঁপানো চুলের স্তবক চেপে দিয়ে রঙিন সিল্কের রুমাল মাথাতে বেঁধেছে রানু। কে চিনবে নতুন জীবনের এই রানুকে? গাড়ির ভিতরটাও তো বেশ ছায়া-ছায়া। একটা গোপন নিরালা। রানুর মুখটাকে এমন স্পষ্ট করে দেখে ফেলবে, এত দৃষ্টিশক্তি কারই বা চোখে আছে? উৎসবের আলোর এত কাছে এসেও গাড়ি থেকে নামতে পারে না রানু, কিন্তু সেজন্য আক্ষেপ নেই রানুর মনে। গাড়ির ভিতরের ওই ছায়া-কায়া গোপন নিরালা তো অমিতের চওড়া বুকের কাছেরই একটি নিরালা।

কিন্তু জঙ্গলের শাল-মহুয়ার ভিড়ের মধ্যে একটু ঘুরে বেড়াতে অসুবিধা কোথায়? কোনও অসুবিধা নেই। এই জঙ্গলই একটি চমৎকার গোপন নিরালা। রাতের অন্ধকারটা অবশ্য একটা বাধা। কিন্তু রাতের বেলা না বেড়ালেই হল।

এই দশ মাসের মধ্যে অন্তত দশবার একটা অদ্ভুত কথা বলেছে অমিত—না, ঘরের ভিতরে আর ভাল লাগে না।

ঠিক বুঝতে পারে না রানু। কিন্তু মনে হয়েছে, এটাও বোধ হয় অমিতের একটা পছন্দের কথা। কিন্তু ভাবতে পারেনি রানু, আজই বুঝতে হবে, আর এমন করে বুঝতে হবে।

আজ তারিখটা কত? দুপুর বেলা গল্পের বই হাতে নিয়ে শুয়ে পড়বার আগে পঞ্জিকাটাকে একবার দেখে নেয় রানু, আজ চৈত্রমাসের পয়লা।

কিন্তু হঠাৎ ঘরে ঢুকে অমিত রানুর হাত থেকে বইটাকে হেসে হেসে ছাড়িয়ে নেয়। —চলো, একটু বেড়িয়ে আসি।

রানু—এখন এই অসময়ে?

অমিত—শালবনে একটু ঘুরে বেড়াতে আবার অসময় কিসের? সব সময়ই সময়।

সত্যিই তো, ঠিক কথাই বলেছে অমিত। বনঘুঘু ডাকছে, শালবনের মাথা দুলিয়ে দিয়ে দুপুরের চৈতী হাওয়া ছুটছে। শুকনো ঝরাপাতা উড়ছে। শালফুলের গন্ধও উড়ছে। কোথাও রোদ, কোথাও ছায়া।

বনপথ খুব সরু হয়ে আর ঢালু হয়ে যেখানে আবার ঘুরে গিয়েছে, সেখানে আমলকির ঝোপ, তারই পাশে আবার একটি আমলকির ঝোপ। দুই ঝোপের মাঝখানে ঘাসে-ঢাকা ছোট্ট একটি জায়গা।

থমকে দাঁড়ায় অমিত—চমৎকার জায়গা। রোদ আছে, ছায়া আছে, ঘাস আছে। চুপ করে শুধু দাঁড়িয়ে থাকে আর আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকে রানু। ঘামে ভিজে গিয়েছে কপালটা। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মোছবার জন্যে রানু হাত তুলতে গিয়ে আর তুলতে পারে না। রানুর হাত ধরেছে অমিত।

চমকে ওঠে রানু। অমিতের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। কোনও কথা বলে না। কিন্তু কোনও আপত্তিও করে না।

আবার যখন হাত তুলে রুমাল দিয়ে কপাল মুছতে চেষ্টা করে রানু, তখন বুঝতে পারে, মাথা হোক না হোক চুলের গোছা থেকে ঘাসের শিসের দানাগুলিকে ছাড়াতে হবে।

এইবার বুঝতে পারে রানু, এটা হল অমিতের পছন্দের জায়গা।

অমিত ডাকে—শুনছ?

রানু—বলো।

অমিত—কী এত ভাবছ, বলো তো?

রানু—ভাবছি, আশ্চর্য-মানুষটির সবই একটু বেশি আশ্চর্য।

অমিত হাসে—সেকথা বলতে পারো।

কিন্তু কথা বলতে গিয়ে রানুর গলার স্বর হঠাৎ একটু অশান্ত হয়ে ছটফটিয়ে ওঠে। —কিন্তু এত বেশি আশ্চর্য সহ্য করতে ভাল লাগে না।

অমিতের গলার স্বর খুব শান্ত—ভাল না লাগলে চলবে কেন, রানু?

॥ ৬॥

ভাল না লাগলেও চলতেই হয়। একটি চৈত্র পার হওয়ার পর আরও চৈত্র পার হয়েছে, আশ্চর্য-মানুষটির পছন্দের সঙ্গে ছন্দ রেখে রানুর জীবনও চলছে। বেশ কয়েকটা বছর কেটে গিয়েছে।

শাল জঙ্গলের ভিতরে, এদিক আর ওদিকে, কত জায়গায় কত নিরালার কাছেই না রানুকে যেতে হল, আর লুটিয়ে পড়তে হল, সেখানে সবুজ ঘাস থাকুক বা না থাকুক। একটা স্রোতের নালার বাঁক, যেখানে পাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে স্রোতের জল কলকল করে, সেখানে ভিজে পাথরের পাশে শুকনো বালুর গাদার উপর কোনও ছায়া নেই, আবছায়াও নেই। এটাও আশ্চর্য-মানুষ অমিত চৌধুরীর পছন্দের জায়গা। শালবনের আরও ভিতরে শিয়ালকাঁটার অনেক ঝোপের কাছে শুধু একটা পছন্দের জায়গা। পাথরের চটানের কাছে দাঁড়িয়ে শুধু একটি কথাই বলেছে রানু—বড্ড ধুলো। তখনি পকেট থেকে রুমাল বের করে পাথরের চটানের ধুলো মুছে দিয়েছে অমিত।

এইভাবেই চলতে চলতে একটানা জীবনের ক্লান্তির মধ্যে আবার একদিন চমকে উঠতে হয়, বুঝতে পারে রানু, জঙ্গলের গভীর রাতের অন্ধকারটাও অমিতের প্রাণের একটি প্রিয় পছন্দ। শিকারের জন্য জঙ্গলের কোথায় যেন মাচান বাঁধা হয়েছে। মাচানের তলায় একটি রোগা মহিষ বাচ্চাকে টোপ করা হয়েছে। অমিত বলে—বেশ ভাল একটা কিল রাখা হয়েছে।

রানু—কী?

অমিত—একটা রোগা বাচ্চা মহিষ। ভয় পেয়ে যতই ছটফটিয়ে উঠুক না কেন, দড়ি ছিঁড়ে পালাতে পারবে না।

কথা বলে না রানু। অমিতই রানুর নীরব চেহারার দিকে তাকিয়ে কথা বলে—আজ তো হাঁকোয়ার হল্লা নেই, দরকারও নেই। তুমিও চলো।

চমকে ওঠে রানু—আমি আবার কোথায় যাব?

অমিত—মাচানে তুমিও থাকবে আমার পাশে।

রানু—অদ্ভুত কথা।

রানুর হাত ধরে অমিত—ঘন্টার পর ঘন্টা মাচানে একেবার একা হয়ে বসে থাকতে আর ভাল লাগে না। তুমি থাকলে বেশ লাগবে। তুমিও দেখতে পাবে জঙ্গলের গভীর রাতের অন্ধকারের চেহারা কষ্টিপাথরের চেয়েও কত কালো আর কত ভাল।

কষ্টিপাথরের চেয়েও কালো আর ভাল অন্ধকারের মধ্যে, মাচানের ভিতরে খড়ের পুরু ঠাসের উপর বসে রানু নিজেও ছোট্ট এক টুকরো অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।

মাচানের কাছে একটা গাছের গোড়ার সঙ্গে শক্ত দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা মহিষ-বাচ্চা বাঘের ভয়ে ছটফট করছে, শব্দ শুনতে পেয়েছে রানু। কিন্তু সেই মুহূর্তে, একটা শক্ত অন্ধকার যখন রানুকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে, তখন রানু ওই ভিতু মহিষ-বাচ্চাটার মত ছটফট করে না।

আশ্চর্য-মানুষটির পছন্দের হাত থেকে জঙ্গলের মাঝরাতের অন্ধকারটাও রেহাই পেল না, এ যে বনের চেয়েও বেশি বুনো পছন্দ। মুখে কোনও কথা না বললেও রানুর বুকের ভিতরে একটা জ্বালা যেন কথা বলে।

শিকারীর জীবনসঙ্গিনী হতে হলে জঙ্গলের মাঝরাতের অন্ধকারের মাচানের উপর বসে থাকতে হবে, এটাই কি নিয়ম। মাচানটা কি কোনও ভদ্রলোকের জীবনের ঘর হতে পারে? অমিত চৌধুরীর জীবনের সবই কি শিকার? কিন্তু না, আজ আর এই জিজ্ঞাসার কোনও অর্থ হয় না। মনের জিজ্ঞাসা মনের ভিতরে শক্ত করে চেপে রেখে দেওয়াই ভাল।

আজ এক মাচান, দশটা দিন যেতে না যেতে আবার এক মাঝরাতের জঙ্গলের গভীরে আর একটি মাচান। শিকারী অমিত চৌধুরীর জীবনের সঙ্গে মিল রেখে চলতেই থাকে রানুর জীবন। সেই সঙ্গে বুকের ভিতরে জ্বালাটাও চলেছে, যদিও সে জ্বালা কোনও কথা বলেনি, বলেও না।

পাঁড়েজি বলে—আরও একটু ডাল দেব মাঈজী? কথা বলে না রানু, আর বুঝতেও পারে না যে, অলস হাতের আলগা মুঠোতে শুধু ভাত তুলে নিয়ে মুখে দিচ্ছে। দৃশ্যটা পাঁড়েজির চোখে ঠেকেছে।

পাঁড়েজি বলে—একটু মাংস দিই, মাঈজি? সাদা কবুতরের মাংস?

রানু বলে—না।

পাঁড়েজি—আপনার শরীর ভাল আছে তো? জ্বর-টর হয়নি তো মাঈজি?

রানু—না।

কিন্তু না বুঝে একটা কথা ভুল বলে ফেলেছে রানু। কারণ, আজ মাচান থেকে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়বার পর কখন যে জ্বর এল আর গা গরম করে দিল, বুঝতেই পারেনি রানু। শুধু বুঝতে পারে, অমিত বাড়িতে নেই, বোধহয় কোলিয়ারি দেখতে গিয়েছে। আর সাদা কুয়াশার ঘোর ভেঙে দিয়ে রোদের আলো ফুটে উঠতে শুরু করেছে।

সন্ধ্যা হবার পর বাড়িতে আসে অমিত— এ কী? এখনও বিছানাতে কেন? সকালবেলা দেখে গেলাম, ঘুমিয়ে আছ। এখন আবার দেখছি, ঘুমিয়ে আছ।

রানু—জ্বর।

রানুর বিছানার কাছে এগিয়ে আসে অমিত—হঠাৎ জ্বর হল কেন? ঠাণ্ডা লেগেছে বোধ হয়? কার্তিক মাসের এই কুয়াশাটা হল জ্বরের ওস্তাদ।

রানুর কপালে হাত রাখে অমিত। —সত্যিই তো, বেশ গরম।

রানুর বিছানারই একপাশে বসে রানুর কপালে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে অমিত। গলায় ও গালে। বিছানার উপর অলস হয়ে লুটিয়ে পড়ে আছে রানুর যে হাতটা, রানুর হাতেও হাত বোলায় অমিত।

একবার চমকে ওঠে আর চোখ খোলে রানু। তারপরেই চোখ বন্ধ করে। চোখ আর খোলে না রানু, খুলতে পারেও না। রানুর প্রাণ যে সত্যিই একটা নতুন অনুভবের আবেশে ভরে গিয়েছে? লজ্জা পেয়ে মরে গিয়েছে বিশ্রী সেই সন্দেহ। স্বপ্নে পাওয়া একটা মমতার নরম হাত রানুর গা বুলিয়ে দিচ্ছে, রানুর প্রাণের সেই জ্বালাও মুছে যাচ্ছে।

কিন্তু সেই মুহূর্তে বুঝতে পারে রানু, মিথ্যে একটা স্বপ্ন। জ্বরের ঘোরে কাহিল হয়ে পড়ে-থাকা রানুর এই গরম গা'টাকে রেহাই দেবে না আশ্চর্য-মানুষের পছন্দের সাধ।

কী তুমি। হাত দিয়ে একটা ঠেলা দিয়ে অমিতকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে রানু। গায়ে জ্বালা, বুকে জ্বালা, রানুর চোখেও দুরন্ত জ্বালা।

অমিত বলে—জানই তো।

দু'চোখ বন্ধ করে রানু যেন মন প্রাণ ও শরীরটার সব সাড়া স্তব্ধ করে দেয়। আশ্চর্য-মানুষের আশ্চর্য-সাধও তৃপ্ত হয়।

কার্তিক, অঘ্রাণ, পৌষ সবই চলে চলে ফুরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু রানুর জীবনও কি এইভাবে চলে চলে ফুরিয়ে যেতে পারবে? সেই অবসাদের লগ্নটির অপেক্ষায় শান্ত হয়ে পড়ে থাকতে পারা যাবে তো?

পাঁড়েজি আর জমাদারের গলার একটা হল্লা শোনা যায়। ঘরের বাইরে এসে দেখতে পায় রানু, পাঁড়েজি আর জমাদার বার বার ঢিল তুলে নিয়ে নিমগাছের মাথার উপর ছুঁড়ছে। নিমগাছের ডালে বাবুই পাখির একটা বাসা দুলছে। একটি সাপ সেই বাসা জড়িয়ে ধরে ঝুলছে।

সরে যায় রানু। এ দৃশ্য আর বেশিক্ষণ দেখে কোনও লাভ নেই। বাসার ভিতরের পাখিটা তো পালিয়ে যেতে পারবে না। এখন আর পালিয়ে যাবার সাধ্যি নেই। বাসার ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে দিয়েছে সাপটা।

আবার ঘরের ভিতরে গিয়ে আয়নাটার কাছে এসেও আনমনা হয়ে যায় রানু। চিরুনিটা হাতে তুলে নিতে ভুলে যায়।

ওদিকে সীতারামপুর পর্যন্ত আঠারো বছর, এদিকে পাঁচটা বছর, মাঝে রত্না সিমেন্টের একটা এক-ঘরের নরকের মধ্যে সাতটা বছর, তবে কত হল বয়সটা? ত্রিশ হয়েই গিয়েছে। কিন্তু আর কী দরকার? বয়সটাকে আর একত্রিশ করে কোনও লাভ নেই।

শুনেছে রানু, এখান থেকে বেশ দূরে কোথায় যেন দামোদর আছে। বোধহয় দূর বলেই বর্ষার দামোদরের জলের শব্দ শোনা যায় না। কিন্তু সেই জল নিশ্চয় একটা জ্বালার মানুষকে ভাসিয়ে ডুবিয়ে আর পাথরের উপর আছড়ে দিয়ে ভাল মরণসুখ দিতে পারে।

কিন্তু রেল-লাইনও কি খুব বেশি দূরে? মাঝে মাঝে জঙ্গলের বাতাসে ট্রেনের চলার যে শব্দ ভেসে আসে, সে তো ট্রেনের চাকার শব্দ। খুব শক্ত চাকা, তার ভারও আছে ধারও আছে। পিষে দিতে পারে, কেটে দু'টুকরো করে দিতেও পারে।

ঘরের ভিতরে খাটে শুয়ে নয়, চেয়ারে বসে নয়, রানুর এখন জানালারই কাছে দাঁড়িয়ে মনে মনে নিজের সঙ্গে এইসব প্রাণের কথা বলাবলি করতে ভাল লাগে।

রানুকে একটা অদ্ভুত অভ্যাসেও পেয়েছে। প্রাণের কথাটা মনের সঙ্গে বলাবলি করবার ইচ্ছে হলেই জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়।

আজ সকালে ঘরের ভিতরে অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করেছে রানু, জানালার কাছে দাঁড়াতে পারছে না। বার বার দরজার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখছে, কম্পাসবাবু চলে গেলেন কিনা? গাড়ির চাকা মেরামত করতে কোলিয়ারি থেকে যে মিস্তিরি এসেছে, সে-ই বা চলে যাবে কখন? ওরা না চলে গেলে তো জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারা যাচ্ছে না। আজ যে বার বার শুধু ওই দুটি কথা মনে পড়ছে; দামোদর কত দূরে? আর রেল-লাইন কত দূরে? সুখে মরে যাওয়ার চেয়ে মরে সুখী হওয়াই কি অনেক ভাল নয়?

না, আর বেশিক্ষণ ঘরের ভিতরে বসে ছটফট করতে হল না। দেখতে পায় রানু, চলে গেলেন কম্পাসবাবু আর মিস্তিরি। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় রানু। আর এতক্ষণের ছটফটে অস্থিরতাও একেবারে শান্ত হয়ে যায়।

কিন্তু ও কী! কে ও? কে ওরকম করে কথা বলছে?

নিমগাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে থেকে একটা পাখি ডাকছে, একটা পাহাড়ি ময়না।

হাসতে হাসতে জানালার কাছে এসে দাঁড়ায় অমিত—ভয় পেলে নাকি, রানু?

রানু—না।

অমিত—কিছু বুঝতে পারলে, কী বলছে পাখিটা?

রানু—না।

অমিত—পাখিটা বলছে, হায় মার দিয়া।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে অমিত। কিন্তু রানুর বুকটা দুরুদুরু করে।

অমিত বলে—ওটা একটা মজার পাখি। কিছুদিন আগে দেখেছিলাম, রিঠুয়ার রাস্তার পাশে একটা ছাতিম গাছের ডালে বসে ডাকছে। স্টোরবাবু বলেন, —ওটা হল একটা খুনে সাক্ষি পাখি।

চমকে ওঠে রানু। অমিত আবার হাসে। —তবে শোনো। শুনলে মনে হবে, এ যেন একটা বানানো গল্প। কিন্তু তা নয়। রামগড়ের থানার এস-আই শিউপ্রসাদ আমাকে বলেছে। প্রায় বছর-দুই আগে, রামগড়ের বস্তিতে একটা লোক ছিল, কাঠ-কাটা মজুর। এই ময়নাটাই ছিল সেই লোকটার পোষা ময়না। একদিন সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে এসেই দেখতে পেল, সুন্দরী বউটার রক্তমাখা ধড়টা মেঝের মাটির উপর পড়ে ছটফট করছে। কাটা গলাটা প্রায় দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে। চেঁচিয়ে উঠল লোকটা।

রানু—লোকটা, না বউটা?

অমিত—লোকটা। হায় মার দিয়া, হায় মার দিয়া, চিৎকার করতে করতে লোকটা থানাতে ছুটে এল। কিন্তু তার পর লোকটা যে কোথায় চলে গেল কেউ জানে না। চলে যাবার আগেই বোধ হয় ময়নাটাকে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল। ....আচ্ছা, আমি চলি, একবার রিঠুয়া ঘুরে আসি।

চলে গেল অমিত। পাখিটা তখনও ডাকছে। ঝুপ্ করে এখটা ঢিল এসে নিম গাছের ডালে লাগতেই উড়ে গেল পাখিটা। কে ছুঁড়েছে ঢিল? দেখতে পায় রানু, চাকর তিন-নম্বর তখনও ঢিল ছুঁড়ছে। ময়নাটাকে বোধহয় একটা অলুক্ষুণে পাখি মনে করেছে, আর ভয় পেয়েছে চাকরটা।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে পাখিটারই কথা ভাবতে থাকে রানু। মজার পাখিই বটে। নানা রকম স্বরে কথা বলে পাখিটা। কখনও মনে হয়, পাখিটা বুঝি হাসছে। আবার মনে হবে, বুঝি ঠাট্টা করছে। এক-এক সময় মনে হবে, কাঁদছে।

বুঝতে পারেনি রানু, হঠাৎ এত ভয় পেয়ে আর এমন করে ছটফটিয়ে উঠবে রানুর নিজেরই মনটা কী অদ্ভুত ভয়, এত ভয় পেলে যে রানুর সব হাড়মাংসও কেঁদে ফেলবে।

নিমগাছের এই ছায়াটাকে দেখতে ভয় করে। কাঁপছে পেঁপে গাছের পাতা, দেখতে ভয় করে। যেমন চোখে ভয়, তেমনিই বোধহয় মনেও ভয়। রান্নাঘরের দরজার কাছে বসে মিউ-মিউ করছে সাদা একটা বিড়াল, শুনে ভয় পায় রানু, যেন কথা বলছে বিড়ালটা। জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আর হাসছে পাঁড়েজির মা; দেখতে ভয় করে।

—কে? কী চাই তোমার?

পাঁড়েজির মা আসে—কিছু না, বহুজি। তুমাকে একটু দেখছি।

রানুর মনে ছটফটে ভয়টা তখনও বোধহয় মিটে যায়নি। বিড় বিড় করে কথা বলে রানু—পাখি কথা বলে, তুমি কখনও শুনেছ?

—হ্যাঁ, তিনবার শুনেছি।

—শুনে ভয় করে না?

—ভয় করবে কেন? ভাল কথা শুনলে কি কারও ভয় হয়?

—ভাল কথা?

—হ্যাঁ। গাছই বলে দিবে, কবে ছেলে হবে। বেটা হবে, না বেটি হবে তাও বলে দিবে। পাপ কেটে গেলে, ভুত-প্রেত দূরে গেল, গরু এবার দুধ দিবে ভাল, সব বলে দিবে।

—কোন গাছ? কেমন গাছ?

—একটা পিপুল গাছ। সে গাছ কি তুমি কখনও দেখ নাই?

—না।

—তবে যাও, একদিন গিয়ে দেখে এসো।

—কোথায় যাব?

—ঢের দূর নয়; এই জঙ্গলেরই ভিতরে, একটা গুপ্তগঙ্গা আছে।

—ধ্যেৎ!

—আছে বহুজি, আছে। কয়লাখাদের বাঙালি বাবুদের বহু-বেটিরাও সেখানে যায়, আর পূজা দিয়ে চলে আসে। সেখানেই আছে ওই গাছ। তুমি মানত করে পূজা দিলেই শুনতে পাবে, কথা বলছে পিপুলদেব।

চলে গেল পাঁড়েজির মা। রানুর মনও আর ছটফট করে না, ভয়টা বোধ হয় রানুর প্রাণের একটা ছটফটে বিস্ময়ের বাতাসে শুকনো ধূলোর মত সরে গিয়েছে। জানালা থেকে সরে গিয়ে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়, আর ফটক পর্যন্ত এগিয়ে আসে রানু। আবার ফিরে গিয়ে আলমারির ভিতর থেকে শাড়ির থাকের অনেক নীচে চাপা পড়া একটা লালপেড়ে শান্তিপুরীকে টেনে বার করে।

দুপুর হতে এখনও বেশ দেরি আছে। যদি এরই মধ্যে কোলিয়ারি থেকে ফিরে আসে অমিত, তবে বলতে হবে, এখনই চলো। আর যদি ফিরতে দেরী করে, দুপুর হয়ে যায়, তবে বলতে হবে, এই বিকেলেই চলো। আশ্চর্য-মানুষ, পেট ভরে ভাত-মাংস খেয়ে নিক, কিন্তু রানু কিছুই খাবে না। এবেলাটা উপোস করে থাকাই উচিত। গুপ্তগঙ্গা দেখে ফিরে আসবার পর যদি দরকার হয়, তবে না হয় কিছু মুখে দেওয়া যাবে। দিতেই তো হবে। মানুষের পেটের মত দুর্ভাগ্য জন্তু তো পৃথিবীতে আর কিছু নেই।

অমিতের ফিরতে দেরি হয়নি। ঘরে ঢুকেই হেসে ওঠে অমিত। অ্যাঁ! এ কী! এ যে একেবারে পূজারিণীর সাজ।

ছটফট করে রানু—চলো।

অমিত—কোথায়? কিসের এত ব্যস্ততা?

রানু—এখানে এই জঙ্গলেই কোথায় যেন একটা গুপ্তগঙ্গা আছে।

অমিত—গুপ্তগঙ্গা-টঙ্গা আছে কিনা জানি না।

রানু—পাঁড়েজির মা বললেন, আছে।

অমিত—ওরা তো যে কোনও নালা-টালাকে গুপ্তগঙ্গা বলে।

রানু—কোলিয়ারির বাবুদের বউরাও তো সেখানে যায় আর পূজো দিয়ে চলে আসে।

অমিত হেসে ওঠে—এইবার বুঝলাম। হ্যাঁ, এক জায়গায় একটা পিপুল গাছের শিকড় ধুয়ে দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে একটা নালা হয়েছে, সেই নালার জল একটা পাথরের গা বেয়ে ঝরে পড়ছে। বেলে পাঁকের রঙ বেশ লাল। তাই জলের রঙও লাল বলে মনে হয়। স্টোরবাবু কাব্যি করে এর নাম দিয়েছে, ঝরনা চন্দনা।

রানু—বেশ সুন্দর নাম।

অমিত—ওখানে কুলের ঝোপঝাড়ের মধ্যে যে সব খরগোস আসে সেগুলোও খুব সুন্দর। চোখগুলো যেন লাল টুকটুকে রুবি। আমি একবার গিয়েছিলাম। চারটে নধর সাদা খরগোস এসে নালার জল খাচ্ছিল। আমি ছেড়ে দিলাম এক নম্বরের ছর্‌রা, তাদেই ওই চারটে খরগোস ছিটকে গিয়ে জলের উপর পড়েছিল।

রানুর মুখে ওই এক কথা—চলো।

অমিত বলে—যেতে একটু অসুবিধে হবে। রাস্তাটা বেশ সরু। গাড়িটা হয়ত কোনওমতে....আচ্ছা চলো।

ঝরনা চন্দনা। স্টোরবাবু কাব্যি করে নামটা দিয়েছেন বটে, কিন্তু একটুও মিথ্যে নয়। চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে রানু, ঝরনা চন্দনা যেন একলা খুশির একটা স্রোত; লাল্‌চে পাথরের গা উপচে ঝরে ঝরে পড়ছে। স্রোতের জল গড়িয়ে এসে একটা দহের মধ্যে পড়েছে। দহের জল কিন্তু একেবারে কাকচক্ষু জল। বড়জোর একহাঁটু গভীর হবে, এই দহ, তলায় বালু আর কাঁকড় চোখে দেখা যায়। ওই তো দাঁড়িয়ে আছে পিপুল গাছটা, যার শিকড় পূজোর সিঁদুর মেখে রঙিন হয়ে রয়েছে। জানে রানু, মনে মনে তৈরি হয়েই আছে, পিপুলদেবের কাছে কী মানত করতে হবে। ছাড়া পেতে চাই, আর কিছু চাই না। পিপুলদেবের শিকড়-ধোওয়া ঝরনা চন্দনার জল মাথায় ছিটিয়ে চলে যায় রানু। তারপর দেখা যাবে, পিপুলদেব সত্যিই কিছু বলেন কিনা। যদি এখনই না বলেন, তবে স্বপ্নে যেন বলে দেন।

ঝরনা চন্দনার কাছে আজ কোনও খরগোস জল খেতে আসেনি; এসেছে রানু। আর অমিত চৌধুরীর হাতে সেই বন্দুকও নেই। তাই রানুর ছায়াটার কাছে আস্তে আস্তে আর ঘুরে-ফিরে বেড়াতে থাকে অমিত। একটু থামে, গায়ের কামিজ খুলে নিয়ে একটা ঝোপের মাথার উপর রাখে। তারপর আবার গায়ের গেঞ্জি ও সাদা জিনের প্যান্টও খুলে ফেলে। সাজ শুধু ছোট্ট একটি জাঙ্গিয়া।

ঝরনার দহের কাকচক্ষু জলের কাছে এসে দাঁড়ায় রানু। দুটি আঙুল ডুবিয়ে দিয়ে দু'চার ফোঁটা জল তুলে নিয়ে মাথায় ছিটিয়ে দেয় রানু। চুপ করে দাঁড়িয়ে ঝরনার জলের শব্দ শুনতে থাকে। কী মিষ্টি শব্দ, গুপ্তগঙ্গারই জলের স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে।

আনমনা রানু হঠাৎ চমকে ওঠে। কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অমিত। এত কাছে যে, অমিতের নিশ্বাসের বাতাসটুকু রানুর গায়ে এসে লাগছে।

অমিত বলে—দহের জল, বড় চমৎকার জল।

কথা বলে না রানু। কিন্তু অমিত বলে—জলে নামতে হবে রানু। তুমি ও আমি। তোমার শান্তিপুরী এখানে এই শুকনো বালুর উপরেই থাকুক।

রানুর চোখ জ্বলে ওঠে, দাঁতেও একটা শব্দ হয়। —না। তুমি সরো।

রানুর হাত ধরে অমিত। জোরে টান দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নেয় রানু—তুমি সরো।

রানুর হাত আবার ধরে অমিত। বুঝতে পারে রানু, এইবার হাত ছাড়াতে চেষ্টা করলে অমিতের হাতের মুঠোর চাপে গুঁড়ো হয়ে যাবে রানুর হাত। রানু বলে—হাত ছেড়ে দাও।

অমিত—আগে বলো, তবে ছাড়ব।

রানু—বলছি।

অমিত—কী?

রানু—তুমি যা বলছ, তাই হবে।

আশ্চর্য-মানুষের পছন্দের উৎসাহটা রানুকে দহের জলে চুবিয়ে খুন করছে, তবু লাল হয়ে যায় না দহের কাকচক্ষু জল। কিন্তু জল খাবার জন্য কূলের ঝোপের একটা খরগোস ছুটে এসেই থমকে দাঁড়ায়, ভয় পায় আর পালিয়ে যায়।

বারান্দার একদিকে একটা চেয়ারের উপর বসে, আর যে গল্পের বইটাকে শুধু পঁচিশ বার পড়া হয়েছে, সেটাকেই হাতে ধরে নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে রানু। খুব নীল আকাশ, কিন্তু হাজার হাজার পঙ্গপালের ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে। কিন্তু আনমনা রানুর চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছে কিনা সন্দেহ, আকাশটা কত নীল আর কত পঙ্গপাল উড়ছে।

অমিত এসে বারান্দার আর এক দিকে একটা ক্যাম্প-চেয়ারে বসে, আর পা দুটোকে বারান্দার কাঠের রেলিঙের মাথার উপর তুলে দেয়।

কিন্তু ক্যাম্প-চেয়ারের পায়া মেঝের সঙ্গে খুব জোরে একটা ঘষা খেয়ে যে বিশ্রী শব্দটা করেছে, তাও কী শুনতে পায়নি রানু? খুব শুনতে পেয়েছে। ভয়ানক বিশ্রী একটা বুনো শব্দ। শুনলে ঘেন্না হয়। মুখ ফেরায় না, অমিতের দিকে একবার তাকায়ও না। কথা বলতে তো ইচ্ছেই হয় না, কথা বলবার কোনও দরকারও নেই। তা ছাড়া,

এখন তো কোনও কথা বলা উচিতও নয়। রানু জানে, আজ খুব বেশি ওষুধ খেয়েছে জঙ্গলের ওই অমিত চৌধুরী।

অদ্ভুত এক-একটা রাগের গর্বের ও ঘৃণার ভাষা যেন অমিত চৌধুরীর নেশায় ভরা নিঃশ্বাসের বাতাসের সঙ্গে উথলে উঠছে। ছেঁড়া ছেঁড়া প্রলাপের ভাষা বলে মনে হয়। তবু উৎকর্ণ হয়ে শুনতে ও বুঝতে চেষ্টা করে রানু।

অমিত বলে—দপ্তরি রঘুনাথ নাকি বড়ই ভালমানুষ। স্টোর কম্পাস, আর আরও অনেকে এই কথা বলে। কিন্তু ব্যাটা রঘুনাথ তো মানুষই নয়। গায়ের রক্ত-মাংসের কোনও জোর নেই, তবু বিয়ে করেছে। ননসেন্স। যুবতী বউটাও যে কী সুখে ওরকম একটা কাপুরুষের ঘরে পড়ে আছে বুঝি না...হুঁ, রঘুনাথ লোকটা নাকি হৃদয়বান মানুষ। ওরে ইডিয়েট, হৃদয় তো স্পঞ্জের মত একটা তুলতুলে বস্তু মাত্র। ওটা থাকলেই বা কী, না থাকলেই বা কী? পুরুষমানুষ হবে পুরুষমানুষ; অমিত চৌধুরীর মতো পুরুষমানুষ এই বিশ্বজগতে ক'টা আছে?

অমিত হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে রানুর মুখের দিকে তাকায়, আর গলার স্বর বেশ চড়িয়ে দিয়ে কথা বলে—খুব দুঃখের কথা রানু, তুমি বেশ অনেকদিন ধরে বড় বেশি অভিমান দেখাচ্ছ, যেন সত্যি তুমি আমার বিশুদ্ধ একটি স্ত্রী। তোমার ভাব দেখে আরও মনে হচ্ছে, যেন তুমিই আমাকে রেখেছ, আমি তোমাকে রাখিনি। তোমার আপত্তির সঙ্গে রোজই আমাকে একটা যুদ্ধ করতে হবে, এটা ভাল নয়, একটুও ভাল নয়।

সিগারেট ধরায় অমিত—সবাই অবিশ্যি জানে যে, আমার বিয়ে হয়েছে, স্ত্রী হয়েছে। আমি নিজেই সবাইকে তাই বলেছি। কিন্তু তাতেই কী তুমি আমার স্ত্রী হয়ে গেলে?

মুখ ফিরিয়ে কথা বলে রানু—সবার কাছে একথা বললে কেন?

অমিত—বলেছি আমার নিজের প্রেস্টিজের জন্য আর তোমার একটা সুবিধের জন্য।

রানু—তার মানে?

অমিত—আমার প্রেস্টিজ মানে আমার প্রেস্টিজ। আর, তোমার সুবিধে মানে, চাকর-বাকরগুলো তোমাকে নিতান্ত একটা মেয়েমানুষ বলে মনে করবে না, তুচ্ছও করবে না।

যেন একটা হঠাৎ রাগের ঝোঁকে ছটফট করে ওঠে অমিত, আর হাতের সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরোটাকে মেঝের উপর আছড়ে দেয়। তারপরই হঠাৎ আবার একটু নিঝুম হয়ে গিয়ে বিড়বিড় করে—। আমার প্রেস্টিজের মানে তুমি কী বুঝবে। বরেন উকিল হাসবে, আরও হরেন নরেন অনেকেই হাসবে, কোলিয়ারির স্টাফ আর চাকর-বাকরগুলো মুখ টিপে হাসবে, তা না হলে...।

চেঁচিয়ে ওঠে রানু—তা না হলে কী? স্পষ্ট করে বলো।

অমিত—তা না হলে এখনই তোমাকে বলে দিতাম, চলে যেতে পারো।

রানু—চলে যেতেই চাই!

অমিত—না, যেতে দেওয়া হবে না। এখানেই থাকতে হবে।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় অমিত। রানুর কাছে এগিয়ে এসে, আর এক হাতের থাবা দিয়ে রানুর কাঁধটাকে আঁকড়ে ধরে। —যদি সত্যিই চলে যাও, তবে যাবার আগে বলবে, কোন চুলোয় যেতে চাও। আমি নিজে তোমাকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে চলে আসব। আর তুমিও মাসখানের পরে একটা টেলিগ্রামে আমাকে জানিয়ে দেবে যে, তুমি কলেরায় মরে গিয়েছ। লোকে যেন বলতে না পরে, রিঠুয়া কোলিয়ারির মালিক অমিত চৌধুরীর স্ত্রী ভেগেছে।

রানুর কাঁধের উপর থেকে হাতের থাবা সরিয়ে নিয়ে অমিত নিজেও সরে যায়। তবু বিড়বিড় করতেই থাকে। —তুমি না বলে কয়ে চলে গেলে যে নিন্দে রটবে, সে নিন্দে তোমার ধরাছোঁয়া পাবে না, শুধু আমাকেই পাবে। লোকে শুধু আমাকেই দেখতে পাবে আর মুখ টিপে হাসবে। এটা শুধু আমারই প্রেস্টিজের ভয়, তোমার কোনও কিছুরই ভয় নয়।

আবার ক্যাম্প-চেয়ারে বসতে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে ফটকের দিকে তাকায় অমিত। কাঠবোঝাই একটা মোটর লরি হোঁচট খেয়ে খেয়ে চলতে ঠিক ফটকের কাছে এসেই থেমে গিয়েছে। চেঁচিয়ে ওঠে আর এগিয়ে যায় অমিত—এত আপত্তি করেছি, তবু তুমি এপথে গাড়ি নিয়ে এলে কেন, এই ড্রাইভার?

ড্রাইভার বলে—পারমিট আছে।

অমিত —পারমিট থাকলেই বা কী? তোমার গাড়ি যে হুমড়ি খেয়ে পড়বে আর মরবে, সেই সঙ্গে তুমিও।

ড্রাইভার—কপালে যদি তাই থাকে তো হবে।

ফিরে এসে আবার বারান্দার ক্যাম্প-চেয়ারে বসে পড়ে অমিত। রাগী আপত্তিটা তবু গজগজ করতে থাকে। —কোথা থেকে এক ব্যাটা নতুন ঠিকেদার এসেছে, মনোহরলাল। জঙ্গলের চারটে বড় বড় কূপ নিলামে ডেকে নিয়েছে। রেঞ্জারের ন্যাওটা ঠিকেদার। যেমন ঠিকেদার নিজে, তেমনই ওর ওই ড্রাইভারটা, দুটোই ত্যাঁদোড়।

বারান্দায় কাঠের রেলিঙের উপর আবার পা তুলে দেয় অমিত। —জানে আমি আপত্তি করেছি, তবু ইচ্ছে করেই আমার বাড়ির ফটকের কাছে গাড়ি থামিয়েছে। এ শুধু আমাকে একটা ঠাট্টা করবার জন্য। বহুত আচ্ছা, আমিও একদিন দেখে নেব।

অমিতই জানে, কী সে দেখে নেবে একদিন। কিন্তু এখন শুধু দেখতে থাকে, নচ্ছার কাঠবোঝাই লরিটা দাঁড়িয়েই আছে। নড়েও না, চলেও যায় না। ড্রাইভারটার রস খুব বেশি বলে মনে হচ্ছে। মুখ বাড়িয়ে এই বারান্দার দিকে, রানুরই দিকে তাকিয়ে আছে।

রানুর হাত থেকে বইটা ঝুপ্ করে মেঝের উপর পড়ে যায়। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় রানু। বারান্দার রেলিঙের কাছে এগিয়ে যায়। কী যেন কী দেখে, রানুর দুই চোখ এই দিনের বেলাতেই চাঁদের আলোতে ভরে গিয়ে হেসে উঠেছে। কাঁপছে হাত, কাঁপছে মাথা, কিন্তু অপলক চোখের আলোক একটুও কাঁপে না।

অমিত—তোমার আবার কী হল? তুমি কী জীবনে একটা মোটর লরিও কখনও দেখনি?

চলে গেল মোটর লরি, আর রানুও ভিতরে গিয়ে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে। ঘুম আসে না, কিন্তু না এলেই বা কী আসে যায়। রানুর প্রাণের ভিতরে একটা স্বপ্ন ঢুকে কথা বলছে, কত অদ্ভুত কথা। পিপুলদেবের কাছে মানত করা হয়নি, কিন্তু পিপুলদেব যে রানুর মনের ও প্রাণের কথাটা শুনে ফেলেছে। ছাড়া পেতে চাই। হ্যাঁ পাবে। হাত ধরে নিয়ে যাবার মানুষ এসে গিয়েছে। সেই ময়না পাখিটা তো একটা পাখি ছিল না। মানিকের আত্মাটাই রানুকে খুঁজে খুঁজে উড়ছে আর হায় হায় করে কেঁদেছে। না, আর কাঁদতে হবে না। রানু খুন হয়ে গেলেও মরেনি, রানু আজও আছে।

হেসে ফেলে রানু, কিন্তু চোখদুটো জলে ভরে যায়। কী যেন সেদিন বলেছিল মানিক, হ্যাঁ আমার কোনও গুণ থাকুক বা না থাকুক, হার্টও কি নেই রানু। আছে আছে, খুব আছে। মানিকের চেয়ে বড়লোক আর কে আছে? নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বার ঘর পেতে হলে তোমারই ঘরে যেতে হবে। হার্ট ধোওয়া জল খেয়েই তো মানুষ বাঁচে, অন্য কোনও জল খেয়ে নয়।

মানিক একটু রোগা হয়ে গিয়েছে বলে মনে হল। কিন্তু সেই চোখ আর সেই মুখ। এখনই জানতে ইচ্ছে করে, একটা স্বপ্ন দিয়ে পিপুলদেব বলে দিন না কেন, এতদিন কোথায় ছিল মানিক। কী করে এতগুলি বছরকে সহ্য করতে পেরেছে, আর কেমন করে এই জঙ্গলের ভিতরে একটা কাঁচাখেগো বুনো ঘরে, শুধু মাংসের হরিণ হয়ে পড়ে-থাকা রানুকে খুঁজে বের করেছে। হ্যাঁ, মানিক নিশ্চয় ভুলেও কখনও জিজ্ঞাসা করবে না, কিন্তু রানু নিজেই বলবে, জীবনে কোনও পাপই করেনি রানু, শুধু একটি পাপই করেছিল, তোমাকে দুঃখ দিয়েছিল।

উঠে বসে রানু। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সন্ধ্যা হয়েছে। আকাশে তারা উঠেছে। আর, ফুরফুরে বাতাসও বইছে। ভাবতে ভাল লাগে, এ বুঝি মানিকেরই নিঃশ্বাসের বাতাস।

মানিকের কাছে আর ক্ষমা চাইতে হবে না। ক্ষমা চাইলে রাগ করে হেসেই ফেলবে মানিক। কিন্তু ঝরনা চন্দনা, তুমি যে সত্যিই গুপ্তগঙ্গা, তুমি ক্ষমা করো। আমি ইচ্ছে করে তোমার জল ঘোলা করিনি। একটা রাক্ষুসে অভিশাপ জোর করে আমাকে তোমার জলে নামিয়ে দিয়েছিল।

আবার কবে আসবে মানিক? কাল আসবে কি? আসুক না, যখন ইচ্ছে তখনই আসুক। সকাল দুপুর বিকেল সন্ধ্যা আর রাত, একবার এসে পড়লেই হল।

বুঝতে পারেনি রানু, কখন এই ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে অমিত। একটা বাতিকেও হাতে করে নিয়ে এসেছে। ওষুধের একটি বোতলও নিয়ে এসেছে।

বাতি আর বোতল, দুটি বস্তুকেই মেঝের উপর রেখে দিয়ে চেয়ারের উপর শক্ত হয়ে বসে অমিত। ডাক দেয়—কাছে এসো।

রানু—না।

অমিত—যদি জোর করে টেনে নিয়ে এসে কাছে বসাই?

রানু—চিৎকার করব।

অমিত—যদি গলা টিপে ধরি?

রানু—তার আগে তোমার হাত কামড়ে ছিঁড়ে দেব।

অমিত—পারবে?

রানু—না পারি দম বন্ধ হয়ে মরে যাব।

অমিত—তবু কাছে আসবে না?

রানু—না।

বাতিটার আলো বাড়িয়ে দিয়ে ব্র্যাণ্ডির বোতল তোলে অমিত। এক দুই তিন, তিনবার তিন ঢোঁক ব্র্যাণ্ডি গিলে নিয়ে ঢেঁকুর তোলে। দশ মিনিট বিরাম। তারপর আবার।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আকাশের তারা দেখতে থাকে রানু, আর অমিত চৌধুরী যেন সন্ধ্যারাতের ফুরিয়ে যাওয়া এক-একটি মুহূর্তকে গুনতে থাকে। কিন্তু আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারে অমিত চৌধুরী? অমিত ডাকে—কাছে এসো।

রানু—না।

অমিত—আসতেই হবে।

রানু—কখ্‌খনও না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় অমিত—তা হলে আমাকেই যেতে হবে।

ঘুরে দাঁড়ায় রানু—তা হলে আমাকেও সরে যেতে হবে।

অমিত—আমি তোমার মাথাটাকে দেয়ালের সঙ্গে চেপে দিয়ে ধরে রাখব।

রানু—পারবে না।

অমিত—কেন পারব না?

রানু—তার আগে আমি এই রাতের অন্ধকারের মধ্যে ছুটে গিয়ে রাস্তা ধরব আর চলে যাব।

অমিত—কোথায় পালিয়ে যাবে?

রানু—যেখানে ইচ্ছে সেখানে।

অমিত—বাঘের মুখে?

রানু—বাঘ তো ভাল জন্তু।

অমিত—তার মানে, আমার চেয়ে ভাল জন্তু?

রানু—সেটা তুমি বুঝে দেখো।

চেয়ারে বসে অমিত। ব্র্যাণ্ডির বোতল হাতে তুলে নেয়। আবার, এক দুই তিন। আবার ঘরের ভিতরে দুটি ঘন্টার একটি নিরেট স্তব্ধতা। মাঝরাতের শিয়াল যেন ডেকে ওঠে, তখন আবার বোতল হাতে নেয় অমিত। আর, রানুর সেই তারা-দেখা স্তব্ধ মূর্তির দিকে তাকিয়ে ডাক দেয়—কাছে এসো।

রানু—না।

অমিতের হাত কাঁপে, হাতের বোতলও কাঁপে, সেই সঙ্গে দু'চোখের দৃষ্টিতে কাঁপতে থাকে দুঃসহ একটা আক্রোশ। হঠাৎ মত্ত হয়ে একেবারে জানালার কাছে গিয়ে রানুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু সরে যায় রানু, অমিতের মূর্তিটা দেয়ালের সঙ্গে একটা ধাক্কা খেয়ে, আবার শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। তারপর, আবার এসে চেয়ারের উপর বসে।

শিয়ালডাকা মাঝরাতও ফুরিয়ে যাচ্ছে। ঘরজোড়া একটা স্তব্ধতার দু'দিকে শুধু দুটি রাতজাগা মূর্তি, একজন জানালার কাছে, আর একজন চেয়ারে।

ব্র্যাণ্ডির বোতল তুলে নিয়ে মুখের উপর উপুড় করে দেয় অমিত। শেষ ঢোঁক গিলে নিয়ে বাতিটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর আবার রানুর দিকে। ডাক দেয় অমিত—রাত প্রায় ফুরিয়ে এল। এখনও বলছি, কাছে এসো।

রানু—না।

অমিত— তবে তো তোমাকে এখুনি ফুরিয়ে দিতে হয়।

রানু—শক্তি থাকে তো, ফুরিয়ে দাও।

অমিত—ভুলে যাচ্ছ কেন যে, পাশের ঘরেই আমার দোনলা ম্যানটন ব্র্যাকেটে ঝুলছে?

রানু—হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছি।

অমিত—তবে নিয়েই আসি।

রানু—নিয়ে এসো।

অমিত—আনছি, এখনই আনছি। একটি গুলিতে বেইমান মেয়েমানুষের এই বড়াই রক্তে ভাসিয়ে দেব। অমিত চৌধুরীর বুকটা ফুলে ফুলে গুমরে উঠতে থাকে। নিঃশ্বাসও ঘড়ঘড় করে।

কিন্তু কাক ডেকে উঠেছে। বাতিটার উপর একটা লাথি ছুঁড়ে দিয়েই ঘর ছেড়ে চলে যায় অমিত।

শেষরাতের সব তারা নিভে গিয়েছে। রানুও ঘর ছেড়ে বাইরের বারান্দাতে এসে দাঁড়ায়। এখন রানুর জীবনের আর তো কোনও কাজ-অকাজ কিছুই নেই। এখন রানুর প্রতীক্ষার চোখ দুটো শুধু ফটকের দিকে তাকিয়ে থাকবে। কখন আসবে সেই

লক্কর মোটর লরি? রানুর প্রতীক্ষার চোখ দুটো যেন নীরব হয়ে বসে-থাকা একটা ধ্যানেরও চোখ।

বুঝতে পারেনি রানু, কখন এত রোদ আর আলো ফুটে উঠে জঙ্গলের সকালবেলাকে এত ঝলমলিয়ে দিয়েছে।

আর শুনতেও পায়নি, এই সকালে এরই মধ্যে এত কলরব আর এত সাড়াই বা কখন জেগে উঠেছে। ওঁরাও গাঁয়ের একদল লোক এসে ফটকের কাছে বসেছে আর হাসাহাসি করে গল্প করছে। ওরা বোধহয় একটা হাঁকোয়া দল। কোথাও বোধ হয় মাচান বাঁধা হয়েছে। শিকারে যাবে শিকারি। রাস্তার ওপারে, ফটকেরই কাছে, গাছের তলায় এসে ভিড় করেছে যারা, তাদেরও চিনতে পারে রানু।

এই তো সেদিন, দু'দিন আগে পাঁড়েজির মা এসে রানুকে একটা খুশির খবর শুনিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। আর মাত্র দুটি দিন বাকি, —বহুজি তোমাদের পাঁড়েজির মেয়ে বাপের বাড়িতে আসবে। আহা মা-মরা মেয়ে, সেই যে চার বছর আগে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল, তারপর আর কোনওদিন বাপের বাড়িতে আসেনি।

নাতনিকে কোলে তুলে নেবার জন্য পাঁড়েজির মা সেই সকালেই গাছতলায় এসে দাঁড়িয়েছে। শুধু কি একা পাঁড়েজির মা? তিন নম্বরের বউ আছে। জমাদারের বউও আছে, যার হাতে একটা ঢোলক, আর কানে ঝুমকো দুলছে। বাচ্চা ছেলেমেয়ের দল আছে।

দুটি সাইকেল এসে ফটকের কাছে থামে। কোলিয়ারির দুই ভদ্রলোক এসেছেন। খাতাপত্র হাতে নিয়ে স্টোরবাবু আর কম্পাসবাবু। চেঁচিয়ে হেসে কথা বলছেন কম্পাসবাবু—স্টোরদা, আজ বোধহয়, একটা খুব ভাল লগনসার দিন।

কী আশ্চর্য, দু'বছর আগে একবার এসেছিলেন যে ফরেস্ট রেঞ্জার, যাঁর নাম বিনয় সান্যাল, তিনিও সাইকেল থেকে নামলেন। আর স্টোরবাবুকে দেখতে পেয়েই বলে উঠলেন—অমিতবাবু বলেছেন, এ রাস্তায় মোটরগাড়ি চলতে পারে না। আমি তো দেখছি, বেশ চলতে পারে। এখান-ওখানে একটু বেশি সরু, গাছের গা ঘেঁষে যেতে হবে, এই যা। বুঝি না, অমিতবাবুর কেন এত আপত্তি।

কোলিয়ারির বাবুরা এলে যে-রানু ঘরের ভিতরেই থাকে, সে-রানু আজ কত স্বচ্ছন্দ হয়ে বাইরের এতগুলি দৃষ্টির কাছে নিজেকে প্রকাশ করে দিয়েছে। রানু আজ যেন কোনও চক্ষুলজ্জারও ধার ধারে না।

ভদ্রলোকেরা কিন্তু বেশ একটু সঙ্কোচ বোধ করছেন। রানু বারান্দাতে বসে আছে বলেই এখানে আসতে চাইছেন না। কিন্তু ওঁরা জানেন না, যার কাছে ওঁদের কাজ আছে সে এখনও ঘরের ভিতরে খাটের উপরে একটা পিণ্ড হয়ে পড়ে আছে।

ফটকের সামনে এসে দাঁড়ায় সেই লক্কর মোটর লরি। আর সেই মুহূর্তে রানুর সেই ধ্যানের চোখে একটা বিদ্যুতের ঝিলিক হেসে ওঠে।

শুধু একবার ঘরের ভিতরে যায় আর চলে আসে রানু। তিনটি মিনিটও সময় লাগে না। ফটকের কাছে ভিড়-করা সব মানুষের চোখ আশ্চর্য হয়ে চমকে ওঠে। হাতে একটা ছোট তোরঙ্গ, গায়ে একটা ছেঁড়া-ছেঁড়া ধনেখালি, কে ইনি?

ফটকের কাছে এসে মোটর লরির মানুষটির দিকে তাকিয়ে হাসতে গিয়েই ডুকরে ওঠে রানু—কেমন আছ?

মানিক বলে—ভাল।

রানু—আমি যাব।

মানিক—চলো।

রানু—এখনই যাব।

মানিক—এখনই চলো।

ঘরের ভিতরে খাটের উপরে পিণ্ড হয়ে পড়ে ছিল যে, সে হঠাৎ জেগে ওঠে আর দোনলা ম্যানটন হাতে নিয়ে, দুর্দান্ত এক আক্রোশে বাঘের মত লাফিয়ে লাফিয়ে ফটকের দিকে ছুটে আসে।

স্টোরবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন—একী। কী হল? কী ব্যাপার?

সবাই চেঁচিয়ে ওঠে, সবাই ভয় পায়। কিন্তু রুষ্ট মত্ত আর দুর্দান্ত অমিত চৌধুরীর দোনলা ম্যানটনের সর্বনেশে আঘাত থেকে মেয়েটাকে রক্ষা করতেও তো হবে। স্টোরবাবু, কম্পাসবাবু আর ফরেস্ট রেঞ্জার বিনয়বাবু, সেই সঙ্গে পাঁড়েজিও ব্যস্ত হয়ে রানুর চারদিকে দাঁড়িয়ে রানুকে ঘিরে রাখে। আর একটা ওঁরাও হাঁকোয়া একলাফে উঠে এসে অমিতের হাতের বন্দুক চেপে ধরে।

স্টোরবাবু হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে আর গলা চেপে চেপে কথা বলেন—আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

রানু হেসে হেসে আর গলা খুলে কথা বলে—ওর কাছে যাচ্ছি।

চমকে ওঠেন কম্পাসবাবু—তার মানে? মোটর লরির ওই লোকটির কাছে?

রানু—হ্যাঁ।

আবার চমকে ওঠেন কম্পাসবাবু—তবে আমাদের স্যার আপনার কে হন?

রানু—কেউ না, কিচ্ছু না। এবার আমাকে যেতে দিন।

রানুকে পথ ছেড়ে দিয়ে সবাই একদিকে সরে যায়। সেই মুহূর্তে ওঁরাও হাঁকোয়াকে একটা ধাক্কা দিয়ে বন্দুকটা ছাড়িয়ে নিয়ে, পেট ভরে মহুয়া খাওয়া মাতাল ভালুকের মত টলতে টলতে রানুর কাছে এসে দাঁড়ায় অমিত—খবরদার!

গাড়ি থেকে নামে মানিক, আর এগিয়ে এসে অমিতেরই চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। —বন্দুক ফেলে দিন। আর, ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকুন।

রানুর হাত ধরে মানিক বলে—চলো। রানুও সেই মুহূর্তে মানিকের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে এগিয়ে যায়, মোটর লরিতে উঠে মানিকেরই পাশে বসে পড়ে।

মোটর লরির ইঞ্জিন শব্দ করে বেজে ওঠে। একটুও হোঁচট খায় না লরি। হেলে-দুলে চলতে থাকে, তারপর একেবারে ছুটে চলে যায়।

স্টোরবাবু, কম্পাসবাবু, রেঞ্জার বিনয়বাবু আর পাঁড়েজি আবার চেঁচিয়ে ওঠেন—এ কী? এ কী? কী হল?

অমিত চৌধুরীর হাতের বন্দুক ধুপ্ করে মাটির উপর পড়ে গিয়েছে। আর অমিত চৌধুরী নিজেও মুখ থুবড়ে রাস্তার কাঁকড়ের উপর পড়ে গিয়েছে। হুঁস নেই, বোধশক্তিও নেই, অমিত চৌধুরী যেন একটা অসাড় শরীরের পিণ্ড।

ওঠাও। তুলে ধরো। টেনে তোলো। কত রকমেরই না কথার চিৎকার বাজতে থাকে। পাঁড়েজি চেঁচিয়ে ওঠে—এই হাঁকোয়া, তুমলোগভি আও, হাত লাগাও, উঠাও।

স্টোরবাবু বলেন—আপনি একটু শক্ত করে পা দুটো ধরুন, কম্পাসবাবু।

রেঞ্জার বিনয়বাবু বলেন—আমি পিঠটাকে টেনে তুলছি মশাই, আপনি ঘাড়টাকে একটু শক্ত করে টেনে তুলুন। স্টোরবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন—মাথাটা যে ঝুলে পড়েছে, দেখতে পাচ্ছেন না?

খুব বেশি দেরি হল না। অমিত চৌধুরীকে তুলে ধরাই হল। কিন্তু বিনয়বাবুর হাতে যেন কোনও জোর নেই, ঠিকমত শক্ত করে ঘাড়টাকে ধরতে পারলেন না। অমিত চৌধুরীর মাথাটা ঝুলে রইল। মুখেও নিশ্চয় বেশ শক্ত একটা চোট লেগেছে, অমিত চৌধুরীর দু'ঠোঁটের ফাঁকের ভিতর দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে।

স্টোরবাবু এইবার ধমক দিয়ে ওঠেন—আঃ, একটা মরা বাঘ পেয়েছেন নাকি কম্পাসবাবু? পা দুটোকে অমন করে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন কেন? আর একটু তুলে ধরুন।

অমিত চৌধুরীকে তুলে নিয়ে ঘরের ভিতরে খাটের উপর শুইয়ে দেওয়া হল। কী আশ্চর্য, এত বলিষ্ঠ একটা পুরুষ, খবরদার বলে একটা হাঁক দিয়েও শুধু দাঁড়িয়ে রইল, শুধু তাকিয়ে দেখল আর ভয় পেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আর খবরদার! কপালের ঘাম মুছে স্টোরবাবু হাঁপাতে থাকেন—এইবার শুধু রামগড়ে একটা লোক পাঠিয়ে ডাক্তার লাহিড়ীকে একটা খবর দিতে হয়।

কম্পাসবাবু বলেন—আমি থাকি, আপনি যান।

স্টোরবাবু বলেন—আপনি যান, আমি থাকি।

বিনয়বাবু বলেন—আমিই যাচ্ছি।

কোলিয়ারির দুই বাবু থেকে গেলেন। অমিত চৌধুরীর মাথায় জল ঢেলে ঢেলে আর পাখার বাতাস দিয়ে দু'জনেই যখন বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েন, যখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল এসে পড়ে, তখন চোখ মেলে তাকায় অমিত চৌধুরী। রিঠুয়া কোলিয়ারির দুই বাবু তখনই ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ান।

বারান্দাতে দুই চেয়ারে বসে দু'জনেই ঢুলে ঢুলে যখন আরো ক্লান্ত হন, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়-হয়। আর ডাক্তার লাহিড়ীর গাড়িও এসে ফটকের কাছে থামে।

ডাক্তার লাহিড়ী এসে মুখ টিপে হাসেন—কী খবর?

কম্পাসবাবু চোখ টিপে হাসেন—ভাল খবর।

তারপর এখানে আর কী খবর আশা করতে পারে এঁরা, এই তিন ভদ্রলোক। না, এখানে নয়। এখানে আর কোন খবর থাকতে পারে না।

স্টোরবাবু বলেন—চলুন এবার।

কম্পাসবাবু বলেন—কিন্তু সবাইকে তো ডাক্তার লাহিড়ীর বাড়িতে যেতে হয়। ঘোর সন্ধ্যার জঙ্গলে সাইকেল চলবে না।

স্টোরবাবু—চালাবার মত বুকের পাটাও আমার নেই।

কিন্তু এসব কথা তো কোনও খবরের কথা নয়। সেই রাত্রিতেই রিঠুয়া কোলিয়ারিতে এসে পৌঁছবার পর একটা খবর পাওয়া গেল। একটা খবরের মত খবর। ঠিকাদার মনোহরলালের ড্রাইভার মানিক রায় মোটর লরিটাকে রামগড় স্টেশনের কাছে রেখে দিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছে।

ডাক্তার লাহিড়ী হাসেন—এরপর কি আরও কোনও খবর আশা করেন স্টোরবাবু?

স্টোরবাবু হেসে হেসে মাথা নাড়েন—না।

চিত্র গন্ধর্ব

কলকাতার থিয়েটার রোডের ওই যে বাড়ির গেটের মুখোমুখি হয়ে ফুটপাথের কিনারায় দুটো ছোট ছোট গুলমোর দাঁড়িয়ে আছে, সে বাড়িতে পাশাপাশি দুটি দুই-কামরা ফ্ল্যাট। একটি ফ্ল্যাটে থাকেন নাগপুরের ডাক্তার গুপ্তের স্ত্রী সৌদামিনী। ডাক্তার গুপ্ত এখন আর বেঁচে নেই। প্রায় সত্তর বছর বয়স, আর বয়সের চেয়ে রোগের কারণেই বেশি স্থবিরা এই সৌদামিনীর একমাত্র ছেলে বিনায়ক গুপ্ত এই কলকাতারই একটি কেমিক্যাল কারখানার ইঞ্জিনিয়ার ছিল। কিন্তু বিনায়ক এখন তার স্ত্রী ও একটি ছেলেকে নিয়ে জার্মানির হামবুর্গে আছে। কারখানারই ইচ্ছায় ও অনুমতিতে. এক বছরের জন্য জার্মানিতে থেকে ওই কাজের আরও বড় কিছু ও নতুন কিছু শেখবার জন্য সেই যে চলে গিয়েছে বিনায়ক, তারপর পুরো তিনটি বছর পার হয়ে গেলেও ফিরে আর আসেনি। বুড়ি সৌদামিনী ছেলের আসার আশায় দিন গুনছেন। কিন্তু বিনায়কের চিঠি বার বার পড়েও ঠিক বুঝতে পারেন না, কবে ফিরে আসবে তাঁর ছেলে বিনায়ক। শুধু একটা অপেক্ষায় অলস হয়ে পড়ে-থাকা সৌদামিনীর এই জীবনের দেখা-শোনার কাজটুকু করে দেয় তাঁরই নাগপুরের পুরনো আয়া।

সৌদামিনীর ফ্ল্যাটের একটি ঘর সত্যিই একটি ছবিঘর। শুধু ফটো আর ফটো, চার দেয়াল ফটোতে প্রায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে। সবই ছেলে বিনায়কের ফটো। একমাস বয়সের বিনায়ক, প্রথম স্কুলে যাচ্ছে বিনায়ক, বল খেলছে কিশোর বিনায়ক, গণপতি উৎসবের দিনে ঘোড়ায় চড়ে আর পতাকা হাতে নিয়ে মিছিলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে

ষোল বছর বয়সের বিনায়ক, কত ফটো না আছে। বিদেশে যাবার এরোপ্লেনের অপেক্ষায় দমদমের এয়ারপোর্টে এসেছে ছেলে, ছেলের বউ আর নাতি, সেই ফটোও আছে।

পাশের ফ্ল্যাটে যিনি থাকেন, তিনিও বলতে গেলে নাগপুরের মেয়ে। ডাক্তার গুপ্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু ডাক্তার রাধামাধব নাগের মেয়ে পূরবী নাগ। ডাক্তার নাগও আজ আর বেঁচে নেই। মারা যাবার আগে বন্ধু-পত্নী সৌদামিনীকে অনুরোধ জানিয়ে রেখেছিলেন ডাক্তার নাগ, যেন তিনি পূরবীকে অন্তত তাঁর চোখের কাছে রাখতে চেষ্টা করেন। সেই কবে, প্রায় পাঁচ বছর আগে ডাক্তার নাগের মৃত্যুর খবর পেয়ে পূরবীকে চিঠি দিয়েছিলেন সৌদামিনী, চলে এসো, আমার চোখের কাছে থাকবে, আমার ফ্ল্যাটের পাশে একটি ফ্ল্যাট খালি আছে। বাংলাদেশের এই কলকাতা তো তোমারই দেশের শহর। তাছাড়া, তোমাকে তোমার দশ বছর বয়স থেকে যারা চেনে ও জানে, সেই আমি এখানে আছি, সেই আয়া জগমায়াও এখানে আছে। এখানে থাকতে তোমার কোনও অসুবিধে হবে না পূরবী।

সৌদামিনীর সেই চিঠি পেয়ে পূরবী সেদিনই নাগপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেনি। অনেক টাকা রেখে গিয়েছেন ডাক্তার নাগ, পূরবীর জীবনে অন্নচিন্তা বলে কোনও সমস্যা নেই, থাকতেও পারে না। পূরবী যদি তার কোনও শখের জন্য এক লক্ষ টাকাও খরচ করে ফেলে, তবুও তাতে পূরবীর জীবনের কোনও সুখ অন্তত দেনার দায়ে কিংবা অভাবে পড়বে না।

সৌদামিনীর চিঠির জবাব দিয়েছিল পূরবী: আমি এখানে মাসিমার বাড়িতে আছি। আমি এখন ইন্দুমতী কলেজের লেকচারার। আমার পড়াবার সাবজেক্ট হিস্ট্রি অব আর্ট। আমার এই মাসিমাকে আপনি বোধহয় চেনেন। আমার মায়ের খুড়তুতো বোন। তাঁর স্বামী, আমার মেসোমশাই এম.এন. রায় হলেন সিটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। কাজেই আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। শুনে সুখী হবেন, সারস্বত সোসাইটি আমাকে একটি সোনার মেডেল দিয়েছে। দক্ষিণ ভারতের প্রত্ন সম্বন্ধে আমার যে লেখা ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকুয়িটি কাগজে বের হয়েছিল, সেই লেখা সোসাইটির খুবই ভাল লেগেছে।

পূরবীর চিঠি পড়ে খুশি হয়েছেন সৌদামিনী। তবু আরও অনেকবার একই ইচ্ছার কথা জানিয়ে পূরবীকে অনুরোধ করেছেন : কলকাতার মেয়ে কলেজেও তো তোমার কাজ হতে পারে। চলে এসো পূরবী। কতদিন তোমাকে দেখিনি, দেখতে বড় ইচ্ছা করে।

এরকম অনুরোধের চিঠি অন্তত এই পাঁচ বছরে দশবার লিখেছেন সৌদামিনী। পূরবীও জবাব দিয়েছে : আমি খুবই দুঃখিত। কলকাতায় যাবার কোনও সুযোগই পাচ্ছি না। চালুক্য গুহা-মন্দিরের স্টাইল নিয়ে এখন রিসার্চ করছি। এটা ঠিক হিস্ট্রির বিষয় নয়। এটা হল স্টাডি অব আর্ট। খুবই খাটতে হচ্ছে। অনেক জায়গায় যেতেও

হচ্ছে। মেসোমশাই খুব সাহায্য করছেন। গত মাসে নাগার্জুন কোণ্ডা ঘুরে এসেছি। আর দু'মাস পরে, শীত পড়লে, পুরনো বিজয়নগরের কয়েকটা ভাঙা মন্দিরের অবশেষ দেখতে যেতে হবে। তার পর হয়ত আরও দক্ষিণে, আরও কয়েকটা জায়গায় যেতে হবে। আপনি ভাল আছেন জেনে সুখী হলাম।

সৌদামিনীর আহ্বান আর আমন্ত্রণের আরও কত মিষ্টি চিঠি, মাঝে মাঝে বেশ করুণ চিঠিও নাগপুরের পূরবীর কাছে গিয়েছে। সৌদামিনী যেন স্নেহে বিহ্বল হয়ে লিখেছেন....কী আনন্দের কথা, সেই ছোট্ট দুষ্টু মেয়েটি আজ বড় একজন স্কলার হয়েছে। যে মেয়ে একদিন আমার বাগানের সব ফুল ছিঁড়ে নিয়ে পালিয়ে যেত, মানা করলেও শুনত না, সে মেয়ে আজ কেমন করে আর কত গম্ভীর হয়ে বড়-বড় বই পড়ছে, আমার যে খুবই দেখতে ইচ্ছে করে।

সৌদামিনীর এই চিঠি পেয়েও কলকাতাতে এসে সৌদামিনীর চোখের কাছে দেখা দিতে পারেনি পূরবী। পূরবী শুধু লিখেছিল : আমারও ইচ্ছা, আর সোসাইটিও আমাকে একটা স্টাইপেণ্ড দিয়েছে, তাই আমি খুব শিগ্‌গির লণ্ডন যাচ্ছি। লণ্ডনের, আর সম্ভব হয় তো রোম আর প্যারিসেরও বড় বড় মিউজিয়ামে ভারতীয় আর্ট ও ক্র্যাফ্‌টের দুর্লভ নমুনাগুলিকে একবার নিজের চোখে দেখে আসতে। সোসাইটির স্টাইপেণ্ড মানে, মোট তিন হাজার টাকা। ও টাকা আমার না পেলেও চলত। কিন্তু ওটা ঠিক সাহায্যের টাকা নয়, সম্মানী দক্ষিণা।

জবাব দিয়েছিলেন সৌদামিনী : তোমার সম্মান আরও বাড়ুক। কামনা করি, সুস্থ থেকে তুমি আবার দেশে ফিরে এসো।

এরপর আর সৌদামিনীর চিঠিতে আমন্ত্রণ ও আহ্বানের কোনও কথা ছিল না। কিন্তু, কী আশ্চর্য, যে পূরবী পাঁচ বছরের মধ্যেও নাগপুর থেকে একবার কলকাতায় আসবার সুযোগ পায়নি, সে ছ'মাস আগে নিজেই লণ্ডন থেকে টেলিগ্রাম করে সৌদামিনীকে অনুরোধ করেছিল : দশদিনের মধ্যে আমি দেশে ফিরছি। কিন্তু নাগপুরে যাব না; আমি এখন কলকাতাতেই থাকব। আমার থাকবার একটা ব্যবস্থা অবশ্যই করে রাখবেন।

খুশি হয়েছেন সৌদামিনী, আর ভাগ্যও ভাল বলতে হবে, পাশের ফ্ল্যাট একমাস হল খালি হয়েও গিয়েছিল। দেখে আরও খুশি হয়েছেন সৌদামিনী, সেই ছোট্ট মেয়ে পূরবী আজ এত বড় স্কলার হয়েও আন্টি সৌদামিনীর গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরতে ভুলে যায়নি।

না, আর নাগপুর নয়। কলকাতার থিয়েটার রোডের ওই বাড়ির ওই ফ্ল্যাটই এখন পূরবী নাগের জীবনের নীড়। সেই চেনা মানুষটি, সেই পুরনো আয়া জগমায়াও এখানে আছে, কাজেই পূরবীর কোনও অসুবিধে নেই। ঠিক সকাল আটটায় সেই বহু দিনের চেনা মিসিবাবা পূরবীর ঘরের টেবিলে চা আর খাবার পৌঁছে দিয়ে যেতে কোনওদিন ভুলে যায় না, ভুলও করে না আয়া জগমায়া।

পূরবী নাগের ফ্ল্যাটের একটি ঘরে শুধু বই আর বই। নাগপুর থেকে পূরবীর সব বই দশটি বড় বড় কাঠের বাক্সে ভরতি হয়ে চলে এসেছে। পাঠিয়ে দিয়েছেন মেসোমশাই এম.এন.রায়। মাসিমা একটা চিঠিতে লিখেছেন, ভালই হল পূরবী। আমাদেরও ইচ্ছে আছে, এবার কলকাতাতে চলে যাব। তোমার মেসো শিগ্‌গির রিটায়ার করবেন। হ্যাঁ, তোমার ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট কলকাতার ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার করবার সব ব্যবস্থা উনি করে দিয়েছেন।

বই আর বই। ইতিহাস আর আর্ট আলোচনার বই। কুমারস্বামীর যে সব বই এখন আর কোথাও পাওয়া যায় না, সেসব বইও পূরবীর এই সংগ্রহের মধ্যে আছে। ইয়াজদানির অজন্তা আছে। রাজপুত আর কাংড়া পেন্টিং-এর অন্তত ত্রিশটি বিরাট আকারের অ্যালবাম আছে। সংস্কৃত প্রতিমালক্ষণম্‌-এর সাতটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশনার সাতটি বই আছে। তা ছাড়া আর্ট আলোচনার আধুনিক পণ্ডিতদের লেখা আরও কত বই—উলডারিং, মাউণ্টফোর্ড, মলিয়ের, উলি, সেকেল, গোয়েৎস্‌ ও আরও কত পণ্ডিতদের লেখা বই। লণ্ডনে থাকতেই পিকাসোর কড়া সমালোচনা করে 'দি আর্টিস্ট' পত্রিকাতে যে লেখা পাঠিয়েছিল পূরবী, সে লেখা পত্রিকার গত মাসের সংখ্যায় বের হয়েছে। আরও অদ্ভুত ব্যাপার, পূরবীর সেই লেখার প্রশংসা করেছেন হারবার্ট রিড, একটি চিঠিতে পূরবীকে সে কথা জানিয়েছেন সম্পাদক।

আন্টি সৌদামিনী তো তাঁর ছেলের আসার অপেক্ষা করে দিন পার করে দিচ্ছেন, কিন্তু পাশের ফ্ল্যাটের পূরবী নাগের প্রাণেও কি কোনও প্রতীক্ষা আছে? দেখে তো মনে হয় না। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা আর হাতেও শুধু সরু সোনার চেন দিয়ে বাঁধা একটা ছোট্ট ঘড়ি; এ ছাড়া আর তো কোনও আভরণ পূরবীর গায়ে নেই। হ্যাঁ, আরও একটি আভরণ আছে, যা ওই ঘড়ি ও চশমারই মত আভরণ, গয়না নয়। পুরনো বিজয়নগরে বেড়াতে গিয়ে একটা ভাঙা মন্দিরের চাতালের কাছে তারার মত আকারের ছয়-কোণা একটা খুব ছোট্ট শ্বেতপাথর পড়ে ছিল। বুঝতে অসুবিধে নেই, এটা হল সেই কৃষ্ণরায়ের যুগের কোনও নারীর গলার হারের লকেট। পূরবী নাগের গলাতে যে সব সোনার চেন হারের মত দোলে, তারই লকেট হয়ে ওই ছোট পাথরটিও দোলে। গলার শোভা বাড়ায়, নিশ্চয়ই সেজন্য নয়। পূরবীর গলার ওই সোনা আর পাথর লকেট হল-পূরবীর স্কলার প্রাণেরই একটি তৃপ্তির শোভা।

কিন্তু পূরবীর মাথায় ওই একরাশ কালো চুলের খোঁপা আর ঠোঁট দুটিকেও চমৎকার আভরণ বলে মনে হতে পারে। লিপস্টিক কখনও ছোঁয়ও না পূরবী। পূরবীর দুটি ঠোঁট যেন আপনি রঙিন! বড় চমৎকার লালচে ঠোঁট। গম্ভীর ও শান্ত মুখ, বইয়ের পাতার উপর দুই চোখের সব আগ্রহের দৃষ্টি ঢেলে দিয়ে যখন বই পড়ে পূরবী, তখন বোধ হয় পূরবীর প্রাণটাও ইতিহাসের কোনও মন্দিরের পথে ঘুরে বেড়ায়। তখন পূরবী যেন অন্য এক জগতের মানুষ; শুধু ওই লালচে ঠোঁট দুটিকে এ জগতের বস্তু বলে মনে হবে।

রাস্তার উপরে ওই জোড়া গুলমোরের একটা অদ্ভুত অভ্যাস আছে। সামান্য ঝড়ের বাতাসেও উতলা হয়ে মাথা দোলাতে থাকে। বই বন্ধ করে জানালার পর্দা সরিয়ে রাস্তার দিকে তাকায় পূরবী। হ্যাঁ, এইবার মনে হবে, পূরবী নাগের জীবনেও প্রতীক্ষা আছে। কেউ আসবে বোধ হয়, কেউ এল কিনা, কিংবা সত্যিই এসেছে কি? পূরবীর সেই হঠাৎ উৎসুক দুই চোখের দৃষ্টিতে যেন অনেকক্ষণের শান্ত প্রতীক্ষা চঞ্চল হয়ে ওঠে।

পূরবী নাগের সঙ্গে দেখা করতে যে এখন আসবে, এই ছ'মাসের মধ্যে সে আরও অনেকবার এসে দেখা করে গিয়েছে। সে-ও একজন স্কলার মানুষ। আর, কী অদ্ভুত মিল। সে-ও আর্টের ইতিহাস নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেছে। সে-ও ইতিহাসের এম-এ। অরেনস্টাইনের অনেক ধারণা ও বিশ্বাসের ভুল ধরে দিয়ে মধ্যে এশিয়াতে ভারতীয় আর্টের প্রভাব সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য দিয়ে একটি বই লিখেছে যে, সে। তার নাম সুমোহন দত্ত। সুমোহনের সেই বই লণ্ডনের বিখ্যাত প্রকাশক হোয়াইট অ্যাণ্ড হ্যামণ্ড প্রকাশ করেছে। ফয়েলের কাউণ্টারে সেই বই দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছিল পূরবী। কে এই লেখক? কাউণ্টারের মেয়েটি হেসে হেসে বলেছিল —চিনি না; তবে বইটি ভাল বিক্রি হয়েছে।

অনেকক্ষণ ধরে বইটার পাতা উলটিয়ে আর পড়ে পড়ে যখন পূরবীর চোখের চাহনি নিবিড় হয়ে যায়, তখন কাউণ্টারের মেয়েটি মুখ টিপে হাসে—আপনি চেনেন নাকি?

—না না, আমি চিনি না। আমি চিনব কেমন করে? আমি আগে কখনও এর নামও শুনিনি।

কিন্তু চিনতে আর খুব বেশি দেরি হয়নি। লণ্ডনের মেঘলা আকাশ সেদিন বিকেলে বড় বেশি দুরন্ত হয়ে উঠেছিল। ঝরঝর বৃষ্টির ধারা আর থামতেই চাইছে না। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বাইরের বারান্দার একটা থামের পাশে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল পূরবী।

হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে হেসে হেসে পূরবীর কাছে দাঁড়ায় বিজয়, নাগপুরের সেই বিজয় কুলকার্নি। —আপনি কি কারও অপেক্ষা করছেন?

পূরবী—না।

বিজয়—তবে তো বাড়ি ফিরতে চান?

পূরবী—হ্যাঁ।

বিজয়—তবে চলুন; আমার সঙ্গে গাড়ি আছে, আমার অফিসের গাড়ি।

পূরবী বলে—না, ধন্যবাদ।

ব্যস্ত হয়ে আর তেমনই হেসে হেসে চলে যায় বিজয় কুলকার্নি, অদ্ভুত ছটফটে স্বভাবের এই বিজয়। কে জানে কিসের মেশিনের কাজ শিখতে ও বুঝতে ও দু বছর ধরে লণ্ডনে দিন কাটাচ্ছে বিজয়।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আর সিঁড়ি ধরে নেমে যাচ্ছিল বিজয়, কিন্তু ওদিক থেকে আগন্তুক কে একজন বিজয়কে দেখতে পেয়েই বিজয়ের হাত চেপে ধরে—কী ব্যাপার? তুমি কী মনে করে?

বিজয়—আরে ভাই, হাম আঁয়েথে সির্‌ফ্ আনেকে লিয়ে, তুমহারে অ্যায়সা বুদ্ধমূর্তি দেখনেকে লিয়ে নেহি।

শুধু এখানে আসবার জন্যেই এসেছে বিজয়, বুদ্ধমূর্তি দেখবার জন্যে নয়।

চলো আজ তোমাকে বুদ্ধমূর্তি দেখিয়ে ছাড়ব। ছটফটে বিজয়কে হাত ধরে টেনে নিয়ে আগন্তুক মানুষটি উঠে আসে ও বারান্দার ঠিক সেইখানেই এসে দাঁড়ায়, যেখানে থামের পাশে দাঁড়িয়ে আছে পূরবী।

ছটফটে বিজয় আবার সেইরকম হেসে পূরবীর দিকে তাকিয়ে কথা বলে—আপনি বাঙালি, আমার এই বন্ধুটিও বাঙালি, সুমোহন দত্ত।

চমকে ওঠে পূরবী। বিজয় বলে—আপনাদের দুজনের মধ্যে একটা মিল আছে। যেমন আপনি, তেমনি আমার এই বন্ধুটিও এখানে বুদ্ধমূর্তি দেখতে আসে।

সুমোহনের দিকে তাকিয়ে হাঁক দেয় বিজয়—জেরা ইধর আও না ভাই সুমোহন। ...হাঁ, বহুত আচ্ছা, ইনি হলেন আমাদের নাগপুরের পূর্বী। নাগপুরের যে বাড়িতে পূর্বীর বাবার ক্লিনিক ছিল, সেটা আমাদেরই বাড়ি। সে বাড়ির ভাড়া প্রথমে ছিল মাত্র দেড়শো টাকা, কিন্তু পূর্বীর বাবা এমনই মহাশয় মানুষ ছিলেন যে, নিজেই ইচ্ছে করে তিনশো টাকা ভাড়া দিতে শুরু করলেন। আমার বাবা বলেন, ডাক্তার আর.এম.নাগের মত উদার মানুষ তিনি কখনো দেখেননি।

পূরবী বলে—আপনার বই আমি দেখেছি।

সুমোহন হাসে—শুধু দেখছেন, পড়েননি নিশ্চয়?

পূরবী—সত্যি কথা বললে বলতে হয়, সামান্য একটু পড়েছি, না-পড়ারই মত।

সুমোহন—ঠিক আছে। বলুন, কবে আবার এখানে আসবেন?

পূরবী—কেন?

সুমোহন—আমার সেই বই একখানা আমি নিজেই আপনাকে দিয়ে যাব।

পূরবী—কাল আমার দিনটা শুধু এক ন্যাশনাল গ্যালারিতে কেটে যাবে। আমি পরশু আবার এখানে আসব!

সুমোহন—আচ্ছা, ধন্যবাদ। বিজয়কে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে গেল সুমোহন। একবার তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করেও দেখতে পায় না পূরবী, কোন দিকে ওরা দুজনে চলে গেল।

আজ ভাবতে গেলে হাসি পায়। কারণ আর কল্পনা করে বুঝবার দরকার হয় না, সেদিনের একটা ঘটনাকে যেন চোখেই দেখতে পায় পূরবী। চলে আসার সময় বিজয়কেও হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে গেল কেন সুমোহন? বিজয় তো মধ্য এশিয়ার পুরনো বৌদ্ধমঠের কোনও দেয়াল-চিত্রের রূপ আর ভঙ্গি আর চমৎকারিতার ধার

ধারে না। বিজয়ের সঙ্গে কী কথা নিয়ে আলোচনা করবে সুমোহন, পূরবী নাগের কল্পনা ছাড়া।

কোনও সন্দেহ নেই, পরদিনই বিজয়ের কাছ থেকে পূরবী নাগের জীবনের অনেক পরিচয় জেনে নিয়েছিল সুমোহন। আর সেই জন্যই তো বিজয়কে ওভাবে হাত ধরে অন্য দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া।

পরশুদিন পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে পারেনি সুমোহন। পরের দিন ন্যাশনাল গ্যালারিতে পৌঁছেই দেখতে পায় পূরবী, উপহারের বইটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুমোহন দত্ত।

সুমোহন হাসে—কাল আমি থাকছি না, কাল একবার অক্সফোর্ড যেতেই হবে। ইন্দোনেশিয়ার আর্ট সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন ডক্টর ভার্গনার। সে বক্তৃতা আমার শোনা দরকার।

উপহারের বইটি হাতে তুলে নেয় পূরবী—তবে যান, বক্তৃতা শুনেই আসুন।

সুমোহন—আমি শুধু এই একটি দিন অক্সফোর্ডে থাকব, পরের দিনই আবার ফিরে আসব। কিন্তু আবার যদি কখনও....

পূরবী হাসে—আমার ঠিকানা জানতে চান?

সুমোহন হেসে ফেলে—না, কারণ সব জানা হয়ে গিয়েছে।

পূরবী—কে বলে দিলে আমার ঠিকানা? বিজয় কুলকার্ণি বোধ হয়।

সুমোহন—হ্যাঁ। বিজয় একটা হঠাৎ ঘটনায় আমার বন্ধু হয়ে গিয়েছে। পিকাডিলিতে রাস্তা পার হতে গিয়ে একটা গাড়ির ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। পায়ে বেশ চোট লেগেছিল, খুব সাংঘাতিক অবিশ্যি নয়। কিন্তু এই বিজয় হঠাৎ কোথা থেকে এসে আমাকে হাত ধরে ওঠাল, ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। আর হোটেলে পৌঁছে দিয়েও গেল। পর-পর প্রায় পনেরো দিন ধরে রোজই একবার আমার হোটেলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে, আমার দরকারের সব খবর জেনে যেত বিজয়। বিজয় একদিন আমার মাথা টিপেও দিয়েছিল, সেদিন আমার জ্বর হয়েছিল।

পূরবী—তাই বলুন। আমি ভাবছিলাম আপনার মত একজন স্কলারের পক্ষে বিজয়ের বন্ধু হবার কী দরকার থাকতে পারে?

সুমোহন—আচ্ছা, আমি তবে চলি।

পূরবী—আসুন।

সেদিন কি পূরবীও বুঝতে পেরেছিল যে, ভদ্রতার এই সামান্য আহ্বান একদিন পূরবীর প্রাণেরই একটি আহ্বান হয়ে উঠবে। সুমোহনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের এই দুটি ঘটনার পর আরও যে সাতটি মাস লণ্ডনে ছিল পূরবী, সেই সাত মাসের মধ্যে অন্তত একশো সাত দিন সুমোহনের সঙ্গে দেখা হয়েছে।

কিন্তু শুধু কি দেখার জন্যই দেখা; না, তা নয়। কে কী নতুন বই পড়ল, কে কী নতুন লেখা লিখল, তারই খবর বিনিময় করে দুজনে কত খুশি হয়। মাঝে মাঝে তর্কও মন্দ জমে না। সুমোহন বলে—আমার কালীঘাটের পট নিয়ে যে কেউ প্রশংসার

গলাবাজি করেছেন, সেটা আমার একটুও ভাল লাগে না। আমি তো মনে করি, কালীঘাটের পট হল ভালগারিটি, প্রতিভা ফুরিয়ে গেলে যা হয়।

প্রতিবাদ করে পূরবী—না, আমি তা মনে করি না। আমি বলব, কালীঘাটের পট হল খুব সরল রীতির একটি সুন্দর পরিণতি।

মার্বেল আর্চের কাছে পার্কের বেঞ্চিতে বসে আর গল্প করে দুজনে বুঝতেও পারে না, কত ঘন্টা সময় কেটে গেল। গল্প তো নয়, যেন দুজন সন্ধানী অভিযাত্রীর বিচরণ, এক-একটি যুগের রূপকলার ইতিহাসের পথে ঘুরে-ফিরে মঠ ও মন্দির মূর্তি দেখে দুজনের শিক্ষিত প্রাণের পিপাসা মিটে যায়।

মেজর বর্ধন, যিনি ভারত সরকারের সার্ভিস থেকে অবসর নিয়ে এখন লণ্ডনে থাকেন, তিনি হলেন পূরবীর ছোট মেসোমশাই, সরযূ মাসির স্বামী। সুমোহন জানে, মিটাফোর্ড স্ট্রিটের কোনও বাড়ির কোনও ফ্ল্যাটে সরযূ মাসির দেখাশোনার অধীন হয়ে পূরবীর লণ্ডন জীবনের দিনগুলি পার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কী অদ্ভুত সেকেলে সন্দেহ ও আপত্তির মানুষ এই সরযূ মাসি। পূরবীর সঙ্গে দেখা করতে এসে প্রথম দিনেই বুঝতে পেরেছিল সুমোহন, সরযূ মাসি খুশি হননি, বরং একটু অসন্তুষ্টই হয়েছেন। পড়াশোনা রিসার্চ থিসিস আর আর্ট স্টাডি, যা কিছুই বলা হোক না কেন, আর ব্যাপারটা যত নির্দোষই হোক না কেন, তা নিয়ে পূরবীর সঙ্গে কোনও ছেলের মেলামেশা তিনি একটুও পছন্দ করেন না। তাঁর ইচ্ছা, দেশের মেয়ে যেমন একলাটি হয়ে বিদেশে এসেছে, তেমনিই আবার একলাটি হয়ে ভালয় ভালয় দেশে ফিরে যাক।

সরযূ মাসির আপত্তির আভাসটা একটু অস্পষ্ট হলেও বুঝে নিতে পূরবীর একটুও দেরি হয়নি। দুঃখিত হয়নি পূরবী, কিন্তু খুশিও হয়নি। এই সত্য তো বুঝতেই হবে যে, যারা সাধারণ মানুষ যারা বিদ্যাচর্চার ধারে-কাছেও থাকে না, তাদের পক্ষে বুঝে ওঠা আর বিশ্বাস করা খুবই কঠিন যে, বিদ্যার চর্চাও দুজনের নির্দোষ বন্ধুত্বের সহজ বন্ধন হতে পারে; তাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী হলেই বা কি এসে যায়?

আজ ভাবতে একটু লজ্জাই বোধ করে পূরবী, সরযূ মাসির আপত্তির বিরুদ্ধে পূরবীর মনের সেই যুক্তির মধ্যে কী অদ্ভুত একটা ফাঁকি ছিল। সেই বন্ধুত্ব কত সহজে দুজনের ভালবাসার ফুলডোর হয়ে গেল।

মনে হচ্ছে, রাস্তার জোড়া গুলমোর উতলা হয়ে মাথা দোলাচ্ছে। সুমোহন এল বোধহয়। গেটের দিকে তাকিয়ে থাকে পূরবী।

না, কেউ এল না। কী আশ্চর্য, আজ সাতদিনের মধ্যেও সুমোহনের একবার আসবার সুযোগ হল না?

॥ ২ ॥

সুমোহনের ভুল নয়, দোষও নয়, ভুলে যাওয়াও নয়। এই সাত দিনের প্রত্যেকটি দিনে, যখনই সন্ধ্যা হয়েছে, তখনই পূরবীর সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্য ব্যস্ত

হয়েছে সুমোহন। কিন্তু ব্যস্ততাই সার। কারণ হল একটি বাধা, একটি উতলা প্রশ্নের কণ্ঠস্বর—তুমি এখন বাইরে যাচ্ছ কেন? কিসের দরকার?

আর কেউ নয়, সুমোহন দত্তের স্ত্রী হিমানীই এই প্রশ্ন করেছে। হিমানীর চোখ দুটোর, সেই সঙ্গে প্রাণটারও অদ্ভুত কোনও শক্তি আছে বলতে হবে। তা না হলে এই ঘরে একটি বিছানার উপর জ্বরের ঘোরে নিঝুম হয়ে পড়ে-থাকা একটা মানুষ কেমন করে বুঝতে পারে যে, ও ঘরের ভেতরের মানুষটি এখন বাইরে যাবার জন্য তৈরি হয়েছে?

পাটনার অ্যাডভোকেট হরিবিলাস দত্ত তাঁর মৃত্যুর পর হৃষীকেশের এক আশ্রমে চলে গিয়েছেন। স্ত্রীর নামে কলকাতার নিউ আলিপুরে যে বাড়িটি করেছিলেন, সেই বাড়িই হল আজকের সুমোহন দত্তের এই বাড়ি, যেখানে শুধু সুমোহন ও তাঁর স্ত্রী হিমানী ছাড়া আর কেউ থাকে না।

মাঝে মাঝে অবশ্য সুমোহনকে একাই থাকতে হয়, যখন হিমানী তার বাবা আর মায়ের কাছে পাঁচ-দশটি দিন কাটিয়ে আসবার জন্য চলে যায়। যে দেড়বছর লণ্ডনে ছিল সুমোহন, সে দেড়বছরে অবশ্য এই বাড়িতেই মাঝে মাঝে পাঁচ-দশটি দিন থেকে আবার যসিডিতে চলে যেত হিমানী। কে জানে কিসের টানে এই শূন্য বাড়িতেই এসে কয়েকটা দিন থেকে যাবার জন্য যসিডির মেয়ে হিমানীর প্রাণটা ব্যাকুল হয়ে উঠত।

টানের কথা নিয়ে যসিডির বাড়ির কেউ কোনও আলোচনা করে না, কিন্তু অনেক কথা নিয়ে হাসাহাসি করে। বড়দা হাসেন—কে না জানে তুই ওই শূন্য বাড়িতে গিয়ে কী করিস?

হিমানী—কী আবার করি? খাই দাই আর ঘুমোই।

বড়দা—তুই তো দুকাপ চা তৈরি করে টেবিলের উপর রাখিস, আর শুধু এককাপ চা খেয়ে গুনগুন করে গান করিস।

হিমানী হাসে—তাতে কী হয়েছে?

বড়দা—কিছুই হয়নি, সবাই শুধু বুঝতে পেরেছে যে, এককাপ চা সুমোহনের নামে নিবেদন করা হয়।

হিমানী—ওই একটি দিন ওরকম করেছিলাম।

বড়দা—সেদিন মনটা খুব খারাপ হয়েছিল, তাই না?

হিমানী—হ্যাঁ।

বড়দা—কেন?

হিমানী—কী অদ্ভুত মানুষ; একটি চিঠি দিয়ে তার পর একমাস চুপ। কী যে এমন ব্যস্ত, বুঝি না ছাই।

যসিডির বিধু সরকারের মেয়ে এই হিমানী পাটনাতে মামার বাড়িতে থেকে কলেজে পড়েছে আর বি-এ পাশ করেছে। বিয়ে হবার আগে পাটনার ছেলে সুমোহনের কাছে যসিডির মেয়ে হিমানীও নিতান্ত অচেনা ও অজানা একটা মেয়ে ছিল না। তার

কারণ, যসিডির বিধু সরকার পাটনার হরিবিলাসবাবুর কাছেও নিতান্ত অচেনা ও অজানা কোনও মানুষ ছিলেন না। যসিডির বিধু সরকারের ছোট নার্সারির গোলাপ কতবার উপহার হয়ে হরিবিলাসবাবুর বাড়িতে এসেছে। বুঝতে অসুবিধে হয়নি হরিবিলাসবাবুর—বিধু সরকারের কী ইচ্ছা। সুমোহনের সঙ্গে হিমানীর বিয়ে হোক, এই তো ইচ্ছেটা। বেশ তো, ছেলে যদি রাজি থাকে, ছেলের যদি আগ্রহ থাকে, তবে হরিবিলাসবাবুর কোনও আপত্তি নেই।

হরিবিলাসবাবুর চিঠির জবাবে চিঠি দিলেন বিধু সরকার—ছেলের আগ্রহ আছে বলেই তো আপনার কাছে আমার ইচ্ছার কথাটা জানিয়েছি।

কী বলে বিধু সরকার? একটু আশ্চর্য হয়েছিলেন আর একটু খোঁজখবরও করেছিলেন হরিবিলাসবাবু, সত্যিই কি বিধুর মেয়ে হিমানীর জন্য তাঁর ছেলে সুমোহনের মনে কোনও অনুরাগের ভাব দেখা দিয়েছে?

হেমেনবাবু একেবারে স্পষ্ট করে হরিবিলাসবাবুকে বলে দিয়েছিলেন—হ্যাঁ, তাই। তা না হলে প্রতি রবিবারে হিমানীর গান শোনার জন্যে আমার ওখানে আসত না সুমোহন।

সবই শুনলেন হরিবিলাসবাবু, হরিবিলাসবাবুর স্ত্রীও শুনলেন—একদিন হিমানীর মামিকে অনুরোধ করেছে সুমোহন—আপনি কি আপত্তি করবেন মাসিমা, যদি হিমানীকে সঙ্গে নিয়ে লেকের দিকে একটু বেড়িয়ে আসি? আপত্তি করেননি হিমানীর মামি। হিমানীকেও একদিন বলেছে সুমোহন—তুমি একদিন নিজের হাতে মুরগি কারি রেঁধে আমাকে নেমন্তন্ন করো। খোঁজ নিয়ে, হিমানীর জন্মদিন কবে জেনে নিয়েছে সুমোহন, আর জন্মদিনে সুন্দর ছবির একটি অ্যালবাম হিমানীকে উপহার দিয়েছে, মোলারামের আঁকা রাগ-রাগিণীর ছবি। হিমানীকেও জিজ্ঞাসা করেছিলেন মামি, কি রে তোদের দুজনের ইচ্ছে কী? হিমানীর সারা মুখ রাঙা হয়ে যায়। হিমানী বলে—আমি আবার কী বলব?

রূপের ইন্দ্রাণী নয় হিমানী, সুন্দরীও বলা চলে না। কিন্তু এমন কিছু অসুন্দরীও নয়। নিন্দে করলে বলা চলে, গায়ের রং ময়লা। আর শরীরটাও একটু বেশি ছিপছিপে, রোগাটে ধরনের। তা ছাড়া আর তো কিছুই তো নিন্দে করবার মত নয়। চোখ সুন্দর, চোখের ভঙ্গিও সুন্দর, আর ঠোঁট দুটোকেও খুব নরম বলে মনে হয়। মুখে সব সময় একটা মিষ্টি হাসি লেগে আছে, হয়ত সেই জন্যেই মামি যখন রাগ করে বকেন, তখন হিমানীর এই মিষ্টি নরম ঠোঁট দুটোকে চিমটি দিয়ে ধরেন—আবার যদি কখনও যসিডিতে চিঠি দিতে দেরি কর, আর যা-তা খেয়ে পেট কামড়ের কষ্টে কান্নাকাটি কর, তবে তোমাকে যসিডি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। পড়াশোনা যদি চুলোয় যায় তো যাক।

পড়াশোনা চুলোয় যায়নি। বি-এর পরীক্ষা ব্যর্থ হল না, পাসই করল হিমানী। আর হরিবিলাসবাবুও যসিডিতে চিঠি দিলেন, এইবার মেয়ের বিয়ে দিতে পারো, বিধু।

বিয়ের পর প্রথম যখন যসিডিতে এসে কয়েকদিন ছিল সুমোহন, তখন একদিন একটা কাণ্ডও করেছিল হিমানী। কাণ্ডটা আড়াল থেকে দেখে ফেলেছিলেন বউদি। ঘরের ভেতর সুমোহনের কাছে বসেছিল হিমানী; আর মন দিয়ে বই পড়ছিল সুমোহন। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আর একটানে বইটাকে সুমোহনের হাত থেকে কেড়ে নিল হিমানী—এখন আবার বই কেন?

সুমোহন—তার মানে?

হিমানী—আমি যখন আছি, তখন আমার সঙ্গে গল্প করো। এখন বই পড়া চলবে না।

সুমোহন হাসে। সেদিন বোধহয় খুশি হয়েই হেসেছিল সুমোহন, যদিও দুচোখে স্পষ্ট করে দেখতে পায় যে, কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে আর একটা পালক ঝাড়ু হাতে নিয়ে সুমোহনের বই-এর ঘরে ঢুকে বই-এর ধুলো ঝাড়ছে হিমানী, অগোছালো বইগুলোকে গুছিয়ে র‍্যাকের উপর সাজিয়ে রাখছে।

এ তো সুমোহন দত্তের জীবনের ঘরে একটা দাসীপনার কাজ; সে কাজ যে কোনও একটা চাকরও করতে পারে। কিন্তু যে কাজটা সুমোহনের জীবনের ধ্যান-জ্ঞান ও সাধনা; সে কাজে কি কোনও সাহায্য করতে পারে হিমানী? পারে না, পারবেও না। হিমানী কোনওদিনও তিব্বতের বৌদ্ধ তান্ত্রিকের বজ্রযানের রহস্য ব্যাখ্যা করে সুমোহনকে আশ্চর্য করে দিতে পারবে না। আর, সুমোহনও কোনওদিনও আফ্রিকান নিগ্রো আর্টের মর্মটি বুঝিয়ে দিয়ে হিমানীকে মুগ্ধ করে দিতে পারবে না।

বিয়ের পর একটি বছরও পার হতে না হতেই মা মারা গেলেন। তারপর একটি বছর পার হতে না হতে বাবা হৃষিকেশের আশ্রমে চলে গেলেন। এর পর আর পাটনাতে থাকতে সুমোহনের একটুও ভাল লাগেনি, যদিও খোদাবক্স লাইব্রেরিতে গিয়ে মোগল মিনিয়েচারের চমৎকার সংগ্রহ দেখতে খুবই ভাল লাগত। মাত্র, একদিন, সুমোহনের অনেক অনুরোধের পর সুমোহনের সঙ্গে খোদাবক্স লাইব্রেরি দেখতে গিয়েছিল হিমানী। কিন্তু আর নয়। পনেরো আর ষোলো শতকের মোগল মিনিয়েচার—রঙীন বিস্ময়ের সেই চিত্রাবলির দিকে ভাল করে তাকায়ওনি হিমানী।

তবু সেদিন সুমোহন দত্তের প্রাণে তেমন কোনও বিষাদ দেখা দেয়নি। কারণ, সেদিন কল্পনাও করতে পারেনি সুমোহন, পাঁচ বছর পরে একদিন তারই পাশে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশ মিউজিয়মের এলগিন মার্বেলস্ দেখবে এক নারী, যার গলাতে প্রাচীন বিজয়নগরের ছোট্ট একটি সাদা তারা-পাথর দোলে। মূর্তিগুলির দিকে তাকিয়ে আছে পূরবী, অথচ কত সহজে আর কত তাড়াতাড়ি হাতে-ধরা একটি খাতায় নোট লিখেও ফেলছে।

কোনও সারস্বত সোসাইটির নয়, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টেরও নয়, কারও দাতব্যের স্টাইপেণ্ড পায়নি সুমোহন। স্টাইপেণ্ড পেতে সুমোহনের মনে কোনও উৎসাহ, লোভ, কিংবা আগ্রহ, কিছুই ছিল না। একবার পাটনাতে, একবার কলকাতাতে, কলেজের

অধ্যাপনার কাজে আহ্বান পেয়েও উৎসাহবোধ করেনি সুমোহন। চাকরি করবার দরকার হয় না যার, যার বেঁচে থাকবার আর সারাজীবনের নিজের সাধের মত পড়াশোনা করে আর রিসার্চ করে সুখী হবার জন্য যথেষ্ট টাকার সঞ্চয় রেখে গিয়েছেন বাপ, তার পক্ষে কলেজের একজন প্রফেসর হবার সুযোগ তুচ্ছ করা কিছুই কঠিন নয়। তুচ্ছ করেও ছিল সুমোহন।

তার চেয়েও ভাল, কলকাতাতে থেকে নিজের মনের মত করে পড়াশোনা করা, ন্যাশনাল লাইব্রেরির আর্ট-সাহিত্যের সঞ্চয় থেকে সব সাহায্য নেওয়া, মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে নিজের চোখে দেখে নিয়ে বিচিত্র শিল্প-জগতের শতযুগের যত রূপভঙ্গি আর শীলতার কিছু নতুন তথ্য সঞ্চয় করে আনা। সুমোহনের জীবনে এর চেয়ে বড় তৃপ্তি আর কী হতে পারে?

ইচ্ছে ছিল, ইতিহাসের এম-এ'র ছাত্র ছিল যখন, তখন থেকেই একবার দেশের বাইরে গিয়ে, অন্তত লণ্ডন প্যারিস রোম আর বার্লিনের মিউজিয়মগুলিকে একবার দেখে আসা। নিগ্রো আর্টের রূপ দেখবার জন্য আফ্রিকাতে, আর পলিনেশিয়ার মূর্তিকলার রূপ দেখবার জন্য ইস্টার আইল্যাণ্ডে ছুটে যাওয়া সম্ভব না হতেও পারে। কিন্তু সেজন্য হতাশ হবার কোনও দরকার নেই। সব দেশের সব জাতির শিল্পকলার সাক্ষ্য ওই কয়েকটি শহরের মিউজিয়মেই পাওয়া যায়।

হিমানী খুব আপত্তি করেছিল, হিমানীর বাবা বিধু সরকারও অনুরোধের ভাষায় সুমোহনকে একটু বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। —হিমির শরীরটা তো এখন ভাল যাচ্ছে না। ঘুরে-ফিরে জ্বরটা বার বার আসছে। এই অবস্থায় তোমার এখন লণ্ডন না গেলেও চলতে পারে। ইচ্ছে যখন হয়েছে, তোমার মতন স্কলার ছেলের পক্ষে এমন ইচ্ছে হবারই কথা, তখন যেও একদিন, যাবে নিশ্চয়, কিন্তু এখন না গেলেই ভাল।

হিমানীর জ্বর? কী এমন সাংঘাতিক জ্বর? ডাক্তার বলেছেন, ও জ্বরে ভয় করবার কিছু নেই। খোলা মাঠের রোদে ও বাতাসে রোজ একটু বেশি করে বেড়ালেই ওই জ্বর আর দেখা দেবে না।

—তবে তুমি এত আপত্তি করছ কেন, হিমানী?

—তোমার এখন বিদেশে যাবার এমন কী দরকার হল?

—তুমি ঠিক বুঝবে না, কী দরকার।

—আমার বুঝে কাজ নেই। আমি একা থাকতে পারব না।

—কী আশ্চর্য, মাত্র একটি বছর, বড় জোর দেড়বছর, এটুকু সময় তুমি একা থাকতে পারবে না? তোমার বড়দার মেয়ে নমিতার স্বামী যখন যুদ্ধে গিয়েছিল, তখন নমিতা কী পুরো তিনটি বছর একা থাকেনি? তাছাড়া একা থাকবার কথাই বা তুলছ কেন। যসিডিতে থাকবে; বাবা, মা, দাদা, বউদি সবাই কাছে থাকবে, খোলা মাঠের রোদে আর বাতাসে বেড়াবারও অনেক সময় পাবে, একে কি একা থাকা বলে?

চুপ করে অনেকক্ষণ ধরে শুধু কাঁদে আর চোখ মোছে হিমানী। তারপর বলে—আচ্ছা, তবে যাও।

হিমানীর পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে হাসতে থাকে সুমোহন—এই তো, চমৎকার একটি সবুঝ মেয়ের মত কথা।

কিন্তু আজ সুমোহনের মুখে সেই হাসি আর নেই। হিমানীর পিঠে হাত বুলিয়ে দেবার জন্য সুমোহনের প্রাণে কিংবা হাতে, কোথাও কোনও আগ্রহের সাড়াও নেই।

কোথায় যাচ্ছ? কী ভয়ানক তীব্র আর তীক্ষ্ণ, হিমানীর মুখের ওই উদ্বিগ্ন প্রশ্নটার শব্দ। শুনতে পেলেই সুমোহনের কপালের একটা রগ দপ্ করে ফুলে ওঠে। প্রশ্ন তা নয়, যেন একটা অবুঝ দাবির শাণিত ছুরি, সুমোহনের পিঠে বসিয়ে দিয়ে খুশি হয় হিমানী। তা না হলে ঠিক সন্ধ্যা হলেই আর সুমোহন বাইরে যাবার জন্য তৈরি হলেই জ্বর গায়ে ও ঘরে বিছানার উপর পড়ে থেকেও হঠাৎ এরকম একটা প্রশ্ন করে বাধা দেয় কেন হিমানী?

বাধা পেয়ে আর বাইরে বের হয় না সুমোহন। চুপ করে ঘরের সোফার উপর বসে থাকে। কিন্তু বুঝতেও পারে সুমোহন, এ বাধা সহ্য করতে আর ইচ্ছে করে না, সহ্য করবার শক্তিও আর নেই। সোফার উপর স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে থেকে সুমোহনের অলস নিঃশ্বাসের ভেতর থেকেও যেন একটা যন্ত্রণা উথলে ওঠে।

হঠাৎ উঠে এসে হিমানীর ঘরের ভেতরে ঢোকে সুমোহন। —তুমি কি মনে কর যে, আমি বাইরে বের হলেই ট্রামের চাকায় কাটা পড়ে মরে যাব।

হিমানী হাসে—তা মনে করব কেন? তুমি তো নিজের গাড়িতে বেড়াতে বের হও; ট্রামের চাকা তোমার ক্ষতি করবে কেন?

—বেশ তো ঠাট্টা করতে পার, তবে আবার অবুঝের মত ডাকাডাকি করে বাধা দাও কেন?

—বাধা? বাধা দিলাম কোথায়? শুধু জিজ্ঞাসা করেছি, কোথায় যাচ্ছ।

—জিজ্ঞেস করবারও তো কোনও মানে হয় না।

—এ আবার কেমন কথা হল? বাইরে যাচ্ছ, বাড়ির মানুষটাকে একটু বলে যাবে না, কোথায় যাচ্ছ?

—না বললে দোষ কী?

—বললেই বা দোষ কী?

—এত ডাকাডাকি না করে চুপ করে শুয়ে থাকলেই তো পার।

—তুমিও বলে ফেললেই তো পার।

—কী?

—কোথায় যাচ্ছ?

—না, কোথাও যাচ্ছি না, কোথাও যাব না। ঘরের ভেতরে বসে শুধু তোমার জ্বরের কাতরানি শব্দ শুনব।

দপ্ করে ফুটে উঠেছে সুমোহনের কপালের রগ। হিমানী বলে—ছিঃ, এত রাগ করতে নেই। তুমি কোথায় যাচ্ছ জানতে পেলে আমার মনটা একটু নিশ্চিন্ত হবে, ভালও লাগবে, জ্বরের জ্বালা নিয়েও ঘুমোতে পারব।

বলতে বলতে সুমোহনের হাতের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দেয় হিমানী। একটা রোগা হাত, সে হাতের চুড়িগুলি ঢলঢল করে।

না, হিমানীর সেই হাত আর ধরে না সুমোহন। ধরতে ভুলেই যায় বোধ হয়। কিংবা আনমনা হয়ে কি যেন ভাবছে সুমোহন, সেইজন্য।

সুমোহনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে হিমানী। হিমানীর চোখের তারা দুটো যেন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে মিটমিট করে। হিমানী বলে—আচ্ছা, এসো তবে। ফিরতে খুব বেশি দেরি করো না।

এইভাবেই সুমোহনের মনটাকে তাক্ত করে দিয়ে, বাইরে বের হবার আনন্দটাকে তেতো করে দিয়ে তারপর এক কথায় সুমোহনকে মুক্তি দেয় হিমানী, আচ্ছা, এসো তবে।

যসিডির খোলা মাঠের রোদ আর বাতাসে বেড়িয়ে হিমানীর সেই বেয়াড়া জ্বরটা সেরে যায়নি? সেরে গিয়েছিল বইকি! হিমানীর সেই রোগা শরীরটা যেন যসিডির বাড়ির বাগানের মাধবীলতার মত ফুলেলা রসে ভরাট হয়ে গিয়েছিল। সেই চেহারার একটি ফটো লণ্ডনের সুমোহনের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বউদি, যদিও খুব আপত্তি করেছিল হিমানী। কিন্তু সেই ফটো পেয়ে খুব যে খুশি হয়েছিল সুমোহন, তা নয়।

একদিন উইণ্ডসর প্রাসাদ দেখে ফিরবার পথে, ট্যাক্সিতে পূরবীর পাশে বসে হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল সুমোহন—ওই যে, দূরে সবুজ ঘাসের ছোট গুমটির মত একটা স্ট্রাকচার দেখছ, ওটা হল সেই জায়গা, যেখানে ম্যাগনা কার্টাতে সই দিয়েছিলেন রাজা জন।

—তাই নাকি? ভাল করে দেখবার জন্য উঁকি দিতে গিয়ে পূরবীর মাথাটা সুমোহনের বুকে ঠেকে যায়। সুমোহনের চোখের কত কাছে ফুটে রয়েছে পূরবীর সেই আপনি রাঙা ফুল্ল ঠোঁট।

ঠিক সেইদিনই হোটেলের ঘরে ফিরে এসে যসিডির একটি বড় খামের চিঠি খুলতেই হিমানীর এই নতুন ফটো যেন জীবন্ত দুটো চোখ নিয়ে সুমোহনের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। চমকে ওঠে সুমোহন। চোখে দীপ্তি নেই, মুখে হাসি নেই, গম্ভীর সুমোহন অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে বসে থাকে, আর ফটোটাকে টেবিলের দেরাজের ভেতরে রেখে দেয়।

পাটনার একটা সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে কী যেন হয়েছে, তাই চিঠি লিখেছিলেন উকিল সান্যালমশাই, তুমি কবে দেশে ফিরবে, সুমোহন? ভাল হয়, যদি এই মাসের শেষের দিকে ফিরে আসতে পার। দেরি হলে কিছু ক্ষতি হতে পারে।

সেদিন আর কোনও মিউজিয়মের গ্যালারির কাছে নয়, জোয়ারে উচ্ছল টেমসের

তটে ছোট একটি পার্কের বেঞ্চের উপর বসে কালো রাজহাঁসের সুখের সাঁতার দেখতে থাকে সুমোহন দত্ত আর পূরবী নাগ। সুমোহনের কোলের উপর একটি উপহারের বস্তু, একটি চমৎকার জাপানি ক্যামেরা। উপহার দিয়েছে পূরবী।

পূরবী বলে—তুমি যখন পাটনা যাবে, তখন কলকাতায় ফেরার আগে একবার রাজগিরে আর নালন্দাতে যাবে আর জৈন মূর্তিকলার যা-কিছু দেখতে পাবে, সবারই ফটো তুলে নেবে।

সুমোহন—কেন? কিসের জন্য?

পূরবী হাসে—আমার জন্য।

সুমোহন—তাই বলো। আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না।

পূরবী—বলো।

সুমোহন—তুমি আর আমি, দুজনেই খেটেখুটে জৈন মূর্তিকলা সম্বন্ধে একটা বড় বই লিখলে কেমন হয়? হোয়াইট অ্যাণ্ড হ্যামণ্ড যখন খুশি আছে, তখন এই বই প্রকাশ করতেও কোনও অসুবিধে হবে না।

পূরবী—বইয়ের লেখকের কী নাম হবে?

সুমোহন—কেন? দুজনেরই নাম। সুমোহন দত্ত অ্যাণ্ড পূরবী নাগ।

বলতে গিয়ে সুমোহনের মুখের শেষ কথাটা কেমন যেন শব্দহীন হয়ে মিইয়ে গেল।

দুজনেই নীরব হয়ে যায়। সেই নীরবতার নেপথ্যে যেন অদ্ভুত একটা বেদনার ছায়া ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে। সত্যিই কি একেবারেই অসম্ভব? সেই বই-এর অথরশিপ কি দুটি নামের মিলন হয়ে দেখা দিতে পারে না, সুমোহন দত্ত অ্যাণ্ড পূরবী দত্ত?

অনেকক্ষণ পরে কথা বলে পূরবী—কলকাতা যাবার দিন তো ঠিক করেই ফেলেছ।

সুমোহন—হ্যাঁ, পরশু দিন।

পূরবী—যাও, আমার অবিশ্যি এ মাসের মধ্যেই যাওয়া সম্ভব হবে না। একটু দেরি করতেই হবে।

সুমোহন—কেন?

পূরবী—সরযূ মাসি দুঃখিত হবেন, যদি মেসোমশাইয়ের জন্মদিনের অনুষ্ঠানের আগেই চলে যাই।

সুমোহন—জন্মদিন কবে?

পূরবী—আর তিনমাস পরে।

সুমোহন হাসে—সে যে অনেকদিন।

পূরবী হাসে—এত অধীর হলে চলবে কেন?

সুমোহন—নাগপুরে পৌছেই কিন্তু আমাকে টেলিগ্রাম করে পৌছ-খবর জানাবে।

পূরবী—নাগপুর? আর নাগপুরে থাকব কেন?

সুমোহন—তবে কি কলকাতাতেই থাকবে?

পূরবী হাসে—নিশ্চয়।

পূরবীর একটা হাত টেনে নিয়ে বুকের উপর ধরে রাখে সুমোহন। পূরবীর সেই লালচে ঠোঁটের উপর সুমোহনের মুখটাও লোলুপ হয়ে ঝুঁকে পড়ে।

আশ্বস্ত হয়েছে, নিশ্চিন্ত হয়েছে সুমোহন। স্কলার সুমোহনের জীবনের পূরবীর মত স্কলার সঙ্গিনীর আবির্ভাব যে দুজনের আত্মারই একটা পরিতৃপ্তির অঙ্গীকার। যার সঙ্গে যাকে সবচেয়ে ভাল মানায়, তারই সঙ্গে তার ভালবাসার বন্ধন সত্য হয়ে উঠেছে।

কিন্তু দমদম এয়ারপোর্টে নেমে আর কাস্টম-বেড়া পার হয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেল সুমোহন, তার সঙ্গে যাকে একটুও মানায় না, সেই নারী হেসে হেসে এগিয়ে আসছে। কী ভয়ানক উৎফুল্ল হয়ে হাসছে হিমানীর সেই কালো চোখ, যে চোখে শুধু একটা মেয়েলিপনা চঞ্চল হয়ে কাঁপে, কিন্তু শিক্ষা বিদ্যা ও প্রতিভার কোনও দীপ্তি ঝিকমিক করে না।

খুব চেষ্টা করে একটা শুকনো হাসি হাসতে পারে সুমোহন, কিন্তু আর কিছুই পারে না। হিমানীর হাত ধরা দূরে থাকুক, হিমানীর সামান্য একটু গা-ঘেঁষে দাঁড়াতেও পারে না।

হিমানী বলে—তুমি আশ্চর্য।

সুমোহন—কী বললে?

হিমানী—মাসে অন্তত একটা চিঠিও তো দিতে হয়।

সুমোহন—খুব ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল, তাই....।

হিমানী হাসে—তাই শুধু আমাকে একটা চিঠি লিখতে ব্যস্ত হতে পারনি।

সুমোহন—গাড়ি এসেছে?

হিমানী—হ্যাঁ।

সুমোহন—আর কেউ এসেছে নাকি?

হিমানী—না।

সুমোহন—তবে চলো, এখানে দাঁড়িয়ে ডিবেট করলে কোনও লাভ হবে না।

বাড়ি ফিরে এসে স্নান করে আর চা-খাবার খেয়েই বই-এর ঘরে ঢুকে ব্যস্ত হয়ে ওঠে সুমোহন। জানতে হবে, জৈন মূর্তিকলা সম্পর্কে স্মিথ কী বলেছেন, মার্শালই বা কী বলেছেন। মনে হয়, ফার্গুসনও জৈন মূর্তি সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন।

দুপুরবেলা খাবার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আর হিমানীর দিকে না তাকিয়ে অদ্ভুত একটা কথা বলে সুমোহন—যসিডির খোলা মাঠের রোদে-বাতাসে এত বেড়ালে, তবু শরীরটা তো একটুও ভাল হল না।

হিমানী—কিন্তু সবাই তো বলছে, ভাল হয়েছে।

রাত্রিবেলা খাবার টেবিলের কাছে এসে আরও অদ্ভুত একটা কথা বলে সুমোহন—তোমার গায়ের ওই জ্বর বোধ হয় কোনও কালেও সারবে না।

চমকে ওঠে হিমানী—আমার তো এখন জ্বর-টর নেই, সেরেই গিয়েছে।

কিন্তু রাত্রি যখন গভীর হয়, যখন হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় আর বুঝতে পারে হিমানী, সুমোহন এখনও তার পড়ার ঘরে বসে আছে, তখন বিছানা থেকে নেমে জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় হিমানী। আকাশে তারা আছে কিনা, ঝাপসা চোখে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু বুঝতে পারে, কপালটা বেশ গরম, নিঃশ্বাসেও একটা জ্বালা। জ্বর এসেছে নিশ্চয়।

তিনমাসের মধ্যে প্রায় দেড়টা মাস পাটনাতে আর রাজগিরে আর নালন্দাতে কাটিয়ে দিয়ে আবার যেদিন কলকাতায় ফিরে আসে সুমোহন, সেদিন থিয়েটার রোডের এক বাড়ি থেকে এক মহিলার টেলিফোনের বার্তা শুনে সুমোহনের বুকের ভেতরে নিঃশ্বাসের সব বাতাস যেন বিহুল হয়ে গিয়েছিল। সৌদামিনী গুপ্তে বলছেন—আপনাকে জানাতে লিখেছে পূরবী, সে আর এক-দেড় মাস পরে কলকাতাতে এসে আমারই পাশের ফ্ল্যাটে থাকবে।

ঠিক দেড়মাস পরে আবার একদিন ঠিক সন্ধ্যা হতেই টেলিফোনে বার্তা শোনে সুমোহন, সেটা পূরবীরই আগমনী বার্তা—আমি এসেছি।

গায়ে তসরের পাঞ্জাবি আর সাদা সুতির ঢিলে পায়জামা, আর পায়ে এক জোড়া বাঘ-ছাল চটি, এই সাজে বই-এর ঘর থেকে বের হয়ে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায় সুমোহন। এখনই একবার গিয়ে দেখা দিয়ে এলে মন্দ কী?

জ্বরে কাতর শরীরটাকে নিয়ে এতক্ষণ ধরে ওঘরে বিছানার উপর শুয়ে ছিল যে হিমানী, সে হঠাৎ উঠে বসে আর ডাক দেয়—শুনছ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় যাচ্ছ?

—বাইরে।

—কেন?

—কাজে।

ব্যস্তভাবে গ্যারেজের দিকে চলে যায় সুমোহন।

যেমন সেদিন তেমনই আজও এই ভয়ানক 'কোথায় যাচ্ছ' প্রশ্ন করে সুমোহনের বাইরে যাবার ব্যস্ততাকে বাধা দিয়েছে হিমানী, আর শেষ পর্যন্ত নিজেই সে বাধা সরিয়ে দিয়ে সুমোহনের পথ মুক্ত করে দিয়েছে, আচ্ছা, এসো তবে।

নিউ আলিপুরের সন্ধ্যার উতলা বাতাসে শিহর জাগিয়ে দিয়ে ছুটে চলে যায় সুমোহনের গাড়ি। সুমোহনের গাড়ির হর্নে সেই হর্ষ আজও আছে।

কিন্তু সুমোহনের বুকের ভেতরে সেই হর্ষ আজ আর নেই। মেঘলা আকাশের মত মনটা যেন মেদুর হয়ে রয়েছে। বুকের ভেতরে ছমছম করছে দুঃসহ একটা ভয়। কারণ, যে কথা আজও বলা হয়নি সে কথা আজ পূরবীকে বলবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে সুমোহন। শুনে যদি শিউরে ওঠে, হঠাৎ আহত মানুষের মত আর্তস্বরে

চেঁচিয়ে ওঠে, আর সুমোহনকে একটা অধম প্রবঞ্চক বলে ভর্ৎসনা করে পূরবী, তবে করুক। কিন্তু পূরবীর কাছে কপট হতে পারবে না সুমোহন। আর গোপন করে রাখা সম্ভব নয় যে, হিমানী নামে অতি বাস্তব একটি কঠোর সমস্যা সুমোহনের কাছেই থাকে।

॥ ৩॥

হাতের ব্যাগের ভেতর থেকে একগাদা ফটো বের করে নিয়ে টেবিলের উপর রেখে দেয় সুমোহন। পূরবীর চেখের সোনার ফ্রেম আর চোখ, দুই-ই যেন একসঙ্গে ঝিক করে হেসে ওঠে — এত ফটো তুলে ফেলেছ?

সুমোহন—ফটো তুলতে বেশ ঝঞ্ঝাট ভুগতে হয়েছে। কোনও কোনও মন্দিরের কর্তারা তো মন্দিরের ভেতর ঢুকতেই দিল না। কিন্তু তোমার উপহার ওই জাপানি ক্যামেরা সত্যিই একটি ওয়াণ্ডার। অত্যন্ত পাওয়ারফুল ক্যামেরা। আমি মন্দিরের পাঁচিলের বাইরেই ঘুরে ফিরে আর তোমার উপহারের ক্যামেরা দিয়ে মন্দিরের গায়ের অনেক হাফ-রিলিফ ছবি তুলে নিয়েছি। তাছাড়া আরও একটা সমস্যা। এক একটি তীর্থংকরের মূর্তিকে সিঁদুর মাখিয়ে কেউ বা সূয্যি ঠাকুর, কেউ বা আবার বিষ্ণু ঠাকুর করে ফেলেছে। গাঁয়ের মানুষকে কত অনুরোধ করা হল, ওরে বাবা, একবার এই সিঁদুর একটু মুছে দে রে বাবা, মূর্তিটার ফটো তুলে নিই; কিন্তু অনুরোধের মর্ম বোঝবার মানুষ নয় ওরা। টাকা দেওয়া হল, তবে কাজ হল। কিন্তু তুমি কতদূর কী করলে?

পূরবী—আমার প্রায় দেড় শো পৃষ্ঠা নোট লেখা হয়ে গিয়েছে। রিভাইজ করব পরে। আমার মনে হয়, আমার ধারণার অনেক কিছুই ডক্টর খাণ্ডেলওয়ালার পছন্দ হবে না; জোর প্রতিবাদ করে শেষে একটা তুমুল কন্ট্রোভার্সি বাধিয়ে তুলবেন।

সুমোহন—তুলুন না কেন? তাতে ভয় পাই না।

পূরবী—তোমাকে আজ কেমন যেন ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছে।

সুমোহন—না, ক্লান্ত হবার তো কোন কারণ নেই।

পূরবী—আমি মনে করলাম, আজও বুঝি তুমি এলে না।

—আসতাম ঠিকই; কিন্তু আসতে একটু দেরি হত, এই যা।

—কেন?

—তোমার এখানে আসবার জন্য ঠিক রওনা হবার সময়ে রোজই একটা বাধা পাই, সে বাধা আজ একটু বেশি ভয়ানক হয়ে উঠেছিল।

—কিসের বাধা?

সুমোহনের মুখের চেহারাটা করুণ হতে হতে একেবারে সাদাটে হয়ে যায়—যে কথা তোমাকে কোনওদিনও বলা হয়নি, সে কথা আজ তোমাকে না বলে আর থাকতে পারছি না।

—বলো।

—তুমি নিশ্চয় জান না, অনেকদিন আগেই আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

—নিশ্চয় জানি না। কিন্তু তাতে কী আসে যায়?

চমকে ওঠে সুমোহন—কী বললে?

পূরবী—একথা যদি সেদিন বলতে, তবে হয়ত কিছু আসত যেত।

—কোনদিনের কথা বলছ?

গলার হারের লকেট, ইতিহাসের যাদু-মাখানো পুরনো বিজয়নগরের সেই পাথুরে তারা, যে তারা পূরবীর বুকের সুগন্ধে মোদিত হয়ে আছে, সেই তারাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কথা বলে পূরবী; আর বলতে গিয়ে পূরবীর আপনি রঙিন-লালচে ঠোঁট আরও ফুল্ল হয়ে ওঠে। —টেমসের জোয়ার; কালো রাজহাঁস সাঁতার দিয়ে খেলা করছে, পার্কের মাটিতে অনেক ডাফোডিল....।

—আর বলতে হবে না পূরবী। সেদিনই, সবকিছুর আগে তোমাকে জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।

—হ্যাঁ, কিন্তু আমারও তো একটু জেনে নেওয়া উচিত ছিল।

—কী বললে?

—আর বেশি ভাল করে বলবার কিছু নেই সুমোহন। কী উচিত কী অনুচিত, সে কথা আজ আর ভেবে লাভ নেই।

ব্যাকুল হয়ে পূরবীর একটা হাত চেপে ধরে সুমোহন—আমি স্বপ্নেও আশা করিনি পূরবী, তুমি একথা বলবে। তুমি আমার একটা দুঃস্বপ্নের যন্ত্রণা শান্ত করে দিলে।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে পূরবী—আমি তোমাকে আর একটা অনুরোধের কথা বলব।

—বলো।

—তুমি নিজেও শান্ত হয়ে যাও।

—কী বললে?

—আমার হাত আর ধরো না। আমিও তোমার হাত আর ধরব না; আমিও একেবারে শান্ত হয়ে যাব।

হাত তুলে খোঁপাটাকে একটু তুলে দিতে গিয়ে হাত দিয়ে চোখ দুটোকেই ঢেকে ফেলে পূরবী—তুমি আর আমি, দুজনে মিলে একটি বই লিখব, এই সম্পর্কই চিরকাল অটুট থাকুক।

—শুধু, এই সম্পর্ক?

—হ্যাঁ। এই ছাড়া তো আর কোনও সম্পর্ক হতে পারে না।

—খুব পারে।

—কেমন করে? তোমার সঙ্গে তো আমার বিয়ে হতে পারে না।

—হতে পারে, পূরবী।

—যিনি তোমার ঘরে এখন আছেন, তাঁকে কি মামলা করে সরাবে?

—না, ছাড়াছাড়ির মামলার মধ্যে আমি যাব না।

—তবে?

চেয়ার থেকে উঠে এসে পূরবীর মাথাটা বুকের উপর টেনে নিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে সুমোহন—শুধু একটু অপেক্ষা করতে হবে পূরবী। আমি বলছি, আমার মন বলছে, আমাদের বিয়ে হবে।

পূরবী—তোমার কথার মানে তবে কি এই যে, তোমার ঘরের মহিলা নিজেই সরে যাবেন?

সুমোহন—আমার তো তাই মনে হয়।

পূরবীর চোখ দুটো এখন আর হাতে ঢাকা নেই। খুব শান্ত আর খুব উজ্জ্বল দুটি চোখ। সুমোহনের মুখেও সেই সাদাটে করুণতা আর নেই। রুমাল দিয়ে কপালটাকে মুছে দিয়েছে সুমোহন, কপালে কোন যন্ত্রণার রেখাও আর নেই।

পূরবী—বাড়ি থেকে বের হবার আগে চা খেয়েছিলে?

সুমোহন—হ্যাঁ।

পূরবী—তুমি কি গোমতেশ্বর যাবে বলে একেবারে ঠিক করে ফেলেছ?

সুমোহন—যাব ঠিকই, তবে খুব শিগগির যাওয়া সম্ভব হবে না। যদি পারি তো, একবার হাজারিবাগে গিয়ে বুড়ো আচার্য হরি শাস্ত্রীর কাছে গিয়ে আর আলোচনা করে কিছু তথ্য জেনে আসব।

পূরবী—কে হরি শাস্ত্রী?

সুমোহন—ইওরোপের ইণ্ডোলজিস্ট মশাইরা যাঁর কাছে চিঠি লিখে ভুরি ভুরি তথ্য জেনে নেন, তিনিই হলেন হরি শাস্ত্রী।

পূরবী— আমার খুব ইচ্ছে ছিল দেশে ফিরে আসবার আগে লণ্ডন থেকে একবার হামবুর্গে গিয়ে ডক্টর আল্ডশ্রফের সঙ্গে দেখা করে আসি।

সুমোহন—আমারও খুব ইচ্ছে ছিল।

পূরবী—দুজনেই যদি আরও কিছুদিন বিদেশে থাকতাম, তবে খুব ভাল হত।

সুমোহন—ঠিকই, একটা প্ল্যান করে দুজনে একসঙ্গে আরও কয়েকটা দেশের মিউজিয়ম দেখলে খুব উপকার হত।

পূরবী—আমার আর প্যারিসের লুভর্ দেখা হল না।

সুমোহন হাসে—কিসের জন্যে? মিলোর হাতকাটা ভেনাসকে দেখতে?

পূরবী—নিশ্চয় দেখতাম।

সুমোহন—কী স্টাডি করতে? ভেনাসের বডি-বিউটিফুল? গড়নের ধাঁচ আর স্টাইল?

পূরবী—তা তো করবেই আর্ট-ক্রিটিক।

—তুমি নিজেও তো একটা বডি-বিউটিফুল। কিন্তু তোমার নিজের গড়নটিকে কখনও কি স্টাডি করেছ, অয়ি আর্ট-ক্রিটিক।

—করেছি।

—কিন্তু বুঝতে পেরেছ কি ভেনাসের গড়নের সঙ্গে তোমার কোনও মিল আছে কিনা?

—খুব বুঝেছি, কোনও মিল নেই।

—আমি কিন্তু বুঝেছি, কার সঙ্গে তোমার খুব মিল আছে?

—কার সঙ্গে?

—খাজুরাহোর গন্ধর্ববধূর সঙ্গে।

—চুপ করো। বুঝতেই পারছ না বোধ হয়, কত রাত হয়েছে।

হাত-ঘড়ির দিকে তাকায় আর উঠে দাঁড়ায় সুমোহন—অ্যাঁ? তাই তো? —এগারোটা। আচ্ছা, আসি তবে। ইণ্ডিয়ান আইভরি সম্বন্ধে কিছু রেফারেন্স আমার চাই, আমার খুব দরকার। কষ্ট করে একটু খোঁজখবর করবে?

—বেশ তো, কিন্তু দু-একদিনের মধ্যে সম্ভব হবে না। অন্তত দুটো সপ্তাহ লাগবে?

—তা লাগুক। তাতে আমার অসুবিধে হবে না।

হর্ন বাজিয়ে, রাতের থিয়েটার রোডের বাতাস শিউরে দিয়ে চলে যায় সুমোহনের গাড়ি। আর, পূরবী হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ডাক দেয়—আয়া। জগমায়া কোথায় তুমি? ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

॥ ৪ ॥

চমকে ওঠে সুমোহন, বই বন্ধ করে আর তীব্র একটা দৃষ্টি তুলে হিমানীর দিকে তাকায়। হিমানীর হাতে একটা তোয়ালে, কোমরেও একটা তোয়ালে জড়ানো, সুমোহনের বই-এর ঘরে ঢুকে বই-এর ধুলো ঝাড়ছে হিমানী।

সুমোহনের ওই দৃষ্টিতে দুঃসহ একটা বিস্ময় আছে। হিমানীর হাত দুটো তো সেরকম রোগা হাত নয়, বেশ পুষ্ট দুটি চটপট হাত। সুমোহন বলে—কী ব্যাপার? জ্বরের মানুষ হঠাৎ বিছানা থেকে উঠে, আর এখানে এসে এরকম হুটোপুটি করছ কেন?

হিমানী হাসে—হুটোপুটি করছি না, কাজ করছি। আর, আমার গায়ে জ্বরও নেই।

—নেই? প্রশ্ন করতে গিয়ে সুমোহনের ভুরু কুঁচকে যায়।

—জান না?

—না।

—আজ একুশ দিন হল আমার জ্বর নেই। ডাক্তার বলেছেন, জ্বর আসবার ভয়ও আর নেই, ভাত ডাল মাছ পেঁয়াজ ভাজা, সব কিছুই খাচ্ছি।

—এ যে দেখছি অদ্ভুত জ্বর। আর ডাক্তারও বেশ অদ্ভুত কথা বলে।

কথা বলতে গিয়ে নিজের গলার স্বর কী অদ্ভুত হয়ে গেল, সেটা বোধ হয় বুঝতে পারে না সুমোহন।

হিমানী—আমি এখন এখানে কাজ করলে, তোমার পড়ার কি কোনও অসুবিধে হবে?

সুমোহন—হ্যাঁ, হবে।

হিমানী—তবে আমি এখন যাই?

সুমোহন—যাও।

হিমানী তো গেল, কিন্তু কতদূর গেল? এই পড়ার ঘর থেকে ওই ঘরে কিংবা ওদিকের ঘরে। এখানে বই -এর ধুলো ঝাড়তে এসেছিল হিমানী, এখন ওদিকের ঘরে গিয়ে মিররের ধুলো ঝাড়বে, কিংবা এক টুকরো শামোয়া-লেদার দিয়ে মিনে-করা জয়পুরি পেতলের টেবিল টপের ময়লা মুছে চকচকে করবে। জ্বর সেরে গিয়েছে যার, সে তো এই কাণ্ডই করবে। শুধু এ ঘর থেকে ও ঘরে, তারপর আবার ওদিকের ঘরে, ওর কাজ আর থামবে না।

বই খুলে আবার পড়তে চেষ্টা করলেও পড়তে পারে না সুমোহন। মনের ভেতরে একটা আশাভঙ্গ স্বপ্নের চাপা যন্ত্রণার গুঞ্জন শুনতে হচ্ছে, বই পড়া অসম্ভব।

কালই তো, অনেক রাত পর্যন্ত আইনের একটা বই পড়তে হয়েছে। কিন্তু সেই বইয়েও সেরকম কোনও স্পষ্ট আশার অঙ্গীকার নেই। আদালতের কাছে ছাড়াছাড়ির দরখাস্ত করতে, সেই দরখাস্ত মঞ্জুর করতে অনেক অসুবিধা আছে। আরও জটিল বিপদের জালে জড়িয়ে পড়বার, তা ছাড়া আরও বেশি ঠকে যাবার ভয় আছে।

বই বন্ধ করে একেবারে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে সুমোহন। দুই চোখ অপলক। নিঃশ্বাসও মন্থর। সুমোহনের প্রাণটা যেন একটা শূন্যতার গভীরে ডুব দিয়ে ডুবুরির মত সন্ধান করে দেখছে, সেখানে আইনের অক্টোপাস ছাড়া কোনও মুক্তা-ঝিনুক আছে কিনা। সত্যিই কি কোনও উপায় নেই?

কলিং-বেল বাজে। কে এল? চাকরটা শুনতে পেল কি? বাইরে গিয়ে একবার দেখতে হবে তো, কে এসেছে। ঘরের দরজার দিকে তাকায় সুমোহন। বুঝতে চায়, চাকরটা সত্যিই বাইরে গেল কি গেল না।

চাকর এসে একটা চিঠি দিয়ে যায়। সেই ডাকপিয়ন বোধ হয় এসেছিল, যার এক চোখ কানা। চিঠির বাক্সটাকে দেখতেই পায় না কানা ডাকপিয়ন, বার বার কলিং-বেল বাজায়।

চিঠির কভার দেখেই বুঝতে পারে সুমোহন, হাজারিবাগ থেকে চিঠি দিয়েছেন আচার্য হরি শাস্ত্রী। টেবিলের উপর রেখে দেয় সুমোহন। এমনই অলস হয়ে গিয়েছে সুমোহনের হাত যে, হরি শাস্ত্রীর চিঠিকেও লুফে নিতে পারে না, ব্যস্ত হয়ে খুলতেও পারে না। এ ঘরে এমন কেউ নেই যে, হরি শাস্ত্রীর ওই চিঠি দেখে, সেই মুহূর্তে উৎসুক হয়ে, ব্যস্ত হয়ে চিঠি খুলবে আর পড়বে। উৎসুক হতে পারে যে, ব্যস্ত হয়ে এই চিঠি খুলে ফেলতে আর পড়ে ফেলতে পারে যে, সে এখানে থাকে না।

কিন্তু সে কি কোনওদিনও এখানে আসতেই পারবে না? এই বই-এর ঘরে, এই সোফাতে সুমোহনের পাশে বসে কথা বলবে না? এই তো এই সেদিনও, দুপুরবেলা এই সোফাতে বসে বই পড়ে যখন সুমোহনের ক্লান্ত চোখে একটা তন্দ্রা এসেছিল, তখন তো মনেই হয়েছিল পাশে বসে আছে পূরবী; ইস্টার্ন আর্ট জার্নালে পূরবীর যে লেখা বের হয়েছে, সেই লেখাটা সুমোহনকে পড়ে শোনাচ্ছে। তবে কি শুধু এরকম একটা নিছক তন্দ্রাসার জীবন নিয়ে পড়ে থাকতে হবে?

কলিং-বেল বাজে। কে এল আবার? চাকরটা বাইরে গেল কি?

হিমানী এসে বই-এর ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। —বিকাশদা এসেছেন।

সুমোহন—কে বিকাশদা?

হিমানী—মনে পড়ছে না?

সুমোহন—না।

হিমানী—তোমারই শুভা বৌদির মেজদা। পাটনাতে একদিন যাকে টেনিসে চ্যালেঞ্জ করে তুমি পাঁচবার হেরে গিয়েছিলে।

সুমোহন—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ভাগলপুরের শুভা বউদির দাদা, বিকাশ। কিন্তু এতদিন পরে আজ হঠাৎ.....জিজ্ঞাসা করেছ, কিসের দরকারে এসেছে?

হিমানী—আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। নিজেই বললেন, তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বাইরের ঘরে বসে আছেন।

সুমোহন—এখানেই নিয়ে এসো।

বিকাশকে ডেকে আনতে চলে যায় হিমানী। আর, সেই মুহূর্তে সুমোহনের চোখে যেন একটা বিদ্যুতের আভা ঝিলিক দিয়ে চমকে ওঠে। প্রবল আশার আবেগে ভরা বিদ্যুৎ।

বিকাশ এসে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াতেই হেসে ওঠে সুমোহন—এসো বিকাশ।

বিকাশও খুব খুশি হয়ে হাসে। —চিনতে পারছ তাহলে। ভয় ছিল, ভুলেই গিয়েছ বোধ হয়। সত্যিই তো, ভুলে যাবারই কথা। সেই কবে প্রায় দশ বছর আগে পাটনাতে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল। তা-ও বা কটা দিন? দুটি কি তিনটি। শুভা বললে, তুমি বিলেত থেকে ফিরে এসেছ, তোমার এই ঠিকানাও শুভার কাছে পেলাম।

সুমোহন—তুমি এখন কোথায় আছ?

বিকাশ—এই কলকাতাতেই।

—কিছু একটা করছ নিশ্চয়।

—হ্যাঁ, এখন একটা ক্লথ মিলের ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আছি। ডিরেক্টর নই, নিতান্ত অফিসার।

—তা মন্দ কী? সবাই তো আর সুমোহন দত্তের মত কুঁড়ে হয়ে দিন কাটাতে পারে না। কাজ করতেই হয়।

—ও কথাটি বলো না, সুমোহন। মনে করেছ আমি বুঝি কিছুই বুঝি না। শুভার কাছ থেকে সবই শুনেছি। লেখাপড়া তোমার ধ্যান ভজন প্রাণ। এ কি চারটিখানি

কথা। কতজনেই তো বিপুল পৈতৃক সম্পত্তি পাচ্ছে, কিন্তু শুধু ফূর্তি করে দিন কাটায়। তোমার মত কজন আছে যে, অনেক টাকার মানুষ হয়েও শুধু বিদ্যাচর্চাকেই জীবনের ব্রত করে নিয়েছে?

—তুমি কলকাতার কোন পাড়াতে থাক?

—এখান থেকে খুব দূরে নয়; টালিগঞ্জে।

—বাড়িতে আর কে আছেন?

—কেউ না।

—কেন? বিয়ে করনি?

—না।

—কেন?

—বিয়ে করবার কথা মনে করবারও সময় পাইনি। বিশ্বাস করো সুমোহন, চাকরির জন্য স্ট্রাগল্ করতে করতে আমার সাত-আটটা বছর কেটেছে। এখন যা-হোক তবু একটা স্থিতি পেয়েছি। মন্দ নয় চাকরিটা।

—এবার তবে আরও একটু স্থিতি লাভ করে ফেল।

—কীভাবে?

—বিয়ে করো।

—করে ফেলব হয়ত; কিন্তু সেজন্য খুব ব্যস্ত হয়ে উঠতে আমার ইচ্ছে করে না।

—শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে কত বয়স হল তোমার?

—বত্রিশ।

—তুমি তা হলে আমার চেয়ে মাত্র তিন বছরের ছোট? আমি মনে করেছিলাম, তুমি বড় জোর পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটি খোকা।

—অফিসের স্টাফের লোকেরা তাই মনে করে। সে জন্যে বেশ অসুবিধেও ভুগতে হয়।

—কী রকম?

—এই ধরো, অ্যাকাউণ্টসের সত্যেন, যার বয়স তেইশ বছরও হবে কিনা সন্দেহ, সে একটা সিনেমা-ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে এসে একটা অভিনেত্রীর ছবি দেখায় আর জিজ্ঞেস করে—চেহারাটা কেমন মনে হয় স্যার? পছন্দ হয় স্যার? বুড়োরা তো তুচ্ছ করেনই; আড়ালে বলাবলি করেন, কাজের কী বোঝে এই ছোকরা?

—টেনিস খেলবার নেশা এখনও আছে, না ছেড়ে দিয়েছ?

—ছেড়েই দিয়েছি। ভুলেও গিয়েছি।

—তাহলে সময় কাটাও কি করে?

—ওই বাড়ি থেকে অফিস, আর অফিস থেকে বাড়ি।

—তারপর?

—তারপর বিছানায় পড়ে রেডিও শুনি, নয় ঘুমোই।

—ছুটির দিনে?

—ছুটির দিনে দু-চারটে চিঠিপত্র লিখি, আর কুকুরটাকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি।

—আমার এখানে বেড়িয়ে গেলেই তো পারো।

—পারি বইকি। কিন্তু সেটা তোমার পড়াশোনার মস্ত ব্যাঘাত হবে।

—একটুও ব্যাঘাত হবে না। তুমি যখনই সময় পাবে, তখনই একটু কষ্ট করে এখানে চলে এসো।

—না না, কষ্ট করবার কিছুই নেই। বরং......

ঘরে ঢোকে হিমানী—বিকাশদার চা কি এখানেই নিয়ে আসব?

সুমোহন—হ্যাঁ, এখানেই নিয়ে এসো, কিন্তু শুধু কি চা?

হিমানী হাসে—না, শুধু চা কেন? খাবারও আছে। নিয়ে আসি।

আবার ঘরে ঢুকে, বিকাশের হাতের কাছের টেবিলের উপরে চা-খাবারের ট্রে নামিয়ে রেখে, নিজেও একটা কোচের উপর বসে পড়ে হিমানী—বিকাশদাকে সাত বছর আগে পাটনাতে যেমনটি দেখেছিলাম, আজও তেমনটি দেখছি।

সুমোহনের চোখের দৃষ্টিতে অদ্ভুত একটি প্রসন্নতা। সুমোহনের ডুবুরি প্রাণ যেন এতক্ষণে একটা মুক্তা ঝিনুক দেখতে পেয়েছে।

বিকাশের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে হিমানী। কত কথাই না জিজ্ঞাসা করছে হিমানী—ভাগলপুরে কবে গিয়েছিলেন?

বিকাশ—এই তো, গত মাসে। তাই তো তোমাদের ঠিকানা পেলাম।

হিমানী—শুভাদির মেয়ে সেই টুটু এখন নিশ্চয় খুব বড় হয়েছে?

বিকাশ—হ্যাঁ, স্কুলে পড়ছে।

হিমানী—আমার সঙ্গে আপনার প্রথম কবে দেখা হয়েছিল, বলুন তো?

বিকাশ—ভাগলপুরে, শুভার বাড়িতে। তুমি তো তখন মাত্র ফার্স্ট ইয়ার; নয় কি?

হিমানী—ঠিক।

বিকাশ—সেদিন শুভাদের বাড়িতে কী যেন একটা ব্যাপার ছিল?

হিমানী—টুটুর অন্নপ্রাশন। সেই জন্যই তো বাবার সঙ্গে আমিও ভাগলপুরে গিয়েছিলাম। শুভাদির সঙ্গে আমার সম্পর্ক তো শুধু এদের দিক দিয়ে নয়; ওদিক দিয়েও আছে। শুভাদি হলেন আমার বাবার এক মামাতো ভাইয়ের মেয়ে, নশু কাকার মেয়ে। নশু কাকা অনেকদিন আমাদের যসিডির নার্সারির এজেন্ট ছিলেন।

বিকাশের চা খাওয়া তো শেষ হয়েই গিয়েছে। এইবার সিগারেট ধরিয়ে উঠে দাঁড়ায় বিকাশ—আচ্ছা, আমি আজ তবে চলি, হিমানী, চলি সুমোহন।

সুমোহন—হ্যাঁ, এস। আবার এস, শিগ্‌গিরই এস। ভুলে যেও না যেন।

—না না, ভুলে যাব কেন?

|| ৫ ||

টালিগঞ্জ থেকে নিউ আলিপুর কতই বা দূর। কিন্তু তিনমাসের মধ্যে মাত্র তিনদিন সুমোহনের বাড়িতে এসে চা খেয়ে গিয়েছে বিকাশ। তবু বিকাশের উপর বেশ সন্তুষ্ট হয়েছে সুমোহন।

কিন্তু তার পরের মাসে সপ্তাহের প্রতি রবিবারেই এসেছে বিকাশ। অনেকক্ষণ ধরে হিমানীর সঙ্গে গল্প করেছে, চা খেয়েছে আর চলে গিয়েছে। শুনে খুব সন্তুষ্ট হয়েছে সুমোহন।

সুমোহন শুধু শুনতেই পায়, দেখতে পায় না, কবে বিকাশ এল আর গেল। হিমানী বলে. তাই শুনতে পায়, বিকাশদা এসেছিলেন। সারা দিনমান পড়ার ঘরে বসে থেকেও প্রাণটা যার আপনি-রঙিন দুটি ফুল্ল ঠোঁটের রক্তিমার কাছে পড়ে থাকে, সে তো সন্ধ্যা হলে নিজেই সশরীরে সেই রক্তিমার কাছে গিয়ে বিহ্বল হয়ে যায়। বিকাশ এসে সুমোহনের দেখা পাবে কেমন করে? বিকাশও যে সন্ধ্যাবেলাতেই আসে।

হঠাৎ কোনওদিনও যদি সকালবেলাতে চলে আসে বিকাশ, শুধু তবেই সুমোহনের সঙ্গে অনেক গল্প করে, অফিসের যত কাহিনী শুনিয়ে, তারপর চলে যায়।

একদিন আচমকা সুমোহনের পড়ার ঘরে ঢুকে একটা তর্ক বাধিয়ে তোলে হিমানী—আমাকে সিনেমা হাউসে ছবি দেখাতে নিয়ে যাবার জন্য তুমি বিকাশদাকে বলেছ কেন?

সুমোহন—বলেছি, তোমারই ভালর জন্য। তোমার তো আর আমার মত লেখাপড়ার কোনও কাজ নেই। ঘরের কাজও নেই বললেই চলে। তোমার সময় কাটবে কী করে? তাই বিকাশকে বলেছি....

হিমানী—না, আমি ছবি দেখতে যাব না। আমাকে ছবি দেখাবার জন্যে তোমার এতই ইচ্ছে যদি হয়ে থাকে, তবে নিজেই তো আমাকে নিয়ে যেতে পার।

—না।

—তবে আমার ছবি দেখে দরকার নেই।

হিমানীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই চোখ ফেরায় সুমোহন। ·চোখে শুকনো বাতাসের একটা ঝাপটা এসে লেগেছে। হিমানীর ওই মুখে সুমোহনের আশার কোনও লক্ষণ ছাপ নেই। হিমানীর এই ভাষাও যেন অচল-অনড় একটা প্রতিজ্ঞার ভাষা। কপাট খুলে দেওয়া হয়েছে, পথও দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবু সরে পড়তে চায় না কয়েদি; এ প্রায় সেইরকম একটা অদ্ভুত ব্যাপার।

আশা বলতে এই আশা যে, বিকাশ আসে। একদিন হিমানীর মুখের একটা কথা শুনে খুশিই হল সুমোহন—বিকাশদার কি কাজকর্ম নেই? আজকাল রোজই আসছেন। গল্প করবার কিছু নেই, তবু বিকাশদা গল্প করতে চেষ্টা করেন। এত সময় নষ্ট করতে পারে মানুষ!

আবার একদিন তর্ক। হিমানীর চোখে-মুখে একটা জ্বালা ছটফট করছে। হিমানী বলে—আমি একটা অন্ধ, না খোঁড়া?

সুমোহন—ঝগড়া করতে তৈরি হয়েছ বুঝি?

হিমানী—আমি তো নিজেই মার্কেটে যাই, কেনাকাটা করে ফিরে আসি। কোনওদিন তো কারও সঙ্গে যাবার দরকার হয়নি।

সুমোহন—তা তো জানি।

হিমানী—তুমি বিকাশদাকে এত ধরি-পড়ি করে অনুরোধ করেছ কেন, আমার মার্কেটে যাবার সময় আমার সঙ্গে থাকতে?

সুমোহন—তোমার একটু সাহায্য হবে, তাই বলেছি।

হিমানী—না, আমার কারও সাহায্যের দরকার নেই।

সুমোহন—দরকার আছে, তুমি বুঝতে পারছ না, তাই ওকথা বলছ।

আর কোনও কথা না বলে, চোখে-মুখে সেই জ্বালা নিয়েই বই-এর ঘর থেকে বের হয়ে নিজের ঘরে চলে যায় হিমানী। হ্যাঁ, এখন এই ঘরটাকে হিমানীর নিজের ঘর বলতে হয়। কারণ, ওটা এখন হিমানীর নিতান্ত একলা দরকারের ঘর। সকাল, দুপুর, রাত, এ ঘরের ভেতরে শুধু একা হিমানীরই ছায়া পড়ে। বিছানার খাটের কাছে সেই ছোট টেবিলটাও আর নেই, যে টেবিলের উপর এক গেলাস জল থাকত। মাঝরাতে তৃষ্ণার্ত মানুষটা, ক্লান্ত সুমোহন সেই জল খেয়ে আবার শুয়ে পড়ত। বিছানাতে শুয়ে পড়বার আগে সেই এক গেলাস জল রেখে দিত হিমানী। কোনওদিনও ভুলে যায়নি, ভুল হয়নি। কিন্তু আজ আর ভুলে যাবার কিংবা ভুল করবারও উপায় নেই। সেই যে বিলেতে গেল আর ফিরে এল সুমোহন, তারপর তার খাটের কাছে টেবিলের উপর এক গেলাস জল রাখবার দরকার বোধ করেনি হিমানী। সুমোহন তার বই-এর ঘরেই ছোট একটা খাট রেখেছে, সেই খাটের বিছানাতে ঘুমিয়ে জীবনের এক-একটি রাত্রি ভোর করে দেয় সুমোহন।

কী আশ্চর্য, একমাসের ছুটি পেয়েছেন বিকাশদা, ট্রেনে ফার্স্টক্লাস যাওয়া-আসা করবার একটা পাশও পেয়েছেন, তবু কলকাতা থেকে নড়লেন না। আগে তো গল্প করে কতবার বলেছেন, দিন পনেরোর ছুটি পেলে অন্তত আগ্রা গিয়ে তাজমহলটা একবার দেখে আসব। কিন্তু কই? আগ্রা যাওয়ার যে নামও করেন না বিকাশদা। জিজ্ঞাসা করলে শুধু বলেন—আর তাজমহল। বাদ দাও তাজমহল।

আর একদিন ঠিক আবার এই রকমই কথা বলে বিকাশ—পি. সরকারের ম্যাজিক দেখব বলে টিকিট কিনেছিলাম, কিন্তু নাঃ ইচ্ছে করেই আর দেখলাম না।

বুঝতে পারে না হিমানী, মানুষের শখের মনটাও এত সহজে দু-দিনের মধ্যে উল্টে-পাল্টে একেবারে অন্যরকম হয়ে যায় কেন? যা-ই হোক, বিকাশদার এই নিত্য-নিয়মিত আগমন এখন একটু থামলে ভাল হয়।

বিকাশের এই নিত্য-নিয়মিত আগমন কিন্তু একটুও থামে না। দেখে আরও অদ্ভুত লাগে হিমানীর, বাইরের ঘরে গিয়ে বসতে হিমানীর এত স্পষ্ট কুণ্ঠা চোখে দেখেও বিকাশ যেন বুঝতে পারে না। বাইরের ঘরে বসে ডাক দেয় বিকাশ—হিমানী, আমি এসেছি।

হিমানী ভেতরের ঘর থেকে জবাব দেয়—বসুন তবে, আমার একটু দেরি হবে।

একঘন্টারও বেশি সময় পার হয়ে যায়। ভেতরের ঘরে বসে, লেসের সুতো ও কাঁটা নাড়াচাড়া করে হিমানী, কিন্তু দশটা ঘরও বুনতে পারে কিনা সন্দেহ। তারপর ব্যস্ত হয়ে নয়, কিন্তু দায়ে পড়া একটা ইচ্ছার মত, আস্তে আস্তে হেঁটে বাইরের ঘরে আসে, আর দায়ে পড়া একটা শুকনো ভদ্রতার মুখরক্ষা করবার জন্য একটি কথাই বলে—কী খবর!

বিকাশ—আমার কাছে খবর বলতে তো ওই এক আপিসের খবর। সে খবর শুনে তোমার লাভ নেই, শুনতে ভালও লাগবে না।

হিমানী হাসতে চেষ্টা করে—ঠিকই বুঝেছেন।

বিকাশ—একটা কথা বলবার ছিল।

—বলুন।

—তোমাদের রেডিওটা ভাল বাজছে না বোধ হয়। রোজই শুনছি কেমন যেন ঘ্যার-ঘ্যার করছে।

—হ্যাঁ, খারাপ হয়ে গিয়েছে রেডিওটা।

—তবে দাও না রেডিওটা, আমি সারাবার দোকানে দিয়ে আসি। সারাই হয়ে গেলে আমি আবার গিয়ে নিয়ে আসব।

হিমানীর চোখে ছোট্ট একটা ভ্রুকুটি শিউরে ওঠে। —কে আপনাকে রেডিও সারিয়ে আনতে বলেছে?

—কেউ বলেনি।

—নিশ্চয় কেউ বলেছে, কেউ শিখিয়ে দিয়েছে। সত্যি করে বলুন তো?

—না না, কেউ বলেনি। সুমোহন, শুধু ওই দু-একবার তোমাকে ছবি দেখিয়ে আনতে, একটু বেড়িয়ে আনতেও বলেছিল। একবার বোধ হয় তোমার সঙ্গে মার্কেটে যাবার জন্যেও বলেছিল। কিন্তু আর তো কোনওদিনও কিছু বলেনি।

হিমানী—কিন্তু আপনিই বা আমার রেডিও সারিয়ে আনতে ব্যস্ত হবেন কেন?

বিকাশ—রোজই নিজের কানে শুনছি, রেডিওটা বাজে আওয়াজ করে; অথচ দেখছি, এই দশ দিনের মধ্যে কেউ রেডিওটা সারিয়ে আনল না।

নীরব হয়, গম্ভীর হয় হিমানী। বিকাশদার এই ব্যস্ততা তো সুমোহনের ইচ্ছার একটা অভিনয় নয়। বিকাশদা নিজের ইচ্ছাতেই ব্যস্ত হয়েছেন। হিমানী বলে—আপনি মিছিমিছি ব্যস্ত হবেন না। রেডিও সারিয়ে আনবার ব্যবস্থা আমি নিজেই করতে পারব।

বিকাশ—বেশ তো, তাই করো। কিন্তু আমি ব্যবস্থা করে দিলে কি তোমার কোনও ক্ষতি হত?

হিমানী—না।

বিকাশ—তবে?

তবে এত গম্ভীর হয়ে, আর এত অদ্ভুত স্বরে কথা বলছেন কেন বিকাশদা? চমকে ওঠে না হিমানী, কিন্তু অস্বস্তি বোধ করে। সামান্য একটা কাজের কথা বলতে হলে এত গম্ভীর হতে হয় না; আর এরকম নিষ্পলক চোখ নিয়ে কারও মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবার দরকার হয় না।

বিকাশ চলে যায়। কিন্তু সেই বাইরের ঘরেই অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে হিমানী। সুমোহনের সঙ্গে তর্ক করবার কোনও যুক্তি নেই, কোনও মানেও হয় না। কিছুদিনের জন্য যসিডিতে গিয়ে থাকতে পারলে ভাল ছিল। কিন্তু যসিডিতে গিয়ে কি মনে কোনও শান্তি পাওয়া যাবে? শুধু কল্পনা করে কিছু বুঝতে পারা যাবে না, আর বিশ্বাসও হবে না, রোজই সন্ধ্যায় বাইরে বের হয়ে যান যে স্কলার, তিনি ভালয় ভালয় রাত্রিবেলায় বাড়ি ফিরে এলেন কিনা।

আজও যা, কালও তা। একটা একঘেয়ে সুরের ভাবনা আর একই রকমের ওঠা বসা ও শোওয়ার একটা জীবন নিয়ে হিমানীর দিন কেটে যেতে থাকে বটে, কিন্তু আর যেন সহ্য করতে ইচ্ছে করে না। যসিডির খোলা মাঠের রোদ-বাতাসের জন্য প্রাণটা ছটফট করে।

দেয়ালির রাত। তুবড়ি ফাটছে, ফানুস উড়ছে, আর আতসবাজির ফুলঝুরি ঝরে পড়ছে; বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আর আলো নিভিয়ে দেখতে থাকে হিমানী। এ এক অদ্ভুত খেলা। প্রথমে আলোর ঝলক, তারপরেই ছাই; শুধু ছাই।

ঠাকুর-চাকর সবাই বাইরে বের হয়েছে। দেয়ালির রোশনাই দেখবার জন্য ওরা আজ সব কাজ সন্ধ্যার আগেই সেরে দিয়ে গিয়েছে। আর স্কলার মশাই তো গিয়েছেনই, রোজ সন্ধ্যায় যেমন যান, যেখানে যান সেখানে। বাড়িতে কেউ নেই, মন্দ লাগছে না এই শূন্যতা।

আজ কিন্তু হিমানীর কল্পনাতে একটু ভুল হয়ে গিয়েছে, যদিও সেটা কল্পনার দোষ নয়। আজ বই-এর ঘরে চুপ করে বসে আছে সুমোহন, ঘরে অন্ধকার। দেয়ালির রাতের এইসব আলোর ঝলক আর চমক বোধ হয় সুমোহনের আজ একটুও ভাল লাগছে না। কিংবা হতে পারে, বুড়ি সৌদামিনীর ঘরে আজ সন্ধ্যায় পুরবীর নেমন্তন্ন হয়েছে, সেইজন্যেই বের হয়নি সুমোহন।

আতসবাজির একটা টুকরো অঙ্গার ছিটকে এসে বারান্দার উপর পড়ে। বারান্দাতে আর না দাঁড়িয়ে, বাইরের ঘরে এসে বসে হিমানী। এ ঘরে অবশ্য একটি মার্কারি-আলো জ্বলছে। নীলচে আলো, তবু খুব জোরালো আলো। চাকরটা বোধ হয় ইচ্ছে

করে আজ রাতে এই ঘরেও একটা রোশনাই মাতিয়ে দেবার জন্য এই কাণ্ডটা করেছে।

চমকে ওঠে হিমানী। বিকাশদা এসেছেন। কী আশ্চর্য, এত বড় কলকাতার এদিক-সেদিক ঘুরে দেয়ালির আলো দেখবারও কি কোনও শখ নেই বিকাশদার মনে? তাজমহল, দেয়ালি আর পি. সরকারের ম্যাজিক, সবই কি এখানে, এই বাড়িতে?

ঘরের ভেতরে ঢুকে বিকাশ আজ আর হেসে কথা বলে না। সোফাতে বসেও ছটফট করে। সিগারেট ধরায়, কিন্তু সিগারেটের ধোঁয়া টানতে আর ছাড়তে ভুলে যায়। খুব আনমনা আর খুব উদাস, বিকাশের হাত থেকে সিগারেটও একবার ফসকে পড়ে যায়।

হঠাৎ সোফা থেকে উঠে দাঁড়ায় বিকাশ, হিমানীর কাছে এগিয়ে যায়। দুহাত বাড়িয়ে হিমানীর একটা হাত টেনে নিয়ে নিজের বুকের কাছে ধরে রাখে। —একটা কথা তোমাকে বলতে চাই; শুনে রাগ করবে না বলো, তবে বলব।

হাত সরিয়ে নিয়ে বিকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে হিমানী। হিমানীর চোখ দুটো থরথর করে কাঁপছে, সেই সঙ্গে কী তীব্র একটা ভর্ৎসনার দৃষ্টি কাঁপছে। —রাগ করেছি, আপনি আর কোনও কথা বলবেন না।

সেই মুহূর্তে থরথর করে কাঁপতে শুরু করে বিকাশের সেই শক্ত পোক্ত চেহারা। এইবার দুহাত বাড়িয়ে, আর হিমানীর দুই হাঁটু ছুঁয়ে, অদ্ভুত এক ভীরু-করুণ আর ফিসফিসে স্বরে যেন ফুঁপিয়ে ওঠে বিকাশ—ভুল হয়েছে। ঝোঁকের মাথায় খুব ভুল করে ফেলেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

হিমানী—আপনি বলুন, কেমন করে, কী ক্ষমা করতে পারি?

বিকাশ—কাউকে কিছু বলবে না। আর, আমাকে এখানে আসতে নিষেধ করবে না।

হিমানী—বাঃ! খুব চমৎকার ক্ষমার কথা বললেন।

বিকাশ—আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আর কোনদিন কখনও আমার ভুল হবে না। যদি দেখ, আমি কখনও একটু বাজে কথা বলেছি, তবে তখনি আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিও।

জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে থাকে হিমানী।

বিকাশ বলে—আমাকে আর ভয় করো না, বিশ্বাস করো, আমি তোমার ক্ষতি করব না।

নিরেট পাথরের একটা মূর্তির মত নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে হিমানী। রুমাল দিয়ে ঘষে ঘষে কপালের ঘাম মোছে বিকাশ। তারপর চলে যায়।

ভেতরের দরজার পর্দাটা কেঁপে ওঠে না, কিন্তু কেঁপে ওঠে পর্দার ওদিকের একটা ছায়া। আলোহীন করিডরের মেঝের উপর দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ধরে পর্দার আড়াল

থেকে বাইরের ঘরের ঘটনার দৃশ্যটাকে দেখছিল যে সুমোহন, আর কেউ নয়, স্বয়ং সেই সুমোহনই হতাশ হয়ে তার বাইরের ঘরে চলে গেল। একটা সত্যি ফাঁসির দৃশ্য দেখতে পাবে বলে আশা করে শুধু একটা কথা কাটাকাটির দৃশ্য দেখতে পেল। সুমোহনের হাতে শক্তিশালী জাপানি ক্যামেরা হতাশ হয়ে আর শিথিল হয়ে ঝুলছে। বাইরের ঘরের একটা চেয়ারের উপর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে সুমোহন।

॥ ৬॥

থিয়েটার রোডের জোড়া গুলমোরের অভ্যর্থনা একটুও ক্লান্ত হয় না। পূরবী রায়ের সোনার ফ্রেমের চশমাও ঝিকমিক করতে ভুলে যায় না। সুমোহনের দুই চোখে করুণ বিষাদের যে ছায়া লেগে আছে, তা-ও পূরবীর চোখে পড়ে না। পূরবীর দুই চোখ তেমনই উজ্জ্বল হয়ে রোজ সন্ধ্যায় সেই আগন্তুক মানুষটিকে অভ্যর্থনা জানায়, যে এখন শুধু একবেলায় অতিথির মত আসে আর চলে যায়, একদিন যার হাত ধরে আর চিরকালের আপনজন হয়ে তারই জীবনের সঙ্গে চলে যেতে হবে। তাই সুমোহনের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে পূরবী—মনে হচ্ছে, অনেক রাত পর্যন্ত পড়েছ কিংবা লিখেছ, ভাল ঘুম হয়নি।

শুনে খুশি হয় সুমোহন। পূরবী বুঝতে পারেনি। পূরবী কিন্তু সন্দেহও করেনি। সুমোহনের হতাশ চোখের বিষাদটাকে ঘুমহারা ও রাতজাগা একটা ক্লান্তির ছায়া বলে মনে করেছে।

এক হিসাবে পূরবীর সন্দেহটা একটুও মিথ্যে নয়। ঘুম হয় না, অনেক রাত পর্যন্ত জেগে জেগেই সময় ফুরিয়ে যায়। শুধু ভেবে ভেবে আর নিঃশ্বাসের একটা ছটফটে কষ্টকে চেপে চেপে সুমোহনের শরীরের সঙ্গে প্রাণটাও যেন ক্লান্ত হয়ে পড়তে থাকে, সারা রাত পার হয়ে যায়। শুধু বিষাদ নয়, একটা যন্ত্রণাও বটে। এক এক সময় মনে হয়, এই ঘরের সব বই পুড়ে গিয়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আর লেখার খাতা ও ফাইলগুলিকে পোকাতে কুরে কুরে খাচ্ছে। এই যন্ত্রণার ভয় তাদের জীবনে নেই, লেখাপড়া যাদের জীবনের সবচেয়ে প্রিয় আর সবচেয়ে বড় আনন্দ নয়। তারা বেশ আছে।

অনেকদিন আগেই ডায়েরি লিখবার অভ্যেস ছেড়ে দিয়েছে সুমোহন, তা না হলে আজ এই যন্ত্রণার অকপট কথাগুলিকে ডায়েরিতে লিখে ফেলতে পারত। এই যন্ত্রণার প্রথম কথা এই যে, হিমানী ওর নিজেরই জীবনের সমস্যাটাকে একটুও বুঝতে পারছে না। যার কাছে থাকলে হিমানীর কোনও লাভ হবে না, জোর করে তারই কাছে পড়ে থাকতে চাইছে। হিমানী তো এই তিন-চার মাসের মধ্যে আর কোনওদিনও এই বই-এর ঘরে আসেনি। সন্ধ্যা হতেই সুমোহনের বাইরে বের হয়ে যাবার সময়ও কোনও ডাক ডেকে কিংবা প্রশ্ন করে বাধা দেয়নি। হিমানী তো খুব ভাল করেই বুঝতে পেরেছে যে, তার কাছে সুমোহনের কোনও কিছুই আশা এখন আর কোনও দাবি করে না। আজ হিমানী এখানে একটা নিরর্থক অস্তিত্ব মাত্র।

যার কাছ থেকে ভালবাসা পাওয়ার কোনও ভরসা নেই, যাকে ভালবাসা দেবারও কোনও ভরসা নেই, তারই কাছে শুধু পাশের ঘরের একটা অচল অনড় পাথর হয়ে পড়ে থাকা একটা একগুঁয়েমি হতে পারে, কিন্তু সেটা জীবনের প্রতি কোনও নিষ্ঠার ব্যাপার নয়। বিকাশকে ভালবাসলে কি হিমানীর কোনও ভুল হত? কোনও ভুল হত না। একটুও না। যেখানে সব আছে, সেখানে হাত বাড়িয়ে উপহার নেবে না হিমানী, আর যেখানে কিছুই নেই, সেখানে হাত বাড়িয়ে উপহার আশা করবে? এ এক অদ্ভুত মনের বিকার।

না, আজ নিজেরও কাছে এ কথা বলবে না সুমোহন যে, পূরবীর শুধু লেখাপড়ার জীবনটাই সুমোহনের চোখের ও প্রাণের মায়া হয়ে উঠেছে। পুরবীর চোখের দীপ্তি, মুখের হাসি আর লালচে দুটো ঠোঁটও একটি মায়া। তর্ক করলে বলা চলে, চোখের অমন দীপ্তি, মুখের অমন হাসি আর অমন লালচে ঠোঁট হিমানীর না থাকুক, পৃথিবীর কোনও মেয়েরই কী নেই?

আছে, নিশ্চয় আছে। কিন্তু দেখতে একই রূপের ও রকমের হলেও সব মায়ার কি একই স্বাদ? স্বাদটা একই রকম হতে পারে বটে, কিন্তু একই রকম তৃপ্তি হতে পারে না। সুমোহনের প্রাণের অভিরুচি যে তৃপ্তি পেতে চায়, সেটা সুমোহনের বিদ্যাবস্তু জীবনের সহচরী ও সতীর্থা উচ্চশিক্ষিতা পূরবী নাগেরই চোখে মুখে ও হাতে, বুকেতে গলাতে ও খোঁপাতে আছে।

হিমানীর জন্য দুঃখ হয়। নিজেরই জীবনের সম্মানের জন্য হিমানীর প্রাণে একটুও আগ্রহ কিংবা সামান্য চেষ্টাও নেই। বিকাশের সঙ্গে হিমানীকে যে কত ভাল মানায়, আর মানিয়ে নিতে পারলে কত ভাল হয়, এই নিরেট বাস্তব সত্যটাকে চোখেই দেখতে পায় না হিমানী, ইচ্ছে করেই নিজেকে অন্ধ করে রেখেছে।

যন্ত্রণা এই যে, সুমোহন আজ হিমানীর জীবনের সুখের পথের কোনও বাধা নয়, হিমানীই সুমোহনের জীবনের সব সুখের পথের বাধা। বিকাশ যদি হিমানীকে ভাল না বাসত, তবে না হয় বলা যেতে পারত যে, হিমানীর সুখী হবার কোনও পথ নেই। কিন্তু তা তো নয়। হিমানী ইচ্ছে করলেই বিকাশকে বিয়ে করে সুখী হতে পারে। সুমোহনের যন্ত্রণা এই যে, তুচ্ছ হয়ে আর অবমাননা মেনে নিয়েই এখানে পড়ে থাকবার, আর মিথ্যে আশার স্বপ্ন দেখবার একটা মোহের মধ্যে সুখী হয়ে রয়েছে হিমানী।

এই তিন-চার মাসের মধ্যে সুমোহনের নামে অনেক চিঠি এসেছে। সেসব চিঠির জবাবে শুধু একটি চিঠিই লিখেছে সুমোহন—আপনারা শুধু উদ্বিগ্ন হয়ে চিঠি দিচ্ছেন। কিন্তু কেউ একবার এলেনও না। আমার সময় নেই। আপনাদের ওখান থেকে কেউ এসে যদি হিমানীকে এখন যসিডিতে নিয়ে যায়, তবে আপনাদের এত উদ্বিগ্ন হয়ে চিঠি লেখবার আর দরকার হবে না।

যসিডির চিঠির প্রশ্ন : হিমানীর জ্বর সেরেছে কিনা? এখন কেমন আছে হিমানী?

কবে হিমানীর আবার নতুন করে জ্বর হল, সেটা অবশ্য জানে না সুমোহন। কিন্তু জানতে ও বুঝতে পেরেছে যে, হিমানীর সেই পুরনো জ্বর দেখা দিয়েছে। মাঝে মাঝে ডাক্তার আসছেন আর চলে যাচ্ছেন, দৃশ্যটা নিজের চোখেও দেখেছে সুমোহন। কিন্তু, নিজে একবার হিমানীর ঘরের ভেতরে গিয়ে হিমানীর অবস্থার আর জ্বরের অবস্থার খবর নেবার ইচ্ছে আর করে না। কারণ হিমানীর একরোখা মনের সেই ভয়ানক বিকারের কথাটা আর শুনতে ভাল লাগে না, সহ্য করতেও পারে না সুমোহন। তবু একদিন একবার নয়, পরপর তিনবার হিমানীর বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে আর বেশ শান্ত অনুনয়ের স্বরে কথা বলে সুমোহন—যসিডির মাঠের খোলা রোদ-বাতাস গায়ে লাগালে যে জ্বর সেরে যায়, সে জ্বর তাড়াতাড়ি সারিয়ে নিলেই তো পারো।

হিমানী—তার মানে, আমাকে যসিডিতে যেতে বলছ?

সুমোহন—হ্যাঁ।

হিমানী—না, আমি যাব না।

সুমোহন—তা হলে আমিও আর এসব চিঠির কোনও জবাব দিতে পারব না।

হিমানী—দিও না।

খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে ও তিক্ত মনে নিয়ে সেই যে হিমানীর ঘর ছেড়ে চলে এল সুমোহন, আর কোনওদিন সে ঘরের ভেতরে যায়নি।

কিন্তু হিমানীর ওই ঘর যে সুমোহনের জীবনে কোন ভরসার সঙ্কেত নয়, তা-ও জানে সুমোহন। এই আছে এই নেই, এই জ্বর যেন একটা চতুর ঠাট্টার খেলা। ভাবতে গিয়ে সুমোহনের সেই তিক্ত মনও লজ্জায় ভরে যায়। এ তো সুমোহনেরও মনের একটা বিকার। সুমোহনের বিষাদ যেন চুপে চুপে আর মুখ লুকিয়ে হিমানীর মৃত্যু কামনা করছে, যেন হিমানীর ওই জ্বরই চরম হয়ে উঠে সব সমস্যার সমাধান করে দেয়।

সুমোহনের মনের এই লজ্জাটা কিন্তু হিমানীকে ক্ষমা করতে পারে না। আজ সুমোহনের মনের ভেতরে ওই বিশ্রী কামনা যে এত সহজে, একটা খোলা দুয়ার পেয়ে ঢুকে পড়তে পারছে, সে তো হিমানীর একরোখা জেদের পরিমাণ। হিমানী সুমোহনের সুস্থ জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাসেরও ক্ষতি করেছে।

কিছুদিনের জন্য হিমানীর যসিডিতে গিয়ে থাকাও সুমোহনের কাছে কোনও আশার অঙ্গীকার নয়। যাবে আবার ফিরে আসবে হিমানী, সুমোহনের এই বাড়ির জীবনে সেটাও একটা চতুর ঠাট্টার লুকোচুরির খেলা।

বিকাশ আসছে। কিন্তু এই বিকাশও একটি ভীরু সঙ্কোচ; সাহস করতে গিয়ে সেই মুহূর্তে হাঁটু ছুঁয়ে ক্ষমা চেয়ে ফেলেছে আর প্রতিজ্ঞা করেছে, না, আর কখনও এমন ভুল আর হবে না। বিকাশ এখন একটি অনুতপ্ত অভাজন। মাঝে মাঝে আসে, বাইরের ঘরে চুপ করে বসে থাকে, চা খায়, খবরের কাগজ পড়ে, আর চলে যায়।

এই বাড়িতে এখন যেটুকু অভ্যর্থনা পায় বিকাশ. সেটুকু এই বাড়ির চাকরটারই

ইচ্ছা আর অনুগ্রহের দান। বিকাশ জিজ্ঞাসা করে—জ্বর কমেছে? চাকর বলে—না। বিকাশ জিজ্ঞাসা করে—ডাক্তার এসেছিল? ওষুধ আনা হয়েছে? চাকর বলে—হ্যাঁ। ব্যস্, শুধু এইটুকু জানাই যথেষ্ট। হিমানীর ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াবারও কোনও দরকার বোধ করে না বিকাশ। এই বাইরের ঘরে বসে দিনরাত ধ্যান করলেও কিছু আসে যায় না।

জানে সুমোহন, চাকরই গিয়ে ডাক্তারকে খবর দেয়। চাকরই ওষুধ আনে। এই কাজটুকু তো বিকাশও করে দিতে পারত। হিমানীও চাকরের মুখে শুনতে পেয়েছে যে, বিকাশবাবু এসেছেন, বাইরের ঘরে বসে আছেন। কিন্তু ওই শোনাটুকুই সার। হিমানী ভুলেও কখনও চাকরটাকে বলেনি যে, বিকাশবাবু যদি এসে থাকেন তবে তাঁকেই বলো, যেন ডাক্তারকে একটা খবর দিয়ে আসেন। বিকাশের কথা ভেবেই দুঃখ বোধ করে সুমোহন। হিমানীর জ্বর থাকলেই বা কী, আর সেরে গেলেই বা কী? বিকাশের জীবনে কোনও আশার সংকেত ফুটে উঠবে না। বিকাশ যে নিজেই সব আশা ছেড়ে দিয়ে একটা শান্ত-দান্ত মুক্ত পুরুষ হয়ে গিয়েছে।

পূরবী, আশ্চর্য এই পূরবীর প্রাণটা, কোনও দিনও আর কোনও মুহূর্তেও জিজ্ঞেস করল না যে, তুমি যে আশার কথা বলেছিলে, সে আশার কী হল? কিন্তু আজ যদি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে ফেলে, তবে কী জবাব দেবে সুমোহন? সত্য কথাটা বলতে হলে বলতে হবে যে, হিমানীর গায়ের সেই পুরনো জ্বরটাকে একটা মরণ-জ্বর বলে সন্দেহ হয়েছিল, ও ডাক্তার ভাদুড়ীও একদিন একেবারে স্পষ্ট করে ওই কথাই বলেছিলেন, তাই সেদিন সুমোহন এত স্পষ্ট করে পূরবীকে এই কথা বলেছিল—হ্যাঁ, আশা আছে।

ডাক্তার ভাদুড়ীর এই অভিমত যে বর্ষাকালের ফর্সা সকালবেলার মত একটা ক্ষণ-ভঙ্গুর ছলনা হতে পারে, সেদিন এমন সন্দেহ করতে পারেনি সুমোহন। কিন্তু মাত্র দশদিন পরেই বুঝতে হয়েছিল, হিমানীর ওই জ্বর নিতান্ত একটা চতুর জ্বর। ডাক্তার ভাদুড়ী বললেন, না, এখন আমি নিঃসন্দেহ যে, সিরিয়াস ব্যাপার নয়, জ্বরটা হল মোর মেন্টাল দ্যান ফিজিক্যাল। বাঃ, স্পেশালিস্ট বিজ্ঞতার কী চমৎকার একটি নমুনা।

সেই ডাক্তার ভাদুড়ী তো আসছেন, হিমানীকে দেখছেন আর বেশ হাসিমুখেই চলে যাচ্ছেন। হিমানীর অদ্ভুত জ্বরকে বোধ হয় ওষুধের নাম করে শুধু মিষ্টি সিরাপ দিচ্ছেন ডাক্তার ভাদুড়ী। এই আর এক অদ্ভুত ছলনা। হিমানী বুঝতে পারছে না, মিষ্টি সিরাপ ওর জ্বর সারিয়ে দিলেও ওর জীবনের তিক্ততা একটুও সেরে যাবে না।

কিন্তু পূরবীর কাছে কোনও ছলনার ছায়াকেও আর থাকতে দেবে না সুমোহন। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, কিংবা মুখের কথাতেও একটু আবছায়া রেখে পূরবীকে একটা মিথ্যা আশার মোহ দিয়ে ভুলিয়ে রাখলে পূরবীর যতটুকু ক্ষতি হবে, তার শতগুণ বেশি ক্ষতি হবে সুমোহনের নিজেরই। ভালবাসার মধ্যে কোনও মিথ্যে রাখবে না

সুমোহন। সব কথা শুনে পূরবী যদি চমকে ওঠে, মুখ ফিরিয়ে নেয়, সুমোহনের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখতেও না চায়, তবে শুধু বলতে হবে, আমি তো কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছি না পূরবী, এবার তুমিই বলো, আমি কী করি? সব বই পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে আমি কি একটা নিঃসঙ্গ জীবনের ভিখারী হয়ে যাব?

থিয়েটার রোডের জোড়া গুলমোর সুমোহনের এই যন্ত্রণার কোন খবর রাখে না। তাই উতলা হয়ে মাথা দোলায়। আর সুমোহনও পূরবীর পড়ার ঘরে ঢুকে দেখতে পায়, হাতে বই, মুখে হাসি, কিন্তু দু চোখ বন্ধ, সোফাতে বসে আছে পূরবী।

সুমোহন—স্বপ্ন দেখে হাসছ নাকি?

চোখ খুলে আরও হাসতে থাকে পূরবী—হ্যাঁ।

সুমোহন—কিসের স্বপ্ন?

পূরবী—তুমি সেদিন যে অদ্ভুত কথাটা বলে চলে গেলে, সেই কথাটাই বার বার মনে পড়ছিল।

সুমোহন—কী কথা?

পূরবী—মনে করতে চেষ্টা করো।

সুমোহন—কত কথাই তো বলেছি, কত কথাই তো মনে পড়ে।

পূরবী—না, সব বাদ দিয়ে শুধু এই একটি কথাকে মনে করতে চেষ্টা করো।

সুমোহন হাসে—চেষ্টা করলেও মনে করতে পারব না।

পূরবী—খাজুরাহো! এইবার মনে পড়েছে?

সুমোহনের দুই চোখের দৃষ্টি সেই মুহূর্তেই মুগ্ধ হয়ে যায়। —হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কিন্তু মিথ্যে বলিনি।

হাতের বইটাকে খুলে একটা ছবির প্লেটের দিকে তাকায় পূরবী। —খাজুরাহোর মন্দিরের এই হাফ-রিলিফের মেয়ে-মূর্তির সঙ্গে আমার মূর্তির মিল তুমি কোন চোখে দেখতে পেলে? আমার মাথাতে কি এরকম একটা কবরীমুকুট কিংবা চূড়ো করে বাঁধা একটা খোঁপা আছে?

সুমোহন—না, তা নেই বটে।

পূরবী—তবে?

সুমোহন—কিন্তু ঠিক ওই রকমই ভঙ্গিতে ওয়েস্ট লাইন একটা ঢেউ হয়ে উথলে উঠে তারপর থাই লাইনের সঙ্গে.....। আচ্ছা, তবে সাধুভাষাতেই বলি।

পূরবী—বলো।

সুমোহন—ঠিক ওই রকমই ক্ষীণ-মধ্য, গুরু-ঊরু, সুডোল শ্রোণি-বলয় আর গভীর নাভিকুহর, সব মিলিয়ে একটি চমৎকার ভরাট কোমলতার আবেদন ছন্দিত করে রেখেছে।

পূরবী—চুপ করো, ঢের হয়েছে, কল্পনার মাত্রা নেই।

সুমোহন—কল্পনাতে কোনও ভুল নেই।

পূরবী—কী করে বুঝলে যে, ভুল নেই? আমি কি কখনও তোমার চোখের কাছে এই পাথুরে মেয়েটির মত একেবারে খোলামেলা নিলাজ মূর্তিটি হয়ে দাঁড়িয়েছি?

এগিয়ে এসে পূরবীর গা ঘেঁষে, আর পূরবীর গলা দুহাতে জড়িয়ে ধরে সুমোহন। পূরবীর কানের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে, একটি নিবিড় নিঃশ্বাসের আবেগে নিবিড় হওয়া স্বরে কথা বলে সুমোহন—আমার কাছে নিলাজ হতে কি তোমার আপত্তি আছে?

পূরবী—না।

॥ ৭ ॥

আশার হরিণ ঝরনার জল পান করেছে; সে বিষাদ আর নেই। কিন্তু আশার হরিণের প্রাণে তবু একটু খেদ আছে। সে ঝরনা এখনও দূরেই আছে। তার কাছে ছুটে ছুটে যেতে হয়, যদিও ছুটে যেতে কোনও বাধা নেই। পূরবী এখন সুমোহনের সব তৃপ্তির দায়িনী; দুঃখ শুধু এই যে, সে আজও সুমোহনের ঘরে এল না, কবে আসবে তাও কোনও ঠিক নেই। হয়ত কোনও দিনও আসতে পারবে না। ভবিতব্য যদি আর ছলনা না করে একটু করুণা করে, শুধু তবেই পূরবীকে এই ঘরে নিয়ে আসতে পারবে সুমোহন। এ ছাড়া সুমোহন তার ভাবনাতে ও কল্পনাতে আর কোনও ভরসার গুঞ্জন শুনতে পায় না।

পূরবী সত্যিই যে একটা বিস্ময়ের ফুলবনের সৌরভ। সুমোহনের কথা শুনে হেসে ফেলেছে পূরবী—এই কথা। এই কথা ভেবে তুমি এত লজ্জা পেয়েছ আর এত দুশ্চিন্তা করছ?

সুমোহন—আমি বিশ্বাস করেছিলাম, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবার সুযোগ শীগগিরই হবে।

পূরবী হাসে—কবে সুযোগ হবে?

সুমোহন—বুঝতে পারছি না।

পূরবী—কোনও দিনও সে সুযোগ হবে কি?

সুমোহন—তাও বুঝতে পারছি না।

পূরবী—একথা আজ না বলে সেদিন বলে দিলেই ভাল করতে।

সুমোহন—কবে?

পূরবী—মনে করে দেখো।

সুমোহন—তুমি বলো।

পূরবী—আমাকে সেই নিলাজ কথাগুলি বলবার আগে।

শুধু একটু গম্ভীর হয় পূরবী। চোখ মুছে নেয়। তারপরেই আবার হেসে ফেলে—যা হবার তা তো হয়েই গিয়েছে।

পূরবীর দুই হাত ধরতে গিয়ে সুমোহনের দুটি হাতও কেঁপে ওঠে। —আমার

ভুল হয়েছে। কিন্তু আমি ইচ্ছে করে অসাবধান হইনি, পূরবী। বিশ্বাস করো, আমি সেদিন তোমাকে ওই কথাই বলবার জন্যে এসেছিলাম। কিন্তু—

হাসতেই থাকে পূরবী—কিন্তু খাজুরাহোর ছবি সব ভুল করিয়ে দিল, তাই না?

সুমোহনের মাথাটা একটু হেঁট হয়ে পড়তেই পূরবীর মুখের হাসি আরও উজ্জ্বল হয়ে ডাক দেয়—শোনো।

সুমোহন—বলো।

পূরবী—আমার পাশে বসো।

সুমোহন পূরবীর পাশে বসে পড়তেই সুমোহনের হাতে হাত রাখে পূরবী। —একটুও দুঃখ করো না। যদি ভাগ্য থাকে, তবে তোমার ঘরে যাব, না থাকে যাব না। কিন্তু তুমি তো আসবে।

সুমোহন—চিরকাল আসব।

রোদের আলো যেমন করে আকাশের সব কুয়াশা মুছে দেয়, তেমনি করে সুমোহনের প্রাণের সব আক্ষেপ মুছে দিয়েছে পূরবী। যে ফুলবনের কাঁটা বিঁধবে বলে ভয় করেছিল সুমোহন, সে ফুলবনের শুধু সৌরভ পেয়েছে।

তবু বারবার কী যেন মনে পড়ে, আর মনে পড়তেই আবার একটা ছায়া-ছায়া বিষাদ এসে যেন চোখের কাছে দাঁড়ায়। বুঝতে পারে সুমোহন, এই তৃপ্তির মধ্যে মস্তবড় একটা শূন্যতা মুখ লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু কেন, কিসের ভয়ে, কার সুখ-অসুখের খেয়ালে এমন করে দুঃসহ একটা শূন্যতাকে সহ্য করবে সুমোহন?

যতক্ষণ বাইরে থাকে সুমোহন, ততক্ষণ পূর্ণ হয়েই থাকে সুমোহনের প্রাণ। নিউ আলিপুর থেকে থিয়েটার রোড, পথটুকু যেন নিত্য উৎসবের যাত্রাপথ। কিন্তু বাড়ি ফিরে এই বই-এর ঘরে ঢুকতেই সেই উৎসবের আনন্দটুকু যেন সেই মুহূর্তে শুকিয়ে যায়। বার বার শুনতে পাওয়া যায়, পাশের ঘরে বিছানাতে শুয়ে অদ্ভুত এক মানসিক জ্বর জোরে জোরে নিঃশ্বাস ছেড়ে ঘুমোচ্ছে। একটু বেশি অদ্ভুতই বলতে হবে, সেই জ্বর সামান্য একটু আর্তনাদও করে না। কোনও অস্থিরতা নেই, কোনও মুখরতা নেই। কী অদ্ভুত শান্ত হয়ে ঘুমোতে পারে হিমানী, যেন ওর জীবনে কোনও সমস্যার সামান্য দুঃখও নেই।

কিন্তু সুমোহন যে সত্যিই নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পারে না, আর ঘুমিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। একটা তন্দ্রা এসে পূরবীকে সুমোহনের বুকের কাছে শুইয়ে দেয়, তখন সুমোহনের দুই হাত চমকে ওঠে, নিঃশ্বাসও দুরন্ত হয়, কিন্তু পূরবীর গলা জড়িয়ে ধরতে গিয়েই সেই তন্দ্রা ভেঙে যায়। তারপর সে ঘুম আর আসতেই চায় না। ভুলতে পারে না সুমোহন, ভুলবে কেমন করে, তার মনে প্রাণ শরীরের সব তৃপ্তির উৎসব যে এখন থিয়েটার রোডের একটি ফ্ল্যাটের ঘরে একলা শুয়ে পড়ে আছে।

আবার জাগা চোখে একটা দুঃস্বপ্নের মত আর একটা ভাবনা। হিমানী নামে

একটা অনড় ও অবিচল অস্তিত্ব পাশের ঘরে ঘুমিয়ে রয়েছে। জ্বলতে থাকে সুমোহনের এই ভাবনাটাই। একটা আগুন হয়ে কিংবা বিষ হয়ে এখনই যদি পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকতে পারা যায়, তবেই জ্বালার শান্তি হতে পারে।

কিন্তু না, সে তো অসম্ভব একটা কল্পনার বিকার।

ঘুমিয়ে পড়তে চেষ্টা করে সুমোহন। ঘুমিয়েও পড়ে। কিন্তু স্বপ্নের ঘোরে, কিংবা কে জানে কিসের ঘোরে, সুমোহনের ঘুমন্ত শরীরটা অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করে। তারপর বিছানারই উপর উঠে বসে।

কে জানে কত রাত। কিন্তু বড় নিস্তব্ধ রাত। আর. যেন নিশির ডাক শুনতে পেয়েছে সুমোহন। আস্তে আস্তে হেঁটে, কোন শব্দ না করে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। পর্দা সরিয়ে কী যেন দেখে নেয়। তারপর, একটা অশরীরী ছায়ার মতন লঘু আর মৃদু হয়ে আরও এগিয়ে যায়। হিমানীর ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। হ্যাঁ, ঠিকই ঘুমিয়ে আছে যে, সে হিমানী ছাড়া আর কেউ নয়। রোগা হাত, ভাঙা গাল, একটা জঞ্জাল। তবু জোরে উঠছে নামছে এই জঞ্জালেরই বুকটা। নিঃশ্বাসে খুব জোর আছে।

সুমোহনের দুই চোখ যেন মাতালের চোখ। কটমট করে জ্বলছে। চোয়ালটা শক্ত হতে হতে যেন কাঠ হয়ে গিয়েছে। জঞ্জালটা এরকম করে বেঁচে থাকবে কেন? শেষ হয়ে গেলেই তো পারে।

হাত দুটোতে বিশ্রী রকমের কাঁপুনি লেগেছে। না, এভাবে এখানে শুধু দাঁড়িয়ে থাকলে কোনও লাভ হবে না। ডাক দিয়ে, হিমানীকে জাগিয়ে দিয়ে, শুধু একটু বলে দিয়ে চলে যাওয়াই ভাল—তুমি এখানে আর থেকো না। এই আমার শেষ কথা।

কিন্তু না, ওকথা বলবারই বা কী আর দরকার? চলে যায় সুমোহন। বই-এর ঘরে এসে সোফার উপর বসে পড়লেও ধড়ফড় করে ওঠে শরীরটা। বুঝতে পারে সুমোহন, গায়ের গেঞ্জিটা ঘামে ভিজে ঢোল হয়ে গিয়েছে। কপাল থেকে ঘামের ফোঁটা ঝরছে। কী আশ্চর্য, এত শ্রান্ত হবার তো কারণ নেই!

রাত আর কতটুকু বাকি? ঘরের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আর বাইরের দিকে একবার তাকিয়েই বুঝতে পারে সুমোহন, ভোর হয়ে গিয়েছে, ঝুর ঝুর করে বৃষ্টিও ঝরছে।

কিন্তু এই ভোরে বাড়ির গেট পার হয়ে কে আসছে এদিকে? বিকাশ? বিকাশের সঙ্গে উনি কে? ডাক্তার ভাদুড়ী?

ঝুর-ঝুর বৃষ্টি তুচ্ছ করে আর হন্‌হন্‌ করে হেঁটে যারা আসছে, তাদের এবার বেশ স্পষ্ট করেই দেখতে পায় সুমোহন। ঠিকই, বিকাশ আর ডাক্তার ভাদুড়ী এসেছে। বারান্দায় উঠে কথা বলছে দুজনে, সে কথার কিছু শব্দও শুনতে পায় সুমোহন।

অন্য দিন হলে কিংবা অন্য সময় হলে সুমোহন বিকাশের সঙ্গে ডাক্তার ভাদুড়ীকে

আসতে দেখেও নিজের ঘরেই বসে থাকত। কিন্তু আজ আড়াল হয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না। মনটাও যেন উদ্বেল হয়ে উঠেছে। কী ব্যাপার?

ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দাতে এসে দাঁড়ায় সুমোহন। ডাক্তার ভাদুড়ী শুকনো মুখে হাসি টানবার চেষ্টা করেন। —কী খবর আপনার? এত ভোরে জেগে উঠেছেন, মনে হচ্ছে রাত জেগে পড়াশোনা করেছেন।

বিকাশ একটা কাগজ সুমোহনের হাতে তুলে দিয়ে বলে—রিপোর্ট।

ডাক্তার ভাদুড়ী—আপনি বিচলিত হবেন না। ও রিপোর্ট এখন দেখারও কোন প্রয়োজন নেই। অন্য সময়ে দেখবেন।

সুমোহন তবু সেই রিপোর্ট পড়বার চেষ্টা করে। কিন্তু ডাক্তার ভাদুড়ী আবার বাধা দিয়ে বলেন—আপনি নার্ভাস মানুষ, আপনি এখন আপনার ঘরে গিয়ে বরং শুয়ে থাকুন। বিকাশবাবু যখন আছেন, তখন সব দরকারের কাজ ঠিক ঠিক হয়ে যাবে।

বিকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে সুমোহন—কী ব্যাপার?

বিকাশ—এখনই একটা ইঞ্জেকশন দরকার। দেখে আমারই কেমন সন্দেহ হল, হার্টের অবস্থা বোধহয় ভাল নয়।

সুমোহন—তুমি কি তাহলে এখানেই....।

বিকাশ—হ্যাঁ, সারা রাত এখানেই ছিলাম।

সুমোহন—সারা রাত এখানে কোথায় ছিলে তুমি?

বিকাশ—ওই বাইরের ঘরে। ওই যে, তুমি উঠে এসে হিমানীকে একবার দেখে নিয়ে চলে গেলে, ঠিক তারপরেই আমি এসে দেখলাম, আর সন্দেহ হল।

চমকে ওঠে সুমোহন—তোমাকে তা হলে খুব হয়রান হতে হচ্ছে।

বিকাশ—না না, হয়রান হব কেন?

ডাক্তার ভাদুড়ী ডাকেন—আসুন বিকাশবাবু।

বিকাশ আর ডাক্তার ভাদুড়ী এগিয়ে যেয়ে হিমানীর ঘরে ঢুকতেই সুমোহন নিজের ঘরে চলে যায়, আর রিপোর্ট পড়েই বুঝতে পারে যে, এইবার হিমানী সত্যিই চলে যাবার ছাড়পত্র পেয়েছে। ইরিটেব্‌ল্ হার্ট, ইনসোমনিয়া আর নিউরাইটিস। হাই ব্লাড প্রেসার হঠাৎ লো হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া লিভারের স্ফীতি, জমাট ব্রঙ্কাইটিস, আর ঘন ঘন সংজ্ঞাহীন আচ্ছন্নতা। জনডিসের আভাস আছে, হাঁপানির ভাবও আছে।

হয় ইচ্ছে করে, নয় ভুল করে রিপোর্টের কাগজের সঙ্গে আর একটা কাগজ দিয়ে ফেলেছে বিকাশ। হিমানীর হাতের লেখা ছোট্ট একটা টুকরো কাগজ—বিকাশদা, আজ চলে যাবেন না, একবার ভেতরে আসবেন।

হ্যাঁ, বিকাশও তাহলে হিমানীর ঘরের ভেতরে গিয়ে দাঁড়াবার হুকুমনামা পেয়ে গিয়েছে।

সবই তো বোঝা গেল, কিন্তু হিমানীর জন্য আর বিকাশেরও জন্য খুব দুঃখ হয়। বিকাশকে এত দেরিতে না ডেকে একটু আগে ডাকলেই তো ভাল করত হিমানী।

বেচারা বিকাশ অনেক অপেক্ষার পর যে সুযোগ পেল, সেটা তো শেষ মুহূর্তে হিমানীর শিয়রের কাছে শুধু একটু দাঁড়াবার সুযোগ। শত ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করলেও বিকাশ কি হিমানীকে ধরে রাখতে পারবে? রিপোর্ট তো বেশ স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিচ্ছে, পারবে না।

অনেকক্ষণ ধরে সুমোহনের মন আর শরীর দুই-ই অদ্ভুত এক অবসাদের ভারে অলস হয়ে পড়ে থাকে। পাশের ঘরে, করিডরে, বাইরের বারান্দায় অনেক পায়ের শব্দ বার বার দৌড়াদৌড়ি করছে, সবই শুনতে পায় সুমোহন, কিন্তু অবসাদের ভারে তবু একটুও চমকে ওঠে না।

অদ্ভুত অবসাদই বটে, যেন একটা বটের ছায়া, শ্রান্তি আর ক্লান্তির মানুষকে শান্ত করে দিয়ে তার দুই চোখ ঘুমে ভরিয়ে দেয়। সুমোহনের রাতজাগা শরীরটা খুবই ক্লান্ত, আর প্রাণটা তো পুরো একটি বছরের বিষাদ আর যন্ত্রণা সহ্য করে খুবই পরিশ্রান্ত। সোফার উপরেই বসে আর ঘুমের ঘোরে ঢুলে ঢুলে এই মেঘলা সকালের পুরো দুটি ঘন্টা পার করে দিয়েই চমকে ওঠে সুমোহন। চোখ খুলে তাকায়, আর দেখতে পায়, ঝলমলে রোদের আলোয় ঘরটা ভরে গিয়েছে। মেঘ নেই, ঝুরু-ঝুরু বৃষ্টিও নেই।

মনটাও আর ঝিমিয়ে পড়তে পারে না। অক্সফোর্ডের ব্ল্যাকওয়েলের কাছ থেকে নতুন বই-এর একটা বড় ক্যাটালগ এসে টেবিলের উপর পড়ে আছে। দুদিন হল এই ক্যাটালগ এসেছে। কিন্তু এই দুদিন মনটা এমনই বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিল যে, ওই ক্যাটালগ খুলে নতুন বই-এর নাম আর পরিচয়ের লেখাগুলির উপর একটু চোখ বোলাতেও পারেনি, ইচ্ছে থাকলেও পারেনি সুমোহন।

ব্যস্ত হাতে নতুন বই-এর ক্যাটালগ পড়তে থাকে সুমোহন। এই তো, ঠিকই, এইরকম একটি বই পেতে চেয়েছিল পূরবী। লেখকের নাম সি.এস.ম্যাক্সওয়েল; ভারহুতের প্রায় সব মূর্তির পরিচয় বিবৃত করে বেশ বড় একটি মনোগ্রাফ রচনা করেছেন।

তবে তো এখনই টেলিফোনে পূরবীকে খবরটা জানিয়ে দিতে হয়, —তুমি যা চাইছিলে পূরবী, ঠিক তারই খোঁজ পাওয়া গিয়েছে।

ব্যস্ত হয়ে বই-এর ঘর থেকে বের হয়ে আর বাইরের ঘরে এসেই দেখতে পায় সুমোহন, টেলিফোনে কথা বলছে বিকাশ। —ডাক্তার ভাদুড়ী নাকি! শুনুন, এখনও জ্ঞান ফিরে আসেনি। তবে নিঃশ্বাসটা স্বাভাবিক হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কী বললেন? মাথায় খুব ঠাণ্ডা জল? আর হাতে-পায়ে অল্প গরম জলের স্পঞ্জ? আচ্ছা!

বিকাশ চলে যেতেই টেলিফোনের রিসিভার হাতে তুলে নেয় সুমোহন। —কী করছ এখন? কী বললে? খুব আশ্চর্য? কেন? এই প্রথম টেলিফোনে তোমার সঙ্গে কথা বললাম বলে? হ্যাঁ, ভাল খবর আছে। ভারহুত সম্বন্ধে একটা ভাল বই-এর খোঁজ পেয়েছি।

খবর বলা শেষ হবার পরেও বই-এর ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকে সুমোহন। তারপর একটা কোচের উপর বসে পড়ে। বসেই থাকে। ধীর স্থির ও নীরব এই সুমোহন যেন একটা উৎকর্ণ কৌতূহল। হিমানীর ঘরের ভেতরে ব্যাকুল পরিচর্যার একটি উৎসব চলছে, তারই শব্দ শুনছে সুমোহন। স্টোভ জ্বলছে, শব্দ শোনা যায়। কেটলির শব্দ, বালতির শব্দ। ফরফর করে ন্যাকড়া কাপড় ছিঁড়ছে, তারও শব্দ। বোধহয় স্পঞ্জ তৈরি করছে বিকাশ।

টেলিফোন শব্দ করে বেজে ওঠে। রিসিভার হাতে তুলে কথা বলে সুমোহন। — হ্যাঁ, বলো.....আরে না, ঘুমিয়ে পড়িনি। খবরটুকু জানবার জন্যে তো আমি সেই তখন থেকে টেলিফোনেরই কাছে বসে আছি। .....সময় হবে বলছ? আজই বিকেলে? আচ্ছা!

শুনে খুশি হয় সুমোহন, বুড়ি সৌদামিনীর ঘরে আজ বিকেলে চায়ের যে নেমন্তন্ন ছিল, অনেক করে বলে-কয়ে সে নেমন্তন্ন কাটিয়ে দিতে পেরেছে পূরবী। আজই বিকেলে মিউজিয়মে যেতে সময় হবে পূরবীর।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সুমোহন। এই বাইরের ঘরে তো সুমোহনের কোনও কাজও আর নেই। কিন্তু চলে যাবার সময় বাধা পায়। দেখতে পেয়েছে সুমোহন, একটা অভাবিত আগমন যেন মিছিল হয়ে এগিয়ে আসছে। যসিডির বিধু সরকার আসছেন, যসিডির বড়দা আর বৌদি আসছেন। হন্তদন্ত সেই মিছিলের মুখগুলি বড় গম্ভীর।

বাইরের ঘরের ভেতর ঢুকেই বিধু সরকার একবার সুমোহনের মুখের দিকে তাকালেন, আর মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। বড়দা সুমোহনের মুখের দিকে একবার তাকিয়েও দেখলেন না। আর বউদি শুধু ভেতরের দরজার পর্দাটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

যেন ঘরের বাতাসটাকেই একবার জিজ্ঞাসা করলেন বিধু সরকার—বিকাশ কোথায়?

কিন্তু বাতাসের কাছ থেকে জবাব শোনবার আশায় কেউ আর দাঁড়িয়ে রইলেন না। পিতা পুত্র ও পুত্রবধূ একসঙ্গে ব্যস্ত হয়ে আর ভেতরের দরজার পর্দা ঠেলে হিমানীর ঘরের দিকে চলে গেলেন।

আর, সুমোহন সবেগে একটা পা ছুঁড়ে চেয়ারটাকে পেছনে ঠেলে দিয়ে, জোরে জোরে পা ফেলে, একটা দৃপ্ত তুচ্ছতার শব্দ তুলে তুলে তার বই-এর ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। দরজার কপাট চাপতে গিয়ে সুমোহনের সবেগ হাতটা ঘষে ঘষে শব্দ করে, কঠোর অবজ্ঞার শব্দ।

॥ ৮ ॥

মিউজিয়ম দেখা শেষ হল। ময়দানেও অনেকক্ষণ বেড়ানো হল। তারপর ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে আরও অনেকদূর. সুমোহনের গাড়ি যেন সন্ধ্যার বাতাস

পান করে আর খুশির নেশার মত একটা উল্লাস নিয়ে ছুটছে। গাড়িতে সুমোহনের পাশে ব্যস্ত হয়ে বসে থাকতে গিয়েও পূরবীর আল্‌গা খোঁপা যেন উতলা হয়ে বার বার সুমোহনের কাঁধের উপর লুটিয়ে পড়ছে।

একটা বাজারের কাছে এসে গাড়ি থামায় সুমোহন। গাড়ি থেকে বেরোয়।

আবার সেই থিয়েটার রোড, সেই জোড়া গুলমোর, আর সেই ফ্ল্যাটের সেই ঘর।

পূরবী বলে—তুমি সেদিন কী যেন একটা কথা বলছিলে?

সুমোহন—কবে?

পূরবী—সেদিন। মনে পড়ছে না বোধহয়? তুমি বলেছিলে, চিরকাল আসবে।

সুমোহন—হ্যাঁ। নিশ্চয় বলেছিলাম।

পূরবী হাসে—কথাটা কিন্তু ভাবার্থে অসমাপিকা।

সুমোহন—কী বললে?

পূরবী—বলা উচিত; চিরকাল আসবে আর চলে যাবে।

পূরবীর চশমার কাঁচ হঠাৎ ঝাপসা হয়ে যায়। হাত তুলে শক্ত করে কপাল টিপে ধরেছে পূরবী। দুই চোখ বন্ধ করে, আর ঠোঁটে ঠোঁট চেপে যেন একটা ব্যথা চাপতে চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। ফুঁপিয়ে উঠছে নিঃশ্বাস।

সুমোহন ডাকে—পূরবী, শোনো। একটা কথা শোনো।

চশমা খুলে কোলের উপর রেখে দিয়ে আর চোখ মুছে নিয়ে সুমোহনের মুখের দিকে তাকায় পূরবী। —সব শোনা তো হয়েই গিয়েছে। নতুন করে কী আর বলবে তুমি?

সুমোহনের গলার স্বর করুণ হয়ে যায়। —তুমি আজ হঠাৎ খুব বেশি দুঃখ করছ, পূরবী। কিন্তু আমার একটা কথা শোনো।

পূরবী—দুঃখ না করে পারব কী করে বল? তুমি শুধু চিরকাল আসতেই থাকবে, আর কোনওকালে আমাকে নিয়ে যাবে না, এ তো একটা ফাঁকির সঙ্গে আপোষ করা জীবন। সহ্য করতে খুব কষ্ট হচ্ছে।

সুমোহন—খুব সত্যি কথা। কিন্তু বিশ্বাস করো পূরবী, আর সহ্য করতে হবে না।

পূরবী—এ তো তোমার শুধু একটা আশার কথা।

সুমোহন—না, আমার বিশ্বাসের কথা। আমি জানি, আমি দেখেছি, আমি শুনেছি, আমার বিশ্বাসে একটুও ভুল নেই।

পূরবীর করুণ চোখ আবার উজ্জ্বল হয়ে হাসতে থাকে। সেই চোখে চুমো দিয়ে সুমোহনেরও দুই চোখ হেসে ওঠে।

আর বাড়িতে ফিরে এসে বারান্দার বাইরের ঘরের দিকে যাবার আগে সুমোহনের দুই চোখের হাসি একটা জ্বালার ছোঁয়া লেগে মুহূর্তেই শুকিয়ে মরে যায়। সুমোহনের ভ্রূকুটির সঙ্গে একটা তিক্ত ও বিরক্ত দৃষ্টি কাঁপতে থাকে।

যসিডির কুটুম্বের দল এখনও যায়নি। ওরা এখন হিমানীর ঘরের ভেতরে আছে।

দরজার পর্দার ওপর ওদের ছায়া নড়ছে। ওদের চাপা চাপা কথার টুকরো টুকরো ফিসফিসে শব্দও শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু ওরা যাবে কখন?

যার বাড়িতে এই তথাকথিত কুটুম্বের দল এসেছে, সে আজ ওদের কাছে একটি পুরনো চোখের চেনা মানুষ মাত্র, তার কাছে ওদের কোনও কাজ নেই। বিধু সরকারের কথাটাও বেশ স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, যসিডি এখন শুধু এক বিকাশকেই নতুন চোখে চিনেছে। খুব ভাল কথা। এই ভালটুকু কিছুদিন আগে হলেই তো আরও ভাল হত।

বুঝতে পারেনি সুমোহন যে, বিকাশ আর ডাক্তার ভাদুড়ীও এখন হিমানীর ঘরের ভেতরে বসে আছে। দুজনে বের হয়ে এসে আর বারান্দাতে সুমোহনকে দেখতে পেয়েই থমকে দাঁড়ায়। ডাক্তার ভাদুড়ী বলেন—এখন তো হিমানীকে যসিডিতে নিয়ে যাবার কোনও প্রশ্নই নেই, একেবারেই অসম্ভব। বিধুবাবু বলছেন, কলকাতারই কোনও নার্সিং হোমে নিয়ে গেলে ভাল হয়। আমি বললাম, কোনও দরকার নেই। বিকাশ একাই একশো নার্সিং হোম।

ডাক্তার ভাদুড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে আর সব কথা শুনেও সুমোহন কোনও কথা বলে না।

ডাক্তার ভাদুড়ী ডাকেন—চলো বিকাশ।

সুমোহনের ভ্রূকুটি আরও শক্ত হয়ে ওঠে। এই ভাদুড়ী ডাক্তার একটি অষ্টম আশ্চর্য। মাথার একদিক সাদা, আর একদিক কালো। মুখ দেখে বোঝা যায় না, মনে কী আছে। আর মাথানাড়া দেখে বোঝা যায় না, হ্যাঁ বলছেন কি না বলছেন। কোনও সন্দেহ নেই, এই ডাক্তার ভাদুড়ীই যসিডিতে চিঠি দিয়ে ওদের এখানে আনিয়েছেন।

—গোলাপ। আমার গোলাপ। আদর করে মেয়েকে ডাকছেন বাপ, বিধু সরকার। যসিডিতে নার্সারি আছে, ফুল বেচে অনেক টাকা রোজগার করেন ভদ্রলোক, তাই মেয়েকে ওই পয়মন্ত নাম দিয়েছেন।

চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে চেষ্টা করে সুমোহন, বাপের ডাক শুনে মেয়ে কি কোনও সাড়া দিতে পেরেছে? না, হিমানীর গলার কোনও সাড়া শোনা গেল না।

এগিয়ে গিয়ে বই-এর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় সুমোহন।

আর শ্রান্তি নেই, ক্লান্তিও নেই। ভবিতব্যের সঙ্কেত খুব স্পষ্ট করেই দেখতে পেয়েছে সুমোহন। সুমোহন আজ বিশ্বাসে উৎফুল্ল একটি অপেক্ষার প্রাণ। প্রাণ ফুরোবে কখন, আর ভোর হবে কখন? আজ না হয় কাল, কাল না হয় আর দুদিন পরেই বোধ হয় অপেক্ষার শেষে রাত ভোর হয়ে যাবে। মাঝরাত পর্যন্ত মন দিয়ে বই পড়তে পারে সুমোহন, আর বাকি রাতটুকু নিবিড় ঘুম ঘুমিয়ে নিতেও পারে।

ঠিক ভোর হতেই সুমোহনের ঘুম ভেঙে যায়। আর অদ্ভুত একটা কলরব শুনতে পেয়ে সুমোহনের মনের শান্তি বিষিয়ে যায়। বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে কুটুম্বের দল। কী আশ্চর্য, ওরা তবে সারারাত এখানে ছিল?

যসিডির বড়দা বলছেন—আমি তো প্রথম দেখলাম, চোখ খুলে তাকিয়ে আছে।

যসিডির বউদি বলছেন—কিন্তু তোমাকে নয়; সবার আগে আমাকেই চিনতে পেরেছে।

বিধু সরকার বলেন—ওঃ!

বড়দা —এখন যাওয়া যাক। আমি না হয় একটু আগেই চলে আসব, তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে তারপর আসবে।

চলে যাক, এখনি চলে যাক ওরা, এই বাড়িতে এসে হল্লা করবার অধিকার ওদের নেই। সুমোহনের তিক্ত বিরক্ত ও রুষ্ট মনটা গরগর করে।

সেই মুহূর্তে মন স্থির করে ফেলে সুমোহন, না, ওরা যতদিন এখানে আসবে থাকবে, ততদিন এ বাড়ির বাইরে থাকবে সুমোহন। হিমানীর ঘর নীরব হোক আগে, তারপর ফিরে আসবে। যারা মনে প্রাণে ও ইচ্ছায়, আর আশায় ভাষায় ও কলরবে সুমোহনের জীবনের কেউ নয়, তাদের হল্লা সহ্য করবার কোনও অর্থ হয় না। সুমোহনই বা তাদের সে সুযোগ দেবে কেন? ওদের নিজেদের জীবনের হল্লা শুনিয়ে সুমোহনকে তুচ্ছ করবার সুযোগ ওদের আর দেওয়া উচিত নয়।

আচার্য হরি শাস্ত্রী নিশ্চয় এতদিনে কাশী থেকে পুরুলিয়াতে ফিরে এসেছেন।

সকাল হতেই রওনা হয়ে গেল সুমোহন। এ তো যসিডির ওই হল্লার কোনও শাস্তি হল না, হল সুমোহনের নিজেরই শাস্তি। পূরবীকে দশটা দিন একটা শূন্যতার দুঃখের মধ্যে রেখে দিয়ে, আর নিজেও শূন্য হয়ে থেকে কি কোনও শান্তি পাবে সুমোহন? ওই সব হল্লা তো নীরব হয়েই যাবে, দশ দিনে না হোক বিশ দিনে। হল্লা শোনার গ্লানি থেকে পলাতক হতে গিয়ে পূরবীর কাছ থেকে পলাতক হওয়ার কোনও অর্থ হয় না। ওটা ভুল বুদ্ধির একটা নাটুকে কাণ্ড ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। বাড়ি ফিরে এসেই টেলিফোনে পূরবীকে খবর দেয় সুমোহন—যাওয়া হল না।

পূরবী হাসে—জানতাম, যাওয়া হবে না।

সন্ধ্যাবেলায় পূরবীকে যখন কাছে পায় সুমোহন, তখন পূরবী আবার হেসে ওঠে—এ কী পাগলামি করতে চলেছিলে?

সুমোহন—বাড়িতে থাকতে অসহ্য বোধ করছি।

পূরবী সুমোহনের হাতের কাছে একটা খবর-কাগজ এগিয়ে দিয়ে একটা বিজ্ঞাপন দেখায়—গেস্ট চাইছেন পার্ক স্ট্রিটের মিসেস উড। থাকবার ও খাওয়ার সব রকম সুবিধে আছে।

সুমোহন—তুমি বলছ?

পূরবী—আমি তো তাই ভাল মনে করি। বাড়ি যখন এত অসহ্য মনে হচ্ছে তখন কিছুদিন মিসেস উডের গেস্ট হয়েই থাক। যখন ইচ্ছে হবে, বাড়ি গিয়ে দেখে আসবে গোলমাল মিটে গেল কিনা।

সুমোহন—ঠিক কথা। আমি আজই আসতে চাই।

বুড়ি সৌদামিনীর ফ্ল্যাটে গিয়ে পূরবী নিজেই টেলিফোন করে আর চলে আসে—হ্যাঁ, মিসেস উড বললেন, আজই আসতে পারেন।

—তা হলে আমি এখন চলি, কেমন?

পূরবী—এসো।

একবার শুধু নিউ আলিপুরের বাড়িতে যাওয়া, আর একটা বাক্স ও কিছু বই নিয়ে নিজের গাড়িতে নয়, ট্যাক্সিতে করে পার্ক স্টিটের মিসেস উডের অতিথিনিবাসে চলে আসা; দুটি ঘন্টারও বেশি সময় লাগল না। সুমোহন তার এই নতুন নীড়ের ভেতরে সব যত্নেরই সুবব্যস্থা দেখতে পেয়ে খুশি হয়। কিন্তু হাসতেও ইচ্ছে করে। থাকতে কোনও অসুবিধে নেই বটে, কিন্তু যেন একটা পরিহাস আছে। অভিশাপে বিড়ম্বিত একটি জীবনের পরিহাস। সান্ত্বনা শুধু এই যে, এ শুধু দুদিনের বাসা। দুদিন না হোক বড় জোর ত্রিশটি দিনের বাসা।

কিন্তু দুদিন যেতেই সুমোহনের নতুন অভিযাত্রিক প্রাণটা যেন ছোট্ট একটা কাঁটার খোঁচা লেগে চমকে ওঠে। ছোট্ট একটা সন্দেহের কাঁটার খোঁচা। বাড়িতে গিয়ে বুঝতে পারে সুমোহন, নীরব হয়নি সে বাড়ির কোনও ঘর; শুধু নিজেরই ঘরটি নীরব হয়ে পড়ে আছে। আর যসিডির হল্লাও সরে যায়নি। বেশ স্পষ্ট করেই শুনতে পায় সুমোহন, বাইরের ঘরে বসে খিলখিল করে হাসছেন যসিডির বউদি। —কথাটা যেই না বলেছি, অমনি হেসে ফেলেছে; আমার হাতে একটা চিমটিও বসিয়ে দিয়েছে।

বিধু সরকার—কিন্তু এখনও তো একটা কথাও বলল না।

যসিডির বড়দা চেঁচিয়ে উঠলেন—বলেছে; বেশ স্পষ্ট করে বলেছে। তুমি শুনতে পাওনি, কিন্তু আমি শুনেছি।

বিধু সরকার—কী বলেছে?

বড়দা—বলেছে, নিয়ে চলো।

বিধু সরকার—সে তো এখন অসম্ভব।

বড়দা—কিন্তু সে কথা তো ওকে বলতে পারি না, আমি শুধু মাথা নেড়ে জানিয়েছি, হ্যাঁ, যাবি।

ভাবতে গিয়ে আশ্চর্য হয় সুমোহন, সেই রিপোর্ট কি তবে একটা পাগল ডাক্তারের প্রলাপ? হ'তে পারে। ডাক্তার ভাদুড়ীর মাথার ঠিক নেই, কথারও ঠিক নেই। কিন্তু আজই আর এত তাড়াতাড়ি এত বেশি সন্দেহ করবার কোনও মানে হয় না। ভবিতব্যের মেজাজে অসম্ভব সম্ভব হয় বটে, কিন্তু আবার সম্ভবও তো অসম্ভব হয়ে যায়।

আবার দশদিন পরে একবার; তারপর আবার পনেরো দিন পরে একবার, বাড়িতে এসেই চমকে উঠেছে সুমোহনের মন; ভবিতব্যটা বোধ হয় খুব চতুর এক বিশ্বাসহন্তা।

ডাক্তার ভাদুড়ী, বিকাশ, বিধু সরকার আর যসিডির সেই বড়দা ও বউদি; সবাই বাইরের ঘরে, যেন একটি আরামের আসরে বসে হাসাহাসি করছেন।

বিধুবাবু বললেন—আমার গোলাপ রইল তোমাদের কাছে, আমি এখন ফিরে গিয়ে আমার নার্সারির গোলাপগুলোর একটু দেখাশোনা করি।

ডাক্তার ভাদুড়ী—যান, একেবারে নিশ্চিন্ত মন নিয়ে চলে যান।

বড়দা—আমি বলি, বাবা তাঁর পুত্রবধূকেও সঙ্গে নিয়ে যান। ওর তো এখানে কোনও কাজ নেই, হিমির সঙ্গে শুধু ফস্টি-নস্টি করা।

বিকাশ হাসে—তা বললে কি হয়! বউদি কী চমৎকার বার্লি-সুপ তৈরি করে দেন, ওকাজ আমাদের কারও সাধ্যি নয়।

অসম্ভব প্রায় সম্ভব হতে চলেছে, তারই উল্লাসের কলরব শুনছে সুমোহন। যে প্রাণ চলে যাবার ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছিল, সেই প্রাণ এখন ছাড়পত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। এখন হেসে হেসে চিমটি কাটে, ফস্টি নস্টির কথা শোনে, বার্লি-সুপ খায়। হিমানী কি তবে একটা অঘটন ঘটন-পটিয়সী কায়া?

ভাবনাগুলি যেন পোকার মত সুমোহনের মনের শান্তি কুরে কুরে ধূলো ঝরিয়ে দিচ্ছে। বিশ্বাসটা বিদ্রূপ হয়ে মুখ লুকোচ্ছে।

আশার আকাশে শুধু একটি তারা এই যে, হিমানীর অসুখ যদি সেরে যায় তবে সে যসিডিতে চলে যাবে। কিন্তু ভয় এই যে, হিমানী আবার ফিরে আসবে। নিজেরই জীবনের অবমাননাকে ভয় করে না যে, একরোখা অর্থহীন সেই জেদ এবাড়িতে আসতেও ওর ভয় করবে না।

হিমানী যদি যসিডিতে থেকেই যায়, এ বাড়িতে আর কোনওদিনও না আসে, তবে তাতেই বা সুমোহনের জীবন ওই মিথ্যার বন্ধন থেকে কতটুকু মুক্তি পাবে? শুধু পূরবীর ওখানে যাওয়ার এই পথটুকু সুমোহনের জীবনে যেন নিত্য উৎসবের যাত্রাপথ। যাওয়া আর মনে প্রাণে ও দেহে একটি বিহ্বল পরিতৃপ্তি নিয়ে ফিরে আসা। কিন্তু পূরবীকে আপনজন করে এবাড়িতে নিয়ে আসবার অধিকার পাওয়া যাবে না।

বিকাশকেও একটা ভরসা বলে বিশ্বাস করা যায় না। বিকাশ শুধু দৌড়াদৌড়ি করে হয়রান হতে পারে, তাকিয়ে থাকতে পারে, হাত বাড়াতেও পারে, কিন্তু জোর করে ধরতে পারে না।

পার্ক স্ট্রিট থেকে রোজই সন্ধ্যায় থিয়েটার রোড কিংবা পার্ক স্ট্রিট থেকে নিউ আলিপুর; পথটা যেন বিফল আশার একটা মরুপথ। যাওয়া, আর মনে প্রাণে দেহে আধপোড়া হয়ে ফিরে আসা। এভাবে এই মরুপথে আর বেশিদিন ছুটোছুটি করতে হলে সুমোহন যে ছাইমাখা একটা আলেয়া হয়ে যাবে, সে আলেয়া দেখে ভয় পেয়ে চোখ ঢাকবে পূরবী।

পূরবীর কাছে গিয়ে বসবার আনন্দটাও মাঝে মাঝে ভয় পেয়ে কেঁপে ওঠে। কী মনে করবে পূরবী, যদি আবার তাকে শুনতে হয় যে, সুমোহনের সেই ধ্রুব বিশ্বাসও একটা ধুলোর আঁধির মধ্যে পড়েছে, পথ খুঁজে পাচ্ছে না?

কিন্তু আশ্চর্য, পূরবীর মন প্রাণ ও দেহ ফুলবনের সৌরভে ভরেই আছে। শীতের

বাতাসেও না, গ্রীষ্মের বাতাসেও না, সে সৌরভ কখনও কুণ্ঠিত হবার নয়। হয়ও না। এতগুলি দিন যে পার হয়ে গেল, তার কোনও হিসাব রাখে না, হিসাবও করে না পূরবী।

পার্ক স্ট্রিটের মিসেস উডের অতিথি-নিবাসে বড় জোর একটি মাস থাকতে হবে বলে বিশ্বাস ছিল, কিন্তু তিনটি মাস পার হয়ে যাবার পরেও মনে হয়, কে জানে আর কতদিন এখানে থাকতে হবে! কারণ, যসিডির সেই দম্পতি, বড়দা আর বউদি এখনও হিমানীকে দেখতে আসে। ওরা নাকি হিমানীর স্বাস্থ্যের আর একটু উন্নতি দেখে নিয়ে তারপর যসিডি চলে যাবে। আর যদি ডাক্তার ভাদুড়ী অমত না করেন তবে হিমানীকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে।

কিন্তু তারপর মাত্র তিনটি দিন পার হবার পর কয়েকটি বই আনবার হঠাৎ দরকারে বাড়িতে গিয়ে দেখতে পায় সুমোহন, বাইরের ঘরে আর কেউ নেই, শুধু ডাক্তার আর বিকাশ হাসছে আর গল্প করছে।

এগিয়ে যায় সুমোহন—কী খবর ডাক্তার ভাদুড়ী?

ডাক্তার—এই তো খবর, যা দেখছেন। শুধু আমরা দুজন, আমি আর বিকাশ। যসিডির দম্পতি যসিডিতে চলে গিয়েছেন।

সুমোহন হাসে—তার মানে আপনার পেসেন্টের স্বাস্থ্যের একটু উন্নতি হয়েছে।

ডাক্তার ভাদুড়ী—একটু উন্নতি হবে কেন? বলতে গেলে, সেরেই গিয়েছে।

সুমোহন—তার মানে, ম্যাজিক!

ডাক্তার ভাদুড়ী—তা বলতে পারেন।

সুমোহন—তা হলে বলুন, আপনাদের মেডিক্যাল সায়েন্স হল ম্যাজিক, সায়েন্স নয়!

ডাক্তার ভাদুড়ী মিটিমিটি হাসেন—আমাদের মেডিকেল সায়েন্সের উপরেও একটা সায়েন্স আছে, সেটা একটা ম্যাজিকই বটে।

সুমোহন—সে সায়েন্সের নাম কী?

ডাক্তার ভাদুড়ী—নাম হলো, আর. কে. এম. কে।

সুমোহন—তার মানে?

ডাক্তার ভাদুড়ী—তার মানে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

'হেঁ হেঁ হেঁ' হাসতেই থাকেন ডাক্তার ভাদুড়ী। বিকাশও হেসে ফেলে। সুমোহন হাসতে চেষ্টা করেও হাসতে পারে না, ব্যস্ত হয়ে হেঁটে বই-এর ঘরের দিকে চলে যায়।

বই-এর ঘরে ঢুকে টেবিলের চিঠিপত্রগুলির দিকে তাকাতে গিয়েই চমকে ওঠে সুমোহন। আবার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে, কী যেন একটা কথা বার বার বলছেন ডাক্তার ভাদুড়ী।

ডাক্তার ভাদুড়ী বিকাশকে বলেছেন—তুমিই দিয়ে আসবে। যসিডি থেকে কাউকে আসতে বলবার দরকার নেই। ....না, না, তুমিই যাবে।

বিকাশ—আমার তো আর ছুটি পাওয়া সম্ভব হবে না।

ডাক্তার ভাদুড়ী—সম্ভব হতেই হবে। আমি চিঠিতে বিধুবাবুকে এই কথাই জানিয়ে দিয়েছি।

বিকাশ—আমাকে একবার একটু জিজ্ঞাসা না করেই জানিয়ে দিলেন?

ডাক্তার ভাদুড়ী— একটু ভুল হয়েছে ভাই। যাই হোক, এখন তো আর অন্য কথা লেখা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। যেমন করেই হোক, ছুটির ব্যবস্থা করে রাখো।

এই দিনটির পর মাত্র একটি দিন পরে মিসেস উডের অতিথি-নিবাস থেকে বিদায় নেয় সুমোহন। আর বাড়িতে এসেই বুঝতে পারে, এতদিনে নীরব হয়েছে বাড়ি। কী অদ্ভুত শান্ত একটা স্তব্ধতা। হিমানী নেই মনে হয়। একমাস পরে ছুটি না পাওয়ার ভয়ে বিকাশ বোধ হয় কালই হিমানীকে নিয়ে যসিডি চলে গিয়েছে।

সুমোহনের স্বস্তির নিঃশ্বাসটা হঠাৎ বাধা পায়। শুনতে পায় সুমোহন, এই নীরবতার মধ্যে যেন চুপে চুপে কথা বলছে শুধু হিমানীর ঘর। শুধু দুটি কণ্ঠস্বর। না, বুঝতেও কোন অসুবিধা নেই, তৃতীয় আর কেউ নেই, ওঘরে এখন শুধু দুজন, হিমানী আর বিকাশ।

স্বস্তি! এমন স্বস্তি কোনওদিনও অনুভব করেনি সুমোহন। ওই ঘরটি যেন সুমোহনের এতদিনের আশা ও বিশ্বাসের একটি কল্পলোক। এখন যদি ওই ঘরের ভেতরে দুটি নিঃশ্বাস জড়াজড়ি করে এক হয়ে যায়, তবেই সমস্যাটা সব দিক দিয়ে সুখী একটি পরম নিষ্পত্তির আনন্দে হেসে উঠবে।

কিন্তু স্বস্তির উপরেও বোধ হয় একটা পরাস্বস্তি আছে। একথা জানতে ইচ্ছে করে, বুঝতে ইচ্ছে করে, একেবারে নিঃসন্দেহ হতে চায় সুমোহন, পরম নিষ্পত্তি হয়ে গেল, কি হল না? কিংবা, আদৌ হবে কিনা?

কল্পলোকের ঘর যদিও খুব চুপে চুপে কথা বলছে, কিন্তু ভরা দুপুরের এই শান্ত স্তব্ধতা যেন একটা দৈব অনুগ্রহ। ওই ঘরের দরজার কাছে গিয়ে, একটু আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে, আর নিজের নিঃশ্বাসের শব্দটাকে একটু চেপে দিয়ে সবই শুনতে পায় সুমোহন।

হিমানী বলছে—রাগ হয় বইকি! না হয় মরেই যেতাম, তুমি ওরকম একটা কাণ্ড করলে কেন?

বিকাশ হাসে—ডাক্তারের নির্দেশ ছিল, তা-ছাড়া রোগীর সেবা করতে হলে ওসব করতেই হয়।

হিমানী—অমন সেবা না করলেই পারতে। একটা আধমরা শরীরের জিরজিরে হাড়-মাংসকে অমন যত্ন করে ধোওয়া-মোছা করবার দরকার ছিল না, তুমি ইচ্ছে করে....।

বিকাশ বলে—কী বললে?

হিমানী—বলছি, তুমি আমার পা ছুঁতে গেলে কেন? নিজের হাতে বেডপ্যান টানাটানি করতে গেলে কেন?

বিকাশ আবার হাসে—আজ আর ওসব কথা বলে লাভ কী? ওসব তো চুকেই গিয়েছে।

হিমানী—একটা মেয়ে নার্স রেখে দিলে না কেন?

বিকাশ—ডাক্তার ভাদুড়ী বললেন, মেয়ে-নার্স রাখবার কোনও দরকার নেই।

হিমানী—ব্যস্ অমনি তুমি বুঝে নিলে দরকার নেই? তুমি মনে করলে যে, তুমি নিজেই একটি মেয়ে-নার্স! ছি!

বিকাশ—যা হবার তা তো হয়েই গিয়েছে।

হিমানী— না, হয়ে গেলেই চলে না।

বিকাশ—তা হলে বলো...।

হিমানী—না, বলব না। কিছুই বলব না।

বিকাশ—আজ কিন্তু আমাকে এখনই উঠতে হবে।

হিমানী—কেন?

বিকাশ—বিকেলে একবার অফিসে না গেলে চলবে না।

হিমানী—তবে যাও।

দরজার পর্দার কাছে বিকাশের মাথা নড়ে ওঠবার আগেই নিজের ঘরে চলে যায় সুমোহন।

॥ ৯ ॥

আশা করেনি সুমোহন, আজ সন্ধ্যায় পূরবীকে এই রকম একটি রূপে ও ভঙ্গীতে সোফার উপর এমন করে বিলোল হয়ে বসতে থাকতে দেখবে। পূরবীর সাজ আর শরীর দুই-ই যেন দুটি সুন্দর শিথিলিত শোভা। কল্পনাও করতে পারেনি যে, সুমোহনকে দেখতে পেয়েই পূরবী আজ এমন করে এত ব্যস্ত একটি অভ্যর্থনার কথা বলে ফেলবে—দরজাটা বন্ধ করে দাও।

সুমোহন—কী হল, বুকের উপর প্রজাপতির পরাগ ঝরে পড়েছে বুঝি?

পূরবী—তার মানে?

সুমোহন—ওই যে। চোখের সঙ্কেত করে দেখিয়ে দেয় সুমোহন।

পূরবীর বুকের ঠিক সেখানে, যেখানে জামার বোতামটা ঘর থেকে আলগা হয়ে সরে গিয়েছে, সেখানে এক ছিটে পাউডার লেগে আছে।

দেখতে পেয়ে পূরবীর আপনি-রঙিন লালচে ঠোঁট আরও রঙিন হয়ে যায়। পূরবী ডাকে—কাছে এসে বসো।

পূরবীর কাছে এসে বসে সুমোহন। জানে সুমোহন, আর পূরবীর মুখের দিকে তাকিয়েও বুঝতে পারে, পূরবী এখন সামান্য কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস-বিনিময়ের পালা পছন্দ করবে না, কিন্তু কোনও কথাও বলবে না। শুধু বিহ্বলতার একটি স্তবক হয়ে পড়ে থাকবে।

সুমোহনও কোনও কথা বলে না। বলবার দরকার হয় না।

প্রিয় উৎসবের মুহূর্তগুলি যে কত দ্রুত ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, তা বুঝতে পারে না সুমোহন। খাজুরাহোর পাথুরে ভঙ্গির সব রেখা আর বলয় স্বপ্নালু হয়ে যে ভরাট কোমলতা ছন্দিত করে রেখেছে, তারই নিলাজ শোভার উপর নিজের হাতে আবরণ টেনে নিয়ে তারপর ডাক দেয় সুমোহন।—পূরবী।

পূরবী—বলো।

সুমোহন—শুধু একটি কথাই বলতে চাই, তুমি একটি বিস্ময়।

পূরবী হাসে—কিন্তু মনে করে দেখো তো একবার, সেদিন কি কথাটি বলেছিলে?

সুমোহন—কী কথা?

পূরবী—তোমার ধ্রুব বিশ্বাসের কথা।

সুমোহন— হ্যাঁ, বলেছি বইকি!

পূরবী—তার মানে, এখনও কিছু-দূর, আরও কিছু বাকি আছে।

সুমোহন হাসে—তা বলতে পারো। কিন্তু আমি বলব, সেটা কিছুই নয়। সেটা একটা শুধু খটকা। অস্পষ্ট একটা কথাকে একটু স্পষ্ট করে জানবার জন্যে কয়েকটি দিনের অপেক্ষা।

পূরবীর চোখের পাতা ভিজে যায়। —অপেক্ষা। শুধু অপেক্ষা।

পূরবীর গলা দুহাতে জড়িয়ে আর মাথার উপর মুখ রেখে সুমোহন বলে—শোনো তবে; এই অপেক্ষার শেষ হবে এই মাসেই, তারপর আর কোনও সমস্যা নয়, শুধু আইনটা দেরি করিয়ে দেবে বলেই একটি বছর পরে আমাদের বিয়ে হবে।

পূরবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরে আসবার পর, আর বই-এর ঘরে বসে পাশের বাড়ির রেডিওর গান অনেকক্ষণ ধরে শোনবার পর বুঝতে পারে সুমোহন, সত্যিই একটা খটকা এখনও একেবারে নিশ্চিন্ত হবার আনন্দটাকে ঠেকিয়ে রেখেছে, কাছে আসতে দিচ্ছে না। কে জানে বিকাশের কাছে হিমানীর কী কথা বলবার ছিল, কিন্তু রাগ করে বলল না। হিমানী হয়ত বিকাশকে এই কথাই বলতে চেয়েছিল যে, তোমরা সবাই মিলে এ বাড়ি থেকে আমাকে সরিয়ে দিতে যতই চেষ্টা কর, আমি সরব না। মানসিক রোগের মানুষ; অসুখ অপমান আর তুচ্ছতার ঘরই তার ভাল লাগবে; অসম্ভব কিছু নয়।

বিকাশ বোধ হয় আজ সন্ধ্যায় আর আসেনি। বিকেলে অফিস করে আবার সন্ধ্যা হতেই এখানে আসা অবশ্য বিকাশের মত মিথ্যে হয়রানির পক্ষে অসাধ্য নয়। এসে থাকলেও চলে গিয়েছে নিশ্চয়, রাতও তো মন্দ হয়নি।

পাশের বাড়ির রেডিও হঠাৎ নীরব হয়ে যায়। সেই মুহূর্তে শুনতে পায় সুমোহন, হিমানীর ঘরের ভেতরে একটা সুরেলা কলরব হেসে হেসে উথলে উঠেছে।

হিমানীর ঘরের দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে সবই শুনতে থাকে সুমোহন। ঠিকই,

দুজনের সঙ্কল্প আর শপথের স্পষ্ট-অস্পষ্ট কথাগুলি হাসিতে খুশিতে ভরে গিয়ে আর সুরেলা হয়ে বাজছে।

হিমানী—বিয়ের কথাটা বাবার কাছে আমি বলতে পারব না, তুমিই বলবে।

বিকাশ—আমিই বলব, কিন্তু তুমি তখন কাছেই দাঁড়িয়ে থাকবে, একেবারে কাঁচুমাচু হয়ে, যেন হঠাৎ আকাশ থেকে পড়েছ। ভাবখানা এমন করবে যে, যেন কিছুই জান না।

হিমানী—বড়দাকেও তুমিই বলবে, আদালতে দরখাস্ত দিতে যেন দেরি না করে।

বিকাশ—সে আর বলতে হবে না, বড়দা তো একেবারে মুখিয়ে আছেন। একবার বললেই হয়।

হিমানী—কে বললে?

বিকাশ—বড়দাই বলেছেন, আজই বড়দার চিঠি পেয়েছি।

হিমানী—কিন্তু আর এখানে থাকা কেন? কালই চলে গেলে তো হয়।

বিকাশ—ডাক্তার ভাদুড়ী যখন বলেছেন, তখন একটা মাস থেকে যাওয়াই ভাল।

হিমানী—কিন্তু কেন? ডাক্তার ভাদুড়ী মিছিমিছি আরও একটা মাস এখানে থাকতে বললেন কেন? উনি নিজেই তো বললেন, আমার স্বাস্থ্যের পুরো উন্নতি হয়েই গিয়েছে।

বিকাশ হাসে—ডাক্তার ভাদুড়ী বলেন, মানসিক স্বাস্থ্যেরও পুরো উন্নতি দরকার। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, সাতদিনের মধ্যেই মানসিক স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হয়ে গিয়েছে, তবে সাতদিনের মধ্যেই চলে যেতে হবে।

হিমানী—বুঝলাম না।....কিন্তু তুমি ওরকম করে হাসছ কেন?

বিকাশ—তার মানে, একমাসের বেশি এখানে থাকা হবে না। মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হোক বা না হোক।

হিমানী—মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি মানে কী?

বিকাশ—ডাক্তার ভাদুড়ী জানেন।

হিমানী—তুমি জান না?

বিকাশ—একটু জানি, কিন্তু বলব না।

হিমানী—বলো বলছি।

বিকাশ—না।

হিমানী—ভাল হবে না বলছি, এখুনি বলো, কী কথা।

বিকাশ—না, এখুনি বলব না, বলতে পারি না।

হিমানী—বলতেই হবে।

বিকাশ—আচ্ছা. কথা দিচ্ছি, যসিডি যাবার আগের দিনেই কথাটা বলে দেব।

হিমানী—যসিডি যাবার দিনটা কবে?

বিকাশ—যেদিন কথাটা বলব, ঠিক তার পরের দিন। ....আচ্ছা চলি।

সুমোহনের এই মুহূর্তের নিঃশ্বাসটা সফল স্বপ্নের মত কলরব নিয়ে আর ফোয়ারা হয়ে বুকের ভেতর থেকে উথলে উঠতে চাইছে। বিকাশের পায়ের শব্দ বেজে উঠবার আগেই সরে যায় সুমোহন। বাইরের ঘরের সোফাতে বসেই আবার উঠে দাঁড়ায়। এখনই টেলিফোনে বলে দিতে ইচ্ছে করে, সবই জানা হয়ে গেল, পূরবী। পথে আর কোনও বাধা নেই। ধূলো নেই, কাঁটা নেই, খটকা নেই, সন্দেহ নেই।

বোধ হয় একমাসের মধ্যেই আদালতের নোটিস আসবে। ভাল কথা। আসুক নোটিস, কালই আসুক না কেন! সে নোটিস কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দেবে সুমোহন। তুচ্ছতা অবহেলা আর রূঢ় নিষ্ঠুর ব্যবহার, অভিযোগের সহজ বাঁধা গত হয়ত চড়া সুরে সঙ্গত করার সঙ্গে অনেক মিথ্যে কথাও বলবে। বলুক। অভিযোগের একটি কথারও প্রতিবাদ করবে না, আদালতের ছায়ার কাছেও যাবে না সুমোহন। একতরফা ডিক্রি পেয়ে আর খুশি হয়ে নতুন ঘরে চলে যাক হিমানী। সুখী হোক হিমানী।

এইরকম একটি সুখী নিষ্পত্তি চেয়েছিল সুমোহন। শেষে তাই তো হল, কিন্তু হবার আগে দুঃসহ ধুলো-জঞ্জালের মত যত মিথ্যে ভয় আর মিথ্যে ভাবনার কী ভয়ানক একটা উৎপাতই না করে নিল। তথাকথিত ভবিতব্য বোধ হয় একটা মূঢ়তার গাধা, জল ঘোলা করে নিয়ে তারপর সেই জলই খায়।

না, আজ এখনই আর এত রাতে পূরবীকে টেলিফোনে কথা না বলে দিলেও চলে। টেলিফোন নয়, মুক্তিসুখের এই কথাটা পূরবীকে বলতে হলে পূরবীর মাথাটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলতে হবে। হয়ত বলবারই দরকার হবে না। সুমোহনের চোখের দিকে তাকিয়েই বলে উঠবে পূরবী—বুঝেছি।

—কেমন করে বুঝলে?

—আগে কোনওদিনও তোমার চোখে এত আলো দেখিনি, আজ দেখছি।

কল্পনার ভাষা বটে, কিন্তু তারই গুঞ্জন শুনতে পেয়ে সুমোহনের দুই চোখ যেন আলোতে ভরে যায়। ঘরের আলোর দিকে তাকিয়ে থাকে সুমোহন।

পরের দিন বিকেলবেলা থিয়েটার রোডের জোড়া গুলমোরের ছবিটা যখন মনে পড়ে, পূরবীর কাছে যাবার জন্য প্রাণটা যখন ব্যস্ত হয়ে ওঠে, তখন বুঝতে পারে সুমোহন, আজ দেয়ালি।

বিকেলের আলোর মধ্যেই শহর উৎসবে মেতে উঠেছে, এদিকে-ওদিকে চারিদিকে পট্‌কা ফাটছে। এতক্ষণে মনে পড়ে, যে কথা মনে রাখতে ভুলেই গিয়েছিল সুমোহন। পূরবী বলেছিল, সুমোহন শুনেছিল যে, দেয়ালির রাতে বুড়ি সৌদামিনী পূরবীকে কিছুতেই ঘরের ভেতরে বসে থাকতে দেবে না। বিকেল হতেই বুড়ির সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যেতে হবেই হবে, ফিরতে রাত হবে। 'কাজেই কাল সন্ধ্যায় তুমি এসো না।'

হেসে ফেলে সুমোহন। মনটা এরকম কত ভুলোপনাই তো করল। পূরবী একদিন বলেছিল, আসবার সময় মনে করে মথুরা মিউজিয়মের হ্যাণ্ডবুকটা নিয়ে আসবে। সুমোহন নিয়ে গিয়েছিল, বার্ডউডের তিব্বতী আইকনোগ্রাফি। পূরবী জিজ্ঞেস

করেছিল, তোমার হাতে ওটা কী বই? পাহাড়ি পেন্টিং? সুমোহন জবাব দিয়েছিল—তুমি যখন বলছ, তখন চা খেয়েই যাই।

কে জানে বই-এর এই ভিড়ের মধ্যে কোথায় পড়ে আছে মথুরা মিউজিয়মের হ্যাণ্ডবুক? টেবিলের উপর বই-এর গাদার ভেতরে, র‍্যাকের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে থাকে সুমোহন। কী আশ্চর্য, যত অনুরাধাপুর তাঞ্জোর মাদুরা আর নালন্দার সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে, শুধু এক মথুরা কোথায় যেন মুখ লুকিয়ে বসে আছেন।

চারদিকের চারটি পাশের বাড়ির রেডিও মত্ত হয়ে গান গাইতে শুরু করেছে।

বই তল্লাশির দুটি হাতের ব্যস্ততা থামিয়ে দিয়ে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় সুমোহন। হঠাৎ মনে হয়েছে সুমোহনের, হিমানীর ঘরের ভেতরেও নিশ্চয় দুটি কণ্ঠস্বরের হর্ষ মিলে-মিশে উৎসব শুরু করে দিয়েছে। আজ বিকাশের অফিসের ছুটির দিন। বিকাশের না আসবার তো কোনও কারণ নেই।

চোখে পড়েছে সুমোহনের, হিমানীর ঘরের দরজা বন্ধ। বাইরের ঘরে গিয়ে দেখতে পায়, হিমানীর ঘরের সেদিকের দরজাও বন্ধ। ভেতরে বারান্দায় গিয়েও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, দরজা বন্ধ, জানালা বন্ধ। বারান্দার শেষ প্রান্তের মুখে লোহার জালি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাই শুধু জালের গায়ে চোখ লাগিয়ে দেখতে পাওয়া যায়, পশ্চিমের দুই জানালা আর দরজাটা খোলা।

জানে সুমোহন, সেই বিচিত্র ডাক্তার ভাদুড়ীরই নির্দেশ আছে, কথাটা নিজের কানে একদিন শুনতে হয়েছে, হিমানী যেন নিয়ম করে রোজ বিকেলে একটু খোলা-মেলা রোদ-বাতাস গায়ে লাগায়। কোন সন্দেহ নেই, পশ্চিমের খোলা জানালা আর দরজা দিয়ে বিকেলের অনেক রোদ আর অনেক আলো হিমানীর ঘরের ভেতরে ছড়িয়ে পড়েছে। পাশের বাড়ির উঁচু পাঁচিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে একটা বকুল আর একটা নিম ঝুরঝুর করে পাতা কাঁপিয়ে বাতাস ছাড়ছে। ভাল রোদ আর ভাল বাতাস ভাল করেই গায়ে লাগাতে পারছে হিমানী। জানে সুমোহন, বেশ কিছুক্ষণ, অন্তত একটি-দুটি ঘন্টা ভেতরের দিকের এইসব দরজা আর জানালা বন্ধ করে র'খবার দরকারও আছে। হিমানীর আদুড় গায়ের লজ্জাটাও তো একটা লজ্জা।

চমকে ওঠে সুমোহনের এই ব্যস্ত কৌতুহলের চোখ আর কান, আর, একটা অদ্ভুত হাসিও শিউরে ওঠে। কত স্পষ্ট করে শুনতে পাওয়া গেল, হিমানীর এই আদুড় লজ্জার ঘরই কথা বলাবলির শব্দে হেসে উঠেছে।

বই-এর ঘরের ভেতর একবার যায় আর ফিরে আসে সুমোহন, হাতে সেই জাপানি ক্যামেরা। যেমন ক্যামেরার লেন্স, তেমনই সুমোহনের চোখ, দুই-ই যেন একটা দুরন্ত কৌতুহলে জ্বল জ্বল করে। ছবি চাই, অবশ্যই চাই, সাবধানের মার নেই। মামলাতে চমৎকার সুবিধার দলিল হতে পারে, সে দলিল হাতের কাছে পেয়েও ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

কিন্তু সুমোহনের চোখের তৃষ্ণার সঙ্গে ক্যামেরার লেন্সের তৃষ্ণাও যেন বন্ধ দরজা আর জানালার গায়ে মাথা ঠুকে ঠুকে ফিরতে থাকে। ফাঁক নেই, ফাঁকি নেই, বন্ধ দরজা আর জানালাগুলি যেন নিখুঁত বদ্ধতার পাথর।

কিন্তু অসাবধানের মার আছে। সুমোহনের মুখের অদ্ভুত হাসি আবার শিউরে ওঠে। যে জানালার ভেতর কি থেকে হিমানীর একটা অতি আদুরে আর্কিডের শুঁড় জানালা পার হয়ে বাইরে ঝুলে পড়েছে, সে জানালা একটু ফাঁক হয়ে আছে। আরও ভাল, এই করিডরে রোদের আলো আসে না, আসতে পারে না। তার উপর আরও ভাল, ঠাকুর আর চাকর দেয়ালির মেলা দেখতে চলে যাবার আগে করিডরের শেষপ্রান্তের দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গিয়েছে। এই করিডর এখন চমৎকার একটি আবছায়াময় গোপন নিরালা।

বেশ দৃশ্য, অদ্ভুত দৃশ্য। সে দৃশ্যের ভাষা অদ্ভুত, ভঙ্গিও অদ্ভুত। শক্তিশালী জাপানি ক্যামেরা সে ভঙ্গির ছবি ধরে। সুমোহনের দুই চোখ সে ছবির উৎসব দেখে। আর দুই কান সে দৃশ্যের ভাষা শোনে।

হিমানীর আদুড় গায়ের সব লজ্জা আদুড় হয়েই আছে। আলগা শাড়িটা শুধু আঁচলের এক পাক বাঁধনের জন্য কোমরে জড়ানো আছে, নইলে খসে পড়ে যেত। বিকাশের একটা হাতকে দুই হাতে শক্ত করে ধরেছে হিমানী—বলো এবার।

বিকাশ—কী বলব?

হিমানী—কাল যে কথাটা কিছুতেই বললে না।

বিকাশ হাসে—আমরা কাল সকালেই যসিডি রওনা হব।

হিমানী—বেশ তো; কিন্তু কথাটা?

বিকাশ—কথাটা এই যে, ডাক্তার ভাদুড়ী আমাকে বলেছিলেন যে, হিমানী একদিন নিজেই তোমার হাত ধরুক; বুঝিয়ে দিক যে, ওর মানসিক স্বাস্থ্যেরই পুরো উন্নতি হয়েছে। তারপর যসিডি যেও।

হিমানীর গলার স্বর খুশির ঝরনার শব্দের মত কলকল করে হেসে ওঠে। —কী ভয়ানক দুষ্টু বুদ্ধির মানুষ এই ডাক্তার ভাদুড়ী।

বিকাশ—এই হল কথা।

হিমানী যেন চকিত বিদ্যুতের মত একটা ভঙ্গির শরীর। এক নিমেষে দুহাত দিয়ে বিকাশের গলা জড়িয়ে ধরে, আর বিকাশের মুখের উপর মুখ রেখে যেন ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর জলে ভরা টসটসে চোখ দুটোকে বিকাশের চোখে গালে আর কপালে ঘষতে থাকে। আঃ কী শান্তি!

হিমানী যেন নিটোল দুটি স্বাদুফলের মাযাতরু। বিকাশের মাথাটাকে বুকের উপর টেনে নিয়ে চেপে রাখে। হিমানী বলছে—নাও, আমার রক্ত-মাংসের সব স্বাদ তোমার বুকের ভেতর চলে যাক।

চৈত্র মাসের উতলা বাতাসে শালমঞ্জরী যেমন করে দোলে, ঠিক তেমনই করে

দুলছে হিমানীর শাড়ির আঁচলের একপাকে জড়ানো কোমরটা। বিকাশের হাত দুহাতে ধরে রেখেছে হিমানী, শালমঞ্জরী যেন তার কোমরে মালা জড়াতে চায়।

বিকাশ ডাকে— হিমানী।

হিমানী—ওরকম করে শুধু কথা বলে ডেকো না ; বুকের উপর জোরে চেপে ধরো আর ডাকো।

সুমোহনের শক্তিশালী ক্যামেরার লেন্স একটু ঝুঁকে পড়ে আর দেখতে থাকে, এলিয়ে লুটিয়ে পড়েছে হিমানী। সে ভঙ্গিতে যেন শুধু একটি ফোঁটা পদ্মের শোভা ভাসিয়ে রেখে টলমল করছে ভরাদীঘির জল।

ক্যামেরার লেন্স নিজে আকুল না হয়েও কত না বিচিত্র ছবি দেখছে আর ধরে রাখছে। হিমানীর শরীরে এত ভঙ্গির জাদু কেমন করে আর কেন এতদিন ঘুমিয়ে ছিল, কেনই বা জাগেনি, সে প্রশ্ন এই ক্যামেরার চোখে নেই। ক্যামেরা শুধু দেখতে থাকে, হিমানীর এই শরীর যেন অস্থিহীন কোমলতার লতা। আদুড় লজ্জার সব বিস্ময় যেন একটি স্তবক হয়ে ফুটে উঠছে। সেই স্তবকের রেখা ও বলয় যেন দুর্বার এক উচ্ছলতার অর্ঘ্য। হিমানী তার উৎসবের সঙ্গী মানুষটিকে সুখের স্বেদজলে সিক্ত করে দিয়ে এইবার যেন ঘুমিয়ে পড়তে চাইছে।

শক্তিশালী জাপানি ক্যামেরা শক্ত করে হাতে ধরে রেখে, পা টিপে টিপে হেঁটে সুমোহন আবার বই-এ: ঘরের ভেতর ভিরে গিয়ে দাঁড়ায়। জোরে একটা নিশ্বাস ছাড়ে। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মোছে। কী আশ্চর্য, ভাবতে গিয়ে হেসে ফেলে সুমোহন। এত ঘাম কেন? তবে কী ক্যামেরার লেন্সও ঘামে ভিজে গিয়েছে?

॥ ১০ ॥

গাছকাটা কাঠুরিয়া শেষ কোপ দেবার আগে তার হাতের টাঙি নামিয়ে যেমন একটু জিরিয়ে নেয়, তথাকথিত ভবিতব্যটা যেন ঠিক তেমনই একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। উকিল মনতোষবাবু বলেছেন: আমি জানতে পেরেছি সুমোহনবাবু, এই মাসের শেষদিকে আদালতের রায় বের হয়ে যাবে।

স্ত্রী হিমানী দত্তের অভিযোগ এই যে স্বামী সুমোহন দত্ত ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সেই সম্পর্ক বর্জন করেছেন, যে-সম্পর্ক থাকলে স্বামী আর স্ত্রী এক ঘরে থাকতে পারে। অতএব প্রার্থনা, ডিভোর্স মঞ্জুর করা হোক। স্বামী সুমোহন দত্তের দরখাস্তের কথা এই যে, অভিযোগের বিরুদ্ধে তার কোনও অভিযোগ নেই। সুতরাং বুঝতে অসুবিধে নেই, কাঠুরিয়ার টাঙির শুধু শেষ কোপটি বাকি আছে। তারপর মিথ্যে সম্পর্কের গাছটা, যে গাছে ফুলও ছিল না, পাতাও ছিল না, শুধু ছিল কাঁটা, সে গাছ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গিয়ে নিতান্ত নির্জীব একটা লকড়ি হয়ে যাবে।

হিসাব করে বুঝতে পারে সুমোহন, মাত্র আর সাতদিন পরে মাসের শেষ দিকটা শুরু হয়ে যাবে। তারপর, শুধু একটি বছরের অপেক্ষা। এই অপেক্ষা একটা অপেক্ষা

মাত্র। ট্রেন আসতে মাত্র আর একটি মিনিট বাকি; এমন অপেক্ষায় কোনও কষ্ট নেই। তাছাড়া টিকিট কেনা হয়েই গিয়েছে, দুটি সিটও রিজার্ভ হয়ে গিয়েছে; অপেক্ষাতে ক্লেশ থাকবে কেন? মথুরা মিউজিয়মের হ্যাণ্ডবুকের খোলা পাতাটার লেখার উপর চোখ রেখেও হাসতে থাকে সুমোহন। বুঝতে পারে সুমোহন, এখানে এই ঘরে আর একা একা বসে থাকতে একটুও ভাল লাগছে না। এখনি পূরবীর কাছে গিয়ে বলতে ইচ্ছে করে—এই নাও মথুরা মিউজিয়মের হ্যাণ্ডবুক। অনেক চেষ্টা আর হয়রানির পরে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে।

আরও কয়েকটা দিন পার হয়ে যাবার পর সেদিন আবার হিসেব করে বুঝতে পারে সুমোহন মাসের শেষ দিকটার শেষ হতে মাত্র আর দুটি দিন বাকি আছে। সেদিন ঠিক সন্ধ্যা হতেই টেলিফোনে খবর দিলেন মনতোষবাবু—রায় বের হয়েছে, ডিভোর্স মঞ্জুর।

ধন্যবাদ। টেলিফোনে মনতোষবাবুকে যে কথাটা বলতে ভুলেই গেল সুমোহন, সে কথাটা একেবারে পূরবীর ঘরের দরজার কাছে এসে অদ্ভুত এক উল্লাসের শব্দের মত বেজে ওঠে।

হেসে ওঠে পূরবী—কী ব্যাপার! কী অপরাধ করলাম আমি যে, ঘরে ঢুকেই আমাকে এরকম একটা ধন্যবাদ দিচ্ছ।

সুমোহন—ধন্যবাদ তোমাকে, ধন্যবাদ আমাকে, ধন্যবাদ তাকেও।

পূরবী—কাকে?

সুমোহন—সেই মহিলাকে, যার নাম হিমানী।

পূরবী—মহিলা এখন কোথায়?

সুমোহন—যথাস্থানে। ডিভোর্সের জন্য তিনি যে দরখাস্ত করেছিলেন, আদালত সেটা মঞ্জুর করেছে।

পূরবী—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো?

সোফাতে বসে পড়েই আক্ষেপ করে সুমোহন—ওঃ, মথুরা মিউজিয়মের হ্যাণ্ডবুকটা খুঁজে পেয়েও আনতে ভুলে গিয়েছি।

পূরবী হাসে—বেশ করেছ।

সুমোহন—রাগ করে হাসছ বোধ হয়?

পূরবী—তা বলতে পারো।

সুমোহন হাসে—কেন? কিসের রাগ?

পূরবী—তুমি ওই সোফাতে বসলে কেন? আমার পাশে জায়গা নেই?

সুমোহন এসে পূরবীর পাশে বসে, পূরবীর কাঁধের উপর একটা হাতও রাখে। —ঠিক কথা, আজ তো ঘরে ঢুকেই তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরা উচিত ছিল।

পূরবীর আপনি-রঙিন লালচে ঠোঁট ফুল্ল হয়ে হাসে আর কাঁপে—আর কিছু উচিত ছিল না?

সুমোহন—বুঝেছি বুঝেছি। দাও, এখনি পড়ে ফেলছি।

পূরবীর চোখ দুটো যেন বেশ কঠিন ও বেশ অদ্ভুত একটা বিস্ময়ের খোঁচায় কেঁপে ওঠে। —কী বললে?

সুমোহন—তোমার সেই লেখাটা দাও।

পূরবী—কোন লেখাটা?

সুমোহন—বাঃ, তুমি নিজেই সেদিন বললে যে, পাহাড়ি পেন্টিংয়ের ভাল-মন্দ বিচার করে তুমি খুব সংক্ষেপে একটা প্রবন্ধ লিখেছ। আমাকে একবার পড়ে দেখতেও বললে। ভুলেই গিয়েছ?

পূরবী হাসে—না, ভুলিনি। কিন্তু বুঝতে পারিনি যে, তুমি সেই লেখা আজই পড়তে চাইবে। ...আচ্ছা, এখনি নিয়ে আসছি।

উঠে দাঁড়ায় পূরবী, পাশের ঘরে গিয়ে টেবিলের উপর থেকে লেখার ফাইলটা হাতে তুলে নেয়। কিন্তু...কিন্তু পূরবীর চোখ যেন গভীর একটা প্রশ্নের আবেশে নিবিড় হয়ে ওঠে। বোধ হয় নিজেরই মনের একটা হঠাৎ-সন্দেহের সত্য-মিথ্যা একটু পরীক্ষা করে দেখতে চায় পূরবী। আয়নার কাছে গিয়ে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আরও একটু সময় লাগে পূরবীর; খোঁপাটাকে একটু ঢিলে করে দিতে, আর বুকের উপর একটু পাউডার ছড়িয়ে নিতে যতটুকু সময় দরকার।

ফিরে এসে সুমোহনের হাতের কাছে লেখার ফাইলটা রেখে দিয়ে সুমোহনের পাশে বসে থাকে পূরবী। চশমাটা খুলে নিয়ে কোলের উপর রাখে।

অনেকক্ষণ পরে কথা বলে পূরবী—মনে হচ্ছে খুব মন দিয়ে আমার লেখাটা পড়ছ!

সুমোহন চোখ তুলে পূরবীর মুখের দিকে তাকায়—হ্যাঁ, একটু মন দিয়ে না পড়লে চলবে কেন?

পূরবী হাসে—পড়ো। আমি তা হলে চুপ করে শুধু তোমার মুখটাকে একটু মন দিয়ে পড়ি।

পড়া শেষ করেই জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে সুমোহন, হাতের ঘড়ির দিকে তাকায়। তারপর পূরবীর মুখের দিকে তাকায়—বেশ ভাল লেখা হয়েছে। আমার ইচ্ছে, তুমি এই লেখাটা এশিয়ান আর্ট জার্নালকেই দাও।

পুরবী হেসে ওঠে—তাই দেব।

সুমোহন—তুমি কিন্তু বাশোলি আর কাংড়ার মধ্যে যে মস্ত বড় রকমের একটা প্রভেদ দেখেছ, সেটা ঠিক হয়েছে বলে আমি মনে করি না। আসলে ওরা একই একজনের ময়ূর নীল, আর একজনের ময়ূর বেগুনি। শুধু রঙের রকমফের।

পূরবী—আমি তা হলে আর একবার ভেবে দেখব।

সুমোহন—আমারও সেই কথা।

পূরবী—কিন্তু আমার কথাটা তো কিছুই শুনলে না, একবার জিজ্ঞাসাও করলে না।

সুমোহন—কী?

পূরবী—এই যে আমি বললাম, আমি এখন তোমার মুখটাকে মন দিয়ে পড়ব।

সুমোহন হেসে ওঠে—পড়েছ নাকি?

পূরবী—নিশ্চয়।

সুমোহন—কি বুঝলে?

পূরবী—বুঝলাম যে, তুমি আজ এখানে বোধহয় চা'ও খাবে না।

সুমোহন—খাব বইকি। তোমার এখানে চা খেয়ে যে তৃপ্তি পাই, বাড়ির চায়ে সে তৃপ্তি পাই না।

পূরবী—দুঃখের কথা। কিন্তু এ বাড়ির কি শুধু চায়েতেই তৃপ্তি আছে, আর কিছুতে নেই?

সুমোহন—একজন টিকিওয়ালা পাটনাই মহারাজ; নাম শুকদেও। পকৌড়ি ভাজে ভাল, কিন্তু চায়ের দফা রফা করে রেখে দেয়।

দুহাত তুলে ঢিলে খোঁপাটাকে একটু আঁট করে ঘাড়ের এক পাশে ঠেলে দেয় পূরবী। —মনে হচ্ছে তুমি আজ একটু বেশি ব্যস্ত। তার মানে, তুমি আজ বেশ আনমনা।

সুমোহন—একটুও না। আমি তো ভাবছি, আজ তোমার এখানেই রেডিওর শেষ গান শুনে তারপর বাড়িতে ফিরব।

পূরবী—তোমার বাড়িতে রেডিও নেই?

সুমোহন—আছে। তবে রেডিও নীরব হয়েই পড়ে থাকে। পাশের বাড়ির রেডিওর প্রচণ্ড সরবতাই যথেষ্ট, কানের ভেতর দিয়ে একেবারে মরমে পশে যায়।

পূরবী হাসে—দুঃখের কথা।

সুমোহন হাসে—কিন্তু দুঃখের কথাটা শুনে তুমি তো বেশ হাসছ দেখছি।

পূরবী—তুমি তো হাসছ।

সুমোহন—তুমি সত্যিই ক্রিটিক, কিন্তু....।

হঠাৎ পূরবীর হাত ধরে সুমোহন—ইচ্ছে করছে, এখনই এই ক্রিটিকের মুখ বন্ধ করে দিই।

পূরবী চুপ করে শুধু সুমোহনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আর সুমোহন মুখ ঘুরিয়ে টেবিলের ফুলদানের দিকে তাকিয়ে পূরবীর হাতে হাত বোলাতে থাকে। আর, সেই সঙ্গে সফল স্বপ্নের তৃপ্তিটাকে মুখরিত করেও তোলে—ভাবতে কী আশ্চর্যই না লাগছে, পূরবী। আর মাত্র একটি বছর পরে তুমি আমার বাড়িতে আমারই কাছে বসে থাকবে। তোমার সঙ্গে আর টেলিফোনে কথা বলতে হবে না। তোমাকে দেখবার জন্য এখানে আর ছুটে আসতে হবে না। হাত বাড়ালেই তোমার এই হাতটি ধরতে পারব।

পূরবীর হাতটাকে পূরবীরই কোলের উপর আস্তে আস্তে রেখে দিয়ে সুমোহন

আবার সফল স্বপ্নের কথা বলতে থাকে। —কী ছিল আর কী যে হয়ে গেল। সেই কবে হঠাৎ একদিন ব্রিটিশ মিউজিয়মের সিঁড়িতে প্রথম তোমাকে দেখলাম, আর সেই তোমাকে আজও দেখছি। কিন্তু দুই দেখার মধ্যে কত তফাত। সেদিন তুমি ছিলে আমার চোখের একটা প্রিয় কৌতূহল, আজ তুমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় তৃপ্তি।

হঠাৎ উঠে গিয়ে টেবিলের কাছে এগিয়ে যায় সুমোহন, ফুলদানের চেহারাটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। —জয়পুরি মীনার কাজ নিশ্চয়, কী বলো, পূরবী?

পূরবী বলে—না, কাশ্মীরি।

হেসে ওঠে সুমোহন—তাই তো। জয়পুরি কাজে এরকম দেওদার হ্রদের জল আর শিকারা নৌকো থাকতে পারে না।

আয়া জগমায়া ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর চায়ের ট্রে রাখে। সুমোহন বলে—চা আজ না খেলেও চলত।

পূরবীর দুচোখ যেন ঝিলিক দিয়ে কেঁপে ওঠে।

চা খেয়ে নিয়েই হাতের ঘড়ির দিকে তাকায় সুমোহন—আটটা বেজে গিয়েছে দেখছি।

টেবিলের কাছে একটা চেয়ারে বসে সিগারেট ধরায় সুমোহন। টেবিলের উপর থেকে খাজুরাহো অ্যালবাম তুলে নিয়ে, একটা প্লেটের দিকে তাকিয়ে কথা বলে—তোমার এখানে মশার উৎপাত নেই, কিন্তু আমার ওখানে মশার উৎপাত যে কী ভয়ানক, সেটা তোমার ধারণাতেই আসবে না।

পূরবীর আপনি-রঙিন লালচে ঠোঁট হঠাৎ যেন সব রক্ত হারিয়ে সাদা হয়ে যায়। হাতের রুমালের ছোট্ট একটা ঘষা দিয়ে বুকের উপরের সেই একছিটে পাউডার মুছে ফেলে পূরবী।

অ্যালবাম রেখে দিয়ে পূরবীর মুখের দিকে তাকায় সুমোহন। হাসতে থাকে সুমোহনের উজ্জ্বল দুটি চোখ।

সুমোহন ডাকে—পূরবী।

পূরবী—কী?

সুমোহন—তোমার মুখটি কিন্তু আজও ঠিক সেই রকমই সুন্দর। সেই প্রথম দেখার দিনে যেমনটি দেখেছিলাম, আজও ঠিক তাই দেখছি।

আবার হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় সুমোহন; হাতের ঘড়ির দিকে তাকায়—ইস্ ন'টা বেজে গিয়েছে। দেখছি....আচ্ছা, আজ এখন চলি।

সোফা ছেড়ে পূরবীও উঠে দাঁড়ায় আর হেসে ফেলে—ধন্যবাদ।

সুমোহন—কেন? কিসের ধন্যবাদ?

পূরবী—বাঃ, তুমি আজ ঘরে ঢুকেই আমাকে একটা চমৎকার ধন্যবাদ দিয়েছ, তুমি চলে যাবার সময় আমিও কি তোমাকে একটা ধন্যবাদ দেব না?

সুমোহন—তুমি দেখছি শুধু একটি ভাল ক্রিটিক নও, একটি খুব ভাল অবজার্ভারও বটে। হাসতে হাসতে চলে যায় সুমোহন।

সুমোহনের এই হাসির মধ্যে কোনও ক্লান্তি নেই। ভুলতে পারে না সুমোহন, এতদিন পরে তার জীবনের ইচ্ছাটা সব চেয়ে বড় বাধার ভয় পার হয়ে মুক্তপথের পথিক হতে পেরেছে।

আজ রাতে পূরবীর ঘর থেকে চলে যাবার সময় যে হাসি নিয়ে গেল সুমোহন, পরদিন সন্ধ্যায় আবার ঠিক সেই হাসি নিয়ে পূরবীর ঘরের ভেতর এসে দাঁড়ায়। আসবার সময় ময়দানের কাছে গাড়ির একটা চাকার হাওয়া হুশ্ করে ফুরিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু একটুও বিরক্তি বোধ করেনি সুমোহন। তখনও সুমোহনের মুখে ঠিক হাসিই ছিল।

পূরবীর মুখও একটুও গম্ভীর হতে পারে না। সুমোহনের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখেই কথা বলে—এসো।

সিল্কের মত বড় একটা স্কার্ফ গায়ে জড়িয়েছে পূরবী। দেখতে পাওয়া যায় না, সোনার চেনের লকেট হয়ে পুরনো বিজয়নগরের তারাপাথর বুকের কোথায় পড়ে আছে। সুমোহন বলে—তোমার এই স্কার্ফের মসলিন বোধ হয় রামপুরী আব-রওয়ান।

পূরবী—না, মুর্শিদাবাদি।

সুমোহন—কাল বাড়ি ফিরে গিয়েই মনে পড়ল, তোমার এখানে একটা ভুল করে গিয়েছিল।

পূরবী—কী ভুল?

সুমোহন—রেডিওর শেষ গান না শুনেই, অনেক আগেই চলে গেলাম।

পূরবী হাসে—তোমার পাশের বাড়ির রেডিও কি বন্ধ ছিল?

সুমোহন—না।

পূরবী—তবে তো রেডিওর শেষ গান শুনতেই পেয়েছ।

সুমোহন—হ্যাঁ। তবে এখানে শোনা আর ওখানে শোনা, আকাশ-পাতাল তফাত।

পূরবী—আকাশ-পাতাল তফাত নয়, বড় জোর তিন মাইলের তফাত।

সুমোহন হাসতে থাকে—দড়ি ধরে মাপলে তাই বটে। যাই হোক, আজ কিন্তু আমি এখনি তোমাকে এমন একটা কথা বলব, যে কথা শুনলে তুমি রাগ করবে।

পূরবী—বলো, যদিও তোমার কোনও কথা শুনে কোনওদিন আমার রাগ হয়নি, হবেও না।

সুমোহন—আজ আমি এখনই চলে যাব, একটু কাজ আছে।

পূরবী হাসে—আমি একটা কথা বলি, তুমিও রাগ করো না।

সুমোহন—আমি তোমার কথা শুনে রাগ করব? অসম্ভব।

পূরবী—তবে বলি?

সুমোহন—বলো।

পূরবী—যেদিন কাজ থাকবে, আসতে অসুবিধে হবে কিংবা আসতেই পারবে না, সেদিন টেলিফোনেই আমাকে বলে দিও যে, আসবে না।

সুমোহন—ঠিক কথা। আচ্ছা, চলি।

শুধু একবার লিণ্ডসে স্ট্রীটের একটি বিপণিতে যেতে হবে, সে বিপণির নাম আব্রাহাম্‌স স্টুডিও, এই তো কাজ। কিন্তু সেজন্য এত ব্যস্ত হবার কোনও দরকার ছিল না। জোড়া গুলমোরের কাছে এসে গাড়িতে উঠতে গিয়ে সুমোহনের মনে হয়েছে, আজ পূরবীর কাছ থেকে এত তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে চলে আসা উচিত হয়নি। পূরবীর মনে হতে পারে, এ বুঝি এতদিনের সান্ধ্য-মিলনের একটা ছন্দোভঙ্গ। কিন্তু এ রকম মনে করলে খুবই ভুল করবে পূরবী।

কিন্তু পূরবী যে ভুল করেনি, করতে পারে না, একটি মাসের আসা-যাওয়ার অনুভবের মধ্যে সুমোহনের সে বিশ্বাস আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হিসাব করে বুঝতে পারে সুমোহন. এই একমাসের মধ্যে মাত্র পাঁচটি দিন পূরবীর সেই সুহাসিত অভ্যর্থনার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু দেখতে পেয়েছে, ঠিক সেই পূরবীই কথা বলছে। পূরবীর ভালবাসা কখনও অভিমান করে না। পূরবীর মুখের হাসিতে বেশ ক্লান্তির সামান্য ছায়াও নেই। পূরবীর প্রীতি কখনও কৈফিয়ত চায় না যে, কেন আসতে পারনি।

আজ সকাল থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বিকেল হয়ে গেল, তবু বৃষ্টির বিরাম নেই। টেলিফোনে ডাক দেয় সুমোহন—পূরবী।

—বলো!

—এই বৃষ্টি সন্ধ্যাতে থামবে বলে মনে হয় না।

—বুঝতে পারছি না।

—তুমি কী করছ?

—আয়ার সঙ্গে গল্প করছি।

—আজ সন্ধ্যাতে যাওয়া সম্ভব হবে না।

—আচ্ছা!

—হাসছ মনে হচ্ছে?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—শোনো। বলছি, যেদিন আসবে কিংবা আসতে পারবে, শুধু সেদিন টেলিফোনে বলে দিও যে, আজ যাব।

—অর্থাৎ...।

—অর্থাৎ, যেদিন আসবে না, সেদিন তোমায় টেলিফোন করে কিছুই বলতে হবে না।

—ঠিক কথা।

সারাদিন বই-এর ঘরের সোফাতে বসে, খালি হাতে কিংবা বই হাতে, শুধু নীরব

হয়ে থাকা, আর সন্ধ্যা হতেই সচল হয়ে ময়দানের বাতাসে বেড়িয়ে আসা, আর কোনও একটা দিনে টেলিফোনে পূরবীকে শুধু জানিয়ে দেওয়া—আজ যাব। সান্ধ্য-মিলনের দুয়ারের কাছে এভাবে মাঝে মাঝে যেতেই সুমোহনের ভাল লাগে। আরও ভাল লাগে, যখন গিয়েই দেখতে পাওয়া যায় যে, পূরবী আজও ঠিক সেখানেই আর ঠিক তেমনই একটি হাসিমুখ নিয়ে বসে আছে।

সুমোহন বলে—কাগজে পড়েছ খবর?

পূরবী—কিসের খবর?

সুমোহন—নতুন বাঁধের জলে ডুবে যাবে নাগার্জুনকোণ্ডা।

পূরবী—ইস্, মূর্তিগুলির কী গতি হবে তা হলে?

সুমোহন—শুনছি, কিছু কিছু মূর্তি সরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। ....আচ্ছা, এখন চলি।

পূরবী—এসো।

থিয়েটার রোড থেকে ময়দান, ময়দান থেকে একবার ডালহাউসি স্কোয়ার, তারপর ঘুরে গিয়ে চৌরঙ্গি; তারপর আবার ময়দানের পথ ধরে নিউ আলিপুর। সুমোহনের মনটা আক্ষেপ করে ওঠে, না, এমন করে শুধু হাওয়া-খাওয়া একটা চক্করের মধ্যে ছুটে না বেড়িয়ে পূরবীর ঘরে আরও কিছুক্ষণ বসে থাকলে ভাল হত।

হঠাৎ জোরে ব্রেক কষিয়ে গাড়ি থামায় সুমোহন। একটা চেনা মুখ চোখে পড়েছে। সুমোহন ডাকে—বিজয়।

বাস-স্টপের আলোর কাছে দাঁড়িয়েছিল বিজয়, সেই বিজয় কুলকার্ণি। ছুটে আসে বিজয়—কী সৌভাগ্য! সুমোহন আমাকে চিনতে পেরেছ।

সুমোহন—কী খবর তোমার?

বিজয়—হাসপাতালে আছেন আমার এক আত্মীয়, তাঁকেই দেখতে গিয়েছিলাম।

সুমোহন—দেশে ফিরেছ কবে?

বিজয়—এই তো, তিনমাসও হয়নি।

সুমোহন—কী করছ?

বিজয়—কপালে যা ছিল, তাই করছি। সেই মেশিন। সেই ভাল্‌ভ্ কমপ্রেসর পিস্টন আর গ্যাসোলিন। হুশ্ হাস্ ভট্ ভট্ আর চুঁ চুঁ।

সুমোহন—সেই ফ্যাক্টরিতেই আছ?

বিজয়—হ্যাঁ। এখন আমি সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার। কী করব বল? এবার মরলে স্কলার হব।

হঠাৎ গলার স্বর চেপে দিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বিজয়—শুনছ সুমোহন?

সুমোহন—বলো।

বিজয়—তুমি কি জান যে, সেই পূর্বী, নাগপুরওয়ালি সেই পূর্বী এখন কলকাতাতেই আছে?

সুমোহন হাসে—জানি।

বিজয়—আমি একদিন দেখেছি, থিয়েটার রোড দিয়ে একা-একা হেঁটে যাচ্ছে পূর্বী। কী তার টেনসন, কী তার ভোল্টেজ, কী তার চার্জ আর স্পার্ক! মত্ কহো ভাই, মত্ কহো।

সুমোহন—সময় পেলে দেখা-সাক্ষাৎ করো, অন্তত মাঝে মাঝে।

বিজয়—নিশ্চয় নিশ্চয়।

চলে যায় সুমোহন।

ভাদ্রমাসের বৃষ্টির আকাশ সব মেঘ হারিয়ে আশ্বিনের নীলাকাশ হয়ে দেখা দিয়েছে, চোখে দেখেই বুঝতে পারে সুমোহন, বৃষ্টির দিন বলতে গেলে চলেই গিয়েছে। তাই টেলিফোনে পূরবীকে রোজই বলতে ইচ্ছে করে—আজ যাব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হবে কি হবে না, ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তাই বলা হয় না।

গোলোকবাবুকে খবর দেওয়া হয়েছিল, বাড়িটার অন্তত একটু ফেস-লিফ্‌ট্ দরকার। দরজা-জানালায় নতুন রং দরকার। সিঁড়িটার মোজায়েক দু জায়গায় ফেটেছে, দেয়ালের অনেক জায়গার ডিস্‌টেম্‌পার ভুসভুসে হয়ে গিয়েছে। এ দুটো দুরবস্থারও একটা বিহিত করা চাই। সারা বাড়িটারই রং-বদল চাই।

লোকজন নিয়ে এসে কাজ শুরু করে দিয়েছেন গোলোকবাবু। কাজেই পূরবীর কাছে রোজই যাওয়ার ইচ্ছে দমিয়ে রাখতে হয়। গোলোকবাবু যখন-তখন নির্দেশ খোঁজেন—গ্রিলগুলোতে অ্যালুমিনিয়াম পেন্ট ধরিয়ে দিই, স্যার, আপনি কী বলেন?

কিন্তু অনেক দিন পার হয়ে গিয়েছে, বোধ হয় পনেরো দিনেরও বেশি। পূরবী ভুল করে মনে করতে পারে যে...

টেলিফোনে ডাক দেয় সুমোহন—পূরবী!

পূরবী—বলো।

সুমোহন—আজ যাব।

পূরবী—শোনো!

সুমোহন—হাসছ মনে হচ্ছে!

পূরবী—একটা কথা বলছি, শোনো।

সুমোহন—বলো।

পূরবী—আজ এসো না।

সুমোহন—কেন? তার মানে?

পূরবী—আমি যেদিন টেলিফোনে বলব, সেদিন আসবে। কেমন?

সুমোহন—ঠিক কথা। এই ভাল। কোনও-কোনও দিন সন্ধ্যাবেলাতে তোমারও তো অন্য অনেক কাজ থাকতে পারে। তাই না?

পূরবী—হ্যাঁ।

॥ ১১ ॥

হৈমন্তী কুয়াশার মাস ফুরিয়ে গিয়েছে। এটা এখন শীতের মাস। নিউ আলিপুরের যত গাছের পাতা সন্ধ্যা হলেই কন্‌কনে শীতের ছোঁয়া লেগে কুঁকড়ে যায়, আর সকাল হতেই রোদের আলো লেগে তেজিয়ে ওঠে। সুমোহনের জীবনে শীতের মাসের দিনগুলো কিন্তু ঠিক এই নিয়মে চলছে না। গাছের পাতা আর মানুষের প্রাণ, এক বস্তু তো নয়। সুমোহনের প্রাণটা সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত রোদের আলো দেখেও যেন কুঁকড়ে পড়ে থাকে। আর সন্ধ্যাবেলাতে প্রথম অন্ধকার দেখা দিতেই তেজিয়ে ওঠে। বই-এর ঘরের ভেতর বসেই বার বার ব্যস্ত হয়ে ওঠে। মনে হয়, টেলিফোন বুঝি বেজেই চলেছে। কিন্তু তখনি বুঝতে পারে ওটা পাশের বাড়ির টেলিফোনের শব্দ। মাঝে মাঝে বাইরের ঘরে এসে, টেলিফোনের চকচকে চেহারাটার দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকতেও হয়। পূরবী ডাক দিলেই যেন তখনি সাড়া দিতে পারে সুমোহন।

ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে, যাই এইবার হাজারিবাগে গিয়ে আরও দশটা দিন আচার্য হরি শাস্ত্রীর সঙ্গে গল্প করে সেই গান্ধার আর্টের কিছু তথ্য জেনে আসি। কিন্তু সে ইচ্ছেও যেন উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে হয়ে যায়। কারণ, যে কোনও দিনের যে কোনও সময়ে পূরবীর টেলিফোনের ডাক এসে যেতে পারে—আজ এসো। এই অবস্থায় একটা দিনের জন্যও বাইরে গিয়ে থাকলে ভুল হবে। এক ঘন্টার জন্য বাড়ির বাইরে বেড়াতে গেলেও ভুল হবে।

হেসে ফেলে সুমোহন; এ যে একটা চমৎকার স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা। পূরবী যেন অদ্ভুত একটা অপেক্ষার আবেশ দিয়ে সুমোহনের ভালবাসার মনটাকে অভিভূত করে আর অনড় করে বসিয়ে দিয়েছে। শীতের মাসের দিনগুলিও যে ফুরিয়ে যাচ্ছে, তারও কি কোনও হিসাব রাখে না পূরবী? আর তিনটে মাস পার হলেই যে পূরবীকে আর থিয়েটার রোডের ওই ফ্ল্যাটের ঘরে বসে থাকতে হবে না, এই বাড়িতেই চলে আসতে হবে, সেকথা তো পূরবীর পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। সেকথা যে পূরবীর প্রাণেরই একটা গুঞ্জন।

মনে হয়, মনে হতেই আবার হেসে ফেলে সুমোহন। ক্রিটিক পূরবী আর অবজার্ভার পূরবী বোধ হয় চমৎকার একটি প্ল্যানার পূরবী। পূরবী বোধ হয় মনে মনে ঠিক করে রেখেছে যে, 'আজ এসো' বলে টেলিফোনে ঠিক সেদিনই ডেকে নেবে পূরবী, যেদিন সন্ধ্যাবেলাতে সুমোহনের হাত থেকে ফুলের গুচ্ছ হাতে নিয়ে, আইনের আর আনন্দের সব অনুষ্ঠান সেরে নিয়ে সুমোহনের হাত ধরে বাড়িতে চলে সে আসবে।

তাই ভাল। চিরদিনের আপন হয়ে যাবার আগে কিছুদিনের অদেখা; ভালবাসার জগতের একটি খুব ভাল প্রথা। তা ছাড়া, এ তো সহজ সুন্দর একটি মেয়েলি কুণ্ঠারও প্রথা। সে কুণ্ঠা থেকে স্কলার মেয়ে পুরবীর প্রাণও রেহাই পেতে পারে না। পুরবীও বোধ হয় এই রকম একটি লাজুক অনিচ্ছা সহ্য করে নিজেকে নীরব করে বসিয়ে রেখে দিয়েছে।

অনেকদিন পরে আবার একদিন, বাইরের ঘরে বসে আর চকচকে টেলিফোনের চেহারাটার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকবার পর, যখন আবার বাইরের আলো-ছায়ার চেহারাটা দেখতে চেষ্টা করে সুমোহন, তখন দেখতে পায়, পাশের বাড়ির বকুলের শুকনো পাতা উড়ে এসে এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, হালকা ঝড়ের বাতাস বইছে। কী আশ্চর্য, শীতের মাসের দিনগুলি কবে আর কেমন করে এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল?

চমকে ওঠে সুমোহন। টেলিফোন বেজে উঠেছে।

—কে, পুরবী?

—না স্যার, আমি, গোলোক বরাট।

—বলুন!

—কাজ আপনার পছন্দ হয়েছে তো, স্যার?

—বাড়ির বাইরেটা দেখতে খুব ভাল হয়েছে। রোজ-পিঙ্ক রং মানিয়েছে ভাল, খুলেছেও ভাল। কিন্তু ভেতরের কাজটা ভাল হয়েছে বলতে পারি না।

—কেন স্যার?

—মোজায়েকের মেরামত খাপছাড়া হয়েছে। ডিস্‌টেম্‌পার কিরকম যেন ঘেয়ো-ঘেয়ো বলে মনে হচ্ছে।

—ওটা কিছু নয়।

—কেন?

—ওটা সামান্য ব্যাপার, স্যার। আসল ব্যাপার হল বাইরের চেহারা।

—কী বললেন, আসল ব্যাপারটা কি?

—বাইরেটা যদি দেখতে খুব চমৎকার হয়, তবে ভেতরে একটু-আধটু এথি-ওথি হলে কী আসে-যায় স্যার?

—বাঃ, কী চমৎকার কথাই না বলছেন!

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে আবার চেয়ারের উপর চুপ করে বসে থাকে সুমোহন। যাক, তবু ভাল, বাড়ির বাইরেটার রং ভাল খুলেছে। পূরবীর কাছে এই রোজ-পিঙ্ক খুবই প্রিয় একটি রং।

গেটের কাছে একটা ট্যাক্সি এসে থেমেছে। কে এল? কে আসছে? বিজয় কুলকার্ণি। আসুক, বিজয় মানুষটা ভাল, কিন্তু সব সময় ওর স্থূল ভাষার কথাগুলি শুনতে ভাল লাগে না।

বিজয় ঘরে ঢুকেই দুহাতে সুমোহনকে জড়িয়ে ধরে, তার পরেই রঙিন খামের একটি চিঠি সুমোহনের হাতের কাছে এগিয়ে দেয়। —আমার শুভ বিবাহ।

হেসে ওঠে সুমোহন—খুব ভাল খবর।

বিজয়—পূর্বীর সঙ্গে আমার বিয়ে।

দুচোখ বড় করে আর চেঁচিয়ে হেসে ওঠে সুমোহন। —কেন? কী হল?

বিজয় হাসে—প্রেম হলে যা হয় তাই হল। খুব হঠাৎ আর খুব তাড়াতাড়ি পূর্বীর সঙ্গে যখন খুব ভাল একটা প্রেম হয়েই গেল ভাই, তখন আর দেরি করি কেন?

চেয়ারে বসেই আবার কথা বলে বিজয়—পূর্বী কিন্তু বড় সান্ত আর বড় লাজুক মেয়ে। দূর থেকে যা মনে হয়েছিল, মোটেই তা নয়। আমি একদিন বললাম—মেশিনের আওয়াজে তোমার আর্টের মূর্তির কান ঝালাপালা হবে না তো পূর্বী? পূর্বী শুধু মাথা নিচু করে আর মিষ্টি করে একটু হাসল আর বলল—না, হবে না।

সিগারেট ধরায় আর পা দোলায় বিজয়। তারপর আবার ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। —জানি তোমার সময় কম, তবু কষ্ট করে একবার যেও, ভাই। ....চলি!

মৃদু হর্ষের মত ছোট্ট একটি শব্দ তুলে ট্যাক্সিটা চলে গেল। কিন্তু কী অদ্ভুত একটা চিৎকারের মত শব্দ করে বেজে উঠল সুমোহনের কথাগুলি—চা নিয়ে এসো, শুকদেও।

ঠাকুর শুকদেও ভয় পেয়ে ছুটে আসে। বাবু হঠাৎ এরকম রাগ করে চেঁচিয়ে উঠলেন কেন? কিন্তু দেখতে পেয়ে নির্ভয় হয়, বাবু শুধু চেঁচিয়ে হেসে উঠেছেন।

সুমোহন বলল—এক গেলাস জল দিয়ে যাও।

শুকদেও ব্যস্ত হয়ে চলে যেতেই সুমোহনও ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়—টেলিফোনে কথা বলে—হ্যালো, আব্রাহাম্স্ স্টুডিও?

—ইয়েস স্যার।

—আমি এস. দত্ত, নিউ আলিপুর। চেক পাঠিয়ে দিয়েছি, পেয়েছেন?

—পেয়েছি, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার!

পূরবী ভাবছে, সুমোহন দত্তকে মস্ত একটা ঠাট্টা করা হল। কিন্তু জানে না পূরবী, সুমোহন দত্ত যে পূরবী নাগ নামক বস্তুটিকে একটা ঠাট্টা বলে মনে করে। একটা অভদ্রতা করতে হলে এখনই টেলিফোনে ডাক দিয়ে পূরবীকে আসল সত্য কথাটা বলে দিতে হয়, খাজুরাহোর মিথুন-নায়িকার ওয়েস্ট লাইন আর থাই লাইন খাজুরাহোতেই আছে, তোমাতে ওসবের কিছুই নেই। তোমার শরীরের নিলাজ বিস্ময়ের ছবিটা ভরাট কোমলতার ছবিই নয়, মাংসল জড়তার ছবি। তার মধ্যে কোনও ছন্দ-টন্দ নেই। আর ওগুলিও কোন লোভন মায়ার রেখা আর বলয় নয়, কতকগুলি খাঁজ আর ভাঁজ। ভাবলে ভয় পাই, লজ্জাও বোধ করি যে, এই হেন বস্তুটি ঘরে আনবার স্বপ্ন দেখেছিলাম।

এক যে ছিল রাজা, সে রাজা বনে মৃগয়া করতে গিয়ে দেখেছিল, গাছতলায় চমৎকার এক রূপসী বসে আছে। রাজা মুগ্ধ, রাজা তখনও জানত না যে, একটা টিয়ে পাখি উড়ে এসে রাজার মাথাটা ঠুক্‌রে দেবে, রাজা তখনই দেখতে পাবে যে, রূপসীর মুখের ভেতরে বড় বড় দাঁত লুকিয়ে রয়েছে, সারা গায়ে ছুঁচের মত রোঁয়া ফুটে উঠছে। রাজার কিন্তু ভাগ্য ভাল, টিয়ে পাখিটা ঠিক সময়ে উড়ে এসে রাজার মাথাতে একটা ঠোকর দিল।

ভাল গল্প। সেই কবে পাটনাতে ছেলেবেলার টিউটর সন্তুবাবুর মুখে যে গল্প

শুনেছিল, আজ আবার মন দিয়ে সেই গল্পটাকেই শুনছে সুমোহন। সন্তুবাবু বেঁচে থাকলে আজ বলতে পারত সুমোহন, আমারও ভাগ্য ভাল সন্তুকাকা, টিয়ে পাখিটা আমার মাথা ঠুক্‌রে দিয়েছে। কিন্তু উড়ে আসতে বেশ দেরি করে ফেলেছে।

পূরবীর কাছ থেকে 'আজ এসো' বলে একটা ডাক শোনবার জন্য তবে এতদিন ধরে মিথ্যে এত ছটফট করলে কেন? এই চকচকে টেলিফোনের ভেতর থেকে যদি কোনও ভূতুড়ে কণ্ঠস্বর মুখর হয়ে এরকম একটা প্রশ্ন করে বসে, তবে কি কোনও জবাব দিতে পারবে সুমোহন?

নিশ্চয় জবাব দিতে পারি। পূরবী বোধ হয় কখনও পাগলা ইঞ্জিন দেখেনি, কিন্তু আমি দেখেছি। অনেক বছর আগে একদিন দানাপুরের স্টেশনে এক পাগলা ইঞ্জিনের কাণ্ড দেখতে হয়েছিল। ড্রাইভার বেচারা ইঞ্জিনকে পিছিয়ে নেবার জন্য কত কলকাঠি নাড়ছে, কিন্তু ইঞ্জিন শুধু এগিয়েই যায়। থামে না, পিছোয়ও না। এইরকম একটি ইঞ্জিন, পূরবীর ডাক শোনবার জন্য ছটফট করেছিল, পাগলা ইঞ্জিনের পিছিয়ে যাবার শক্তি আর ইচ্ছাটাও বিকল হয়ে গিয়েছিল।

তুমি কিছুই নও পূরবী, একেবারে কিচ্ছু না। তুমি সরে পড়াতে সুমোহন দত্তের বুকের পাঁজরে একটা টোকার ব্যথাও বাজছে না।

সিগারেট ধরিয়ে ঘরের ভেতরে পায়চারি করে খবর-কাগজ পড়তে থাকে সুমোহন। মনের উপর কোনও ভার নেই, নিশ্বাসে কোনও গুমোট নেই, মুক্তি পাওয়া সচল জীবনের অবাধ পায়চারি।

চাকরটাকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করে সুমোহন—আজ কি বাজার করেছিস রামদেও?

—মাছ ভাল পেলাম না বাবু। ছানা নিয়ে এসেছি। আলু আর পটলও এনেছি।

—ব্যস, ওতেই হবে। শুকদেওকে বল, ছানার তরকারিতে যেন পেঁয়াজ-রসুন না দেয়।

বই-এর ঘরের ভেতরে এসে পাটনার উকিলবাবুকে চিঠি লেখে সুমোহন—সম্পত্তিটার গোলমাল বোধহয় এতদিনে মিটে গিয়েছে। সব খবর জানিয়ে চিঠি দেবেন।

স্নান করবার পর এত স্নিগ্ধতা, শরীরে মনে ও প্রাণে, কোনও অনুভব করেনি সুমোহন। শান্তি। সুমোহনের মুখের হাসিতেও স্নিগ্ধতা।

কোনও ক্লান্তি নেই, তবে শুয়ে পড়বার পাঁচ মিনিটের মধ্যে কী নিবিড় ঘুমের আবেশ এসে গেল। তার উপর প্রথম ফাল্গুনের ফুরফুরে দুপুরে বাতাস। সুমোহনের এই গভীর ঘুমের মধ্যে কোনও স্বপ্নও আজ আর নেই।

ঘুম ভাঙে তখন, যখন আকাশে অনেক তারা জেগেছে। বিছানা থেকে উঠে, চোখ-মুখ ধুয়ে, আর বাইরের ঘরে এসে চা খায় সুমোহন। —শুকদেও, আর এক পেয়ালা চা দাও।

আবার চা খেয়ে নিয়ে হাতের ঘড়ির দিকে তাকায় সুমোহন—এঃ, এ যে বেশ রাত হয়েছে দেখছি।

শুকদেও—আমিও তো ভাবছি, বাবু এত রাতে দুবার করে চা খাচ্ছেন কেন?

সুমোহন—তবে চলো, রাতের খাওয়া খেয়েই নিই।

খেতে খেতে গল্প করে আর হাসে সুমোহন—কে বেশি গাঁজা খায় শুকদেও? তুমি, না রামদেও?

শুকদেব—না বাবু, আমি ওই নেশার জিনিস কবেই ছেড়ে দিয়েছি।

সুমোহন—আর তুই? কি রে রামদেও, তুইও ছেড়ে দিয়েছিস নাকি?

রামদেও হাসে—এই মাঝে মাঝে।

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সুমোহনের প্রাণটা এইভাবে সহজ ছন্দে হেসে ঘুমিয়ে আর কথা বলে বলে চলেছে। মনের জোরে মনের সব কাঁটা তুলে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পেরেছে সুমোহন। ভাবতে গিয়ে নিজেই আশ্চর্য হয়, একলা হওয়া জীবনটাকে একটুও শূন্যতা বলে মনে হয় না।

বই-এর ঘরে ঢুকে সোফার উপর চুপ করে বসে থাকে সুমোহন। কিন্তু হঠাৎ এই চুপ করে বসে থাকা সুমোহনের চোখ দুটো একবার চমকে উঠেই আবার স্থির হয়ে যায়। জ্বল-জ্বল করে দুটো অপলক চোখ। সে চোখে বই পড়বার কোনও ব্যাকুলতা নেই, ঘুমের কোনও আবেশ নেই। একটি মিনিট নয়, দু মিনিট নয়, দু'ঘন্টার সব মুহূর্ত ঝরে ঝরে বাইরের ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে উড়ে চলে যায়। তবু বসে থাকে সুমোহন।

চারদিকে তাকিয়ে যেন একটু দেখতে আর বুঝতে চেষ্টা করে সুমোহন। বাড়িটা এত বেশি নীরব কেন? কোথায় গেল সেই ফুরফুরে হাওয়া? এত গুমোট কিসের? বাইরে, না ঘরের ভেতরে? হাতের ঘড়ির দিকে তাকায় সুমোহন, এ যে মাঝরাতের চেয়েও বেশি রাত।

চোখ দুটো বার বার কেঁপে উঠছে। প্রতি নিশ্বাসের বাতাসে কী অদ্ভুত একটা পিপাসাও ছটফট করছে! বুকের উপর একটা হাত চেপে রেখে যেন দুঃসহ একটা জ্বালার উৎপাত চেপে রাখতে চেষ্টা করে সুমোহন।

ধুলো ধুলো ধুলো, ধুলো জমাট হয়ে বইগুলোর চেহারা ঢেকে ফেলেছে। বইগুলোকে জঞ্জালের গাদার মত দেখাচ্ছে। কেউ কি একবার ভুলেও এই ঘরের ভেতরে এল না আর দেখল না যে, বই-এর উপর এত ধুলো জমেছে।

একলা হওয়া এই শূন্যতা যেন একটা রাক্ষুসে কামড়; সুমোহনের পাঁজর চিবিয়ে খেতে চাইছে। একবার উঠে দাঁড়ায়, তারপরেই আবার বসে পড়ে সুমোহন, তার পরেই দুচোখ বন্ধ করে একেবারে নিঝুম হয়ে যায়।

কিন্তু কতক্ষণ? আবার হঠাৎ চমকে ওঠে সুমোহন। চোখ মেলে তাকায়। যেন একটা স্বপ্নের ছবিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে হাতটা মট্ করে ভেঙে গিয়েছে।

একবার ওদিকে তাকায়, একবার সেদিকে তাকায়, যেন খুব সন্তর্পণে বুঝতে চেষ্টা করছে সুমোহন, ঘরের জানালার কোনও ফাঁক দিয়ে উঁকি দেবার জন্য কেউ দাঁড়িয়ে আছে কিনা।

ঠোঁট কাঁপে, চোখ কাঁপে, বুকটাও থেকে থেকে যেন উথলে উঠতে চেষ্টা করে। কী দুরন্ত-ব্যাকুল একটা পিপাসার মূর্তি এই সুমোহন।

আস্তে আস্তে টেবিলের একটা দেরাজের দিকে হাত বাড়ায় সুমোহন। দেরাজের ভেতর থেকে একটি বস্তু বের করে টেবিলের উপর রাখে। সোনা নয়, হীরা নয়, একটি অ্যালবাম। সে অ্যালবামের গায়ে এক ছিটেও ধুলো নেই।

মন প্রাণ আর চোখের সব পিপাসা ঢেলে এক-একটি ছবিকে দেখতে থাকে সুমোহন, যে ছবি ধরে ধরে সুখী হয়েছিল শক্তিশালী জাপানি ক্যামেরার লেন্স।

কোনও খাজুরাহোর পাথুরে মিথুন-নায়িকার ছবি নয়, এই সেদিনও এ বাড়ির ওই ঘরে ছিল যে, যার নাম হিমানী, তারই অসাজ অলাজ আদুড়ে দেহটার সব ভঙ্গির সব ছবি। সে ভঙ্গিতে চকিত বিদ্যুৎ আছে, উতলা ঝড় আছে, ভরা দীঘির টলমল জল আছে, শালমঞ্জরীর দোলা আছে। মূর্তিলোকের কোনও মিথুন-নায়িকা জানে না, শুধু এক হিমানী জানে, এলিয়ে পড়া শরীরেও এমন বিস্ময়ের ভঙ্গি কেমন করে সম্ভব হয়। সে ভঙ্গিতে কোমলতার স্তবকের মত এরকম একটি ছন্দিত তনুশোভা ফুটিয়ে তুলতে পৃথিবীর আর কেউ পারে না, শুধু এক হিমানীই পারে।

সুমোহনের কপাল থেকে বড় বড় ঘামের ফোঁটা ঝরে পড়ে। হাত তুলে কপাল মুছতে থাকে সুমোহন।

আলো নিভিয়ে দেয়, শুয়ে পড়ে সুমোহন। ঘুমিয়ে পড়ে।

নিঝুম হয়ে যায় শেষ রাতের প্রহর। কিন্তু হঠাৎ জেগে ওঠে সুমোহন। জেগে ওঠে ঘুমহারা একটা দুরন্ত অবাধ্য পিপাসা।

বিছানা থেকে নেমে, অন্ধকারের মধ্যে পা টিপে টিপে এগিয়ে আর সুইচ টিপে আলো জ্বালে সুমোহন। টেবিলের দেরাজ থেকে টেনে বার করে চকচকে অ্যালবাম। ছবি দেখতে থাকে সুমোহন। চোখের পলক আর পড়ে না। বুঝতে পারে না সুমোহন, আর কতক্ষণ দেখতে হবে, আর কতকাল দেখতে হবে।

গল্প

নায়িকা মুগ্ধা

দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে কুন্তলা, মানুষ এভাবে একটা অসম্ভবের আশায় এত ব্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। ভদ্রলোকের নাম-ধাম গোত্রের কোন পরিচয় জানে না কুন্তলা। ভদ্রলোকও কুন্তলার নাম-ধাম-গোত্রের কী পরিচয়—আর কতটুকু পরিচয় জানতে পেরেছে, কে জানে? মনে হয়, কিছুই জানতে পারেনি। জানবে কেমন করে? ভদ্রলোক শুধু জানে যে, এই অফিসে কাজ করে কুন্তলা। কুন্তলা নামটাকেও জানে বলে মনে হয় না। জানলে এতদিনে কি কুন্তলার নামে আর এই অফিসের ঠিকানাতে একটা চিঠি লিখে ফেলত না এই ভদ্রলোক?

মান-সম্ভ্রমের কোন বোধ, কিংবা কোন লজ্জার বোধ এই ভদ্রলোকের আছে কিনা সন্দেহ। পাঁচটা বাজতেই অফিসের যখন ছুটি হয়, তখন অফিসের বাইরে এসেই দেখতে পায় কুন্তলা, বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে আছেন এই ভদ্রলোক। সাজে-পোষাকে বেশ পরিপাটি যত্ন আছে, দেখতেও বেশ ভাল। বয়সই বা কত হবে? ত্রিশের বেশি হতেই পারে না। কে জানে কোথায় কী কাজ করেন ভদ্রলোক। ঝড় বৃষ্টি আর কড়া রোদ, শীত গ্রীষ্ম আর বর্ষার সব দিনেই দেখা যায়। ভদ্রলোক একেবারে নিয়মিত ও অমোঘ একটি আবির্ভাবের মতো কুন্তলার এই অফিসের বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন।

এই অফিসের কোন লোকের সঙ্গে ভদ্রলোকের আলাপ-পরিচয় কিংবা সামান্য চেনাশোনাও যে নেই, সেটাও বেশ বুঝতে পারা যায়। ছুটির পর অফিসের এত লোক বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে জটলা পাকিয়ে গল্প করে নিচ্ছে, হাসাহাসি করছে, খেলার কথা আর সিনেমা-ছবির কথা আলোচনা করছে, কিন্তু কই? এই ভদ্রলোকের সাথে তো কাউকে কথা বলতে দেখা যায় না। অফিসের লোকেরা মনে করে, এই ভদ্রলোক নিজের কোন কাজের জন্য এসেছেন আর দাঁড়িয়ে আছেন, কিংবা কারও অপেক্ষায় রয়েছেন। কিন্তু কোন্ কাজের জন্য কিংবা কার অপেক্ষায়, সেটা জানবার জন্যে কারও মনে কোন ইচ্ছা বা চেষ্টার সাড়া নেই। কুন্তলাকেও তাই একটু আশ্চর্য হতে হয়েছে আর সন্দেহও করতে হয়েছে, তবে কি কুন্তলাকে দেখবার জন্যেই ভদ্রলোক রোজ পাঁচটার কয়েক মিনিট আগে এখানে আসেন আর দাঁড়িয়ে থাকেন?

পুরো একটা বছর হলো, ভদ্রলোক রোজ আসছেন। রোজ এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে, তারপর কোথায় কোন্ দিকে কখন যে চলে যান, তাও জানে না কুন্তলা। কারণ, অফিস থেকে বের হয়ে এই ভদ্রলোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বেশ একটু বিরক্ত হয়ে সেই যে মুখ ঘুরিয়ে নেয় কুন্তলা, তারপর আর কোন মুহূর্তেও ভদ্রলোকের দিকে

তাকায় না। গেট পার হয়ে ফুটপাথের উপরে এসে প্রায় পাঁচ-দশ মিনিট কুন্তলাকেও দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কিন্তু ভুলেও মুখ ফিরিয়ে পিছনে তাকায় না কুন্তলা। জানতেও পারে না কুন্তলা, ভদ্রলোক এখনও সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন কি নেই।

ভদ্রলোক কি সত্যিই বিশ্বাস করেছেন যে, কুন্তলা একদিন হঠাৎ করে কথা বলবে? ভদ্রলোকের চোখের চাহনিতে যেন একটা আশার ব্যাকুলতা লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু কী ভয়ানক একটা ভুল স্বপ্ন মনে পুষে রেখেছেন ভদ্রলোক। কুন্তলার মতো মেয়ে যে কোনদিনও নিজেকে এত ছোট আর এত নীচু করে ফেলতে পারে না, সে-খবর জানেন না ভদ্রলোক। একজন অচেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা বলা কুন্তলার মতো মেয়ের জীবনের কোন গরজ হতে পারে না। কুন্তলার মতো শিক্ষিতা আর সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে যেচে কথা বলবার জন্য কারা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, সে খবরও জানেন না এই ভদ্রলোক। কিন্তু ভদ্রলোকের চোখের চাহনিতে একটু সাবধানতা আর একটু বুদ্ধি থাকলে ভদ্রলোক বুঝতে পারতেন। রোজই তো ওখানেই দাঁড়িয়ে দেখতে পান ভদ্রলোক, এই পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে পর-পর তিনটে গাড়ি এসে দাঁড়ায়। গাড়ির ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে কথা বলে চলে যায় এক-একটি তরুণ অনুরোধ—চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

এই ভদ্রলোক জানেন না, ওরা কারা এত আগ্রহ করে কুন্তলার একটু সান্নিধ্য কামনা করে এরকম অনুরোধের কথা বলছে। ওরা শিক্ষিত, ওরা যথেষ্ট বিত্তবান আর বড় রোজগারের মানুষ। ওরা এক-একটা সুন্দর শখের আর স্টাইলের মানুষ। কুন্তলা যদি নিজে একটু আগ্রহ করে ওদের কারও একজনের গাড়িতে উঠে পড়ে, তবে একদিন তারই জীবনের চিরকালের সঙ্গিনী হয়ে যাবে কুন্তলা, এই সত্যে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু না, কুন্তলার জীবনে এই অহঙ্কারটুকু আছে; একটা ঝকঝকে গাড়ির অনুরোধের ভাষা শুনে একেবারে খুশিতে আত্মহারা হয়ে যাবে, এমন মনের মেয়ে নয় কুন্তলা।

তাই ভাবতে গিয়ে মনে-মনে এক-একবার হাসিও পায় কুন্তলার। এই ভদ্রলোকের আশার সাহস তো খুবই অদ্ভুত। শুধু চুপ করে একটা অপেক্ষার মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেই স্বপ্ন সফল হবে, এইরকম একটা বিশ্বাস ভদ্রলোকের কাণ্ডজ্ঞান নষ্ট করে রেখে দিয়েছে। তা না হলে কি একটা মানুষ এভাবে পুরো এক বছর ধরে শুধু কুন্তলাকে একবার দেখবার জন্য রোজ এসে এই অফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন?

এভাবে অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকলেও ভদ্রলোকের কোন লাভ হবে না। কারণ ভদ্রলোক জানতে পারছেন না, এই এক বছরের মধ্যে কুন্তলার মনে এই অচেনা আবির্ভাবের উপর কত বিরক্ত ও তিক্ত হয়ে উঠেছে। এটা যে কুন্তলার জীবনের উপর একটা উপদ্রব। অফিস থেকে বের হবার আগেই কুন্তলার মনে অস্বস্তিতে ভরে

যায়। বের হয়েই তো দেখতে হবে, সেই ভদ্রলোক অদ্ভুত একটা পিপাসা দুই চোখে ভরে নিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে আছেন। কুন্তলা বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই একেবারে একটা মুগ্ধতার মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কুন্তলার সুন্দর মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকবেন ভদ্রলোক। সে-সময় ভদ্রলোকের বুকের ভিতরে সব নিঃশ্বাসের আনাগোনাও বোধহয় বন্ধ হয়ে যায়। এক-একবার চোখে পড়েছে কুন্তলার, ভদ্রলোকের হাতের জ্বলন্ত সিগারেট শুধু পুড়ছে, সিগারেট মুখে দিতে ভুলে গিয়েছেন ভদ্রলোক।

প্রথম প্রথম ভয় হতো; ট্রামে উঠেই একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিত কুন্তলা, ভদ্রলোকও পিছু পিছু এসে ট্রামে উঠে পড়েননি তো? ট্রাম থেকে নেমেও সাবধানে একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখতো কুন্তলা, ভদ্রলোকও ট্রাম থেকে নেমে পড়েননি তো? সন্দেহ হয়েছিল, এমন বেহায়া মানুষ কুন্তলার বাড়ির সন্ধান নিতেও চেষ্টা করবে।

ভুল সন্দেহ। মিথ্যে ভয়! এই অদ্ভুত ভদ্রলোকের সব মতলব আর ইচ্ছা যেন নিদারুণ এক অলস তপস্যার মধ্যে অনড় হয়ে পড়ে আছে। শুধু কুন্তলাকে চোখে দেখবার চেষ্টা ছাড়া আর কোন চেষ্টাই নেই।

আরও আশ্চর্য, এই এক বছরে কলকাতা শহরের কত জায়গাতেই তো যেতে হলো কুন্তলার, কতবার ট্রামে বাসে ঘুরতে হলো; কত দোকানে ঘুরে জিনিস কিনতে হলো, কিন্তু কোনদিনও তো কোথাও এই ভদ্রলোকের দেখা পাওয়া গেল না। কুন্তলা যদি ভদ্রলোকের কাছে এমনই একটি আকাঙ্খার স্বপ্ন হয়ে থাকে, তবে কুন্তলাকে পৃথিবীর অন্য কোন জায়গাতে একবার দেখবার জন্য কোন সখে ভদ্রলোকের মন চঞ্চল হয়ে ওঠেনি কেন? কুন্তলার জীবনটাতো শুধু এই অফিসের ছ'টি ঘন্টার জীবন নয়। কুন্তলাকে তো ছবির এগজিবিশনে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সিঁড়িতে আর সিনেমা লাউঞ্জেও দেখা যায়। ভদ্রলোক যদি কুন্তলার জীবনের পরিচয় আরও ভাল করে পেতে চাইতেন, তবে কুন্তলার ছায়া অনুসরণ করে কুন্তলার নাম-ধাম-গোত্রের পরিচয় জেনে নেওয়া উচিত ছিল। তাহলে, আর চেষ্টা করলেই দেখতে পেতেন ভদ্রলোক, কুন্তলার এই সুন্দর চেহারা কী অদ্ভুত সুন্দর সাজে সেজে মার্কেটের স্টলের পাশ দিয়ে রাস্তা ধরে চলে যায়।

কুন্তলার অস্বস্তিটা যেন মাঝে মাঝে আক্ষেপ করে উঠেছে, এই ভদ্রলোককে আর কোথাও কোনদিনও দেখতে পাওয়া গেল না। ভদ্রলোকের উপরে মনের এই এক বছরের যত সন্দেহ বিরক্তি আর বিদ্রূপ, সবই যেন হঠাৎ জব্দ হয়ে গিয়ে ছটফট করে। লোকটাকে ঘেন্না করবার মতো এত কারণ থাকতেও ঘেন্না করতে পারা যাচ্ছে না।

কিন্তু ইচ্ছে করে ঠিকই, মনের অস্বস্তিটা যেন একটা জ্বালা হয়ে ওঠে। ভদ্রলোককে একটা কথা শুনিয়ে দিতে ইচ্ছা করে, এভাবে একটা মেয়ের চোখের কাছে রোজই উপদ্রবের মতো দেখা দিতে আপনার কি একটুও লজ্জা বোধ হয় না?

সেদিন খুব ঝড় আর বৃষ্টি চলছিল। তাই অফিসের ছুটির পরেও বাইরের বারান্দায় এসে কুন্তলাকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। অচেনা ভদ্রলোকের চোখের সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল কুন্তলা। মনে হয়েছিল, আজ নিশ্চয়ই ভুল করে কথা বলে ফেলবেন ভদ্রলোক। সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত জবাবও শুনিয়ে দেবে কুন্তলা। তার মানে, একটিও কথা না বলে ভদ্রলোককে বুঝিয়ে দেওয়া হবে যে, কুন্তলার কাছে উনি নিতান্ত একটি তুচ্ছ অস্তিত্ব।

না; এমন তুচ্ছতা দেখাবার সুযোগও পায়নি কুন্তলা। কারণ এই অদ্ভুত ভদ্রলোক কুন্তলাকে চোখের এত কাছে আধ ঘন্টা ধরে অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও একটি কথা বললেন না।

বৃষ্টি থামবার পর, ট্রামে ওঠবার পর, ট্রাম থেকে নেমে বাড়ি ফিরে এসে চা খাওয়ার পরও ঘরের ভিতরে চুপ করে পুরো একটি ঘন্টা বসে থাকবার পর, কুন্তলার মনের ভিতরে যেন একটা অদ্ভুত অভিমানের মনের বেদনা জ্বলতে থাকে। সেই অভিমানের সঙ্গে যেন একটা অপমানের ছায়াও মিশে আছে। লোকটা যেন আজ নিজেই মস্ত বড় একটা সুবিধা পেয়ে গিয়ে কুন্তলাকে তুচ্ছ করে সুখী হয়ে গেল।

কিন্তু পরের দিনও তো আবার ঠিক সেই পাঁচটার সময় অফিসের বারান্দায় একটা দুরন্ত পিপাসিত অপেক্ষার মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ভদ্রলোক। কুন্তলাকে দেখতে পেয়ে ভদ্রলোকের চোখ দুটো তো আবার সেই রকমই নিবিড় হয়ে ওঠে।

প্রণব সরকার গেটের সামনেই রাস্তার উপর গাড়ি থামিয়ে জোরে হর্ণ বাজাচ্ছে। ইচ্ছা করে কুন্তলার, এখনই হেসে-হেসে সাড়া দিয়ে প্রণব সরকারের গাড়ির ভিতরে উঠে পড়তে। তারপর দেখা যাবে, এই ভদ্রলোকের চোখ দুটো বোকা হয়ে, জব্দ হয়ে আর করুণ হয়ে তাকিয়ে থাকে কিনা।

কিন্তু তা তো সম্ভব নয়, এই সামান্য একটা অচেনা অজানা লোকের চোখের আশাকে জব্দ করতে গিয়ে কুন্তলা একটা জঘন্য কাণ্ড করে ফেলতে পারে না।

কিন্তু আর চুপ করে থাকবারও যে শক্তি নেই কুন্তলার। এই ভদ্রলোকের চোখের ওই ভয়ানক শান্ত লোভের দৃষ্টি আর সহ্য হয় না। ভদ্রলোককে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করে ফেললেই তো হয়—আপনি রোজ এখানে আসেন কেন? কোন্ সাহসে? অপমানিত হবার কোন ভয় নেই বুঝি?

এমন প্রশ্ন করবার ইচ্ছাটা যে একটা যুক্তিহীন অভদ্রতার ইচ্ছা, তাও বোধহয় ভুলে গিয়েছিল কুন্তলা। তা না হলে সেদিন হঠাৎ চোখ-মুখ একেবারে কঠোর করে নিয়ে আর রুক্ষস্বরে ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করে ফেলতে পারতো না কুন্তলা—আপনি রোজই এখানে কিসের জন্য আসেন? এই অফিসে আপনার কী কাজ আছে?

ভদ্রলোক হাসতে চেষ্টা করেন—কোন কাজের জন্য আসিনা।

—অদ্ভুত কথা। কাজ নেই, তবু এক বছর ধরে রোজই আসেন। লজ্জার কথা।

—লজ্জার কথা কেন হবে। আপনিই বা একথা বলছেন কেন?

—আমি কেন বলছি, সেটা আপনি জানেন!

—আমি তো আপনাকে চিনিও না।

—আমিও তো আপনাকে চিনি না।

—তাই তো বলছি, আপনি হঠাৎ আমাকে এরকম একটা বাজে কথা জিজ্ঞাসা করে বসলেন কেন?

কুন্তলার গলার স্বর আরও রুক্ষ হয়ে ওঠে। —আপনি রোজই এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন, এটা খুব কাজের কাজ, না?

—না।

—আপনার উদ্দেশ্য কি?

—আপনি পুলিশের মতো মেজাজ নিয়ে কথা বলছেন কেন? ভদ্রলোকের গলার স্বরও ভয়ানক তীক্ষ্ণ হয়ে কুন্তলাকে পাল্টা প্রশ্ন করে।

অফিসের ঘরের ভিতর থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে আর লাঠি ঠুকে ঠুকে বের হয়ে এলেন অফিসের সিনিয়র ক্লার্ক, বুড়ো অনাদিবাবু। চোখে ভাল দেখতে পান না। তাই পুরু লেন্সের চশমার আড়াল থেকে অনাদিবাবুর চোখ দুটো টান হয়ে সামনের মানুষগুলিকে দেখবার চেষ্টা করে। মৃদুস্বরে একটা কথাও বলেন অনাদিবাবু—মনোজ এসেছ নাকি!

—এই যে, আমি এসেছি কাকা। এগিয়ে গিয়ে অনাদিবাবুর হাত ধরেন ভদ্রলোক।

চমকে ওঠে কুন্তলা। ভদ্রলোকের মুখের দিকে, তার মানে মনোজের মুখের দিকে অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে।

যেন কুন্তলার জীবনের এক বছরের একটা আদুরে স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এই মনোজ তাহলে কুন্তলার জীবনের কোন উপদ্রব নয়। বুড়ো কেরানী অনাদিবাবু হলেন এই মনোজের কাকা। স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছে, চোখে ভাল দেখতে পান না কাকা, তাই ভাইপো রোজই এখানে এসে কাকাকে বাড়ি নিয়ে যায়। এই তো ব্যাপার।

কিন্তু কী ভয়ানক ছলনার ব্যাপার। এই ছলনা এক বছর ধরে কুন্তলার প্রাণটাকে অস্বস্তির কাঁটায় বিঁধে বিঁধে কষ্ট দিয়েছে। আর এখন কত খুশি হয়ে নিশ্চিন্ত মনে, যেন একটা জয়ের গর্ব নিয়ে কাকার হাত ধরে চলে যাবার জন্য তৈরি হয়েছে মনোজ।

চোখ ভিজে গিয়েছে কুন্তলার। অনাদিবাবুর কাছে এগিয়ে যায় কুন্তলা—আমাকে চিনতে পারছেন তো?

অনাদিবাবু চোখ টান করে তাকান—ও হ্যাঁ, তুমি তো আমাদের কুন্তলা। তাই না?

কুন্তলা হাসে—হ্যাঁ, ঠিকই চিনেছেন; কিন্তু আপনি কি এখন বাড়ি যাচ্ছেন?

অনাদিবাবু—হ্যাঁ, আজকাল তো একা-একা বাড়ি যেতে পারি না। একজন কেউ সাহায্য না করলে...।

কুন্তলা—আপনি আমাকে বললেই তো পারতেন। আমি ছুটির পর আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে একটু সাহায্য নিশ্চয় করতে পারতাম।

অনাদি—তা দরকার হলেই বলবো।

কুন্তলা হাসে—আজই বলুন না।

অনাদিবাবু—আজ তো মনোজ আছে।

কুন্তলা—আজ ওঁকে চলে যেতে বলে দিন। আমিই আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেবো।

অনাদিবাবু আশ্চর্য হয়ে তাকান—তুমি পৌঁছে দেবে? তুমি আমাদের বাড়িতে যাবে?

কুন্তলা—হ্যাঁ।

অনাদিবাবু—মনোজ, তুমি তবে আগেই চলে যাও।

মনোজও আশ্চর্য হয়ে কুন্তলার দিকে তাকায়। কুন্তলা বেশ একটু ভ্রূকুটি করে, আর যেন চাপা অভিমানের স্বরে কথা বলে। —যান না, আমিও তো একটু পরে কাকাকে সঙ্গে নিয়ে আসছি।

তিন অধ্যায়

অহিভূষণ হঠাৎ এসে বলল —'ভাই ভবানী, একটা কনফিডেন্সিয়াল টক ছিল তোর সঙ্গে।'

আড্ডার মাঝখানে বসেছিলাম। বারীন তখন বলছিল—'কি আশ্চর্য, মেয়েটাকে মুহূর্তের জন্যও হাসতে দেখলাম না। লোকের দিকে একটু চোখ তুলে তাকাবার সাহস পর্যন্ত নেই। এই ধরনের মেয়েদের মতিগতি যদি একটু অ্যানালিসিস করে দেখ, তাহলে বুঝতে পারবে যে, তারা শুধু চায়...'

পুলিন বাঁড়ুয্যের মেয়ে বন্দনার কথা বলছিল বারীন। এইরকম একটা সুপ্রাসঙ্গিক অবস্থায় এসে অহিভূষণ বাধা দিল। আরও বেশী অপ্রসন্ন হয়ে উঠলাম, অহিভূষণ যখন বললো —'এখানে বসতে পারবো না ভাই, একটু ডিসট্যান্সে যেতে হবে।'

এরকম বিশ্রীভাবে অযথা ইংরেজী বলে অহিভূষণ। ইদানীং আরও বেশী করে বলে। অবশ্য আমরা জানি, অহিভূষণের লেখাপড়া ফোর্থ ক্লাসের চৌকাঠ পার হয়নি। সেই যে আট বছর আগে আমরা অকৃতি অহিকে একা ফোর্থ ক্লাসে রেখে সকলে থার্ডে চলে গেলাম, তারপর থেকে জীবনে সত্যিই ক্লাস হিসেবে ওর সঙ্গে আর এক হতে পারলাম না। কিন্তু আমাদের আচরণে সেটা ওর বোঝা উচিত ছিল। অহি যেন আমাদের তাচ্ছিল্যগুলিকে একেবারেই গায়ে মাখে না। সব জেনেশুনেই সে আমাদের সঙ্গে মেশে। তার প্রতি আমাদের একটা নির্বিকার ঔদাসীন্য অনাগ্রহ ও করুণাকে সে মাথা পেতে মেনে নিয়েছে। অহি যেন আজও আমাদের ক্লাসটা ছাড়তে চায় না। শেষ বেঞ্চের এক কোণে, একটু পৃথক হয়ে সবার পেছনে বসে থাকবে, তবু আমাদেরই সঙ্গে।

বলতে ভুলে গেছি, বারীনও সেই ফোর্থ ক্লাসে ফেল করেছিল। আর পড়াশুনা না করে স্কুল ছেড়ে দিল। কিন্তু আজ আট বছর পরেও বারীন আর আমরা যেন এক ক্লাসেই আছি। বারীন কন্ট্রাক্টরি করে, এরই মধ্যে বেশ কিছু যাকে বলে, বেশ সম্পন্ন হয়ে উঠেছে বারীন। কিন্তু অহি? অহি ঠিক তার উল্টো। অহির কথা একেবারে স্বতন্ত্র। বড় সাংঘাতিকভাবে ফেল করেছে অহি। বাইশ টাকা মাইনের একটি চাকরি করে। দুঃখটা আসলে ঐ বাইশ টাকায় বাঁধা দীনতার জন্য নয়। আসল কথা হল চাকরিটাই। বড় নীচ নোংরা নগণ্য চাকরি। কখনও কোনো ভদ্রলোকের ছেলেকে এরকম চাকরি করতে আমরা দেখিনি। শুনিনি।

খুব ভোরে ঘুম ছেড়ে বাইরে বেড়ানো যাদের অভ্যাস, তারাই শুধু অহিভূষণের চাকরির স্বরূপটা জানে, কারণ তারাই ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখতে পায়। এক হাতে প্রকাণ্ড একটা খাতা, আর-এক হাতে একটা লক্কড় সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে শহরের যত লেন আর বাই-লেনের মোড়ে মোড়ে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে অহিভূষণ। ভোরের আবছা অন্ধকারের মধ্যে সরু গলির মুখ থেকে এক-এক করে চার পাঁচটি অদ্ভুত ধরনের মূর্তি এসে অহির কাছে দাঁড়ায়। খাতাটা খুলে হাজিরা লেখে। নীচুস্বরে কয়েকটা কথা বলে অহি, কখনো বা বিরক্ত হয়ে ধমক দেয়। তারপরেই অহিভূষণের লক্কড় সাইকেল আবার আর্তনাদ করে ওঠে। আর একটা গলির মোড়ে গিয়ে দাঁড়ায় অহিভূষণ চাটুয্যে।

আমাদের এই ছোট শহরের ছোট মিউনিসিপ্যালিটির একজন কর্মচারী হল আমাদের পরিচিত ও প্রাক্তন সহপাঠী অহিভূষণ। রাত্রি ভোর হতে না হতে পাখির ঘুম ভাঙার আগেই মেথরেরা শহরের ময়লা পরিষ্কার করে। এক একটা দল বের হয় ঝাড়ু হাতে রাস্তা ঝাঁট দিতে। কয়েকটা দল বের হয় ঝাড়ু হাতে রাস্তা ঝাঁট দিতে। কয়েকটা দল বের হয় মাথার ওপর পুরীষবাহী বড় বড় টিনের টব নিয়ে। দু'চাকার ওপর পিপে বসানো একটা অদ্ভুত ধরনের গাড়ি আছে মিউনিসিপ্যালিটির। একটা বুড়ো বলদ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গাড়িটাকে রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যায়। পিপের গায়ে দু'সারি ফুটো আছে। খুব ভোরে উঠলেই দেখতে পাওয়া যাবে, পিপে গাড়িটা ভ্রাম্যমান ধারাযন্ত্রের মত হেলে দুলে কঁকিয়ে কঁকিয়ে চলে যাচ্ছে, রাস্তার ধুলোর দৌরাত্ম্যকে শান্তিজল ছিটিয়ে শান্ত করে দিয়ে। আমাদের অহিভূয়ণের চাকরিটা হল—এইসব কাজ তদারকি করা। তারই জন্য বাইশটি টাকা মাইনে পায় অহি। লেখাপড়া শেখেনি, বাপ বেঁচে নেই, বাপের পয়সাও ছিল না। মা আছে, মায়ের অসুখও আছে। তাছাড়া নিজের পেটের দায় তো আছেই। সামর্থ্য নেই, যোগ্যতা নেই, তাই বোধহয় এই সামান্য জীবনের দায়টুকু মেটাতে গিয়ে, উপায় খুঁজতে খুঁজতে একেবারে নরকের কাছাকাছি চলে এসেছে অহি। দুপুরবেলা যখন আদালতে দশটার ঘন্টা বাজে, অর্থাৎ ঠিক যে সময়ে ভদ্রলোকের কাজের জীবন কলরব করে ওঠে, সেই সময়ে এক ভাঙা ঘরের নিভৃতে অহিভূযণের ক্লান্ত শরীর নিঃশব্দে ঝিমোয়। সূর্য উঠলে আমরা ঘরের

বার হই। সূর্য উঠলে অহি ঘরে ঢোকে। আমরা কাছারি রোড দিয়ে গাড়ি ঘোড়া শব্দ জনতা ভেদ করে যাই জীবিকা অর্জন করতে। অহি ঘুরে বেড়ায় নির্জন নিস্তব্ধ ও অবসন্ন শেষরাত্রের অস্পষ্ট গলিঘুঁজির মোড়ে মোড়ে, ড্রেন পায়খানা ডাস্টবিনসঙ্কুল একটা ক্লেদাক্ত জগতের চোরাপথে।

বিকেলবেলা অহিকে আরও দু'বার কাজের ক্ষেত্রে দেখা যায়। লক্কড় সাইকেলটার পিঠে সওয়ার হয়ে মাইল দেড়েক দূরে শহরের বাইরে গিয়ে শ্মশানঘাটের সিঁড়িতে একবার দাঁড়ায়। ডোমটার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে, মড়া আর চিতার হিসাব নেয়। তারপরেই গিয়ে দাঁড়ায় খালের ধারে—ময়লা ময়দানের কাছে। দুটো ইনসিনারেটারের চিমনি থেকে দগ্ধ পুরীষের দুর্গন্ধ ধূম বাতাস আচ্ছন্ন করে। অহির সাইকেলের শব্দে অলস গৃধিনীর দল আবর্জনার স্তূপের আড়ালে চমকে ওঠে, বড় বড় পাখা ছড়িয়ে আকাশে উঠে চক্কর দিয়ে উড়তে থাকে। অহি দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। উড়ন্ত গৃধিনীর পাখার চঞ্চল ছায়া আর শব্দের নীচে দাঁড়িয়ে এইখানে সূর্যাস্ত দেখে অহিভূষণ।

কথায় কথায় অহি বলে—এমন চাকরি থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি? চাকরির ব্যাপারে কত ভাবে ফাঁকি দিচ্ছে অহি, সেই সব বিবরণ বেশ ফলাও করে মাঝে মাঝে শোনায়। আমাদের একেবারে নিঃসংশয় করবার জন্য অহি প্রায়ই বলে—'সত্যি বলছি ভবানী, প্রাণ গেলেও আমি গলি-ফলির ভেতর ঢুকতে পারব না।'

বারীন প্রশ্ন করে—'ময়লা ময়দানে যেতে হয় না তোকে?'

—'কস্মিনকালেও না। আমি দূরে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে কাজ দেখি।'

আমি জিজ্ঞাসা করি—'চিতে গুনতে যাস না আজকাল?'

অহি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়—'মোটেই না! ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে হিসাব নিই, শ্মশানে নামি না।'

একটু চুপ করে থেকে অহি আবার নিজের থেকে একটু অস্বাভাবিকভাবে গর্ব করে বলতে থাকে—কি ভেবেছে মিউনিসিপ্যালিটি, বাইশটে টাকা মাইনে দেয় বলে বামুনের ছেলেকে দিয়ে যাচ্ছেতাই করিয়ে নেবে?

আমরা প্রায় একসঙ্গে সবাই হেসে ফেলতাম। অহি একটু আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকতো, আমাদের হাসির অর্থ বুঝবার চেষ্টা করতো।

অহির কথা নিয়ে বেশীক্ষণ মাথা ঘামাবার মত উৎসাহ কারও ছিল না। কথা প্রসঙ্গে এক-আধটু যা হলো তাই যথেষ্ট। পর মুহূর্তে আমরা উৎকর্ণ হয়ে উঠতাম, কারণ বারীন একটি সুস্বাদু কাহিনী পরিবেশন আরম্ভ করে দিয়েছে—'কি বলবো ভাই, আজকাল যা সব কাণ্ড আরম্ভ করেছে ললিতা! ফিক্ ফিক্ করে হাসে। ইয়া বড় বড় চোখ করে বেপরোয়া তাকিয়ে থাকে। হাবেভাবে স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছে যে....কিন্তু আমি ভাই ভিড়তে চাই না।'

অহি বেফাঁস রসিকতা করে বললে—'তাহলে আমি ভিড়ে যাই, কি বল?'

হঠাৎ প্রসঙ্গ বন্ধ করে দিয়ে, মুখটা কঠোর করে অহির দিকে তাকিয়ে বারীন বলে—তোমাকে এর মধ্যে ফোড়ন দিতে বলেছে কে?

এ-সব কুৎসার অম্বলে ফোড়ন সচরাচর আমরাই দিয়ে থাকি। অহি কখনো মন্তব্য করতো না, ভদ্র বাড়ির তরুণীদের নামে কোনো রসাল প্রসঙ্গ উঠলে অহি বরং নিস্পৃহভাবে চুপ করে থাকতো। অতি পরিচিত এই সব প্রতিবেশিনীদের কাহিনীগুলিও ওর কাছে আজ যেন রাণী পরী আর দেবীর রূপকথার মত এক অতিদূর অলীকদেশের গল্প হয়ে গেছে। এই সব প্রসঙ্গে তাই অহিকে কখনো উৎসাহ প্রকাশ করতে আমরা দেখিনি। এই প্রথম হঠাৎ ভুল করে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে বারীনও তাকে সাবধান করে দিল। চুপ করে রইল অহি। আর কখনো তার এ ভুল হয়নি। অহি এইভাবে তার অধিকারের সীমা আমাদের ধমক খেয়ে বুঝে ফেলে। যেন মাথা পেতে ত্রুটি স্বীকার করে নেয়। মেলামেশার দিক দিয়ে আমাদেরই আড্ডার ছেলে অহিভূষণ, আমাদেরই প্রাক্তন সহপাঠী, এক শহরের ছেলে। কিন্তু মনের রুচির দিক দিয়ে সে যেন ভিন পাড়ার লোক, সে তত্ত্ব তাকে আমরা কারণে অকারণে বুঝিয়ে দিই। অহিও বুঝতে পারে।

কিন্তু একটি ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম ছিল। সেদিনের আড্ডায় বারীন যে মেয়েটির নামে যা খুশি তাই বলছিল, সেই মেয়েটির নাম বন্দনা। এই বন্দনার মতিগতি একটু অ্যানালিসিস করে বারীন বুঝতে পেরেছে যে.....

বন্দনার নামে যখন কথা উঠতো, তিলমাত্র ভদ্রতার সঙ্কোচ বা শ্রদ্ধার বালাই কেউ অনুভব করতো না। বিশেষ করে বারীন। বন্দনাকে একটু ভাল করে আমরা চিনে ফেলেছি। তাই অবিশ্বাস করার মত কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে, কষ্ট করে এতটা ভাববার কোনো দরকার ছিল না আমাদের। অন্য কোনো মেয়ের সম্পর্কে বারীনের রসনার অসংযম হয়তো আমরা বাধা দিতাম, প্রশ্ন করতাম, সন্দেহ প্রকাশ করতাম। কিন্তু বন্দনা ঠিক সেই সব মেয়েদের দলে নয়, তাদের বাইরে, অনেক নীচে। যদিও আমাদেরই পরিচিত পুলিন বাঁড়ুয্যের মেয়ে বন্দনা। বন্দনার চারিত্রিক রহস্য নিয়ে সবাই আফসোস করতো, কটূক্তি করতো, ঘৃণায় ছটফট করে উঠতো। কখনো বা এক ঝাঁক রসিকতার মাছি ভন্‌ভন্‌ করে উঠতো। অহিও হেসে হেসে মাথা নেড়ে মন্তব্য করতো—ডোবালে, ডোবালে, ভদ্র সমাজের নাম ডুবিয়ে ছাড়লে ছুঁড়ি।

শুধু এই একটি ক্ষেত্রে অহির অধিকারের সীমা স্মরণ করিয়ে দেবার কথা আমাদের কারও মনে হতো না। এক্ষেত্রে অহির অধিকার যেন পরোক্ষভাবে আমরা স্বীকার করে নিয়েছিলাম। বন্দনাকে কুৎসা করার এই সমানাধিকার পেয়ে অহি যেন ধন্য হয়ে যেত। মুখ খুলে রসিকতা করতো অহি। এই একটি সুযোগকে বার বার সদ্ব্যবহার করে অহি উপলব্ধি করতো, সে আমাদেরই মধ্যে একজন!

শুধু সন্ধ্যে হলে অহি আমাদের আড্ডায় একবার আসে। না এসে পারে না।

নেশাড়ে মানুষ যেমন সন্ধ্যে হলে একবার শুঁড়ির দোকানে না গিয়ে পারে না, অহির অবস্থাটা বোধহয় সেইরকম। সেই কবে আট বছর আগে আমাদের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তো অহিভূষণ, একই রিং-এ বক্সিং করতো, একই প্যারালাল বার-এ পীকক্ হতো—সেই পুরানো নেশা আজও বোধহয় ছাড়তে পারেনি অহি। একটু বেশী ধোপদুরস্ত কাপড়-চোপড় পরে সন্ধ্যেবেলা আমাদের আসরে দেখা দেয়। আমাদের বিদ্রূপ বিরক্তি অশ্রদ্ধা—সবই অকাতরে সহ্য করে। ছেলেবেলায় অহির এক-একটি কঠোর স্ট্রেট লেফ্ট্ ও ডানহাতের পাঞ্চ্ কতবার যে আমাদের ছিটকে বের করে দিয়েছে রিং এর বাইরে—তিন হাত দূরে। আজ যেন সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছে অহি। আমাদের সব অশ্রদ্ধার আঘাত সহ্য করে, সাধ করেই পরাজিত হয়ে আমাদের রিং-এর মধ্যে থাকতে চায় অহিভূষণ।

—একটু ডিসট্যান্সে যেতে হবে ভাই, প্রাইভেট টক আছে।

অহির অনুরোধ শুনে উঠে গিয়ে একটু আড়ালে দাঁড়ালাম। বললাম—'কি বলছিলি, বল।

অহি—'তোর কাকাকে একটু বুঝিয়ে বলতে হবে ভাই, যেন আমার নামটা কেটে না দেন।'

আমার কাকা হলেন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। কাকা একটু বেশি পরোপকারী ও সদয় মানুষ। তাই খুব আশ্চর্য হলাম, অহিভূষণের মত এক গরীব কর্মচারীর চাকরিটা খাবার মত উৎসাহ তাঁর কেন হবে?

বললাম—'তোকে বরখাস্ত করার কথা হয়েছে নাকি?'

—বরখাস্ত নয় ভাই, আমার নামটা কেটে দিচ্ছেন।'

'বরখাস্ত নয়, নাম কেটে দেওয়া হচ্ছে, কথাটার অর্থ বুঝতে পারছি না, অহি। ঠিক করে বল।'

—'তুই তো জানিস, আমার পোস্টটার নাম ছিল.....'

—'না জানি না।'

—'আমি হলাম এ সি এস।'

—'সেটা আবার কি জিনিস?'

—আমি হলাম অ্যাসিস্টেন্ট কনজারভেন্সী সুপারভাইজার। পাঁচ বছর ধরে এই নাম চলে আসছে। আজ হঠাৎ তোর কাকা চেয়ারম্যান হয়ে কোথায় একটু উপকার করবেন, না উঠে-পড়ে লেগেছেন আমার নামটার পেছনে। নামটা বদলে দিচ্ছেন।'

—'তাতে তোর ক্ষতিটা কি? মাইনে তো আর কমল না।'

—'না মাইরি, সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার নাম সহ্য করতে পারবো না, মাইরি। তুই বল ভাই, ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে....'

—'তোরই বা এত নাম নিয়ে মাথাব্যথা কেন? তোর আগে যে লোকটা সর্দার ছিল, সেই মানকিরাম যে তোর চেয়েও বেশী মাইনে পেত।'

অহির মুখটা বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। একটু অভিমান করেই যেন বললো—'শেষে তুইও মানকিরামের সঙ্গে আমার তুলনা করলি, ভবানী?

একটু রাগ করে বললাম, —'মানকিরাম তোর চেয়ে ছোট কিসে রে অহি? মানুষকে যে খুব ছোট করে দেখতে শিখেছিস, অথচ....'

অহি চুপ করে তাকিয়ে রইল, কোনো উত্তর দিল না। এইভাবে সামান্য একটা ধমকে তার সব বিদ্রোহ শান্ত হয়ে যায়। আজও চুপ করে আমার ধমক আর মন্তব্যটাকেই মেনে নিল অহি।

বাড়িতে ফিরে এসে অহির কথাটা কেন জানি বার বার মনে পড়ছিল। কাকাকে হেসে হেসে বললাম—'অহি নামে আপনাদের মিউনিসিপ্যালিটির একজন প্রকাণ্ড অফিসারের ডেসিগনেশনটা নাকি আপনি খারিজ করে দিচ্ছেন?'

কাকা উত্তর দিলেন—'হুঁ, ঐ নামটা আইনত চলে না। ঐ নাম থাকলে মাইনে ও গ্রেড আইনমাফিক করতে হয়। তাছাড়া, তাহলে অহির চাকরিও থাকে না; কেন না, অ্যাসিস্ট্যান্ট কনজারভেন্সী সুপারভাইজার রাখতে হলে ট্রেনিং নেওয়া পাশ করা লোক চাই। অহির তো সে সব যোগ্যতা নেই।'

—'কিন্তু সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার নামটা সত্যিই বড় বিশ্রী। গরীব হলেও ভদ্রলোকের ছেলে তো, অহির মনে বড় ব্যথা লেগেছে।'

কাকা দুঃখিত হয়ে বললেন—কি করবো বল? কোনো উপায় নেই। অহির মাইনে তিন টাকা বাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা আছে আমার এবং বাড়িয়ে দেবো ঠিক, কিন্তু ঐ পোস্টটা, ওভাবে ঐ নাম দিয়ে রাখবার উপায় নেই। আইনে বাধে।'

পরদিন সকালবেলা অহির কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু ঘরে বসে অহির গলার স্বর শুনতে পেয়ে আবার ঘটনাটা নতুন করে মনে পড়ে গেল। কাকার সেরেস্তায় এসে অহি কাকাকে সেই অনুরোধ নিয়ে আবার পাকড়াও করেছে।

অহি বলছিল—'আমার এই পোস্টের নামটা বদলে দেবেন না, কাকাবাবু।'

কাকা বোধহয় একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, —'কেন হে কাকাবাবু?'

কাকার উত্তরটার মধ্যে এবং গলার স্বরে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের আভাসও ছিল যেন। অহির মুখে 'কাকাবাবু' ডাকটা হয়তো তিনি পছন্দ করলেন না।

কাকার সেরেস্তার কাছে দাঁড়িয়ে একটু আড়াল থেকে উঁকি দিলাম। দেখলাম, অহি দাঁড়িয়ে আছে। অহির নোংরা খাকি হাফপ্যান্ট আর বগলদাবা হাজিরা খাতাটা ওর সর্দারীর সাজটা নিখুঁত করে তুলেছে। অহির মুখটা আজও কিন্তু সেই পুরনো ধাঁচেই চলে গেছে। নাক আর চিবুকে সেই দক্ষিণী নটরাজের ব্রোঞ্জের মত ছাঁদটা আজও মুছে যায়নি। গড়ানটা কঠিন, কিন্তু ছাঁদটা কোমল। এই অহি একদিন আমাদের স্কুলে প্রাইজের অনুষ্ঠানে কপালে রক্তচন্দনের তিলক কেটে মেঘনাদ সেজেছে, আবৃত্তি করেছে। কী সুন্দর ওকে মানাতো!

আপাতত দেখছিলাম. অহিভূষণ কাকার প্রশ্নে একটু কাঁচুমাচু হয়ে বললো—'আজ্ঞে আমি বলছিলাম.....'

কাকা—'কিছু বলতে হবে না তোমাকে। আমি যা করেছি তোমার ভালোর জন্যই করেছি। হয়তো মাইনে কিছু বাড়িয়ে দেব যদি....'

অহি—'মাইনে বাড়াবার জন্য আমি আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না স্যার। কিন্তু আমার পোস্টের নামটা যদি আপনি একটু অনুগ্রহ করে....'

কাকা আমার পরম দয়ালু মানুষ, কিন্তু ভিক্ষে করবার এত বস্তু থাকতে কেউ এসে পোস্টের সম্মান ভিক্ষে করবে, সে-ঔদ্ধত্যকে বোধহয় পৃথিবীর কোনো দয়ালু প্রশ্রয় দিতে পারেন না। কাকা হঠাৎ ভয়ানকভাবে চটে গিয়ে চোখ পাকিয়ে হিন্দী করে বলতে লাগলেন। —'মাইনে বাড়ানোর দরকার নেই, না? তবে চাকরিটারই বা কি দরকার হে সর্দার? খুব বাড় বেড়েছে দেখছি?'

—'আজ্ঞে না হুজুর!' সঙ্গে সঙ্গে এক সর্দার স্ক্যাভেঞ্জারের মুখ দীনতায় সঙ্কুচিত হয়ে আর্তস্বরে যেন ক্ষমা প্রার্থনা করে উঠলো।

কাকা বললেন—'যাও, খাড়া মৎ রহো।'

এরপর অহি আমাদের সান্ধ্য আড্ডায় রোজ হাজিরা দেবার অভ্যাস ছেড়ে দিল। তবে আসে মাঝে মাঝে, একটু গম্ভীর হয়ে থাকে। অহি বোধহয় আমাদের অন্তরঙ্গতার সীমা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে।

অহির আচরণের এই পরিবর্তন সকলেই লক্ষ্য করলো। আমিই একদিন সকলকে রহস্য ফাঁস করে দিলাম—মিউনিসিপ্যালিটি অহিকে সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার নাম দিয়েছে, অ্যাসিস্টেন্ট কনজারভেন্সী সুপারভাইজার নামটা রদ করে দেওয়া হয়েছে, তাই অভিমান হয়েছে অহির। কাকার কাছে এই নিয়ে তর্ক করতে গিয়েছিল। কাকা ধমক দিয়ে খেদিয়ে দিয়েছেন।

এর পরে যেদিন অহি আড্ডাতে এল, সকলে মিলে বেশ মিঠেকড়া করে ধমকে দিল—'তোর আবার এই সব ঘোড়ারোগ কেন রে অহি? মাইনের পরোয়া করিস না, তাই নিয়ে চেয়ারম্যানের সঙ্গে মুখের ওপর তর্ক করতে যাস। সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার কাজটা করবি, অথচ বললে তোর একেবারে মাথা কাটা যাচ্ছে। তুই কি ভাবছিস নিজেকে, তুই একটা ভয়ানক রকমের অফিসার?'

ধমক খেয়ে প্রতিবাদ করে না অহি। অভিযোগ স্বীকার করে নেয়। আজও অহি নিরুত্তর থেকে অভিযোগ স্বীকার করে নিল। কিন্তু বলিহারি ওর ধৈর্য আর সহ্যগুণ। শুধু আমাদের আড্ডার স্পর্শটুকুর লোভে ও সব সহ্য করতে পারে।

পর পর অনেকদিন পার হয়ে গেল, অহি আর আড্ডায় আসে না। হঠাৎ একদিন হাসতে হাসতে ক্লাবের বৈঠকে দেখা দিল অহি।

বীরভূমের এক গাঁয়ের এক গরীব স্কুলমাস্টারের মেয়ের সঙ্গে অহির বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেছে। অহি নিজে গিয়ে মেয়েকে দেখে এসেছে। আমাদের কাছে

একটা সলজ্জ আনন্দে সব কথাই বললো অহি—মেয়েটি দেখতে বেশ, ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে, গানটানও গাইতে পারে।

অহি যেন তার জীবনের এক নতুন সূর্যোদয়ের কথা বলে চলে গেল। কিন্তু সেই মুহূর্তে সে বুঝতে পারেনি যে, কী বিসদৃশ, কী অশোভন, কী অন্যায় কুকাণ্ডের একটি বার্তা সে আমাদের কানের কাছে ছেড়ে দিয়ে গেল। আমাদের মনের শান্তি নষ্ট হলো।

আমরা বুঝলাম, কত বড় ভাঁওতা দিয়ে এক ভদ্রলোকের মেয়ের সর্বনাশ করতে চলেছে অহি। বেচারী স্কুলমাস্টার কল্পনাও করতে পারছে না যে, এক সর্দার স্ক্যাভেঞ্জারের হাতে তাঁর মেয়েকে তিনি সঁপে দিতে চলেছেন। তিনি হয়তো শুধু জানেন, অ্যাসিস্টেন্ট-কনজারভেন্সী-সুপারভাইজার নামে এক অফিসারের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে হতে চলেছে।

সমাজের একটা স্বাভাবিক আত্মরক্ষা করার শক্তি আছে। সেদিনই দু'পাতা চিঠি লিখে সব ব্যাপার আমরা জানিয়ে দিলাম স্কুলমাস্টার ভদ্রলোককে। অহিও তিন দিন পরে বীরভূমের এক গেঁয়ো ডাকঘর থেকে টেলিগ্রাম পেল—বিয়ের প্রস্তাব বাতিল।

আমাদের যা করবার সবই আমরা গোপনে করেছিলাম। অহি কি বুঝলো, তাও আমরা জানি না। কিন্তু অহি আর আমাদের আড্ডায় এল না। এক মাসের মধ্যে একবারও নয়। এতদিনে সত্যি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অহি।

মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে বোধহয় অনেকদিন আগে থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল অহি। শুধু ধোপদুরস্ত কাপড় পরে জোর করে ভদ্রলোক সাজবার চেষ্টা করতো। অল্পদিনের মধ্যে আমরা দেখলাম, হ্যাঁ, খাঁটি স্ক্যাভেঞ্জার বটে অহি। হাজিরা খাতা বগলে নিয়ে গলিতে গলিতে নিঃসঙ্কোচে ঘুরে বেড়ায়, শ্মশানের চড়ায় নেমে চিতা গুনে আসে, ময়লা ময়দানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ট্রেঞ্চ কাটায়, ড্রেনের পাশে বসে মেরামত তদারক করে। নোংরা খাকি-হাফপ্যান্ট পরে ক্লেদাক্ত পৃথিবীর চিহ্নিত পথে আন্তরিক নিষ্ঠা নিয়ে চরে বেড়ায় অহি, লক্কড় সাইকেল আর্তনাদ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, পুলিনবাবু আর বন্দনা ঠিক এই ধরনের সমস্যাটাকেই জটিল করে তোলবার চেষ্টা করলো।

দেনা দৈন্য আর বেকার অবস্থার জীবনের বারো আনা ভাগ সময় পণ্ড করে দিয়ে পুলিন বাঁড়ুয্যে শেষকালে জুতোর দোকান খুলেছিলেন। আমরা দেখতাম, পুলিনবাবুর দোকানে মেঝের ওপর তিন-চারজন মুচি সকাল দুপুর সন্ধ্যা জুতো সেলাই করে। একটা কাঁচের আলমারী ছিল দোকানে, তার মধ্যে নতুন চামড়ার বাণ্ডিল সাজানো—ক্রোম, উইলোকাফ, কিড আর শ্যামোয়। দোকান ঘরের মধ্যে কিছুটা স্থান ভিন্ন করে, একটা ভাল মেহগনি টেবিল আর চেয়ার নিয়ে বসে থাকতেন পুলিনবাবু। টেবিলের পাশে আবার একটা সুন্দর রঙীন পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। এখানে বসলে মুচিদের আর ঠিক পাশাপাশি বা মুখোমুখি দেখতে পাওয়া যায় না। ঐ রঙীন পর্দাটা

যেন পুলিনবাবুর মনের একটা সতর্ক ও জাগ্রত শ্রেণীমর্যাদার প্রতীকের মত ঝুলতো। মুচিদের কর্মভূমি থেকে তিনি যেন স্পষ্ট করে তাঁর জীবনের আসরটুকু সযত্নে ভিন্ন করে রাখতেন। শত হোক, পরলোকগত ত্রৈলোক্য পণ্ডিতের নাতি তো। সাত-পুরুষের কৌলিক চেতনাকে একটা উপার্জনের দায়ের সঙ্গে একাকার করে দিতে পারেন না তিনি। তিনজন মুচির মধ্যে একজনকে তিনি মিস্তিরি বলে ডাকতেন। আলমারী থেকে চামড়া বের করে মাপ মত কেটে কেটে মুচিদের দেওয়া, খদ্দেরের পায়ের তলায় কাগজ পেতে মাপ মত এঁকে নেওয়া—ইত্যাদি সব কাজ মিস্তিরিই করে। জুতোর দোকানের জুতোত্বের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেন না পুলিনবাবু, তাঁর সম্পর্ক শুধু দোকানত্বের সঙ্গে! এর চেয়ে বেশী নীচে নামতে পারেন না পুলিনচন্দ্র বাঁড়ুয্যে।

এই পুলিনবাবুর মেয়ের নাম বন্দনা। এই শহরের স্কুলেই পড়েছে। এ-পাড়া আর ও-পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে মিশে কোনকালে মহিলা সমিতির বাৎসরিকীতে অভিনয় করেছে। চার বছর আগের কথাই ধরা যাক। আমার ভাগ্নীর বিয়েতে বন্দনা একাই গান গেয়ে বাসর জমিয়েছে। বন্দনার স্কুল-বান্ধবীরা অনেকে আজ আর বাপের বাড়িতে নেই; শ্বশুরবাড়ি থেকে তারা মাঝে মাঝে যখন আসে, সবারই সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় তাদের। শুধু দেখা হয় না বন্দনার সঙ্গে। বন্দনা আজ সেই পুরাতন সখিত্বের বৃত্ত থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। বন্দনার খোঁজ বড় কেউ করে না। বন্দনা এখন কী বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে, সবাই জানে সে-কথা। সেই সখিত্বের আগ্রহ দূরে থাক, তাদের মনের দিক দিয়ে অস্পৃশ্যতা গোছের একটা বাধা বন্দনাকে আজ একেবারে অস্পষ্ট করে দিয়েছে।

হাসপাতালে কী একটা কাজ করছে বন্দনা। বন্দনার মা অবশ্য লোকের কাছে বলেন—নার্সের কাজ। কিন্তু তাই বা কি করে হয়? বন্দনা তো নার্সবিদ্যা পাশ করেনি। যাই হোক, এতটা বাড়াবাড়ি পুলিন বাঁড়ুয্যের উচিত হয়নি। জীবনে টাকার প্রয়োজন কার না আছে? কিন্তু তাই বলে সব ভদ্রয়ানার সংস্কার অমান্য করে, সমাজের স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির তোয়াক্কা না করে, রুচি-অরুচির বালাই না রেখে, শুধু কাজ আর পয়সাকে শ্রেষ্ঠ করে তোলা মানুষের লক্ষণ নয়। একে জীবিকা অর্জন বলে না, এটা হলো জীবনকে বিকিয়ে দেওয়া। পুলিন বাঁড়ুয্যে খুবই গরীব সন্দেহ নেই। তার গরীবত্বের জন্য অবশ্য আমাদের সবারই সমবেদনা আছে। কিন্তু গরীবত্ব ঘোচাবার যে পথ তিনি বেছে নিলেন, সেই পথটাকে কেউ সম্মান করবে না।

পুলিনবাবু বোধহয় তাঁর ভবিষ্যৎটা বুঝতে পারেননি, নইলে এতটা স্পর্ধা তাঁর হতো না। কিন্তু অতি অল্পদিনেই তিনি বুঝলেন, একেবারে মর্মে মর্মে বুঝলেন।

কাকা একদিন আমাকে ডেকে বললেন—হ্যাঁ রে ভবানী, পুলিন চামারের দোকানে জুতো-টুতো কেমন তৈরী করে? বেশ ভাল?

কাকা অক্লেশে যে কথাটা বললেন, তাতেই হঠাৎ একটা শক্ পেলাম যেন। আজ

মাত্র এক বছরের মধ্যে পুলিন বাঁড়ুয্যে কাকার কাছে কত সহজ ও স্বাভাবিক নিয়মে পুলিন চামার হয়ে গেছে!

বিব্রতভাবে উত্তর দিলাম—'হ্যাঁ, ভালই তৈরি করে।'

কাকা—'তাহলে এবার পূজোর সময় পুলিন চামারকেই অর্ডার দিস।'

কথাটা যেন বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো। ঠাট্টা করে নয়, বেশ সহজভাবে। সকলে পুলিন-চামার কথাটা ব্যবহার করে। পুলিনবাবুও নিশ্চয় স্বকর্ণে কথাটা শুনেছেন। এখন বুঝুন তিনি, এই নতুন উপাধির গৌরব প্রতি মুহূর্তে তিলে তিলে উপভোগ করে প্রায়শ্চিত্ত করুন।

জুতোর অর্ডার দিতে গিয়ে দেখলাম ক'মাসের মধ্যেও আশ্চর্য রকমের বদলে গেছেন পুলিনবাবু। এক বছর আগেও আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছেন। আজ আমাকে 'আপনি' করে বলছেন। আলমারী খুলে নানারকম চামড়া বের করে দেখালেন। এক জোড়া অক্সফোর্ড হান্টিং-এর দরকার ছিল আমার। পুলিনবাবু খুশী হয়ে আমার পায়ের তলায় একটা কাগজ পাতলেন, পেন্সিল দিয়ে মাপ এঁকে নিলেন। ভয়ানক রকম একটা অস্বস্তির মধ্যে আমার পা-টা সিরসির্ করে উঠলো। যেন একটা অপরাধ করছি, মনের কোণে এই রকম একটা দুর্বলতা নিঃশব্দ গঞ্জনার মত পীড়া দিতে লাগলো। এইরকম অপ্রস্তুত অবস্থায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, পুলিনবাবু আমার পায়ের কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে জুতোর মাপ নিচ্ছেন। পুলিনবাবুর হাতের পেন্সিল এক অপার্থিব তুলির মত সুড়সুড়ি দিয়ে আমার পায়ের পাতার চারদিকে ঘুরছে। আমি দেখছিলাম, প্রৌঢ় পুলিনবাবুর কাঁচা-পাকা চুলে ভরা মাথাটা আমার হাঁটুর কাছে হেঁট হয়ে আছে।

এর পরেও দেখেছি, সেই মেহগনি টেবিল চেয়ার আর পর্দা নেই। মিস্তিরী নেই। পুলিনবাবু মেঝের ওপর জুত করে বসে নিজেই কাঁচি দিয়ে হিসেব করে চামড়া কেটে মুচিদের দিচ্ছেন। পুলিন চামারের দোকান সত্যিই সার্থক হয়ে উঠেছে এতদিনে।

বন্দনাকেও আমরা প্রায়ই দেখতে পেতাম, কখনো পায়ে হেঁটে—কখনো বা রিক্সায় চড়ে হাসপাতালে যায়। বারীন সবচেয়ে বেশী চটে যেত বন্দনার সাজসজ্জার নিষ্ঠা দেখে। নার্সদের অ্যাসিস্টেন্ট কুড়ি টাকা মাইনে, তার জুতো শাড়ি আর ব্লাউজের এতটা বাহার একটু বিসদৃশ ঠেকে বৈকি। তার ওপর আবার মাঝে মাঝে রিক্সায় চড়ে! আমরা অবশ্য বন্দনার পক্ষ নিয়ে কখনো-সখনো প্রতিবাদ করতাম—একটু রিক্সাতে চড়লেই বা! এতটা পথ এই দুপুরের রোদে চলাফেরা করা একটা মেয়ের পক্ষে কষ্টকর নয় কি?

বারীন একেবারে ক্ষেপে উঠতো। —'থাক থাক, আমাকে আর শেখাতে এস না কেউ। জমকালো শাড়ি আর রিক্সার পয়সা যে এমনিতেই হয়, সে তত্ত্ব আমি বুঝি।'

পথে বন্দনার সাথে আমার মুখোমুখি দেখা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করেছি, বারীন

আমাদের সঙ্গে থাকলে বন্দনা ভুলেও চোখ তুলে তাকাতো না, একটু সঙ্কুচিত হয়ে মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিত। কখনো বা চকিতে মুখটা বিবর্ণ হয়ে উঠতো, যেন হঠাৎ ভয় পেয়েছে। বারীন আবার চটে উঠে আমাদের কানের কাছে বলতো—ঠিক এই, এই ধরনের হাব-ভাব যে-সব মেয়েদের দেখা যায়, যারা ইচ্ছে করেও হাসতে পারে না, চোখ তুলে তাকাতে পারে না, তাদের মতিগতি একটু অ্যানালিসিস করলেই বুঝতে পারবে যে, তারা শুধু চায়.....

পুলিনবাবু তো এরই মধ্যে দমে গিয়ে একেবারে অমানুষ হয়ে গেছেন। কিন্তু পুলিনগিন্নী দমবার পাত্রী নন। যার স্বামী জুতো বেচে, মেয়ে সদর হাসপাতালে কে জানে কী করে, তাকে আজও একটু লজ্জিত হতে দেখিনি। যে কোনো পরিচিতা প্রতিবেশিনীর সঙ্গে দেখা হলে আলাপক্রমে একবার নিজের বংশগর্বটাকে বড় করে এবং আলাপিতাকে একটু নীচু ঘর প্রমাণ না করে তিনি শান্ত হন না। প্রয়োজন হলে সৌজন্য ভুলে ঝগড়া করতে কুণ্ঠিত হন না। যে সব বুড়ী নির্জলা একাদশী করতে পারে না, তাদের গায়ে পড়ে দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে আসেন। তাঁকে কেউ আমল দেয় না, তবু গায়ে পড়ে সবাইকে বিব্রত করেন। পুলিনবাবু আর বন্দনার ঠিক উল্টোটি হলেন পুলিনগিন্নী। কোন্ বামুনের বাড়িতে এক ফোঁটা গঙ্গাজল নেই, কারা তিথিনক্ষত্র মানে না, কার মেয়ের অলগ্নে বিয়ে হয়ে গেল, সব খবর রাখেন পুলিনগিন্নী এবং সবাইকে তার জন্য কটূক্তি করতে ছাড়েন না।

কবে এবং কী করে পুলিনগিন্নী বন্দনার একটা বিয়ের ব্যবস্থাও প্রায় পাকাপাকি করে ফেলেছেন, তা আমরা আগে জানতে পারিনি। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। পাত্রের মামা বন্দনাকে আশীর্বাদ করতে এলেন এবং উঠলেন আমাদের বাড়িতে। পাত্রের মামা আমার কাকার বন্ধু। তাঁর কাছেই খবর শুনলাম—তাঁর ভাগ্নে অর্থাৎ পাত্রটি হলো পাটনার একজন প্রফেসর। বেশ ভাল চেহারা, মডার্ণ ও স্মার্ট ছেলে। পুলিনগিন্নী বন্দনাকে নিয়ে মাত্র দু'দিনের জন্য পাটনা গিয়েছিলেন। মেয়ে দেখে পাত্র খুশি হয়েছে, পাত্রপক্ষ রাজী হয়েছে।

আমরা আশ্চর্য হলাম, কাকা আতঙ্কিত হলেন। তারপরে সবাই মিলে হাসতে লাগলাম। কাকার বন্ধুমশায় অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি ব্যাপার?'

কাকা তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন—'যাক, আপনার ভাগ্য ভাল যে আমার এখানে উঠেছিলেন। আপনার ভাগ্নের জন্য অন্য সম্বন্ধ দেখুন। সব কথা পরে হবে। এখন বিশ্রাম করুন।'

রাত্রিবেলা ক্লাব থেকে ঘরে ফিরেই দেখি পুলিনগিন্নী খুড়িমার সঙ্গে কথা বলছেন। বারান্দার চেয়ার টেনে নিয়ে পুলিনগিন্নীর কথাবার্তা শোনার জন্য বসলাম।

পুলিনগিন্নী যেন করুণভাবে আবেদন করছিলেন—'আপনি বিশ্বাস করুন দিদি, বন্দনা কখনো রোগীর বেডপ্যান-ট্যান ছোঁয় না। চাকরি করে এই মাত্র, তাই বলে ব্রাহ্মণের মেয়ে কি এতটা নোংরামি করতে পারে দিদি?'

একবার উঁকি দিয়ে পুলিনগিন্নীর চেহারাটা দেখলাম। সে চেহারাই নয়। একটা প্রচ্ছন্ন আশঙ্কায় পুলিনগিন্নীর মুখটা নিষ্প্রভ হয়ে আছে। যেন তাঁর সর্বস্ব ডুবতে বসেছে। খুড়িমার কাছে যেন একটা পরিত্রাণের প্রার্থনা বার বার কাতরভাবে শোনাচ্ছিলেন পুলিনগিন্নী।

খুড়িমা বললেন—'এ সব কথা আমায় বলে লাভ নেই। কর্তারা যা ভাল বুঝবেন, তাই হবে!'

পুলিনগিন্নী যেন ফুঁপিয়ে উঠলেন—'আপনি ভবানীর কাকাকে একটু বুঝিয়ে বলুন দিদি। ছেলের মামা ওঁর বন্ধু। আমি জানি, উনি হ্যাঁ বললেই বিয়ে হবে, উনি না বললেই বিয়ে ভেঙে যাবে। উনি তো বন্দনাকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছেন, উনি জানেন বন্দনা কেমন মেয়ে।'

খুড়িমা বললেন—উনি যদি ভাল বোঝেন তবে.....'

পুলিনগিন্নী ওঠবার আগে খুড়িমার হাত ধরে একবার অনুরোধ করলেন—'আপনি একটু বুঝিয়ে বলবেন দিদি।'

পুলিনগিন্নী যাবার সময় কাকার বৈঠকখানার দরজার কাছে হঠাৎ কী ভেবে একটু দাঁড়ালেন। কাকা তখন তাঁর বন্ধুকে এই কথা বোঝাচ্ছিলেন—'মেয়ে হল হাসপাতালের জমাদারনী, এরকম একটি মেয়ের সঙ্গে আপনার ভাগ্নের বিয়ে দিতে চান?'

পাত্রের মামা কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বললেন—'না।'

কথাগুলি কানে যাওয়ামাত্র পুলিনগিন্নী ছটফট করে পালিয়ে গেলেন।

পুলিনবাবুর ষড়যন্ত্র ফেঁসে গেল, এই ব্যাপারে বোধহয় খুশি হলো সবাই। বারীন খুশি হলো এই কারণে যে, বন্দনার বিয়ে ভেঙে গেল। বন্দনার চেয়েও কত গরীবের মেয়ের বিয়ে হয়েছে বড়লোকের সঙ্গে। তার মধ্যে তো বিসদৃশ কিছু কেউ দেখেনি। গরীব বলে নয়, পুলিন বাঁড়ুয্যে আর বন্দনা, বাপ-বেটি মিলে যা বেপরোয়া জুতোটুতো বেচতে আরম্ভ করলো—তারই ফল ফলছে একে একে। সমাজে কূলের প্রশ্ন হয়তো বড় পুরনো হয়ে গেছে, সে-সব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। এটা শীলের প্রশ্ন। এক সমাজে থাকতে হলে একই রকম শীলাচার মানতে হবেই। তার ব্যতিক্রম হলে সমাজ ক্ষমা করতে পারে না। আমরা কালচারের দিকটাই দেখছিলাম।

আমরা যে ভুল করিনি, তার প্রমাণ এই যে, বার বার দু'বার আমরা জিতে গেলাম। দু'বারই দুটো অন্যায় হতে চলেছিল, তাই সামান্য আঘাতে ভেঙে গেল। প্রথম অহি, দ্বিতীয় বন্দনা।

ঐ মানুষগুলিও কত সহজে ও সামান্য আঘাতে ভেঙে গেল। সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার বলা মাত্র হু হু করে নেমে গেল অহি। পুলিনবাবুও তাই। চামার নামে শুধু একটা কথায় যেন চামার হয়ে গেলেন। আসলে ওদের মনুষ্যত্বটাই স্ক্যাভেঞ্জার ও চামার হয়ে গিয়েছিল অনেকদিন আগেই। আমরা শুধু মুখোশটা খুলে দিয়েছি। আমাদের

দোষ নেই। অপবাদ দিয়ে আমরা ওদের মিথ্যে করে দিয়েছি, একথা সত্য নয়। এবং যেটুকু শিক্ষা আমাদের বাকী ছিল, তাও অল্পদিনের মধ্যে চরম করে শিখিয়ে দিল বন্দনা।

হৃদয়ভেদী এ-একটি সংবাদ শুনতে পেলাম। সতু তাদের চাকরটাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে গিয়েছিল। কম্পাউণ্ডার এসে দুটো টাকা ঘুষ নিয়ে গেল। কোথা থেকে বন্দনাও এসে নির্লজ্জ ও নিষ্কম্পস্বরে চাইল—আমারও পাওনা আছে। একটা টাকা দিতে হবে। না দিলে....

শশীদের বাড়িতে রোগিণী দেখতে লেডীডাক্তার এসেছিলেন। তার সঙ্গে বন্দনাও এসেছিল। লেডীডাক্তার ফী নিলেন আট টাকা, বন্দনা পেল এক টাকা। এই ন্যায্য পাওনা ছাড়া অক্লেশে হাত পেতে বকশিশ দাবী করে বসলো বন্দনা—আরও কিছু দিতে হবে। শশীর বাবা কৃপণ মানুষ বার বার আপত্তি তুললেন। বন্দনা জেদ ছাড়লো না। অপ্রস্তুত হয়ে, শশী তাড়াতাড়ি নিজের পকেট থেকে আট আনা বকশিস দিয়ে উদ্ধার পেল।

সতু আর শশীর কাছে এই কাহিনী আমরা শুনলাম। বুঝলাম সত্যিই মনেপ্রাণে জমাদারনী হয়ে গেছে বন্দনা। একটা চক্ষুলজ্জারও ধার ধারে না।

আমাদের মনেও আর কোনো অনুশোচনা নেই। যা করেছি, ভালই করেছি। অহিভূষণকে, বন্দনাকে, পুলিনবাবুকে আমরা ঘৃণা করি না। কিন্তু সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার, জমাদারণী ও চামারকে আমরা আমাদের রুচিগত জীবনের আসরে ও বাসরে গ্রাহ্য করতে পারি না। কোনো অন্যায় করিনি আমরা, ওদের কোনো ক্ষতি করিনি আমরা, ওদের জীবিকাই ওদের কালচার নষ্ট করেছে। ওরা যা ওরা তাই। আমরা শুধু নিজেদের বাঁচিয়েছি।

অনেকদিন পরে সমস্যাটা হঠাৎ তৃতীয় অধ্যায়ে পৌঁছে গেল, যেন অদ্ভুত হয়ে উঠলো। ক্লাবে গিয়ে দেখলাম, টেবিলে দশ-বারোটা রঙীন লেপাফাবদ্ধ চিঠি পড়ে রয়েছে। বিয়ের চিঠি, অহির সঙ্গে বন্দনার বিয়ে। অহি আমাদের নেমন্তন্ন করেছে।

বিশ্রী রকমের একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কি অদ্ভুত কাণ্ড! কি অদ্ভুত কাণ্ড! অহির সঙ্গে বন্দনার বিয়ে। এই কি উচিত হলো। কিন্তু কেন উচিত নয়? এই বিয়ে সমর্থন করতে কোনো আনন্দ পাচ্ছি না। কিন্তু অসমর্থন করারও কোনো হেতু খুঁজে পাচ্ছি না।

বারীন অযথা রেগে পাগল হয়ে উঠলো। বারীনের মতে এটা হলো অহির সর্বনাশ। বারীন চেঁচাতে লাগলো—'যত বাজে লোক অহি, তবু বন্দনার মত জমাদারনীর সঙ্গে অহির বিয়ে হতে পারে না।'

সতু ও শশী তার চেয়ে জোরে চেঁচিয়ে উত্তর দিল—'বন্দনা যতই যা তা হোক, কোন সর্দার-স্ক্যাভেঞ্জারের সঙ্গে ওর বিয়ে হওয়া উচিত নয়।'

দু'পক্ষেরই আচরণ বড় গর্হিত, হৃদয়হীনতার মত লাগছিল। ওদের নিয়ে আর মাথা ব্যথা কেন? ওরা সরে গেছে, ওরা আমাদের কেউ নয়। ওদের জীবিকা ভিন্ন, তাই ওদের জীবনও ভিন্ন। আজ ওদের কথা নিয়ে এতটা বিতণ্ডা করা আমাদের পক্ষে অনধিকার চর্চা নয় কি?

কিন্তু কার মনে কি আছে কে জানে? পরের মঙ্গলের গরজে সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলো। সতু ও শশী পুলিনবাবুর কাছে বেনামী চিঠি ছাড়লো—যেন এ বিয়ে না হয়। এত ভাল মেয়ে আপনার, তার জন্য ঐ সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার পাত্র?

বারীন চারপাতা কাগজ ভরে অহিকে চিঠি লিখলো—সাবধান, নিজের সর্বনাশ করো না। বন্দনার মত জমাদারনী মেয়েকে কি তুমি চেন না? যে-সব মেয়ে ইচ্ছে করেও হাসতে পারে না, চোখ তুলে ভদ্রভাবে তাকাতে পারে না, তাদের মতিগতি সম্বন্ধে একটু অ্যানালিসিস করলে দেখতে পাবে যে তারা শুধু চায়.....

তাহলে কি এ-বিয়ে ভেঙে যাবে? এর আগে দু'দুবার তাদের আমরা ভেঙেছি। আমাদের নাগালের মধ্যে তারা এসেছিল, তাই। আজ কিন্তু ঘটনা সে নিয়মের মধ্যে নেই। তারা নিজের পৃথিবীতে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে? তবে কি কোনো উপায় নেই?

অহির বিয়ের নিমন্ত্রণলিপি অর্থাৎ সেই রঙীনখামের চিঠিগুলি ক্লাবের টেবিলের ওপরেই পড়ে রইল। কেউ আগ্রহ করে তুলে নিল না; সঙ্গেও নিয়ে গেল না। কোনো প্রয়োজন হয়তো ছিল না। প্রতি সন্ধ্যায় তাস খেলার সময় আমরা মাত্র দু'টি করে সেই রঙীন চিঠি সদ্ব্যবহার করতাম। সিগারেটের ছাই ফেলার জন্য কোনো পাত্র তাড়াতাড়িতে পাওয়া যেতো না, এ হেন সঙ্কটে গোটা দুয়েক রঙীন খামই ভস্মাধারের কাজ করতো। তাস খেলা শেষ হলে ক্লাবের মালী এসে সতরঞ্চি গুটিয়ে রাখতো। ছাই ঠাসা রঙীন খাম দুটো ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিত।

অহি আর বন্দনার বিয়ে নিয়ে তর্জন-গর্জন ধিক্কার ভ্রূকুটি—সবই কেন জানি হঠাৎ চাপা পড়ে গেল। অহির বিয়ের রঙীন আবেদনের চিহ্নগুলি চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও ঘটনাটা যেন কারও চোখে পড়ছে না। অহির বিয়ের মত একটা ঘটনা, একি নিজের তুচ্ছতায় চাপা পড়ে যাচ্ছে? মাত্র ক'দিন আগে যারা এই ব্যাপার নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছিল, তারাও যেন আজ ভয় পেয়ে চুপ করে গেছে। বারীন, সতু আর শশী এ বিষয়ে কোনো কথাই বলে না। শেষ রঙীন খামটা যেদিন আমাদের আড্ডা থেকে ভস্মাবশেষ নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, সেদিন হঠাৎ আমার একবার কৌতূহল হয়েছিল—অহির বিয়ের দিনটা কবে?

তারপরেই মনে হলো—জেনেই বা কি হবে?

সন্ধ্যের দিকে খুব জোরে বৃষ্টি হয়ে থেমে গেল। ধীরে ধীরে বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। তারপর রওনা হলাম। আজই রাত্রে অহির বিয়ে। কেমন করে তারিখটা সঠিক জানতে পারলাম, জানি না। তবু বুঝলাম, পুলিনবাবুর বাড়ির দিকে চলেছি, একা একা, অন্ধকারে, চুপে চুপে।

বরের আসরে বসেছিল অহি। ছোট একটি সামিয়ানা, ওপরে একটি বেলোয়ারি ঝাড়ের আলো জ্বলছে। দু'টি ছোট কার্পেট পাতা। তার ওপর বসে আছে জনকয়েক বরযাত্রী—মিউনিসিপ্যালিটির মুন্সি হীরালাল, রামনাথ পানওয়ালা, অক্ষয় ময়রার ছেলে গোলক, আরও ঐ ধরনের কয়েকজন। সবাই বেশ ভাল সাজগোজ করে এসেছে, বেশ সজ্জনের মত বসে আছে। বড় কৃতার্থ খুশি ও গর্বিতভাবে বরযাত্রীরা বসেছিল।

আসরের দিকে আর বেশী দূর এগিয়ে যেতে পারলাম না। আজ আবার অনেক বছর পরে অহির ঘুসি খেয়ে যেন রিং থেকে বাইরে ছিটকে পড়েছি। ঐ রিং-এর ভেতর অহি এখন সর্বেশ্বর। সামিয়ানার নীচে যেন এক ভিন্ন পৃথিবীর শান্ত আলো ফুটে রয়েছে। সেখানে সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে আছে অহি। দক্ষিণী ব্রোঞ্জের চিবুক আর কপালের ওপরে চন্দনের ছিটে লেগে রয়েছে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে অহিটাকে।

পিঁড়িতে বসিয়ে বন্দনাকে বিয়ের আসরে নিয়ে আসা হলো। বন্দনাও আশ্চর্য করলো। লাল চেলির শাড়ি জড়ানো সলজ্জ ও সন্ত্রস্ত একটা মূর্তি ধনুকের মত বেঁকে রয়েছে। হিন্দুস্থানী পুরুত মন্ত্র পড়লেন। ভীড় নেই, কলরব নেই। আস্তে শাঁখ বাজলো। ভদ্র ষড়যন্ত্রের আবর্জনা সরিয়ে পুলিনবাবুর বাড়ির বাগান আর উঠোনের এক কোণে আজ একটা নতুন সংসারের রূপ স্পষ্ট ও কঠিন হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের দেবীবর মিশ্র আড়ালে আড়ালে মেল বেঁধে দিচ্ছেন। কাকা আর ক্লাবের সুগম্ভীর সমাজতত্ত্ব এইখানে এসে চরমভাবে ভূয়ো হয়ে গেছে।

হঠাৎ দেখলাম, আমার পাশে কতকগুলি অপরাধী দাঁড়িয়ে আছে—সতু শশী আর, ...একে একে সবাই এসেছে। যাক। কিন্তু বারীন কই?

একটু পরেই দেখলাম বারীনও আসছে। আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল, তবু আমাদের দেখতে পেল না। বিয়ের আসরটার দিকে এক লক্ষ্য রেখে ধীরে এগিয়ে গেল বারীন। একেবারে আসরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। হিন্দুস্থানী পুরুত তখন জোর চেঁচিয়ে মন্ত্র আবৃত্তি করে হোম করছিলেন। দেখলাম, বারীন হাঁ করে অহির দিকে তাকিয়ে আছে। বারীনকে দেখতে পেয়ে অহির সারামুখে অদ্ভুত একটা হাসি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বন্দনার মাথাটা আরও হেঁট হয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেই বারীন উঠে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালো। দেখলাম, পুলিনগিন্নীর সঙ্গে বারীন একটা বচসা বাধিয়েছে। পুলিনগিন্নী হাসছেন। তারপর পুলিনবাবুর কাছে গিয়ে বারীন হাত নেড়ে চেঁচিয়ে একদফা ঝগড়া করলো। পুলিনবাবু হাসতে লাগলেন। পরমুহূর্তে বারীন কোথায় যেন চলে গেল এবং কয়েক মিনিট পরে ফিরে এল। বারীনের সঙ্গে বারীনের জেঠিমা, বারীনের বোন দীপ্তি, বারীনের ভাগ্নী ডলি।

বারীন হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়লো। চাকরগুলোকে ধমক দিল। শেষে স্পষ্ট শুনতে পেলাম, পুলিনগিন্নীর ওপর চটে গিয়ে বারীন গরম গরম কথা বলছে—'ছি ছি, কোনো একটা ব্যবস্থা নেই, আপনাদের এ কী রকমের কাণ্ড?'

দেখলাম দীপ্তি আর ডলি একটা ঘর থেকে জিনিসপত্তর টানাটানি করে বের

করছে। বাসর ঘর তৈরি করছে। বারীনদের গোমস্তা এক ঝুড়ি ফুল দিয়ে গেল। ঘরের চৌকাঠের কাছে, একটা হ্যাজাক বাতি জ্বালাবার জন্য, খুটখাট করে কাজ করতে বসলো বারীন। বারীনের কাণ্ডকারখানা দেখে আমাদের সঙ্কোচ কেটে গিয়েছিল। শেষকালে একেবারে প্রকাশ্যভাবে আসরের কাছে গিয়ে আমরা দেখা দিলাম। বিয়ে তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

বারীন আমাদের দেখেই বলে উঠলো—'এই যে, তোমরা শুধু গিলতে এসেছো, গিলেই যাও।'

এতক্ষণে সত্যি একটা বিয়ে বাড়ির কলরব জেগে উঠেছে। অহি আর বন্দনা আমার পাশ দিয়ে বাসর ঘরে চলে গেল। সবাই হাসি মুখে ইশারায় অভিনন্দন জানালাম। লজ্জায় ও আনন্দে অহি আমাদের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল।

বেশ পেট ভরে গিলে নিলাম আমরা। বারীন তখনও ব্যবস্থা তদারক করছে। পুলিনবাবু সামনে এসে বললেন—'লজ্জা করে খেও না কিন্তু তোমরা। লুচি-মিষ্টি যত খুশি চেয়ে নেবে।'

আজ তিন বছর পরে পুলিনবাবু হঠাৎ আমাদের 'তুমি' বলে সম্বোধন করলেন।

এইবার আমরা বাড়ি ফিরবো। বারীন তখন বাসর ঘরের কাছে ঘুরঘুর করছিল। ডাকলাম বারীনকে।

বারীন সামনে এসে দাঁড়াল। বড় বেশি ক্লান্ত দেখাচ্ছিল বারীনকে। কপালটা ঘেমে আছে, আস্তে আস্তে হাঁপাচ্ছে। মাথার উস্কোখুস্কো চুলের ছায়ার আড়ালে ওর চোখ দুটো যেন অন্ধকারে লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা করছে।'

বারীনকে বললাম—'কি হে, আর কতক্ষণ? চল এবার।'

বারীন সেই মুহূর্তে ঘাবড়ে গিয়ে যেন ব্যস্ত হয়ে পড়লো—'না, এখন আমি যাব না। কাজ আছে।'

বারীনের বাড়াবাড়ি দেখে আমরা বিরক্ত বোধ করছিলাম। হয়ত আর একটু পরেই খুব রেগে উঠতাম, কিন্তু আগে বারীন নিজের থেকেই বেফাঁস কথা বলল—'খুব কষে চটাচ্ছি, কিন্তু আশ্চর্য মেয়ে, প্রত্যেক কথায় শুধু হাসছে।'

সকলে এক সঙ্গে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম—'কাকে চটাচ্ছ? কার কথা বলছো? কে হাসছে?'

হঠাৎ সাবধান হয়ে উঠলো বারীন। সামলে গেল। সেই পুরাতন শ্লথ বিদ্রূপের সুরে, একটু লঘু কুৎসার হাওয়া জাগিয়ে, শুধু কথার চালাকিতে শেষবারের মত আমাদের ফাঁকি দেবার চেষ্টা করলো—'তোমাদের মিসেস চ্যাটার্জী, আবার কে? ফাইন হাসছে কিন্তু, যাই বল।'

আর বলবার কিছু নেই। বারীনকে রেখে আমরা রওনা হলাম। আরও কিছুক্ষণ থাকুক বারীন। আজ যেন ওর অন্তরাত্মা চরমভাবে হেরে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করছে। আজ বোধহয় বারীন সত্যিই অ্যানালিসিস করে বুঝতে পেরেছে যে—এই ধরনের

মেয়েরা, যারা চোখ তুলে তাকাতে পারতো না, ইচ্ছে করেও হাসতে পারতো না, তারা শুধু চায় যে.....

অলীক

তারিণী মিত্তির রোডে সবচেয়ে বড় লাল-রঙের বাড়িটার ফটকের মাথায় শালুর কাপড় দিয়ে মোড়া আর লতাপাতা দিয়ে সাজানো একটা মাচানের ওপর সানাই বাজছে সন্ধ্যাবেলা। আজ গগনবাবুর ছোট মেয়ের বিয়ে।

আঙ্গিনার ওপর ফরাস-পাতা হয়েছে। নিমন্ত্রিতেরা দলে দলে এসে বসছেন। তেতলার ছাদে গোলপাতার ছাউনির নিচে বিদ্যুতের বাতি জ্বলে, ছাদের দিক থেকে জনতার কলরবও শোনা যায়। বুঝতে কষ্ট হয় না, একদল লোক এরই মধ্যে খেতে বসে গেছে।

ফরাস পাতা আসর ছাড়া আর একটা আসরও করা হয়েছে, আর একটু ভিতরের দিকে, হলঘরের প্রায় কাছাকাছি একটা রোয়াকের মত জায়গার ওপরে। প্রায় শ'খানেক চেয়ার পাতা এই আসরের এখানে ওখানে গোটা কয়েক তে-পায়া ছোট ছোট টেবিল আছে; তার ওপর আছে ছোট ছোট রূপোর রেকাবিতে পান আর একটা করে সিগারেটের টিন। এখানে বসেছেন বরযাত্রীর দল, আর এখানেই এসে বসবেন বিশিষ্ট গণ্যমান্যের দল। গগনবাবুর কারবারের যিনি মুরুব্বী এবং মহাজন সেই দত্তবাবুও এসে বসলেন। স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড মিলারের পারচেজিং-এর অধ্যক্ষ বিরাটকায় দত্তবাবু হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ফ্লানেলের একটা আলখাল্লা গোছের জামা গায়ে।

আঙ্গিনার ফরাস পাতা আসর এবং এই রোয়াকের ওপর চেয়ার পাতা আসর— মাঝখানে যে ব্যবধান রয়েছে, তাকে জুড়ে রেখেছে যোজকের মত একটা সরু পথ। এখানে দাঁড়িয়েছিলেন গগনবাবুর মেয়ের বড়-পিসেমশাই আর ন'মামা। তাছাড়া চারদিকে ঘুরে নজর রাখছিল একটা ভলান্টিয়ার দল। যে সে দল নয়, বাছাই করা স্যাণ্ডো মার্কা ছেলের দল—হাবুল, আলোক, অশেষ আর বঙ্কু। নেপালের চেহারাটা সত্যিই স্যাণ্ডোগোছের, হাত দুটো বেশ মাস্কুলার, ভারি দুটো লোহার হাতুড়ির মতো দেখতে। হাবুল, আলোক, অশেষ আর বঙ্কু চেহারার দিক দিয়ে যাই হোক না কেন, ওরাও স্যাণ্ডো গেঞ্জি গায়ে দিয়েছিল।

নিমন্ত্রিতদের ভিড় বাড়তে থাকে, বড়-পিসেমশাই এবং ন'মামা একটু বেশি করে সাবধান হতে থাকেন। স্যাণ্ডোর দলও বিয়েবাড়ির নানাদিকে ঘুরে ফিরে কড়া নজর রাখতে থাকে।

তারিণী মিত্তির রোডে সবচেয়ে বড় লাল রঙের বাড়িতে আজ পৃথিবীর মানবজাতিকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করে ফেলা হয়েছে। প্রথম হলো, যাঁরা ফরাস পাতা আসরে বসবেন এবং তেতলার ছাদে বসে খাবেন। দ্বিতীয়, অল্পসংখ্যক

বাছাই-করা যাঁরা চেয়ার পাতা আসরে বসবেন এবং হলঘরের ভেতরে বসে খাবেন। তৃতীয়, যারা এই দুই আসরের কোন আসরেরই নয়—অর্থাৎ নিমন্ত্রিতই নয়, যাদের খাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না, এবং ধরতে পারলে সোজা টেনে নিয়ে ঘা'কতক ভাল শিক্ষা দিয়ে একেবারে ফটক পার করে দিতে হবে।

তেতলার ছাদে যাঁরা খাবেন তাদের জন্য লুচি, বেগুন ভাজা, মাছের ঘন্ট, দই আর দরবেশ—এই ছয়টি ভোজ্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। হলঘরে যাঁরা খাবেন তাঁদের জন্য এই ছয়টি ভোজ্য ছাড়া আরও কয়েকটি বিশেষ ভোজ্য আছে—আনারসের চাটনি, সন্দেশ, পায়েস, মাছের কালিয়া এবং রাবড়িও।

কাজেই সাবধান হতে হয়েছে। কোন বিশিষ্ট সজ্জন যদি ভুলক্রমে ফরাস-পাতা আসরে বসেন এবং তেতলার ছাদে বসে সাধারণ খাওয়া খেয়ে চলে যান, তাহলে গগনবাবুর অপমান হবে, নিন্দে হবে এবং ক্ষতিও হতে পারে। যদি ফরাস পাতা আসরে বসবার যোগ্য কোন সাধারণ মানুষ ভুলক্রমে চেয়ার পাতা আসরের বিশিষ্টদের মধ্যে মিশে যান এবং হলঘরে বসে খেয়ে যান, তাহলে হিসেব করা আনারসের চাটনি, পায়েস ও রাবড়ির ওপর মাত্রাছাড়া আঘাত পড়বে। এর ওপর যদি মানবজাতির সেই ভয়ানক তৃতীয় শ্রেণীর কিছু লোক ফাঁকতালে এ-আসর অথবা ও-আসরের মধ্যে ঢুকে পড়বার সুযোগ পায়, তাহলে তো কথাই নেই, সব বে-হিসাব হয়ে যাবে।

কাজেই সাবধান থাকতে হবে, সাধারণের কেউ যেন ভুলে চেয়ার পাতা আসরে ঢুকে না পড়ে এবং অসাধারণের কেউ যেন ভুলে ফরাস পাতা আসরে গিয়ে বসে না থাকেন। আর অনাহুত কোন দুর্দান্ত লোভী যেন কৌশলে কোন মতেই কোন আসরে ঢুকে পড়তে না পারে।

দুরূহ দায়িত্ব, তবু খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছিলেন বড়-পিসেমশাই আর ন'মামা। মানুষ চিনতে হবে। চেনা-অচেনা, ফর্সা, কালো, বৃদ্ধ ও তরুণ প্রত্যেকেরই শুধু বাহিরটা দেখে ভিতরটা বুঝে ফেলতে হবে।

প্রবেশ পথের মাঝখানে টিকিট-চেকারের মত পথটা আটক করেই দাঁড়িয়ে থাকেন বড়-পিসেমশাই আর ন'মামা। আগন্তুকের সাজ-পোষাক, চলবার ভঙ্গি এবং চোখের দৃষ্টি দেখেই বুঝতে পারছিলেন, কে কোন দরের মানুষ। কোন সমস্যা দেখা দিচ্ছে না। মানুষ চিনতে কোন ভুল হচ্ছে না। সাধারণদের চিনে ফেলামাত্র ট্রাফিক পুলিশের মত ভঙ্গিতে হাত তুলে ফরাস পাতা আসর দেখিয়ে দিচ্ছিলেন এবং অসাধারণদের চিনে ফেলা মাত্র হাতজোড় করে চেয়ার পাতা আসরের দিকে সাগ্রহে পাইলট করে আনছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, আসছেন কেমন রকমের একজন মানুষ। বড়-পিসেমশাই আর ন'মামা দুজনেই বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করছিলেন, একটা লোক ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে চারদিকে একবার তাকিয়ে নিল, তারপর ধীরে ধীরে হেঁটে এসে ফরাস পাতা আসরে ঢুকে পড়লো। এখন আবার ফরাস পাতা আসরের ভেতর

থেকে লোকটা বের হয়ে এই দিকেই আসছে, চেয়ার পাতা আসরের দিকে যাবার জন্য। এ আবার কেমন মানুষ?

দোহারা চেহারার লোকটা, একটু কম বয়সের মনে হয়েছিল, কিন্তু কাছে আসতেই কপালের রেখাগুলির দিকে তাকিয়ে দেখা গেল যে, বয়েসটা অন্তত চল্লিশ পঁয়তাল্লিশের কম নয়। মাথার চুল খুবই কালো আর গায়ের রঙও বেশ কালো। সাজটা কিন্তু ধবধবে সাদা। গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী, ফরাসডাঙ্গা ধূতি, পায়ে সাদা চামড়ার নাগরা। কোঁচাটা পাঞ্জাবির পকেটে গোঁজা, থরে থরে কুঁচি-করা কোঁচার প্রান্তভাগ জাপানী-পাখার মত পকেটের ভেতর থেকে বাইরে উঁকি দিয়ে রয়েছে।

বাধা দিতে হবে, প্রশ্ন করতে হবে এবং একটু পরীক্ষা করে দেখতে হবে, লোকটা কোন্ শ্রেণীর মানুষ। ফরাস পাতা আসর ছেড়ে চেয়ার পাতা আসরের দিকে যেতেই বা চাইছে কেন? কিন্তু কিভাবে কোন্ কথা বলবেন, এবং কেমন করে বাধা দেবেন, ভেবে ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না বড়-পিসেমশাই আর ন'মামা।

লোকটা প্রায় কাছে এসে পড়েছে, কিন্তু বাধা দেবার অথবা লোকটার মনুষ্যত্ব লক্ষ্য করবার কায়দাটি ঠিক ভেবে উঠতে পারছিলেন না দু'জনের কেউ। হঠাৎ দু'জনেরই চোখে পড়ে, লোকটার পিছু পিছু স্যাণ্ডো দলের পাঁচজন ছায়ার মত নিঃশব্দে অনুসরণ করে আসছে। মাস্কুলার নেপাল তার হাতুড়ির মত হাত তুলে একটা ইশারা করলো। সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন বড়-পিসেমশাই আর ন'মামা, কারণ নেপালের ইশারার অর্থটা ভাল করেই তাঁরা বুঝতে পেরেছেন।

এতক্ষণে একটা লোককে আবিষ্কার করা গেছে, যে লোক কোন আসরেরই লোক নয়। অবাঞ্ছিত এবং অনাহুত সেই ভয়ঙ্কর কপট অতিথিদলেরই একজন, যাদের ধরবার জন্য স্যাণ্ডো দল বিয়েবাড়ির নানাদিকে এতক্ষণ নজর রেখে ঘুরছিল। এতক্ষণের চেষ্টায় মাত্র একজনকে চিনতে পারা গেছে। চেনবার মত কতগুলি প্রমাণও পাওয়া গেছে। ঐ লোকটাকে তো কিছুক্ষণ আগে বড় রাস্তার পানের দোকানের কাছে দাঁড়িয়েছিল আর বঙ্কুর কাছেই জিজ্ঞাসা করেছিল, এ বাড়িটা কার বাড়ি, কার মেয়ের বিয়ে, বর আসছে কোথা থেকে, বরযাত্রীরা কি এসে গেছে!

লোকটা সামনে এসেই অত্যন্ত সহজভাবে হাসতে থাকে এবং মাথা নেড়ে বলে—নাঃ, গগনদার টিকিটিও আজ আর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না, এতই ব্যস্ত।

দু'চোখ বিস্ফারিত করে ন'মামা জিজ্ঞাসা করেন—কি বললেন? কার নাম করলেন?

ন'মামার প্রশ্ন শুনেই লোকটা চমকে উঠলো মনে হলো, পরমুহূর্তে মুখ ঘুরিয়ে এবং উদ্‌গ্রীব সারসের মত গলা টান করে চেয়ার-পাতা আসরের দিকে তাকিয়ে ব্যস্তভাবে বলে—অ্যাঁ, আমাদের স্যারও দেখি এসে গেছেন।

বলতে বলতে বড়-পিসেমশাইয়ের পাশ কাটিয়ে দ্রুতপদে চলে এসে লোকটা

চেয়ার পাতা আসরে প্রবেশ করে এবং বিরাটকায় দত্তবাবুর পাশের চেয়ারে বসেই জিজ্ঞাসা করে—কেমন আছেন?

দত্তবাবু সম্ভ্রমের সুরে বলেন—আজ্ঞে ভাল আছি। আপনি?

লোকটা বলে—ভালই আছি আপনাদের আশীর্বাদে।

বড়-পিসেমসাই, ন'মামা আর স্যাঙাের দল হতভম্ব হয়ে দেখতে থাকে, লোকটা তেপায়া টেবিলের ওপর থেকে স্বচ্ছন্দে একটা সিগারেট তুলে নিল এবং দত্তবাবুর কাছ থেকেই দেশলাই চেয়ে সিগারেট ধরালো। চেয়ারের ওপর একটু আয়েস করে কাত হয়ে বসে এবং পা ছড়িয়ে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো লোকটা, এই অঘ্রাণ মাসের দিনে ফিনফিনে একট গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবী! অদ্ভুত!

মাস্ক্যুলার নেপাল বলে—কি রকম বুঝছেন পিসেমশাই?

বড়-পিসেমশাই—কিছুই বুঝতে পারছি না। বোধহয় স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড মিলারের পারচেজিং ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র গ্রেডেরই কেউ হবে, নইলে দত্তবাবুর সঙ্গে এতটা মাখামাখি.....।

ন'মামা বলেন—কিছু বলা যায় না দাদা, অলীক চেনা বড় কঠিন।

বড়-পিসেমশাই—কিন্তু কি করা যায় বলুন দেখি!

বড়-পিসেমশাই আর স্যাঙাে দলকে এই বিমূঢ় অবস্থা ও সমস্যা থেকে আপাতত মুক্তি দিলেন স্বয়ং গগনবাবু। হাতজোড় করে চেয়ার পাতা আসরে সমাসীন বিশিষ্ট সজ্জনদের খাবার জন্য আহ্বান জানালেন। আহুত সজ্জনেরা একে একে উঠে হলঘরের ভেতর টেবিল-পাতা খাবারের আসরে গিয়ে বসলেন। ফ্লানেলে ঢাকা বিরাটকায় দত্তবাবুর সঙ্গে গল্প করতে করতে গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবিও উঠে গিয়ে খাবার টেবিলে বসলো। হতাশ হয়ে পড়লো স্যাঙাে দল। মাস্ক্যুলার নেপাল হাতুড়ির মত হাতের আঙুল মটকে আক্ষেপ করলো—আর কোনো আশা নেই। লোকটা অলীক নয় বলেই বোঝা যাচ্ছে।

ন'মামা বললেন—না হে, তবু নজর রাখ। চালচলনেই ধরা পড়ে যাবে যত পাকা অলীক হোক না কেন। এখুনি আশা ছেড়ে দিও না নেপাল।

হলঘরের বিশেষ খাবারের আসরে বিশিষ্টদের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে আসে এবং দই-সন্দেশের পরিবেশন করা হয়ে যায়। তবু নজর রাখছিলেন বড়-পিসেমশাই, ন'মামা আর স্যাঙাের দল হলঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে, দুর্গদ্বারের সতর্ক প্রহরীর মত, কারণ সেই লোকটা, সেই গিলে-করা আদ্দি তখনো একমনে হাত চালিয়ে লুচি দিয়ে মাছের কালিয়া খেয়ে চলেছে।

মাছের কালিয়া শেষ করে দইয়ের খুরি কাছে টেনে নিয়ে গিলে-করা আদ্দি পরিবেশক পটলদার মুখের দিকে তাকিয়ে অল্প একটু হেসে রান্নার সুখ্যাতিও করে—মাছের কালিয়াটা সত্যিই অতি উপাদেয় হয়েছে।

গিলে-করা আদ্দির ভাষার আঘাতে খাইয়েদের ভ্রূভঙ্গির ব্যাকরণ কৌতুকে একটু

কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে স্যাঙোর দল, বড়-পিসেমশাই আর ন'মামা। চোখে চোখে শাণিত সন্দেহ আরও প্রখর হয়ে ওঠে।

মাস্ক্যুলার নেপাল অস্থির হয়ে ওঠে—এখুনি ব্যাটাকে ঘাড় ধরে তুলে নিয়ে আসি, আর দেরি করা চলে না।

বড়-পিসেমশাই একটু বিব্রতভাবে ন'মামাকে জিজ্ঞাসা করেন—আপনি কি বলেন?

ন'মামা হতাশভাবে বলেন—আর ওসব করে লাভ কি? সন্দেশ পর্যন্ত শেষ করে ফেলেছে, বাকি আছে আঁচানো।

নেপাল উত্তেজিত হয়। —কিন্তু এরকম একটা জোচ্চোরের গায়ে একটা টোকা পর্যন্ত না মেরে বেমালুম ছেড়ে দেবেন?

ন'মামা—কখ্‌খনো না। আঁচিয়ে নিক, তারপর। লোকজনের সামনে হল্লা না বাধিয়ে, বরং একটু আড়ালে গিয়ে একটু বাগে পেয়ে নিয়ে তারপর.....।

দরজা ছেড়ে বাইরে চলে যায় স্যাঙোর দল, বড়-পিসেমশাই আর ন'মামা। এবং খাওয়া শেষের পর আঁচানো শেষ করে গণ্যমানের দলও আবার বাইরের রোয়াকে চেয়ার পাতা আসরে এসে ভিড় করতে থাকেন। কেউ পান চিবোন, কেউ ঢেঁকুর তোলেন, কেউ বা সিগারেট ধরান। যাঁর সঙ্গে যাঁর খুশি গল্পে ও বার্তালাপে মেতে ওঠেন। সকলেরই কথায়, আচরণে, হাসিতে এবং চাঞ্চল্যে একটা বাঁধভাঙ্গা অবস্থা।

গিলে-করা আদ্দিও চারদিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে কি যেন দেখে, সাদা নাগরা-জোড়ার ভেতর তার কালো কালো পা জোড়া ঢুকিয়ে নিয়ে কিসের জন্য যেন প্রস্তুত হয়।

একটা হুল্লোড় জাগে ফরাস পাতা আসরেও, তেতলার ছাদ থেকে একটা খাইয়ের দল খাওয়া শেষ করে এঁটো হাতে নেমে আসছে সিঁড়ি ধরে। ফরাস পাতা আসরের প্রতীক্ষমান দলটা মুহূর্তের মধ্যে উঠন্ত হয়ে এবং প্রায় দৌড়ে গিয়ে নামন্ত জনতাকে যেন চার্জ করে। এঁটো জনতার গায়ের ওপর দিয়ে খাইয়েদের দ্বিতীয় ব্যাচ মরিয়া হয়ে তেতলার দিকে ছুটে উঠতে থাকে। চারদিকে একটা হৈ হৈ শব্দের অরাজগতা, সবদিকে যেন বেশ একটা অসাবধানতা, চাঞ্চল্য আর বেসামাল ভাব।

দূরের ফটকটার দিকে তাকিয়ে গিলে-করা আদ্দির চোখ দুটো ঝক্‌ঝক্ করে। যেন মুক্তির পথ এতক্ষণে অবারিত হয়েছে। ফটক লক্ষ্য করে সবেগে দৌড় দিল গিলে-করা আদ্দি।

কিন্তু কয়েক পা'র বেশি আর দৌড়তে হলো না। নিকটেই একটা থামের আড়াল থেকে চিতে বাঘের মত এক লাফে এগিয়ে এল নেপাল এবং দুটি মাস্ক্যুলার হাতে জড়িয়ে ধরলো গিলে-করা আদ্দির কোমরটা। তার পরেই প্রচণ্ড একটা ধোবিয়া আছাড়ের প্যাঁচ দিয়ে শানের ওপর পট্‌কে চেপে ধরলো গিলে-করা আদ্দিকে। এপাশ আর ওপাশ থেকে মুহূর্তের মধ্যে ছুটে এল বঙ্কু, হাবুল, অশেষ আর আলোক। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন বড়-পিসেমশাই আর ন'মামা, ঘুষি পাকিয়ে এবং চোখ পাকিয়ে।

বঙ্কু চিৎকার করে—আগে হাত দুটোকে শক্ত করে দুমড়ে ধর নেপাল, যেন কোমর থেকে ছুরি বের করতে না পারে।

গিলে-করা আদ্দির হাতদুটোকে মুচড়ে পিঠের ওপর চড়িয়ে দিল নেপাল।

গিলে-করা আদ্দির বড়-বড় চুলের ঝুঁটি ধরবার জন্যে হাত কাঁপাতে থাকেন ন'মামা এবং বঙ্কু একটা চড় তুলে ধরে তার লম্বা হাতে। কিন্তু ঘটনাটা এত তীব্র ও দ্রুত জমে উঠতে গিয়েও হঠাৎ একটা বাধা পেল। বিরাটকায় দত্তবাবু তাঁর ফ্লানেলে ঢাকা ভুঁড়ির ওপর হাত চেপে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে দাঁড়ালেন। —ছি-ছি-ছি, কি কুৎসিত ব্যাপার! ভদ্রলোককে তোমরা এরকম....।

গিলে-করা আদ্দিকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় নেপাল এবং হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—ভদ্রলোক নয় স্যার, এটা একটা অলীক।

দত্তবাবু বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে বলেন—অলীক? তার মানে?

নেপাল—নেমন্তন্ন হয়নি, অচেনা অজানা লোক, ভাঁওতা দিয়ে সাঁটিয়ে খেয়ে নিয়ে সটকে পড়ছে স্যার।

গিলে-করা আদ্দি দু'হাত দিয়ে নাক মুখ ও কপাল চেপে, যেন শুধু পিঠের ওপর সব মার বরণ করবার জন্য তৈরি হয়ে মাটির ওপরে বসেছিল, ধূর্ত শেয়াল যেমন চাষার লাঠির সম্মুখে গুটিসুটি হয়ে মরার ভান করে পড়ে থাকে। গিলে-করা আদ্দির আরও কাছে এগিয়ে এসে দত্তবাবু দাঁড়ালেন এবং দু'হাত তুলে সকলকে সরে যেতে বললেন—যেতে দাও, যেতে দাও।

তেতলার ছাদে খাইয়েদের হুল্লোড় শোনা যায়। অন্তঃপুরের অন্তর থেকে শঙ্খধ্বনি, আর আকুল ললনাকুলকণ্ঠ হতে উলু রব। একটা লুচি-লুচি গন্ধও চারদিকে থৈ থৈ করে ওঠে।

দত্তবাবু বলেন—দুটো খেয়েছে, এই তো? তাতে কি হয়েছে? যেতে দাও, কিছু বলো না।

কাউকে কিছু বলতে হলো না। গুটিসুটি গিলে-করা আদ্দি হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে এবং সটান দৌড় দিয়ে ফটক পার হয়ে যেন তারিণী মিত্তির রোডের বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়।

অঘ্রাণের রাতের উল্টোডিঙ্গির খালের ওপর ছোট ছোট কুয়াশার স্তবক ভাসে, তারিণী মিত্তির রোড এখান থেকে অনেক দূরে। খালের পাশে পাশে পথ ধরে হেঁটে চলেছে অলীক—গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি, ফরাসডাঙ্গা ধুতি আর সাদা নাগরা দিয়ে তৈরি লোকটা।

মুচিদের ছোট বস্তিটা ডাইনে রেখে আরও কিছুদূর গিয়ে অলীক একবার থামে, পথের পাশে একটা টিউবওয়েলের পাম্পের হাতলটা ধরে চাপ দেয়। বেশ জোর লাগে এবং জোর দিতে গেলে ঘাড়ের মাংসপেশীগুলিও থরথর করে। সবই ভুলে গিয়েছিল অলীক, এতক্ষণে মনে পড়ে, তারিণী মিত্তির রোডের সেই যণ্ডাটা তার হাত

দুটোকে কিভাবে বলির পাঁঠার ঠ্যাঙের মত মুচড়ে দিয়ে একেবারে পিঠের ওপর তুলে দিয়েছিল।

টিউবওয়েলের জল ঝলক দিয়ে উঠতেই আঁজলা তুলে জল ধরে অলীক। ঘাড়ের দু'পাশটা জল দিয়ে মালিশ করে, তারপর চলতে থাকে।

সোজা রাস্তা ছেড়ে ডাইনে আরও ছোট এবং গোবরমাখা একটা পথে নেমে পড়ে অলীক। পাশেই মহিষের খাটাল, পেছল হয়ে আছে ধরাতল, তবু পিছলে পড়ে না অলীক, স্বচ্ছন্দে চলতে থাকে। এবার দেখা যায়, অনেকগুলি খোলার ঘর, মাঝে মাঝে এক-একটা দালানবাড়িও আছে। চলতে চলতে একটা সরু গলির মুখে এসে দাঁড়ায় অলীক। ভৈরবতলা সেকেণ্ড লেন।

গলির ভেতরে ঢুকে কয়েকটা ঘর পার হয়েই একটা ঘরের দরজায় কড়া নাড়ে অলীক। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে যায়। কেরোসিনের একটা বাতি হাতে, লালপেড়ে শাড়ি এবং টিকালো নাকে নাকছাবি একটি শীর্ণকায় নারীমূর্তি অলীকের মুখের দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি তুলে প্রশ্ন করে—আজ আবার এত দেরি করলে যে?

একমুখ হাসি হেসে ঘরে ঢোকে অলীক এবং আদ্দির পাঞ্জাবিটা সাবধানে গা থেকে খুলতে খুলতে উত্তর দেয়—আজকের মিটিং-এ ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়েছিল বউ, সামলাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে।

নাকছাবি বলে—এমন মিটিং-এ না গেলেই নয়!

—না গেলে আমার কোন ক্ষেতি নেই, কিন্তু আর পাঁচজনের যে ক্ষেতি হয় বউ।

ছাড়া পাঞ্জাবীটাকে আস্তে আস্তে মেঝের ওপর রাখে অলীক। নাগড়া জোড়া খুলে ঘরের কোণে সযত্নে রাখে। ফরাসডাঙ্গা ছেড়ে গামছা পরে। পালক ছাড়ানো একটা পাখির মতই দেখায় অলীককে—কতটুকু দেখতে, কত দূর্বল এবং কি রোগা মানুষের শরীর!

নাকছাবি প্রশ্ন করে—মিটিং-এ মারামারি হয়েছিল বুঝি?

অলীক—হতে আর দিলাম কই? যখন মিষ্টি কথায় কেউ শান্ত হলো না, তখন আচ্ছা করে ধমক দিয়ে দু'দলকে দু'দিকে সরিয়ে দিলাম।

নাকছাবি—কি নিয়ে ঝগড়াটা বাধলো?

অলীক—ঐ, সেই কনটোল নিয়ে। একদল স্বদেশী বলে কনটোল চাই, আর একদল স্বদেশী বলে চাই না। শেষ পর্যন্ত আমাকেই মাঝখানে পড়ে একটা আপোস করিয়ে দিতে হলো।

নাকছাবি—কি আপোস হলো?

অলীক—মাসে পনেরো দিন কনটোল থাকবে, আর পনেরো দিন থাকবে না। তারপর আবার পনের দিন কনটোল, এইরকম আর কি! দু'দলই খুশি হলো।

কুলুঙ্গি থেকে একটুকরো কাপড়-কাচা সাবান তুলে হাতে নেয় অলীক এবং একটা নারকেলের আঁচি নেড়েচেড়ে আক্ষেপ করে—এঃ, সোডাটা যে তোর কাঁথা কাচতেই একেবারে শেষ করে দিয়েছিস বউ, এখন আমি কি করি বল তো!

নাকছাবি বিরক্ত হয়—এই মাঝরাতে আবার কাচাকাচি আরম্ভ হলো? মরণ আমার।

এক হাতে জলের বালতি এবং এক হাতে একটা লোহার রড নিয়ে অলীক দরজার দিকে এগিয়ে যায়। গলি পার হয়ে পাকা রাস্তার কিনারা থেকে একটা হাইড্রেন্টের মুখ খুলে জল আনতে হবে। যেতে যেতেই বলে—স্বদেশী বেটাদের ধস্তাধস্তির মধ্যে পড়ে জামাকাপড়ে বেশ ময়লা লেগেছে বউ। এখুনি কেচে না রাখলে দাগগুলো পেকে যেতে পারে। কাল আবার মিটিং-এ যাবার সময় যাতে....।

নাকছাবি বাধা দিয়ে অপ্রসন্নভাবে বলে, কালও আবার মিটিং আছে নাকি?

অলীক—আছে, এই অঘ্রাণ মাসের মধ্যেই আরও চারটে মিটিং-এর দিন আছে; তারপরেই কিছুদিন আবার রেহাই পাওয়া যাবে।

নাকছাবি এইবার রাগ করে একটু ঝাঁঝালো স্বরে বলে—তাহলে এই অঘ্রাণ মাসের মধ্যেই আমার মরণ হবে, চিতের জন্য কাঠ যোগাড় কর।

দরজার চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে অলীক একটু বিব্রতভাবে প্রশ্ন করে—তুই এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন বল দিকি?

নাকছাবি—এ মাসটা শুধু মিটিং করে যদি কাটিয়ে দাও তো কেলাবে যাবার ফুরসত পাবে কখন, আর পাওনা কোমিশনের টাকাগুলোই বা আনবে কখন?

বলতে বলতে হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নাকছাবির কণ্ঠস্বর—ঘরে দু'কুড়ি ঘুঁটে পর্যন্ত নেই যে, এই পোড়াকপালে আর একটু আগুন দেব। মুচিমাগীদের কাছে হাত পেতে ধার করে মরছি, আর দেবে না বলে দিয়েছে। এ মাসটা চালাবো কি করে?

গলির বাইরে অন্ধকারের দিকে একবার দু'চোখ তুলে তাকায় অলীক, তারপরেই মুখ ফিরিয়ে রুষ্টা নাকছাবির দিকে তাকায়। অতি শান্ত ও কোমল কণ্ঠস্বরে অনুনয় করে অলীক বলে—একটু আস্তে কথা বল বউ, অবুঝ হোসনি।

তারপরেই আরও কোমল স্বরে অলীক আবেদন করে—চালিয়ে নে বউ, এই অঘ্রাণ মাসটা কোন মতে চালিয়ে নে। শুনেছি পৌষ মাসে কোন মিটিং-এর তারিখ হয় না। এ মাসটা শেষ হলেই কেলাবে যাব আর কমিশনও নিয়ে আসব.

লালপেড়ে শাড়ি, টিকালো নাকে নাকছাবি শীর্ণকায় নারীমূর্তি অলীকের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অন্যরকম হয়ে যায়। চোখের দৃষ্টিটাও কেমন যেন মমতামন্থর হয়ে ওঠে। এমন মানুষকে গঞ্জনা দিয়ে আর লাভ কি? দশজনের উপকার করবার শখে এমনই মেতে আছে যে, নিজের হাঁড়ির জন্যে দু'মুঠো চাল-ডালের পয়সাও রোজকার করে আনবার সময় পাচ্ছে না। সময়মত ভাত পায় না, পেলেও পেট ভরার মত হয় না, পূজো-পার্বণের দিনেও দুটো ক্ষীর-ছানার জিনিস পেটে পড়ে না। তবুও কি মানুষটা কোনওদিন মনের দুঃখে একটুও রাগ করলো? ভগবানের যেন চোখ নেই, নইলে এমন মানুষ কষ্ট পায়?

আদুর গা, রোগা এতটুকু একটা শরীর, পরিধানের ছোট একটা গামছা, এক হাতে একটা লোহার রড এবং আর এক হাতে বালতি— দাঁড়িয়েছিল অলীক দরজার

চৌকাঠের কাছে। কেরোসিনের বাতির ধোঁয়াটে আলোর মধ্যে কেমন একটা ছায়া-ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন সংসারবিরাগী একটা সন্ন্যাসীর মূর্তি। অলীককে যেন নতুন করে চেনবার চেষ্টা করছে তার বিশ বছরের জীবন-সঙ্গিনী, এই লালপেড়ে শাড়ি আর টিকালো নাকছাবি। বিশ বছর ঘর করেও মানুষটাকে যেন সে ঠিক চিনে উঠতে পারেনি। তাই মাঝে মাঝে ভুল হয়। তাই এমন সন্ন্যাসীর মত যার মন—রাগ নেই, লোভ নেই এবং দুঃখ করে না, এমন একটা মানুষকেও কতবার কত কটূ কথা বলতে হয়েছে। কিন্তু ভগবানও কি চিনতে ভুল করেছে? নইলে মানুষটাকে দিনরাত অমন একটা হাভাতে অদেষ্ট সহ্য করতে হয় কেন?

খুবই আস্তে আস্তে এবং শান্তস্বরে নাকছাবি বলে—মিটিং থেকে কিছু খেয়ে ফিরেছ তো?

অলীক—না।

নাকছাবি—তাহলে দু'মুঠো চাল ফুটিয়ে দিই।

অলীক—আরে না-না। ওসব কিছু করিসনি। তুই তো জানিস মিটিং-এ গেলে আমার ক্ষিদে মরে যায়। এখন খেলে অসুখ করবে।

জল আনতে বের হয়ে যায় অলীক। মেঝের ওপর মাদুর পেতে এবং মাথার নীচে ছোট একট ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলি গুঁজে দিয়ে শীর্ণকায় লালপেড়ে শাড়িও শুয়ে পড়ে নিশ্চিন্ত মনে। অঘোরে ঘুমিয়ে পড়তেও আর দেরী হয় না।

অঘ্রাণের রাত একটু গভীর হয়। উল্টোডিঙ্গির খালের কুয়াশা রাতের আকাশে ক্রমেই ওপরে ওঠে। ভৈরবতলা সেকেণ্ড লেনে এক অলীকের ঘরের দরজার বাইরে একখণ্ড তক্তার ওপর কাপড় কাচার শব্দ আছাড় খেয়ে পড়তে থাকে। তার ঐ আদ্দি, ফরাসডাঙ্গা আর নাগরার ধবধবে সাদার ওপর একটুও ময়লার দাগ সহ্য করতে পারে না অলীক।

রাত বাড়ছে। এখন শুধু একদফা সাবান-কাচা করে পাঞ্জাবি আর ধুতিটাকে খুব হাল্কা নীলের জলে চুবিয়ে রাখতে হবে। সকাল হতেই আরম্ভ হবে আবার এবং প্রায় বিকেল পর্যন্ত চলবে অলীকের এই কাপড়-চোপড় সাদা ধবধবে করার সাধনা।

এ কাজেও অলীক হাতটা পাকিয়েছে ভাল। ভোরে ঘুম ছেড়ে উঠেই সবার আগে একটা কাঠের গামলায় রিঠে ভিজিয়ে রাখে। তারপর কাচা পাঞ্জাবি আর ধুতিটাকে এক দফা ছায়ায় এবং আর এক দফা রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। কলপ দেওয়া বাকি থাকে, যতক্ষণ না টিকালো নাকে নাকছাবি একবাটি ভাতের ফেন এনে দিয়ে যায়।

একটি আদ্দির পাঞ্জাবি এবং একটি ফরাসডাঙ্গা ধুতি ছাড়া আর একটি বস্তু আছে—একখানা মখমলের উড়ুনি। যেদিন একেবারে ভদ্রেশ্বর হতে হয়, মাঝে মাঝে দরকারও হয়, সেইদিন মখমলের উড়ুনিটাকে সাবান জলে, রিঠে ভেজানো জলে ও নীলের জলে চুবিয়ে এবং আছড়ে আছড়ে দুধের মত সাদা করে ফেলে অলীক।

ইস্তিরি করা শেষ হয় দুপুরের মধ্যে এবং বিকেল হলেই আরম্ভ হয় গিলে করা। গিলে করা যখন শেষ হয় তখন সন্ধ্যে হবার আর বেশি বাকি থাকে না।

সন্ধ্যেটাই তো আসল সময়। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত যেন একটা ঘুমের মধ্যে কাজ করে অলীক। সত্যি করে জেগে ওঠে তখন, সন্ধ্যে-প্রদীপ যখন জ্বলে ওঠে ঘরে ঘরে, উল্টোডিঙ্গির খালের অলস নৌকাগুলির বুকের ভেতর এবং এত বড় কলকাতার পথে পথে।

রাতের আলো তবু সহ্য করতে পারে অলীক, দিনের আলো একেবারেই না। সকালে বা দুপুরে ঘরের বার হলেই চোখে কেমন ধাঁধা লাগে। গায়ে রোদ লাগলে মাথা ঘোরে এবং গা বমি-বমিও করে। রোদের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক কবেই চুকিয়ে দিয়েছে অলীক, আজ প্রায় বিশ বছর হলো। ওর কাছে দিনের বেলাটাই হলো রাত্রি আর রাত্রিটা হলো দিন। সারা দিনমান ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে অলীক, বের হবার দরকারও হয় না।

যেমন বাইরে তেমনি ঘরে, অলীক একেবারে খাঁটি অলীক। বাইরের জগৎ ওকে চেনে না এবং ভৈরবতলা সেকেণ্ড লেনের এই অঘ্রাণের রাতে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে রয়েছে যে লালপেড়ে শাড়িটা, অলীকের বিশ বছরের জীবনসঙ্গিনী, একমাত্র সে-ই বোধহয় শুধু স্মরণ করে রেখেছে, সন্ন্যাসীর মত মন এবং গামছা পরা ঐ হাড়-সার রোগা মানুষটার দেশ কোথায়, নাম কি এবং বাপের নামটাই বা কি?

কিন্তু এটা একটা পরিচয় হলো? সে ছাই বিশ বছর আগেকার পরিচয়েরও কি এখন আর কিছু আছে? বাড়িওয়ালা জানে, ওর নাম নুটুবিহারী। লেনের বাসিন্দারা জানে, লোকটা হলো হরিপদ। মুদি জানে, উনি হলেন মহাদেববাবু। আর পুলিশের খাতায় যে কত নামে লোকটার পরিচয় লেখা আছে তার ইয়ত্তা নেই। এক-একটা ঘটনার পরেই নাম হারিয়ে, ঠিকানা হারিয়ে একেবারে নতুন একটা নামে যেন পুনর্জন্ম লাভ করে এসেছে অলীক, একেবারে নতুন একটা ঠিকানায়। সরকারী হাতকড়া ও পরোয়ানা মাসের পর মাস ও বছরের পর বছর শুধু খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছে। ধরা পড়েনি অলীক। কে ধরবে তাকে, যার নাম এত নশ্বর ও ঠিকানা এত ক্ষণস্থায়ী? আসানসোল থেকে মগরাহাট, তারপর কিছুকাল কলকাতার শ্যামবাজারে। কিছুদিন রিষড়ে, তারপর নৈহাটি ও অধুনা এই ভৈরবতলা সেকেণ্ড লেনে। পালাতে পালাতে এবং লুকোতে লুকোতে এমনি করেই বিশটি বছর কাটিয়ে দিয়েছে অলীক। কপালের রেখায় রেখায় বয়সের হিসেবটাও স্পষ্ট করে ফুটে উঠেছে।

কিন্তু আজও বিশ বছরের ঘরণী ঐ টিকালো নাকে নাকছাবিরও সাধ্যি হয়নি যে অলীকের খাঁটি পরিচয়টুকু বুঝতে পারে। বুঝবার সুযোগও দেয়নি এই শান্ত-দান্ত সন্ন্যাসীর মত মানুষটা। বছর কয়েক আগেও মানুষটার বয়স যখন আরও কম ছিল এবং শরীরটাও এত রোগা ছিল না, তখন মাঝে মাঝে দিন কয়েকের জন্যে ঘর থেকে উধাও হয়ে যেত। ফিরে আসত কিছু কাপড়-চোপড়, কিছু বাসনপত্র, কিছু টাকা-

পয়সা এবং কিছু সোনা-রূপোর টুকরো টাকরা সঙ্গে নিয়ে। লালপেড়ে শাড়ি জানতো তার স্বামী মফঃস্বলে অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করে ফিরে এল। এ ছাড়া আর কিছু জানবার সুযোগ দেয়নি অলীক।

অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজটা ছেড়ে দেবার পর এবং শ্যামবাজারে এক গলিতে এসে বাসা নেবার পর কয়েকটা বছর প্রতি রাত্রেই ঘর থেকে বের হতো অলীক এবং ফিরে আসতো রাত শেষ হবার আগেই। লালপেড়ে শাড়ি জেনেছিল শুধু, স্বামী তার একটা নাইট ডিউটির চাকরি করছে।

কিন্তু জানলেও বুঝতে একটু দেরি হয়েছিল লালপেড়ে শাড়ির। রহস্যময় অন্ধকার সেই নাইট ডিউটিকে সন্দেহ না করে পারেনি। সন্দেহ করতে করতে একদিন কেঁদেও ফেলেছিল লালপেড়ে শাড়ী।

সে রাত্রিটা ছিল শিবরাত্রি। বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল অলীক। হঠাৎ লালপেড়ে শাড়ি এসে বাধা দিয়ে হাত চেপে ধরলো অলীকের—যেতে দেব না।

—কেন, কি হলো?

—কিছু বুঝি না, মনে করেছ?

— কি বুঝেছ?

—চরিত্তির নষ্ট করা মানে নাইট ডিউটি।

হো হো করে হেসে ওঠে অলীক—আরে আমার চরিত্তির থাকলে তো নষ্ট করবো?

হাসি থামিয়ে তারপর একেবারে প্রমাণ দিয়েই লালপেড়ে শাড়িকে বুঝিয়ে দেয় অলীক। —চরিত্তির নষ্ট করতে হলে রেতের বেলা ঘর থেকে টাকা নিয়ে বের হতে হয় এবং ফিরে আসতে হয় খালি হাতে। আমার মত খালি হাতে বের হলে আর টাকা হাতে ঘরে ফিরলে চরিত্তির নষ্ট করা হয় না বউ। বুঝলি এবার?

বুঝেছিল লালপেড়ে শাড়ি এবং আর কোন বাধাও দেয়নি। আর সন্দেহ করা দূরে থাক, শিবের মত স্বামীর ঘরমুখো অনুরাগের প্রমাণ পেয়ে সেদিন মনে মনে একটু গর্বিত না হয়েও পারেনি।

অনেক দিন আগে, সেই নাইট ডিউটির রাজত্বকালেই, তালতলায় একটা পূজোবাড়িতে ভিড়ের সঙ্গে মিশে একবার যাত্রাগান শুনতে হয়েছিল অলীককে। অভিমন্যুর মৃত্যুটা দেখবার জন্যে নয়, আশেপাশের লোকগুলির পকেটগুলির দিকে তাকাবার জন্যে এবং একটা বাচ্চা মেয়ের গলার সোনার হারটার ওপর কারবার করবার জন্যে। অভিমন্যুর মৃত্যু র সময় ভিড়ের চোখগুলি একটু ঝাপসা হয়ে উঠতেই কারবার শেষ করে সরে গেল অলীক। চলে যাবার সময় চোখে পড়লো অলীকের, অভিমন্যুটা এরই মধ্যে উঠে এসে সাজঘরের কাছে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে আর হাসছে। আসরের লোকগুলো কিন্তু তখনো চোখের জল মুচছিল।

দেখতে ভালই লেগেছিল অলীকের। এই তো একটা খাঁটি মানুষের জীবন, যাত্রার অভিমন্যুর মত আসরের ভিড়কে কাঁদিয়ে দিয়ে সরে পড় এবং হেসে হেসে চা খাও।

খুব সম্ভব সংসারটাকে একটা যাত্রাগানের আসর বলেই ধরে নিয়েছে অলীক। এই আসরে প্রতি রাত্রির আলোকে আর অন্ধকারে তার এক-একটি ভয়ানক অভিনয়ের আঘাতে কার কি সর্বনাশ হলো, তার জন্য কোন ব্যথা-বেদনা নেই অলীকের ভাবনায়। যাত্রার অভিমন্যুর মত পালা শেষ করেই অনায়াসে হেসে হেসে চা খেতে পারে।

কোন আক্ষেপ নেই অলীকের মনে। তার কাজের আঘাতে কে বঞ্চিত হলো, কে দুঃখ পেল আর কে হায়-হায় করে উঠলো—পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখবার কোন কৌতূহল নেই। যা হলো তা পেছনেই পড়ে রইল, স্মৃতির বোঝা নামে কোন বালাই নেই অলীকের জীবনে। আজ পর্যন্ত কোন কাজের জন্য একবিন্দুও অনুতাপ হয়নি। ওর হৃৎপিণ্ডটাও যেন নিরেট বরফের চেয়েও সাদা, শক্ত ও ঠাণ্ডা। কোন উত্তাপেও গলে না, উত্তাপ লাগেই না বোধহয়।

নাইট ডিউটির খাটুনি আর হয়রানির পালা অতীত হয়ে গেছে। সে বয়স নেই এবং সেরকম রাত-বেরেতে দৌড়াদৌড়ি করে খাটবার সামর্থ্যও নেই। এখন মাঝে মাঝে একটা কেলাবে যায় অলীক এবং কমিশন নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। এর চেয়ে বেশি কিছু জানাবার প্রয়োজন মনে করেনি অলীক, স্বামীর কৃতিত্বে ও প্রেমে গরবিনী এই লালপেড়ে শাড়িকে।

অনেক জেলের ভাত-খাওয়া এক দাগী ও ঘাগী ওস্তাদের একটি আড্ডা, অলীকের ভাষায় যার নাম হলো কেলাব। এই বেআইনী আড্ডার কিছু কিছু মালপত্র আইনসম্মত দোকানগুলির কাছে বিক্রি করিয়ে দু'দশ টাকা কমিশন পায় অলীক। তাই ভৈরবতলা সেকেণ্ড লেনের একটা ক্ষুদ্র ঘরের নিভৃতে মাটির হাঁড়িতে কয়েক মুঠো প্রাণ-বাঁচানো চাল-ডাল সেদ্ধ হয়, এই কমিশনের পয়সার জোরে, এই কেলাবটা আছে বলে। এই সহজ সরল রোজগারেও মাঝে মাঝে বাধা দেয়, বেগ পেতে হয়। পুলিশের জ্বালায় কেলাবও প্রায় ঠিকানা বদলাতে বাধ্য হয়।

এই বাধার চেয়েও বেশি খারাপ একটা বাধা দেখা দিয়েছে আজকাল। বাইরের নয়, মনের। অলীকের ঐ মিটিং-এ যাবার শখ। কে জানে কেন, হয়তো বয়সটা একটু বেড়েছে বলেই। এত ঘন ঘন মিটিং-এ গেলে কেলাবে যাওয়া আর হয় না, রোজগার হয় না। মাঝে মাঝে দিন-রাতের মধ্যে একবেলাও উনুনে আগুন জ্বলে না। হাঁড়ি খা-খা করে। উপোস শরীর নিয়ে লালপেড়ে শাড়ী মাদুরের ওপর পড়ে থাকে এবং দুনিয়ার মিটিংগুলোর ওপর রাগ না করে পারে না।

অলীকের শখ। যেন পৃথিবীর সঙ্গে একটা নতুন সম্পর্ক পাতাবার শখ। জনতার সঙ্গে একটু মেশবার, পাঁচজনের সামনে গিয়ে বসবার, একটু সম্মান ও সমাদর পাবার শখ। মদ, গাঁজা, ভাং কত নেশার অভ্যেসই তো ছিল অলীকের, এবং এখনো এক-আধটু আছে। কিন্তু আজকাল যেন আর একটু মৌতাতী নেশার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে জীবনে।

নতুন নেশা না বলে নতুন কারবারও বলা যায়। মূলধন হলো একটি মাত্র আদ্দির পাঞ্জাবি, একটি ফরাসডাঙ্গা ধুতি, একজোড়া নাগরা এবং একটি মখমলের উড়ুনী—সবই সাদা। এই মূলধন সম্বল করে একটা মস্ত বড় কারবারে হাত দিয়েছে অলীক। এ কারবারে পয়সা পাওয়া যায় না ঠিকই, কিন্তু যা পাওয়া যায় তার লোভ সামলানো বড় কঠিন। লোভটা বড় জোর পেয়ে বসেছে অলীককে, তার এই প্রায়-প্রৌঢ় ক্লান্ত বয়সের জীবনকে।

বছরের মধ্যেই এমন এক-একটা মাস আসে, যখন প্রায় প্রতি রাত্রে পাড়ায় পাড়ায় ঘরের দুয়ারে সানাই বাজাবার লগ্ন দেখা দেয়। দুর্দমনীয় একটা আকর্ষণ আছে এই সানাইয়ের শব্দে। ছাদের ওপর গোলপাতার চালা, কিংবা একটা রঙিন চাঁদোয়া—একটু বেশি করে আলোকের ছড়াছড়ি, লোকের গায়ে গায়ে একটু বেশি করে সেন্ট পাউডারের মাখামাখি—একটু বেশি সুন্দর করে সাজ করা, একটু বেশি করে হাসা—হুলুধ্বনি আর শঙ্খরব—তার ওপর চার দিকে একটা লুচি-লুচি গন্ধের আলোড়ন। এ লোভ সামলাতে পারে না অলীক। আদ্দি, ফরাসডাঙ্গা আর মখমলে একেবারে সাদাটি হয়ে পৃথিবীর বিয়েবাড়ির ভিড়ে এসে ঢুকে পড়ে।

বিয়েবাড়ির লুচি সন্দেশে যেন অতিরিক্ত একটা স্বাদুতা আছে। আড্ডার ওস্তাদও তো কখনো-কখনো এসব জিনিস খাইয়েছে অলীককে এবং ভাল কমিশন পেলে অলীক নিজেও বৈঠকখানার বাজারে ভাল ময়রার দোকানে বসেই এসব জিনিস কিনে খেয়েছে। কিন্তু দোকানের সে জিনিস বিয়েবাড়ির এ জিনিসের মত সুস্বাদু নয়।

কম সুস্বাদু নয়, বিয়েবাড়ির লোকজনের হাসিমুখের অভ্যর্থনা; অলীক অতিথিকে একেবারে অকৃত্রিমতম মনে করে কত ভাবে তুষ্ট করার চেষ্টা। এই তো সেদিন সুকিয়া স্ট্রীটের সেই অ্যাটর্নির মেয়ের বিয়েতে, এক ঘর বড়লোকের সঙ্গে একই খাবারের আসরে বসে খেয়েছিল অলীক। অ্যাটর্নিমশায় অলীকের সামনে এসে হাতজোড় করে বললেন—যদি কোন ত্রুটি হয়ে থাকে তো মার্জনা করবেন।

—কিছু না, কোন ত্রুটি হয়নি, অতি সুন্দর ব্যবস্থা হয়েছে।

অত্যন্ত প্রসন্ন চিত্তে অ্যাটর্নির সব ত্রুটি মার্জনা করে দিয়েছিল অলীক। আনন্দ আছে এই সব অকৃত্রিমের সব ত্রুটি ক্ষমা করতে। মাত্র একটি নিষ্কলঙ্ক সাদা পোশাকের ছলনায় এই ভয়ানক সভ্যভব্য মানুষগুলির দু'চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়ে এবং এক-একটা খাঁটি সমাদর আর অভ্যর্থনা চুরি করে নিয়ে সরে পড়তে আনন্দ আছে।

অঘ্রাণের রাতে, ভৈরবতলা সেকেণ্ড লেনে একটা ঘরের দরজায় এক খণ্ড তক্তার ওপর কাপড় কাচার শব্দ বাজে। যেন তার বরফের হৃৎপিণ্ড থেকে সব দাগ এক রাতের মধ্যে ধুয়ে মুছে একেবারে ধবধবে করে দিচ্ছে অলীক। পরের রাত্রির জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। মনে পড়ে অলীকের, কালকের দিনটাও একটা বিয়ের দিন, এক রাতের মধ্যেই চারটে লগ্ন আছে।

হঠাৎ কাপড় কাচা থামিয়ে উৎকর্ণ হয় অলীক। গলির মুখে ভারি-ভারি বুট

জুতোর এবং লাঠি ঠোকার শব্দ শোনা যায়। খাটালের দিকে কুকুরগুলো ডাকতে থাকে। এক লাফে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় অলীক।

অঘ্রাণ মাসের চারটে মিটিং-এর তারিখ ছিল। এর মধ্যে তিনটে মিটিং স্বচ্ছন্দে ও বেশ সাফল্যের সঙ্গে সেরে দিতে পেরেছে অলীক। একটা ভবানীপুরে, একটা টালিগঞ্জে এবং আর একটা শোভাবাজারে। কোন অসুবিধায় পড়তে হয়নি।

আজ হলো অঘ্রাণের শেষ মিটিং-এর তারিখ। বড় জোরে সানাই বাজছে পাড়ায় পাড়ায়, বাজারে দই-মিষ্টির দর দ্বিগুণ এবং ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডগুলিও শূন্য। মানুষগুলি যেন মরিয়া হয়ে বিয়ে করছে চারদিকে।

ভালই হয়েছে। অলীকও আজ প্রায় মরিয়া হয়ে সেই সন্ধ্যে থেকেই সন্ধান করে ফিরছে একটা বেশ ভাল আর জাঁকালো রকমের বিয়েবাড়ি।

অনেকগুলি বিয়েবাড়ির দরজা থেকে ফিরে গিয়েছে অলীক, ভেতরে ঢোকেনি, কারণ বিয়েবাড়ির চেহারাটাই পছন্দ হয়নি। এমন একটা বাড়ি চাই, যেখানে খুব বেশি করে সমাদর আর অভ্যর্থনার উৎসব আজ জেগে উঠেছে, গণ্যমান্য আর সভ্য-ভব্যের ভিড়ও হয়েছে খুব, ভোজনের আয়োজনও ভুরিপ্রমাণ। অঘ্রাণের শেষ মিটিং-এর সমাদর আর দই-সন্দেশ বেশ ভাল করে খেয়ে নিতে হবে। তাই মখমলের উড়ুনিটা পাকিয়ে এবং মালার মত গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে আজ একেবারে ভদ্রেশ্বর হয়ে উঠেছে অলীক।

একটা বিয়েবাড়িকে মনে ধরেছিল অলীকের, বেশ জাঁকালো রকমের ব্যাপার ভেতরে চলেছে মনে হলো। কিন্তু ব্যবস্থাটা একটু অসভ্য রকমের। নিমন্ত্রিতের দল ফটকে এসে কার্ড দেখিয়ে ভেতরে ঢুকছে।

হলো না। এ রাস্তাটাই ছেড়ে দিয়ে একেবারে অন্য একটা রাস্তায় চলে গেল অলীক। পর পর আরও কয়েকটা সানাই-বাজা বাড়ি পড়লো। কিন্তু একটু সন্দেহভাজন চোখে বিয়েবাড়ির রকম-সকম দেখে দরজা ভেঙেই সরে গেল অলীক। মনে হলো তারিণী মিত্তির রোডের সেই লালরঙা বাড়িটার মত এখানেও যণ্ডা যণ্ডা কতকগুলি লোক কিরকম বিশ্রীভাবে চারদিকে চোখ রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

চলতে চলতে একটা সিনেমা ঘরের বারান্দার দেয়ালের ঘড়ির দিকে চোখ পড়ে অলীকের। রাত ন'টা। মুহূর্তের মত বিষণ্ণ হয়ে ওঠে অলীক, তার পরে আরও ব্যস্ত হয়ে চলতে থাকে।

বিয়ের শেষ লগ্ন রাত দশটায়। বিয়েবাড়িগুলির উৎসবের আয়ুও ফুরিয়ে আসছে। ছটফট করে ওঠে অলীকের মন এবং ছটফট করেই হাঁটতে থাকে। পথের পর পথ পার হয়ে এবং পাড়ার পর পাড়া ঘুরে ঘুরে একটা জাঁকালো রকমের বিয়েবাড়ির সন্ধান করতে থাকে অলীক। অঘ্রাণের শেষ মিটিং-এর দিনটা এমন করে ফাঁকি দিয়ে ফুরিয়ে যাবে, সহ্য করা যায় না।

পথও জনবিরল হয়ে আসছে। সামনে পড়ে আশু পোদ্দারের গলি। গলি ধরে দ্রুতপদে হেঁটে যেতে থাকে অলীক, ওদিকের বড় রাস্তাটায় পৌঁছবার জন্য। গলির একদিকে দালান বাড়ির সারি, আর একদিকটায় ছোট ছোট বাড়ি, মাটির দেয়াল আর খোলার চাল।

দেখা যায়, গলির এই দীনহীন চেহারার বাড়িগুলির মধ্যেই একটা বাড়ির সামনে সানাই বাজছে, দুটো ট্যাক্সি এসে থেমেছে। ট্যাক্সি থেকে নামছে বর এবং গোটা দশেক বরযাত্রী। শাঁখ বাজিয়ে ছুটে এল ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল। হাত দিয়ে মাথার ঘোমটা সামলাতে সামলাতে বের হয়ে এল বাড়ির ভেতর থেকে একদল বউ। ফর্সা গেঞ্জি এবং ময়লা ধুতি পরে কয়েকটা লোকও বর এবং বরযাত্রী দলকে অভ্যর্থনা করে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল।

হাঁটা থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে অলীক। হাত দিয়ে পরিশ্রান্ত কপালের ঘাম মোছে। তারপরই আর কোন দ্বিধা না করে এ দীনহীন চেহারার বিয়েবাড়িটারই ভেতর ঢুকে পড়ে।

বাড়ির ভেতরে একটা উঠোন। উঠোনের একদিকে একটা গরুও বাঁধা রয়েছে, দেখা যায়। আর একদিকে জায়গাটাকে নিকিয়ে আলপনা দেওয়া হয়েছে, দুটো পিঁড়ি আছে এবং একজন পুরুত ঠাকুরও বসে আছেন সেখানে তৈরি হয়ে।

উঠোনের একপাশে একটা উঁচু বারান্দায় শতরঞ্চির ওপর বর এবং বরযাত্রীরা বসেছিল। বারান্দার পাশে দুটো ঘর, একটা ঘরের দরজা দিয়ে রান্নার ধোঁয়া বের হয়ে আসছে, আর একটার ভেতরে বউ আর মেয়েদের ভিড়।

সটান ভেতরে ঢুকে বারান্দায় শতরঞ্চির ওপর বরযাত্রীদের কাছে বসে পড়লো অলীক। বরযাত্রীরা সসম্ভ্রমে এবং সঙ্কুচিত হয়ে একটু সরে বসে। অলীকের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আর একটু বেশি জায়গা করে দেয়।

বিয়েবাড়ির ফর্সা গেঞ্জি এবং ময়লাধুতি লোকগুলির মধ্যে একজন টাকমাথা প্রৌঢ় বয়সের লোক একটু চিন্তিতভাবে সাদা ধবধবে গিলে-করা আদ্দির দিকে তাকিয়েছিল। কিছুক্ষণ কি ভেবে নিয়ে টাকমাথা লোকটা বিয়েবাড়ির একটা কর্মব্যস্ত ছোকরার দিকে হাত তুলে কি যেন ইঙ্গিত করে। সতর্ক হয় অলীক, দরজার দিকে তাকায়।

একটা পাখা হাতে নিয়ে ছোকরাটা দৌড়ে এসে গিলে-করা আদ্দির গায়ে বাতাস দিতে আরম্ভ করে। মনের হাসি চাপতে গিয়ে মুখ ভরে হেসে ফেলে অলীক। আপত্তির সুরে বলে—থাক, আমাকে আর বাতাস করতে হবে না।

এ আসরে সমাসীন সকল মূর্তির মধ্যে অলীকই একমাত্র রাশভারি, আর সবাই পলকা। অলীকই একমাত্র ভদ্রেশ্বর, এমন নিখুঁত সাদা ধবধবে সাজ আর কারও নেই, পাখার বাতাসের সমাদর ওরই গায়ে সবচেয়ে বেশি করে লাগবে তাতে আর আশ্চর্য কি।

এগিয়ে আসছে বিয়ের লগ্ন। কিন্তু বিয়েবাড়িটা কেমন যেন বোবা-বোবা হয়ে রয়েছে, উৎসবের কলরব ঠিক জাগছে না।

লক্ষ্য করে অলীক, কনেপক্ষের লোকগুলি কেমন যেন ভয় পেয়ে রয়েছে। সবচেয়ে ভীরু দেখাচ্ছে ঐ টাকমাথা ময়লা ধুতিকে। ঐ লোকটাই বোধহয় মেয়ের বাপ।

বরযাত্রীরাও কেমন গম্ভীর। তার মধ্যে সবচেয়ে গম্ভীর হলো, কালো একটা কোটের ওপর গরদের চাদর জড়ানো এবং খোঁচা-খোঁচা সাদা-পাকা দাড়ি এই লোকটা, অলীকের কাছেই যে বসে রয়েছে। নিশ্চয় বরের বাপ। অস্বস্তি বোধ করে অলীক।

হঠাৎ টাকমাথা লোকটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে এবং অলীকের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলে—একবার একটু এদিকে আসবেন?

সন্ত্রস্তের মত চমকে ওঠে অলীক—কেন?

—একটা কথা নিবেদন করবার আছে।

টাকমাথার মুখের দিকে গম্ভীরভাবে অলীকও তাকিয়ে দেখে একবার। তারপর বলে—চলুন।

বারান্দার আর এক প্রান্তে, একটু নিরিবিলি আলাপ করার জন্যেই দাঁড়ালো টাকমাথা ময়লাধুতি, তার সঙ্গে গিলে-করা আদ্দি।

টাকমাথা বলে—আপনি তো সম্পর্কে হলেন গিয়ে ছেলের.....।

অলীক—ছেলের কাকা। বর হলো আমারই জ্ঞাতি ভাইয়ের ছেলে।

টাকমাথা বলে—আপনাকে দেখে একটু ভরসা পেয়েছি মশাই। দেখেই বুঝেছি, আপনার মত মানুষ কখনো অবুঝ হতে পারে না। যদি দয়া করে ছেলের বাপকে একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে....।

অলীক—ব্যাপারটা একটু খুলে না বললে কিছুই বুঝতে পারছি না।

টাকমাথা—চুক্তির দেড়শো টাকা এখন আর দিতে পারবো না।

অলীক বলে—বেশ তো, দেবেন না।

টাকমাথা করুণভাবে প্রশ্ন করে—না দিলে কি বর উঠবে?

মাথা হেঁট করে অলীক কিছুক্ষণ মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর আবার টাকমাথার মুখের দিকে তাকায়। উত্তর দেয় না অলীক, এবং যেন এই অদ্ভুত ফ্যাসাদ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে মাথা চুলকিয়ে মনের ভেতর একটা পথ খুঁজতে থাকে।

টাকমাথার চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে—ওরা জানেন না, আপনিও জানেন না, বিয়ের খরচটা যোগাড় করতে আমাকে কি করতে হয়েছে। একটা গরু বেচেছি, অফিসের দারোয়ানের কাছ থেকে চারশো টাকার হ্যাণ্ডনোট দিয়ে দু'শো টাকা যোগাড় করেছি। গিন্নির হাতে যেটুকু সোনা শেষ পর্যন্ত টিকে ছিল তাই দিয়ে মেয়ের জন্য রুলি জোড়া গড়িয়েছি। এখন বলুন....।

অলীকের হাত চেপে ধরে টাকমাথা ময়লাধুতি। —আপনি শিক্ষিত মানুষ, আপনিই বলুন দেখি, পাখা-মিস্ত্রির কাজ করে যার পেট চলে, সে লোককে যদি মেয়ের বিয়েতে তিনশো টাকা বরপণ দিতে হয়, তবে....।

অলীক—দেড়শো বুঝি আগেই দিয়ে ফেলেছেন?

টাকমাথা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

খুব জোরে হাই তোলে অলীক। একটু বেশি হাঁটাহাঁটিতে শরীরটা তো ক্লান্ত হয়েই আছে। বেশ তেষ্টা পেয়েছে। ক্ষিদেটাও পেটের ভেতর পাক দিচ্ছে খুব জোরে। অথচ শাক-চচ্চড়ি যা খাওয়াবে তার ভরসাও একটা ফ্যাসাদ ভেদে কিরকম গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কি যে হবে তার ঠিক নেই। কি করা যায়, তাও বুঝে উঠতে পারে না।

টাকমাথা আবেদন করে—উদ্ধার করুন মশাই।

অলীক হেসে ফেলে—এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন?

টাকমাথা আবার আবেদন করে—বলুন, কি উপায় হবে?

অলীক—বিয়ে হবে, আবার কি হবে?

টাকমাথা—বর উঠবে তো?

অলীক—বরের চোদ্দপুরুষ উঠবে।

টাকমাথা—টাকাটা?

অলীক—সে ভার আমার।

টাকমাথা ময়লাধুতি সেই মেয়ের-বাপ কৃতজ্ঞতায় বিচলিত হয়ে আর একবার অলীকের হাত চেপে ধরে। অলীক আরও স্পষ্ট করে আশ্বাস জানায়—আমি ওদের বলে কয়ে সব ঠিক করে দিচ্ছি। আপনার কাছে কেউ টাকার দাবিই করবে না।

মুখের ভাষায় উত্তর দিতে না পেরে টাকমাথা ময়লাধুতি অলীকের হাতে মাথা ঠেকায়।

অলীক তার হাতটা আস্তে আস্তে গুটিয়ে নিয়ে বললে—যান, এইবার বরযাত্রীদের ভালমন্দ যা'হোক কিছু খাইয়ে দেবার ব্যবস্থাটা একটু তাড়াতাড়ি.....।

ব্যস্তভাবে ঘরের ভেতর মেয়েদের ভিড়ের কাছে গিয়ে চিৎকার করে টাকমাথা মেয়ের-বাপ—তৈরি হও, লগ্নের আর বড় বাকি নেই।

বারান্দার অপর প্রান্তে শতরঞ্চির ওপর সমাসীন কালো কোটের ওপর গরদের চাদর জড়ানো বরের বাপ চেঁচিয়ে বলে—টাকাটা যে বাকি আছে।

কালোকোটের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে একবার তাকায় অলীক। তারপরে ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসে এবং গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করে—কত টাকা?

কালোকোট একটু অপ্রস্তুত হয়ে সম্ভ্রমের সুরে বলে—আজ্ঞে দেড়শো টাকা।

অলীক—কাল পাবেন।

কালোকোট আপত্তি জানায়—কালকেই যে পাব এমন ভরসা কি করে করি বলুন? যে একবার কথা ভাঙে সে যে আর একবার....।

অলীক—আমি কথা দিচ্ছি।

কালোকোট বিচলিত ও বিস্মিতভাবে তাকায়।—আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।

অলীক—একবার আমার সঙ্গে বাইরে আসুন, চিনিয়ে দিচ্ছি।

চোখ বড় করে কালোকোট নিঃশব্দে এবং ভীতভাবে তাকিয়ে থাকে। অলীকও তার কণ্ঠস্বর একটু নরম করে নিয়ে বলে—বাইরে আসুন, এক মিনিটের জন্যে অনুগ্রহ করে বাইরে আসুন, তাহলেই চিনতে পারবেন।

দ্বিধা কাটিয়ে কিন্তু একটু সন্দিগ্ধভাবে শতরঞ্চি থেকে উঠলেন কালোকোট। দরজার বাইরে এসে দাঁড়াতেই অলীক হাত তুলে দেখায়—ঐ যে দেখছেন, এ পাড়ার শেষ বাড়িটা, ঐ যে ফটকে আলো জ্বলছে?

কালোকোট বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

অলীক—আমার বাড়ি, ভাল করে চিনে রাখুন।

কালোকোট—চিনলাম তো, কিন্তু....।

অলীক—কিন্তু-টিন্তু কিছু নেই, কাল রাত্রে কোনো এক ফাঁকে সময় করে চলে আসবেন আমার কাছে, টাকাটা নিয়ে যাবেন।

এ পাড়ারই শেষ বাড়ি, গলিটা যেখানে শেষ হয়েছে, যেখানে ছোট একটা পার্ক আছে, সেখানে বিরাট তিনতলা একটা বাড়ি; ফটকের মস্ত মস্ত থাম দুটো এখান থেকেই স্পষ্ট দেখা যায়। বাড়িটার দিকে সম্মোহিতের মত তাকিয়ে থেকে কালোকোট বলে—আজ্ঞে আপনার সঙ্গে দেখা করতে কোন অসুবিধে হবে না তো?

অলীক—কিছু না। দারোয়ানকে বলবেন, ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চান, তাহলেই হবে।

কালোকোট—আজ্ঞে আমরা কাল সন্ধ্যে সাতটার সময়ে রওনা হব।

অলীক—ঠিক সন্ধ্যে ছটার সময় গিয়ে টাকাটা নিয়ে আসবেন....আর একটা কথা। মেয়ের বাপকে এসব কথা কিছুই জানাবেন না, শুনলে বড় লজ্জা পাবেন। শত হোক, একটা পিতিবেশী ছাড়া তো আমি আর কিছুই নই!

ভেতরে ঢুকে আবার শতরঞ্চির ওপর হাসি হাসি মুখ নিয়ে কৃতার্থভাবে বসলেন কালোকোট, তার পাশেই গিলে-করা আদ্দি। কালোকোট হাঁক দিয়ে বলে—কনেপক্ষ এবার তৈরি হলেই তো হয়, লগ্নের আর বড় দেরি নেই।

এতক্ষণে বিয়েবাড়িতে একটা সাড়া জেগে ওঠে। একটু ব্যস্ততা, একটু চেঁচামেচি আর দৌড়াদৌড়ি। কালোকোটের সঙ্গে আলাপ করে গিলে করা আদ্দি। ছেলের কথা তুলে কালোকোট বেশ গর্ব করে এবং নানা বৃত্তান্ত বলে। এই বয়সে কোম্পানির হেড-চাপরাশির পোস্টটা পেয়ে গেছে কালোকোটের কৃতী ছেলে। সাহেবদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে হয় ছেলেকে। তাছাড়া, ছেলের মনটাও বড় শৌখীন, রাত জেগে নাটক-নভেল পড়ে।

এগিয়ে আসছে অঘ্রাণ মাসের শেষ বিয়ের লগ্ন। আর ভাল লাগছিল না অলীকের। এখন শাকচচ্চড়ি যা দেবার তা পাত পেড়ে দিলেই তো হয়। কিন্তু এইটুকু একটা আঙিনা, আর এই তো সরু ফালির মত একটা বারান্দা। এর মধ্যে কোথায় যে খাবার আসর হবে কে জানে? খাওয়াবে কিনা, তাই বা কে জানে? বর হলেন কোথাকার

এক চাপরাশি এবং কনে হলেন কোন্ এক পাখা মিস্ত্রির মেয়ে। এমন বিয়ের বাড়িতে যে লুচি-লুচি গন্ধ মেতে উঠবে, এমন ভরসা নেই।

টাকমাথা ও ময়লাধুতি, সেই মেয়ের বাপ হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে এসে অলীকের হাত ধরে। —আপনি একবার ভেতরে আসুন। না এলে চলবে না।

যে ঘরে মেয়ে আর বউয়ের দল ভিড় করে ছিল, সেই ঘরের ভেতরেই গিলে করা আদ্দিকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে ঢুকলো টাকমাথা। বউয়ের দল সসঙ্কোচে পাশে সরে গিয়ে দাঁড়ায়, মেয়ের দল দু'চোখ তুলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে গিলে করা আদ্দির দিকে, ব্রতকথার দয়ালু রাজার মত মস্ত বড়লোক অথচ খুব ভাললোক অদ্ভুত এক বরের কাকার মুখের দিকে।

ঘরের মেঝের উপর রঙিন চেলি পরে একটি মেয়ে দু'হাতে হাঁটু জড়িয়ে এবং মাথা হেঁট করে বসেছিল।

টাকমাথা বলে—মুখ তোল টুনি-মা, উঠে আয়, কাকাবাবু এসেছেন, প্রণাম কর।

মুখ তুলে তাকায় মেয়েটা। বাচ্চা বয়সের একটা কচি মেয়ের মুখ, চন্দনের ফোঁটা আঁকা রয়েছে মুখের ওপর। চোখে কাজলও পরেছে এবং একটা টিপ আছে কপালে।

—আয় আয়, উঠে আয়। প্রণাম কর কাকাবাবুকে। উনি না থাকলে আজ কি যে হতো....।

বলতে গিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে টাকমাথা। তারপর একটু শান্তভাবে বলে—মেয়েটা এতক্ষণ শুধু হাঁটুতে মুখ গুঁজে কেঁদেছে মশাই।

অলীক মৃদু হেসে জবাব দেয়—কেন, কাঁদবার কি হয়েছে?

টাকমাথা মৃদু হেসে জবাব দেয়—বিয়ে হবে না শুনেছে, তাই।

অলীক— কে বললে হবে না? কার সাধ্যি আছে বিয়ে আটকায়?

মেয়েটা উঠে দাঁড়ায়, আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে গিলে-করা আদ্দির পায়ে ঢিপ করে একটা প্রণাম করে। সিরসির করে একবার কেঁপে ওঠে গিলে-করা আদ্দির পা'দুটো। অস্ফুট স্বরে কি একটা কথা বলতে চেষ্টা করে, তারপর মেয়েটার মাথায় হাত দিয়ে জোর গলায় চেঁচিয়ে ওঠে—লক্ষ্মী মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ে। জন্ম এয়োতি হও।

প্রণাম করার পর অলীকের সামনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে টাকমাথা ময়লাধুতির মেয়ে, টুনি-মা। টাকমাথা বলে—আসল কথা কি জানেন, বাপের দুঃখ বুঝবার মত বয়স তো হয়েছে, তাই এসব গণ্ডগোলের কথা শুনেই কেঁদে ফেলেছে।

মুহূর্তের মধ্যে গিলে-করা আদ্দিরও মনের ভেতরে কেমন একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল। সটান একটা হাত এগিয়ে গিয়ে টুনি-মার চিবুকটাকে যেন আদর-করার আবেগে ছুঁয়ে ফেললো অলীক। হেসে হেসে ভ্রূভঙ্গি করে একটা ধমকও দেয়—খবরদার মেয়ে, কাঁদবে না বলে দিচ্ছি। আবার যদি কাঁদ বাছা, তুলে আছাড় দেব।

হেসে ফেলে টুনি-মা, চন্দনের ফোঁটা-আঁকা কচি একটা মুখে।

অলীকের অলীকত্ব আরও প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। গলা ছেড়ে একটা উল্লাসের সুরে

অলীক ঘরের ভেতর ঘোমটা টানা বউগুলির দিকে তাকিয়ে বলে—উলু দিন, জোরে উলু দিন, সবাই এরকম বোবাটে হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কেন!

লগ্ন এগিয়ে আসছে। উলুধ্বনি জাগে, বরযাত্রীরা চঞ্চল হয়, বর উঠি-উঠি করে। পুরুত নড়েচড়ে বসে। টাকমাথা ময়লাধুতির কাছে ব্যস্তভাবে বিদায় নেয় অলীক—আমাকে এবার বিদায় নিতে আজ্ঞা করুন কর্তা।

টাকমাথা—সে কি? এখুনি? না খেয়ে?

অলীক—খেতে পারবো না কর্তা।

টাকমাথা—তা হয় না, খেতেই হবে।

অলীকের মুখে সন্ত্রাসের ছায়া, জীবনে এই প্রথম অঘটন। যেন তাকে চারদিক থেকে কতকগুলি অদৃশ্য প্রহরী আজ ভয়ানকভাবে পথ আটক করে ধরতে চাইছে। কথা বলতে গিয়ে ভাষা আর গলার স্বর একসঙ্গে কেঁপে ওঠে আর্তনাদের মত—ছেড়ে দিন, যেতে দিন আমাকে। বাড়িতে আমার অফিসের লোক এসে বসে আছে, বড্ড জরুরি কাজ আছে।

গিলে করা আদ্দির হাত শক্ত করে চেপে ধরে টাকমাথা ময়লাধুতি। চেঁচিয়ে বলে—যা তো টুনি-মা, ওঘর থেকে একটা ঠোঙায় করে দশটা সন্দেশ আর এক গ্লাস জল চটপট নিয়ে এসে কাকাবাবুকে খেতে দে।

এক মুহূর্তও দেরি করে না টাকমাথার মেয়ে টুনি-মা। সেখানেই মেঝের উপর একটা আসন পাতে। একটা পেতলের রেকাবিতে সন্দেশ আর এক গ্লাস জল নিয়ে এসে রাখে।

ঘন ঘন উলুর রব বাজে, বউয়ের দল কনেকে ডাকাডাকি করে। এগিয়ে আসছে লগ্ন, আর মোটেই সময় নেই। টুনি-মা তবু চন্দনের ফোঁটা-আঁকা মুখ নিয়ে অলীকের সামনেই বসে থাকে। কাকাবাবুর খাওয়া দেখে।

আর একবার খুব জোরে উলু বাজলো। বর উঠে গিয়ে বসেছে পিঁড়িতে।

অলীকের খাওয়া শেষ হয়েছে। আর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা দরজা পার হয়ে যায় অলীক। পিছু ফিরে একবারও তাকায় না। ধরা পড়তে হয়নি, কোন বাধা পায়নি, কিন্তু যেন ভয়ানক জখম হয়ে যন্ত্রণাক্ত মূর্তি নিয়ে ছুটে চলে গেল অলীক, সাদা ধবধবে গিলে-করা আদ্দি!

আজও সকাল থেকে সোডা সাবান আর রিঠে নিয়ে কাপড়-জামা কাচাকাচি আরম্ভ করেছে অলীক।

নাকছাবি জিজ্ঞাসা করে—আজও আবার মিটিং আছে নাকি?

অলীক—না না, আজ আর মিটিং ফিটিং কিছু নেই। কালকের মিটিং-এ ঘেমেছিলাম খুব, পাঞ্জাবিটা একটু ময়লা হয়ে গেছে। কেচে না রাখলে দাগ ধরে যাবে।

অগ্রাণের শেষ মিটিং-এর তারিখ কালই পার হয়ে গেছে। আজ একবার কেলাবে

যাওয়া দরকার, কিছু কমিশনের চেষ্টা দেখতে। এ ছাড়া বাইরে বের হবার কোন তাগিদ তার আর নেই।

জীবনে কোন ঘটনার দিকে পিছু ফিরে তাকাবার অভ্যেস নেই অলীকের। আজ যা ঘটে, কাল তা ভাল করে মনেও পড়ে না। ছাপ পড়ে না, দাগ লাগে না অলীকের মনে। কিন্তু আজ একটু দোমনা হয়ে কাজ করছে অলীক। কাজের মধ্যেই হঠাৎ এক-একবার হেসে ফেলে। দূরান্তের একটা উলু -উলু ধ্বনি যেন মনের ভেতর ঢুকে মাঝে মাঝে হাসিয়ে দিচ্ছে অলীকের মুখটাকে। কি যেন থেকে থেকে মনে পড়ছে, এবং বেশ চেষ্টা করে ভুলে যেতে হচ্ছে।

বিকেল ফুরিয়ে যায়, সূর্য ডোবে। সন্ধ্যে নামলেও আজ আর সানাইয়ের শব্দ জাগে না কোথাও। তবু একবার ছটফট করে ওঠে অলীক। তারপরেই বেশ ভাল করে আদ্দি, ফরাসডাঙ্গা আর মখমল জড়িয়ে প্রস্তুত হয়।

ভৈরবতলা সেকেণ্ড লেনের গলিতে অন্ধকার জমে। দরজায় চৌকাঠের ওপর অলসভাবে দাঁড়িয়ে থাকে অলীক। ভাবতে থাকে এবং ভেবে কিছু উপায় ঠাহর করতে পারে না। শুধু মনে হয়, আজ আর কিছুক্ষণ পরেই একটা ক্ষতি হয়ে যাবে। কোথায়, কার ক্ষতি? এত তলিয়ে ভাবতে পারে না অলীক। অভ্যেস নেই।

চুপ করে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকায় চোখ দুটোও যেন অবসাদে ঘুমন্ত হয়ে ওঠে। যেন অর্ধেক সত্য আর অর্ধেক মিথ্যা একটা স্বপ্নের দিকে তাকিয়ে থাকে অলীক। কালোকোট আর কর্কশ দাড়ি, সেই লোকটা আশু পোদ্দারের গলির তেতলা বাড়িটার ফটক থেকে দারোয়ানের তাড়া খেয়ে ফিরে যাবে। দেড়শো টাকার জন্য দাবি হেঁকে আবার গোলমাল বাধাবে কালোকোট। টাকমাথা ময়লাধূতি অসহায়ভাবে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে।

তাহলে কি টুনি-মা'র শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হবে না? কে জানে, হয়তো দেড়শো টাকার শোকে পাগল হয়ে কালোকোটের দল কনে ফেলে রেখেই চলে যাবে, আশ্চর্যের কিছু নেই।

চুলোয় যাক। মখমলের উড়ুনিটাকে একটা কড়াপাক দিয়ে কাঁধের ওপর রাখে অলীক। কেলাবে যাবার জন্যেই বের হয়, যদিও কেলাবের চালা-ঘরে যাবার জন্যে এত সাদা সাজের কোন দরকার ছিল না।

—আমি তো মেয়ের বিয়েটা দিয়েই দিলুম মাত্র দু'চারটে কথার প্যাঁচে, আর তুমি ব্যাটা মেয়েটাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে পারছো না? কালোকোটটাকে দুটো কথার প্যাঁচে ঘায়েল করবার শক্তি নেই? বৃথাই মেয়ের বাপ হয়েছ। বিড়বিড় করে আপন মনে বলতে থাকে অলীক, মনের ভেতর একটা রাগী ভোমরা যেন গুন্ গুন্ করছে।

বুদ্ধিহীন আর শক্তিহীন টাকমাথা পাখা-মিস্ত্রিটার ওপর রাগ করতে গিয়ে পথের ওপরেই দাঁড়িয়ে পড়ে অলীক। তারপর ব্যস্তভাবে ঘরে ফিরে এসে ডাক দেয়—বউ।

নাকছাবি—কি বলছো?

অলীক—সেই ছেঁচা-সোনাটার টুকরো-টাকরা কিছু আছে?

নাকছাবি ভ্রূকুটি করে—সোনা?

অলীক—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সেই যে নাইট ডিউটির সময় একটা বড়লোকের ছেলে আমাকে পেরাইজ দিয়েছিল। দাম মন্দ হবে না, দেড়শো টাকার কিছু বেশিই হবে।

নাকছাবি—কপাল আমার! সে তো দশ বছর আগের কথা।

অলীক—তা হোক গে, আছে কিনা বল?

নাকছাবি—কি মন রে বাবা? রিষড়ে যাবার সময় নিজেই নিয়ে গিয়ে বেচে দিলে, মনে নেই?

অলীক—যাক, তবে তো ল্যাঠা চুকেই গেছে।

ঘরের ভেতরেই ছটফট করে ঘুরতে থাকে অলীক। যেন বের হবার মত শক্তি পাচ্ছে না। কিন্তু না গেলেও নয়। ছ'টা বেজে যাবার পরমুহূর্তে কালোকোট আর কর্কশ দাড়ির পাগলামিতে একটা ভয়ঙ্কর ঝড় উঠবে পৃথিবীতে। চন্দনের ফোঁটা-আঁকা একটা কচি মেয়ের মুখ সে ঝড় সইতে পারবে না।

সুস্থির হয়ে একবার দাঁড়ায় অলীক। আর, বোধহয় তার বিশ বছরের শঠ-কপট-চতুর জীবনের সব দক্ষতা ও শক্তি নিয়ে দাঁড়াবার দুঃসাহস মনে মনে আহ্বান করে। যেতে হবে, টুনি-মা'কে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থাও করে দিয়ে আসতে হবে।

নাকছাবির দিকে তাকিয়ে অলীক বলে— আজ একটা নতুন কাজে বেরুচ্ছি বউ, যদি রাত্রে না ফিরি তবে সকালবেলায় বেলগেছে থানায় কিংবা হাসপাতালে একবার খোঁজ করিস।

আর্তনাদ করে অলীকের হাত চেপে ধরতে ছুটে আসে নাকছাবি। এক-লাফে সরে গিয়ে দরজা পার হয়ে এবং ভৈরবতলা সেকেণ্ড লেনের অন্ধকার ভেদ করে চলে যায় অলীক।

ছ'টা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি আছে। আশু পোদ্দারের গলির শেষ প্রান্তে তিনতলা বাড়ির ফটকের থাম দুটো কত বড়। একটা থামের গা ঘেঁষে টুলের ওপর দারোয়ান বসে আছে নীল রঙের উর্দি আর হলদে রঙের পাগড়ি পরে।

গিলে-করা আদ্দি আজ তার অলীকতার সব দুঃসাহস দিয়ে যেন বিমল কুটিরকে অধিকার করেছে। ফটকের সম্মুখে সিমেন্ট বাঁধানো ফুটপাথের অংশটুকুর ওপর আস্তে আস্তে অথচ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কায়াহীন প্রেতদেহের মত কি-ভূয়া অথচ কি ভয়ানক স্পষ্ট এক ছোটবাবু। এই প্রেতদেহ জানে, আজ এইখানে একটি ভঙ্গীর ভুল হলে তার খুলি-ফাটা রক্তে ফুটপাথ ভিজে যাবে। হাতকড়া, হাসপাতাল, আদালত আর জেল—সবই তার চারদিকে ঘিরে যেন অলক্ষ্যে ওৎ পেতে বসে আছে এখানে। একটু ভুল হলেই লাফ দিয়ে এসে গলা টিপে ধরবে এবং তার পরেই অলীকের একটা চলন্ত মৃতদেহের হাতে হাত-কড়া দিয়ে টেনে নিয়ে চলে যাবে।

বিমল কুটীরের বারান্দার দেয়ালে টুং-টাং মিষ্টি শব্দে ঘড়ি বেজে ওঠে—ঠিক

ছ'টা। আশু পোদ্দারের গলির মিটমিটে আলো পার হয়ে উদ্বিগ্নভাবে হেঁটে হেঁটে বিমল কুটীরের ফটকে জোরালো আলোর সামনে এসে দাঁড়ালো ভিক্ষার্থীর মত বিনয়ী ও লোভী একটি মানুষের মূর্তি। সেই কালোকোট। নিরীহ প্রার্থীর ছদ্মবেশ ধরে চলে এসেছে কি-ভয়ানক এক মহাজন।

কিন্তু দুঃসাহসিক অলীক আজ আর কোন ভয়ের ধার ধারে না। অভ্যাগত কালোকোটের দিকে তাকিয়ে স্বচ্ছন্দে হাসতে থাকে। —ঠিক সময়মত এসেছেন।

কালোকোট বলে—আপনার ওপর যথেষ্ট উপদ্রব করলাম, কিছু মনে করবেন না।

অলীক—মোটেই না। তবে আমার একটা কথা আপনাকে রাখতে হবে।

কালোকোট—বলুন।

অলীক—আজ টাকাটা দিতে পারলাম না। কারণ সরকারমশাই আজ আসেননি। কাল পাবেন, কিংবা পরশু, কিংবা যে-কোন দিন এসে নিয়ে যাবেন।

কালোকোট ক্ষুব্ধ হয়—আজ্ঞে, তাহলে কিন্তু....।

অলীক—তাহলে কি? কনে ফেলে রেখে চলে যাবেন? কনের বাপের সঙ্গে ঝগড়া বাধাবেন?

উত্তর দেয় না কালোকোট। কর্কশ দাড়ির দৃঢ়তা দেখে অলীকও ঘাবড়ে যায়। কিন্তু মাত্র এক মুহূর্তের মত, তার বেশি নয়। কালোকোটের দিকে তাকিয়ে অলীক প্রশ্ন করে—আপনি কি কাজ করেন?

—কাপড়ের দোকানে কাজ করি।

—খাতা লেখেন?

—আজ্ঞে না, দারোয়ানের কাজ করি।

—আমার ব্যাঙ্কে দারোয়ানের কাজ করবেন? মাইনে আশি টাকা, জলখাবার বাবদ আরও পনের।

কর্কশ দাড়ির অনড় দৃঢতা হঠাৎ বিচলিত হয়ে যায়। হাত দুটো জোড় করে বুকের কাছে তুলে নিয়ে এবং মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে কালোকোট বলে—আজ্ঞে, এত বড় অনুগ্রহ যদি সত্যিই করেন, তবে....তবে আর কি বলবো....আপনার জীবন দের্ঘো হোক।

অলীক—তাহলে কথা দিচ্ছেন?

কালোকোট—কোন্ কথা আজ্ঞে?

অলীক—কথা হচ্ছে, আসছে মাসেই আমার ব্যাঙ্কে কাজ নেবেন, আর টাকা-পয়সার কথা তুলে কখ্খনো মেয়ের বাপের সঙ্গে কোনরকম তক্কাতক্কি করবেন না।

কালোকোট—আপনি স্বয়ং যখন এর মধ্যে রয়েছেন, তখন আমার আর তক্কো করার কোন দরকার নেই হুজুর।

—যান, এবার বেশ আনন্দ করে বর-কনে তুলে নিয়ে বাড়ি চলে যান। আর সাবধান, মেয়ের বাপের কাছে টাকার কথা একেবারেই তুলবেন না।

দু'হাত জোড় করে এবং কোমর ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানিয়ে কালোকোট বলে—যে আজ্ঞে।

চলে গেল কালোকোট। অলীকতার এমন একটা অগ্নি-পরীক্ষাও স্বচ্ছন্দে পার হয়ে গেল গিলে করা আদ্দি। বিমল কুটীরের ফটক পেছনে রেখে, আশু পোদ্দারের গলির শেষ ল্যাম্প-পোস্ট পার হয়ে বড় রাস্তায় এসে হেসে ফেলে অলীক। ফুটপাথ ধরে সোজা চলতে থাকে। আজ আর কোন কাজ নেই। অঘ্রাণের এই সন্ধ্যাটা শুধু এইভাবে মনের খুশিতে চলে চলে এবং হেসে হেসে শেষ করে দিতে হবে।

কোন লক্ষ্য নেই, কোন গন্তব্যও নেই। ফিরে আসার একই ফুটপাথ ধরে উলটো মুখে চলতে থাকে অলীক। আশু পোদ্দারের গলির মুখে এসে কিছুক্ষণ দাড়ায়। তারপর আবার বড়রাস্তার ফুটপাথ ধরে এগিয়ে যায়।

ঘুরে ফিরে আবার আশু পোদ্দারের গলির মুখ। ল্যাম্প-পোষ্ট মিটি-মিটি জ্বলে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অলীক। সাতটা তো প্রায় বাজে।

অলীকের প্রাণটা যেন একটা বাঘিনীর আত্মা; যেন অনেক অন্বেষণের পর এই গলির ভেতরে তার হারানো শাবকের কচি গায়ের গন্ধ আবিষ্কার করেছে। তাই ঘুরে ফিরে এখানেই এসে দাঁড়াচ্ছে। গলির পথে আলো-অন্ধকারে মেশামেশি রহস্যের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে অলীক। টুনি-মা কি শ্বশুরবাড়ি চলে গেল?

সানাই বাজে না, আজ বিয়ের তারিখও নয়, আজ শুধু পাড়ায় পাড়ায় মেয়ে বিদায়ের পালা। এ-পালা দেখতে কেমন? দুরন্ত একটা লোভে আকুল হয়ে জ্বলজ্বল করে অলীকের চোখ।

বিয়েবাড়ির আদর আর অভ্যর্থনা চুরি করতে আনন্দ আছে, তার জন্য যথেষ্ট লোভও আছে অলীকের। কিন্তু আজ যেন অলীকের দেহ আর মনের ভেতরে লোভের নাড়িগুলি বদলে গেছে নতুন হয়ে। লোভ হয়, একটা মেয়ে-বিদায়ের কান্না চুরি করতে। মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার সময়, একটি চন্দনের ফোঁটা-আঁকা কচি মুখের দিকে তাকিয়ে শখের চোখের জল ফেলতে।

লোভ সামলাতে পারলো না গিলে-করা আদ্দি। জীবনের সব ঘটনা থেকে চিরকাল পালিয়ে এসেছে যে বিশ বছরের অলীক, সে-ই গতকালের একটা পুরনো ঘটনার কাছে একটা নতুন লোভের আবেগে দেখা দিতে ফিরে যায়। জীবনে এই প্রথম। গলির ভেতরে তাড়াতাড়ি পা ফেলে এগিয়ে যেতে থাকে অলীক।

হ্যাঁ, টুনি-মা বিদায় নিচ্ছে। টোপর মাথায় বর রয়েছে দাঁড়িয়ে তার পাশে। একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়ে আছে। বউয়ের দল মাথার কাপড় টেনে টেনে চোখ ঘষছে। কালোকোটের ওপর গরদের চাদর জড়িয়ে বরের বাপ দাঁড়িয়ে আছে একটা পুঁটলি হাতে, বরপক্ষের আরও দু'চারজন দাঁড়িয়ে আছে। পাড়ার কিছু লোকও এসে ভিড় করেছে। টাকমাথা ঠিক টুনি-মা'র পেছনে দাঁড়িয়ে, বারবার চোখ মুছছে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে অলীক। আরও এগিয়ে যায় এবং টুনি-মা'র খুব কাছে এসে দাঁড়ায়।

ঘোমটা আছে, তবু টুনি-মা'র মুখটা স্পষ্ট করে দেখতে পায় অলীক। কি সুন্দর, কত কচি একটা চন্দনের ফোঁটা-আঁকা মুখ রে! অলীকের দু'চোখ থেকে ঝরঝর করে জল গড়াতে থাকে।

কালোকোট পুঁটলি হাতে নিয়ে অলীকের সামনে এসে কোমর ঝুঁকিয়ে দাঁড়ায় এবং সসম্ভ্রমে দু'হাত তুলে নমস্কার জানায়। —আমরা আসি তাহলে ছোটবাবু, অধীনকে মনে রাখবেন।

জোরে হাত ঘষা দিয়ে চোখটা একবার মুছে নিয়ে টাকমাথা বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করে—কে ছোটবাবু? কোন্ ছোটবাবু?

কালোকোট বিরক্তভাবে বলে—আপনার প্রতিবেশী, বিমল কুটিরের ছোটবাবু।

টাকমাথা বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে প্রশ্ন করে—কোথায় তিনি?

কালোকোট—আপনার সুমুখে দাঁড়িয়ে আছেন যিনি, দেখতে পাচ্ছেন না। মেয়ের জন্য এত কী কাঁদলেন যে চোখ অন্ধ হলো মশাই?

টাকমাথা—ইনি তো আপনার জ্ঞাতিভাই।

কালোকোট ভ্রূকুটি করে—তার মানে?

টাকমাথা—তার মানে, আপনার ছেলের কাকা।

বরপক্ষের একটা মজবুত লোক একলাফে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে—কে ছেলের কাকা?

গিলে-করা আদ্দির দিকে আঙুল তুলে টাকমাথা বলে—উনি।

পাড়ার লোকের জমাট ভিড়টাও হঠাৎ টলমল করে উঠে এক মুহূর্তের মধ্যেই উগ্র হয়ে যেন ঘটনাটাকে চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়ায়। হল্লা তুলে জিজ্ঞাসা করে—কোন্ লোকটা? কোন্ লোকটা?

অলীকের দিকে কঠোরভাবে তাকিয়ে কালোকোট প্রশ্ন করে—আপনি কে মশাই?

পাড়ার লোক চেঁচামেচি করে বলতে থাকে—বিমল কুটীরের ছোটবাবুকে কে না চেনে? কিন্তু এ ব্যাটা কে মশাই?

বরপক্ষের লোকেরা বলে—ছেলের কোন কাকাই বরযাত্রী হয়ে আসেনি। ছেলের কাকাদেরও কে না চেনে? কিন্তু এ শালা কে?

—শালা একটা অলীক। পাড়ার লোকের মধ্যে একজন চিৎকার করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে আর-একজন গর্জন করে—দে ফাটিয়ে।

স্তম্ভের মত স্থির ও নির্বাক গিলে করা আদ্দির পেছন থেকে একটা জুতোর বাড়ি হিংস্র হয়ে আছড়ে পড়ে ঠিক তার বাঁ চোখের ওপর। মখমলের উড়ুনি দিয়ে চোখ চেপে ধরে অলীক। পরমুহূর্তে জনতার কঠিন ব্যূহটাকে যেন একটা শৃঙ্গী জানোয়ারের মত ঢুঁ মেরে ভেদ করে আর মুক্ত হয়ে দৌড় দেয় অলীক।

তাড়া করেও ধরা গেল না। আশু পোদ্দারের গলির আলো আর অন্ধকার থেকে যেন নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল অলীক।

ভৈরবতলা সেকেণ্ড লেনের ধূলোতে অঘ্রাণের সকালে চারদিকের ঘিঞ্জির এক ফাঁকে কয়েক মুঠো মিষ্টি রোদ এসে লুটিয়ে পড়ে। উল্টোডিঙ্গির খালের কুয়াশা উবে যেতে থাকে। একখণ্ড কাঠের তক্তার ওপর আছাড় দিয়ে কাপড় কাচে অলীক।

বাঁ দিকের ভুরুর ওপর ক্ষতের দাগ পড়েছে, হাত দিয়ে ছুঁলেই বোঝা যায়। আর চোখে দেখা যায়, দাগ পড়েছে সাদা মখমলের উড়ুনিতেও, চোখ ফাটা রক্তের ফোঁটা-ফোঁটা লাল-লাল দাগ।

হেসে ফেলে অলীক। সাবান-জলে উড়ুনিটাকে একবার চুবিয়ে নিয়ে তারপর জোরে আছাড় দিয়ে কাচতে থাকে।

ভেজা লালপেড়ে শাড়ি পরে টিকালো নাকে নাকছাবি এসে বলে—আমি একবার বাইরে যাচ্ছি।

নাকছাবির হাতে একটা মাটির সরার ওপর কয়েক মুঠো চাল, এক ঢেলা গুড় আর কয়েকটা বেলপাতা। অলীক কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করে—কোথায় যাচ্ছিস বউ?

—ভৈরবতলায় পূজো দিতে।

—কিসের পূজো?

—মানত করেছিলাম।

—কিসের মানত?

—তা শুনে তোমার লাভ কি?

—বলই না, শুনলে ক্ষেতি তো আর হবে না?

—কাল ভরা সন্ধ্যেটার সময় একটা ডাকাতের মত মুখ করে, আর কি বলতে বলতে ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে গেলে, মনে নেই?

—মনে পড়েছে। তাতে তোর মানত করবার কি দরকারটা হলো?

—মানত করেছিলাম, ঠাকুর যেন তোমার সব আপদ কেটে দিয়ে রাতের মধ্যেই তোমাকে ঘরে ফিরিয়ে দেয়।

কাপড় কাচা থামিয়ে হো হো করে হাসতে থাকে অলীক। —বাবা ভৈরব এতদিনে তোর একটা কথা রেখেছে, তাই না?

—রেখেছেন বৈকি?

নাকছাবি তার পূজোর পসরা হাতে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। অলীক ডাকে—শুনছিস বউ?

দাঁড়ায়, ফিরে তাকায় নাকছাবি। অলীক হেসে হেসে বলে—আর কোন মানত করবি না?

—বল, কি মানত করবো?

—সেই মানতটা একবার কর না?

—কোন্ মানত? মনে পড়ে না নাকছাবির। সারা জীবন ধরে কত ঠাকুরের কাছে কত মানতই তো করেছে। আজ আবার নতুন করে কোন্ পুরনো মানতের কথা তুলছে মানুষটা! নাকছাবি জানতে চায়—কোন্ মানতটা?

টিকালো নাকে নাকছাবির মুখের দিকে একটা বিহুল দৃষ্টি তুলে অলীক বলে—তোর কোলে একটা আসুক।

চমকে ওঠে নাকছাবি। তারপরেই মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকায়। আজ এতদিন পরে সে-মানতের কথা আবার তোলে কেন এই সন্ন্যেসীর মত মানুষটা? কি লজ্জা! নাকছাবির শীর্ণ ও সাদা ঠোঁট দুটোও মুহূর্তের মত লালচে হয়ে ওঠে অদ্ভুত একটা হাসির ছোঁয়া লাগে।

নাকছাবি ব্যস্তভাবে বলে—আমি চললাম।

অলীক—থাম থাম, কথাটা ভাল করে না শুনে নিয়ে যাসনি।

নাকছাবি—শুনলাম তো।

অলীক—আর একটু শুনে নে।

নাকছাবি—বল।

অলীক—কিন্তু, ঠিক করেছিস কিছু, কি চাইবি? ছেলে না মেয়ে?

নাকছাবি—তুমি যা বলবে।

অলীক—মেয়ে চাই।

নিষ্পলক চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে অলীক। ঠাণ্ডা ও সাদা হৃৎপিণ্ডটা যেন একটা উত্তাপের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে তাকিয়ে আছে।

নাকছাবি বলে—বেশ তো, তাই হবে।

আর দেরি করে না নাকছাবি। দরজা পার হয়ে ব্যস্তভাবে চলে যায়। অলীকও তার নিষ্পলক দৃষ্টিটাকে আবার ঘুরিয়ে নেয়, দু'হাত চালিয়ে কাপড় কাচতে থাকে।

আর একবার সাবান-জলে চুবিয়ে নিয়ে সাদা মলমলের উড়ুনিটাকে তক্তার ওপর আছাড় দিতে থাকে অলীক। উড়ুনিটার সাদার ওপর লাল-লাল দাগগুলি ফিকে হয়ে আসছে, যেন মিলিয়ে যাচ্ছে কতগুলি ফোঁটা-ফোঁটা চন্দনের দাগ।

নীলের জলে ডুবিয়ে নিয়ে উড়ুনিটাকে আস্তে আস্তে একবার মেলে ধরে অলীক। চোখ দুটো বড় বড় করে বুঝতে চেষ্টা করে, দাগগুলি কি সত্যি ঝাপসা হয়ে এল, না চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে?

গরল অমিয় ভেল

মেহেদি গাছের বেড়ার ওপারে চন্দ্রবাবুর বাড়ির একটি জানালা। প্রায় সব সময় একটি মেয়েকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। মেয়েটির নাম মালা বিশ্বাস। চন্দ্রবাবুর মেয়ে। শহরের সকলেই একে চেনে।

জানালায় দাঁড়িয়ে থাকা, মেয়ে হয়ে দুর্নাম কেনার পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। মালা বিশ্বাসের চালচলনে যেন মাত্রা নেই। দুর্নামও তাই এককালে মাত্রা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। এখন লোকনিন্দার সেই অশান্ত গুঞ্জন কিছুটা থিতিয়ে গেছে। চন্দ্রবাবুর বাড়ির মেহেদি গাছের বেড়া, ফটকের ল্যাম্পপোস্ট আর পথের কাছে মাকাল গাছটা—এসবের মতোই জানালার কাছে মালার দাঁড়িয়ে থাকাটাও এখন একটা নিছক নিসর্গ শোভা মাত্র।

মালা তাকিয়ে দেখে সবাইকে। ফেরিওয়ালারা যায়, পুলিশ লাইনের সেপাইরা যায়। কেউ তাকালে চোখ ফিরিয়ে নেয় না। বেলা সাড়ে দশটায় পথ ভর্তি করে স্কুলের ছাত্র আর কাছারির বাবুরা যায়। হাটের দিনে পথে ভিড় হয় আরও বেশি। দুপুরের রোদে পথের ধূলো ক্ষেপে আঁধি ওঠে, কখনও বৃষ্টি নামে। মালা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে জানালার ধারে। কখনও বা রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে ছেলের দল জটলা করে। মালা তবু সরে যায় না। এ এক সমস্যার কথা—একি শুধু দেখার নেশা? অথবা দেখা দেওয়ার নেশা?

ঘরের বাইরেও মালা বিশ্বাসকে দেখা যায়। কখনও বেড়াতে বার হয়, কখনও বা অকারণেই ঘুরে আসে। তাই সে প্রায় সকলেরই চেনা। সকলেই চেনে মালা বিশ্বাসের মুখের বসন্তের দাগগুলি, কালো মোটা চেহারা, চোখে অদ্ভুত রকমের চশমা, হাতে ছাতা, সঙ্গে চাকর রামজীবন। তার শাড়ি, রঙ-এর বৈচিত্র্যে আর পরবার কায়দায় হাঁ করে তাকিয়ে দেখার মতো। পথে যেতে হঠাৎ মালা একবার থামে গ্রামোফোনের দোকানের সামনে। রামজীবন গিয়ে কয়েকটা রেকর্ডের দাম জিজ্ঞেস করে আসে। কখনও থামে গুরুদাসের ঘড়ির দোকানের কাছে—রামজীবন অনুসন্ধান করে হাতঘড়ির ভাল ব্যাণ্ড আছে কিনা।

আড়ালে থাকলে মালা বোধহয় হাঁপিয়ে ওঠে। শুধু ভিড় খোঁজে যদিও ভিড়ের মধ্যে ঠিক মিশতে পারে না। বারোয়ারিতলায় যাত্রাগানের আসরে বর্ষীয়সী মহিলারা বসেন চিকের আড়ালে, ছোট মেয়েরা বসে চিকের বাইরে দু'সারি বেঞ্চে। মালা বসে চিকের বাইরেই ভিন্ন একটা চেয়ারে, একটু এগিয়ে—সবা হতে দূরে।

মেয়ে স্কুলের বার্ষিক উৎসবে মালা বিশ্বাসও এসেছিল। সকালে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে দেখেছিল, তার গলায় প্রকাণ্ড সাঁওতালী হাঁসুলীটা। আশপাশ থেকে নানারকম ঠাট্টা ভরা টিপ্পনি টিক্‌টিক্ করে উঠলো। কিন্তু ওসব মন্তব্য মালার কানেই আসে না।

ভাদ্রের ঠিক মাঝামাঝি এসে আকাশ ভরা বর্ষার ঘটা একেবারে থেমে গেল। রাণী ঝিলের মাঠের ঘাসে, কালো পাথরের টিলাতে, টেলিগ্রাফের তারে, দূরের নিম বনের চূড়ায় প্রথম শরতের আলো চিক্‌চিক্ করে উঠলো ছোট ছেলের হাসির মতো।

ঝাপ্‌সা হয়ে ছিল সারা শহরের প্রাণ, আড়াই মাস ধরে। আজ আবার আলোয় চমকে উঠেছে রঙিন আয়নার মতো। শিকল দেওয়া প্রাণগুলি ছাড়া পেল ঘরে ঘরে। নিঝুম শহরটা সাড়া দিল আবার।

রাণীঝিলের মাঠে বেড়িয়ে ফেরার মরসুম এল। একটা দেওদারের নীচে দেখা যায় হরিজন স্কুলের ছেলেরা ড্রিল করছে। আয়ার দল ঘুরছে পেরাম্বুলেটার টেনে। শরৎবাবু ও কান্তিবাবু, বিহার-জুডিসিয়ারির দুটি রিটায়ার্ড মানুষ, লাঠি হাতে একসঙ্গে পা ফেলে চলেছেন বাঁধের লাল কাঁকরের সড়ক ধরে।

রাণীঝিলের নতুন বাতাস আজ ডাক দিয়েছে সবাইকে। হাসপাতাল রোড ধরে সপরিবারে ভদ্রলোকেরা বেড়াতে আসেন। গল্‌ফের লাঠি হাতে মুখে পাইপ কামড়ে আসছে সামুয়েল সাহেব। মালা বিশ্বাস বেড়াতে এসেছে, খোঁপায় জড়ানো প্রকাণ্ড একটা রঙিন রুমাল উড়ছে বাতাসে। প্রচারক চৌধুরী মশায় ঝিলের ধারে একটা খবরের কাগজ পেতেছেন, উপাসনায় বসবার জন্য।

সকলে একবার থমকে দাঁড়াচ্ছিল সেখানে, ছোট একটা কালো পাথরের টিলা, তার গা ঘেঁষে একটা করবী গাছ। এই পাথরটা ক্রস রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে আজ পঞ্চাশ বছর ধরে। কোন দিন এর দিকে তাকিয়ে দেখার মতো কিছু ছিল না। গরু চড়াতে এসে রাখালেরা কোন দুপুরে মাঝে মাঝে এখানে ভাত খেতে বসে।

সকলেই একবার থমকে দাঁড়াচ্ছিল সেখানে। জায়গাটা পার হতে অন্তত দু-তিন মিনিট সময় লাগছিল সবারই। পাথরটার ওপর বড় বড় হরফে সাদা খড়ি দিয়ে গদ্যে পদ্যে মিশিয়ে নানা ছন্দে কীসব লেখা। পথচারী সকলেই, কেউ একা কেউ সদলে চোখ ভরা দুরন্ত আগ্রহ দিয়ে পড়ছিল লেখাগুলি। প্রথম শরতের সকালবেলা এই পথে পড়ে থাকা পাথরটার গায়ে কে ছড়িয়ে গেল এমন একমুঠো রোমান্স!

বেশিক্ষণ কেউ দাঁড়াচ্ছিল না সেখানে। তা সম্ভবও ছিল না। পড়ে নেয় আর সরে পড়ে। লেখাগুলি ভয়ানক রকমের অশ্লীল।

শুধু তাই হলে ভাল ছিল। দেখা যাচ্ছে, কথাগুলি সবই একটি মেয়েকে উদ্দেশ্য করে লেখা। শুধু নাম থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কাদের বাড়ির মেয়ে। এই নিদারুণ পরিচয়-লিপির অনেককিছু বাদ দিলে সংক্ষেপে তাকে এইটুকু চেনা যায়।

—পূর্ণিমা বসু। রূপে আর নামে এমন মিল আর দেখা যায় না। তুমি নাকি গয়না ভালবাস না? লজ্জাই তোমার ভূষণ, খুব সত্যি কথা। ছ'মাস চেষ্টা করে একটি বার শুধু তোমায় চোখে দেখতে পেয়েছি। জানি তোমার চিঠি আসে ভিয়েনা থেকে। তিনি ভালো আছেন তো? আর এক যক্ষ যে সিমলা পাহাড়ে হাঁ করে বসে আছেন। ক'দিক সামলাবে? যাচ্ছ কবে? যখন-তখন ওভাবে হাই তুলতে নেই, বড় বিশ্রী দেখায়।

কে লিখেছে কে জানে! এই অজানা অশ্লীল কুৎসাবিশারদের লেখাগুলি মৌচাকে ঢিলের মতো শহরের বুকে এসে লাগলো। তিন ঘন্টার মধ্যে প্রত্যেক ঘরে ও বৈঠকে, নিভৃতে ও নেপথ্যে গুন্ গুন্ করে উঠলো এই প্রসঙ্গ—কালো পাথরের লেখা।

শুধু এই প্রশ্ন,—কে লিখলো? —কে পূর্ণিমা বসু?—কথাগুলি কি সত্যি? মনে

মনে, মুখে মুখে, আলাপে আলোচনায়, সন্দেহে ও সন্ধানে এক প্রকাণ্ড কৌতূহল যেন পরোয়ানা হয়ে ছুটলো চারদিকে। এই প্রশ্নের উত্তর চাই।

প্রথম কৌতূহলের বিকার একটু শান্ত হয়ে এল। পূর্ণিমা বসুর পরিচয় পাওয়া গেছে। দু'বছর হলো পুরনো গির্জার দক্ষিণে যে নতুন বাড়িটা তৈরি হয়েছে, সেই বাড়ির মালিকের নাম মহীতোষবাবু। মহীতোষবাবুর মেয়ে পূর্ণিমা। ক' জনই বা এদের চেনে। লতা-মোড়া উঁচু প্রাচীর দিয়েই ঘেরা থাকে এঁদের বড়মানুষী বনিয়াদ। এঁরা অগোচর। তার মধ্যে পূর্ণিমা বসুকে একরকম অলীক বললেই হয়। কিন্তু সেও আজ সব জানা-অজানার ব্যবধান ঘুচিয়ে নতুন এক আবিষ্কারের মতো সবার কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

নিশ্চয় নতুন কেউ এসেছেন এ শহরে। যেই হোক, পূর্ণিমা বসুর ওপর তার এত আক্রোশ কেন? একি কোন বিগত অপমানের প্রতিশোধ? তবুও এটা বড় কাপুরুষের মতো কাজ হয়েছে। অত্যন্ত গর্হিত।

অনেকে এই ভেবে লজ্জিত হচ্ছে, পূর্ণিমার বাড়ির লোকেরা কি মনে করলো। কেন তাদের ওপর এই অহেতুক কুৎসার আঘাত? সত্য হোক মিথ্যা হোক, এই আঘাত কারও গায়ে না বেজে পারে না।

মহীতোষবাবুর বাড়ির সবাই বিকেলের দিকে একবার বেড়াতে বার হতেন। সমস্ত দিনের মধ্যে প্রাচীরের বাইরের পৃথিবীতে একটিবার ঘোরাফেরার এই শ্রদ্ধাটুকুও তাঁদের হারাতে হলো। তাঁদের কাউকে যেন আজ আর কোথাও দেখা গেল না।

কিন্তু পূর্ণিমা কি ভাবলো? এতক্ষণে সেও নিশ্চয় সব খবর শুনেছে। হয়তো ঘরে খিল দিয়ে কাঁদছে, হয়তো আজ সারাদিন খায়নি। ভাবতে গেলে কত কি মনে হয়, কিন্তু ঠিক বোঝা যায় না, এই উপদ্রবে পূর্ণিমার মনের শান্তি কতটা নষ্ট হলো। এও হতে পারে, সে কিছুই গ্রাহ্য করছে না, তার রীতিমত মনের জোর আছে। ক্ষুব্ধ হয়েছেন চৌধুরী মশায়।

ঠিক বেলা বারটার সময় কাছারি রোড দিয়ে যেতে চোখে পড়ে, সমাজবাড়ির সামনে কুঁয়োতলায় প্রচারক চৌধুরী মহাশয় স্নান করছেন। মাথা ভরা টাক আর চিবুক ভরা পাকা দাড়ি, ফরসা রোগা চেহারা। এক এক সময় দেখা যায় স্নান সেরে আদুড় গায়ে কুঁয়োতলার শানে বসে সাবান দিয়ে খদ্দরের ধুতি কাচছেন। দু'খানার বেশি তাঁর ধুতি নেই। সমাজবাড়ির কোণের ঘরটাতে তাঁর আস্তানা। দারা সুত পরিবার অর্থাৎ সংসার বলতে কোন বালাই তাঁর নেই। দুপুরের রোদে সেই লোলপেশী বুড়ো মানুষের সাদা শরীরটা বড় অদ্ভুত দেখায়।

তিনি সত্যবাদী ও নির্ভীক। এই কারণেই সরকারি চাকরি গ্রহণ করতে পারেন নি। যেখানে দুর্নীতি, সেখানে তিনি ক্রুর ও কঠোর। বহু বহুবার তিনি ছেলেদের সখের থিয়েটারের আয়োজন পণ্ড করেছেন। তিনি একবার মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার হয়েই পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ, তাঁর প্রস্তাব ছিল বিড়ির

দোকানগুলিকে উচ্ছেদ করা, যাতে ধূমপানের পাপ যথেচ্ছা ধুঁইয়ে না ওঠে। সে প্রস্তাব গ্রাহ্য হয়নি।

অন্যদিকে যতই নিরীহ ও নমনীয় মানুষ হোন না কেন, নীতিগত কোন অন্যায়ের ব্যাপারে তিনি নিজের কর্তব্য ভুলতে পারেন না। সেখানে তাঁকে ঠেকিয়ে রাখার মতো প্রতাপ কারও নেই। লোকে জানুক আর না জানুক, প্রচারক চৌধুরী মশায় জানেন, তিনিই স্বয়ং এ-শহরের ভদ্র সমাজের নীতি রুচি ও শালীনতার অভিভাবক স্বরূপ। একবার হোলির দিনে মেথরদের মদ খাওয়া বন্ধ করে সকলকে গেলাস ভর্তি দুধ খাইয়েছিলেন চৌধুরী মশায়। এরকম অঘটনও এ শহরের ইতিহাসে ঘটে গেছে।

তাই ক্ষুব্ধ হয়েছেন চৌধুরী মশায়, তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেছেন পাপের এই দুঃসাহসিক রূপ দেখে। রাগে ও ঘৃণায় চৌধুরী মশায় স্থৈর্য্য হারালেন। স্বয়ং থানায় এসে ডায়েরি করিয়ে গেলেন, কে বা কারা শহরের বুকের ওপর বসে এই অপকীর্তি করলো? অবিলম্বে তাকে যেন ধরে ফেলা হয়। এমন কঠোর শাস্তি তাকে দেওয়া হোক যাতে এক যুগ ধরে যত দুষ্ট ও দুর্বৃত্তের বুক কাঁপতে থাকবে। নইলে বুঝতে হবে দেশে সুশাসনের শেষ হয়েছে, গভর্ণমেন্ট নেই।

পুলিশের ইন্সপেক্টর প্রতিশ্রুতি দিলেন—তিনি এই ঘড়িয়াল বদমায়েসকে সাত দিনের মধ্যে ধরে ফেলবেন, সে যতই গভীর জলে থাক না কেন।

মালা বিশ্বাস অবশ্যই দেখেছে পাথরের লেখাগুলি। বোধহয় একমাত্র সেই লেখাগুলি ভাল করে পড়েছে, পরম নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে। মালা চিনেছে পূর্ণিমাকে, লোকমুখে শুনে নয়, সে আগেই তাকে জানতো। গির্জার সড়কে বেড়াতে গিয়ে কতদিন সকালবেলা মালা তাকে দেখেছে, দোতলা ঘরের জানালার কাছে বই হাতে বসে আছে পূর্ণিমা। চোখাচোখি হতেই পূর্ণিমা সশব্দে জানালাটা বন্ধ করে দিত। বোঝা যেত, এই জানালা বন্ধ করা একটা সশব্দ প্রতিবাদ মাত্র। কিন্তু কিসের বিরুদ্ধে বা কার বিরুদ্ধে তা ঠিক আন্দাজ করা যায় না। হতে পারে—সেটা মালার গায়ে জড়ানো ঐ সবুজ রঙের রেশমী নেট, বড় বেশি ঝকঝক করে।

আজ সারাক্ষণ হেসেছে মালা। রূপসী পূর্ণিমা বসুর সকল অহঙ্কার কালো পাথরের নোংরামির আঘাতে কী ভয়ানক জব্দ হয়ে গেছে।

সমস্ত শহরের শাসন ও সতর্কতাকে বিদ্রূপ করে ক্রসরোডের পাথরটা পনের দিনের মধ্যে আর একবার খেউড় গিয়ে উঠলো। —"সুমিতা নন্দী, প্রতিজ্ঞা করেছে মনের মতো মানুষ না পেলে গলায় মালা দেবে না। তবে তোমার এলবাম ভরা ওসব কাদের ছবি? কিছু বেছে উঠতে পারলে? এ অভ্যেস ভালো নয়। এটা দ্বাপর যুগ নয়। বয়স তো সাত বছর ধরে সেই তেইশে ঠেকে রয়েছে। তবে তোমার মেক-আপের পায়ে গড় করি। এত শিথিলতাকে কি কৌশলে এত উদ্ধত করে রেখেছ? নাঃ, তুমি সত্যই সুতনুকা, তুমি অমর্ত্য বধূ। ও ছাই মানুষের ছবির এলবামে কি হবে? তোমার বিয়ে না করাই ভালো।"

ব্যাপারটা আগাগোড়া বিস্ময়কর বলেই মনে হচ্ছে। যেই লিখুক না কেন, সে দুঃসাহসী সন্দেহ নেই। সুচতুর তো নিশ্চয়ই। প্রতি দুশ্চিন্তা মনের মেঘে মেঘে, সন্দেহের পরতে পরতে, এক একবার তার রূপ আবছায়ার মতো গোচরে আসে যেন। কল্পনার নেপথ্যে এই অদ্ভুতকর্মা কাজ করে চলেছে। নেহাত বাজে ফক্কর গোছের কেউ নয়। লেখাপড়া খুব ভালোই জানে। বয়স বিশ-পঁচিশের বেশি বোধহয় হবে না। বোধহয় কোন হতাশ প্রেমিক।

সেবক সমিতির অফিসে সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বালিয়ে সেক্রেটারি ননীবাবু চিন্তিতভাবে বসেছিলেন। আজ জেনারেল মিটিং আহ্বান করা হয়েছে। সভ্যেরা সব এল একে একে। এরা সবাই ছাত্র—সতু, প্রিয়তোষ, লোকনাথ.....।

ননীবাবু জানালেন —এটা আমাদের সবারই অপমান। কোন্ এক বদমাস দিনের পর দিন এইসব কুকর্ম করে চলেছে, আজও ধরা পড়লো না। সে যে শিগগির বন্ধ করবে, তারও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কখন কার নামে লেখা উঠবে এই ভয়েই সবাই শঙ্কিত। বাস্তবিক...।

ননীবাবু দুঃখের হাসি হাসলেন।

—যেই হোক্, এটা বুঝতে পারছি, বাইরের লোক কেউ নয়। নিশ্চয় আমরা সবাই তাকে চিনি, তবে ভোল দেখে হয়তো বুঝতে পারছি না।

ননীবাবুর কথায় সংশয়ের কুয়াশা ঠেলে তার মূর্তিটা যেন ছায়ার মতো দেখা যায়।

—এ ধরনের লোককে সহজে চেনা মুশকিল। যাকে কোন মতেই সন্দেহ হচ্ছে না, এ কাজ হয়তো তারই।

স্বয়ং ননীবাবুই শেষ পর্যন্ত আশ্বাস দিয়ে বলেন—তাকে না ধরতে পারলে কোন সুরাহা হবে না। হাতে হাতে ধরে ফেলা চাই।

চৌধুরী মশাই রণে হার মানেন নি। অনেকদিন পরে সংগ্রাম করার মতো এক পাপের চ্যালেঞ্জকে পাওয়া গেছে। আবার একদিন থানায় এসে পুলিশ কর্মচারীদের সঙ্গে একপ্রকার বচসা করে গেলেন। চৌধুরী মশাই বিশ্বাস করেন না, পুলিশ আন্তরিকভাবে ঠিক কর্তব্য করছে, নইলে অপরাধী নিশ্চয় এতদিন ধরা পড়তো। তিনি প্রস্তাব করলেন—পাথরটার কাছে দিবারাত্র পাহারা দেবার জন্য এক বন্দুকধারী সান্ত্রী মোতায়েন করা হোক্।

ইনস্‌পেক্টর হেসে হেসে বললেন—কি যে বলেন মশায়, পুলিশের আর কাজ নেই? একটা মামুলী ব্যাপারে কামান-বন্দুক নিয়ে টানাটানি করতে হবে?

চৌধুরী মশাই উত্তেজিত হলেন—মামুলী ব্যাপার! কথাটা প্রত্যাহার করুন।

ইনস্‌পেক্টর—আপনি বৃথা রাগ করছেন। চুরি রাহাজানি খুন ডাকাতির খবর দিন, এক সপ্তাহে আসামীকে বেঁধে আনছি। কিন্তু এসব ভুতুড়ে গোছের ব্যাপার, এটা কি একটা তদন্ত করার মতো কেস চৌধুরী মশায়?

চৌধুরী মশাই—তাহলে প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ নিয়োগ করুন।

ইনস্‌পেক্টর—মাপ করবেন, আপনি আমার শ্রদ্ধেয়। তবু আপনার প্রস্তাব গ্রাহ্য করতে আমরা অসমর্থ, তবে যথাসাধ্য চেষ্টা অবশ্য করবো।

চৌধুরী মশাই—তাহলে আমাকেও বাধ্য হয়েই গভর্নরকে টেলিগ্রাম করে কম্‌প্লেন জানাতে হয়।

চৌধুরী মশাই উঠে গেলেন।

ইনস্‌পেক্টর ভয় পেল কিনা বোঝা গেল না। চৌধুরী মশাইয়ের মতো প্রবীণ শ্রদ্ধাভাজন লোককে রাগানো উচিত নয়। যে কারণেই হোক, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত একজন কনস্টেবল লাঠি হাতে পাথরটাকে পাহারা দিল। সকাল বেলা ছিল সামান্য একটু পুরনো লেখার অবশেষ। সুমিতা নন্দীর কলঙ্কগুলি প্রায় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। কিন্তু এই সজাগ সতর্ক পাহারার এক ফাঁকেই বিকেলের মধ্যে ঝলসে উঠলো একটা নতুন লেখা। সারা গোধূলিবেলা পাথরটা যেন ঠাট্টার সুরে হাসতে লাগলো। —"সুধা দত্ত, অনেক মেয়ের গলায় সুর শুনেছি, তবে তোমার মতো এত মিষ্টি কারও নয়। সত্যিই গলাটি তোমার সুধায় ভরা, ছোট্ট গলগণ্ডটাই তার প্রমাণ। হাই-কলার ব্লাউজে আর ঢাকা পড়ছে না। কেন যে এত ইংরেজি বুলি বলছো, বুঝি না। প্রফেসর ভদ্রলোকের স্ত্রী আছে, ও পথ ছেড়ে দাও।"

কনস্টেবলের চাকরি যাবার উপক্রম হলো। সে কসম খেয়ে জানালো, এক মুহূর্তের জন্যে সে ডিউটিতে ফাঁকি দেয়নি। একটা পিঁপড়ের দিকেও ভুল করে তাকায়নি।

আশ্চর্য এই কালো পাথরের অশরীরী শিল্পী।

সন্দেহের ঝড় উঠছে। অলক্ষ্যে যদি গরুর হাড় বা মড়ার মাথা কেউ ফেলে দিয়ে যেত, তবে না হয় বলা যেত ভূতের কাণ্ড। কিন্তু এটা নিছক প্রাকৃতিক আর চারিত্রিক ব্যাপার। একজন কেউ আছে পেছনে। সাবাস তার বাহাদুরী। তিন মাস ধরে শহর সুদ্ধ লোককে আঙুলের ডগায় নাচাচ্ছে। এক এক সময় বেশ ভেবেচিন্তে সন্দেহ হয়। যার-তার ওপর এই কৃতিত্ব আরোপ করা যায় না। যেই হোক, সে কবি ও প্রেমিক, সে দুঃসাহসী ও চতুর। এতগুলি তরুণী হিয়ার গোপন কথা যে জানতে পেরেছে, সে গুণী ও যাদুকর। সব সময় তাকে অশ্লীল বলতে বাধে, সে বড় রসিয়ে লেখে।

কিন্তু একবার যদি এই অধরা যাদুকর ধরা পড়ে। চৌধুরী মশায়, পুলিশ, সেবক সমিতি আর নিন্দিতাদের বাপ-ভাইয়েরা ওর হাড়মাস কুচিকুচি করে ছড়িয়ে দেবে রাণীঝিলের মাঠে। সন্দেহ হয় অনেককে। কার্নিভালের বাঙালী ম্যানেজারটা ঠিক তিন মাস ধরে শহরে বসে আছে। কেন? ঘড়ির দোকানে নতুন ম্যাট্রিক-পাশ ছেলেগুলি বড় বেশি গুলতানি করে আজকাল। কেন? নন্দ মিস্তিরি উপন্যাস পড়ছে। হাতুড়ি ছেড়ে হঠাৎ এ সখের ব্যামো আবার কেন? প্রশান্ত পানের দোকান করে, এমন কি লাভ হয়? তবু সপ্তাহে তিনখানা রেকর্ড কেনে। হঠাৎ এত সুরেলা হয়ে উঠলো কেন সে? তবু ভরসা, প্রশান্ত নাকি লেখাপড়া জানে না। কিন্তু এ ভব মাঝারে কিছুই অসম্ভব নয়। সেবক সমিতি সন্দেহ করে পুলিশকে, পুলিশ সন্দেহ করে খদ্দরধারী

মতিলালকে। মতিলাল চেষ্টা করছে, কাকে সন্দেহ করা যায়। এই সন্দেহের মাৎসন্যায়ে কারও অস্তিত্ব বুঝি আর ঠিক থাকে না।

কিন্তু ক্রসরোডের পাথর কি হঠাৎ বোবা হয়ে গেল? এক মাস পার হয়ে গেছে, কোন নতুন রহস্যের দাগ পড়ছে না আর। তাহলে চলে কি করে? শহরের প্রাণের তার যে বাঁধা পড়েছে কালো পাথরের সুরে। দিবস রজনী ঐ কালো পাথরে ফুটে উঠবে নব নব শ্বেতলিপিকার ফুল। জ্যোৎস্না রোদ কুয়াশা শিশির—তারই ছোঁয়ায় প্রতি প্রভাতে কত প্রেমবৈচিত্র্যের অর্ঘ্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে ক্রসরোডের পাষাণ-বেদিকা। ক'মাসের মধ্যে কত অজানা কথা বলে দিল পাথরটা। এই লেখাগুলির মধ্যেই শহরের ঘুমন্ত মহিমা সাড়া দিয়ে উঠেছে।

সিনেমায় দর্শকদের ভিড় কমে গেছে। সকাল বিকেল রাণীঝিলের মাঠে লোকের সমারোহ। গত বছরেও শরৎ এসেছিল এমনি আকাশভরা নীল নিয়ে। কিন্তু রাণীঝিলের মাঠ আর ক্রসরোডের ধূলা এত চঞ্চল হয়ে ওঠেনি জনপদধ্বনির উচ্ছ্বাসে। ঘরে ঘরে চিত্তে চিত্তে দোলা লাগে। ক্রসরোডের পাথর তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। এবার কার পালা কে জানে! মনে হয়, এই ক্ষমাহীন পাথরের অমোঘ অনুশাসন একে একে সকল গোপনচারিণীর কীর্তিকলাপ ফাঁস করে দেবে।

শত শত মূক মুখের প্রার্থনা পাথরের কাছে পৌঁছল যেন। বহু জিজ্ঞাসার আবেদনে ক্রসরোডের পাথরে অনুগ্রহের স্বাক্ষর আবার জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠলো।

—প্রীতি মুখার্জী, তুমি অপরূপ না হলেও অদ্ভুত। পরের কোলের ছেলে নিয়ে এত টানাটানি কেন? সবই বুঝি সখি। যাক্ যা হবার হয়ে গেছে, এবার সামলে থেকো। গিরিডিকে ভুলে যাও।

যেই যাক্ ক্রসরোড দিয়ে, সকলকে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে হবেই লেখাগুলিকে, যতদিন না কেউ সাহস করে মিটিয়ে দেয়। ক্ষুব্ধ বিরুদ্ধ মুখে যে যাই বলুক, এই কুৎসাদৃপ্ত পাথরের কাছে যেন ঝুঁকে পড়ে সকলেই, অভিবাদনের আবেশে।

শরৎবাবু যান, কান্তিবাবু আসেন। ক্রসরোডের মুখোমুখি দুজনের সাক্ষাৎ হয়। উভয়েই এই কুপথে চলার গ্লানিটুকু বার্তালাপের মধ্যে ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করেন।

কান্তিবাবু —এ যে অসহ্য হয়ে উঠলো মশাই। কুৎসিত লেখাগুলি কি বন্ধ হবে না?

শরৎবাবু—আর বলেন কেন, বড়ই ঘৃণ্য ব্যাপার!

দুই সজ্জনের আলাপ হয়তো আরও কিছুক্ষণ চলতো, আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতো কিন্তু তাঁদের পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন চৌধুরী মশাই—সাদা ভুরু ও দাড়ির মাঝখানে শাণিত নাক আর কঠোর দৃষ্টি। ওভাবে চলে যাওয়া—বড় অস্বাভাবিক মনে হয়। শরৎবাবু একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন।

কান্তিবাবু—চৌধুরী মশাই ওভাবে তাকালেন কেন বলুন তো?

শরৎবাবু সশব্দে হেসে বলেন—কে জানে, উনি হয়তো মনে করছেন আমরা দুজনেই লেখাগুলি লিখেছি।

কান্তিবাবু—বলা যায় না, এ সন্দেহ তাঁর হতে পারে, যে রকম নীতিবাতিক লোক।

এতক্ষণে তারা কি ভাবছে। কালো পাথরের লেখাগুলি যাদের সুনামকে কালো করেছে, সেই অপমান শয্যা থেকে তারা কি এতদিনে সুস্থ হয়ে উঠতে পেরেছে? কিন্তু যতই কৌতূহল হোক না কেন, এ সংবাদ জানবার উপায় নেই। প্রথমে ভয় হয়েছিল, নিন্দিতাদের মধ্যে দু'একজন অতি-অভিমানিনী আত্মহত্যা করে না বসে। খুব বেশি ভয় হয়েছিল সুধা দত্তের কথা ভেবে।

সত্য মিথ্যা যাচাই হয় না, তবু রীতিমত মনোবেদনা পায় অনেকে। মানুষ আজ খারাপ থাকে, কাল ভাল হয়ে যায়। কিন্তু লোকসমাজে কারও দোষত্রুটিকে ঢোল পিটিয়ে রটিয়ে দিলে কোন লাভ হয় না, বরং তাতে অনেকে উল্টো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। যদিও সত্যও হয়, তবুও এতগুলো ভদ্রবাড়ির মেয়ের চরিত্র নিয়ে মাঝ ময়দানে লেখালেখি করা খুবই অন্যায়।

শুধু সন্দেহ নয়, বিচিত্র রকমের গুজব উড়ছে চারিদিকে। পূর্ণিমারা নাকি চিরকালের মতো চলে যাচ্ছে এ শহর ছেড়ে। সুমিত্রা নন্দী বোধহয় বিষ খাবার চেষ্টা করেছিল। প্রীতি মুখার্জীর দাদা খুব সম্ভবত গুণ্ডা লাগিয়েছে— যে এসব কথা লিখছে, তাকে খুন করা হবে। সুমিতার জোর করে বিয়ে দেওয়া হবে এই মাসেই। গুজব উড়ছে—বিশ্বাস না করলেও অবিশ্বাস করার উপায় নেই। এতগুলি বাড়ির হাঁড়ির খবর কে আর স্বচক্ষে দেখে এসে অধিক বলতে পারে? হ্যাঁ, সে কাজ একমাত্র পারে এবং যদি দয়া করে—সে হলো কালো পাথরের কবি।

মালা বিশ্বাস তাদের দেখলো একদিন, টাউন সিনেমার ওপরের গ্যালারিতে। প্রথম সারিতে বসে আছে—পূর্ণিমা, সুমিতা, সুধা ও প্রীতি। গুণে গুণে তারা ঠিক চারজন। পাশে ও পেছনের সারিতে আরও অনেক মেয়ে বসে আছে। মালা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে আছে একেবারে শেষ প্রান্তে—ঝকঝকে একটা আলোর ঝাড়ের নীচে।

মালা ভাল করে আর একবার দেখলো। হ্যাঁ, ঠিক ওরাই চারজন। কিন্তু কবে ওরা এত ঘনিষ্ঠ হলো? আগে তো ওরা কেউ কাউকে ভাল করে চিনতোও না। আশ্চর্য, আজ ওরা এক হয়ে গেছে।

পেছনের সারিতে সেনপাড়ার মেয়েদের মধ্যে বসে আছে মুক্তি রায়, মালারই স্কুলজীবনের বন্ধু। ওরা সকলেই ব্যস্ত, সবাই উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখছে, সামনের সারির চারজনকে। মুক্তি রায় এক-এক করে চিনিয়ে দিচ্ছিল সকলকে—কে পূর্ণিমা, কে সুমিতা, কে সুধা.....।

পূর্ণিমারাও চুপ করে ছিল না। ওদের আলাপ গল্পের উদ্বেল কলরব সমস্ত গ্যালারিকে চুপ করিয়ে দিয়েছিল। সকলেই আস্তে কথা বলে, শুধু পূর্ণিমারা ছাড়া। ওদের হাসি থামতে চায় না। একজনে বাদাম কেনে, চারজনে ভাগ করে খায়। ওরা

তাকায় না কারও দিকে। সমস্ত গ্যালারির জনতা যেন প্রকাণ্ড একটা ছায়া মাত্র, শুধু ওরাই সজীব।

মালা একা পড়ে গেছে, তাকে কেউ দেখছে না। জীবনে বোধহয় এই প্রথম সে আড়ালে পড়ে গেল। এত প্রখর বিদ্যুতের বাতিটার নীচে বসে আছে মালা, অস্ট্রিচের পালকের বর্ডার দেওয়া মেরিনো পশমের জামা গায়ে, দু'ইঞ্চি লম্বা সোনার চেনে গাঁথা একজোড়া উদ্ভট প্যাটার্নের দুল দু'কান থেকে ঝুলে ঘাড়ের ওপর লুটিয়ে আছে। তবু কোন বিস্মিত বিরক্ত বা ধিক্কার ভরা দৃষ্টি কোন দিক থেকে তার দিকে তেড়ে আসছে না। মালা আজ নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

ছবির অভিনয় আরম্ভ হলো। ক্ষান্ত হলো গ্যালারির কলরব। আলোগুলি নিভলো। পূর্ণিমাদের সারি থেকে এক-এক টুকরো হাসিভরা কলরব মাঝে মাঝে বাঁধভাঙ্গা জলস্রোতের মতো উছলে পড়ছিল। কে জানে, কোন সার্থকতায় ভরে উঠেছে ওদের জীবনের এই খুশিয়ালী রাত।

সিনেমার ছবি চোখের সামনে বৃথা ঝলসে পুড়ছিল। মালা ডুবেছিল তার মনের অন্ধকারে। কালো পাথরের সেই ভয়ঙ্কর কুৎসা, মনে পড়লেই আতঙ্ক হয়। মালা জানতো, এই গরবিনীরাই তো মান হারিয়েছে। কিন্তু এ আবার কোন ছবি। এ যে নতুন করে মান পাওয়া। ওদের চোখে মুখে সেই তৃপ্তির উল্লাস।

পেছনের মেয়েদের দৃষ্টি আর-এক তৃষ্ণার ছলনায় ছল ছল। ওরা তাকিয়ে আছে পূর্ণিমার দিকে—এক দুরধিগম্য মহিমালোকের দিকে। ওখানে আসন পেতে হলে ছাড়পত্র চাই, সে বড় কঠিন ঠাঁই।

কালো পাথরের ছবি মরে যায়নি।

সেদিন মেয়েদের বাৎসরিক আনন্দমেলার অনুষ্ঠান। রাণীঝিলের মাঠে বাঁশের জাফরি আর খেজুর-পাতার ঘেরান দিয়ে সারি সারি স্টল সাজানো হয়েছে। পথে যেতে সবাই দেখলো, বহুদিনের স্তব্ধ পাথরটা আবার মুখর হয়ে উঠেছে।

—মুক্তি রায়, অমন মেঘে ঢাকা চাঁদের মতো ফুলবাগানের গাছের আড়ালে আর কতদিন থাকবে? আজকাল সব সময় হাতে ওটা কি থাকে? কাব্যগ্রন্থ? তোমার আসল কাব্য ভাল আছেন মজঃফরপুরে। আমার আর কি লাভ? শুধু যখন হেঁটে চলে যাও তখন পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি। বড় সুন্দর—তোমার চলার ছন্দ। মুখের দিকে তাকাতে ভাল লাগে না। স্নো-পাউডার দিয়ে কি চোখের কালি ঢাকা পড়ে! অসুখটা সারাবার ব্যবস্থা করো।

দলে দলে মেয়েরা এসেছে আনন্দমেলায়। মালা বিশ্বাসও এসেছে। আজ তার বেশভূষার কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত দীনতা। একটা সাধারণ মিলের শাড়ি, আঁচলটা আধ হাত ছেঁড়া। দেশী ছিটের একটা আধময়লা ব্লাউজ। পায়ে জুতো নেই, চোখে নেই চশমা।

চন্দ্রার দিদিরা একটা স্টল নিয়েছে। হরেক রকম ফুলের তোড়া আর বুকে বিক্রি হচ্ছে সেখানে, এক আনা একটি। স্কটিশ মিশনের মেয়েরা খুব ভিড় করেছে সেখানে,

তোড়া কেনার জন্য। মালা সেখানে সামান্য একটু দাঁড়িয়ে আবার এগিয়ে চললো।

মালতীরা একটা স্টল নিয়েছে, ঘরে তৈরী নানারকম জ্যাম জেলী আর চাটনী ভরে সাজিয়ে রেখেছে। সেখানে কোন ভিড় নেই, তবু মালতীর অনুরোধে একবার দাঁড়িয়ে এক শিশির দাম ছ'আনা পয়সা রেখে দিয়ে মালা বলে গেল, ফেরবার সময় নিয়ে যাবে।

মালার চোখে পড়েছে একটু দূরেই রাণুদের ম্যাজিকের স্টল। ভিড় সেখানেই সবচেয়ে বেশি। নবীনা প্রবীনা সকলেই সেখানে দলে দলে ঘাসের ওপর বসে পড়েছে। কী এমন আকর্ষণ আছে রাণুদের স্টলে?

আর একটু এগিয়ে যেতেই নজরে এল, হ্যাঁ কারণ আছে। সেখানে বসে আছে পূর্ণিমাদের দল। আজ তাদের মধ্যে একটা নতুন মুখ দেখা যাচ্ছে, মুক্তি রায়। পূর্ণিমারা সবাই খুশি হয়ে ম্যাজিক দেখছিল, আর অন্য সবাই দেখছিল পূর্ণিমাদের।

মালার চলার বেগ শান্ত হয়ে এল। ওদিকে এদিকে যেতে ওর বুকটা যেন দুরু দুরু করছে আজ। কিন্তু যেতেই হবে তাকে। তার ছেঁড়া কাপড়, খালি পা, নোংরা ব্লাউজ। নিশ্চয় তাকিয়ে দেখবে সবাই, পূর্ণিমারাও দেখবে।

হঠাৎ পাশে অনেকগুলি বাচ্চা বাচ্চা মেয়ে চিৎকার করে ডাকলো, মালাদি! মালাদি!

মালা মুখ ঘুরিয়ে দেখলো অনুপমা ডাকছে তাদের চায়ের স্টলে। সবাই মিলে চিৎকার করে মালাকে চা খেতে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

কি ভেবে নিয়ে মালা স্টলের ভেতরে গিয়ে বসলো। পর পর তিনকাপ চা খেলে। অনুপমারা খুব খুশি। বয়স্কাদের মধ্যে কেউ তাদের এক কাপ চা খেয়েও অনুগৃহীত করেনি। কত চেনা অচেনা মহিলাদের হাত ধরে ওরা টানাটানি করেছে, কিন্তু কারও হৃদয় গলেনি।

অনুপমা মানুষ জাতির ওপর তাই চটে গেছে। ম্যাজিকের স্টলের দিকে তাকিয়ে চড়া মেজাজে বলে, বুঝলে মালাদি, আমাদের দোকানের সব বিক্রি মাটি করে দিয়েছে রাণুদি। কাঁচা আম জলে ডুবিয়ে দেখাচ্ছে আম নেই। ছাই ম্যাজিক, ওটা তো চিনির তৈরী আম।

মালা—রাণু তোমাদের দোকানের বিক্রি মাটি করেনি।

অনুপমা—তবে কে?

মালা — করেছে.....।

উত্তর দিতে গিয়ে মালা হঠাৎ থমকে গেল। অনুপমার মতো এতটুকু একটা মেয়েকে অবাক করে দিয়ে আর লাভ কি?

চায়ের স্টলের সামনে দিয়ে কতজন আসছে যাচ্ছে। মালা আজ জোর করে সকলের চোখের ওপর ভেসে রয়েছে। তবু যেন তাকে কেউ লক্ষ্য করছে না। একটু দূরেই বসে রয়েছে পূর্ণিমারা। খুবই ইচ্ছে করেছিল সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে। আজও ভিড়ের পাশে

গিয়ে দাঁড়ালে হয়তো সবাই তাকিয়ে দেখবে তার এই ছেঁড়া ময়লা সাজ আর নিরাভরণ জীবনের চরম বিনতি। এই তো দেখবার মতো একটা নতুন জিনিস। কিন্তু যদি কেউ না তাকায়, এই আবেদনও যদি ব্যর্থ হয়! মালার সাহস হলো না।

মালা যেন আভাসে দেখতে পাচ্ছে—এই মেলার ভিড় ভাগ করে দেওয়া হয়েছে তিন ভাগে। এখানে একদল আছে, যারা পূর্ণিমাদের মতো অসাধারণ। একদল রয়েছে, রাণু অনুপমা ও এই পাঁচশত নবীনা প্রবীণার মতো সাধারণ। আর আছে মাত্র একজন—মালা বিশ্বাস, সাধারণের নীচে। তার এতদিনের আত্মবিজ্ঞাপনের সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে।

সেবক সমিতির বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে আবার। সেক্রেটারি ননীবাবু বললেন—একটা দুঃখের কথা বলবো আজ।

ননীবাবুর গলার স্বরে বোঝা গেল, অদ্ভুত কিছু-একটা ঘটেছে। সভ্যেরা কৌতূহলী হয়ে ননীবাবুর মুখের দিকে তাকালো। ননীবাবু টেবিলের আলোটার গায়ে বই মেলে দিয়ে তাঁর চিন্তিত মুখের ওপর যেন আরো খানিকটা অন্ধকার মেখে নিলেন।

—তোমাদের গ্যারান্টি দিতে হবে, একথা আমাদের ক'জন ছাড়া বাইরের কোন জীবের কানে পৌঁছবে না। সে ধরা পড়ে গেছে, কালো পাথরের লেখাগুলি যার কুকীর্তি। এ কাজ করেছে চৌধুরী মশাই।

কথাগুলি যেন মাথায় হাতুড়ি মেরে ভয়ানক একটা ঠাট্টা করে বসলো। প্রিয়তোষের রাগ হলো—আপনি কি তার কোন প্রমাণ পেয়েছেন?

ননীবাবু—ইয়েস্। যারা দেখেছে স্বচক্ষে, তারাই বলেছে।

প্রিয়তোষ—কে দেখেছে স্বচক্ষে?

ননীবাবু—তাদের নাম বলতে আমি বাধ্য নই।

ননীবাবুর চোখ দুটো মিট মিট করে এক দুর্বোধ্য প্রদীপের মতো জ্বলতে লাগলো।

সেবক সমিতির দায়িত্ব সমাপ্ত হলো এইখানে। কিন্তু এই উদ্ভট অকল্প্য তথ্যটা প্রতিজ্ঞা দিয়ে বেঁধে গোপন করে রাখা সম্ভব হলো না। দু'দিনের মধ্যেই সকলে জানলো, বার লাইব্রেরী থেকে আরম্ভ করে গুরুদাসের দোকান পর্যন্ত। যে শোনে সেই লজ্জা পায়, আপত্তি তোলে, এও কি সম্ভব?

তবু এই বিশ্বাসের সম্পদ হারাতে কেউ রাজি নয়। হোক না শোনা-কথা। শোনা যাচ্ছে কেউ একজন স্বচক্ষে দেখেছে। তাহলেই হলো।

বিশ্বাস বাড়ির জানালায় সেই অচঞ্চল মূর্তি আর দেখা যায় না। ক্রসরোডের কালো পাথরের আর লেখা পড়ছে না। শহরের উৎসাহে মন্দা পড়েছে। জমাট গানের মাঝখানে হঠাৎ যেন সুর ছিঁড়ে গেল।

আজকাল ঘরের ভেতরেই থাকতে ভালবাসে মালা। বাইরের পৃথিবী, সেখানে মানায় পূর্ণিমাদের। ওরা অঘ্রাণের তারা, সন্ধ্যা সকাল ওদেরই শুধু দেখতে হয়।

সার্থক জীবন পূর্ণিমাদের। ওরাই প্রার্থিতা। আড়াল থেকে মুক্ত করে এনে

সংসার ওদেরই মুখ দেখতে চায়। ওরা দয়িতা—কামনার লীলাকুরঙ্গী। কুৎসা কলুষও ধন্য হতে চায় ওদেরই আশ্রয়ের প্রসন্নতায়। আর সকল কামনার সীমানার ওপারে, এক বেদনাহীন বিবাগের মরুস্থলীতে দাঁড়িয়ে আছে মালা। সে একা, সে নিঃস্ব।

মালা নিজেকে বন্দী করে ফেলেছে। সব দেখা আর দেখা পাওয়ার পালা শেষ হয়ে গেছে। ওর মধ্যে কোন সত্য নেই। পৃথিবীর চোখের ওপর নিজেকে যে এতদিন অকুণ্ঠভাবে সঁপে দিয়ে এসেছে, সেই মুছে গেল আজ।

এই বুঝি দুনিয়ার রীতি।

জানালার খড়খড় দিয়ে পড়ন্ত রোদের একফালি ঘরে এসে পড়েছিল। আনমনে জানালাটা খুলে দিয়েই মালা বন্ধ করে দিল আবার।

আয়নার সামনে বসেছিল মালা। নিজের চেহারা চোখে পড়তেই মুখ ফিরিয়ে নিল। আর বুঝতে বাকি নেই, এ চেহারা যদি গ্রহের মতো আকাশে ভেসে বেড়ায়, তবুও চোখ তুলে কেউ তাকাবে না।

এক এক সময় মালা চেষ্টা করেও তার অস্থিরতাকে চেপে রাখতে পারে না। মনে হয় বাইরের বাতাসে নিঃশ্বাস না নিলে যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে তার। তবু জোর করে কপাটে খিল এঁটে দেয়—কোন পলাতকার পায়ে যেন বেড়ি পরিয়ে তাকে সবলে ধরে রাখে।

সন্ধ্যে হয়ে আসে, অনেকদিন পরে চাঁদ উঠেছিল আবার। মালা জানালা বন্ধ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ একটা ঝোড়ো মেঘে ঢাকা পড়ে গেল চাঁদ। দৃশ্যটা ভালোই লাগলো মালার। মালা ডাকলো—রামজীবন, আমি বেড়াতে যাব এখনি।

সাজ-সজ্জার পর মালা কিছুক্ষণ নিঝুম হয়ে বসে রইলো আয়নার সামনে। চোখের জলে দু'দুবার মুখের পাউডার ভিজে গেল। রামজীবন বার বার হাঁক দিচ্ছে। নিজেকে একরকম জোর করে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে গেল মালা।

রাণীঝিলের চারদিকে দু'দুবার ঘোরা হল, মাঠটা আড়াআড়ি দু'বার হাঁটা হলো। দিক ছাপিয়ে অন্ধকার আসছে। পূর্বে পশ্চিমে দেওদারের মাথা শিউরে উঠছে। বন জোয়ানের গন্ধমাখা ধুলো ছিটিয়ে পড়ছে চারিদিকে। ঝড় আসছে। রামজীবনের হাঁক-ডাকে অগত্যা মালা ফিরলো ঘরের দিকে।

রামজীবন এগিয়ে গেছে কিছুদূর। মালা খুবই আস্তে আস্তে যেন টেনে টেনে চলেছিল। হ্যাঁ, এই ক্রসরোডের মোড়। এই তো সেই পাথর, অন্ধকারে যেন কারও প্রতীক্ষায় বসে আছে।

মালা থমকে দাঁড়ালো।

এই সেই পাথর, এই কলঙ্ক কীর্তনিয়ার প্রসাদে কত নগণ্যা গরীয়সী হয়ে উঠেছে। অপবাদ হয়েছে প্রশস্তি। কিন্তু এ পাথরের মনে সুবিচার নেই। এর সব চক্রান্তকে আজ একটি আঘাতে চূর্ণ করে দেওয়া যায়। কালো পাথরের কবিকে কেউ ধরতে পারেনি, মালা তাকে আজ নিঃশেষ করে দিতে পারে। সব পরাজয়ের প্রতিশোধ

নিতে পারা যায় এইক্ষণে। মালা যেন একটা ঝাঁপ দিয়ে লুটিয়ে পড়লো পাথরটার ওপর। ব্লাউজের ভেতর থেকে টেনে বার করলো এক টুকরো খড়ি।

বিদ্যুৎ চমকাবার আগে, রামজীবনের হাঁক শোনার আগেই খড়ির আখরে এক স্তবক ঘনঘোর মিথ্যা সাদা ফুলদলের মতো ছিটিয়ে পড়লো পাথরের গায়ে।

—মালা বিশ্বাস, তোমায় দূর থেকে সেলাম করি। এক দুই তিন চার...থাক্, বেচারাদের নাম আর করবো না। কত পতঙ্গের পাখা পুড়ে গেল। আর সংখ্যা বাড়িও না। তোমার চিঠির তাড়া রাণীঝিলের জলে ভাসিয়ে দিয়ে এবার সুস্থির হও।

গ্লানিহর

হিরোতা মারু পোতাশ্রয় ছেড়ে অনেক দূর এগিয়ে এসে এবার ডাইনে মোড় নিল। ধীরে মিলিয়ে গেল অ্যাপোলো বন্দরে অভ্রলেহী টাওয়ার আর ঠাসাঠাসি, নোঙর করা কার্গোবোটের মাস্তুলের ভীড়। নিস্তরঙ্গ আরব সমুদ্রের বুক চিরে মেঘের মত উড়ে গিয়ে এলিফান্টা পাহাড়ের ছোট চূড়োটাকে ঘিরে ধরল। বোম্বাইয়ের মাথার ওপর তার ঘনমসী কালো ধোঁয়ার সুগোল মারাঠী টুপিটা শুধু সুস্থির হয়ে লেগে রইল উত্তরের আকাশে।

ঠিক এমনি সময়ে হাঁ করে এই আকাশভুবনের খেলা দেখাটা যে কত মূঢ়তা, তা টের পেলাম ডেকের উপর দৃষ্টি পড়তে। শোণপুরের মেলার একটা ভগ্নাংশ, এত ভীড়। এরই মধ্যে বিছানা বিছিয়ে যে যার জায়গা কায়েমী করে নিয়েছে। বাক্স তোরঙ্গ বদনা ছড়িয়ে চৌহদ্দি রেখেছে পাকা করে। স্থান নেই। কিন্তু স্থান চাই, শুতে হবে। এডেন পৌঁছতে পুরো ছটা দিন; ঠায় দাঁড়িয়ে তো আর যাওয়া যায় না।

কাথিয়াবাড়ী বেনেরা তাদের ছেঁড়া জুতোগুলো পর্যন্ত দু'হাত অন্তর এলোপাথাড়ি করে সাজিয়ে রেখেছে; যতদূর পারে দখলের পরিধি ফলিয়ে রেখেছে। যেন মূর্তিমান স্বার্থ, ক্ষুরে শান দেওয়া সওদাগরী বুদ্ধি, শত অনুরোধের কোন ফল হবে না!

জাঞ্জিবারী বোবারা চলেছে। লবঙ্গ বেচা টাকায় সব লাল লাল চেহারা, প্রত্যেকের দুটি করে বিছানা, একটি শোবার আর একটি নমাজ পড়বার। সামনে দাঁড়িয়ে মূর্ছা গেলেও এরা আধ হাত জায়গা ছেড়ে দেবে না।

আমারই মত নিরুপায় এক প্যালেস্তানী ইহুদী সাহেব অগত্যা তার সুটকেশটার ওপরে বিছানা পেতে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু আমি কি করি?

নজর পড়ল ডেকের শেষপ্রান্তে খাঁচার মত মুখোমুখি দুটো বেশ সুপরিসর কাঠের ঘর, ওপরে নোটিশ লেখা—ফর হর্সেস ওন্‌লি, শুধু ঘোড়ারা থাকিবে। এখন কিন্তু ঘোড়ারা নেই, ফিরতি পথে রেসের ঘোড়া যাবে। বাক্স বিছানা সমেত একটা খাঁচায় ঢুকে পড়লাম। দূরে দাঁড়িয়ে জাহাজের কোরিয়ান মেথরটা আমার গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। এগিয়ে এসে আপত্তি করতেই একটা সিগারেট উপহার দিলাম। খুশি হয়ে চলে গেল।

দ্বিতীয় খাঁচাটার দিকে লক্ষ্য পড়তেই বিস্মিত হতে হল। সপরিবারে এক বাঙালি ভদ্রলোক সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন। ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী আর দুটি ছোট ছেলে। একটি বছর পাঁচেক আর একটি দুগ্ধপোষ্য, মাত্র হামা দেবার বয়সে পৌঁছেছে। খুব খুশি হলাম দেখে। বাঙালী সহযাত্রী, তবে তো মনের সুখে বাংলা বলা যাবে—দিন যাবে ভাল। তা ছাড়া একজোড়া বাঙালী খোকা, জাহাজী জীবনে ক্বচিৎ এমন ষোল আনা স্বদেশী সঙ্গ পাওয়া যায়।

কিন্তু বড় নিরাশ হতে হল। অবাক হলাম ভদ্রলোকের সৌজন্যবোধের অভাব দেখে। এঁদের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে যেতেই ভদ্রলোক চকিতে একবার আমাকে দেখে নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে রইলেন। ভদ্রমহিলা ঘোমটা টেনে কাঠের সিন্দুকটার আড়ালে গিয়ে বসলেন। সাগ্রহ আলাপনের উৎসাহটা উদ্যোগেই ক্ষান্ত হয়ে গেল। নিজের খাঁচায় ফিরে এলাম ক্ষুণ্ণ হয়ে।

শুয়ে শুয়ে দেখছি, মহিলাটি স্টোভ জ্বেলে খিচুড়ি রাঁধলেন। ভদ্রলোক আর বড় ছেলেটা খেয়ে নিল। শিশি থেকে গুঁড়ো দুধ বার করে নিয়ে জ্বাল দিলেন, ছোট ছেলেটাকে খাওয়ান হল। ভদ্রলোক সিগারেট মুখে দিয়ে শুয়ে শুয়ে বই পড়তে লাগলেন। মহিলাটিও খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে তোরঙ্গ থেকে কাঁথা বার করে সেলাইয়ের কাজে মন দিলেন।

বিকেলের দিকে জাহাজের দোলা বেড়ে ওঠায় ঘুম ভেঙে গেল। চোখ বুজে শুনছি, মাথার কাছে কুরকুর একটা শব্দ। চেয়ে দেখি বড় ছেলেটা আমারি মাথার কাছে বিছানার কোণে বসে একবাটি গরম কফি নিয়ে খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে সশব্দে মিছরি চিবোচ্ছে। ছোট ছেলেটাও মেঝের উপর বসে সিগারেটের একটা খালি খোল হাতে নিয়ে দুহাত দিয়ে কুটিকুটি করে ছিঁড়ছে। বড় ছেলেটাকে প্রশ্ন করলাম—কি খোকা, নাম কি তোমার?

—পটল।

—ও তোমার কে হয়?

—আমার ভাই পল্টু।

—আর ওঁরা কারা? বাবা আর মা?

—হ্যাঁ।

—কোথায় যাচ্ছ তোমরা?

—আমরা যাচ্ছি কেপ।

—তোমার বাবা বুঝি সেখানে চাকরি করেন?

—হ্যাঁ।

প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিল পটল। এবার তার পালা। প্রশ্ন করল—তুমি কে?

—আমিও চাকরি করি। যাচ্ছি এডেন।

—তোমাকে কে রান্না করে দেয়?

—আমি হোটেল থেকে খাবার কিনে খাই।

—তবে তোমাকে হাওয়া করে কে? যখন কাশি হয়?

পটলের প্রশ্নে কৌতুক আর কৌতূহল জাগিয়ে তুলল। জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার বাবার বুঝি খুব কাশি হয়?

—হ্যাঁ, হাঁপানি কাশি। কাউকে বলবে না কিন্তু।

—কেন বল তো?...পটলের কথাবার্তা ধাঁধার মত ঠেকছে।

—জাহাজের ডাক্তার আমাদের নামিয়ে দেবে তা হলে....পটল উত্তর দিল।

এইবার বুঝলাম। ছেলেটির বুদ্ধিশুদ্ধি বেশ পরিষ্কার। দেখলাম আলাপের সঙ্গী হিসেবে পটল নেহাত নগণ্য নয়। এ বিষয়ে বাপের চেয়েও বেশি শালীনতার পরিচয় দিয়েছে সে।

প্রশ্ন করলাম—তোমার বাবার নাম কি?

—বিকাশচন্দ্র গাঙ্গুলী।

—তোমাদের বাড়ি কোথায় পটলবাবু?

—কিম্বার্লি।

—আর মামাবাড়ি?

পটল খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল—ইণ্ডিয়া। আমার প্রশ্ন-প্রবাহে বাধা পড়ল। এ সব আবার কি বলে! বাড়ি কিম্বার্লি, মামাবাড়ি ইণ্ডিয়া? মনে মনে বিচার করে দেখলাম, তাই হবে বোধহয়। বেচারা গাঙ্গুলী হয়ত বহুদিন দেশছাড়া। পেটের দায়ে পড়েছে গিয়ে সুদূর কিম্বার্লি।

এবার নজর পড়ল ছোটটার ওপর। ডাকলাম—পল্টু। ছেলেটা দ্রুত হামা দিয়ে চলে এল। পটল চেঁচিয়ে উঠল—বিছানায় বসাবে না, ভিজিয়ে দেবে। এই বলে পল্টুকে সবলে দুহাত দিয়ে বুকের ওপর ঝুলিয়ে নিয়ে বেতালা পা ফেলে চলে গেল।

পটলের মা যে আধুনিকা নন তা বুঝতে দেরী হল না। মাথার ঐ ঘোমটাটিই তার প্রমাণ। তবে তিনি সাহসিকা নিশ্চয়। দুটি শিশুসন্তান নিয়ে স্বামীর সঙ্গে দূর কিম্বার্লিতে গিয়ে সুখে ঘর করছেন। বাংলাদেশের ছায়া সুনিবিড় পল্লীর এক টুকরো সংসার কৃষ্ণ মহাদেশের কোলে এক মরু উপত্যকাতে গিয়ে ছিটকে পড়েছে।

খাওয়া শোয়ার সময়টুকু ছাড়া পটল আর পল্টু সব সময় আমারই আশেপাশে ঘুরঘুর করে বেড়ায়। পল্টু এক একবার ক্লান্ত হয়ে মেঝের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে, বিছানায় তুলে নিই। পটল তার মায়ের ইশারা পেয়ে কখনও কখনও চলে যায়, ডেকের দোকান থেকে সোডা দেশলাই সিগারেট কিনে আনে। দুপুরে যখন মহিলাটি গাঙ্গুলীমশায়ের সঙ্গে স্নানাগারের দিকে যান, পটল তখন বসে বসে জিনিসপত্র পাহারা দেয়, পল্টুর ওপর চোখ রাখে।

দিন কাটছিল। আর কটাই বা দিন? গাঙ্গুলীর অসামাজিকতায় ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম

সত্যি, কিন্তু পটল আর পল্টু সেটা ভালভাবেই মিটিয়ে দিচ্ছে। দিনরাত সমুদ্রের একটানা কলোচ্ছ্বাস, কান ও মন দুই বধির হয়ে যায়। পল্টু ও পটল আচমকা এসে মিঠে কলরব জাগিয়ে তোলে। একটু স্বজনতা পাই, তাতেই মন ভরে ওঠে।

পটল ছেলেটা বড় কাজের। খিচুড়ি রান্না করা থেকে বিছানা করা পর্যন্ত প্রত্যেকটি কাজে সে তার মাকে সাহায্য করে। ভাবছি, এত বুদ্ধিমান ছেলেটা, লেখাপড়া শিখছে তো? নইলে হয়তো কপালে কুলিগিরি আছে। যে সাংঘাতিক দেশে থাকে। পটল এসে ডাকল—মিস্টার, কি করছ?

জিজ্ঞাসা করলাম—পটলবাবু, তুমি লেখাপড়া কর না?

—হ্যাঁ, আমি আর মা পড়ি।

—কে পড়ায়?

—বাবা। পল্টুও পড়বে আর একটু বড় হলে।

চুপ করে এদের কথা ভাবছি। গাঙ্গুলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি। পটলের সঙ্গে এমনি ধরনের খণ্ড খণ্ড আলাপের ভেতর দিয়ে ওদের পরিচয় ক্রমশ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে।

পটল বলল—জান মিস্টার, আমি বিলাত যাব পড়তে। বাবা বলেছে।

বললাম—তাই নাকি? বেশ, বেশ নিশ্চয়ই যেও, পটলবাবু।

পটল আবার বলল—আমার বিয়ে হবে মেমের সঙ্গে, মা বলেছে। লজ্জিত হয়ে পটল বালিশে মুখ গুঁজে রইল।

আদর করে পটলের মাথাটা ঝেঁকে দিয়ে বললাম—বিয়ের সময় আমাকে নেমন্তন্ন করতে ভুলো না যেন। পটল একটু সিরিয়াস হয়ে সাগ্রহে বলল—তবে তোমার নাম লিখে দিয়ে যাও। চিঠি দেব।

নাম লিখে দিতে হল।

দেখছি। স্থিরদৃষ্টি নিয়ে দেখছি ঐ মহিলাটাকে। মহিলা? মিসেস গাঙ্গুলী? পটলের মা?

চোখ দুটোকে লোহার শিক দিয়ে যেন নির্মমভাবে খুঁচিয়ে দিল। এ তো মহিলা-টহিলা নয়? এ যে আমাদের ভৈরবমালীর মেয়ে মালতী।

এই মালতী, যে জেঠামশায়ের বাড়ির ঝি ছিল। কথাবার্তা নেই হঠাৎ জেঠিমার গয়না চুরি করে পালাল শিশির বেয়ারার সঙ্গে। ধরা পড়ে জেলে গেল। ফিরে এসে ঘর নিল কাশীর এক কুখ্যাত পাড়ায়। তার প্রণয়ের সেই শিশির বেয়ারা তারই হাতে খুন হল একদিন। তারপর থেকে সে ফেরার। পুলিশ এতদিন খোঁজাখুঁজি করেও হদিস পায়নি। ....সব জানি। আমি ওর সাক্ষাৎ চিত্রগুপ্ত। ওর পাপ-জীবনের সব ঘটনার ফর্দ আমার প্রায় মুখস্থ আছে।

এখন বুঝেছি ঐ আধহাত ঘোমটার অর্থ। ছি ছি, এতদিন মনে মনে এত স্তুতি করে এসেছি, ঘটনার মধ্যে এরকম সাংঘাতিক একটা ঠাট্টা লুকিয়েছিল প্রহেলিকার মত।

গয়নার শোকে জেঠিমার বুকফাটা চিৎকার যেন শুনতে পাচ্ছি। ডাকব পুলিশ। আমি শুধু ওর চিত্রগুপ্ত নই, আমি এবার ওর যম।

সোজা জিজ্ঞেস করব—ভাল চাস তো মাগি জেঠিমার গয়নাগুলো ফিরিয়ে দে। তাহলে ছেড়ে দেব, নইলে রেহাই নেই।

আরো জানবার আছে। সুস্পষ্ট উত্তর চাই—শিশিরকে খুন করলি কেন? গাঙ্গুলীর সঙ্গে কতদিন আছিস?

না হয় একবার সামনে আসুক। ক্ষমা চা'ক, অকপটভাবে স্বীকার করুক অপরাধ। তারপর বিচার করা যাবে, ছেড়ে দেওয়া যায় কিনা।

কানটা ধরে একবার জিজ্ঞাসা করলে হয়—এখনো পিরিতের ব্যবসা ছাড়তে পারলি না? গাঙ্গুলীর কাঁচা মাথাটা না খেলে চলছিল না?

অনেক কিছুই বলবার ছিল কিন্তু আজ আর বলা হল না। একটা অজ্ঞাত সঙ্কোচে মনের সমস্ত উদ্ধত বাচালতা স্তব্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু বলতেই হবে।

কিংকর্তব্য গুলিয়ে গেল। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে দেখলাম, পল্টু তার অর্ধভুক্ত বিস্কুটের গুঁড়ো ছড়িয়ে আর বসে বসে আমার বিছানাটাকে নোংরা করছে। টেনে নামিয়ে দিলাম—যা এখান থেকে, এক্ষুনি চলে যা।

পটল আমার বিছানার কাছে বসে ছবির বই দেখছিল। বললাম—এই ছোঁড়া, ভাগ হিঁয়াসে। আর আসিস না।

পটল আর পল্টু চলে গেল।

গাঙ্গুলীকে ডেকে একবার সাবধান করে দেব। ওর ভবিষ্যৎ ভাবতে গিয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠছি। না হয় রক্ষিতাই রেখেছে, কিন্তু বোকাটা কি আর কাউকে পায়নি? এমন একটা বিষকন্যাকে করেছে জীবনপথের সহচরী! ওর একটি ছোবলে যে গরল উগ্‌রে আসবে, তাতে কয়টি মুহূর্ত টিকে থাকবে বোকা ভদ্রলোকের এই সংসারবিলাস।

শিশির বেয়ারা ঘটিত কাহিনীটা শুনিয়ে দেব, তাতেও যদি মূর্খ লোকটার হুঁস হয়। কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে, ওকে বলেও কোন সুফল হবে কি? এই গাঙ্গুলীই হয়তো একটি রসাতলচারী নররূপী সরীসৃপ। জেনেশুনেই কালনাগিনীর সঙ্গে একক বিবরে বাসা বেঁধেছে।

ন্যাঃ, কিছু একটা করতে হবে। এই বাজে মেয়েমানুষটার এত নিখুঁত পতিব্রত্যের অভিনয় আর সহ্য হয় না।

পটল আর পল্টু এদিকে আর আসে না। নিশ্চিন্ত হলাম। আর যেন না আসে। এখন কি করা কর্তব্য সেইটাই ভাবি।

যাক্, যা হবার হয়ে গেছে। দুজনকে ডেকে নিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলবে—আর যেন ভবিষ্যতে কোন কেলেঙ্কারী না করে। যেন দুজনে মিলেমিশে ভালভাবে থাকে। আর ছেলে দুটোকে যেন আর্যসমাজের অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেয়, যাতে ভবিষ্যতে মানুষ হতে পারে।

মাথার কাছে খসখস একটা শব্দ হতেই তাকিয়ে দেখি পটল এসে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিনের মত বিছানা ঘেঁষে নয়—একটু দূরে। তাকাতেই বলল—মিস্টার, তুমি আমাদের মারবে কেন?

—কে বলেছে, আমি তোদের মারব?

—হ্যাঁ, মা বলেছে তোমার কাছে গেলে তুমি মারবে। বড় পাকা পাকা শোনাল ছেলেটার কথা। বললাম—যা নিজের জায়গায় যা, বেশি বক্‌বক্‌ করবি না এখানে।

পটল পল্টু নিজেদেরই বিছানায় বসে সারাদিন খেলে, আবোলতাবোল বকে, আর ঘুমোয়। মালতীর মাথায় এই কদিন আর ঘোমটার বালাই নেই। এ দৃশ্য দেখি, চক্ষু পোড়ে, অন্তর্দাহও হয়।

....আজই তলব করব দুজনকে। শেষ সাবধান বাণী শুনিয়ে ছেড়ে দেব।

পটল অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে এসে বলল—মিস্টার, তোমার দেশলাইটা দাও তো। স্টোভ জ্বালতে হবে, শিগগির দাও। পটলের মুখ শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে। প্রশ্ন করলাম—কেন পটল, কি হয়েছে? এত হাঁপাচ্ছ কেন?

—তেল কর্পূর গরম করব। বাবার হাঁপানি ধরেছে, বুক ব্যথা করছে।

দেখলাম গাঙ্গুলীমশায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করছেন। সাঁ-সাঁ করে হাঁপাচ্ছেন বুকে হাত রেখে। মালতী একহাতে তাঁর বুকে হাত বুলোচ্ছে, অপর হাতে পাখার বাতাস দিচ্ছে।

পটল স্টোভ ধরিয়ে বাটিতে তেল কর্পূর চড়িয়ে দিল।

ওদিকে আমার কিছু করবার নেই। ভাজা কর্পূরের সুগন্ধ ভেসে আসছে। পল্টু সবেগে হামা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। এর সঙ্গেও আজ আমার কোন কাজ নেই।

হাঁপানির জোর বেড়ে চলেছে ক্রমশ। এবার সাঁ-সাঁ শব্দ ছেড়ে দস্তুর মত আর্তনাদ শুরু হল। মালতী গাঙ্গুলীর পায়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে।

দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। জল আর আকাশের নীলঘন রূপ ফিকে হয়ে এসেছে। এডেন বোধহয় আর বেশী দূর নয়।

শেষ কথাটা শুনিয়ে নেমে পড়তে হবে। কিন্তু কখন বলি?

পটল আস্তে আস্তে এসে কানের কাছে ফিস ফিস করে বলল—ডাক্তারকে বলে দিও না, মিস্টার। আমাদের নামিয়ে দিলে খুব কষ্ট হবে, বুঝলে?

কর্তব্য আর স্থির হল না। একটা অলক্ষ্য ভীরুতা এসে শেষ কথাটাকেও একেবারে চাপা দিয়ে দিল। বলা আর হল না।

ভাবছি পটল ও পল্টু বড় হবে, বিলেতে যাবে। মেম বিয়ে করবে। এদের জীবনশোণিত নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যাবে মহামানবের সহস্র স্রোতে।

ভাবছি—মালতী আর গাঙ্গুলী। কোথায় তারা? আদিম নীহারিকার মত সব অন্ধকারের বোঝা নিয়ে তারা মুছে গেছে অনেকদিন। আজ যাদের দেখছি তারা কেউ নয়। তারা শুধু পটলের মা আর পটলের বাবা।

চিন্তার আবেশের সঙ্গে সঙ্গে একটা সুখতন্দ্রা ধীরে নেমে আসছিল, কিন্তু হঠাৎ

চমকে উঠতে হল, শিশুর আক্রমণে। পল্টু তার দন্তহীন মাড়ি দিয়ে কামড়ে ধরেছে আমার নাক, তার মুখের লালায় আমার সমস্ত মুখ প্রলিপ্ত করে তুলেছে।

তুলতুলে কচি মানুষের মুখ, জেলির মত নরম ঠোঁট। নতুন মানুষের গন্ধ পাচ্ছি পল্টুর দুধমুখে। পল্টুকে বুকের ওপর তুলে নিলাম।

এডেনের গ্যারিসন আর কয়লার স্তূপ দেখা যাচ্ছে। যাত্রীদের কোলাহল শুনছি—এডেন এডেন! এডেন এসে পড়েছে।

মনে পড়ল, আমাকেও নামতে হবে। কিন্তু পল্টু তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে আমার বুকের ওপর। সুখসুপ্ত মানুষের ভবিষ্যৎ কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রয়েছে।

পল্টুর ঘুম ভাঙাতে হবে। ভাবতে কষ্ট হচ্ছে।

ঐশ্বরিক

তাঁর নাম সাধু রামানন্দ।

কানপুর থেকে আগে চিঠি লিখে নিরঞ্জনকে জানিয়ে দিয়েছিলেন ছোট কাকা : সাধু রামানন্দ এই এক মাস এখানেই ছিলেন। এইবার পাটনা যাবেন। আমি তাঁকে অনুরোধ করেছি, যেন পাটনাতে তোমাদের ওখানে গিয়ে তিনি একবার পায়ের ধুলো দেন আর অন্তত একটা সপ্তাহ তোমাদের ওখানে বিরাজ করেন। আশা করি তোমাদের ওখানে তাঁর সেবা-যত্নের আর ভক্তি-শ্রদ্ধার কোন ত্রুটি হবে না।

পাটনাতে এসেছেন সাধু রামানন্দ। এবং, একটা সপ্তাহ পার হয়ে গিয়েছে, এখনও তিনি নিরঞ্জনের এই বাড়িতেই আছেন। আরও যে কতদিন এখানেই বিরাজ করবেন সাধু রামানন্দ, সেটা তিনিই জানেন। শিগগির যে চলে যাবেন, এমন কোন লক্ষণও তাঁর কথায় বা আচরণে দেখা যায় না।

ছোটকাকা এত আগ্রহ করে আর অনুরোধ করে চিঠি দিয়েছেন বলেই নিরঞ্জন চুপ করে আছে; তা না হলে সাধু রামানন্দকে নিশ্চয় জিজ্ঞেস করে বসতো নিরঞ্জন, আর কতদিন এখানে বিরাজ করবেন সাধুজী? কবে যাবেন?

বুঝতে পারা যায় আর সাধু রামানন্দ নিজেও বলেছেন, কানপুরের ছোটকাকার বাড়িতে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা আর খুব সেবা-যত্ন পেয়েছেন সাধুজী। এখানে নিরঞ্জনের এই বাড়িতে সাধুজীর সেবা-যত্নের অবশ্য কোন ত্রুটি হচ্ছে না, কিন্তু ভক্তি-শ্রদ্ধার কোন বাড়াবাড়ি নেই। ভক্তি-শ্রদ্ধার কোন ব্যাপার নেই বললেও চলে, যদিও অভক্তি বা অশ্রদ্ধারও কোন ব্যাপার নেই।

নিরঞ্জনের পাটনার বাড়ির পিছনের বাগানে বারান্দা-দেওয়া ছোট একটা ঘর আছে। পাকা ঘর। রঙিন সিমেন্টের মেজে। এই রঙিন সিমেন্টের চকচকে মেজের একদিকে সাধু রামানন্দের কম্বল পাতা আছে। একটা ঝোলা আছে। কমণ্ডলু আছে। একজোড়া খড়ম আছে। কম্বলের উপর মাঝে-মাঝে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকেন

সাধু রামানন্দ। তখন ঘরের ভিতরের আর বারান্দার ভিড়ও একেবারে নীরব হয়ে সাধুজীর সেই ধ্যানস্থ মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকে।

এই ভিড়ের মধ্যে নিরঞ্জনকে কোনদিন দেখা যায়নি। নিরঞ্জনের বাড়ির কোন মানুষ এই ভক্ত-জনতার ভিতর এসে দাঁড়ায় না, বসে না, হাতজোড় করে তাকিয়ে থাকে না।

অথচ নিরঞ্জনের বাড়িতে লোকজনের অভাব নেই। নিরঞ্জন আছে, নিরঞ্জনের স্ত্রী আছে, নিরঞ্জনের তিন বোন আছে, বড়দার যে দুই ছেলে কলেজে পড়ে, তারাও আছে। বড় বোন রাণুর বরও এখন এখানে আছে। এরা সবাই সাধু রামানন্দকে একবার দেখে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু শুধু দেখা, প্রণাম করেনি কেউ, হাত পেতে কোন আশীর্বাদী ফুলও চায়নি।

কিন্তু কোন তুচ্ছতার বা ঠাট্টার হাসিও হাসেনি কেউ। কানপুরে অনেক বড়-বড় লোকের বাড়িতে অনেক ভক্তি-শ্রদ্ধা পেয়েছেন এক সাধু, সে-সাধু দেখতে কেমন, শুধু এই কৌতূহলটুকুর জন্যই এবাড়ির মানুষেরা সাধুজীকে শুধু চোখে দেখেছে, আর চলে গিয়েছে।

কিন্তু সাধুজীর অসুবিধেও হতে দেয়নি নিরঞ্জন। বাইরের যারা আসছে, আর ভিড় করছে—সাধুজীর ধ্যান দেখছে, উপদেশ শুনছে—তারা আসুক। দারোয়ানকে বলাই আছে, সাধুজীকে দেখবার জন্য কোন ভক্ত মানুষ এলেই যেন গেট খুলে দেওয়া হয়। রোজই সাধুজীর কিছু ফুল দরকার, কারণ বহু প্রার্থীকে আশীর্বাদ করতে হয়। নিরঞ্জন তার চাকর কৈলাসকে বলে দিয়েছে, রোজ সকালবেলা যেন এক ঠোঙা ফুল সাধুজীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

সাধুজীর দু'বেলা স্নানের জল কৈলাসই কুয়ো থেকে তুলে দেয়। বাড়ির রান্নার কাজ করে যে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বৈকুণ্ঠ পাঁড়ে, তাকেও বলা আছে, সাধুজীর দু'বেলার ভোজন আর জলখাবার বাগানের ঐ ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসবে। চা খাওয়া অভ্যাস আছে সাধুজীর। বৈকুণ্ঠ পাঁড়ে সকাল-সন্ধ্যায় সাধুজীর ঘরে চা পৌঁছে দিয়ে আসে।

সাধু রামানন্দের বয়স বেশি নয়; তবু মুখভরা দাড়ি, কাঁচা দাড়ি। জটা নেই, কিন্তু চুল খুব লম্বা। চুলের গোছা মাথার উপরে ঝুঁটি করে বাঁধা। পরনে গেরুয়া রঙে ছোপানো ধুতি আর ফতুয়া। গলায় তামার চাকতির একটা মালা—সে মালার সঙ্গে ছোট একটা সাদা শঙ্খ ঝুলছে।

নিরঞ্জন এক-একদিন রাণুর বর হিতেনের সঙ্গে গল্প করে—সাধুজীর আধ্যাত্মিক পসার তো বেশ জমে উঠেছে দেখছি।

হিতেন—তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

নিরঞ্জন—এ তো বড় চমৎকার প্রফেসন; পনের দিনের মধ্যেই মক্কেলের এত ভিড়। আমার চেম্বারে তো এই দশ বছরের মধ্যে একসঙ্গে দশজনের বেশি মানুষেরও ভিড় হয়নি।

হিতেন—সাধুজী ভক্তদের কাছ থেকে টাকা-পয়সাও নিচ্ছেন নাকি?

—নিচ্ছেন বই কি। আমারই মক্কেল শ্যামলাল আজ একশো টাকার একটি নোট দিয়ে সাধুজীকে প্রণাম করেছে।

হিতেন—তাহলে আমি আর এত কষ্ট করে মড়া চিরে-চিরে ডাক্তারি পড়ি কেন? এরকম একটা স্পিরিচুয়্যাল প্র্যাকটিস শুরু করে দিলেই তো পারি।

নিরঞ্জন হাসে—যদি সাহস করে শুরু করে দিতে পার তবে বুদ্ধিমানের কাজ হবে হিতেন।

চাকর কৈলাস বলে—না বাবু, সকলেই যে সাধুজীকে টাকা দিয়ে প্রণাম করে, তা নয়। কেউ কেউ এক-আনা দু'আনা দিয়েও প্রণাম করে। এমন কি, এক-পয়সাও প্রণামী দিতে পারে না, এমন লোকও আসে।

হিতেন হাসে—তার কাছ থেকে বোধহয় হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নেন সাধুজী।

কৈলাস—আজ্ঞে?

হিতেন—নগদ না হলে, ধারেই পায়ের ধূলো বিক্রি করে তোমাদের সাধুজী?

কৈলাস—না জামাইবাবু। ঐ তো সত্যবাবুর বউ রোজই আসছেন আর প্রণাম করে চলে যাচ্ছেন। কোনদিন একটি পয়সাও দেননি সত্যবাবুর বউ।

হিতেন—কেন?

কৈলাস—পয়সা দেবার সামর্থ্য নেই।

দুই

ঠিকই, সাধু রামানন্দ বোধহয় মনে মনে রোজ বিরক্ত হয়েছে। এক মহিলা ভক্ত রোজই আসছেন; দু'হাত জোড় করে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকছেন। সব ভক্ত চলে যাবার পরেও কিছুক্ষণ বসে থাকেন এই মহিলা।

সাধু রামানন্দের ধ্যানস্থ চোখ দুটোও মাঝে মাঝে যেন অস্বস্তি সহ্য করতে গিয়ে কাঁপতে থাকে।

সাধু রামানন্দ বিরক্ত হয়ে কথা বলেন—তুমি তো রোজই আস, কিন্তু একেবারে খালি হাতে আস কেন?

—আমার এক পয়সা দেবার সামর্থ্য নেই, ঠাকুর।

—কেন?-ভাত খাও না? সে জন্যে পয়সা খরচ করতে হয় না?

—ভাত খাই ঠাকুর, কিন্তু এক-একদিন খাইও না।

—কেন?

—স্বামী হলো রুগী, এক বছর হলো বিছানা নিয়েছে। বাড়িওয়ালা এখনও দয়া করে ঘরে থাকতে দিচ্ছে। আর পাড়ার কেষ্টবাবু দয়া করে বাড়ি থেকে ভাত পাঠিয়ে দেন বলেই....।

—তাহলে তো চলেই যাচ্ছে।

—হ্যাঁ, বেঁচে আছি ঠিকই।

—তবে আর দুঃখ কিসের?

কেঁদে ফেলে সত্যবাবুর বউ—কিন্তু আমার ছেলেটা কি বাঁচবে ঠাকুর?

—কি হয়েছে ছেলের?

—কে জানে কি হয়েছে? গায়ে জ্বর, এই তিন মাসের মধ্যে ছেলে আমার একটা জিরজিরে কাঠি হয়ে গিয়েছে ঠাকুর। কি উপায় হবে ঠাকুর?

—ভগবানকে বলো।

—আপনি তো ভগবান। তাই তো আপনাকে বলছি।

—কে বললে, আমি ভগবান?

—কেউ বলেনি, আমার মন বলছে। আমি স্বপ্ন দেখেছি ঠাকুর।

হেসে ফেলেন সাধু রামানন্দ।

সত্যবাবুর বউ বলেন—ওরা কেউ আপনাকে চিনতে পারেনি; মনে করেছে, আপনি একজন মস্ত সাধু। কিন্তু আপনি যে সাক্ষাৎ ভগবান। আমি বুঝেছি, আমি চিনেছি, আপনি আর আমাকে ছলনা করবেন না ঠাকুর।

সাধু রামানন্দের পায়ের কাছে চকচকে সিমেন্টের মেজের উপর মাথা লুটিয়ে দিয়ে কাঁদতে থাকে সত্যবাবুর বউ।

সাধু রামানন্দ—কিন্তু তুমি কি চাও, সেটা তো বুঝতে পারছি না।

সত্যবাবুর বউ—আপনি একবার নিজে গিয়ে আমার ছেলের কপালে আপনার পা ঠেকিয়ে আসবেন। আমি স্বপ্ন দেখেছি ঠাকুর, তাহলেই আমার ছেলের রোগ সেরে যাবে।

—ছেলেকে নিয়ে এস তবে।

—নিয়ে আসা সম্ভব নয়, ঠাকুর। ওকে একটু নাড়া দিলেই ওর প্রাণটা বের হয়ে যাবে বলে ভয় হয়। ছেলে আমার এক মাস হলো একটু কাত হতেও পারে না, ঠাকুর।

সাধু রামানন্দের চোখ দুটো তীব্র হয়ে জ্বলতে থাকে। —আমি তোমার মর-মর ছেলের মাথায় পা ঠেকিয়ে দেবার পরেও যদি তোমার ছেলে ভাল না হয়, যদি তোমার ছেলে....।

—কি বলছেন ঠাকুর?

যেন হিংস্র হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন সাধু রামানন্দ—যদি তোমার ছেলে মরে যায়? তবে?

—তবে জানবো, আপনার তাই ইচ্ছে।

—আমার ইচ্ছে?

—হ্যাঁ, ভগবান যা ইচ্ছে করবেন, তাই তো হবে। তাই তো মেনে নিতে হবে।

কী অদ্ভুত শান্ত নম্র আর অবিচল বিশ্বাসের এক নারী কথা বলছে।

সাধু রামানন্দ এই ক' বছরের সাধুত্বের জীবনে কত শত ভক্ত ও ভক্তার বিশ্বাসের কথা শুনেছেন। কিন্তু এমন বিশ্বাসের কথা শোনেননি। ছেলে যদি মরে যায়, তবুও সাধু রামানন্দকে সাক্ষাৎ ভগবান বলে মনে করে রাখবে, এ কী ভয়ানক বিশ্বাস।

সত্যিই যে ভগবান হতে ইচ্ছে করে। অন্তত একদিনের জন্য ভগবান হয়ে এই

মহিলার মর-মর ছেলের মাথায় পা ঠেকিয়ে দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তুলতে ইচ্ছে করে। চেঁচিয়ে ওঠেন সাধু রামানন্দ—তুমি যাও।

—আমার কি উপায় হবে ঠাকুর?

—তুমি যাও। কোন কথা বলো না। তুমি আর এখানে এস না।

—ভগবান। সাধু রামানন্দের কাছে মাথাটা নুইয়ে দিয়ে তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যায় সত্যবাবুর বউ।

তিন

সন্ধ্যা হয়েছে। সাধু রামানন্দের চোখে আজ ধ্যান নেই। ঘরের ভিতরে কোন ভক্তও নেই।

আজ সকাল থেকে একটিও ভক্তের আগমন হয়নি। কাল মাত্র তিনজন এসেছিল। সাধু রামানন্দের আত্মাও যেন সতর্ক হয়ে উঠেছে। লক্ষণ ভাল নয়।

শুধু কাল নয়, গত দশ দিন ধরে ভক্তের আগমন ক্রমেই বিরল হয়ে এসেছে। বুঝতে অসুবিধে নেই। ভক্তদের বিশ্বাসের জোয়ারে ভাঁটা পড়েছে। শ্যামলাল সেই মামলাতে জয়ী হতে পারেনি। আশীর্বাদী ফুল নিয়ে গেল যারা, তাদের একজনেরও চাকরি হয়নি। মুন্সীবাবুর জামাই শেষ পর্যন্ত মারা গিয়েছে, সাধু রামানন্দের আশীর্বাদী ফুলে কাজ হয়নি।

চাকর কৈলাসের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে সব খবর জানতে পেরেছেন সাধু রামানন্দ। কোন সন্দেহ নেই, এখানে আর পসার জমতে পারবে না। ঠিক সময়েই সরে যাওয়া নিয়ম। এইরকমই সময় বুঝে কানপুর থেকে সরে এখানে চলে এসেছিলেন সাধু রামানন্দ।

আজই, এই কিছুক্ষণ আগে ঝোলার ভিতর থেকে সব টাকা-পয়সা বের করে আর গুনে নিয়ে সেই সঞ্চয় একটা পুঁটলি করে বেঁধে আবার ঝোলার ভেতরে রেখে দিয়েছেন সাধু রামানন্দ। কিন্তু আজই সরে পড়বার ইচ্ছে ছিল না।

কিন্তু না, আর দেরি করলে নিদারুণ ভুল করা হবে। ঐ যে, আজই বিকেলে এক ভদ্রলোক বাগানের ঐখানে দাঁড়িয়ে সাধু রামানন্দের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, কে সেই ভদ্রলোক? তাকে যে পাঁচ বছর আগে কলকাতার লালবাজার থানার সেই ঘরে একদিন দেখেছিলেন সাধু রামানন্দ। কী আশ্চর্য, সেই শিকারীর সন্ধান আজও ফুরোয়নি। আজও সেই হাতকড়ার প্রতিনিধি পৃথিবীর সব অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে এক তহবিল-তছরুপ মামলার আসামীকে ধরবার জন্য ছুটোছুটি করছে। না, এক্ষুনি সরে পড়া চাই। কিন্তু...।

কোথায় যেন একটা বাধা। মনে হয়, ফটকের কাছে কলকাতার লালবাজারের সেই সাংঘাতিক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। হয়তো, তাঁর জামার বুকপকেটে ফেরারী আসামীর ফটোটা আছে। সাধু রামানন্দকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে আর এই লম্বা

চুলের ঝুঁটি কেটে দিলে যে চেহারাটা বেরিয়ে পড়বে, সে চেহারার সঙ্গে ঐ ফটোর চেহারার যে কোন অমিল দেখতে পাওয়া যাবে না।

না, ফটক দিয়ে বের হয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। তাছাড়া দারোয়ানও তো আশ্চর্য হয়ে বাধা দিতে পারে; এ কি, না বলে কয়ে বাবুকে কিছুই না জানিয়ে, এই সন্ধ্যার অন্ধকারে আপনি ঝোলাঝুলি নিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছেন সাধুজী?

কিন্তু ও বাধার জন্য চিন্তা কিসের? ফটক দিয়ে বের হয়ে যাবার দরকার কি? এই তো পাঁচিলের কাছে একটা পেয়ারাগাছ আছে। গাছের গা বেয়ে পাঁচিলের উপর চড়ে তারপরই টুপ করে একটি লাফ দিয়ে পিছনের গলিটাতে নেমে পড়তে পারা যায়। তারপর....তারপর আর কে আটকাবে সাধু রামানন্দকে? ট্রেনে না উঠে, নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে আর সারা রাত হেঁটে অনেক দূরে এক গাঁয়ের জমিদারবাড়িতে গিয়ে আস্তানা নিতে পারা যাবে।

ওটা বাধা নয়। তবে কিসের বাধা?

কৈলাস চাকরটার কাছ থেকে একটা ঠিকানা না নিয়ে সরে পড়তে পারছেন না সাধু রামানন্দ। সেই মহিলা, সেই সত্যবাবুর বউ—কোথায় থাকে সে? কতদূর? রাস্তাটার নাম কি?

কৈলাস এসেছে। কৈলাসের হাতে একটা বালতি। বোধহয় স্নানের জল তুলে দিয়ে যাবে কৈলাস।

সাধু রামানন্দ জিজ্ঞাসা করেন—ঐ যে আসতো এক মহিলা, সত্যবাবুর বউ, সে কোথায় থাকে বলতে পার?

কৈলাস—হ্যাঁ, কদমকুয়ার শিবমন্দিরের পাশে একটা গলিতে সত্যবাবুর বাড়ি।

জল তুলতে চলে যায় কৈলাস। আর, ছটফট করতে থাকেন সাধু রামানন্দ। যেন ভয়ঙ্কর একটা শখের জ্বালা সাধু রামানন্দের বুকের ভিতরে ছটফট করছে। সত্যিই ভগবান হতে ইচ্ছে করছে।

ধরা তো পড়তেই হবে একদিন। তাছাড়া, না ধরা পড়লেই বা কি। চিরকাল এই পৃথিবীর আনাচে-কানাচে শুধু সাধু রামানন্দ হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। ভগবান হবার সুখ কোনদিন কপালে জুটবে কিনা সন্দেহ।

স্নানের জল নিয়ে চলে গেল কৈলাস। আর এক মুহূর্তও দেরি করেন না সাধু রামানন্দ। ঝোলাটা হাতে নিয়ে, পেয়ারাগাছে চড়ে আর পাঁচিল টপকে গলির অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যান।

চার

—ঠাকুর। এসেছেন ঠাকুর! ভগবান তোমার এত দয়া। চেঁচিয়ে ওঠেন সত্যবাবুর বউ।

—কোন চিন্তা করো না। আমি আছি। শান্ত কোমল সান্ত্বনার স্বরে কথা বলেন সাধু রামানন্দ।

বিছানার উপর শুয়ে আছে, ধুকধুক করছে একটা শিশুর এইটুকু একটা বুক। হাত-পা সত্যিই যে জিরজিরে চারটি কাঠি। শুধু মুখটা একটু জীবন্ত। আর মুখটাও যে বড় চমৎকার। শিশুটার মাথায় রেশমের মত নরম ঝাঁকড়া চুল ফুরফুর করে উড়ছে, জানালা দিয়ে ফুরফুর করে বাতাস ঘরে ঢুকছে, তাই।

চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ে আছে ছেলেটা। সাধু রামানন্দ জিজ্ঞেস করেন--ঘুমিয়েছে বোধহয়?

—না ঠাকুর; বেহুঁস হয়ে আছে।

—কোন ভয় নেই। ভাল হয়ে যাবে।

—আপনি ওর মাথায় একবার পা ঠেকিয়ে দিন ঠাকুর।

বিছানার কাছে এগিয়ে যান সাধু রামানন্দ। ছেলেটার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন।

—দয়া করুন ঠাকুর। করুণ স্বরে মিনতি করে সত্যবাবুর বউ।

ছেলেটার ছোট্ট ছোট্ট পা দুটোকে আস্তে আস্তে হাতের উপর তুলে নিয়ে, তারপর সেই ছোট্ট পা দুটোর উপর ঝুঁটিওয়ালা মাথা ঘষে দিয়ে হাউ-হাউ করে কেঁদে ওঠেন সাধু রামানন্দ—হ্যাঁ, দয়া করো! দয়া করো ভগবান।

তারপরেই ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ান সাধু রামানন্দ। হেসে ফেলেন। —ব্যস্ এবার আমি যাই।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যান সাধু রামানন্দ। তারপরেই হাতের ঝোলাটাকে ঝুপ করে মেজের উপর ফেলে দিয়ে সাধু রামানন্দ বলেন—এর মধ্যে অনেক টাকা আছে। আজ এখনই সব চেয়ে বড় ডাক্তারকে ডেকে এনে ছেলেকে দেখাও। ভাল-ভাল ওষুধ খাওয়াও। ভাল করে চিকিৎসা করাও।

আর কোন কথা না বলে দরজার দিকে এগিয়ে যান সাধু রামানন্দ।

পাশের ঘরে অন্ধকারটার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন সত্যবাবুর বউ—ওগো, তুমিও একবার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ; ঠাকুর যে চলে যাচ্ছেন।

পাশের ঘরের অন্ধকারটা যেন ব্যাকুল হয়ে বলে ওঠে, দেখলাম! দেখলাম!

হেসে ওঠেন সাধু রামানন্দ—আমি চলি।

দরজার কাছে ঢিপ করে মাথা ঠুকে কেঁদে ফেলে সত্যবাবুর বউ—ভগবান। ভগবান।

মনভ্রমরা

মনভ্রমরা অর্থ মন নয়, ভ্রমরাও নয়। দেখতে বেশ সুন্দর যে-মেয়ে যখন-তখন গুনগুন্ করে গান করে, তাকে বলে মনভ্রমরা।

সেদিন কথাটার অর্থ আমরা এইরকম বুঝেছিলাম, কারণ এইরকমই বুঝতে

শিখেছিলাম। কিন্তু শিখিয়েছিলেন যাঁরা, সেই সতুদা, হীরুদা আর কানুদারাও বোধহয় কথাটার অর্থ আজ একেবারে ভুলে গিয়েছেন।

সেই অর্থটা ভুলে গেলেও সেই কথাটা কি তাঁরা ভুলে যেতে পেরেছেন? সেই মনভ্রমরার কথা?

আমার তো মনে হয়, মনে করিয়ে দিলে সতুদা নিশ্চয় এখনো মনে করতে পারবেন। কানুদা আর হীরুদাও নিশ্চয় আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে স্বীকার করবেন, হ্যাঁ, এখনো তাঁদের মনে আছে সেই কথা। মনে করিয়ে দিলে মনে পড়ে বৈকি। ওঃ, সে কত দিন আগেকার কথা।

অনেকদিন আগেকার কথা বটে। সেদিন আর আজ, মাঝখানে প্রায় পঞ্চাশ বছর সময়ের ব্যবধান। আমারই মাথা আজ সাদা হয়ে গিয়েছে, আর সতুদা, হীরুদা ও কানুদার মাথার অবস্থা যা হয়েছে তা তো বোঝাই যায়।

সেদিন ঐ কথাটার অর্থ যা বুঝেছিলাম, তা তো বুঝেই ছিলাম। কিন্তু যেটুকু স্পষ্ট করে সেদিন বুঝতে পারিনি, আজ মনে হয়, সেটুকু যেন স্পষ্ট বুঝতে পারছি। মনভ্রমরার অর্থ মনই বটে, তবে সে মন হলো চৈত্র মাসের ভ্রমরার মতো, ভালবাসে ফুলের গন্ধ, রঙের ফুল নয়। রঙ দেখে গুনগুনিয়ে গান হয়তো করে, কিন্তু গন্ধের কাছে ছুটে যাবার জন্য গুনগুনিয়ে কাঁদে।

সতুদা সম্প্রতি মেধাতিথির মনু-টীকার এক দার্শনিক টীকা রচনা করেছেন। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে তাঁকে, কি বলে আপনার দার্শনিক মন? আমার এই কাব্যিক ব্যাখ্যাটা কি ঠিক নয়?

যাক গিয়ে এসব তত্ত্বের কথা। আজ সতুদার সঙ্গে দেখা হলে কোনরকম তত্ত্বের নাম করেও তাঁদের অতীতকালের কোন ছেলেমানুষী বাচালতার কথা তুলতে পারব না বোধহয়, তোলা উচিতও নয়। সেদিনের সেই ঘটনার অর্থ বুঝবার জন্য সতুদার মনে আজ আর কোন পুরানো অথবা নতুন দুশ্চিন্তা আছে বলেও মনে হয় না। কিন্তু আজকের এই মেধাতিথি সতুদার সেই ছেলেবয়সের মুখ থেকেই তো আমরা ঐ কথাটা প্রথম শুনেছিলাম। আর, সতুদাদের কথা থেকেই সেদিন আমরা বুঝেছিলাম যে, দেখতে বেশ সুন্দর যে-মেয়ে যখন-তখন গুন্‌গুন্ করে গান করে, তাকে বলে মনভ্রমরা।

সতুদারা ছিলেন দাদাদের দল, আর আমি ভুতো ও বলাই ছিলাম ভাইদের দলে। আমাদের চেয়ে বয়সে ওঁরা ছিলেন পাঁচ-বছরের বড়। আমাদের বয়স তখন দশের উপর, আর ওঁদের বয়স তখন পনের'র উপর। তখন শুধু বেবিরা পড়ত ছোট স্কুলে। আমরা তখন মিডল স্কুল ছেড়ে সবেমাত্র হাইস্কুলে ঢুকেছি, আর সতুদারা হাইস্কুল ছেড়ে সবেমাত্র কলেজে ঢুকেছেন। কাজেই সতুদা যখন তাঁর দলবল নিয়ে তাঁদের বাড়ির বাইরের ঘরে ক্যারম খেলতেন, তখন আমরা শুধু বাইরের থেকে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখতাম। বড়দের আড্ডার কাছে থাকা দূরে

থাকুক, কাছাকাছি থাকারও অধিকার আমাদের ছিল না। জানালা দিয়ে খুব সাবধানে আর খুব নিঃশব্দে উঁকিঝুঁকি দিতে হতো। দেখতে পেলেই তেড়ে আসতেন সতুদা— ভাগ ভাগ ডেঁপোর দল। ঠ্যাং ভেঙ্গে দেব, যদি দেখি আবার কখনো বড়দের আড্ডার কাছে গা ঘেঁষতে এসেছ।

তখনকার মতো ভেগে পড়লেও আবার ফিরে আসতাম, সেদিন না হোক আর একদিন, ঠিক সেই জানালার কাছেই দাঁড়াতাম, আর সতুদাদের ক্যারম খেলা দেখতাম।

এইভাবেই একদিন শুনলাম—ক্যারম খেলার খুটুস-খুটুস হঠাৎ থামিয়ে সতুদা যেন নিজের মনেই বলে উঠলেন—আজও শুনলি তো হীরু?

হীরুদা হাত গুটিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করেন —কি?

সতুদা—মনভ্রমরা গুন্‌গুন্ করে গান করছিল।

হীরুদা বলেন—শুনেছি, এই নিয়ে দশবার শুনলাম।

কানুদা বিস্মিত হয়ে বলেন—এর মানে কিছু বুঝতে পারছিস?

সতুদা বলেন—কিছু একটা ব্যাপার আছে, নিশ্চয়ই আছে।

জানালার দিকে হঠাৎ সতুদা তাকিয়ে ফেললেন, সঙ্গে সঙ্গে এক লাফ দিয়ে উঠে এসে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললেন ভুতোর ডান হাতের কবজি। বললেন—কি রে বখাটে, এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস?

ভুতো আর্তনাদ করে—আপনাদের খেলা শুনছি সতুদা।

গর্জন করলেন সতুদা—খেলা শুনছিস? কি শুনছিস বল?

করুণ মুখ করে ভুতো বলে—খেলা দেখছিলাম সতুদা, কিন্তু শুনতে পাইনি।

হীরুদা উঠে এসে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে থাকেন। প্রশ্ন করেন—সত্যিই কিছু শুনতে পাসনি তো?

ভুতো বলে এবং আমরাও বলি—কিচ্ছু না হীরুদা।

ভুতোকে ছেড়ে দিলেন সতুদা এবং তখনকার মতে আমরাও জানালা'র কাছ থেকে সরে গেলাম। কিন্তু সেদিন যে কথাগুলি ওদের মুখে প্রথম শুনলাম, ঠিক সেই কথাগুলিই আরও কয়েকবার ঠিক এভাবে নিঃশব্দে সতুদাদের ক্যারম খেলার ঘরে ঐ জানালার কাছেই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে শুনতে পেলাম এবং আমাদেরও আর বুঝতে বাকি রইল না যে ছোট স্কুলের দিদিমণি সুধাদিই হলেন মনভ্রমরা।

কথাটা শুনে আমরা কিন্তু মনে মনে সতুদাদের উপর রাগই করেছিলাম। সুধাদি গুন্‌গুন্ করে গান করেন তো তোমাদের তাতে কি? গুরুজনের সম্পর্কে মনে কোন মান্যি নেই, যা-তা একটা নাম তৈরি করে দিলেই হলো।

ভুতো বলে—সুধাদি তো সতুদাদের গুরুজন নয়।

বলাই বলে—নিশ্চয় গুরুজন। সুধাদি সতুদাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়।

ভুতো বলে—সতুদারা তো আর সুধাদির কাছে পড়েননি। সুধাদি আসবার আগেই ওরা হাইস্কুলে চলে গিয়েছিল। ওরা আমাদের চেয়ে অনেক সিনিয়র।

কথাটা ঠিকই বলেছে ভুতো। আমরা পড়েছি সুধাদির কাছে, কাজেই সুধাদির জন্য আমাদের মনে যে মায়া আছে, সে মায়া সতুদাদের সিনিয়র-মনে থাকবে কেন? মিডল স্কুলে যাবার আগে ছোট স্কুলের শেষ বছরটা আমরা সুধাদির কাছেই পড়েছিলাম। সুধাদির সঙ্গে এখনো যে আমাদের কত ভাব আছে, তার কোন খবরই জানেন না ক্যারম-মার্কা সতুদা, হীরুদা আর কানুদা। বিকাল বেলা ওরা যখন বড় মাঠে হকি খেলে হাঁপায়, তখন আমরা সুধাদির সঙ্গে ছুটোছুটি করে ছোট স্কুলের মাঠে কাঠবিড়ালী ধরবার চেষ্টা করি। হকি খেলার শেষে ওরা যখন পয়সা খরচ করে মালাই বরফ কেনে আর খায়, আমরা তখন সুধাদির কাছ থেকে কুচো নিমকি নিই আর খাই। রবিবারের সকালে ওরা যখন মাঠের উপরে সাইকেল রেস খেলে, আমরা তখন ছোট স্কুলের পাঁচিলের উপর চুপ করে বসে থাকি।

সে রবিবারের সকালবেলা ছোট স্কুলের পাঁচিলের উপর বসেছিলাম আমরা। রেস খেলার শেষে ছোট স্কুলের এই পাঁচিলের কাছ দিয়েই সতুদারা সাইকেল ছুটিয়ে চলে যাবার সময় আমাদের দিকে কটমট করে একবার তাকালেন। প্রশ্ন করেন সতুদা—তোরা এই সকালবেলাটা এই পাঁচিলের ওপর এরকম করে বসে রয়েছিস কেন?

আমাদের মধ্যে ভুতোরই সাহস সবচেয়ে বেশি। সতুদার প্রশ্নে বেশ একটু তাচ্ছিল্যের স্বরেই ভুতো জবাব দেয়—এই রকম করেই তো বসে থাকতে হয়।

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক দাবিয়ে সাইকেল থামালেন সতুদা। সতুদার চোখ দুটো আরও কটমট করে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন—না, এই রকম বাঁদরের মতো দল বেঁধে বসে থাকতে হয় না।

একটা ঢোঁক গিলে চুপ করে রইল ভুতো। আমাদের সব কথার সাহস সতুদার ঐ একটি ধমকেই ফুরিয়ে গেল। সতুদাও তাঁর চোখের কটমটানি একটু শান্ত করে নিয়ে সাইকেলের প্যাডেলে ঠেলা দিলেন। হেলেদুলে, আস্তে আস্তে তাঁর রেস-ক্লান্ত সাইকেল চালিয়ে চলে গেলেন, আমরাও হাঁপ ছাড়লাম।

সতুদারা সত্যিই জানেন না, কেন আমরা সকালবেলাটা ছোট স্কুলের পাঁচিলের উপর চুপ করে বসে আছি, তাই ওরকম একটা গালি দিয়ে চলে গেলেন। আমাদেরও একটা খেলা আছে, যার জন্য এইভাবে অনেকক্ষণ ধৈর্য্য ধরে এই পাঁচিলের উপর বসে থাকতে হয়। তাকিয়ে থাকতে হয় বড় মাঠের এদিকে ওদিকে, অনেক দূরের দিকেও। এ খেলা শেষ হবার পর আমরাও মালাই বরফ কিনি আর খাই, কারণ এ খেলার পর আমাদের পকেটে কিছু পয়সাও আসে—কোনদিন তিন আনা, মাঝে মাঝে দু'আনা, আর বেশির ভাগ দিনই এক আনা।

মিডল স্কুলে গিয়েও যে ছোট স্কুলের এই পাঁচিলটার মায়া আমরা ছাড়তে পারিনি,

তার কারণ হলো এই বিশেষ খেলাটা। সতুদাদের মতো সিনিয়রেরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবেন না যে, এই রকমের একটা খেলা করা যায়, আর সে খেলায় আবার পয়সা হয়।

জানেন সুধাদি। সতুদারা জানেন না যে, মনভ্রমরা বলে যাকে তারা ঠাট্টা করেন, সেই সুধাদির জন্যই আমরা এখন এই পাঁচিলের উপর চুপ করে বসে অপেক্ষা করছি। আমাদের খেলার সব খবর জানেন সুধাদি। তিনিই তো আমাদের রবিবারের সকালবেলার এই খেলা দেখতে দেখতে হেসে গড়িয়ে পড়েন। হাততালি দেন এবং তাঁর ঐ হাসি আর হাততালির জন্য আমাদের সাহস আর উৎসাহ কখনো ক্ষান্ত হয় না। সুধাদি এলেই আমরা বড় মাঠে নেমে পড়ব, আর খেলা শুরু হয়ে যাবে। মাঠের দিকে তাকিয়ে আজ আবার অনেকদিন পরে আমাদের বহুদিনের লক্ষ্য ও লোভনীয় সেই বুড়োকে দেখতে পেয়েছি।

বুড়োর সামনের পা দুটো দড়ি দিয়ে বাঁধা, পিছনের পা দুটো স্বাধীন। মনের সুখে ঘাড়ের ঝাঁকড়া রোঁয়া দুলিয়ে মাঠের নতুন দূর্বা খাচ্ছে বুড়ো। বুড়োর কানের কাছে একটা ফড়িং ফরফর করছে। তাই মাঝে মাছে ছটফট করে উঠছে বুড়ো। মাথা ঝেঁকে কান নেড়ে ফড়িং তারায় বুড়ো, তার পরেই কুঁড়ে ব্যাঙের মতো লাফ দিয়ে সরে যায়। আবার মনের সুখে দূর্বা খায় বুড়ো। প্রতিজ্ঞা করেছি আমরা, ঐ বুড়োকে আজ ধরতেই হবে। ধরতে যদি পারি, আর ঠেলেঠুলে কোনমতে কানি-হাউসে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারি, তবে আজ আমাদের রোজগার হবে তিনটি আনা। কম নয়—তিন আনাতে এবেলা আর ওবেলা, দু'বেলারই মালাই বরফ কেনা যায়।

কানি-হাউসে মানে মিউনিসিপ্যালিটির খোঁয়াড়, যার ইজারা নিয়েছে ছেদি মিঞা। ফোলা-ফোলা দুটো গোদা পা আর শুকনো ঝিরকূট শরীর, চোখে সুরমা দেয়, সেই ছেদি মিঞা। ছেদি মিঞার চোখ কানা নয়, তাই বুঝতে পারি না, এই খোঁয়াড়ের নাম কেন হলো কানি-হাউস?

বড় মাঠের চরন্ত জন্তুগুলিকে আমরা ধরতাম, আর কানি-হাউসে নিয়ে গিয়ে জমা দিতাম। এই ছিল আমাদের খেলা।

ছেদি মিঞা জিজ্ঞাসা করত—কোথায় পেলে এই জানোয়ার, কার কি ক্ষতি করেছে এই জানোয়ার?

ছেদি মিঞার প্রশ্নে ঘাবড়ে গিয়ে আমরা চুপ করে তাকিয়ে থাকতাম। বুকের ভিতরটা দুরদুর করত। ছেদি মিঞা মুখ ভেংচিয়ে হেসে হেসে ধমক দিত—স্কুলের ফুলগাছ খেয়ে একেবারে শেষ করে দিয়েছে এই জানোয়ার, তাই না?

আমরা বলতাম—হ্যাঁ, তাই তাই।

ছেদি মিঞা বলত—তাই বলতে হয়, বুঝলে?

জানোয়ার জমা করে নিত ছেদি মিঞা। কলম তুলে নিয়ে খরখর করে খাতার উপর কি-সব লিখত। তারপরেই পয়সা দিত। টাট্টু ঘোড়া হলে তিন আনা, গাধা হলে

দু'আনা আর ছাগল হলে এক আনা। আমরা দেখতাম, —ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে খোঁয়াড়ের মস্ত বড় কাঠের দরজাটা খুলে গেল, আর বিনা অপরাধের সেই জন্তুগুলি আমাদেরই মিথ্যা কথার চাতুরীতে অভিযুক্ত হয়ে হাজতী কয়েদীর মতো সেই খোঁয়াড়ের ভিতর অন্তর্হিত হলো।

সুধাদিকেই আমরা জিজ্ঞাসা করতাম—এ খেলায় পাপ হচ্ছে না তো সুধাদি?

সুধাদি বলতেন—হচ্ছে বৈকি।

ভয় পেয়ে আবার জিজ্ঞাসা করতাম—তাহলে এই পাপের কি উপায় হবে সুধাদি?

হেসে ফেলতেন সুধাদি। বলতেন—উপায় তো আমিই আছি।

—তার মানে?

প্রথম প্রথম বুঝতে না পারলেও পরে সবই জেনেছিলাম আর বুঝেও ফেলেছিলাম। সুধাদির কাছেই এসেছিল লছমনের মা, এসেছিল রজ্জাক ধুপী—যার ছাগল আর যার গাধা আমরা খোঁয়াড়ে জমা দিয়ে এক-আনা আর দু'আনা রোজগার করেছিলাম, তাদেরই হাতে দু'আনা আর চার আনা পয়সা দিয়ে সুধাদি আমাদের পাপ কাটিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ পয়সা দিয়ে তাদের ছাগল আর গাধা খোঁয়াড় থেকে ছাড়িয়ে এনেছিল লছমনের মা আর রজ্জাক ধুপী। সুধাদি সত্যিই সুধাদি। তারপর থেকে পাপের ভয় ছেড়ে দিয়েই আমরা ঐ খেলা খেলতাম, কারণ পাপ কাটাবার উপায় ছিলেন সুধাদি।

পাঁচিলের উপর বেশিক্ষণ বসে থাকতে হয়নি। এলেন সুধাদি, জিজ্ঞাসা করলেন—কি ব্যাপার?

—ব্যাপার খুব ভাল সুধাদি। হরিদা'র বুড়োকে আজ আবার হাতের কাছে পাওয়া গিয়েছে।

হরিদা'র টাট্টু ঘোড়া। তারই নাম বুড়ো। অনেকদিন অনেক চেষ্টা করেছি বুড়োকে ধরবার জন্য। কিন্তু বুদ্ধিতে কি ভয়ানক ঝানু ঐ বুড়ো টাট্টুটা। যেন আমাদের ছায়ার শব্দও শুনতে পায় বুড়ো। কতবার চারিদিকে থেকে ঘিরে ধরেছি বুড়োকে, কিন্তু প্রত্যেকবার ঐ বাঁধা-পা নিয়েই মুহূর্তের মধ্যে তিন লাফে যেন বাতাসে ঘাই মেরে পালিয়ে গিয়েছে বুড়ো। আমাদের সব ধৈর্য্য সতর্কতা ও পরিশ্রম ব্যর্থ হয়েছে।

মাঠের উপর নিশ্চিন্ত মনে চরন্ত টাট্টু ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলেন সুধাদি। বললেন—আজ কিন্তু যেমন করেই হোক্ ধরা চাই হরিদা'র ঐ বুড়োকে। পারবে তো?

আমরাও বললাম—পারতে হবেই সুধাদি। আজ আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি।

অনেক হাসলেন সুধাদি, অনেক হাততালি দিলেন, আর আমরা অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু হরিদা'র বুড়োকে ধরতে পারা গেল না। সেই রকমই তিন লাফে ঘাই মেরে পালিয়ে গেল বুড়ো। মাঠ পার হয়ে সড়কের উপর উঠে আর ঘাড়ের রোঁয়া

ঝাঁকিয়ে পিছনের মাঠের দিকে তাকিয়ে রইল। না, আজ আর কোন চান্স পাওয়া যাবে না।

সুধাদি বললেন—ছি ছি, হরিদা'র বুড়োর কাছে আবার হেরে গেলে?

একে তো হাঁপাচ্ছিলাম, তার উপর আবার ছি ছি করলেন সুধাদি। বড় বেশি দমে গেলাম। তবু বললাম—আর একদিন চান্স পাওয়া যাবেই সুধাদি।

সুধাদি নিজেই তখনি আবার নতুন উৎসাহে হেসে উঠলেন। বললেন—আবার চান্স পাওয়া যাবেই। আর হরিদাকে জব্দ করতে হবেই।

হ্যাঁ, হরিদাকে জব্দ করতেই হবে। এ শহরের সবাই হরিদাকে জব্দ করে আনন্দ পায়, শুধু আমরাই আজ পর্যন্ত সে আনন্দ পাইনি। শুধু তিন আনা পয়সার লোভ নয়, বুড়োকে ধরবার জন্য আমাদের এই আগ্রহের মধ্যে আর একটা জিনিস আছে, হরিদাকে জব্দ করার প্রতিজ্ঞা।

হরিদাকে সতুদারা বলেন, জল গিলপিন হরি। মাথার উপর মস্ত বড় এক শোলার হ্যাট চাপিয়ে আর মালকোঁচা মেরে এই টাট্টু বুড়োর পিঠের উপর সওয়ার হন হরিদা। টাট্টুর পিঠের এক পাশে ঝুলতে থাকে চটে জড়ানো একটা ওষুধের বাক্স, আর অপর পাশে হরিদা'র কম্বল-জড়ানো বিছানা ও একটা ঘটি। শহরের বুকের উপর দিয়ে এইভাবেই সড়কের যত কুকুরকে রাগাতে রাগাতে শহরের বাইরের অনেক দূরের গাঁয়ে ডাক্তারি করতে চলে যান হরিদা, ফেরেন একদিন দু'দিন বা এক সপ্তাহ পরে।

হরিদাকে জব্দ করার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারব তো? ক্লান্ত হয়ে পাঁচিলের গায়ে হেলান দিয়ে ঘাসের উপর বসে আমরা এই কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবতে দিলেন না সুধাদি, বললেন—চলো বেড়িয়ে আসি।

বলেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন সুধাদি। কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তারপরেই বললেন—নাঃ থাক্‌গে।

আমরা জানতাম, এই কথাই বলবেন সুধাদি। সেই যে কবে বাসন্তী পূজার দিনে আমাদের সঙ্গে একবার বেড়াতে বের হয়েছিলেন সুধাদি, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আর কোনদিনই বের হলেন না।

সেই বাসন্তী পূজার দিন বড় সড়ক ধরে হাঁটতে হাঁটতে সুধাদির সঙ্গে আমরা ঐ পলাশতলা পর্যন্ত গিয়েছিলাম। বড় সুন্দর সাজ করেছিলেন সুধাদি। একে তো দেখতে সুন্দর, এ শহরের সব মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুন্দর সুধাদি, তার উপর অমন সুন্দর একখানা চাঁপা রঙের শাড়ি পরে কি সুন্দরই না যে সেদিন হয়ে উঠেছিলেন, সেটা আমরা পথে বের হয়েই বুঝতে পেরেছিলাম।

হীরুদাদের বাড়িব জানালায় দাঁড়িয়ে অমন স্টাইলের পুঁটিদিও গম্ভীর হয়ে, বোধহয় একটু রাগ করেই তাকিয়ে দেখছিলেন সুধাদিকে। কানুদাদের বাড়ির কাছে পৌঁছতেই দেখেছিলাম, চারুমাসী পর্যন্ত ঘরের ভিতর থেকে ছুটে এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন, আর

হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। সবচেয়ে বেশি গর্ব আমাদের। আমরাই প্রত্যেক বাড়ির বারান্দা আর জানালার দিকে তাকিয়ে শহরের যত দিদি মাসী আর খুড়িমাদের লক্ষ্য করে সুধাদির পরিচয় শুনিয়ে যাচ্ছিলাম—সুধাদি, বেবিদের ছোট স্কুলের দিদিমণি সুধাদি।

পলাশতলার কাছে পৌঁছতেই দেখেছিলাম, শান্তিদা বসে বসে একমনে ছবি আঁকছেন। হঠাৎ হাতের তুলি থামিয়ে সুধাদির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন শান্তিদা। শান্তিদার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলেন সুধাদি। দেখলাম, যেন হঠাৎ পলাশ ফুলের রঙ ছড়িয়ে পড়েছে সুধাদির মুখের উপর। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন সুধাদি। ভুতোর কাঁধে হাত রেখে ব্যস্তভাবে একটা ঠেলা দিয়ে বললেন—চলো, এখান থেকে চলো।

সেই যে চলে এলাম, তারপর আর কোনদিন সুধাদির সঙ্গে চলবার সুযোগ পাইনি। তাই আজ আবার বললাম—চলুন না সুধাদি।

সুধাদি বললেন—যাব কোথায় রে ভাই?

—চলুন না, সেদিনের মতো ঐ পলাশতলা পর্যন্ত গিয়ে...।

আমরা আর কথা শেষ করতে পারলাম না। ডাকপিওন এসে সুধাদির হাতে একটা খামের চিঠি দিয়ে চলে গেল। রঙিন খামের এক কোণে একটা ফোটা পলাশের ছবি।

যদিও সুধাদি কোনওদিন বলেননি, কিন্তু আমরা বুঝি, এই রঙিন চিঠি আসে ঐ পলাশতলা থেকেই। প্রায়ই আসে চিঠি। এবং আজ এক রকমের রঙিন খামের চিঠি এদিক থেকেও চলে যায় ঐ পলাশতলার দিকে।

সুধাদির অন্য সব চিঠি ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে আসে হয় স্কুলের মালী, না হয় আমি কিংবা ভুতো কিংবা বলাই। কিন্তু এই রঙিন চিঠি সুধাদি নিজের হাতে ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে আসে। বেশি দূরে নয় ডাকবাক্স। ছোট স্কুলের ফটক থেকে বড়জোর দশ গজ দূরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে লালরঙের ডাকবাক্স। ডাকবাক্সের ঠিক অপর দিকে রাস্তার ওপাশে এক সারি দোকান ঘরের মধ্যে একটি ঘর হলো জল গিলপিন হরিদা'র। হরিদা'র ঘরের জানালার কাছে একটা পেয়ারা গাছ। সেই পেয়ারা গাছের সঙ্গে বাঁধা থাকে হরিদা'র প্রিয় টাট্টু অর্থাৎ বুড়ো।

বুঝতে পারি, পলাশতলার দিকে বেড়াতে যাবার আর কোন দরকার নেই সুধাদির। শান্তিদার রঙিন চিঠির ভিতর দিয়ে পলাশতলাই এখানে আসে। সুধাদিরও যত চাঁপা রঙের কথা এখান থেকে রঙিন চিঠির ভিতর দিয়েই পলাশতলায় পৌঁছে যায়।

আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে চিঠি পড়লেন সুধাদি। পড়া শেষ করে নিজের মনেই গুন্‌গুন্ করে বলে উঠলেন—পলাশের স্বপ্ন কি বৃথা হবে? চম্পার ঘুম কি ভাঙবে?

ভুতো জিজ্ঞাসা করে —কি বলছেন সুধাদি?

সুধাদি বলেন—কিছু না। আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।

আমি ও বলাই একসঙ্গে বলি—বলুন।

—টাউন ক্লাবের লাইব্রেরী থেকে কয়েকটা কবিতার বই আমার জন্য এনে দিতে হবে। পারবে তো?

বললাম—নিশ্চয়ই পারব।

রবিবারের সকাল শেষ হলো। আমরাও ছোট স্কুলের ফটক পার হয়ে বাড়ির দিকে চললাম। শুনতে পেলাম গুন্‌গুন্‌ করে গান করছেন সুধাদি।

সেদিন সন্ধ্যায় সতুদাদের ক্যারম-খেলার ঘরে উঁকি দিতে এসে আমি, ভুতো আর বলাই শুনতে পেলাম, সতুদা বলছেন—আজও আবার শুনলি তো হীরু?

হীরুদা বললেন—কি?

সতুদা—মনভ্রমরা গুন্‌গুন্‌ করে গান করছিল।

হীরুদা বলেন—হ্যাঁ শুনেছি, এই নিয়ে এগার বার হলো।

কানুদা বলেন—সত্যিই কি যেন হয়েছে মনভ্রমরার, কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

অনেকগুলি রবিবারের সকাল পার হয়ে গেল, তবু হরিদা'র বুড়োকে ধরবার সুযোগ পেলাম না। বুড়োর পিঠের উপর জন গিলপিন হয়ে হরিদা ডাক্তারি করতে কখন যে চলে যান, আর কখন যে ফিরে আসেন, কিছুই জানতে পারছি না। ছোট স্কুলের ফটকে ঢুকবার আগে একবার হরিদা'র ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখি, ঘরের দরজার কড়ায় তালা ঝুলছে। হরিদা নেই, পেয়ারা গাছের তলায় বুড়োও নেই। নিরাশ হয়ে স্কুলের পাঁচিলের উপর গিয়ে বসি, বড় মাঠের দিকে তাকাই। দু'একটা টাট্টু আর ছাগলকে চরতেও দেখা যায়। কিন্তু এগুলিকে ধরতে মনের ভিতর থেকে আর খুব বিশেষ উৎসাহ পাই না। চেষ্টা করলে ওগুলিকে এখনি ধরতে পারি। কিন্তু তাতে দু'আনা একআনা হলেও এবং মালাই বরফে পেট ঠাণ্ডা হলেও হরিদা'র বুড়োকে না ধরা পর্যন্ত মন ঠাণ্ডা হবে না।

সবাই জব্দ করে যে হরিদাকে, সেই হরিদাকে জব্দ না করলে যে আমাদের মনের একটা প্রতিজ্ঞাও জব্দ হয়ে যায়। বার বার ছি ছি করবেন সুধাদি, এই গ্লানি বার বার সহ্য করাও যায় না।

এক সারি দোকান ঘরের মধ্যে ঐ ঘরটাতেই থাকেন হরিদা। পথ দিয়ে যাবার সময় কতবার দেখতে পেয়েছি, ঘরের ভিতর রান্না করছেন হরিদা, আর পেয়ারা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বিচালি চিবোচ্ছে আর কান নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছে বুড়ো।

হরিদা যে কি ধরনের মানুষ আর কি ধরনের ডাক্তারি করেন, তার বিশেষ কিছু খবর রাখি না আমরা। শহরের এতগুলি ভদ্রলোকের মধ্যে বোধহয় কেউ-ই সে খ রাখেন না। হরিদা'র মুখটা দেখতে বেশ, যদিও রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গি কুঁয়োতলার কাছে যখন আদুড় গায়ে স্নান করেন হরিদা, তখন কিছুক্ষণ তাকি

ইচ্ছে করে হরিদা'র চেহারাকে। হরিদাকে দেখতে অভিশাপে বনবাসী রাজপুত্তুরের মতোই মনে হয়, শুধু শরীরটা রোদে জলে খেটে খেটে একটু ময়লা হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু হরিদা নামে একটা মানুষ থাকে এই শহরে, এটা যেন স্বীকার করতে চায় না এই শহর। কোনদিন কোন বিয়ে বাড়ির নিমন্ত্রণে হরিদাকে দেখতে পাইনি। কোন উৎসবেই হরিদাকে নিমন্ত্রণ করবার কথা কখনো কোন ভদ্রলোকের মনেও পড়ে না। পথ দিয়ে যাবার সময় চারুমাসী যে-কোন ভদ্রলোককে দেখতে পেলেই কাপড় টেনে বড় করেন, কখনো বা ঘোমটা টানেন, কিন্তু একটু আশ্চর্য হয়েই দেখেছি, হরিদাকে দেখতে চারুমাসীর মাথার কাপড় নির্বিকার হয়েই থাকে। হাত দিয়ে মাথার কাপড়টা একটু স্পর্শ করবার চেষ্টাও করেন না চারুমাসী। সতুদাকে দেখেছি, সাইকেল থেকে নেমে এক লাফে হরিদা'র ঘরের দরজার কাছে এসে বলেন—দেশলাইটা একবার দাও তো জন গিলপিন। বয়সে এত বড় হরিদা, তবু তাঁরই কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে নিয়ে তাঁর সামনে সিগারেট ধরিয়ে নিতে সতুদার একটু বাধে না। পথ দিয়ে যেতে এস-ডি-ও বলেন—এই ইধার আও, গাড়ি ঠেল। সতুদাকে যেমন কোন কথা না বলে দেশলাই এগিয়ে দেন হরিদা, ঠিক তেমনি কোন কথা না বলে গাড়িও ঠেলে দিলেন। সামনের বাড়ির অক্ষয়বাবুর বাচ্চা ছেলেটা যখন না ঘুমিয়ে চেঁচাতে থাকে তখন অক্ষয়বাবুর স্ত্রী বাচ্চাকে শান্ত করার জন্য হরিদা'র ঘরের দিকে তাকিয়ে বেশ জোরে জোরে চেঁচিয়েই বলতে থাকেন—চুপ চুপ চুপ, বাঘে ধরেছে হরিকে, মস্ত বড় বাঘ। বড় বড় থাবা নিয়ে একেবারে মেরে ফেলেছে হরিকে। চুপ চুপ চুপ।

এই রকমেই তুচ্ছ হয়ে আছেন হরিদা। সম্ভ্রম দূরে থাক, হরিদার যেন অস্তিত্বও নেই। যেটুকু আছে সেটুকুও বাঘের মুখে ফেলে দিয়ে একেবারেই শেষ করে দিচ্ছেন অক্ষয়বাবুর স্ত্রী। কিন্তু সকলের কাছে এত জব্দ হয়েও হরিদা যেন প্রতিজ্ঞা করেছেন, আমাদের কাছে কখনই জব্দ হবেন না। হাতের কাছে পাচ্ছি না হরিদা'র বুড়োকে, আর দিনগুলি ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

সুধাদি পড়ছিলেন রঙিন চিঠি। আমরা এসে বললাম—আজ কোন চান্স পাওয়া যাবে না সুধাদি। হরিদা তাঁর বুড়োকে নিয়ে গাঁয়ের দিকে ডাক্তারি করতে চলে গিয়েছেন।

আমাদের কথাগুলি বোধহয় শুনতে পেলেন না সুধাদি। চিঠি পড়া শেষ হলেই নিজের মনে গুন্‌গুন্ করে বলে উঠলেন—সময় যেদিন আসিবে আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে....।

বুঝতেও পারলাম না কিচ্ছু। তবে এইটুকু বুঝলাম যে, সুধাদি ঐ রঙিন চিঠিরই কোন একটা কথাকেই গুন্‌গুনিয়ে বলছেন।

উঃ, এত চিঠিও আসে, আর চিঠিতে এত কথাও থাকে, আর পলাশতলার শান্তিদার মনে এত কথাও ছিল?

সুধাদির মনে ঐরকম আর কি-কথা ও আর কত কথা আছে জানি না। কিন্তু দেখছি তো, সুধাদিও সমানে চিঠি লিখছেন। কিরকম যেন মনে হয়, কিছুটা বুঝতেও পারি, তারপর আর কিছু বুঝতে পারি না।

আজ দেখলাম, সুধাদি আমাদের সামনে বসে চিঠি লিখলেন। আমরা যে কবিতার বইগুলি লাইব্রেরি থেকে এনে দিয়েছিলাম, তারই মধ্যে একটা বই তুলে নিয়ে একটা কবিতা বের করলেন সুধাদি। তারপরেই চিঠি লিখতে শুরু করলেন। দু'মিনিটের মধ্যেই চিঠি লেখা শেষ হয়ে গেল।

রঙিন খাম বন্ধ করে নিয়ে তারপর সুধাদি আমাদের দিকে তাকালেন। বললেন—পলাশতলার শান্তিদাকে তোমরা নিশ্চয়ই চেন?

আমরা বলি—খুব চিনি সুধাদি। খুব ভালো লোক। যেমন চেহারা, তেমনি গুণ। আর তেমনি শৌখিন।

হেসে ফেলেন সুধাদি। —এত খবরও জান?

ভুতো বলে—অনেক টাকা আছে শান্তিদার। সেদিন পথে যেতে যে গালাকুঠিটা দেখেছিলেন, ওটা শান্তিদারই গালাকুঠি।

আমি বলি—খুব ভাল ফটো তুলতে আর ছবি আঁকতে পারেন শান্তিদা।

বলাই বলে—এ শহরে শান্তিদার চেয়ে ভাল বেহালা বাজাতে আর কেউ পারে না।

গুন্‌গুন্ করতে করতেই হঠাৎ যেন আনমনা হয়ে চুপ করে যান সুধাদি। রঙিন খামে বন্ধ চিঠিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। আমাদের মনে হয়, সুধাদিকেও যে কি এক রঙিন খেলায় মেতেছে। শান্তিদাকে চেনেনও না, একদিনের জন্য শান্তিদার সঙ্গে একটি কথাও হয়নি সুধাদির, তবুও কত রকম রঙের কথা আর মিষ্টি কথার আসা-যাওয়া চলেছে দু'জনের মধ্যে।

উঠে গিয়ে স্কুলের ফটক পার হয়ে ডাকবাক্সের ভিতর চিঠিটা ফেলে দিয়ে এসে সুধাদি বলেন—বলো এবার তোমাদের খেলার খবর কি? হরিদাকে জব্দ করবার প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়েছ বোধহয়?

আমরা বলি—ভুলিনি সুধাদি, কিন্তু আজ আর কোন ভরসা নেই।

সুধাদি—কেন?

ভুতো বলে—হরিদা'র বুড়ো এখন শহরের বাইরে।

সুধাদি—তাহলে কি করবে আজ?

বলাই বলে—আজ আর না-ই বা খেললাম সুধাদি। কাঠবিড়ালীর পিছু পিছু ছুটে আর লাভ কি?

সুধাদি হাসেন—তাহ'লে আমার একটা কাজ করে দাও ভাই।

ঘরের ভিতর গিয়ে বাক্স খুলে একটা কাগজ নিয়ে এলেন সুধাদি। তার মধ্যে অনেকগুলি ওষুধের নাম লেখা।

সুধাদি আমাদের হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে বললেন—এই ওষুধগুলি আমাকে এনে দাও।

আমি প্রশ্ন করলাম—আপনার কি কোন অসুখ করেছে সুধাদি?

সুধাদি—হ্যাঁ, ক'দিন থেকে জ্বর হচ্ছে। এখন থেকেই সাবধান না হলে আমাকে আবার সেই ম্যালেরিয়ায় ধরবে। আর...।

বলাই বলে—আর কি সুধাদি?

সুধাদি হেসে হেসে বলেন—আর তোমাদের সুধাদিরও চেহারা হয়ে যাবে ঐ লছমনের মায়ের মতো, জিরজিরে কাঠিকাঠি।

কথাগুলি হেসে হেসে বললেও সুধাদির চোখ দুটো কেমন ছলছল করছিল। ভুতো ঘাবড়ে গিয়ে বলে—আপনাকে কেউ নজর দেয়নি তো সুধাদি?

সুধাদি বেশ জোরে হেসে ওঠেন—তাই হবে, নিশ্চয় কেউ নজর দিয়েছে।

ভুতোর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি, ভুতো ভাবছে, কে নজর দিল সুধাদিকে? জানতে পারলে তাকে আচ্ছা করে পিটিয়ে....।

আমি বললাম—দিন সুধাদি, ওষুধের নাম লেখা কাগজটা দিন, এখনি ওষুধ এনে দিচ্ছি।

সারা বিকাল আর সন্ধ্যা শহরের সব ওষুধের দোকান ঘুরেও সুধাদির ঐ ওষুধগুলি পেলাম না। কেউ বললেন, দশ দিন পরে পাওয়া যাবে, কেউ বললেন, একমাস পরে নতুন চালানের সঙ্গে আসবে। একজন বললেন, স্টেশনের বাজারে যে ফার্মাসি আছে, সেখানে এই সব ওষুধ পাওয়া যাবে।

কিন্তু এ যে একটা সমস্যা। কে যাবে স্টেশনের বাজারে? এখান থেকে তের মাইল দূরে রেল-স্টেশন, পথের উপর আবার একটা ভয়ানক জঙ্গল। কাল সকালে সার্ভিস বাসে চড়ে অবশ্য স্টেশনে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যাবে কে? যাবার অনুমতিই বা বাড়ি থেকে পাবে কে?

সুধাদির ঐ সুন্দর চেহারাকে সুন্দর করে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তারই জন্য তো আমাদের এত উদ্বেগ আর এত পরিশ্রম। কিন্তু সবই যে ব্যর্থ হলো, সুধাদির এই উপকারটুকু আমরা করতে পারব না, এটা একটা দুঃখ বৈকি।

সন্ধ্যার শেষে ছোট স্কুলে ফিরবার সময় দেখলাম, হরিদা ফিরে এসেছেন। রান্না করছেন হরিদা। টাট্টু বুড়ো পেয়ারা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে।

মুখ ভেংচে ভুতো বলে, হুঃ আমাদের সব চান্স নষ্ট করে এতক্ষণে এত রাত করে মহারাজ ফিরে এসেছেন!

সুধাদির কাছে এসে বললাম, ওষুধ পেলাম না সুধাদি। এখানে পাওয়া যাবে না, যেতে হবে স্টেশনের বাজারে।

সুধাদিও যেন একটু হতাশ হয়ে পড়লেন। বললেন—তাহলে উপায়?

ভুতো হঠাৎ বলে —একটা উপায় হতে পারে সুধাদি। হরিদাকে বললে নিশ্চয়ই এ-কাজটা করে দেবেন।

সুধাদি বললেন—বলে দেখ।

আমাদের সব কথা চুপ করে শুনলেন হরিদা। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন, যেন একটা স্বপ্নের দিকে তাকিয়ে আছেন।

তার পরেই হাত বাড়িয়ে ওষুধের নাম-লেখা কাগজটা আর পাঁচটা টাকা আমাদের হাত থেকে নিয়ে পকেটে ফেললেন হরিদা। বললেন—এখনি যাচ্ছি।

আমি বলি—এখনি কি করে যাবেন হরিদা? এখন তো কোন গাড়ি নেই?

হেসে হেসে হরিদা বললেন—আমার বুড়ো আছে, ওর চেয়ে ভাল গাড়ি হয় না।

বলাই বলে—এই রাত্রে ঐ ভয়ানক জঙ্গল পার হতে আপনার ভয় করবে না হরিদা?

হরিদা বলেন—একটুও না।

বলাই প্রশ্ন করে—কি করে এরকম নির্ভয় হলেন হরিদা, আমাদের বলুন না?

অনুরোধ শুনে হরিদা হাসতে থাকেন। তারপর বলেন—আমার কাছে অ্যাকোনাইট নামে একরকম ওষুধ আছে, এক ড্রপ খেলেই অন্তত চারঘন্টার মতো মৃত্যুভয় থাকে না।

ভুতো বলে—এখন তাহলে ঐ অ্যাকোনাইট খেয়েই আপনি টাট্টু চড়ে জঙ্গলের পথে...।

হরিদা বলেন—হ্যাঁ, এখনই যাব।

সবাই উৎফুল্ল হয়ে দৌড়তে দৌড়তে স্কুল-ঘরে ফিরে এসে সুধাদিকে শুভ-সংবাদ জানালাম। হরিদাকে যা বলেছি, আর হরিদা'র কাছ থেকে যা শুনেছি, সবই বললাম সুধাদিকে।

শুনে হেসে ফেললেন সুধাদি। বললেন—হরিদাকে আর একরকমের জব্দ করা হলো, তাই না?

তারপরেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন এবং তারপরে বড় বেশী গম্ভীর হয়ে গেলেন সুধাদি। বললেন, যাই বলো, এরকম করে লোকটাকে জব্দ করা উচিত হলো না। এই রাত্রে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাবে, যদি কোন বিপদ-আপদ ঘটে, তবে...।

সুধাদি হঠাৎ কিরকম একটা রাগের সুরেই বলে ওঠেন—লোকটাকে বারণ করা উচিত ছিল তোমাদের।

বারান্দায় থামের গায়ে হাত দিয়ে আরও কি সব ভাবতে থাকেন সুধাদি। তারপর নিজের মনেই বলে ওঠেন—লোকটাই বা কি-রকম? বলা মাত্র ছুটে চলল?

সুধাদির মেজাজ দেখতে ভালো লাগছিল না আমাদের। বললাম—আসি সুধাদি।

বাড়ি যাবার জন্য আমরা তৈরি হতেই সুধাদি বললেন—আমি কি করে জানব, লোকটা নিরাপদে ফিরল কি না?

আমি বললাম—সকাল হলেই খোঁজ নেব সুধাদি।

সুধাদি বললেন—না, এত খোঁজাখুঁজির দরকার নেই। যাও, এখনি গিয়ে হরিদাকে বারণ করে দিয়ে বলে এস, ওষুধ আনবার দরকার নেই।

দৌড়ে গেল ভুতো, আর ফিরে এসেই বলল—চলে গিয়েছেন হরিদা।

সুধাদি রাগ করে বললেন—রাত হয়েছে, তোমরাও বাড়ি যাও এবার।

বাড়ি ফিরবার সময় অনেক চিন্তা করেও ঠিক বুঝতে পারলাম না, সুধাদি এরকম রাগারাগি করলেন কেন? প্রথমে তো বেশ হাসছিলেন।

মনে হয়, সুধাদির সম্মানে খুব লেগেছে। যে হরিদা একটা মানুষ নয়, যে হরিদা হলো লোকের হাসি আর জব্দের জিনিস, সেই হরিদা'র কাছ থেকে উপকার নিতে সুধাদির লজ্জা করবে বৈকি। পলাশতলা থেকে রঙিন চিঠি আসে সুধাদির কাছে, তার উপকার করবে জন গিলপিন হরিদা, এটাও তো ভালো কথা নয়।

যাক, কোন রকম বিপদ-আপদ হয়নি। মৃত্যুভয়হীন হরিদা সকাল হতেই ওষুধ নিয়ে হাজির হলেন, আর আমি এক দৌড়ে সেই ওষুধ সুধাদির হাতে পৌঁছিয়েও দিলাম।

একটু পরেই এলো ভুতো আর বলাই। সুধাদি হেসে হেসে বললেন—আজ তো চান্স এসে গিয়েছে।

হ্যাঁ, মনে পড়ে গেল, সুযোগ আবার এসেছে। হরিদা'র বুড়ো টাট্টুকে নিশ্চয় আজ বিকালবেলা মাঠের মধ্যে পাওয়া যাবে। পেলে আজ আর রক্ষা নেই।

সুধাদির হাসি দেখে খুশি হয়ে, আর আমাদের প্রতিজ্ঞাটা সুধাদির কাছে আর একবার ঘোষণা করে বাড়ি ফিরে এলাম আমরা। আর, সন্ধ্যা হবার আগেই ছোট স্কুলের পাঁচিলের উপর গিয়ে বসলাম।

দেখে রাগ হলো, মঠে ঘাস খাবার জন্য আসেনি হরিদা'র বুড়ো। দু'চারটে ছাগলছানা শুধু চরে বেড়াচ্ছে। ঘরের কাছে গিয়ে সুধাদিকে ডাক দিয়ে বললাম—আজও চান্স হলো না সুধাদি।

সুধাদি হেসে ফেললেন—তোমাদের ভাগ্যটাই এই রকম।

দেখলাম, ফস্ করে একটা রঙিন খাম ছিঁড়লেন সুধাদি। এক মিনিটের মধ্যে চিঠি পড়া শেষ করলেন। ঝট্ করে একটা কবিতার বই খুললেন। তারপর দু'মিনিটের মধ্যে একটা চিঠি লিখে ফেললেন।

শুধু চিঠি আর চিঠি। দেখতে আর ভাল লাগে না আমাদের। যেন পলাশতলায় আর এখানে দুটো চিঠির কল বসে রয়েছে। চেনা নেই। জানা নেই, মুখ দেখাদেখি নেই, তবু দু'দিক থেকে কতগুলি রঙিন লেখার খেলা চলছে।

সুধাদি জিজ্ঞাসা করেন—হরিদা'র সঙ্গে দেখা হতেই কি বললেন?

আমি বললাম—বললেন, তোমাদের সুধাদি কেমন থাকেন, তার জ্বর কমছে কিনা, আমাকে মাঝে মাঝে জানিয়ে যেতে ভুলো না ভাই।

সুধাদি বলেন—বলে দিও, খুব ভাল আছি। ওকে কোন চিন্তা করতে হবে না।

তারপরেই বলেন—থাকগে, ওসব কথা ওকে বলা উচিত নয়, বলার দরকার নেই।

ভুতো বলে—তবে কিছু একটা বলতে হবেই তো সুধাদি।

সুধাদি—বলো, ভাল আছেন সুধাদি, ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

অনেকক্ষণ ধরে আনমনাভাবে স্কুলেরই মাঠের ফুলগাছের পাশে পাশে পায়চারি করলেন সুধাদি। খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল সুধাদিকে। আমরা আবার দুশ্চিন্তায় পড়লাম। মনে হচ্ছে, আজও আমাদের সঙ্গে কোন খেলায় মেতে উঠবেন না সুধাদি।

আমরা নিঃশব্দে ঘুরঘুর করছিলাম সুধাদির আশেপাশে। হঠাৎ সুধাদি বলে উঠলেন—আর ভাল লাগে না এই চাকরি। পঁচিশ টাকা তো মাইনে। ছেড়েই দেব এই চাকরি।

সত্যিই বুক কেঁপে উঠল আমাদের। সুধাদি চলে যাবেন, তবে ছোট স্কুলের এই পাঁচিল আর এই সব খেলার উপর কি আর কোন মায়া থাকবে আমাদের? কখনই না।

চুপ করে রইলেন সুধাদি। আমরা ধীরে ধীরে সরে পড়লাম। —আসি সুধাদি। বেশ জোরে কথাটা বললেও সুধাদি কোন সাড়া দিলেন না।

সমস্যায় পড়লাম আমরাই। সুধাদির চলে যাওয়া বন্ধ করতেই হবে। মাইনে কিছু বেশি করে দিলে সুধাদি নিশ্চয়ই চলে যাবেন না। কিন্তু আমরা কি আর তাঁর মাইনে বেশি করে দিতে পারি?

তিনজনে মিলে আলোচনা করে শেষকালে একটা বুদ্ধি বের করলাম। এলাম হরিদা'র কাছে। বললাম—সুধাদি ভাল আছেন, আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সেই রকমই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন হরিদা, যেন একটা স্বপ্নের দিকে তাকিয়ে আছেন। জীবনে এই বোধহয় প্রথম ধন্যবাদ পেলেন হরিদা। সত্যিই তো, স্বপ্নেও নিশ্চয়ই এতটা আশা করতে পারেননি হরিদা।

আমরা বললাম—সুধাদি কিন্তু চলে যাবেন।

চমকে উঠলেন হরিদা—কেন?

ভুতো বলে—পঁচিশ টাকা মাইনেতে চাকরি করতে পারবেন না সুধাদি।

শুনে চুপ করে আর চোখ দুটো বন্ধ করে বসে রইলেন হরিদা।

বলাই বলে—কিন্তু একটা উপায় তো বের করতেই হবে হরিদা।

হরিদা বলেন—হ্যাঁ, দেখি কি উপায় হয়।

জয় হোক হরিদা'র। মনে মনে হরিদাকে জীবনে প্রথম সম্মান জানিয়ে আমরা যে যার বাড়ি চলে গেলাম।

কিন্তু মাত্র একটি দিন আমাদের মনে এই জয়ের আশা বেঁচেছিল, মরে গেল পরের দিনই।

উঁকি দিয়েছিলাম সতুদার ক্যারম খেলার ঘরে।

সতুদা বলেছিলেন—শুনেছিস তো হীরু, জন গিলপিন কি কাণ্ড করেছে, আর তার কি ফল হয়েছে?

হীরুদা বলেন—না।

সতুদা—মনভ্রমরার মাইনে বাড়িয়ে দেবার জন্যে ছোট স্কুলের সেক্রেটারির কাছে গিয়ে কিসব আবোল-তাবোল কথা বলেছে।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন হীরুদা—সর্বনাশ, জন গিলপিনের পেটে পেটে এত ফন্দিও ছিল।

কানুদা বলেন—দুঃস্বপ্ন। হরিটা একটা অন্ধ।

সতুদা বললে—ফলও ফলে গিয়েছে।

হীরু—কি হয়েছে?

সতুদা—সেক্রেটারি চরণবাবু হরির গর্দানে হাত দিয়ে একটা ধাক্কা দিয়ে তাঁর বৈঠকখানা থেকে সোজা বের করে দিয়েছেন হরিকে।

ভেবেছিলাম এই সব ব্যাপার সুধাদিকে কিছু জানাব না। কিন্তু হরিদা মার খেয়েছেন শুনে মনটা এত খারাপ লেগেছিল যে, পরের দিনই সন্ধ্যাবেলা গিয়ে সুধাদির কাছে সব বলে ফেললাম।

শুনে সুধাদি বড় বেশি রেগে উঠলেন আমাদেরই উপর। এ রকম শক্ত কথা বলতে আর এত ধমক দিতে কখনো তাঁকে দেখিনি। বখাটে ছেলে সব, পরামর্শ করবার আর লোক পেলে না? হরিদা'র কাছে এসব কথা বলতে গেলে কেন তোমরা? যে লোকটা একটা ইয়ে, যার মাথার কোন ঠিক নেই, তার কাছে গিয়ে....।

বলতে বলতে মুখ ঘুরিয়ে একেবারে চুপ করে গেলেন সুধাদি। আমরাও ভয়ে একেবারে বোবা হয়ে গেলাম।

যেন একটা যন্ত্রণায় ছটফট করে ধিক্কার দিয়ে উঠলেন সুধাদি—ছি ছি ছি, শেষে লোকটাকে তোমরা মার খাওয়ালে?

তার পরেই সুধাদির সুন্দর মুখের স্নিগ্ধ চোখ দুটো কি ভয়ঙ্কর দপ করে জ্বলে উঠল। —কি ভেবেছেন চরণবাবু, সামান্য কারণে একটা মানুষকে অপমান করবেন আর মারবেন?

স্কুল-বারান্দার থামের গায়ে হাত দিয়ে ফটকের দিকে তাকিয়ে রইলেন সুধাদি। আস্তে আস্তে খুব ক্লান্ত স্বরে বললেন—লোকটাই বা কি রকম! কেন মিছামিছি পরের জন্য মাথা ঘামাতে গিয়ে গলা ধাক্কা খায়?

আলো জ্বেলে দিয়ে গেল স্কুলের মালী। সুধাদি তেমনি থাম ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আর বারান্দার উপর আমরা চুপ করে গুটিসুটি হয়ে বসে আছি। মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি, বাড়ি যাবার সময় সুধাদির কাছে ক্ষমা চাইব।

ফটক খোলার শব্দ শুনে ফটকের দিকে তাকালাম। বোধহয়, সন্ধ্যার ডাকপিয়ন চিঠি নিয়ে আসছে। কিন্তু আসছিলেন যিনি, তাঁকে দেখামাত্র আমরা এমন চমকে

উঠলাম যে, কি যে করব কিছু ভেবে পেলাম না, থাকব, না যাব, কিংবা একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়াব।

আসছিলেন শান্তিদা। হাতে ছোট একটা ক্যামেরা ঝুলিয়ে আর রঙীন শালে তাঁর শৌখিন চেহারা জড়িয়ে হাসিমুখে আস্তে আস্তে আসছেন শান্তিদা।

আমরা তো চমকে উঠলাম, কিন্তু সুধাদি যে চুপ করে দাঁড়িয়ে শুধু একটু আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন! কি আশ্চর্য, সুধাদি কি শান্তিদাকে চিনতে পারছেন না?

সুধাদি আমাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কে আসছেন, চেন তোমরা?

—সে কি সুধাদি? শান্তিদা আসছেন।

চমকে উঠলেন সুধাদি, শান্তিদাও কাছে এসে পড়েছেন, আর এসেই হেসে হেসে বললেন—বোধহয় ভাবতে পারনি, আমি এইভাবে হঠাৎ এসে তোমাকে একদিন চমকে দেব।

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সুধাদি। বোধহয় সত্যিই ভাবতে পারেন নি যে, চিঠির মানুষ একদিন এসে কথা বলবে। এত রঙিন কথার মানুষকে এত কাছে, চোখে দেখার পর এত অচেনা ও অজানা বলে মনে হবে তাও বোধহয় আগে বুঝতে পারেন নি সুধাদি।

আমরাই চেয়ার টেনে নিয়ে এসে শান্তিদাকে বসতে দিলাম। সুধাদি সেই রকম কেমন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। শান্তিদা আমাদের দিকে তাকালেন, বোধহয় আমাদের বয়সগুলির দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন। তারপরেই সুধাদির দিকে তাকিয়ে বললেন—কলকাতা থেকে মা চেয়ে পাঠিয়েছেন তোমার একখানি ফটো।

উত্তর দিলেন না সুধাদি। যেন একেবারে অপরিচিত একটা মানুষ এসে সুধাদির সঙ্গে কথা বলছেন, তাই ভয়ে পেয়ে একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছেন সুধাদি।

শান্তিদা হাসিমুখে বললেন—আজ শুধু জানিয়ে গেলাম, কাল আসব ফটো তুলতে। তারপর যা ব্যবস্থা করবার সবই করবেন মা।

সুধাদি বলেন—না, কাল আসবেন না।

শান্তিদা চেয়ার ছেড়ে ওঠেন—সুধাদির কাছে এগিয়ে গিয়ে গলার স্বর নামিয়ে আস্তে আস্তে বলেন—না, আর দেরি করা উচিত নয়, আমি কালই এসে তোমার ফটো নিয়ে যাব। কেমন?

হ্যাঁ বা না, কোন উত্তরই দিলেন না সুধাদি। শান্তিদা কিন্তু হাসিমুখেই চলে গেলেন।

দু'হাতে কপাল চেপে বারান্দার মেজের উপর বসে পড়ে সুধাদি বললেন—তোমরা এবার বাড়ি যাও।

দিনটা ছিল রবিবার। সকাল হতেই শহরের পুবের পাহাড়ের মাথা অন্য দিনের মতো সেদিনও রঙিন হয়ে উঠল। চটপট তৈরি হয়ে নিয়ে আমরা ছোট স্কুলের দিকেই ছুটে চললাম। পলাশতলার ক্যামেরা আসবে আজ সুধাদির ঘরে। সুধাদিও বোধহয় সেই বাসন্তী পূজার দিনের মতো চাঁপা রঙের শাড়ি পরে বড় সুন্দর হয়ে উঠবেন।

ফোটা পলাশের রঙ আবার ছড়িয়ে পড়বে সুধাদির মুখের উপর। নানারকম আশায় ছট্‌ফট্‌ করছিল আমাদের মন।

ছোট স্কুলের ফটকে ঢুকবার আগেই থমকে দাঁড়ালাম আমরা। রঙিন-খড়ি দিয়ে ফটকের পাশের দেওয়ালে লেখা রয়েছে—শান্তি-সুধা-শান্তি-সুধা।

কে লিখল এই কথা? কে জেনে ফেলল পলাশতলার রঙিন চিঠির কথা। আমরা তো কোনদিনই সতুদার কাছে কিংবা কোন দাদার কাছে শান্তিদা আর সুধাদির চিঠির গল্প করিনি। তবে কি কাল সন্ধ্যেবেলা ছোট স্কুলের ফটক দিয়ে শান্তিদাকে ঢুকতে কিংবা বের হয়ে যেতে কেউ দেখেছে?

ভুতো বলে—এটুকুও বুঝতে পারলি না বোকা। যারা এতদিন ধরে জানবার চেষ্টা করছিল, তারাই জেনেছে আর লিখেছে।

এইবার বুঝলাম, এই রঙিন খড়ির লেখা কাদের হাতের কীর্তি। সঙ্গে সঙ্গে চোখ পড়ল, রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে রঙিন খড়ির শান্তি-সুধার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন হরিদা। দু'চোখের পলক পড়ছেও না, পাথরের মতো চোখ নিয়ে দেখছেন হরিদা। তারপরেই মনে হলো, হরিদা'র পাথুরে চোখ দুটো যেন চিক-চিক করছে। ডাকলাম—ও হরিদা, কি দেখছেন?

সাড়া দিলেন না হরিদা। শুনতে পেলেন কি না, তা-ও বুঝলাম না।

যাক গিয়ে, হরিদা'র পাথুরে চোখ আর চোখের চিকচিক। সুধাদির চাঁপা রঙের সাজ দেখবার লোভে তখন আমরা ছটফট করছি। ফটক পার হয়ে সুধাদির ঘরের কাছে এসে দাঁড়ালাম।

সুধাদি তখন তাঁর ঘরের ভিতর খাটের উপর বসে বই পড়ছিলেন। আমরা ডাক দিতেই বললেন—ভেতরে এস।

অসুখ হয়নি, কিন্তু অসুস্থর মতো দেখাচ্ছিল সুধাদির চেহারাটা। হেসে হেসে বললেন সুধাদি, আমাকে আজ বাঁচাতে পারবে তো?

মুখ কালো হয়ে গেল আমাদের—আপনার কি অসুখ হয়েছে সুধাদি?

সুধাদি বলেন—অসুখ নয় ভাই।

ভুতো প্রশ্ন করে—তবে কি?

উত্তর দিলেন না সুধাদি। বইটা বন্ধ করে অনেকক্ষণ আবার আনমনার মতো চোখ নিয়ে কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন—হরিদা'র খবর কি? ভাল আছেন তো?

আমরা চুপ করেই ছিলাম। সুধাদিই আবার ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করলেন—কি? হরিদা'র সঙ্গে তোমাদের কি আর দেখা হয়নি?

বলাই বলে—এই তো এখনি ফটকের কাছেই দেখা হল হরিদা'র সঙ্গে। ডাক দিলাম, কিন্তু কোন সাড়াই দিলেন না।

উঠে বসলেন সুধাদি—কি রকম? কি করছিলেন হরিদা?

খুলে বলতে সত্যিই সঙ্কোচ হচ্ছিল আমাদের সবারই। পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে পরামর্শ করছিলাম, সত্যিই ব্যাপারটা বলে ফেলব কি না? বলাই বলল—তুই বল না ভুতো।

ভুতো বলে—ফটকের পাশের দেয়ালে কে যেন রঙিন খড়ি দিয়ে লিখে রেখে দিয়েছে।

সুধাদি—কি লিখেছে?

ভুতো—শান্তি-সুধা।

হাতের বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সুধাদি চেঁচিয়ে ওঠেন—কে লিখল? কোন মুখ্খু এসব মিথ্যা কথা লিখল?

আমি বললাম—আমরা কি করে বলব সুধাদি।

ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন সুধাদি। সত্যি যেন জ্বর হয়েছে, আর সেই জ্বরের জ্বালা সহ্য করতে পারছেন না। ছটফট করে বলে উঠলেন—কে জানে, তোমাদের হরিদাও বোধহয় এতক্ষণে ঐ মিথ্যা কথাটা দেখে ফেলেছেন।

ভুতো—হরিদা দেখে ফেলেছেন সুধাদি।

সুধাদি—ছি ছি ছি, কি ভাবল লোকটা!

আর একবার ছটফট করে ওঠেন সুধাদি। বলেন—যাও, এখনি গিয়ে লেখাটা মুছে দিয়ে এস।

রঙিন খড়ির লেখা মুছে ফেলবার জন্য আমরা দৌড় দিয়ে চলে যাচ্ছিলাম। পিছন থেকে সুধাদি ডাকলেন শোন—

শোনবার জন্য ফিরে এলাম। সুধাদি আঁচল দিয়ে কপাল মুছে নিয়ে আস্তে আস্তে বললেন—হরিদাকে গিয়ে বলো, তিনিই যেন ঐ লেখাটা নিজের হাতে মুছে দেন। বলো, আমি বলেছি।

এক দৌড়ে ফটক পার হয়ে রাস্তার উপর এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম, হরিদা সেখানে আর নেই। চলে এলাম হরিদা'র ঘরের কাছে। কিন্তু এখানেও নেই হরিদা। দরজায় কোন তালাও ঝুলছে না, পেয়ারা গাছের তলায় বুড়ো টাট্টুটাও আর নেই। একেবারে খোলামেলা শূন্য হয়ে পড়ে আছে হরিদা'র ঘর। হরিদা'র সেই ছোট খাটিয়াও আর নেই।

খোজ নিলাম পাশের ঘরের দোকানী রতনলালের কাছে। রতনলাল বলে—চলে গিয়েছে হরি ডাক্তার, ঘর ছেড়ে দিয়েই চলে গিয়েছে।

জিজ্ঞাসা করি—কোথায় গিয়েছেন?

রতনলাল বলে—জানি না।

সুধাদির কাছে ফিরে এসে খবরটা দিতে কেন যেন বড় ভয় করছিল। ভীরু বলাইয়ের চোখটা তো প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে উঠল। তবু বলে ফেললাম—হরিদা চলে গিয়েছেন সুধাদি।

সুধাদি—কোথায়? ডাক্তারি করতে?

ভুতো বলে, না, একেবারে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছেন। রতনলালও জানে না কোথায় গিয়েছেন হরিদা।

চোখের তারা দুটো নিশ্চল করে তাকিয়ে রইলেন সুধাদি। যেন নিজের মনেই ভাঙ্গা নিশ্বাসের ব্যথার মতো অস্পষ্ট স্বরে বললেন—চলেই গেল মানুষটা, রঙিন খড়ির একটা বাজে লেখাও সহ্য করতে পারল না।

সুধাদির চোখ থেকে টপ করে বড় একটা জলের ফোঁটা ঝরে পড়ল তার হাতের চুড়ির উপর। দৌড়ে ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকলেন সুধাদি। কাগজ কলম টেনে নিয়ে একটা চিঠি লিখতে শুরু করলেন।

আবার চিঠি? কার কাছে, কিসের চিঠি? বুঝতে পারছিলাম না কিছুই। লেখা শেষ করে একটা সাদা খামের ভিতর চিঠিটা পুরে খামের উপর নাম লিখলেন সুধাদি—হরিপদবাবু, শ্রদ্ধাস্পদেষু।

তারপর আমাদের বললেন—এখনি যাও, সব জায়গায় খুঁজে দেখ। যেখানেই লুকিয়ে থাকুক হরিদা, তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে। দেখা পেলেই এই চিঠি হরিদা'র হাতে দেবে।

ভয়ে ভয়ে বললাম—যদি দেখা না পাই সুধাদি?

সুধাদি চেঁচিয়ে উঠলেন—নিশ্চয় দেখা পাবে, এরই মধ্যে কোথায় পালিয়ে যাবেন তোমাদের হরিদা?

সকাল থেকে সারা দুপুর পর্যন্ত শহরের সব জায়গায় খোঁজ করলাম। কোথাও দেখা পেলাম না হরিদা'র। মোটর বাস কোম্পানীতে এসে খোঁজ নিলাম। দারোয়ান বলল, হ্যাঁ, সকাল নটার মোটর বাসে চলে গিয়েছেন হরি ডাক্তার।

চকের কাছে এসে অনেকক্ষণ ধরে আমরা ভাবলাম, কি গতি করব এই চিঠিটার? হরিদা'র কাছে লেখা সুধাদির এই চিঠি, কি আছে এর মধ্যে কে জানে?

ভুতোর একবার ইচ্ছা হয়েছিল, চিঠি খুলে নিয়ে পড়া যাক। বাধা দিল বলাই—ছিঃ, গুরুজনদের চিঠি পড়তে নেই।

সুতরাং সকলে মিলে ঠিক করলাম, একটা ডাক টিকিট লাগিয়ে চিঠিটাকে ডাক বাক্সেই ফেলে দেওয়া যাক। কে জানে কপালে যদি থাকে, তবে একমাস দু'মাস বা কয়েক বছর পরেও হয়তো হরিদা'র হাতে পৌঁছে যাবে এই চিঠি। এই রকম ঘটনার গল্পও তো কত শুনতে পাওয়া যায়।

বিকাল হবার পর ছোট স্কুলের পাঁচিলের দিকে যেতেই চোখে পড়ল, শান্তিদা দাঁড়িয়ে রয়েছেন সুধাদির ঘরের বারান্দায়। আর সুধাদি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর ঘরের দরজায়। শান্তিদার হাতে ক্যামেরা ঝুলছে ঠিকই, কিন্তু সুধাদির গায়ে চাঁপা রঙের

শাড়ি তো দেখা যাচ্ছে না। বরং কি রকম আলুথালু চুল নিয়ে আর ধুতির মতো সরু পাড়ের একটা আধময়লা শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছেন সুধাদি।

আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে সুধাদির আশেপাশে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। শান্তিদা তখন আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন—কি বললে, আমাকে তুমি চেন না?

সুধাদি—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার কতটুকু পরিচয়ই বা আমি জানি? কিছুই জানি না।

রঙিন খামের চিঠির মস্ত বড় একটা মালা সুধাদির ঘরের দেয়ালে তখনো ঝুলছিল। সেই দিকে আঙুল তুলে শান্তিদা বললেন—তবে ওগুলি কি?

সুধাদি—কতগুলি রঙিন চিঠি।

শান্তিদা—কি আছে, ঐ চিঠির মধ্যে, জান না?

সুধাদি—জানি, কি আছে।

শান্তিদা—কি আছে?

সুধাদি—কবিতা, গান, রঙ, কথা, ছবি।

শান্তিদা বললেন—শুনে সুখী হলাম। তাহলে তোমার আর কিছু বলবার নেই।

সুধাদি—আছে।

শান্তিদা—কি?

সুধাদি—ক্ষমা করবেন।

শান্তিদা কিছুক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর বললেন—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

সুধাদি—বলুন।

শান্তিদা—বোধহয় আমাকে অপমান করার জন্যই ইচ্ছে করে এরকম বিধবার মতো সাজ করেছ?

চোখ দুটো শক্ত করে উত্তর দিলেন সুধাদি—আজ্ঞে না।

শান্তিদা—তবে?

সুধাদি—বিধবা হয়েছি।

শান্তিদা ভ্রূকুটি করেন—কবে?

সুধাদি—আজ।

শান্তিদা বিদ্রূপের সুরে প্রশ্ন করলেন—আজ ক'টার সময়?

চুপ করে রইলেন সুধাদি। শান্তিদা বিশ্রী রকমের চোখেব দৃষ্টি তুলে তাকালেন সুধাদির দিকে—কি? একটা বাজে কথা বলে চুপ করে গেলে কেন? উত্তর দাও।

চট করে উত্তর দিয়ে দিল ভুতো—আজ সকাল ন'টার সময়।

চমকে ওঠেন শান্তিদা—তার মানে?

ভুতো বলে—আজ সকাল নটার গাড়িতে চলে গিয়েছেন হরিদা, আর ফিরে আসবেন না হরিদা।

পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালে ঘাম মোছেন শান্তিদা। —ওঃ এইবার বুঝলাম। ধন্যবাদ।

হন্ হন্ করে হেঁটে পার হয়ে চলে গেলেন শান্তিদা। সুধাদি ঘরের ভিতর ঢুকে খাটের উপর শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে দিয়ে পড়ে রইলেন। আমরা একেবারে মন-মরা হয়ে পাঁচিলের উপর গিয়ে বসলাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে আর ছোট একটা ভাঙা চাঁদও উঠেছে পশ্চিমের আকাশে।

ভাল লাগছিল না কিছু। নিঝুম হয়ে রয়েছে স্কুলঘর। বড় মাঠের বুকে হাওয়া খেলছে খুব, আর ঘাসের উপর চাঁদের আলোও পড়েছে। পাঁচিল থেকে নেমে আমরা মাঠের ঘাসের উপর গল্প করতে বসলাম।

হঠাৎ তীরের মতো বেগে আর খুটখুট শব্দ করে যেন একটা ছায়া ছুটে অসে আমাদের কাছে থেকে একটু দূরে দাঁড়াল। দেখলাম, ছায়া নয়, হরিদা'র বুড়ো। বুড়োর পায়ে আজ আর দড়ির বাঁধন নেই। বুড়োর পায়ের বাঁধন খুলে বুড়োকে যেন একেবারে মুক্তি দিয়ে চলে গিয়েছেন হরিদা।

কিন্তু আমাদের কি চিনতে পারছে না বুড়ো? যদি চিনতে পেরেই থাকে, তবে পালিয়ে যাচ্ছে না কেন?

কি আশ্চর্য, এক পা-দু-পা করে আস্তে আস্তে আমাদেরই দিকে এগিয়ে আসতে থাকে বুড়ো। সাহসী ভুতো ভয় পেয়ে লাফিয়ে ওঠে। —ওরে বাবা।

এক দৌড় দিয়ে ছুটে এসে স্কুলের পাঁচিলের উপর আমরা উঠলাম। হরিদা'র বুড়ো সেই খোলা মাঠের হাওয়াতে বোঁ বোঁ করে একটা চক্কর দিয়ে ঠিক আবার আমাদের এই পাঁচিলের কাছেই এসে দাঁড়াল। আমাদের দিকে মুখ তুলে একেবারে স্থির ও শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বুড়ো। আরও ভয় পেয়ে আর হুড়মুড় করে আমরা পাঁচিল থেকে নেমে সুধাদির ঘরের বারান্দায় এসে উঠলাম।

ঘরের ভিতর থেকে সুধাদি বললেন—কে?

—আমরা।

সুধাদি ভিতর থেকে বের হয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—এখন আবার পাঁচিলের কাছে গিয়ে কি করছ তোমরা?

—হরিদা'র বুড়ো আজ নিজের থেকেই ধরা দিতে আসছে সুধাদি।

কেঁপে উঠল সুধাদির চোখ দুটো। বললেন—থাক, কিছু বলো না।

বড় শান্ত হয়ে গিয়েছেন সুধাদি। বড্ড আস্তে আস্তে কথা বলছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার শরীর ভাল আছে তো সুধাদি?

সুধাদি বললেন—হ্যাঁ....এবার তোমরা বাড়ি যাও।

—আসি সুধাদি। সুধাদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চললাম আমরা। বেশ বুঝতে পারছিলাম, ছোট স্কুলের পাঁচিলের মায়া আর খেলা এতদিনে শেষ হলো। আর খেলা কোনদিনই জমবে না। খেলা আর হবেই কিনা, ঠিক কি? হরিদাকে জব্দ করবার আর কোন চান্স নেই।

সুধাদি ডাকলেন—একটা কথা শুনে যাও।

কাছে আসতেই হেসে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার চিঠিটা কই?

সাহসী ভুতো গলা কাঁপিয়ে বলে—ডাকবাক্সে ফেলে দিয়েছি সুধাদি।

দু'হাতে মুখ ঢাকেন সুধাদি। আমরাও সরে এলাম। ছোট স্কুলের ফটক পার হয়ে রাস্তায় পা দেবার আগেই শুনতে পেলাম, গুন্‌গুন্‌ করে কাঁদছেন সুধাদি।

ক্যারম খেলার শব্দ শুনে সতুদাদের ঘরের জানালার কাছে এসে দাঁড়ালাম। উঁকি দেওয়া মাত্র শুনলাম, সতুদা বলছেন—শুনেছিস হীরু, মনভ্রমরার খবর?

হীরুদা বলেন—কি খবর?

সতুদা—কার ওপর মজেছে বল দেখি?

হীরুদা—কার ওপর?

সতুদা—শান্তিপদ নীলকমলে।

আমার পাশে দাঁড়িয়েই জানালার গরাদ ধরে ভুতো চেঁচিয়ে ওঠে। —হরিপদ নীলকমলে।

চমকে আর রেগে একটা লাফ দিয়ে উঠে এসে সতুদা খপ্‌ করে ভুতোর একটা কান ধরলেন।—বল ছোঁড়া, এর মানে কি?

ভুতো আর্তনাদ করে—আঃ, মানে হচ্ছে, হরিদা চলে গিয়েছেন, তাই সুধাদি গুন্‌গুন্‌ করে কাঁদছেন।

ভুতোর কান ছেড়ে দিয়ে অবাক হয়ে হীরুদা আর কানুদার মুখের দিকে বার বার ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে থাকেন সতুদা। —এ কী বলছে রে হীরু!

সতুদাই কিছুক্ষণ কি যেন ভাবেন। মুখ কালো করে বসে থাকেন। তার পরেই বলেন—আমারও কীরকম মনে হচ্ছে হীরু।

হীরুদা—কি মনে হচ্ছে?

সতুদা—মনে হচ্ছে, ঠিকই বলেছে স্টুপিড ভুতোটা।

কানুদা বলেন—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে।

হীরুদা বলেন—আমারও তাই মনে হয়।

সতুদা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন, তারপরেই বলেন—তবে চল, লেখাটা মুছে দিয়ে আসি।

হৃদ্‌ঘনশ্যাম

শুঁয়োপোকাটা দেয়ালের গা ধরে এগিয়ে আসছে। কুৎসিত নির্বোধ ও ভীরু ক্ষুদ্র একটি রোমশ সর্বনাশ যেন কেৎরে কেৎরে এগিয়ে আসছে। এই পোকাটাও একদিন প্রজাপতি হয়ে যাবে। বসন্তের বাতাসে এরই বিচিত্র পাখা থেকে রঙীন ধুলো ঝরে পড়বে। একথা বিশ্বাস করতে বাধা নেই; খুব বেশি আশ্চর্য হই না। কিন্তু শ্যামুও

সাধু মহারাজ হয়ে যাবে, একথা কখনো মনে আসেনি, এখনো বিশ্বাস করতে পারি না। এটা যেন এক ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক অনিয়ম।

সুরেনদা বললেন—কিন্তু তাই যে হয়েছে।

কুঞ্জবাবু বললেন—শ্যামু শ্যামুই আছে, শুধু ভোল বদলেছে।

চরণডাক্তার বললেন—বহুজন দুঃখায় বহুজন অহিতায় চ। এবার বেশ পাকা বন্দোবস্ত করে পরের সর্বনাশ করছে।

শুঁয়োপোকাটা টুপ করে টেবিলের ওপর পড়ে গুটিয়ে রইল। শ্যামুও ঠিক এইভাবে এক-একদিন আমাদের পায়ের কাছে অসহায়ভাবে গুটিয়ে পড়ে থাকতো—এ যাত্রা বাঁচিয়ে দাও নিতুবাবু। ভবিষ্যতে আর কখনো হবে না।

মনে পড়ে, শ্যামুর কাজ ছিল গুলি খেয়ে নেশা করা আর জুয়া খেলা। রোজগার ছিল স্টেশনে হাঁক দিয়ে বিক্রী করা—লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি, এক আনা প্যাকেট। কতবার কত অপরাধের দায়ে ধরা পড়েছে শ্যামু। আমরাই ওকে রক্ষা করেছি। টাকা দিয়েছি, মোকদ্দমার খরচ যুগিয়েছি। তারপর সাবধান করে দিয়েছি।

শ্যামুর কাছে শুনেছিলাম, ওর পিতৃদেব নাকি এক অতি বিত্তশালী ও অতি নিষ্ঠুর জমিদার। এমন বাপ না মরলে শ্যামু আর ঘরে ফিরবে না। সেই ক'টা দিন সে আমাদের ওই দয়ার আশ্রয়ে কাটিয়ে দিতে চায়। তারপর, সম্পত্তি পাবার পর প্রত্যেকটি রূপোর দেনা সে সোনার ওজনে শোধ করে দেবে।

শ্যামু উধাও হয়েছিল প্রায় দশটি বছর। আজ আবার নতুন করে ওর নাম শুনছি লোকের মুখে মুখে। লোকটি সেই বটে, সে নাম আর নেই। শ্যামু এখন বাবাজী হৃদ্‌ঘনশ্যাম। আশ্রম করেছে, অন্তত শ পাঁচেক দীক্ষিত শিষ্য ও শিষ্যা আছে। ভক্ত ও অনুরাগীর সংখ্যা আরও পাঁচ শত।

প্রতি সন্ধ্যায় শ্যামুর আধ্যাত্মিক মহিমার বহু কীর্তিকাহিনী কানে শুনতে পাই, নিত্য নতুন সব অলৌকিক ঘটনা, বিচিত্র ও অদ্ভুত। বাবাজী হৃদ্‌ঘনশ্যামের মহিমা অদৃশ্য এক জালের মত দূর দূর শহরের ব্যারিস্টার ডাক্তার জমিদার ও মার্চেন্টদের ভক্তিবিগলিত হৃদয়গুলি যেন ছেঁকে এনে ফেলেছে তার আশ্রমের আঙিনায়। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্। যা শুনছি তা সবই বিশ্বাস হয় না। মনে হয়, অনেক কিছু বাড়িয়ে বলা হচ্ছে। তবে হ্যাঁ, শ্যামু কিছু একটা কাণ্ড করার চেষ্টা করছে নিশ্চয়। কোন বড় রকমের দাঁও মারার মতলবে আছে।

সুরেনদা, চরণডাক্তার ও কুঞ্জবাবু ব্যাপার দেখে সবচেয়ে বেশি চটে গেছেন। মানুষের বিশ্বাসেরও তো একটা রীতি-নীতি আছে। যেকোন একটা উজবুগ জটা-চিমটে নিয়ে দুটো ধর্মের বুলি ছাড়বে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে অবতার বানিয়ে ফেলতে হবে, এতটা মতিভ্রম শিক্ষিত লোকেরও কি করে হয়? শ্যামু যতই ঘুঘু লোক হোক, অন্তত গুরু-অবতার সাজবার মত মার্জিত ধূর্তামিও যে ওর নেই।

সবাই বললেন—শ্যামুকে একবার শাসিয়ে দিলে হয়। এই ভড়ং ছাড়ুক,

নইলে সব পুরনো কুকীর্তি সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে ধরিয়ে দেব। আশ্রমবাজি বেরিয়ে যাবে।

বললাম—যদি গ্রাহ্য না করে?

চরণডাক্তার—চেলাচেলীগুলিকে সব কথা বলে ঘাবড়ে দেব। তা'হলেই শ্যামুর চাক ভেঙে যাবে।

গুড ফ্রাইডের ছুটির একটি দিনে মোটর বাসে চারটি ঘন্টা সফরের পর ট্রাঙ্ক রোডের একটা বাঁকে এসে থামলাম। বাবাজী হৃদ্‌ঘনশ্যামের আশ্রম দেখা যায়, বাগান, পুকুর ও মন্দির। পাশে একটা শালবন তপোবনের মত চেহারা। শীর্ণ একটা নদী আশ্রয়-উদ্যানের প্রান্ত ছুঁয়ে চলে গেছে। পরেশনাথ পাহাড়ের ঘননীল ছায়ায় আকাশের ছবিটা আরও স্নিগ্ধ।

আশ্রমে ঢুকেই প্রথমে মন্দিরের দিকে চললাম। শ্যামু বড় শিবভক্ত ছিল জানতাম। হয়তো শিবমূর্তি বসিয়েছে।

মন্দিরের ভেতর উঁকি দিয়ে আমরা চারজনেই চারটি পাথরের থামের মত স্থির হয়ে গেলাম। এমন ভয়াবহ, এমন অপার্থিব, এমন প্রচণ্ড বিস্ময়কর দৃশ্য কখনো কল্পনায় অনুভব ও অভিজ্ঞতায় জীবনে আমরা দেখিনি।

শ্যামু বসে আছে। মন্দির ঘরে কোনো ঠাকুর দেবতার মূর্তি বা ছবি নেই। একটা শিলাবেদীর ওপর বাঘেব ছাল পেতে স্বয়ং জীবন্ত বিগ্রহের মত সমাসীন—বাবাজী হৃদ্‌ঘনশ্যাম।

এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক গরদের ধুতি ও চাদর পরে, একটি ঝালর লাগানো প্রকাণ্ড পাখা নিয়ে বাবাজীর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন ও ব্যজন করতে লাগলেন।

একদল মহিলা মন্দির ঘরে ঢুকলেন। আমাদের একটু সরে দাঁড়াতে হলো। আমাদের হতভম্বতা যেন একটু একটু করে কেটে যেতে লাগলো।

শ্যামুর চেহারাটা একবার উঁকি দিয়ে দেখলাম। শুঁয়োপাকা ঠিক প্রজাপতি হয়নি, অজগর হয়েছে। বপুটি যেমন নধর তেমনি বিরাট; অতি মুল্যবান ও মসৃণ রেশমের গৈরিক বেশ। মেদচিক্কণ অবয়বে একটা অসাধারণ সুখ-সন্তোষ এবং সাফল্যের দীপ্তি। সুরেনদা হাত দুটি কপালে ঠেকিয়ে প্রায় প্রণাম করে ফেলেছিলেন। একটা চাপড় দিয়ে জোড়-করা হাত দুটো ছাড়িয়ে দিলাম, কিন্তু সুরেনদার চোখ দেখে বুঝলাম যে তাঁর সংবিৎ তখনো তেমনি ভোঁ মেরে আছে।

বাবাজী তখন পর্যন্ত চোখ বুঁজেই ছিলেন। আর কতক্ষণ থাকবেন বুঝলাম না। ধৈর্য্য আর ধরে রাখি কতক্ষণ? বুঝলাম, যার সঙ্গে লড়তে হবে, সে আর শ্যামু নয়; সে সত্যই হৃদ্‌ঘনশ্যাম। আশ্রমে ঢুকবার আগে পর্যন্ত যে বেপরোয়া সাহস মনের মধ্যে শানিয়ে রেখেছিলাম, প্রথম দেখার আঘাতেই যেন তার খানিকটা ধার কমে গেল। কিন্তু এই তো সূচনা। বাবাজী একবার চোখ খুলে আমাদের দেখুক। তারপর দেখি, কোন্ দিকে ঝড়ের গতি চলে।

বাবাজী চোখ খুললেন না। শুধু হাসতে লাগলেন। অদ্ভুত রহস্যময় অথচ ভীরু সেই হাসি। গরদ-পরা ভদ্রলোক জোরে জোরে বাতাস করতে লাগলেন।

বাবাজীর গলা থেকে শান্ত আবেগভরা কয়েকটি কথা বেজে উঠলো—এতদিনে তারা এল। আসতেই হবে। একে একে সবাইকে আসতে হবে।

মন্দিরের ক্রমাগত সকল পুরুষ ও মহিলা কৌতূহলভরা দৃষ্টি নিয়ে আমাদের দেখতে লাগলেন। একজন ভদ্রলোক এসে সবিনয়ে বললেন—ভেতরে এসে বসুন।

ভেতরে গিয়ে বসলাম। বাবাজী আবার স্থির হয়ে গেলেন। বোধহয় নিঃশ্বাস পড়ছে না। ঠোঁট দুটো সেতারের তারের মতো কাঁপছে। আর সেই সঙ্গে বহুদূরের কোন শালবনে চাকভাঙা মৌমাছির গুঞ্জরণের মত একটা শব্দ।

সমাগত নরনারী একসঙ্গে প্রণাম করে উঠে পড়লো। ক্লাস শেষ হলো। প্রত্যহ সকালবেলা একবার করে হয়।

বাবাজী যখন চোখ মেললেন, তখন ঘরে আমরা চারটি অবিশ্বাসী অভাজন ছাড়া মাত্র গরদপরা ভদ্রলোক আছেন। এঁর নাম পরমবাবু; তাঁর ইহলৌকিক যথাসর্ব্বস্ব এই আশ্রমকে দান করে দিয়েছেন। বলতে গেলে, ইনিই বাবাজীর প্রধান শিষ্য। আশ্রমের এক্সিকিউটিভ ইনিই।

বারকোশে সাজানো নানারকম মিষ্টি ও নোনতা খাবার, চা এবং সরবত পৌঁছে গেল।

বাবাজী বললেন—আজ তোমাদের সেবা করবার সুযোগ পাব, একথা আমি আগেই জানতাম। তাই কাল রাত্রি থেকেই তৈরী হয়ে আছি। হ্যাঁ, তারপর আছ কেমন সুরেনবাবু?

সুরেনবাবু আমতা-আমতা করে উত্তর দিলেন—তা আপনি সেবাটেবার কথা ওসব কি বলছেন? আপনি সেবা করবেন, না আপনাকেই.....

সুরেনদার দিকে তাকিয়ে শুধু একবার চোখের ইঙ্গিতে ভর্ৎসনা করলাম। সুরেনদা অনিচ্ছাসত্ত্বেও সামলে গেলেন।

পরমবাবু একবার বাইরে গেলেন। সুযোগ পেয়ে এইবার জিজ্ঞাসা করলাম—এসব কি কাণ্ড শ্যামু?

বাবাজী হো হো করে হেসে উঠলেন।

বললাম—হাসলে কথার উত্তর পাওয়া যায় না। তোমাকে বলতে হবে, কেন এসব করছো। আমাদের কাছে বাজে কথা বলে নিষ্কৃতি পাবে না।

বাবাজী হাসতে লাগলেন। হাসির প্রতিধ্বনিতে মন্দিরঘরের বাতাস গমগম করতে লাগলো। শুধু হেসে চলেছেন। হঠাৎ দৃশ্য পরিবর্তন। বাবাজী একেবারে স্তব্ধ। শান্ত গম্ভীর মুখ, দু'চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়লো। বাবাজী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার সহজ হয়ে গেলেন।

আবার বলতে যাচ্ছিলাম, কুঞ্জবাবু কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে আপত্তি করলেন। কী করবো ভাবছি, বাবাজী বলে উঠলেন—নিতুবাবু, তোমরা এবার একটু কষ্ট কর।

ওরা সবাই অপেক্ষা করছে। কেষ্টকথাটা সেরে ফেলি, তারপর গল্পগুজব করা যাবে। তোমরাও এস সবাই।

বাবাজী গাত্রোত্থান করলেন।

কেষ্টকথা শোনবার অধিকারী সবাই হতে পারে না। বাবাজী যাদের মনোনীত করেন, শুধু তারাই শোনে। আশ্রমের উত্তর দিকে একটা লতা মণ্ডপের পাশে অল্প প্রশস্ত একটি ঘর। দুটি প্রৌঢ়া, একটি তরুণী এবং জনদশেক বৃদ্ধ প্রৌঢ় ও যুবক আগে থেকেই সেই ঘরে বসেছিল। আজকের দিনের মত এরা ছাড়পত্র পেয়েছে।

বাবাজী ও প্রধান শিষ্য পরমবাবুর সঙ্গে আমরা চারজনও এসে ঘরে ঢুকলাম। ঘরের দেয়ালে একটি বহু পুরাতন ছেঁড়া ময়লা ক্যালেণ্ডার টাঙানো। ক্যালেণ্ডারের ছবিটি হলো মুরলীধারী কৃষ্ণ, স্থানে স্থানে আবীর ও চন্দনের ছিটে লেগে আরও বিচিত্র হয়ে রয়েছে।

বাবাজী ধ্যানে বসলেন। সমবেত সকলেই চোখ বুঁজে ফেললো। সুরেনদা তো প্রায় সমাধিলাভ করে ফেলেছেন বলে মনে হলো। দেখলাম কুঞ্জবাবু মিটমিট করে একবার আমার দিকে তাকিয়ে শেষে চোখ বুঁজে ফেললেন। এই ঘরভরা আধ্যাত্মিক সুষুপ্তির মধ্যে শুধু আমারই চোখ দুটো আশঙ্কায় জেগে রইল।

শুনলাম, বাবাজী আস্তে আস্তে অস্পষ্টস্বরে একটা ভজন গাইছেন। এ ভজন কোনো কবির রচনা নয়। এই ধ্যানের আবেশে বাবাজী যা দেখছেন, সেই সব ঘটনা আপনা থেকেই সুর বেঁধে আর গান হয়ে তাঁর গলা থেকে বের হয়ে আসে।

হঠাৎ বাবাজী চীৎকার করে কীর্তনের সুরে গেয়ে উঠলেন—গোঠে গোকূলে বেণু বাজে। বাবাজী আকুল হয়ে মাথা দোলাতে লাগলেন। এক একবার হাত দিয়ে কান দুটো ঢেকে রাখছেন, যেন সেই বংশীধ্বনি তাঁর মরমে প্রবেশ করে মনপ্রাণ খাবলাচ্ছে।

আবার চুপ। বাবাজী নিষ্কম্প দীপশিখার মত সুস্থিরভাবে যেন জ্বলজ্বল করতে লাগলেন। প্রায় অর্ধ ঘন্টা এভাবে কেটে গেল। হঠাৎ একটা দমকা বাতাস ঘরের ভেতর এসে হুটোপুটি করতে থাকে। থরথর করে নড়ে উঠলো দেয়ালের ক্যালেণ্ডার।

—শুনে নে, যে আছিস শুনে নে। বাবাজী রোগীর মত ছটফট করে চেঁচাতে লাগলেন। তারপর দেয়ালের গায়ে একেবারে এলিয়ে পড়ে চুপ করে গেলেন। শুধু ঠোঁট দুটো কেঁপে বিড়বিড় করতে লাগলো।

সোহং! সোহং! সোহং! সকলেই শুনছে, ক্যালেণ্ডারের কৃষ্ণ কথা বলছে। দেখতে পাচ্ছি চরণডাক্তারের হাতের রোঁয়াগুলি শিউরে খাড়া হয়ে গেছে। এক জন বৃদ্ধ মূর্ছা গেলেন। বাকী সবাই মাথা ঝুঁকিয়ে কাঁপতে লাগলো।

একটি মিনিট মাত্র। বাবাজীর কাশির শব্দের সঙ্কেত বুঝিয়ে দিল, সমাপ্ত।

মধ্যাহ্নভোজনের পর আশ্রমের অতিথিশালার একটি ঘরে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম। আছি মাত্র তিনজন। সুরেনদা সরে পড়েছেন দল ছেড়ে। তিনি বাবাজীর

আশেপাশে ঘুরঘুর করছেন। মরমে মরে গিয়ে বুঝলাম, হারাধনের একটি ছেলে এই যে হারালো, আর ফিরছে না। বাবাজীর একটি শিষ্য সংখ্যা বাড়লো।

এইবার সত্যি ভয় পেয়ে গেলাম। শেষে কি একে একে নিভিবে দেউটি? যারা ভড়কাতে এল তারাই ভিড়ে গেল। সুরেনদার বিশ্বাসঘাতকতায় বাবাজী যেন আমাদের সমস্ত ষড়যন্ত্রের ওপর তুরুপ মেরে গেলেন। পরাজয়ের অপমানটা ভাল করেই গায়ে বিঁধলো।

বললাম—কুঞ্জবাবু! শ্যামুকে তো একলা পাওয়া যাচ্ছে না। এবার একটু উদ্যম নিয়ে লাগুন, বাগিয়ে ধরা যাক। শুধু ওর মতলব আর এই দশ বছরের হিস্ট্রি জেনে নেব। তারপর এস-ডি-ও সাহেবের কাছে একটা দরখাস্ত করে, সব ব্যাপার ফাঁস করে, আশ্রমটা ভেঙে ফেলবার...

কুঞ্জবাবু অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। চরণডাক্তার বললেন—একটু ভেবেচিন্তে যা হয় করা যাবে। ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

পরমবাবু খবর নিয়ে এলেন—বাবাজী বেড়াতে যাচ্ছেন শালবনে। আপনাদের ডাকছেন।

ভাবলাম, এই আর একটা সুযোগ। শালবনের কোন এক নিভৃতে শ্যামুকে বাগিয়ে ধরতে হবে। কিন্তু বেড়াতে বার হয়েই খানিকটা দমে গেলাম। বাবাজীর সঙ্গে আরও দশ বারোজন অন্তরঙ্গ চলেছেন। সুরেনদা বাবাজীর গা ঘেঁষে চলেছেন।

আমরা তিনজন পিছনে ছিলাম। বাবাজী দু'বার ডাক দিলেন—ওগো নিতুবাবু, পেছিয়ে কেন? আমার সঙ্গে এস।

কুঞ্জবাবু প্রায় দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে বাবাজীর পাশে পাশে চলতে লাগলেন। রাগ হলো, উপায় নেই। আছি শুধু সুযোগের অপেক্ষায়। শুধু শ্যামুকে নয়, সুরেনদাকেও ন্যাজেগোবরে নাজেহাল করে ছাড়বো। আর কুঞ্জবাবুর ব্যবহারটাও.....

চলেছি। আগে আগে বাবাজী হৃদ্‌ঘনশ্যাম, ভক্ত শিষ্য ও অন্তরঙ্গের দল শনিগ্রহের বলয়ের মত ঘিরে চলেছে। পিছনে মাত্র আমরা দু'টি অবিশ্বাসী ধূমকেতু যেন তাড়া করে চলেছি কিন্তু নাগাল পাচ্ছি না।

পাথুরে সড়কটা ধরে অনেকদূর এসেছি। এইবার রেললাইনটা পার হয়ে মাঠে নামবো, তারপর শালবন। শ্যামু গল্প আলাপ ও হাসিখুশিতে নিজে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে এবং প্রায় পনেরটি ভক্তহৃদয়ের ফানুস উড়িয়ে তেমনি হন্‌হন্‌ করে চলেছে।

হঠাৎ সকলে এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো—বাবাজী থামুন, থামুন। লাইন ক্রস করবেন না।

নাইন আপ ধোঁয়া ছড়িয়ে হু হু করে দৌড়ে আসছে। বাবাজী একটু হকচকিয়ে তারপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। ট্রেনটা কি জানি কিসের জন্য ক্রমেই মন্থর হয়ে, একটু দূরে এসে থেমে গেল।

পরমবাবু বললেন—এবার এগিয়ে চলুন বাবাজী। ট্রেন তো থেমে গেছে।

—হ্যাঁ, থেমে যেতেই হবে, চলো। বাবাজী হাসলেন। অতি গম্ভীর ও সূক্ষ্ম তত্ত্বে ভরা সেই হাসি।

বাবাজী আবার এগিয়ে চললেন—দেখলাম কুঞ্জবাবু চট করে ঝুঁকে পড়ে বাবাজীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। দৃশ্যটাকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। বললাম—কি ব্যাপার চরণবাবু? কুঞ্জবাবু শ্যামুকে প্রণাম করলেন মনে হচ্ছে?

চরণডাক্তারেরও মনের ভেতর অবিশ্বাসী ইঞ্জিনটার গর্জন যেন থেমে এসেছে। বোধহয় দম ফুরিয়ে এসেছে। তাই কোন মতে হাঁসফাঁস করে উত্তর দিলেন—তা প্রণাম করতে দোষ কি, বোধহয় পায়ে পা ঠেকেছে।

বললাম—পা ঠেকলে প্রণাম করতে হবে শ্যামুকে?

চরণডাক্তার আর কোন উত্তর দিলেন না। একসঙ্গে রাগ পরাজয় আর অপমান বোধে কিছুক্ষণের জন্য আমার সমস্ত অন্তরাত্মা মারমূর্তি হয়ে রইল। এদের সঙ্গটাও ঘৃণ্য মনে হতে লাগলো। বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। নইলে কীই বা এমন ভেল্‌কি এঁরা দেখলেন যে বিস্ময়ে আকাট মেরে গেলেন। ছেলেবেলায় স্কুলে পড়া গোল্ডস্মিথের সেই লাইনটা বার বার মনের মধ্যে চাবুক মারছিল। শেষে তাই হতে চললো। দোজ হু কেম টু স্কর্ফ রিমেনড্ টু প্রে!

মনের প্রতিবাদ চেপে রাখতে পারলাম না। আর বেড়াতে না গিয়ে একাই আশ্রমে ফিরে এলাম। আজ রাত্রের মোটরবাসে টাউনে ফিরে যাব।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। অতিথিশালার ঘরে আর কেউ নেই। বাইরে থেকে একটা সোরগোলের রব শোনা যাচ্ছে। মনে পড়লো, আমাকে যেতে হবে। সুরেনদা ও কুঞ্জবাবু আজ বোধহয় কেউ টাউনে ফিরছেন না। এক যদি চরণডাক্তার ফেরে। সে রকমও কোনো লক্ষণ দেখছি না। এতক্ষণে শালবন থেকে চরে ফিরেছে নিশ্চয়। যাবার আগে দু'কথা মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়ে যাব। শ্যামুকে নয়, আমারই সতীর্থ শিক্ষিত বন্ধু দুটিকে।

পরমবাবু একটা আলো হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন—একি, আপনি এখনো বসে রয়েছেন। ওদিকে যে....চলুন চলুন। জীবনে এ দৃশ্য দেখবার সুযোগ পাবেন না। যিনি মুক্ত, যিনি ভগবান পেয়েছেন, যিনি ত্রিকালজ্ঞ, তাঁর ইচ্ছাশক্তি, আহা। সে ইচ্ছাশক্তিকে ঠেকায় কে?

চমকে উঠলাম। কিছু ভয়ানক একটা ঘটেছে। বোধহয় আকাশ থেকে ফুলটুল পড়ছে; কিংবা মাটি ফুঁড়ে সরবত।

—কী ব্যাপার পরমবাবু?

—কুকুরভোজন।

—সে কি?

—হ্যাঁ, বাবাজীর আদেশ নির্দেশ ও ইচ্ছা। তাঁর কাছে জীব শিব একই। বাগানে

পাত সাজানো হয়েছে, সম্ভবত আসন করে। খিচুড়ি ও মাংস রান্না হয়েছে। পাতা সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—কুকুররা এসেছে খেতে?

—আসবে। আসবে। সেই জন্যই তো বলছি, উঠুন। এ দৃশ্য দেখে নিন। বাজারে গিয়ে ময়রার দোকানের কুকুরদের যথাবিহিত সৌজন্যের সঙ্গে নেমন্তন্ন করে আসা হয়েছে।

উঠলাম। চরণডাক্তার বোধহয় অনেক আগেই গিয়ে জুটেছেন। এ দৃশ্য দেখবো, ধন্য হব, তারপর হয়তো আত্মহত্যাও করে ফেলবো। পরমবাবুর সঙ্গে নেমন্তন্নের আসরের দিকে চললাম। যাবার পথে দেখলাম বাবাজী মন্দিরঘরে একা ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। তিনি এখন এভাবেই থাকবেন। কুকুরভোজন সমাধার পর নিজে অন্ন গ্রহণ করবেন। তার আগে নয়।

যেতে যেতে পরমবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—কুকুরদের নেমন্তন্ন করতে কে কে গিয়েছিল?

পরমবাবু—আমি ছিলাম, আপনার বন্ধু সুরেনবাবু ছিলেন, আরও দু'তিনজন।

—গিয়ে কি বললেন?

—বললাম, আজ সন্ধ্যায় বাবাজীর আশ্রমে আপনারা দুটি অন্নগ্রহণ করে সবাইকে কৃতার্থ করবেন।

—একথা বললেন? কুকুরগুলো কিছু বুঝলো?

পরমবাবু খুব পরিশ্রম করে বোঝাতে লাগলেন—না বললে রক্ষে ছিল। বাবাজী আমাদের আস্ত রাখতেন। কুকুর হয়েছে তো কি হয়েছে? আপনি বিষয়ী মানুষের দৃষ্টি দিয়ে এসব বিষয় বিচার করবেন না!

নেমন্তন্নের আসরের দিকে যাচ্ছি। দেখলাম, বাগানের কয়েকটা গাছে বড় বড় বাতি ঝুলিয়ে দিয়ে জায়গাটা আলোকিত করা হয়েছে। সারি সারি আসন পাতা। সামনে কলাপাতায় খিচুড়ি ও মাংস। মাংস ও খিচুড়ির সুগন্ধে বাগান থমথম করছে।

চারদিকে রব উঠলো—এসেছে, এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের নানাদিক থেকে, নানা ঘর ও কক্ষ থেকে উৎসুক দর্শক ছুটে আসতে লাগলো। বুঝলাম, নিমন্ত্রিত কুকুরেরা এসে গেছে। পরমবাবু দৌড়ালেন। আমি দৌড়তে আর পারলাম না। একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে এসে দর্শকদের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গলা উঁচিয়ে রইলাম।

দেখলাম দৃশ্য। কিন্তু কোথায় কুকুর? সব আসনগুলি খালি। শুধু একটা রোগাটে চেহারার সাদা রঙের দীনহীন কুকুর আসন থেকে একটু দূরে ভয়ার্ত ও সন্দিগ্ধ চোখে তাকাচ্ছে।

এক ভদ্রলোক ভাবে গদগদ হয়ে বললেন—ঐ যে এসেছে। আসতেই হবে। একে একে সবাইকে আসতে হবে।

আবার শুনলাম ফিসফিস করে কে একজন বলছে—কই পরমদা, কালোগুলোকে এত করে বলা হলো, একটাও এল না কেন?

ভাবুক ভদ্রলোক আবার যেন ভাবের ঘোরে ঢেঁকুর তুললেন ঘড়ঘড় করে—আসতেই হবে। একে একে সবাইকে আসতে হবে।

রাত্রি নটা বেজে গেছে। আর আধঘন্টা পরে মোটরবাস আসবে। ট্রাঙ্ক রোডের ওপর গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। সুটকেশটা হাতে নিয়ে উঠে পড়লাম।

বিদায় দেবার সময় সুরেনদা কুঞ্জবাবু ও চরণডাক্তার এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু কোনো কথা তাঁরা বলতে পারলেন না। চরণডাক্তারের হাবভাব দেখে বুঝে ফেললাম, তিনিও ভাল করে টোপ গিলেছেন। বাবাজীর অলৌকিক মহিমা বঁড়শির মত মনের নাড়ীতে গিয়ে বিঁধেছে। শুধু পরমবাবু অনুরোধ করলেন বারবার—আজ রাত্রিটা আপনিও থেকে গেলে পারতেন।

—না। বেশ রূঢ়ভাবে বললাম।

তবু শুধু পরমবাবু বিদায় দিতে ফটক পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। সড়কে পা বাড়িয়ে দিলাম। পরমবাবুকে নিছক ভদ্রতার খাতিরে একটা নমস্কারও জানালাম না। ইচ্ছে করেই করলাম না।

পরমবাবু কিন্তু হাত তুলে নমস্কার করলেন—আচ্ছা, আসছে পূর্ণিমায় অবশ্য আসবেন নিতুবাবু। বাবাজীর ইচ্ছেয় আর একটা উৎসব আছে। বাঘভোজন হবে।

বর্ণচোরা

মাত্র ছ'বছর বয়স ছেলেটার, কিন্তু মুখের চেহারাটা এরই মধ্যেই ঝামিয়ে গেছে। খুব রোগা। মাথার চুলগুলি পাতলা এবং ফাঁকা ফাঁকা। বয়স্ক মানুষের একটা ধুতি মালকোঁচা দিয়ে পরানো। ছোট শরীরে অপরিমিত ধূতির ভার অনেক চেষ্টা করে গুঁজে গেঁথে নেওয়া হয়েছে। গায়ে শুধু একটা গেঞ্জি। হারানমাস্টারের পিছু পিছু পোষা কুকুরছানার মত গোকুল সিঁড়ি বেয়ে জগৎবাবুদের কলকাতার বাড়ির দোতলায় এসে উঠলো।

দেশ থেকে ফিরেছে হারানমাস্টার। হারান জগৎবাবুর ছেলেপিলেদের পড়ায় আর নিজে কলেজে পড়ে।

বাড়ির সবাই চোখভরা কৌতূহল নিয়ে ঘিরে দাঁড়ালো হারানমাস্টার ও গোকূলকে। হারানমাস্টার প্রায় বিশ মিনিট ধরে বাংলাদেশেরই একটা গ্রামের ইতিহাস বর্ণনা করে শোনালো, যার সমার্থ হলো, এই গোকুল জগৎবাবুর ভাইপো-গোছের কেউ হয়।

জগৎবাবুর সংশয় ঘুচলো না। গোকুলকে দু'চারবার প্রখর দৃষ্টি দিয়ে পরীক্ষা করে মাথা নাড়লেন—উঁহু, ফটিকের ছেলে? কোন্ ফটিক?

হারান—আপনার জ্যাঠামশায়, মেজচৌধুরী নিত্যবাবুর ছেলে ফটিক?

জগৎবাবু—কোন্ নিত্যবাবু? কোন্ জ্যাঠা?

হারান—সেই যে সেটেলমেন্টে কাজ করতেন, আপনাদেরই খালপারের শরিক। নিত্যবাবুর ভাই সেই যে চৈতন্যবাবু, ইয়া পালোয়ানের মত চেহারা, ফৌজদারী মামলা করে ফতুর হলো। শেষে মরলো যক্ষ্মায়।

জগৎবাবু—ওসব কুলজী রাখ মাস্টার। বলো ছেলেটি কে?

হারান—আপনি কি শোনেননি, বিয়ের ক'মাস পরেই ফটিকদা পাগল হয়ে গিয়েছিল। তারপর চার মাসের মধ্যেই মারা গেল। গোকুলকে চোখে দেখে যায়নি।

জগৎবাবু—হুঁ, তাতে হলো কি?

হারান—ফটিকদার বউ আঁতুর থেকে বেরিয়ে মাত্র দেড় মাস বেঁচে ছিল। গোকুল এতদিন ছিল ফটিকদার শাশুড়ির কাছে। এবার বুড়িও পটল তুলেছে।

জগৎবাবু—বুঝলাম। তুমি যক্ষ্মা, পাগলামি আর খুন-ডাকাতির একটা চারা ঝাড় থেকে তুলে নিয়ে এসেছ।

জগৎবাবুর স্ত্রী নন্দা এতক্ষণে কথা বললেন—এরকম কপাল নিয়ে মানুষ সংসারে জন্ম নেয়! বাপকে খেলে, মাকে খেলে। যেখানে যায় পিদিম নিবে যায়। ওর ঠাঁই হবে কোথায়?

হারান—আমিও তাই বলছিলাম কাকিমা। দেখুন না, ভুগে ভুগে এই বয়সেই চেহারাটা কেমন...।

নন্দা—চামচিকের মত।

জগৎবাবু—বিড়ি-টিড়ি খায় বোধহয়।

হারানমাস্টার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। হঠাৎ গোকুলের দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—একি রে গোকু! এখনও চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছিস? জ্যাঠামশাইকে প্রণাম কর, আর ঐ যে জেঠিমাও রয়েছেন।

গোকুল এতক্ষণ কাঠগড়ার আসামীর মত দাঁড়িয়ে যেন দুই পক্ষের কৌঁসুলীর তর্ক শুনছিল। কি বুঝেছে তা সে-ই জানে। হারানের আকস্মিক নির্দেশে গোকুল চমকে উঠলো শুধু, কিন্তু আচরণে কোন উৎসাহ বা সাড়া দেখা দিল না। হারানের মুখের দিকে তাকিয়ে তেমনি চুপ করে রইল।

জগৎবাবু, নন্দা, হারানমাস্টার সবাই চুপ করেছিল, থিয়েটারের সিন বদলাবার আগে যেমন লোকে কিছুক্ষণ উৎসুকভাবে নীরব হয়ে থাকে। তারপরেই জগৎবাবুর গলা ঘড়-ঘড় করে উঠলো—হুঁ, প্রণাম করবে! ওকে বলো এখনই রাস্তায় গিয়ে লোকের পকেট মেরে আনতে, দেখবে ওর উৎসাহ।

হারান—আজ্ঞে হ্যাঁ, যেসব সাংঘাতিক মানুষের মধ্যে এতদিন ছিল, ওরকম হওয়া আশ্চর্য নয়। তবে কোন মহৎ লোকের দয়া ও আশ্রয় পেলে মতিগতি ঠিক হয়ে যাবে, নিশ্চয় মানুষ হবে।

জগৎবাবু—কিস্‌সু হবে না।

হারানমাস্টার আবার কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে, অক্ষম অসহায় ও উদাসীনের মত, তারপরেই হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে বলে—স্টিমারে একজন সাধু গোকুর হাত দেখে বেশ ভাল ভাল কথা বললো। ওর অদৃষ্টে নাকি এবার অন্নদাতা-যোগ আছে, আর অন্নদাতার না কি খুব সৌভাগ্য-যোগ আছে।

জগৎবাবু ও নন্দা সহসা বলবার মত কোন কথা খুঁজে পেলেন না। তাঁদের বিদ্রূপ ও বিরুদ্ধ মনের আপত্তিগুলিকে হারানমাস্টার যেন এলোমেলো করে দিয়েছে। হারানও এইবার সময় বুঝে তাক করে ওর আসল বক্তব্য বলে ফেললো—আপনাদের কাছে এনে ওকে ছেড়ে দিলাম। যেমন ইচ্ছে রাখুন।

জগৎবাবু—আরে না না না। নিজেই হাফ-এ ডজন নিয়ে বিব্রত। শুধু দুটো খেতে পরতে দেওয়ার প্রশ্ন নয়, মানুষ করবার দায়িত্ব। কে জানে, শেষে মানুষ হবে না বনমানুষ হবে? তুমি ওর অন্যত্র ব্যবস্থা করে দাও।

হারান—বেশ তো, এখন দু-একটা দিন এখানে জিরিয়ে নিক, তারপর নিশ্চয়....।

গোকুল থেকে গেছে, আজ দশ দিন হলো। নন্দা রাগে প্রায় আত্মহারা হয়ে ঝড়ের মত জগৎবাবুর কাছে এসে ভেঙে পড়লেন—দুধ দিয়ে কালসাপ পোষা হচ্ছে।

জগৎবাবু—লক্ষণ দেখা দিয়েছে নাকি?

নন্দা—দিয়েছে। মৃগেনবাবুর মেয়েরা বাড়ি এসে শুনিয়ে দিয়ে গেছে, গোকুকে নাকি আমরা কশাইয়ের মত কষ্ট দিচ্ছি। পেট ভরে খেতে দিইনি, শীতের জামা দিইনি, বিছানা দিইনি...।

জগৎবাবু—কেন তারা এসব বললে?

নন্দা—গোকু ছোঁড়া গিয়ে লাগিয়েছে নিশ্চয়।

জগৎবাবু—নিশ্চয় নয়। মৃগেনবাবুর মেয়েরা স্বচক্ষে কোন প্রমাণ দেখেছে, তাই বলেছে।

নন্দা রাগের মাত্রা রাখতে পারলেন না—তুমি বেশী ভালমানুষী ফলিও না।

জগৎবাবু—আমি যেটা জানতে চাইছি, সেটা স্পষ্ট করে বলো। জামা-বিছানা দেওয়া হয়েছে কিনা?

নন্দা—সবই দেবো ঠিক করেছিলাম। আজই দিতাম।

জগৎবাবু—কিন্তু দিয়ে উঠতে পারনি, এই তো? ওর খাওয়া-টাওয়ার ব্যাপারেও এইরকম কিছু হচ্ছে নিশ্চয়।

নন্দা—শুধু কাল রাত্তিরে মাছ দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। ....কিন্তু এইটুকু ছেলের হিসেবটা দেখলে? আজ ওকে আমি খুন্তি-পেটা করবো।

জগৎবাবু নন্দাকে সতর্ক করেন—কিন্তু তোমার এরকম ব্যবহার মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না।

নন্দা সবেগে ঘর থেকে বের হয়ে যান। বোঁচার গা থেকে সোয়েটারটা রূঢ়ভাবে খুলে নিয়ে আসেন। জগৎবাবুর সামনে জামাটাকে ছুঁড়ে দিয়ে বলেন—এই নাও। তোমার গোকুর গায়ে পরিয়ে দাও।

বাড়ির আবহাওয়া গোকুর উপদ্রবে অশান্ত হয়ে উঠেছে। হাঁপানীর রুগীর মত দম টেনে টেনে চেঁচিয়ে কথা বলে গোকু। যত সব গেঁয়ো বুলি। দাবী, বায়না, আবদার ক্রমে ক্রমে চড়েই উঠছে। বকুনি দিলে বা দু'এক ঘা চড়-চাপড় দিলে তো রক্ষা নেই, কদর্য কান্না আর চিৎকারে বাড়িশুদ্ধ লোককে অতিষ্ঠ করে তোলে। এবার আবদার ধরেছে—বই চাই। রাখু মিনু বোঁচা বই পড়ে, আমারও চাই।

হারানমাস্টার কান মলে পড়ার ঘর থেকে গোকুকে তাড়িয়ে দিল। গোকু রুখে এসে গড়িয়ে পড়লো রান্নাঘরে, নন্দার কাছে। তরকারির খোসাগুলির ওপর শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করে কান্না ধরলো। জলের গামলাটা উল্টে গেল। রাঁধুনে ঠাকুর চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে গোকুকে চিলেকোঠায় বন্ধ করে রাখলো।

নন্দা এবার নিঃসন্দেহ হয়েছেন, এ ছেলে বড় হয়ে বিভীষণ হবে। হবে না কেন? যে ছেলে এই বয়স থেকেই শিখেছে শুধু কি করে নিজেরটা বাগাতে হয়, সে তো ঘর-জ্বালানো ভাই-খেদানো বিভীষণ হবেই।

নন্দার অনুমান মিথ্যা হলো না। একে একে সব আদায় করেছে গোকু, ভিন্ন বিছানা পায়, গরম সোয়েটার পায়। সংগ্রামে আজ পর্যন্ত গোকুর পরাজয়লাভ ঘটেনি এবং জয়ের তালিকা ক্রমশ ভরে উঠেছে। একখানা বর্ণপরিচয় ও একখানা ধারাপাত পেয়েছে, চীনেমাটির সিংহ পেয়েছে একজোড়া।

সবচেয়ে আশঙ্কার কথা, গোকু বিশেষ করে তিনজনের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে—রাখু, মিনু ও বোঁচার। রাখুরা কখন কি খেল, কোথায় গেল, কেন হাসলো—গোকুর সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম যেন সজাগ হয়ে সব সময় পাহারা দিচ্ছে। কিছুই এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। গোকু যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখতে পায়, রাখু মিনু বোঁচা তেতলার ঘরে কপাট বন্ধ করে রেডিওর চাবি টানছে। অমনি গোকু ঘুম ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে, আর ছুটে গিয়ে মরিয়া হয়ে তেতলার ঘরের কপাটে লাথি মারে।

কাণ্ড দেখে নন্দা ভয় পাচ্ছেন সবচেয়ে বেশি। এবং জগৎবাবুও যেন বুঝেও কিছু বুঝছেন না। গোকুর এই প্রতিযোগিতার পরিণাম শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকবে কে জানে!

গোকুর কিন্তু একটা নিঃস্বার্থ সত্তা আছে। শুধু একজনের সম্পর্কে কোন বৈরিভাব, কোন স্বার্থবাদ এবং কোন প্রতিযোগিতা নেই। সে হলো লালু—নন্দার কোলের ছেলেটি। গোকু যখন লালুকে আদর করে তখন সে আদরের যেন সীমা থাকে না। লালুর পেটে নিজের মাথাটা ঘষে ঘষে গোকু হাসতে থাকে, লালুর ছোট ছোট পা দুটো মুখে পুরে দিয়ে গোকু নিজেই খুশিতে লাফাতে থাকে। লালুর হাতের কাছে মাথাটা এগিয়ে দিয়ে বার বার অনুরোধ করে—আমার চুল ছেঁড় লালু, একটু খিমচে দাও, লালু!

আনমনা হয়ে নন্দা কিছুক্ষণ গোকুর দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর চোখের ওপর কিছুক্ষণের জন্য যেন বহুদূরের আকাশকোণের মেঘের মত একটুকরো জলভরা

মেঘের ছায়া পড়ে। তেমনি আনমনে শান্ত-কোমল স্বরে গোকুকে বলেন—যাও গোকু, ঝিকে বলো তেল মাখিয়ে তোমায় স্নান করিয়ে দেবে। আর দেরি করো না।

যেন অন্য কোন মানুষ এই কথাগুলি বলছে আর নন্দা কান পেতে শুনছেন। এবং শুনতে পেয়েই একটু সতর্ক হয়ে ওঠেন। গোকুর মুখের দিকে আর না তাকিয়ে ত্রস্তভাবে লালুকে কোলে তুলে নেন, এবং লালুকে আদর করতে করতে ঘরের চারদিকে ঘুরতে থাকেন। খোঁজ করেন, লালুর নতুন মোজা জোড়া কোথায় গেল?

কিন্তু আবার পর পর কতগুলি তিক্ত ঘটনার বিস্বাদে বাড়ির মন বিষিয়ে উঠলো। গোকু ছাদের কার্নিশের ওপর দিয়ে হাঁটছিল, ঠাকুরটা খারাপ ভাষায় গোকুকে গাল দিয়েছে। জগৎবাবু ঠাকুরকে চড় মেরে তাড়িয়ে দিলেন। নন্দাকে হাত পুড়িয়ে রাঁধতে হলো।

আবার একদিন, সামান্য একটা ছবি নিয়ে গোকু একলাই রাখু মীনু বোঁচার সঙ্গে নিদারুণ মারামারি করলো। জাঁতি ছুঁড়ে মেরেছিল গোকু, মীনুর কপালটা কেটে গেছে, আর ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

এ বাড়িতে গোকুর থাকা আর চলতে পারে কি?

নন্দা বললেন—না, আর কোনমতেই গোকুকে এ বাড়িতে রাখা চলে না।

জগৎবাবুও বললেন—রাখা উচিত নয়।

হারানমাস্টার সব অভিযোগ শুনে নিয়ে সবচেয়ে বেশি রাগ আর চিৎকার করতে থাকে—। ঠিক বলেছেন কাকিমা। তবে আমার মতে ছোঁড়াটাকে আরও কিছুদিন রেখে বেশ একটু টিট না করে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

জগৎবাবু—তার মানে?

হারান—শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দিলে ওর কোন শিক্ষাই হবে না। আমি বলি, স্টুপিডটা দু'বেলা ঝিয়ের সঙ্গে বাসন মাজবে, এই নিয়ম করে দেওয়া হোক।

নন্দা ভ্রূকুটি করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং জগৎবাবু কিরকম একটা হাই তুলে যেন একটু বিরক্ত হয়ে গম্ভীরভাবে বলেন—তুমি সমস্যাটা বুঝতে পারছো না হারান।

—বাস্তবিক আমি বুঝতে পারছি না কাকাবাবু। ছোঁড়া কোথায় আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ হবে, না উলটো....

জগৎবাবু—বাজে কথা বলো না হারান, ছ'বছর বয়সের একটা বাচ্চা, কৃতজ্ঞতার বোঝে কি?

—আপনাদের দয়া-মায়া তো বুঝতে পারে?

—দয়ামায়া করলে বুঝতো ঠিকই কিন্তু...কিন্তু যেসব কাণ্ড হচ্ছে তাতে...।

নন্দার দিকে চকিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জগৎবাবু আবার মুখ ফিরিয়ে চিন্তিতভাবে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

নন্দা তীব্রস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন—কি কাণ্ড হচ্ছে? মিছিমিছি আমার ওপর দোষ চাপিও না বলে দিচ্ছি।

জগৎবাবু কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বললেন না, এবং ব্যস্তভাবে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

হারানমাস্টার নন্দাকে শান্ত করে—কিছু মনে করবেন না কাকিমা, কাকাবাবুর কথার কোন অর্থ হয় না।

—খুব হয়, হারান। উনি বলতে চাইছেন, গোকুর ওপর আমার বিদ্বেষ আছে। আমি গোকুকে কষ্ট দিচ্ছি, নিষ্ঠুরের মত। চার ছেলেমেয়ের মা হয়েও আমার মনটা নাকি ....।

চোখে আঁচলচাপা দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন নন্দা, তারপর যেন প্রতিজ্ঞা করার ভঙ্গীতে মনের সব জোর দিয়ে বলেন—পরের ছেলেকে আপন করতে পারবো না, পরের ছেলে ঘরেও রাখতে পারবো না। আমার দ্বারা এসব হবে না।

হারানমাস্টারের মুখ বিষণ্ণ হয়ে ওঠে, হতাশ ও নিরুপায়ের মত।

নন্দাই আবার যেন, নিজের মনের দিকে তাকিয়ে বিড়-বিড় করে বলতে থাকেন—একরত্তি ছেলে, কিন্তু কত হিংসুটে বুদ্ধি পেটে পেটে। কতরকম তার আবদার।

হারানমাস্টার—খাবার টাবার নিয়ে রাখু-মীনুদের সঙ্গে খুব হিংসেহিংসি করে বুঝি?

নন্দা—না না, ওসব কিছু নয়। সবাই যা খায়, গোকুও তাই খায়। খাবার নিয়ে হিংসেহিংসি করবে কেন?

হারান—জামাকাপড় নিয়ে?

নন্দা—না, এখন ওর জামাকাপড় তো রাখুর চেয়ে বেশি।

হারান—তবে?

নন্দা কোন উত্তর দেন না, অন্যমনস্কের মত বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ছ'বছর বয়সের একটা একরত্তি বাইরের ছেলে ঘরের ভেতর ঢুকে কিসের দাবী করে ভয়ানক সমস্যা সৃষ্টি করেছে, মুখ খুলে বলতেও যেন ভয় করছে নন্দার। অথচ ভয়টাকে উপেক্ষা করারও শক্তি পাচ্ছেন না।

মিথ্যে নয়, বড় বেশি দাবী করছে গোকু। কালকেই তো সারা দুপুরটা নন্দার আঁচল ধরে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে, ধমক দিলেও ছাড়েনি। জেদ ধরেছে গোকু, বোঁচার যেমন জন্মদিন হলো, তেমনি ওরও জন্মদিন করতে হবে। গোকুও চন্দনের টিপ পরবে, আর নন্দার কোলে বসে পায়েস খাবে।

হঠাৎ আতঙ্কিতের মত নন্দা বলে ওঠেন—না, আর এসব বাড়তে না দেওয়াই ভাল, হারান। তুমি একটা ব্যবস্থা করে ফেল।

হারান আরও শঙ্কিত হয়ে বলে ওঠে—কিসের ব্যবস্থা কাকিমা?

নন্দা—গোকুর ব্যবস্থা।

হারান—গোকুকে কি এখানে রাখতে চান না?

নন্দা আনমনার মত তাকিয়ে চুপ করে থাকেন।

হারানমাস্টার বলে—আচ্ছা তাই হবে।
ঘর ছেড়ে চলে গেল হারানমাস্টার।

হারানমাস্টার খবর নিয়ে এল। রাজচন্দ্র অনাথ আশ্রমেই ব্যবস্থা করা হলো।

জগৎবাবু কথাটা শুনেও খবরের কাগজের উপর মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিলেন। নন্দার বুকটা আচমকা দুরদুর করে উঠলো।

অনেকক্ষণ পরে জগৎবাবু বললেন—একটা দিন ঠিক করে ফেল। আর দেখ, ও যেন জানতে না পারে কিছু। বেড়াবার নাম করে নিয়ে যেও, পরে একবার গিয়ে কাপড়-চোপড় বিছানা দিয়ে এস।

মাত্র আর ক'টা দিন বাকি। এরই মধ্যে একদিন গোকুর জন্যে একখানা আলোয়ান কিনে নিয়ে এলেন জগৎবাবু। রাখু, মীনু ও বোঁচাকে নন্দা একদিন বেদম মার দিলেন—খবরদার যদি গোকুর সঙ্গে তোদের ঝগড়া করতে দেখি।

দিন এগিয়ে আসছে। গোকু একেবারে শান্ত।

হারানকে সেদিন চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলেন নন্দা—ও কিছু টের পেলে নাকি, হারান?

হারান—কি করে পাবে?

নন্দা—কিন্তু দেখছি তো, আজকাল সব সময় আমার পিছু-পিছু ঘুরছে। খেলতে বললে বই নিয়ে বসে। নিজেই সময়মতো স্নান করছে। বোঁচা পাজিটা ওর একটা খেলনা ভেঙে দিল, কিন্তু একটা কথাও বললে না গোকু, আশ্চর্য।

হারান—নতুন আলোয়ান দেখে কিছু মনে করেনি তো?

নন্দা—কে জানে কি মনে করেছে। কিন্তু আমার সত্যি ভয় করছে, হারান। এতটুকু একটা বাচ্চা, এখানে মন বসে গেছে। ওকে সরিয়ে দিচ্ছি জানতে পারলে সত্যিই কি আর যেতে চাইবে?

হারান—না না, ওসব কিছু নয় কাকিমা। কিস্‌সু টের পাবে না। এক ভাঁওতায় বের করে নিয়ে চলে যাব।

আর ক'টা দিন গেল, তারপর সেদিনের সেই সকালবেলার ঝকঝকে সূর্যটা উঠলো। বাড়িতে কোলাহল নেই। বেশ মিষ্টি মিষ্টি দিন। তারই মধ্যে হারানমাস্টারের গলার স্বর কর্কশ উল্লাসে বেজে ঠলো—ওরে গোকু, আজ আমি আর তুই চিড়িয়াখানা দেখতে যাব।

জগৎবাবু খবরের কাগজ রেখে উঠে পড়লেন। নন্দাকে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে জানালেন—আমি এখনি চললাম, অনেক জরুরি কাজ আছে। ফিরতে হয়তো বিকেল হয়ে যাবে।

নন্দার কোন আপত্তি শোনবার আগেই জগৎবাবু চাদর কাঁধে ফেলে বেরিয়ে গেলেন। নন্দা যেন হিংস্র এক দুর্যোগের মুখে একা অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

ওপরতলা থেকে মিছিমিছি নীচেরতলায় একবার নামলেন নন্দা। আবার উঠলেন।

যেন ছটফট করে ছুটোছুটি করছেন নন্দা। একটা ভয়, একটা দমবন্ধ বেদনা যেন আজ সারাদিন তাঁর সমস্ত চিৎকার গা ছুঁয়ে রয়েছে. সরানো যাচ্ছে না। গোকু আজ সকালেই ঘুম থেকে উঠে বলেছে—আমি আজ থেকে রাত্রে তোমার কাছে শোব বড়মা, বড্ড ভূতের ভয় করে।

নন্দা একবার ভাবলেন—এখনি সেজমামার বাসায় চলে যাই। সন্ধ্যের পর ফিরে আসা যাবে।

হারান এসে নন্দার কাছে হেসে হেসে বলে—তৈরি থাকুন কাকিমা, দুপুরে এসে গোকুকে নিয়ে যাব।

নন্দার গলা কাঁপতে থাকে—ছেলেটা সব বুঝে ফেলেছে, হারান। সারাটা সকাল আনাচে-কানাচে লুকিয়ে ফিরছে। ও যেতে চাইবে না।

হারান—না কাকিমা, বৃথা আশঙ্কা করছেন।

নন্দা—একেবারে এইটুকু বাচ্চা, আপন-পর জ্ঞান নেই। এটা পরের বাড়ি বলে যদি বুঝতো তবে কোন ভাবনা ছিল না।

ঠিক সন্ধিক্ষণ বুঝেই যেন গোকু তার দাবীকে আরও প্রচণ্ড করে তুলেছে, তাই নন্দার পরে এভাবে না পালিয়ে থেকে উপায় নেই। বড়মা! বড়মা! ওপরতলা থেকে নীচেরতলা নেমে নন্দাকে সন্ধান করছে গোকুর কণ্ঠস্বর। ডাক শুনতেই নন্দা এঘর থেকে ওঘরে সরে পড়েন। গোকু যেন আজ চরম জানা জেনে নিতে চায়, আজ রাত থেকে ভূতের ভয়ে নন্দার গা ঘেঁষে শোবার অধিকার তার আছে কি না।

কিন্তু আশ্চর্য, আজ আর জেদ নেই, উৎপাত উপদ্রবের কোন লক্ষণ নেই গোকুর কথায় কিংবা আচরণে। অনেকক্ষণ ঘুর-ঘুর করার পর যখন নন্দাকে মুখোমুখি দেখে ফেলে, তখনই শুধু ব্যস্তভাবে নন্দার সামনে এগিয়ে আসে, আর এই সাংঘাতিক বায়নাটাকে অতি কোমল ও দুর্বল নাকিসুরে যেন আবৃত্তি করে গোকু।

উত্তর দেন না নন্দা, এবং গোকুর মুখের দিকে না তাকিয়ে ব্যস্তভাবে অন্য কোন কাজের উদ্দেশ্যে অন্য দিকে চলে যান। যেন গোকু আবার এসে ধরতে না পারে, একেবারে ভাঁড়ার ঘরের ভেতরে ঢুকে এবং জানালা বন্ধ করে অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকেন।

কিন্তু তবু শোনা যায়, নাকিসুরের শিশুকণ্ঠের একটা ভয়ানক আবদার যেন নন্দাকে গ্রাস করার জন্য সিঁড়ি থেকে চিলেকোঠা পর্যন্ত সন্ধান করে ফিরছে।

অনেকক্ষণ পরে, দোতলার বারান্দায় একটা শোরগোল শুনতে পেয়ে ভাঁড়ার ঘরের গোপনতা থেকে বের হয়ে আসেন নন্দা।

জগৎবাবুর অফিসের দারোয়ান এসে হাঁকডাক করছে। কতগুলি জিনিসপত্র বারান্দার মেঝের ওপর রেখে দারোয়ান বলে, বড়বাবু এই সব জিনিস আর এই চিট্‌ঠি ভেজিয়েছেন।

সার্টিনের ছোট একটা কোট আর একটা প্যান্ট, এক শিশি লজেন্স, কতকগুলি

রঙিন পুতুল আর একটা ছবির বই। এই সব জিনিস, এবং তার সঙ্গে চিঠি 'আমার বাড়ি ফিরতে দেরী হবে। গোকুর সঙ্গে এই জিনিসগুলি দিয়ে দিও।'

তিনতলার সিঁড়ি ধরে তর্‌তর্‌ করে খরগোসের বাচ্চার মত লাফিয়ে নেমে আসে গোকু এবং এসেই দু'হাত দিয়ে নন্দার একটা হাত ধরে ঝুলে পড়ে। — বড়মা!

গোকুও ক্লান্ত হয়েছে, তার আবেদনের ভাষাটাও ছোট হয়ে এসেছে। সব কথা যেন ঐ একটা কথার মধ্যে বলে দিতে চায় গোকু—বড়মা।

নন্দা বলেন—ছিঃ, এরকম করতে নেই, গোকু। গোকু নাকিসুরে প্রতিশ্রুতি জানায়, লালুকে একটুও কাঁদাবে না, শুধু বড়মার বিছানার একপাশে শুয়ে থাকবে।

গোকুর দু'হাতের বন্ধ থেকে নিজের হাতটা আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিলেন নন্দা। তারপর অবিচলিতভাবে বলেন—এই সব জিনিস তোমার জন্যে এসেছে গোকু। নিয়ে যাও।

গোকু নিষ্পলকভাবে নন্দার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

নন্দা বলেন—নিয়ে যাও গোকু, কেমন সুন্দর লাল নীল সব জিনিস।

গোকু তবুও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। নন্দা উৎসাহিতভাবে বলেন—এই সব তোমার জিনিস গোকু, রাখু বোঁচা মিনু কেউ কিছ্ছু পাবে না।

গোকু আবার জিনিসগুলির দিকে তাকায়। শিশুচোখের দুই চঞ্চল তারকা একটা রঙিন লোভের স্তূপের দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকে। মুগ্ধ হয়েছে গোকু। নিশ্চিন্ত হন নন্দা।

ওপরতলায় চলে গেলেন নন্দা এবং আরও নিশ্চিন্ত হলেন তখন, যখন কান পেতে আর শুনতে পেলেন না নাকিসুরের আহ্বান। একেবারে নিশ্চিন্ত হলেন যখন আবার দোতলায় নেমে এসে দেখতে পেলেন, গোকু একমনে রঙিন পুতুল আর ছবির বই নিয়ে খেলা করছে।

দুপুর হতে আর বড় বেশি বাকি নেই। হারানমাস্টারের আসবার সময় হয়ে এল। কিন্তু এরই মধ্যে ঘটনার রকমটাও উল্টে গেছে। কিছু বুঝে উঠতে না পেরে নন্দা আবার দুশ্চিন্তায় পড়লেন।

নতুন সমস্যা হলো, গোকু একেবারে শান্ত হয়ে গেছে। ঘরের কোথায় কোন্‌ আনাচে-কানাচে লুকিয়ে থাকছে গোকু, অনেক ডেকে ডেকে এবং খুঁজে খুঁজে বের করতে হচ্ছে গোকুকে।

ওপর নীচ এবং এঘর-ওঘর অনেকক্ষণ ধরে সন্ধান করার পর নন্দা দেখতে পান, গোকু বসে আছে বারান্দায় থামের পাশে চুপ করে। কখনও বা বাইরের ঘরে জগৎবাবুর টেবিলটার কাছে। কখনো দেখা যায়, দোতলার সিঁড়ির ধাপে, কিংবা একটা জানালার ওপরে উঠে বসে আছে গোকু। রাখু, মীনু বোঁচা সবাই ঝি-এর সঙ্গে মামাবাড়ি বেড়াতে চলে গেল, চোখের সামনে এমন ঘটনা দেখতে পেয়েও বিচলিত হলো না গোকু। ওর অন্তরাত্মা যেন এ বাড়ির জানালার গরাদ আঁকড়ে পড়ে থাকবার জন্য একটা সিদ্ধান্ত এরই মধ্যে করে ফেলেছে।

স্নান করতে বলা মাত্র স্নান করলো গোকু এবং খেতে বলা মাত্র খেয়ে নিল। গোকুর সত্তা থেকে যেন সব বিদ্রোহ শেষ হয়ে গেছে। হাত-পা থেকে সব দুরন্তপনা পালিয়ে গেছে। চোখ থেকে সব কৌতুহলের উগ্রতা উবে গেছে এবং কণ্ঠস্বরে আবেদন রুদ্ধ হয়ে গেছে।

তবে কি কিছু টের পেয়ে গেছে গোকু? সন্দেহ করে মনে মনে আবার আতঙ্কিত হন নন্দা। আনাচে-কানাচে লুকিয়ে থাকে কেন? এমন শান্ত হয়ে গেল কেন গোকু? দেখে মনে হয়, গোকু যেন এক অদৃশ্য ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যে এই প্রশ্ন নিবেদন করছে—আমি তো এখন আর কোন সমস্যা নই। আমি তো জোর করে কোন দাবী আর করছি না। রাখু, মীনু, বোঁচার কাছ থেকে দূরে দূরে সরে সরে থাকছি। তবে আজ আমাকে সরিয়ে দেবার জন্য এত চেষ্টার দরকার কি?

কিন্তু এমন করে ভাষা গুছিয়ে প্রশ্ন করবার শক্তি তো এইটুকু ছেলে থাকতে পারে না। নন্দা শুনছেন তাঁর নিজেরই মনের প্রশ্ন, এবং শুনেই চমকে উঠছেন।

তবে কি চিড়িয়াখানা দেখতে চাইবে না গোকু? সত্যিই কি কিছু সন্দেহ করেছে? নইলে হঠাৎ এত সতর্ক হয়ে ওঠে কেন?

হারানমাস্টার এসে গেল। সমস্ত বাড়ির মনটা যেন পাকা শিকারীর মত সতর্ক হয়ে ওঠে। গোকু যেন টের না পায়। নন্দা আবার হারানকে জিজ্ঞাসা করলেন—আশ্রমে মারধর করে না কি হারান?

—আজ্ঞে না, কাকিমা। সুন্দর সুন্দর মাদুর বুনতে শেখায়।

নন্দা চুপ করে বসে রইলেন।

হারান প্রশ্ন করে—গোকু কোথায়?

নন্দা উত্তর দেয়—পড়ার ঘরে গোকু ঘুমিয়ে পড়েছে।

গোকুকে জাগিয়ে ওঠাবার জন্যে পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলো হারানমাস্টার।

নন্দার কি-রকম একটা আশঙ্কা ছিল গোকু যেতে চাইবে না। বোধহয় সব ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেছে গোকু। কিন্তু থেকেই বা কি হবে ওর? এই রক্তমাংসের সূত্রে বাঁধা মায়া-মমতার ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যে ছ'বছর বয়সের বাইরের মানুষকে কেমন করে ঠাঁই দেবে নন্দা? ছ'বছরের দশ মাস আগেই আসা উচিত ছিল গোকুর, এখন আর উপায় নেই।

কোন উপায় নেই? একটা উল্টো প্রশ্ন যেন দূরের ঝড়ের শব্দের মত নন্দার কানের মধ্যে বাজতে আরম্ভ করে। ওলট-পালট হয়ে যায় মনের ভেতরটা। উপায় আছে বৈকি। বিনা বেদনায়, বিনা প্রসবে ও বিনা আঁতুড়ে একটা শিশু কোলের কাছে এসে গেছে, এ সত্য বিশ্বাস করে নিলেই তো উপায় হয়ে যায় এবং আর কোনো সমস্যাই থাকে না। কিসের ভয়? বাধা কোথায়?

হঠাৎ চেঁচিয়ে ডাকতে থাকেন নন্দা—হারান, হারান। যেন আর সমস্যা নেই।

গোকু যখন যেতে চায় না, নন্দাই বা গোকুকে যেতে দেবেন কেন? তিনতলার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে আরও জোরে চেঁচিয়ে ডাক দিলেন নন্দা—একবার শুনে যাও, হারান।

ভীরুর মত চুপি চুপি এবং পা টিপে-টিপে দোতলা থেকে নেমে এসে হারান বলে—সব বুঝে ফেলেছে, কাকিমা। এই দেখুন, পুঁটলি বেঁধে সব গুছিয়ে রেখেছে। একেবারে তৈরি হয়েই রয়েছে।

নন্দা দেখলেন, চীনেমাটির সিংহ, ছবির বই, সিগারেটের রাংতা, গণেশের ছবি সব কিছু এক করে জড়ানো একটা পুঁটলি ফিতে দিয়ে আলগা করে বাঁধা। ফিতের গেরোটা কেমন এলোমেলো, গোকুর ছোট হাতে এর চেয়ে বেশি বাঁধন দেবার ক্ষমতা নেই, শক্তিও নেই বোধহয়।

নন্দা হতবুদ্ধির মত খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপরেই চেঁচিয়ে উঠলেন—যাও তোমরা, এবার সরে পড়, আর দেরি করো না।

গোকুর ঘুম ভাঙাবার জন্য তেতলার ছাদে আবার চলে গেল হারানমাস্টার। ঘরের দরজা সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে নন্দা চুপ করে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। হঠাৎ বুঝতে পারলেন, সিঁড়ি হয়ে তেতলা থেকে কতগুলি পায়ের শব্দ নেমে আসছে। কপাট খুলে দরজার কাছে দাঁড়ালেন নন্দা।

দেখলেন নন্দা, গোকুর বিছানা আর জামাকাপড়ের ছোট বাক্সটা দু'হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে হারানমাস্টার সিঁড়ি ধরে নেমে আসছে। সঙ্গে গোকু। গোকুর হাতে তার যত রঙিন জিনিসপত্রের সেই ভয়ঙ্কর পুঁটলিটা। এবাড়ির ষড়যন্ত্রের ওপর এখন আর কোন আবরণ নেই, তাই ঘটনাটাকে যেন দু'চোখ দিয়ে বেশ ভাল করে চিনে নিয়ে স্বচ্ছন্দে চলে যাচ্ছে গোকু।

দরজার কপাটটা শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন নন্দা। নন্দার চোখের ওপর দিয়ে, এবং নন্দার ধীর-স্থির-শান্ত-দমবন্ধ শরীরটার প্রায় কাছ ঘেঁষে চলে গেল গোকু। সিঁড়ির শেষ ধাপ পর্যন্ত নেমে চলে গেল, তবু একবার ফিরে তাকাল না।

সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন নন্দা। কি ভয়ানক অপমান করে, কি যেন ঠকিয়ে আর কি যেন বাগিয়ে নিয়ে একটা দস্যুর মত চলে গেল ছেলেটা।

আত্মজা

উপেনবাবুর ছেলে নেই, একথা তাঁরা সকলেই জানেন যাঁরা উপেনবাবুকে জানেন। সন্তান বলতে শুধু দুটি মেয়ে আছে উপেনবাবুর।

নিকট আত্মীয় অথবা বন্ধুস্থানীয় যাঁরা উপেনবাবু সম্পর্কে আরও বেশি খবর রাখেন, তাঁরা জানেন যে, উপেনবাবুর মেয়ে হলো একটি এবং আর একটি হলো মেয়ের মতো।

রমা আর অম্বি। একটি হলো উপেনবাবুর আত্মজা, আর একটি হলো পালিতা। একটি মেয়ে এবং একটি মেয়ের মতো, এই দুই সন্তানকে নিয়ে সপত্নীক উপেনবাবু একটা বহু পর্যটনার সার্ভিস খাটতে খাটতে সারা ভারতের প্রায় অর্ধেক ভূখণ্ডের জল-বাতাস উপভোগ করে এখন কলকাতায় এসে অবসর উপভোগ করছেন। পণ্ডিতিয়ার পশ্চিমে পুরনো বস্তি ভেঙ্গে যে নতুন রাস্তাটা হয়েছে, তারই পাশে উপেনবাবুর নতুন বাড়ি।

প্রতিবেশিনীদের মধ্যে যাঁরা নবাগত উপেন পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হননি, তাঁরা অনুমান করেন, এই দুটি মেয়ে নিশ্চয় যমজ মেয়ে। দুজনেই মাথায় মাথায় সমান। দুজনেই বেশ দেখতে, মুখের ধাঁচে দুজনের মধ্যে কোন পার্থক্যও দেখা যায় না। দুজনেরই চোখ দুটো একই রকমের টানা-টানা। তবে একজনের গায়ের রঙ হলো মায়ের গায়ের রঙের চেয়ে একটু বেশি উজ্জ্বল, এবং আর একজনের গায়ের রঙ মায়ের তুলনায় কম ফরসা। কেমন একটা শ্যামল ছায়া দিয়ে মাখানো রঙ। বয়স দুজনের তো একেবারে সমানই মনে হয়, এবং স্বভাবও যে একই রকমের। প্রতিবেশিনীদের মধ্যে সবচেয়ে নিন্দুক চক্ষুগুলিও দেখে খুশি হয়েছে, আলাপে আচরণে এবং চলায়-বলায় দু'জনেই বেশ শান্ত। যেমন লাজুক, তেমনি ভদ্র। এত মিল যখন, তখন এ'দুটি মেয়ে নিশ্চয় যমজ মেয়ে।

পরিচিত হবার পর প্রতিবেশিনীদের ভুল ভাঙ্গে। উপেনবাবুর স্ত্রী চারুবালাই আগন্তুকা আলাপচারিণীর ভুল ভেঙে দেন।

চারুবালা বলেন—রমা হলো আমার মেয়ে, আর অম্বিকে আমার মেয়ের মতোই মনে করতে পারেন।

প্রতিবেশিনীদের কৌতূহল আর মুখের প্রশ্নগুলির সামনে রমা হাসিমুখে বসে থাকে, আর অম্বি মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে। কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হয়। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে আনমনার মতো দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে অম্বি।

প্রতিবেশিনীরা বললে—তাই বলুন। আমরা তো ভেবেই পেতুম না, দু'বোন হয়েও দু'জনের মধ্যে একটুও মিল নেই কেন।

রাজশাহীর পিসিমা প্রায় কুড়ি বছর পরে এলেন তাঁর ভাই উপুকে দেখতে। রমা পিসিমার পায়ে হাত দিয়ে সামনে বসে থাকে, আর অম্বি পাখা হাতে নিয়ে পিসিমার মাথায় বাতাস দেয়।

পিসিমা প্রশ্ন করেন—এটি কে রে উপু?

উপেনবাবু—ও হলো রমা, আমার মেয়ে।

পিসিমা—আর এটি কে?

উপেনবাবু—ওর নাম অম্বালিকা। আমার মেয়ের মতোই।

হঠাৎ ব্যথা পাওয়ার মতো অম্বির হাতটা চমকে ওঠে, হাতের পাখা তুলে মুখ ঢাকা দেয় অম্বি। কে জানে, নিজের পরিচয় শুনে এভাবে চমকে উঠে অম্বি, বুঝি ঐ

পরিচয়টাকেই সহ্য করতে পারে না। কিংবা একটা অহেতুক লজ্জা? চারুবালা জানেন, অম্বির এই একটা বেয়াড়া অভ্যাস।

পিসিমা প্রশ্ন করেন—তোদের কাছেই মেয়েটা মানুষ হয়েছে বুঝি?

উপেনবাবু—হ্যাঁ।

পিসিমা—নামটা ওরকমের কেন?

উপেনবাবু—নামে কি আসে যায় বড়দি। মুখে একটা নাম চলে এল, সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিলাম, ব্যস্।

এর বেশি কিছু আর বড়দিকে জানাবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না উপেনবাবু। কাউকেই এর বেশি কিছু কোনদিন বলেনওনি। উপেনবাবুর এই অল্প কয়েকটি কথার ভিতর দিয়ে প্রায় কুড়ি বছর আগের যে-ঘটনার ছবি তাঁর মনের মধ্যে চকিতে উঁকি দিয়ে চলে গেল, সে ঘটনা শুধু জানেন উপেনবাবু এবং তাঁর স্ত্রী চারুবালা। অম্বালিকা, এই নামের ইতিহাসের সঙ্গে অম্বির জীবনেরই ইতিহাস মিশে রয়েছে। সে বড় পুরনো ইতিহাস, আজ সেটা নিছক একটা আষাঢ়ে কাহিনীর মতোই অবাস্তব বলে মনে হয়।

পূর্ব গোদাবরী জেলার ভিতর তখন যে নতুন রেল লাইন তৈরি করা শুরু হয়েছিল, তার তদারকের ভার ছিল রেল ইঞ্জিনিয়ার উপেনবাবুরই উপর। গোদাবরীর একটা শাখাস্রোতের ধারে রেল ইঞ্জিনিয়ারের বাংলো। কুলিরা মাস ছয়েক বয়সের একটি মেয়েকে নিয়ে এসে বাংলোর বারান্দায় শুইয়ে দিল।

উপেনবাবু বিরক্ত হন—কার মেয়ে? এখানে কেন?

কুলিরা বলে—আপনার ট্রলিম্যানের মেয়ে।

উপেনবাবু—কোন ট্রলিম্যান? সেই ভাল্লুকে আঁচড়ানো মুখ, রোগা-মতন লোকটা?

কুলিরা—হাঁ সাব।

উপেনবাবু—সে কোথায়?

কুলিরা—কলেরায় মরেছে। ওর বউও মরেছে। দুজনকেই নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু এই মেয়েটা এখনো বেঁচে আছে; কিন্তু এটাকে তো আর ভাসিয়ে দেওয়া যায় না সাব।

উপেনবাবু — নিশ্চয় না, কিন্তু এ সব ঝামেলা এখানে কেন? গাঁয়ের কোন লোকের বাড়িতে ওকে রেখে দিয়ে এস।

কুলিরা আক্ষেপ করে—এ জাতের মেয়েকে এই গাঁয়ের কেউ ঘরে রাখবে না সাব।

উপেনবাবু চুপ করে থাকেন। একটা কুলি বলে—ওকে তো শেয়ালে টেনে নিয়েই যাচ্ছিল। যদি আমরা ঠিক সময় মতো না পৌঁছে যেতাম, তবে এতক্ষণে ওর...।

ঘরের ভিতরে দু'মাসের রমাকে আয়ার কোলে তুলে দিয়ে চারুবালা বাইরে বের হয়ে আসেন।—শেয়ালে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল? ঐ মেয়েকে?

কুলিরা বলে—হাঁ, মেমসাব।

চারুবালা বলে—মেয়েটা রইল, তোমরা যাও।

কুলিরা চলে যায়, এবং আবার ঘরের ভিতরে এসে দু'মাসের রমাকে আয়ার কাছ থেকে নিজের কোলে নিয়ে চারুবালা বলেন—ঐ মেয়েটাকে এখনি গরম জল আর সাবান দিয়ে স্নান করিয়ে একটা জামা পরিয়ে দাও আয়া।

কাজে বের হয়ে যান রেল ইঞ্জিনিয়ার উপেনবাবু। দশ মাইল দূরের অফিস-তাঁবু থেকে ট্রলি করে ফিরে এসে যখন আবার এই বাংলো-বাড়ির বারান্দায় উঠলেন উপেনবাবু, তখন রাত মন্দ হয়নি। বারান্দায় চেয়ারে বসে ধুলোমাখা বুটের ফিতা খুলতে খুলতেই চেঁচিয়ে চারুবালাকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—মেয়েটা ঘুমিয়েছে নাকি?

চারুবালা—কোন মেয়েটা?

উপেনবাবু—ঐ যে, সেই মেয়েটা। আজ সকালে যে অম্বালিকাটি এসেছে।

চারুবালা—হ্যাঁ, দুধ খেয়ে আয়ার কাছে ঘুমিয়ে আছে।

যেমন আকস্মিক মেয়েটার আবির্ভাব, তেমনি আকস্মিক মেয়েটার নামকরণ। প্রায় কুড়ি বছর আগে ঐ ছয়-মাসের যে একটা প্রাণ শিয়ালের মুখ থেকে উদ্ধার পেয়ে রেল-ইঞ্জিনিয়ার উপেনবাবুর কোয়ার্টারের একটি ঘরে দুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, সেই প্রাণটাই আজ উপেনবাবুর নিজের মেয়ের মতো হয়ে গিয়েছে।

এই মেয়েকে নিজের মেয়ের মতো মনে করবার অথবা গড়ে তুলবার কোন ইচ্ছা ছিল না উপেনবাবুর, চারুবালারও না। শুধু একটা প্রাণকে ক'টা দিন আশ্রয় দিয়ে আর খেতে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা, এইমাত্র। থাকুক কিছুদিন। আর এক বছর পরেই তো এদিকের কাজ শেষ হবে, নতুন সার্ভের কাজে গঞ্জামে বদলি হয়ে চলে যাবার আগেই এই মেয়েকে ওর জাতের একটা লোকের হাতে সঁপে দিয়ে কিছু টাকা দিয়ে চলে গেলেই হবে।

এক বছর পরেই, বদলি হবার আগে খোঁজ-খবর করায় মাইল দশেক দূরের এক গাঁ থেকে ক'জন জাতের লোকও এসেছিল। মাত্র পঞ্চাশটা টাকা পেলেই তারা সেই জাতের মানুষ করবার ভার নিতে রাজি আছে।

ঘরের ভিতর থেকেই চারুবালা বলেন—দূর কর, দূর কর! কোত্থেকে কতগুলো অলুক্ষুণে আপদ এসে জুটেছে।

লোকগুলির দিকে ভ্রূকুটি করে উপেনবাবুও বলেন—আগে নিজেরা মানুষ হও, তারপর পরের মেয়েকে মানুষ করবে।

চেয়ার থেকে উঠে সত্যই তাড়া দিলেন উপেনবাবু—ভাগো, ভাগো, ভাগো!

অমানুষগুলিকে তো ভাগিয়ে দেওয়া হলো, কিন্তু অস্থির মনুষ্যত্বের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা না করে পারেননি উপেনবাবু, চারুবালাও। যদি এই মেয়ে এভাবে বড় হয়ে উঠতে থাকে, এবং যদি এভাবে কারও কাছে এ মেয়েকে তাঁরা ছেড়ে দিতে না

পারতে থাকেন, তবে এই মেয়ের পরিণামই বা কি হবে? সমস্যাটা কল্পনা করতে পেরেছিলেন উপেনবাবু। এ মেয়ে তাহলে যে বাড়ির মেয়ের মতোই হয়ে উঠবে।

কিন্তু বাড়ির মেয়ের মতো হয়ে উঠলে ক্ষতি কি? কিসের ভয়? এই প্রশ্নগুলিকেও দূরদর্শী উপেনবাবু বিচার করে দেখতে আর বুঝতে ভুলে যাননি।

ক্ষতি, মেয়েটারই ক্ষতি। মেয়েটার মনটা হয়ে যাবে এ-বাড়ির মেয়ের মন, অথচ বিয়ে দেবার জন্য খুঁজতে হবে এ বাড়ির চেয়ে অনেক নীচের জাতের একটা বাড়ি। সে বাড়িকে তখন এই মেয়েটাই বা সহ্য করবে কেমন করে?

উপেনবাবু আর চারুবালার ক্ষতিটাই বা কি কম হবে? একটা মমতার ভুলে মেয়েটাকে যদি একেবারে বাড়ির মেয়ের মতো করে ফেলা হয়, তবে যার-তার হাতে আর যে-সে ঘরে মেয়েটাকে তুলে দিতেও যে মনটা কেমন কেমন করে উঠবে!

সতর্ক হয়েছিলেন, এবং একটা পরিকল্পনাও করেছিলেন উপেনবাবু। চারুবালাও সায় দিয়ে বলেছিলেন—তাই ভাল। গঞ্জামে থাকতে থাকতে একটা ব্যবস্থা করে ফেললেই হবে।

গঞ্জামে থাকতে থাকতেই কোন একটা চাপরাশি বা ভেণ্ডারের ছেলের সঙ্গে অম্বির বিয়েটা দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। এই রকম শিশু বয়সেই তো এ জাতের বিয়ে হয়। শুধু খোঁজ করে বের করতে হবে, ভাল একটা ছেলের বাপ। খেটেখুটে খেয়ে-পরে আছে, এইরকম একটি শ্বশুরের হাতে অম্বির ভাগ্যকে সঁপে দিতে পারলেই দায়মুক্ত হওয়া যাবে। মোটামুটি এই ছিল উপেনবাবুর পরিকল্পনা।

আশ্চর্যের বিষয়, গঞ্জামের তিনটি বছরের মধ্যে একটি দিনও অম্বির জন্য পাত্র খুঁজবার চেষ্টা করেননি উপেনবাবু। চারুবালাও স্মরণ করিয়ে দেননি। গঞ্জাম থেকে বদলি হয়ে যাবার আগে উপেনবাবু বললেন—না, আর বেশি দেরি করা উচিত নয়। সাসারামে গিয়েই একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। মেয়েটাকে আর বেশি ভদ্র করে তুলে লাভ নেই। বয়স অল্প থাকতে থাকতেই আর মনটা পেকে উঠবার আগেই রেল-অফিসের কোন ছোকরা পিওন-টিওনের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দিলেই হবে।

চারুবালা বলেন—দিতেই হবে। একটু ভাল পণ দিলে ওরকম পাত্রও পেয়েই যাবে।

সাসারামে পাঁচ বছর কাটিয়ে ঝাঁসি যাবার সময় আক্ষেপ করলেন উপেনবাবু—এ তো বাড়ির মেয়ের মতোই হয়ে উঠছে দেখছি। এখন কি যে করি ভেবে পাচ্ছি না।

চারুবালা বলেন—রমার মাস্টার পড়াতে এলে রমার দেখাদেখি অম্বিও আজকাল মাস্টারের সামনে গিয়ে বসতে আরম্ভ করেছে।

উপেনবাবু—কেন?

চারুবালা—লেখাপড়া শিখতে চায় অম্বি।

উপেনবাবু—না না, কোন লাভ নেই, মাস্টারকে আড়ালে বলে দিও, অম্বিকে যেন কিছু না শেখায়।

চারুবালা—আমি অম্বিকেই বারণ করে দিয়েছি।

উপেনবাবু—ভাল করেছ। একটু এ-বি-সি-ডি আর কবিতা লিখে লাভ তো কিছু নেই, উল্টে মেয়েটার না-এদিক না-ওদিক একটা অবস্থা হবে। মুটে-মজুরের ঘরকে ঘেন্না করবে অথচ কোন ভদ্রঘরে ঠাঁই পাবে না। সুতরাং....

চারুবালা বলেন—ঝাঁসিতে থাকতে থাকতেই মেয়েটাকে পাত্রস্থ করার যাহোক একটা উপায় বের করতেই হবে।

বহু দূর অতীতের যে-সব চেষ্টার কাহিনী এখন অতীতের একটা স্মৃতি মাত্র। আজ দেখা যাচ্ছে, উপেনবাবু ও চারুবালার প্রত্যেকটি পরিকল্পনা যেন ব্যর্থ করেই বড় হয়ে উঠেছে অম্বি। যে মেয়েকে বাড়ির মতোও মনে করতে চাননি উপেনবাবু, সেই মেয়েই আজ তাঁর নিজের মেয়ের মতো হয়ে উঠেছে।

কিন্তু, ঐ মেয়ের মতো পর্যন্তই। ব্যস্, আর না, আর বেশি নয়। অম্বিকে মানুষ করতে করতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে যেন থেমে গিয়েছেন উপেনবাবু আর চারুবালা। কারণ, সমস্যাটা এসেই প.ড়ছে। রমার বিয়ে দিতে হয়, অম্বিরও বিয়ে দিতে হয়। ভয় হয়, অম্বিরও যেন রমার মতো, অর্থাৎ লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোকের মতো শখ আর মনে না পেয়ে যায়। রমার জন্য যেরকম পাত্র পাওয়া যাবে সেরকম পাত্র তো আর অম্বির জন্য পাওয়া যাবে না। অম্বির জীবনটাই যে একটা সমস্যা। জাত-পাত জন্মের ইতিহাস নিয়ে একটা পরিচয় তো আছে অম্বির। আর পরিচয়টা তো সুবিধার নয়। সুতরাং কে বিয়ে করবে অম্বিকে, জাত-পাত শিক্ষা-দীক্ষা আর অবস্থার দিক দিয়ে একটু নীচু গোছের লোক ছাড়া? তাই এবার একটু বেশি কঠিনভাবেই সতর্ক হয়েছেন উপেনবাবু আর চারুবালা। যতই খারাপ লাগুক, অম্বির মন আর মনের শখগুলিকে একটু নীচু করিয়েই রাখতে হয়।

বাইরের চোখে রমা ও অম্বির মধ্যে কোন পার্থক্য ধরা পড়ে না। কিন্তু মেয়ে আর মেয়ের মতো, এই দুয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, সেটা চোখে পড়বে তাদেরই, এ বাড়ির ভিতরে চোখ দিয়ে দেখবার সুযোগ যাদের আছে।

রমা লেখাপড়া শিখেছে। কলেজে পড়ে। এই তো থার্ড ইয়ার চলছে। ইংরাজিতে অনার্স নিয়েছে। আর নিরক্ষরা অম্বি, কোনকালেই লেখাপড়া শেখেনি, শেখানোও হয়নি। এ শুধু বই-এর ছবি দেখে বইয়ের মর্ম বুঝতে চেষ্টা করে। তার বেশি কোন সাধ্য নেই। রমার কাছে উপেনবাবু ও চারুবালা হলেন বাবা ও মা। কিন্তু ঠিক একরকমের সম্বোধনের অধিকার পায়নি অম্বি। অম্বির কাছে উপেনবাবু হলেন আপ্পি এবং চারুবালা হলেন আম্মি। কে জানে কবে থেকে, বোধহয় গঞ্জাম থেকেই এই সম্বোধনের ইতিহাসের শুরু।

রমা শোয় চারুবালারই ঘরে, তাঁর পাশের খাটের বিছানায়। আর অম্বি শোয় পাশের ঘরের একটা খাটে, মাঝে একটা দেওয়ালের ব্যবধান, যদিও দেওয়ালে একটা দরজা আছে, এবং দরজাটা খোলাও থাকে।

এই মাত্র, এ ছাড়া রমাতে ও অম্বিতে আর কি পার্থক্য? কিছুই না।

পার্থক্য বলাও ঠিক নয়, বলা উচিত, সতর্কতার ছোট একটা প্রাচীর। বাপ-মা'র মন নামে কতকগুলি দুর্বলতা আর মমতা দিয়ে তৈরি একটা জগতের কোথায় যেন একটা ভয় আছে। তাই সতর্ক না থেকে পারেন না উপেনবাবু আর চারুবালা।

এখনো কি একদিন নিভৃতে দু'জনের মধ্যে আলোচনা হয়, এবং আলোচনাটাও শেষ পর্যন্ত কথায় কথায় কি রকম যেন হয়ে যায়।

চারুবালা বলেন—সেই তো, সেই সমস্যাই দাঁড়াল। পরের মেয়ে নিজের মেয়ের মতো হয়ে উঠল, অথচ....।

উপেনবাবু—কি হলো?

চারুবালা—কে এখন বিয়ে করবে এই মুখ্‌খু মেয়েকে?

কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করেন উপেনবাবু। তারপর বলেন—ঠিক বলেছ, সমস্যাই বটে। তবে ধর, বাঙালী সমাজেরই মধ্যে যদি এমন ছেলেকে পাওয়া যায়, জাতে যা-ই হোক, লেখাপড়া কিছু শিখেছে, আর ছোটখাট চাকরি বা দোকানদারি করে খেয়ে-পরে থাকবার মতো রোজগারও করছে...।

চারুবালা—পাওয়া আর যাবে না কেন, খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে।

উপেনবাবু—যদি ভাল পণও দেওয়া যায়....।

চারুবালা—তাহলে কোন আপত্তিই করবে না। অম্বির মতো মেয়েকে খুশি হয়েই বিয়ে করতে রাজী হয়ে যাবে।

—কিন্তু। উপেনবাবু কেমন যেন একটু চেঁচিয়ে এবং রুক্ষস্বরেই বলেন—কিন্তু অম্বি রাজি হবে কি?

চারুবালাও রাগ করে বলেন—তা, আমার ওপর চোখ রাঙাচ্ছ কেন? দোষ তো তোমার। তুমি ভুল করেছ; তাই।

উপেনবাবু—ভুল করেছ তুমি।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ করে থাকেন। তারপর দু'জনেই শান্ত হয়ে আর বেশ গম্ভীর হয়ে আলোচনা করতে করতে একমত হয়ে একটা সিদ্ধান্ত করে ফেলেন—যাতে রাজি হয় অম্বি, তাই করতে হবে। আর ভুল করলে চলবে না।

সত্যিই দেখা যাচ্ছে, আর ভুল করতে চান না চারুবালা আর উপেনবাবু। এবার থেকে তাঁরা দুজনেই আরও বেশি সতর্ক হয়েছেন।

কারণ, সেই সমস্যাটা এতদিনে এসে পড়েছে। রমার আর অম্বির বিয়ের জন্য ভাবতে হচ্ছে। রমাকে নিয়ে কোন সমস্যা নেই, বিয়ের খোঁজখবর চেষ্টা করলেই করা যাছে। কিন্তু অম্বির জন্যে যে কোন চেষ্টাও করে যাচ্ছে না।

আগে অনেক ভুল করলেও অম্বিও যেন বুঝতে পেরেছে, আর ভুল করলে চলবে না। সতর্ক হয়েছে অম্বিও। এখন তো সে আর গঞ্জামের সেই চার বছর বয়সের একটা জেদী অবুঝ আর আবদেরে মেয়ে নয়। কুড়ি বছর বয়সের টানা-টানা দুটি

চোখের দৃষ্টি দিয়ে সে আজ আপ্পি আর আম্মির মনের সমস্যাটা সহজেই বুঝতে পারে।

উপেনবাবু ডাকেন—অম্বি।

অম্বি উত্তর দেয়—যাই আপ্পি।

উপেনবাবু—রমা আর তুই তৈরি হয়ে নে তাড়াতাড়ি। পরেশনাথের মন্দিরে আরতি দেখতে যাব।

বের হবার আগেই অম্বির সাজসজ্জার রূপ আর রকম দেখে রমা ভ্রূকুটি করে—এ কি একটা বাজে শাড়ি পরে বের হচ্ছিস? কানপাশা দুটো খুলে রাখলি কেন?

অম্বি বলে—ঠিক আছে। তুই বাজে বকিস না।

উপেনবাবু আর চারুবালা তাকিয়ে তাকিয়ে সবই দেখতে পান এবং কানেও সব শুনতে পান। কিন্তু কেউ কোন মন্তব্য করেন না। যেন এটাই তাঁদের ইচ্ছা। অম্বিকে একটা বাজে শাড়ি পরিয়ে পৃথিবীতে ছেড়ে দিতে তাঁদের আপত্তি নেই। উপেনবাবু অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে নেন, আর চারুবালা অন্য একটা দরকারের কথা ব্যস্তভাবে ঘোষণা করেন—ফেরবার পথে একটা নতুন পঞ্জিকা কিনে আনবে, ভুলে যেও না যেন।

পঞ্জিকা কিনতে সেদিন ভুলেই গেলেন উপেনবাবু আর ঘরে ফিরে হাতমুখ না ধুয়ে চুপ করে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। চারুবালা জিজ্ঞাসা করে—কি হলো?

উপেনবাবু কিরকম বিদ্রূপের সুরে গম্ভীরভাবে বলেন—দেখা হলো তোমার ছোটমামার সঙ্গে।

চারুবালা—কি বললেন ছোটমামা?

—রমাকে দেখেই বললেন, এইটিই বুঝি তোমার সেই পালিতা মেয়ে?

চারুবালার কণ্ঠস্বরও তিক্ত হয়ে ওঠে—কিন্তু এভাবে বাঁকা করে কথা শুনিয়ে আমাকে কি বোঝাতে চাইছ তুমি?

উপেনবাবু অন্যমনস্কের মতো বলতে থাকেন—ছোটমামার কথা শুনে অম্বি তো হেসে কুটিকুটি। সারা রাস্তাটাই হাসতে হাসতে এসেছে, বোধহয় এখনো হাসছে।

বলতে বলতে উপেনবাবুর গম্ভীর মুখটাই শুকনো হাসি হেসে ফেলে।

উপেনবাবু হাত মুখ ধুতে চলে যান। চারুবালা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকেন। মনে হয়, ছোটমামার প্রশ্নটা সত্যিই একটা কঠিন বিদ্রূপ। কিন্তু তার চেয়ে বড় বিদ্রূপ বলে মনে হয়, অম্বির ঐ হাসি। এবং এই বিদ্রূপ মনে মনে সহ্য করতে গিয়ে অম্বির উপর মনটা অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে।

কিন্তু বেশি দুশ্চিন্তা করতে হয় না চারুবালাকে, উপেনবাবুকেও না। কারণ, অম্বিই সতর্ক হয়ে যায়।

বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজনের মেলামেশার আসরও এক একদিন বেশ জমে ওঠে। রমা গান গায়। এলাহাবাদে থাকতেই গানের মাস্টারের কাছে সুর সেধে গলা মিষ্টি করেছে রমা। রমার গান শুনে সকলেই প্রশংসা করে—বেশ গান, বেশ গলা।

আর অম্বি যেন ঘুরে বেড়ায় এই গানের আশেপাশে। গানের কাছে আসতে চায় না। গানের স্বরলিপি বইটি রমার কাছে এনে দিয়েই সরে যায়। একটু দূরে দাঁড়িয়ে গান শোনে, তার পরেই আজও দূরে সরে গিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকে।

রমা হঠাৎ বলে ফেলে—অম্বিও তো গাইতে পারে।

আতঙ্কিতের মতো এক দৌড় দিয়ে অন্য ঘরে পালিয়ে যায় অম্বি, রমার ডাকাডাকি শুনতে পেয়েও আর এমুখো হয় না।

আত্মীয় স্বজনের মেলা ভাঙবার পর ভিতরের বারান্দায় একদিকে চুপ করে বসে থাকেন উপেনবাবু। কাছে এসে বসেন চারুবালা। শোনা যায়, পাশের ঘরে একটা মুখচোরা সঙ্গীত যেন ভয়ে ভয়ে বাতাসের কাঁপন এড়িয়ে আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গান গাইছে অম্বি।

উপেনবাবু জিজ্ঞাসা করেন—এলাহাবাদে থাকতে গানের মাস্টারের কাছে, অম্বিও কি গান শিখেছিল?

চারুবালা বললেন—না।

উপেনবাবু বড় করুণভাবে হাসতে থাকেন—এটা আবার কিরকমের একটা ব্যাপার হলো? শেখানো হলো না, তবুও শিখল।

উত্তর দেন না চারুবালা। শুধু বুঝতে পারেন তাঁদের কথাবার্তার সাড়া পেয়ে মুখচোরা সঙ্গীতটা চুপ করে গিয়েছে, গান বন্ধ করে দিয়েছে অম্বি।

অম্বির এইসব সতর্কতা দেখে একটু খুশি হন উপেনবাবু, চারুবালাও।

সেদিন দুপুরবেলা ভাঁড়ার ঘরের ভিতর হতে বিস্মিত হয়ে ডাক দিলেন চারুবালা। —অম্বি অম্বি!

—যাই আম্মি।

অম্বি কাছে এসে দাঁড়াতেই এক গাদা লেস হাতে তুলে নিয়ে চারুবালা বলেন—একি? এগুলি বুনলো কে? তোরই কীর্তি নিশ্চয়।

—হ্যাঁ।

—তোকে কে শিখিয়েছে এসব বুনতে? রমা?

—না।

—রমার দেখাদেখি শিখেছিস?

—হ্যাঁ।

—কি দরকার তোর এসব শিখে আর মিছিমিছি সময় নষ্ট করে?

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অম্বি। চারুবালা গম্ভীরভাবে বলেন—কিন্তু এইসব শিশি-বোতলের পেছনে এগুলি লুকিয়ে রেখেছিস কেন? নিয়ে যা।

লেসের গাদা হাতে নিয়ে নিজের ঘরের খাটের কাছে এসে দাঁড়ায় অম্বি। এ লেস সহ্য করতে পারল না আম্মি, ভাবতে গিয়ে অম্বির চোখ দুটো একবার চিকচিক করে ওঠে। এই তো সেদিন আম্মি নিজের হাতে রমার তৈরি লেস নিয়ে পাশের বাড়ির

বৌদিকে দেখাচ্ছিলেন। থাক সে কথা। লুকিয়ে রাখতেই তো চেয়েছিল অম্বি। কিন্তু লুকোবার মতো জায়গা কই?

সামনের আলমারিটার মাথার উপর লেসের গাদা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, বিছানার উপর গড়িয়ে পড়ে অম্বি। বুঝতে পারে অম্বি, আরও বেশি সতর্ক হতে হবে।

আপ্পি ও আম্মির সতর্কতা দেখে দুঃখ করে না অম্বি। এসবের জন্য কোন ভাবনা নেই অম্বির মনে। আপ্পি ও আম্মিকে সুখী করবার জন্য দুটো কানপাশা খুলে রাখতে, আর সব গান ও লেস লুকিয়ে রাখতে কষ্ট হলেও এমন কি কষ্ট? ও ছাই কষ্ট খুব সহ্য করা যায়।

কিন্তু একটা ভয় অম্বির ভাবনাগুলিকে মাঝে মাঝে অস্থির করে তোলে। বিছানার উপর শুয়ে ছটফট করতে করতে কেঁদেই ফেলে অম্বি। কি হবে উপায়, আপ্পি আর আম্মি যদি একদিন বলে ফেলেন—তুই আর নিজের হাতে খাবার জল-টল আমাদের দিস না অম্বি।

বাজার থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে চেয়ারের উপর বসবার পর আপ্পি যদি একদিন বলেই দেন—থাক, তোর পাখার বাতাসে আর দরকার নেই; অম্বির এই হাত দুটো যে তাহলে চিরকালের মতো অসাড় হয়ে যাবে।

সেই যে কবে, স্মৃতি হাতড়ে খুঁজতে থাকে অম্বি, সেই যে বেরিলিতে থাকতে অসুখের সময় অম্বির মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন আম্মি, তারপর আর কই? ভাবতে গিয়ে অম্বির মাথাটাই যে তৃষ্ণার্ত হয়ে বালিশের এপাশে আর ওপাশে আশ্রয় খুঁজতে থাকে। কিন্তু এটা তো অম্বির জীবনের ভয় নয়। এটা দুঃখ বলা যেতে পারে এবং সে দুঃখ গোপন করার মতো শক্তি আছে অম্বির।

ভয় হলো সেই ভয়। আম্মির যখন মাথা ধরবে, আর আম্মির মাথা টিপে দেবার জন্য যখন হাত বাড়াবে অম্বি, তখন যদি আম্মি মাথা সরিয়ে নিয়ে আপত্তি করে বলে ফেলেন—সর, সর, তোর হাতের সেবার দরকার নেই! তবে কি হবে উপায়? আপ্পি আর আম্মির গা ছুঁয়ে পড়ে থাকবার অধিকারও যদি একদিন বন্ধ হয়ে যায়, তবে সে দুঃখ গোপন করার মতো মনের জোর থাকবে তো?

কেন থাকবে না? একটা শান্ত হয়ে ভাবতে থাকে অম্বি। তা হলেও সহ্য করতে হবে, আর আপ্পি ও আম্মি যেন একটুও বুঝতে না পারেন, কত কষ্টে সহ্য করেছে অম্বি সেই দুঃখকে।

বিছানা ছেড়ে উঠে বসে অম্বি। কাজ করতে হবে। কিন্তু কোন কাজ? রমার সঙ্গে যেন কোন তুলনার মধ্যে না পড়তে হয়, সেই সব কাজ। রমা যেসব কাজ করে না, সেই সব কাজেই এই হাত দুটোকে এবার উৎসর্গ করে দেবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয় অম্বি। রমা থাক লেখাপড়া গান আর লেস নিয়ে। আর অম্বি থাকবে শুধু... ঐ তো দেখা যায় আপ্পির জুতোগুলিতে একেবারেই পালিশ নেই। মনে পড়ে, ঝিয়ের হাতের কাচা কাপড় দেখে একটুও যেন খুশি হন না আম্মি।

বিছানা থেকে উঠে কাজে মন দেয় অম্বি। এ ঘর থেকে ও ঘর ঘুরে ঘুরে হাত দুটোকে দিয়ে জুতো পালিশ করিয়ে আর কাপড় কাচিয়ে যেন জীবনের সেই ভয়টাকে একেবারে ক্লান্ত করে দিতে থাকে অম্বি।

উপেনবাবু বললেন—ভাবতে ভালও লাগছে, আবার আর একদিকে মনটা খারাপ লাগছে।

চারুবালা—কেন?

উপেনবাবু—রমার সঙ্গে অধীরের বিয়ের জন্য যদি প্রস্তাব করি, তবে অধীর আপত্তি করবে না বলেই মনে হচ্ছে।

চারুবালা—আমারও তাই মনে হয়।

উপেনবাবু—রমাকে নিয়ে তো আর সমস্যা নেই। কথা হলো, তারপর অম্বির জন্য কি উপায় হবে? সেই জন্যই মনটা খারাপ লাগছে।

সম্পর্কে উপেনবাবুর আত্মীয়ই এই অধীর, এবং খুব বেশি দুরের সম্পর্কও নয়। বেশ ভাল ছেলে। গণিতের এম.এ, প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছে, এবং এক বীমা কোম্পানীতে আজ এক বছর হলো ভালো মাইনের একটা কাজও পেয়ে গিয়েছে। অধীরের খুড়িমাও এসে বলে গিয়েছেন—ভাল পাত্রী পেলে, এইবার ছেলেটাকে সংসারে বসিয়ে একবার কেদার-বদরী ঘুরে আসতেন।

এর মধ্যে অধীরও কয়েকবার এসেছে, পণ্ডিতিয়ার পশ্চিমে এই নতুন বাড়িতে। উপেনবাবু আর চারুবালার সঙ্গে গল্প করে চলে গিয়েছে অধীর। একটু তফাতে একটা সোফার উপর পাশাপাশি বসে গল্প শুনেছে রমা ও অম্বি।

উপেনবাবু বলেছেন—ঐ, ওদের মধ্যে ঐটি হলো আমার মেয়ে রমা, আর ঐটি হলো অম্বি, আমার মেয়ের মতোই।

মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকায় অম্বি, যেন নির্মম এক বিদ্রূপের আঘাত ওর মুখের রং মুহূর্তের মধ্যে কালো করে দিয়েছে।

একদিন এসে, কলেজ ম্যাগাজিনের লেখা রমার একটা প্রবন্ধের খুবই প্রশংসা করে অধীর। সুন্দর ভাষা এবং ইংরেজি কবিতা সম্বন্ধে এই সব নতুন নতুন কথা এত ভাল করে গুছিয়ে যে বলতে পারে, তাঁর মন ও মনের সুরুচির প্রশংসা না করে পারা যায় না।

প্রশংসা শুনে রমা লজ্জা পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। উপেনবাবু ও চারুবালার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। উপেনবাবু বলেন—রমার গান তো তুমি এখনো শোন নি অধীর।

অধীর বলে—হ্যাঁ, একদিন এসে শুনতেই হবে।

অম্বি রমার কানে-কানে কি যেন বলে। চারুবালা ও উপেনবাবু দুজনেই উদ্বিগ্নভাবে ও ব্যস্তভাবে বলেন—কি? কি শেখাচ্ছে অম্বি?

রমা লজ্জিতভাবে বলে—এখনি গাইতে বলছে। কিন্তু....।

অধীর বলে—না, না, এত তাড়াহুড়োর কি আছে! একদিন হবে।

অধীর চলে যাবার পর চারুবালা অম্বিকে বলেন—বাইরের লোকের সামনে ছেলেমানুষি করিস না অম্বি।

দিন পার হয়ে যাচ্ছে একের পর এক। ভাদ্রটা তো পার হতেই চলল। ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন উপেনবাবু আর চারুবালা। এইবার প্রস্তাবটা করে ফেলতেই হয়। অধীরের খুড়িমাকে হয় একবার নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে, নয় তো নিজেরাই গিয়ে...।

ট্যাক্সির হর্নের শব্দে ফটকের দিকে এগোতেই দেখা যায়, অধীরের খুড়িমা ধীরে ধীরে আসছেন।

উপেনবাবু উল্লাসের সুরেই বলেন—আপনার কথা চিন্তা করা মাত্র যখন আপনি এসে গিয়েছেন, তখন বুঝেছি নিশ্চয় সুসংবাদ আছে।

খুড়িমা হাসেন—হ্যাঁ, সুসংবাদ আছে। ছেলে বিয়ে করবে, পাত্রীও সে পছন্দ করে ফেলেছে। এখন তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে তাহলেই....।

আকস্মিক আনন্দে বিচলিত হয়ে চারুবালা বলেন—কোনই আপত্তি নেই। তবে উনি চাইছিলেন, পরীক্ষাটা হয়ে যাবার পরে কোন তারিখে যদি বিয়ের দিন....

খুড়িমা—কার পরীক্ষা?

চারুবালা—রমার।

খুড়িমা—রমার পরীক্ষা রমা দিক না। অম্বির তো আর কোন পরীক্ষা-টরীক্ষা নেই।

চারুবালা চেঁচিয়ে ওঠেন—অম্বি?

উপেনবাবু প্রশ্ন করেন—আপনি কি অম্বির কথা বলছেন?

খুড়িমা—হ্যাঁ, অম্বিকেই তো বিয়ে করতে চায় অধীর।

নীরব হয়ে গেলেন উপেনবাবু ও চারুবালা।

খুড়িমা বলে—কি হলো? তোমাদের দিক থেকে কি কোন অসুবিধা আছে?

উপেনবাবু বলেন—না, আমাদের আর অসুবিধা কি? কিন্তু....।

খুড়িমা—আমিও কিন্তু কিন্তু করেছিলাম, কিন্তু ছেলে সে-সব আপত্তি শুনতে চায় না।

উপেনবাবু বলেন—কার মেয়ে, আর কি জাতের মেয়ে, সে-সব কথা অধীর যদি জানতে পেত, তবে বোধহয়...।

খুড়িমা—জানতে চায় না। আমি কি আর কথাটা তুলিনি মনে করেছ? কিছু বললেই বলে, এখন তো অম্বি উপেনবাবুরই মেয়ে।

চমকে ওঠেন দুজনেই। বোবার মতো তাকিয়ে থাকেন উপেনবাবু।

চারুবালা বলেন—অম্বি যে লেখাপড়া কিছুই শেখেনি।

খুড়িমা—তাও জানি, আর ছেলেও সব শুনেছে। তবুও....।

কি কঠিন ও নির্মম খুড়িমার মুখের এই কথাটা—তবুও উপেনবাবু ও চারুবালার

সারা-জীবনের সতর্কতার সাধনা ব্যর্থ করে আর মিথ্যা করে দিয়ে সংসারে আর একটা ভয়ংকর অম্বি জেগে উঠেছে। তাঁদের সব সঙ্কল্প ও পরিকল্পনার পিছনে একটা বিদ্রূপের অম্বি যেন কুড়ি বছর ধরে আক্রোশ নিয়ে ছুটে ছুটে এসে এতক্ষণে চরিতার্থ হয়েছে।

চারুবালা খুড়িমার দিকে তাকিয়ে বলেন—আমাদের কোনই আপত্তি নেই, অম্বি যদি আপত্তি না করে।

খুড়িমা উঠলেন—তাহলে তাই করো, অম্বিকে জিজ্ঞাসা করে তারপর খবর দিও।

চলে গেলেন খুড়িমা।

বার বার মনে পড়ে খুড়িমার মুখের ঐ ভয়ানক কথাটা—তবুও। উপেনবাবুর মনের সব ভাবনা যেন ভয় পেয়ে এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। এত বাধা-নিষেধ, তবুও। এত সতর্কতা, তবুও আজ কুড়ি বছর ধরে সব অরণ্যের বাধা ভেদ করে আর পাহাড়ের বাধা ছাপিয়ে গোদাবরীর সেই শাখাস্রোতের আত্মাটা ছুটে এসেছে, কেউ তার গতি রোধ করতে পারেনি।

—এ কি করে সম্ভব হয়? করুণ আক্ষেপের মতো উপেনবাবুর কথাগুলি কাঁপতে থাকে।

চারুবালা গম্ভীরভাবে বলেন—কি?

উপেনবাবু—এই যে রমাকে পছন্দ না করে অম্বিকে পছন্দ করল অধীর।

চারুবালা—জানে তোমার ভগবান, আমি এ ছাই অনাসৃষ্টির কিছু বুঝি না।

—তাহলে কি...? কথাটা সমাপ্ত না করেই নীরব হয়ে রইলেন উপেনবাবু। যেন বিরাট একটা প্রশ্ন ভূমিকম্পের মতো তাঁর মনের অতলের ঢেউগুলিকে ছন্দহারা করে দিয়েছে। তাহলে কি রূপ গুণ কূল মান ও শিক্ষা ছাড়াও এবং এসবের উপরেও কিছু আছে? কুয়াশামাখা সূর্যের মতো রহস্যময় একটা কিছু। নইলে রমাকে পছন্দ না করে অম্বিকে পছন্দ করে, এ কোন্ প্রেমের চক্ষু?

জোরে নিঃশ্বাস ছেড়ে উপেনবাবু বলেন—যাক, এসব ফিলসফি চিন্তা ক'রে আর কোন লাভ নেই। অম্বিকে জিজ্ঞাসা করে অধীরের খুড়িমাকে একটা চিঠি পাঠিয়ে দাও। ল্যাটা চুকে যাক।

চারুবালা—অম্বিকে জিজ্ঞাসা করবার আর দরকারই বা কি? রাজি তো হয়েই আছে। এই কাণ্ডটি করবার জন্যই বোধহয় এ বাড়িতে মেয়ের মতো হয়ে ঢুকেছিল। খুব শিক্ষা দিল অম্বি। শত্রুতেও যেন আর পরের মেয়েকে আপন মেয়ের মতো করে না পোষে।

চারুবালার ক্ষোভ আর থামতে চায় না। উপেনবাবুও শুকনো হাসি হেসে বলতে থাকেন—কি অদ্ভুত অদৃষ্ট! নিজেরই মেয়ের মতো, তবুও ওর বিয়ের কথা শুনে আনন্দ করতে পারছি না।

চারুবালা বলেন—বেরিলিতে থাকতে নিউমোনিয়া করে যে অম্বি আমাকে একটা মাস রাত জাগিয়ে হাড়-মাস কালি করে দিয়েছিল, সেই অম্বিই কি না আজ...।

বোধহয় বলতে চান চারুবালা, সেই অম্বিই আজ তার আপ্পি আর আম্মির স্নেহমমতার ঋণ শোধ দিল এইভাবে? এই রকম অপমান, আর সব সতর্ক পরিকল্পনা মিথ্যা করে দিয়ে?

আরও স্পষ্ট করে এবং হিসাব করে আজ উপেনবাবু অনুভব করতে পারছেন—আজ এই প্রথম নয়; সেই গঞ্জাম থেকেই শুরু হয়েছে অম্বির জয়ের আর তাঁদের পরাজয়ের ইতিহাস। পরাজয়টা শুধু এতদিনে চরমে এসে পৌঁছেছে। মেয়ের মতো হয়েও অম্বি আজ কি জানি কিসের গর্বে তাঁদের নিজের মেয়েকে ছোট করে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সহ্য করতে কষ্ট হয়, ভাবতেও ভালো লাগে না। উপেনবাবু আর চারুবালার এই কুড়ি বছরের যত স্নেহ ও মমতার সব শ্রী ও গৌরব চূর্ণ করে দিল অম্বি।

—যাক অনেক ভুল হয়েছে, আর ভুল করতে চাই না। উপেনবাবু বেড়াতে বের হবার জন্য চাদর কাঁধে তুলে নিয়ে তাঁর শেষ সতর্কতার সংকল্প ব্যক্ত করেন—যাক্, পরের মেয়েকে কুড়ি বছর ধরে পোষা আর নিজের মেয়ের মতো মনে করাই ভুল হয়েছে। এখন ভালোয় ভালোয় পরকে পরের মতোই বিদায় করে দাও।

সবে মাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। বাইরে থেকে ফিরে এসে ক্লান্ত ও বিষণ্ন উপেনবাবু বারান্দার উপর আরাম-চেয়ারে শুয়েছিলেন। হঠাৎ চমকে উঠলেন। পাশের ঘরের ভিতরে লুকিয়ে থেকে একটা করুণ শব্দ যেন বোবা হয়ে যাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! এ তো সেদিনের সেই মুখচোরা গানের শব্দ নয়, মুখচোরা কান্নার শব্দ।

ব্যস্তভাবে চারুবালাকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন উপেনবাবু—কাঁদছে কেন অম্বি?

চারুবালা—ও কাঁদছে ওর মনের শখে, আমি কি করব বলো?

উপেনবাবু—বিয়ের কথা বলেছ ওকে?

চারুবালা—হ্যাঁ।

উপেনবাবু—কি বললে অম্বি?

চারুবালা—ঐ তো শুনতে পাচ্ছ, যা বলছে।

উপেনবাবু—এ তো কাঁদছে শুধু। হাঁ-না কিছু বলেনি?

চারুবালা—না, কোন কথা বলেনি।

উপেনবাবু—তার মানে হলো রাজি আছে।

চারুবালা অপ্রসন্নভাবেই বলেন—তাই তো, রাজি না হবার কি আছে?

অস্বস্তি বোধ করছিলেন, এবং বিচলিতভাবে নিঃশ্বাসও ফেলছিলেন উপেনবাবু। চারুবালাও থেকে থেকে ছটফট করে উঠছিলেন। কিন্তু না, আর না, মনের দুয়ার বন্ধ করে এইবার বেশ শক্ত হয়েই বসেছেন দু'জনেই। আর ভুল নয়। যে মেয়ে নিজের

মেয়ে নয়, মেয়ের মতোও নয়, একেবারে আস্ত একটা পরের মেয়ে, তার কান্নার কাছে নিজেদের আর দুর্বল করে ফেলতে চান না উপেনবাবু আর চারুবালা।

—আপ্পি! দরজা খুলে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে একটা পাখা হাতে নিয়ে উপেনবাবুর সামনে দাঁড়ায় অম্বি। উপেনবাবুর ক্লান্ত শরীরের উপর বাতাস দেবার জন্য পাখা তুলতেই উপেনবাবু বলেন—থাক, পাখা রেখে দিয়ে বস।

চমকে ওঠে অস্থির হাত। অম্বির হাতের পাখা মেঝের উপর পড়ে গিয়ে যেন অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে। উপেনবাবুর মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অম্বি। এতদিনের সেই ভয়ের চাবুকটা এসে এইবার সত্যিই অম্বির মনের সব কল্পনাকে একটি আঘাতেই একেবারে বিমূঢ় করে দিয়েছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অম্বি। যেন সহ্য করার শক্তি খুঁজছে অম্বি। আপ্পি আর আম্মি যেন কিছুতেই বুঝতে না পারেন, অম্বির মনের ভিতর কোন দুঃখ অভিযোগ আর বিদ্রোহ আছে।

অম্বিই দেখে আশ্চর্য হয়, আর চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে, আম্মি আর আপ্পি বসে রয়েছেন মুখ করুণ করে, যেন দুটো শিশুর মুখ। কেউ যেন দু'জনকে অসহায়ের মতো ফেলে রেখে আর ফাঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছে, তাই অভিমান।

উপেনবাবুর গায়ের উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে অম্বি। উপেনবাবুর একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে অম্বি বলে—আমার বিয়ে দিও না আপ্পি।

উপেনবাবু—সে কি কথা!

অম্বি বলে—আমাকে পরের বাড়ি পাঠিও না। আমি চিরকাল এখানেই থাকব। যতদিন তোমরা বেঁচে থাকবে ততদিন আমিও বেঁচে থাকব।

চারুবালা বলেন—আবোল-তাবোল কথা বন্ধ করে শান্ত হয়ে বস অম্বি।

অশান্ত, দুরন্ত আর অবুঝ মেয়ের মতো চিৎকার করে বলতে থাকে অম্বি—আমার বিয়ে হবে, রমারও বিয়ে হবে, তারপর তোমাদের দেখবার জন্যে থাকবে কে? আমি বিয়ে করব না আম্মি।

চমকে ওঠেন উপেনবাবু আর চারুবালা নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকেন। একি বলে অম্বি, পূর্ব গোদাবরীর একটা পাতার ঘরের ভিতর থেকে কুড়িয়ে আনা আর শেয়ালের মুখ থেকে ছিনিয়ে আনা অতি অন্ত্যজ একটা পরের মেয়ের প্রাণ? এসব কথা কি একটা মেয়ের মতো মেয়ের প্রাণের উদ্বেগ? না, মেয়ের চেয়ে-বড় একটা সত্তার ব্যাকুলতা?

চারুবালা বলেন—সে চিন্তা তোর কেন অম্বি?

অম্বি—চিন্তা না করে পারছি না আম্মি।

উপেনবাবু বিচলিতভাবে বলেন—হেসে হেসে কথা বল অম্বি, নইলে আমি তোর কোন কথাই শুনব না।

অম্বি—হাসতে পারছি না আপ্পি। আমি যে তোমাদের....।

চুপ করে অম্বি। ঘরের অন্তরাত্মা যেন ক্ষণিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে দু'কান সজাগ রেখে একটা কথা শুনবার প্রতীক্ষায় রয়েছে, যে কথা আজ পর্যন্ত অম্বির মুখে কোনদিন শোনা যায়নি।

অম্বি বলে—আমি তো তোমাদের ছেলের মতোই। চিরকাল তোমাদের কাছেই থাকব।

বুকের ভিতরে যেন একটা ধাক্কা লেগেছে, আবার চমকে ওঠেন উপেনবাবু ও চারুবালা। কুড়ি বছরের একটা নীরব বিদ্রোহ, একটা শান্ত অভিমান যেন এতদিনে মুখ খুলে ফেলেছে।

—আমাকে কথা দাও আম্মি। চারুবালার একটা হাত শক্ত করে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চারুবালার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অম্বি। অন্য দিকে চোখ ঘুরিয়ে অম্বির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন চারুবালা।

অম্বির দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে চোখ বন্ধ করলেন উপেনবাবু। অকস্মাৎ একটা বিস্ময়ের ঝড় এসে যেন তাঁর মনের যত ভুলের আবর্জনা উড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। মেয়ের মতো তো নয়, তাঁদের আত্মারই মতো এই মেয়েটা আজ বিশ বছর ধরে তাঁদের সব ভুলগুলিকে হারিয়ে দিয়ে এসেছে। পরাজয় সম্পূর্ণ হলো এতদিনে, এবং এই পরাজয়েও এত আনন্দ ছিল?

গলার স্বরের কাঁপুনি সংযত করে আস্তে আস্তে উপেনবাবু বলেন—তোর বিয়ে না দিয়ে পারব না অম্বি, তুই তো আমাদেরই....।

চেঁচিয়ে আর্তনাদ করে ওঠে অম্বি—বলো না, আর ওকথা বলো না আপ্পি। সহ্য করতে পারি না।

হেসে ফেলেন উপেনবাবু। —তুই তো আমাদেরই মেয়ে।

ঘরের বাতাস কয়েক মিনিট একেবারে নিস্তব্ধ হয়েই থাকে। চারুবালার কাঁধের উপর মুখ গুঁজে দিয়ে একেবারে শান্ত হয়ে বসে থাকে অম্বি। যেন বিশ বছরের একটা অভিযোগ এতদিনে শান্ত হলো।

উপেনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে চারুবালা বললেন—অধীরের খুড়িমাকে কালই চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিতে হবে, তারপর...।

চারুবালার কথা শেষ না হতেই ফুঁপিয়ে ওঠে অম্বি। —আম্মি!

উপেনবাবু আর চারুবালা এক সঙ্গেই বিচলিতস্বরে বলতে থাকেন। —ছি ছি, ওরকম করতে নেই অম্বি। সব মেয়েরই বিয়ে হয়, আর বাপ-মাকে ছেড়ে থাকতেও হয়।

তমসাবৃতা

ধুলগড়া হলো বাউরী চাষী আর বোষ্টম তাঁতীদের একটা গাঁ। তাঁতীরা তাঁত ছেড়েছে দু'পুরুষ আগে। এখন তারাও সবাই চাষী, কিন্তু বাউরীদের মত এত খাটিয়ে পিটিয়ে

পাকা চাষা তারা নয়। তাঁতীদের কাছে বাউরীরা হ'লো সত্যিকারের চাষা চোয়াড়। রঙীন গামছা কাঁধে ঝুলিয়ে যতদূর সম্ভব তারা নিজেদের আভিজাত্য বজায় রাখার চেষ্টা করে।

বাউরীদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ছেলেটির নাম দয়ারাম। সে মারা গেছে আজ ক'বছর হ'লো, সবচেয়ে সুন্দর মেয়েটিকে বিধবা করে, যার নাম জবা। জবার বাপ কুঞ্জ বাউরী মেয়ের আবার বিয়ে দিতে চায়। জবাও জানে, আজ হোক কাল হোক, তাকে বিয়ে করতেই হবে। গাঁয়ের সবার ইচ্ছে এ গাঁয়েই কারও সঙ্গে জবার বিয়ে হোক। জবার বাপও তাই বলে।

কিন্তু জবাকে ঘরণী করার মতো যোগ্যতা এ গাঁয়ের কোন্ ছেলের আছে? দয়ারামের সঙ্গে রূপগুণের তুলনা করলে তাদের নিতান্তই দীনহীন মনে হয়। এক এক করে প্রায় সবকটি বিয়ের যুগ্যি ছেলের কথা মনে পড়ে। জয়, মতি, মধু, গুণধর....। বয়সের দিক দিয়ে এদের মধ্যে যে কোনো একজনের সঙ্গে জবাকে ভালই মানাবে। চেহারার দিক দিয়েও এরা কিছু কম নয়; সুগঠন ও সুশ্রী চেহারা। তবু সকলেরই অভিমত, দয়ারাম নাকি সবচেয়ে সুন্দর ছিল।

দয়ারাম ছিল সৌখীন ও সুবেশ। তার গামছা পরিষ্কার, ধুতি ফর্সা, চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। সেই দয়ারাম আজ নেই। তার শুভ্র সুন্দর স্মৃতিটুকু এখনো রাজহাঁসের মত ডানা মেলে গাঁয়ের আকাশে উড়ে বেড়ায়।

দয়ারামের কথা উঠলেই তার চেহারাটা আজও সকলের চোখে ভেসে ওঠে। ঘরেই থাক বা বাইরে থাক, ক্ষেতে কাজ করার সময় পর্যন্ত দয়ারামের পরিধানে থাকতো সাদা ধোলাই ধুতি। অনেক দূর থেকে দেখলে মনে হতো, ক্ষেতের মাঝখানে কাদাজলের মধ্যে কটা বড় সাদা শালুক ফুটে আছে।

কাজের সময় সবাই পরতো ছেঁড়া গামছা বা পুরনো কাপড়ের একটা টুকরো। বুড়ো গোছের চাষীরা কোমরে নিছক একটা কাপড়ের ফালি ঝুলিয়ে কাজে নামতো। তাদের চেহারাগুলিও কেমন মেটে মেটে হয়ে গেছে। দূর থেকে দেখলে চেনা যেত না। মেঠো তিতিরের মত তারা যেন রঙ ফাঁকিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে আছে।

বিধবা হবার পরও জবা বাপের সঙ্গে ক্ষেতে খাটতে গিয়েছিল কয়েকবার; মাঝে মাঝে আলের পাশের ক্ষেতে তার দৃষ্টি ছুটে যেত, নিড়েনে বসে আছে মতি। সামান্য একটা লেংটি কোমরে, চওড়া কালো পিঠটা রোদে পুড়ে চকচক করছে। জবা বিরক্ত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। হলোই বা পুরুষমানুষ, গরু ঘোড়ার মত এরকম নির্বসন হয়ে থাকা জবার কাছে বড় বিদ্‌ঘুটে মনে হয়।

ঘাট থেকে জল নিয়ে ফিরতে জবা দেখতো, পথের পাশে গাছ কাটছে গুণধর। এমন একটা ছেঁড়া গামছা পরা যে সেটা না থাকলেও কোনো ক্ষতি হতো না। জবা হেঁট মুখে ও চোখ নামিয়ে চলে যায়। গুণধর একবার টাঙ্গিটা নামিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে জবার দিকে তাকায়, স্বেদাক্ত কালো শরীরটা থরথর করে।

জবার বিয়ে দেওয়া উচিত। প্রস্তাবটা এই পর্যন্ত এসে থেমে থাকে, আর অগ্রসর হয় না। পাত্র হিসাবে কারও নাম করতে সহসা কেউ সাহস করে না। কে না জানে দয়ারামকে জবা কত ভালবাসতো। সেই জবার কপালে সিঁদুর যে দেবে তাকে অন্তত দয়ারামের কাছাকাছি রূপগুণ পেতে হবে। একটু সৌখীন সুবেশ কোনো জোয়ান হলেই ভাল। কিন্তু সে-রকম পাত্র কই?

এ বছরের মত ফলন ধুলগড়ায় সাত বছরের মধ্যে হয়নি। ক্ষেত-ভরে ফসল ফলেছে; রাত জেগে গানে গানে খড়িয়ান সেরেছে তারা। নতুন খড়ে গরুগুলির হাড়ে মাংস লেগেছে। সারি সারি বোঝাই গাড়ি ধুলগড়ার ধূলো থেকে তোলা সম্পদ গঞ্জে নিয়ে গিয়ে বেচে এসেছে দু'গুণ দরে। কিন্তু মাত্র তিনটি মাসের মধ্যে ধুলগড়ার স্বাচ্ছন্দ্যের উল্লাস ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়তে লাগলো। বিয়ে পরব উৎসবের কল্পনা দূরে সরে গেল বেলাশেষের ছায়ার মত। দু'মাসের মধ্যেই তারা বুঝেছে, দোষ কারও নয়। তারা নিজেই নিজের পেটে পাগলা শুয়োরের মত দাঁত বসিয়েছে। ধুলগড়ার গাড়ি বোঝাই সোনা ফেলে দিয়ে এসেছে গঞ্জের চাল-কলের কালিমাখা পায়ের কাছে। ছেঁড়া গামছায় বাঁধা যত কোমরের ট্যাঁকে কাগজের টাকা কুঁকড়ে পড়ে আছে—অসার অর্থহীন আবর্জনা।

খেতে হবে সারা বছর, টাকায় সাড়ে চার সের চাল। আবার গঞ্জের গোলায় কাঙালের মত ঘুরে ফেরা। ঘামে ভেজা নোংরা নোটগুলিকে মুঠো করে ধরে তারা মর্মে মর্মে বোঝে, এর চেয়ে ধুলগড়ার একমুঠো মাঠের কাদার দাম বেশি।

শুধু ধুলগড়া নয়, চারদিকের আরও বিশটা গাঁ একই ভুল করেছে। ওরা দর চেয়েছিল, পেয়েছে দর। ভাল করেই পেয়েছে। চার টাকা দু'আনা মণ ধান। সুতরাং কারও বিরুদ্ধে তাদের কিছু বলবার নেই। ওরা নিজেরাই সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দিয়েছে। তিনটি মাস না ফুরোতেই সারা গাঁয়ের প্রাণ একটা অভাবের আতঙ্কে খাবি খেতে থাকে। আবার সাতটি মাস আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা।

তাঁতী চাষীদের অবস্থাও তাই। তাদের কাঁধের রঙীন গামছা একে একে খসে পড়েছে। বড় আশা ছিল, খুঁটিতে ঝোলানো সাধের মৃদঙ্গগুলি আবার বেজে উঠবে। বুড়োদের মধ্যে কেউ কেউ ভেবেছিল, ঘরের অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে ঠেলে রাখা তাঁতের হাড়গোড়গুলিকে হয়তো আবার টেনে তুলে জিয়ানো যেতে পারে। সামান্য কিছু টাকার পুঁজি—তারপর ঘটা করে একটি ব্রত—ঘট সিঁদুর পাঁচালি গান। আজও তাদের জরাজীর্ণ শিল্পীসত্তা আবার সাড়া দিয়ে উঠতে পারে। ঘরে ঘরে নাটাই ঘুরবে, মাকু নাচবে—বেশে বাসে বৈভবে ধুলগড়ার যৌবন হয়তো আবার সেজে উঠবে। সে স্বপ্ন মিলিয়ে গেল। তাঁতীরা বুঝেছে ভুল হয়েছে তাদের।

অসহায় ধুলগড়া যেন তার অনুশোচনার ভারে নিঝুম হয়ে গেল। এরই মধ্যে হঠাৎ একটা চাঞ্চল্য জেগে উঠলো। এর প্রথম সাড়া এসেছে তাঁতী পাড়ায়। দীনবন্ধু

তাঁতীর ছেলে মোহনবাঁশী অনেকদিন গাঁ ছাড়া হয়েছিল, শোনা যেত সে নাকি সদরে কি-সব ফেরি কারবার করে। আজ সে ফিরে এসেছে আবার নিজের গাঁয়ে।

ধুলগড়ার সব পাড়া একবার ঘুরে গেল মোহন। গায়ে নতুন নীল উর্দি, বাবরি করা তেলা চুলের উপর আলগোছা নীল মুরেঠা বসানো। কোমরে চামড়ার পেটি, তার ওপর পেতলের তকমা। মোহন চৌকিদার হয়েছে। চারটে গাঁ নিয়ে চৌকি, সাত টাকা মাইনে। টাঙ্গিটা আলগাভাবে কাঁধে ঝুলিয়ে মুখভরা হাসি নিয়ে মোহন সব পাড়া ঘুরে বেড়ায়।

যে পাড়া দিয়ে যায় মোহন, সে পাড়াতে তার পেছনে ন্যাংটো ছোট ছেলেদের দল ধাওয়া করে চলে। দাওয়া থেকে গামছা পরা প্রৌঢ় প্রবীণেরা প্রথম বিস্ময়ের অভিভাব কাটিয়ে কুশল প্রশ্ন করে। বড় বড় মেয়েরা আড় চোখে দেখে নিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তাদের ছেঁড়া-কাপড়ের ফাঁকে ফাঁকে মোহনের দৃষ্টিটা গায়ে এসে বেঁধে। বহুড়িরা বৃথা ঘোমটা টানবার চেষ্টায় একবার ঘাড়ের দিকটা হাতড়ায়। খাটো কাপড়ে ঘোমটা কুলোয় না।

বাউরীপাড়ার বাথানের কাছে গোবর নেবার জন্য ছোটবড় অনেকগুলি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর ছিল জবা। আঁকাবাঁকা অনেক পথ মাড়িয়ে মোহন সেখানে এসে থামলো। মনে হলো, এতক্ষণ এই উদ্‌ভ্রান্তির পর সে যেন একটা অভীষ্ট লাভ করে ক্ষান্ত হলো।

মেয়েরা বাথান থেকে গোবর কুড়িয়ে নিয়ে তালপাতার ওপর জড়ো করে রাখছে। এক জবা ছাড়া আর সবারই চেহারা যেন ঐ পচা গোবরের মত বীভৎস। কারও কোমরে একটা কাঁথা জড়ানো, কেউ একটা চট একপাক জড়িয়ে নিয়েছে। কেউ প'রে আছে একটা বহুপ্রাচীন রঙীন শাড়ীর ধ্বংসাবশেষ। দেখতে কুরূপ বোধহয় কেউ নয়। পরিধেয় এই কদর্য বস্তুগুলিই ওদের চেহারাকে কদর্য করেছে। এর চেয়ে নিশ্চয় ওরা অনেক সুন্দর।

জবার কথা আলাদা। তার গায়ের শাড়িটা খাটো হলেও আস্ত। তবে বহু ব্যবহারে স্থানে স্থানে ফেঁসে গেছে। দেখে মনে হয়, জবা এখনো যেন কোনো মতে যৌবনের প্রথম সঙ্গী সুশ্রী সুবেশ দয়ারামকে শ্রদ্ধার শেষ সঞ্চয়টুকু দিয়ে বুকে ধরে রেখেছে।

চৌকিদার মোহনকে চিনেছে সবাই। তবে আর কেন? এতক্ষণ, এখানে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ কি? হয়তো আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতো মোহন, কিন্তু প্রায় সবকটি মেয়ে একসঙ্গে মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলো। বিরক্তি ও বিদ্রূপে গলার স্বর বিষিয়ে নিয়ে তারা শুনিয়ে দিল—বুঝেছি, বেশ বুঝেছি, চৌকিদার হয়েছ। নীল কবুতরটি সেজেছ। তবে আর এখানে খাঁড়া নিয়ে সবাইকে ডরাচ্ছ কেন? নিজের ঘরকে যাও না এবার, পথে তো বাঘ বসে নাই।

মোহন তাড়াতাড়ি অন্য পথে সরে পড়লা।

শুধু জবা চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখে মোহনকে, যতক্ষণ না অদৃশ্য হয়ে যায়। ওকে

ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেবার মত অহঙ্কার কোথা থেকে পায় এই মেয়েগুলি? সে তাঁতী, সে চৌকিদার, সে ভিন পাড়ার ছেলে, তবু আজ সে-ই গাঁয়ের একমাত্র সুবেশ ও সুপরিচ্ছন্ন মানুষ। জবার সঙ্গে মেয়েদের একটা ঝগড়া হয়ে গেল।

জবা—তোরা ওকে দেখে অমন ঘেউ ঘেউ করে উঠলি কেন?

মেয়েরা—কেন করবো না? লো'টার লাজ-সরম নাই; তাকাবেক কেন আমাদিগের পানে?

জবা—খুব হয়েছে, চুপ কর। ?র লাজ-সরম নাই, নিজের পানে চেয়ে দেখ।

ধুলগড়ার বিপর্যয়ের বিলাপ যেন বাতাসে ভেসে গেছে দূরান্তরে! এসেছে, এক পাদরী; সুর করে শুনিয়ে যায়—গরীবের জন্য স্বর্গের দ্বার খোলা আছে। এসেছে একজন সন্ন্যাসী ডাক্তার। গোবীজের শিশি আর চুরি করে নিয়ে টিকে দেবার জন্য গাঁয়ের ছেলেবুড়ো সবাইকে তাড়া করে বেড়ায়। ভাগ্য গণনা করতে এসেছে এক গণকঠাকুর। গাঁয়ের গ্রহশান্তি করতে এসেছে এক সন্ত বাবাজী। আর, ঘনিয়ে এসেছে পঞ্চমীর পুজো, বটতলার শিলাদেবীর কাছে জোড়া পাঁঠার বলি না দিলে রেহাই নেই। সব দেবতার খোরাক যোগাতে নিঃস্ব ধুলগড়ার রক্ত শুকিয়ে আসে।

আহত ধুলগড়ার রক্তমাংসের গন্ধে গন্ধে কোথা থেকে এক লোন-অফিস এসে জুটেছে। লোন অফিসের আমলা আর সরকারেরা প্রায় সাতদিন ধরে খোঁজখবর নিল বাউরীপাড়া আর তাঁতীপাড়ার যত কুঁড়েঘর ঢুঁড়ে, গরু আর মহিষের চেহারা দেখে, যেন ক্ষেতের মাটি চেখে চেখে তারা কিছু একটা স্থির করে নিল। বোঝা গেল তারা খুশি হয়েছে।

ক'দিন পরেই দেখা গেল দু'পাড়ার মাঝখানে একটা কুশে জমির ওপর নতুন টিনের একচালা উঠেছে। দাদনের ঝুলি নিয়ে বসলো লোন-অফিস। আকাশের দিকে চোখ রেখে ওরা সাবধানে ঋণ ছাড়ে। আমন রবি রেহান দিয়ে চাষীরা কবলায় টিপসই মারে। শুধু নিজেরা নয়, মাটির ভবিতব্যের নাড়ীতে কোটি কোটি শস্যভ্রূণ এই ঋণের বন্ধনে খাতক হয়ে যায়।

দৈবের এই পীড়ন গ্রামের সকল উৎসাহকে চেপে ধরছে পাকে পাকে। শুধু ভরসা হয় মোহনকে দেখে। মোহন যদি একবার তাদের সব দুঃখ-দুর্গতির বার্তা নিয়ে ইউনিয়নের হৃদয় গলাতে পারে, ইউনিয়ন যদি সার্কেল কর্তাদের মর্জি মজাতে পারে, তবে সদরের কৃপা ডুকরে উঠতে কতক্ষণ?

ধুলগড়ার বটতলায় এক সন্ধ্যায় তাঁতী বাউরী সকলেই মোহনকে তাদের প্রস্তাব যথামিনতির সঙ্গে জানালো। এই একটি দিনের পরীক্ষায় মোহনের চরিত্র চরম যাচাই হয়ে গেল। মোহন বললো—না, সে হতে পারে না। আমি গাঁয়ের চাকর নই। আমি চোর ধরব, বদমাস ঠেঙাব।

তাঁতীদের সস্তা স্বপ্ন ভেঙে গেল। ওদের গাঁয়ের ছেলে মোহন, সেই দীনবন্ধুর ছেলে। কিন্তু সে আজ ফিরে এসেছে কাবুলী আর ইংরেজের চেয়েও বেশী বিদেশী

হয়ে। ধুলগড়ার ভাষা ওর মুখে বাজে না। ধুলগড়ার অভাব ও অপমান ও চিনতে পারে না।

তবু সারা গাঁয়ের মধ্যে একমাত্র পরিচ্ছন্ন হল মোহনবাঁশী, তারই শুধু পরিচ্ছদ আছে। গাঁ-ভরা মানুষ ও গরুর ভিড়ের মধ্যে ওর বেশভূষা ওকে এক ভিন্ন জাতের মর্যাদা দিয়েছে।

ভয় পেয়েছে বেশি বাউরীপাড়ার লোকেরা। জয় মতি মধু আর গুণধর দূর থেকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখে মোহনকে। চোখাচোখি হলেই অপরাধীর মত মুখ নামিয়ে নেয়। ছেলেবেলায় একদিন যে ওরা আর মোহন একসঙ্গে হারাণপুরের মেলায় চুরি করে সরবত খেয়েছিল, সে ঘটনাও আজ একেবারে মিছে হয়ে গেছে।

তবু আবার হাল ধরে সবাই। রোদেপেটা এঁটেলমাটি লাঙলের মুখে উল্টে পাল্টে দেয়। কড়া মই চালিয়ে ঠেলা ভাঙে, চাষী মেয়েরা পাশে দাঁড়িয়ে আগাছা বাছে, কঞ্চি দিয়ে ক্ষেত্রে ধুলো চৌরস করে। সব ক্ষুধা রোগ তাপ ফাঁকি হতাশার ষড়যন্ত্রকে উপেক্ষা করে ওরা আবার লেগে যায় অদৃষ্টকে শক্ত মুঠোয় ধরে রাখতে।

শুধু জবা বেঁকে বসেছে, ক্ষেতে কাজ করতে সে নারাজ। ক্ষেতভরা এক পাল মরদ, কোনো লজ্জা বালাই নেই তাদের। গায়ে একটা সুতো কুটো আছে কি না আছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

বুড়ো কুঞ্জবাউরী বার বার বুঝিয়ে বলে—তোর ওসব চিন্তে কেন? তুই কাজ করবি মাটির সাথে। মাটির দিকে তাকিয়ে থাকবি।

জবা—না, আমি পারবো নাই।

কুঞ্জ—পারতে হবে।

জবা—না, পারবো নাই।

জবা সদর্পে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়। বুড়ো কুঞ্জ তার মেয়ের দেমাকের দাপট দেখে প্রথমে একচোট মেজাজ দেখিয়ে ফেলে। গালাগালি করে। কিন্তু পরক্ষণেই মমতার আবেশে শান্ত হয়ে আসে। সত্যিই তো, ও চেহারা রোদে জলে খাটবার জন্য নয়। ভগবান ওকে বুদ্ধি দিয়েছে, ভদ্রলোকের মত রুচি দিয়েছে। কষ্টে পড়লে কেঁদে ফেলে, অভিমান করে। ও ঠিক কানিপরা চাষার মেয়ে নয়। আসলে, ও হলো দয়ারামের বৌ। এই পরিচয় জবা ভুলতে পারে না। জবা এখনো সিঁদুরের টিপ পরে; পান খায়; ছেঁড়াফাটা যে দু'একটা শাড়ি আছে, তাই দিয়ে সে আজও রোজ সাজ করতে ভোলে না।

জবা কখনো কখনো ঘরের দাওয়ায় বসে চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়ায়। ঝুমকোর বেড়া ঘেঁষে, চুবড়ি কোদাল কাঁধে নিয়ে মতি বাউরী ভীরু চোখে তাকিয়ে চলে যায়। মতির গায়ে একটা মোটা বিলিতি পশমের কোট। কোথা থেকে যেন যোগাড় করেছে, বোধহয় শহরের কোনো বাবুর বাড়ি থেকে ভিক্ষে মেগে নিয়ে এসেছে। বেঢপ

জামাটার ঝুল ছেঁড়া-গামছার ক্ষুদ্র অধোবাসটুকু ঢেকে ফেলেছে। তবু ঘামে ভিজে জলটোপা হয়ে চলেছে মতি। জবা অপাঙ্গে দেখে নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। বিদ্রূপের হাসিতে কুটিল ঠোঁট দুটো একবার নড়ে উঠলো শুধু। মতির সমস্ত মুখ চকিতে ফ্যাকাশে হয়ে যায়, চোখ দুটো আবার পরক্ষণেই জ্বলে ওঠে।

সকালবেলা থেকে বটতলার ছায়ায় এক কাপড়ের ফিরিওয়ালা এসে তার পসরা সাজিয়ে বসেছে। গাছের ডালে দড়ি টেনে ঝুলিয়ে দিয়েছে হরেক রকমের শাড়ি। কোরা ও ধোলাই; নানা মাপের ধুতি ভাঁজ করে থাক লাগিয়ে রেখেছে। একপাশে ছাঁট-কাপড়ের একটা ঢেরি লাগানো। ছিট আদ্দি শালু মলমল নয়নসুখ। আর একপাশে বিবর্ণ কতকগুলি জামার স্তূপ।

খদ্দেরের সমাগম দেখে ফিরিওয়ালা প্রথমে খুশি হয়ে উঠেছিল। ভুল ভাঙলো তাদের চেহারার রকম দেখে। এই প্রায়-উলঙ্গ অকিঞ্চনের জনতা—এদের রোদপোড়া চামড়ায় লম্বসাটপটাবৃত পৃথিবীতে লজ্জাবাদ বোধহয় এখনো সত্য হয়ে উঠতে পারেনি। এরা সত্যিই কি কিছু কিনবে? সন্দেহ হয়।

ছোট ছোট ন্যাংটো ছেলেগুলির মাতামাতি, ছোকরাদের দর হাঁকাহাঁকি, বয়স্কা মেয়েদের প্রশ্ন, জনতার চোখভরা প্রশ্ন দৃষ্টির উল্লাস—ফিরিওয়ালা কেমন ভয় পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি করে সব বেঁধেছেঁদে উঠে দাঁড়ালো সে। মাতব্বর চরণবাউরী ও আরও দু'একজন বয়োবৃদ্ধ ফিরিওয়ালাকে অনুরোধ জানালো—এবার পূজায় এ গাঁয়ে কেউ সওদা লিবে না হে। তুমি এইসো হোলির সময়। তখন অনেক মাল লিব আমরা।

—হাঁ, আসবো। সোনার সাজ নিয়ে আসবো তোমাদের জন্য, যত খুশি নিও।

ফিরিওয়ালা কাপড়ের বোঝাটা ঘাড়ে তুলে ঠোঁটের এককোণে একটু হাসি মুচকে নিয়ে পথে নেমে পড়ে।

পঞ্চমীর পরবে বটতলার দেবতার পায়ের কাছে, মাটিটুকু শুধু রঙীন হয়ে উঠলো। জন প্রতি পাঁচ পয়সা চাঁদা ধরে একজোড়া পাঁঠা কিনে বলি দেওয়া হয়েছে। এ উৎসবের রূপ চোখে পড়ে না। শুধু শোনা যায় তার শব্দ। শুধু উদ্দাম ঢাকের বাজনা; বিবস্ত্র ক্ষুধাজীর্ণ ধুলগড়ার শূন্য পাকস্থলী ও ফুসফুস যেন গর্জন করছে। বুড়ো বুড়ী বহুড়ী—প্রায় তিন-শো মানুষের একটা জনতা। লেংটি কানি ফালি ন্যাকড়া চটের টুকরো, তার ওপর এক-আধটু হলুদের ছিটে; ওদের মুখের সমস্ত হাসিরই মত বেদনা-করুণ এই উৎসব-সজ্জা। চারদিকের বাসি ও বিবর্ণ ফুল, শুকনোপাতা আর রুক্ষমাটির সঙ্গে ওরা ছন্দে ছন্দে মিলে গেছে।

জবার কথা আলাদা। শিউলি-গোলা দিয়ে রঙানো একটা চওড়া-পাড় শাড়ি পরিপাটি করে পরেছে জবা, সিঁদুর তো আছেই; চোখে কাজলও দিয়ে ফেলেছে।

রাজনন্দিনী! অন্য মেয়েরা জবাকে দেখে ফিসফিস করে উঠলো, মুখ টিপে টিপে হাসলো। জবা যেখানে দাঁড়ায়, সেখান থেকে তারা সরে যায়। আগে জবাকে পেলেই মেয়েরা তাকে সাগ্রহে ঘিরে দাঁড়াতো। জবার গায়ের শাড়ি আর খোঁপার ফিতে ধরে

তারা টানাটানি করতো। শতমুখে প্রশস্তি গুঞ্জন করে উঠতো। কিন্তু আজ তারা যেন জবার কাজল লেপা চোখের চাউনিতে ক্রুর বিদ্যুতের ছায়া দেখতে পেয়েছে। জবা তাদের কাছ থেকে সরে গেছে বহু দূরে। সব কাহিনী শুনেছে তারা। দয়ারামের জন্য আজ ওদের মন কেঁদে ওঠে। বুড়ো কুঞ্জ বাউরীর কথা ভেবে দুঃখ হয়। মেয়েরা যেন জবার ছায়া বাঁচিয়ে যায়। ওরা সবাই যেন মনে মনে এই ধিক্কার দিচ্ছে—জানি, কী নিয়ে তোমার এই গরব।

কুঞ্জবুড়ো নির্বোধ। কোদাল কুপিয়ে একটা ভাঙা আলে মাটি দিচ্ছিল কুঞ্জ। জানকী বাউরী জিজ্ঞাসা করলো—কি গো কুঞ্জদাদা, তোমার বিটি খাটতে আসছে লাই কেনে?

কুঞ্জ—তোমরা কি আর মানুষ বট হে? জানোয়ারের মত নেড়া-ন্যাংটা হয়ে থাকবে, লাজ সরম নাই তো তোমাদের। মেয়েমানুষ হয়ে কি করে এখানে আসবে বল?

প্রায় দশ-বারজন একসঙ্গে কোদালের হাতল চেপে গর্জে উঠলো—কি বললি রে বুড়ো? তোর জবা হলো মেয়েমানুষ? আর হোই যে এতগুলি বিটি মাগ মাতারী খাটছে, ওরা মেয়েমানুষ লয়? ঘরকে গিয়ে একবার দেখ। মোহন তাঁতী যে জাত লুটে নিচ্ছে রে কানা বুড়ো। দেখ গিয়ে যা।

কুঞ্জবুড়োর পাঁজরার ভেতর দমটা যেন আটকে গেল। বুড়ো দাঁড়িয়ে সিরসির করে কাঁপতে লাগলো। এই বিদ্রূপের নিদারুণ একটা অর্থ পঞ্চান্ন বছরের বাউরী-জীবনে দর্পকে যেন হঠাৎ লাথি মেরে ভূমিসাৎ করে দিল।

কোদালটা শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরে, বুড়ো এক লাফে জাল থেকে উঠে পাগলা ঘোড়ার মত ছুটলো ঘরের দিকে। বুড়োর পেছনে সবাই চিৎকার করে ছুটে এল—থাম্—বুড়ো থাম্।

জবা সেজেগুজে বসেছিল নিকানো আঙিনার ওপর একটা তুলসী পিঁড়ার কাছে। এখন বিকেল, তারপর সন্ধ্যা। কাজের মধ্যে কিছু কাঠের চেলি যোগাড় করা। বুড়োর জন্য ফেনভাত ফুটিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু তারপরেই তো নিশুতি রাত। এই আঙিনায় সুবেশ ও সুন্দর এক জোয়ান মরদের ছায়া দেখা দেবে। তার আকুল অনুনয় দু'হাতে ঠেলে রাখতে জবা যেন আর জোর পায় না। কিন্তু ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঘুমন্ত কুঞ্জবুড়োর আর্ত নিঃশ্বাসের শব্দ কানে আসে। অন্ধকারের আহ্বান ব্যর্থ হয়ে যায়।

মোহন বলে—তোর জন্য আমি জাত ছাড়ছি, তোর অত জাতের মায়া কেন?

জবা—আমি তো তোকে জাত ছাড়তে বলছি না।

মোহন—তবে কি করে হবে? খাবি কি?

জবা—কেন, আমি কি খাই না? আমার বাপ নাই?

মোহন—পরবি কি? এবার কি কানি পরে থাকবি? আর ক'টা কাপড় আছে তোর?

জবা—এই একটা।

মোহন—তারপর? কি করে তোর মান থাকবে?

জবা—তুই তো দিতে পারিস।

মোহন—আমি দিব কেনে?

জবা—বেশ, দিস না।

প্রতি রাত্রে আঙিনায় তুলসীপিঁড়ার কাছে এক সুস্বপ্ন একসঙ্গে ভিক্ষা ও দানের ছলনা নিয়ে আসে। আজ অনেক কষ্টে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঢাকাঢুকি দিয়ে এই জীর্ণ শাড়িটাকে জবা গায়ে জড়িয়েছে। কিন্তু একটু অসাবধানে ওঠাবসা করলেই ফেঁসে যায় কাপড়ের আধহাত ফাঁকটা বেসামাল হয়ে ঠিক হাঁটুর ওপরেই নির্লজ্জ হয়ে ওঠে। এ লাঞ্ছনা সবার পক্ষে দুঃসহ।

কাল রাত্রে মোহন বলেছিল—যেদিন তুই কানি প'রে পথে বের হবি জবা, সেদিন থেকে সব খতম। আমি আর আসবো না। আর ভাল লাগবে না তোকে।

ঠিক এইরকম কথা বলতো দয়ারাম। বেশভূষায় জবাকে উদাস দেখলে দয়ারাম এমনিভাবেই তাকে শাসাতো। অন্ধকারে মোহনের চৌকীদারী মুরেঠার ঝালরটা, দয়ারামের মাথায় বাবরীর মত যেন দুলে ওঠে। জবা তার হাত দুটিকে তবু সামলে রাখে। একটু ভুল হলেই হাতটা হয়তো মোহনের গলা সবেগে জড়িয়ে ধরবে এখনি।

মোহন যাবার সময় বলে যায়—তোর রূপ আছে। সাজবি না কেনে জবা?

জবা বলে—এখনি যেও না, আর কিছুক্ষণ থেকে যাও...

জবার ভাবনার আমেজ ছুটে যায়। একটা চিৎকারের তাণ্ডব যেন হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মাথার ওপর কুঞ্জবুড়োর হাতের কোদালটা হিংস্র হয়ে লাফিয়ে ওঠবার আগেই সকলে মিলে তার হাত চেপে ধরলো। কুঞ্জ কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লো। লোকের ভিড়, মন্তব্য, ধমক আপসোস ও ধিক্কারের সেই সোরগোলের মধ্যে জবা ঘটনাটির অর্থ বুঝে নিল। বুঝে নিল জবা—তার প্রতি রাত্রের সেই তমসাবৃত কাহিনী সারা গাঁয়ের গোচরে এসে গেছে। সবাই বুঝে ফেলেছে, পঞ্চমীর বটতলায় তাই তারা মুখ টিপে হেসেছে।

জবা ঘরের ভেতর ঢুকে দরজায় আড় টেনে দিল।

ভিড় সরে গেছে। কুঞ্জবুড়ো পা-ভাঙ্গা বলদের মত ঘরের বাইরে অন্ধকারের মধ্যে কাত হয়ে পড়েছিল। জবা এসে কেঁদে পড়লো—চল, ঘরে চল।

কুঞ্জবুড়ো—না।

জবা—এই ধরিত্রী ছুঁয়ে দিব্যি দিচ্ছি, আর কখনও আমি দোষ করব না। আর ভুল হবেক নাই।

জবার হাতে ভর দিয়ে উঠে কুঞ্জ ঘরের ভেতর গিয়ে শুয়ে পড়লো। জবা একটা চট টেনে শুয়ে পড়লো বুড়োর পায়ের কাছে মাথা রেখে। এই ধরিত্রীর কোল থেকে কে যেন তাকে ঠেলে দিয়েছিল ক'দিনের জন্য। সেই হারানো ঠাঁই আবার পাওয়া গেছে। এক ভাবনাহীন তৃপ্তির আবেশে জবা অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লো।

তাঁতীপাড়া জেনেছে মোহন তাদের কেউ নয়। সে শুধু চৌকিদার। বাউরীপাড়া জানে. জবা তাদের জাতের অপমান। দু'পক্ষেই বিদ্বেষ ঘনিয়ে ওঠে, কোন পক্ষের কেউ ভুলতে পারে না তাদের গোষ্ঠী-অভিমান। তাঁতীরা মনে করে, জবা তাদের পাড়ার ছেলেকে খারাপ করেছে। বাউরীরা মনে করে, মোহন তাদের সংসারে এনেছে কলঙ্কের ছাপ। সময় সময় বাউরী পাড়ার সবাই বোঝে—এ শুধু মোহনের দোষ নয়। জবা যদি একটু কড়া হত তাহলে তাদের জাতের মান এভাবে সস্তায় ও সহজে খোয়া যেত না। জবার বাপও যেন কেমন। মেয়ের ওপর শাসন নেই। সব বুঝেও চুপ করে আছে। তারও কি জাত হারাবার ভয় নেই? তবু সবাই চুপ করে এই অপমানের মার হজম করে। দৈন্যে হাহাকারে জাতের দেমাক আজ লাঠিমারা সাপের মত মাথা গুঁজে পড়ে আছে।

কুঞ্জবুড়ো আবার খাটতে আরম্ভ করে। আজকাল ওকে সকলে একটু দয়ার চক্ষে দেখে। আর ক'টা দিনই বা ওর আছে? ওকে জাতের বার করে লাভ কি? এমন জোয়ান মেয়ে ঘরে থাকতে ভাঙা কোমর নিয়ে বুড়ো বাপকে ধুঁকে ধুঁকে খাটতে হয়। কিন্তু মোহন তাঁতীর এ দুঃসাহস ওরা ক্ষমা করবে না। এই রোপাইটা শেষ হয়ে একবার ক্ষেত ধরে নিক, একটু সুদিন পড়ুক; তারপর দেখে নেবে তারা—তাঁতীর হাতে টাঙির কত তেজ!

তিন দিন থেকে কুঞ্জবুড়ো একটা বিসদৃশ্য ব্যাপার লক্ষ করছে। কোনো চাষী কামিন ক্ষেতে খাটতে আসছে না। চাষীদের মুখভরা একটা অপ্রসন্নতা থমথম করে। নতুন জল নেমেছে। চটপট রোপাই সেরে ফেলতে হবে। কিন্তু আল বাঁধতেই সময় ফুরিয়ে যায়। আঁটি-আঁটি ধানের চারা ক্ষেতের জলে হাবুডুবু খেয়ে পড়ে থাকে।

হৃদয় বাউরীকে পাশে পেয়ে কুঞ্জ প্রশ্ন করলো—তোমাদের ঘরের লোক কই হে? কেন আসছে নাই বল তো? ব্যাপার কি?

হৃদয়কে চুপ করে থাকতে দেখে কুঞ্জ আবার চোয়াল কাঁপিয়ে একটা হিংস্র হাসি টেনে জিজ্ঞাসা করে—মোহন তাঁতী কি সবারই....

হৃদয় জবাব দিল—তোমার বুদ্ধিতে মরণ এসেছে বুড়ো। তুমি বুঝবে না। ঘরে গিয়ে নিজের বিটিকে শুধায়ে দেখ।

কুঞ্জ—তোমাদিগেরই বা বলতে এত লাজ কেনে?

হৃদয়—ঘরের লোক সবাই আসবে গো আসবে। না হলে রোপাই সারবো কি করে? তুমি কিছু বুঝবে না, চুপ কর।

কুঞ্জ কি বুঝলো সেই জানে। বিশ্রী রকমের একটা হাসি আর হাই তুলে আবার কাজে মন দিল।

বাঁশবনের ডোবাটা দুপুর বেলাতেও একেবারে নির্জন। কাটা তালগাছের একটা খণ্ড ডোবার কিনারায় জলের মধ্যে কাছিমের মত পিঠ ভাসিয়ে পড়ে থাকে। জবা সেখানে বসে বসে দুধিয়া মাটি দিয়ে তার শেষ শাড়িটাকে খুব সাবধানে কেচে নিল।

শাড়ির পাড়টাতে এখনো কিছু জোর আছে, কিন্তু সুতোগুলি থেঁতলে তুলোট হয়ে গেছে, তালি সেলাই আর ধরে না। খুব সামলে কাচতে গিয়েও আবার দু'জায়গায় ফেটে গেল।

শাড়িটাকে আঙিনায় মেলে দিয়ে জবা ঘরের ভেতর বসে রইল। নিজের কাছ থেকেই সে যেন লুকিয়ে ফিরছে। ঘরের কোণে বসে যেন একটা লজ্জার জ্বরের জ্বালায় জবা ছটফট করতে থাকে।

শাড়িটা শুকিয়ে গেলে তুলতে এসে জবা দেখলো—খড়খড়ে কাগজের মত হয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও কাপড়টাকে অন্যদিনের মত আর ছাঁদ করে গায়ে জড়ানো গেল না। পুরনো পলকা চাটাইয়ের মত ভেঙে যায়। দারুণ ঘৃণায় এক টান মেরে শাড়িটাকে সরিয়ে ফেলে দেয় জবা। না, আর সহ্য যায় না। উলঙ্গ ধুলগড়ার ষড়যন্ত্র এতদিনে বোধহয় চরম হয়ে উঠেছে।

রাত্রি একটু গভীর হয়ে আসতেই জবা ঘরের বাইরে আঙিনার ওপর এসে দাঁড়ায়। মোহনের পায়ের শব্দ অনেকদিন পরে আবার অন্ধকারে রোমাঞ্চ জাগায়।

মোহন —কি হয়েছিল তোর জবা? এতদিন দেখা দিলি নাই কেনে? তুই দেখছি, হয় আমাকে মারবি, নয় পাগল করে ছাড়বি।

জবা—তুই রোজ এসে ফিরে গেছিস, না?

মোহন—তবে? সেদিন বিছা কামড়ে শরীরটা জ্বালায়ে দিল, তবুও দাঁড়িয়েছিলাম।

মোহনের উত্তরগুলি জবার সব সংশয় দ্বিধা বিবেচনার ওপর যেন মন্ত্রপড়া জল ছিটিয়ে তাকে বিবশ করে আনে। একটা টাল খেয়ে মাটির ওপর বসে পড়লো জবা। মোহন ব্যস্ত হয়ে ধরে তুলতে যেতেই শাড়ির একটা ভাগ খুলে গিয়ে তার মুঠোর ভেতর ঝুলতে লাগলো।

মোহন—একি জবা, তুই কানি পরেছিস!

জবা—হ্যাঁ।

মোহন—এই তোর ইচ্ছে?

জবা—না।

মোহন—আনবো শাড়ি? নিবি তো? বল, তুই একবার হাঁ বলে দে।

জবা—হ্যাঁ।

মোহন—কালই নিয়ে আসছি।

মোহন চলে গেলে তুলসীপিঁড়ার কাছে সংজ্ঞাহীনের মত জবা বসে রইল অনেকক্ষণ। বসনে ভূষণে প্রসাধনে চর্চিত এক আন-দুনিয়ার আলোকের ধাঁধায় ধুলগড়ার পথ হারিয়ে গেছে তার—চিরদিনের জন্য। জাত-মান, ক্ষেত, বাগান, বটতলার শিলা—সরে গেছে বহুদূরে। কোনো মমতা তাকে আর ধরে রাখতে পারলো না।

ঝুমকোর বেড়ার ধার দিয়ে যেন অনেকগুলি ছায়ামূর্তি দল বেঁধে যাচ্ছে। পায়ের শব্দে চমকে উঠলো জবা। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর জবার ভীত বিস্মিত ও

অলস চোখের ঝাপসা দৃষ্টি ক্রমে স্বচ্ছ হয়ে এল। মুক্তির পথ পাওয়া গেছে, খোলা পড়ে রয়েছে। সবাই সে পথে চলেছে। রাত্রিচর পাখির মত উল্লাসে যেন ডানা ঝাপটে ঝুমকোর বেড়াটা ডিঙ্গিয়ে গিয়ে জবা তাদের সঙ্গে মিশে গেল।

গঞ্জ থেকে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। সারাদিনের মধ্যে সামান্য একটু জল-বাতাসাও পেটে পড়েনি মোহনের। পয়সা ছিল না। তের টাকা নগদ দিয়ে আর কিছু ধার বাবদ লিখিয়ে পালবাবুদের দোকান থেকে একজোড়া শাড়ি কিনে এনেছে মোহন। নক্সাকরা একটা নকল বারাণসী, আর একটা মিলের মিহি শাড়ি। সারা দুপুর রংরেজের ঘরে বসে নতুন ছুপিয়ে নিয়েছে, যার জন্য খরচ পড়েছে সাত টাকা। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, নিজের জন্য একটা বুটিদার তোয়ালে কেনে। কিন্তু সব সঞ্চয় তার নিঃশেষ হয়ে গেছে। ভালই হয়েছে। যাকে পাওয়া যাবে, পেতে হবে, তার দাম কখনই সামান্য নয়।কাজেই উচিত শুল্ক দিতেই হবে। এ এক আত্মহারা আনন্দ, নিঃশেষে ফুরিয়ে যাওয়ার সুখ।

রাত্রি মাঝ প্রহরে ফেউয়ের দল একবার চিৎকার বন্ধ করলো। গুঁড়ো বৃষ্টির ছাট মোহনের চোখে মুখে লাগছে। তুলসীপিঁড়ার কাছে পাট করা একজোড়া শাড়ি—যেন তার একজোড়া ইহ-পর পরিণাম সঁপে দিয়ে মোহন আঙিনার চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। জবা তখনো বুঝি ঘরের ভেতর আছে।

আঙিনার কোণে কোণে জলেভেজা পাতার গাদায় মরা জোনাকীরা আলো ছাড়ে। মোহন অস্থির হয়ে ওঠে। এই রাত্রে সব গভীরতা সব মুহূর্ত যে জবার প্রতিশ্রুতি ছোঁয়ার পরম মূল্য লাভ করেছে।

মোহন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে—বেড়ার ফাঁকে কুঞ্জবুড়োর শ্বাসবায়ু ফাটা হাপরের মত হাঁসফাঁস করছে। আর ধৈর্য ধরার সাধ্যি নেই. মোহন দরজার আড় সরিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো। চকমকি ঘষতেই দেখা গেল—ঘরে আর কেউ নেই। শুধু ঘুমোচ্ছে কুঞ্জ বাউরী। জীর্ণ কদর্য অস্থিপেশীর একটা কৃত্রিম মানুষী সজ্জা বৃথা দম টেনে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে।

মোহনের মাথার শিরায় যেন পাগলামির বান ডেকে গেল। এক লাফে ঘর থেকে বার হয়ে একটা থাবা দিয়ে শাড়ি-জোড়া তুলে নিল মোহন। আর, এক হাতে টাঙিটা শক্ত করে ধরে আঙিনা পার হয়ে পথের অন্ধকারে মিশে গেল। জবা কোথায়?

বাউরীপাড়ার প্রত্যেকটি কুঁড়ের দুয়ারে, বেড়ার ফাঁকে, মেটে পাঁচিলের মাথায়, মরাই মাচানের অন্ধকারে মোহনের চোখ কান আর ধারালো টাঙি উঁকি দিয়ে ঘুরে গেল। জবার সন্ধান পাওয়া গেল না।

মনে পড়লো মতি বাউরীকে। তাগড়া চেহারা ছোঁড়ার, ওরই সঙ্গে জবার সাঙ্গা-বিয়ের কথা উঠেছিল একবার। কোথায় সে?

মতি শুয়েছিল একটা ছোট খড়ের বোঝা বুকে আঁকড়ে, বাথানের বাইরে। মতি একাই বাথান পাহারা দেয়ে। নেকড়ে হায়নার ভয় নেই ওর—যেমন গরীব তেমনি সাহসী। মোহন তাকে স্বচক্ষে একবার দেখে নিয়ে তবে শান্ত হলো।

জীবনে এই প্রথম সত্যিকারের পাহারা দিল মোহন; শুনে গেল ঘরে ঘরে ক্ষুধার্ত হাড়েরা ঘুমের ঘোরে দাঁত পিষছে। কোন ঘরে একটি প্রদীপ জেগে নেই। কোনো নিভৃতে বীতনিদ্র প্রণয়ের সম্ভাষ অসাবধানে বেজে ওঠে না। শুধু কাঁদে শিশুর দল—তৃষ্ণার্ত ছোট ছোট জিভের বিলাপ রাত্রি স্থৈর্যকে শব্দাতুর করে তোলে। কিন্তু তাদের সান্ত্বনা দিতে কেউ জেগে ওঠে না কেন?

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে এল মোহন। জবা পালিয়েছে। তবু মনে হয়, এই জলো হাওয়া আর অন্ধকারের মত সে যেন কাছেই আছে, অধরা হয়ে। বস্তি পার হয়ে গাঁয়ের সীমানায় একটা করঞ্জগাছের তলায় মোহন এসে দাঁড়ালো।

মোহন বোধহয় ঝিমিয়ে পড়েছিল। চোখ মেলে চাইতেই বুঝলো সে গাছে ঠেসান দিয়ে আছে। অবসাদে সমস্ত শরীরটা একটা মরা ডালের মত বেঁকে চুরে গাছের গায়ে নেতিয়ে লেগে আছে। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে।

ক্ষেতের আল ধরে কারা যেন আসছে। এক—দুই—তিন—অনেক। হেমন্তের শিশিরে উদ্‌ভ্রান্ত একদল শৃঙ্গারাদ্রা হরিণী যেন ত্রস্তপদে ছুটে আসছে, গাঁয়ের দিকে।

রাত্রির অন্ধকারের আড়ালে ক্ষেতে রোপাই সেরে ফিরছিল বাউরী মেয়েরা। আজ রাত্রের মত কাজ শেষ, আর সময় নেই।

ওরা আসছিল—বিবসনা মৃত্তিকাবধূর দল। টুকরো টুকরো কানি চট কাঁথা—মধ্যদিনের রুচি-পরমাদ, আজ রাত্রের মত পরম অবহেলায় ওরা ঘরেই ফেলে রেখে এসেছে, ওদের লজ্জা ঘিরে রেখেছে লক্ষ কালোসূতোর জালে তৈরী এই নিঃসীম অন্ধকারের পরিচ্ছদ।

চৌকিদার মোহন অনিমেষ চোখে, জোড়া শাড়ি বুকে আঁকড়ে করঞ্জতলায় নির্জীবের মত পড়েছিল। জলকাদা মাখা সেই মূর্তিগুলি তারই সুমুখ দিয়ে দল বেঁধে হেঁটে চলে গেল তরতর্ করে। ওদের রুক্ষ চুলের ভার পিঠের ওপর ঘষা খেয়ে শব্দ করছে। নিরাবরণ দেহের প্রতিটি পেশী যেন নূপুরের মত অদ্ভুত শব্দ করে বেজে চলে যাচ্ছে।

—বেলা চমকাচ্ছে যে গো। জলদি কর। তাদেরই ভিড়ের মাঝখান থেকে জবা বলে উঠলো।

পূব আকাশের দিকে একবার চকিতে চোখ চেয়ে, করঞ্জতলা দিয়ে ব্যস্তত্রস্ত হয়ে হন্ হন্ করে চলে গেল গাঁয়ের মেয়েরা। খগ মৃগ মধুপের সাড়ায় এখনি জেগে উঠবে পৃথিবী। ওরা শুধু ভয় পাচ্ছিল, এখুনি বুঝি সূর্য উঠে পড়ে।

সমাপিকা

কোথায় গেল মানসী?

অফিস ছুটি হয়েছে বিকেল পাঁচটায়, বাড়ি পৌছতে মাত্র আধ ঘন্টা সময় লেগেছে। এখন, শুধু এক কাপ চা খেয়ে নিয়ে মানসীকে সঙ্গে নিয়ে বের হবে তাপস, চৌরঙ্গীর

সেই সিনেমা-ভবনের কাছে ছ'টার মধ্যেই পৌঁছে যেতে পারা যাবে। সাধারণ ক্লাসের সিট যদি না পাওয়া যায়, তবে অসাধারণ ক্লাসের দুটো সিট পাওয়া যাবে নিশ্চয়। না হয় তো স্পেশ্যাল ক্লাসের সিট, তাও যদি না পাওয়া যায়, তবে ছোট একটা বক্স তো পাওয়া যাবেই। আজ গোটা পঞ্চাশেক টাকা হেসে-খেলে ছড়িয়ে দিতেও রাজি আছে তাপস। কাল জেনেছিল তাপস, মাইনে বেড়েছে। তিন বছর ধরে আড়াইশো টাকাতে ঠেকে-থাকা মাইনেটা এক দফাতে বেড়ে গিয়ে সাড়ে চারশো টাকায় দাঁড়িয়েছে। রিটায়ার করে গেলেন যে সুকান্তবাবু—তাঁরই জায়গায়, —অর্থাৎ জেনারেল ম্যানেজারের সেকেণ্ড অ্যাসিস্ট্যান্টের পোস্টে পার্মানেন্ট হয়েছে তাপস। দুশো টাকা মাইনে বৃদ্ধির সৌভাগ্যটিকে আজ একশো টাকারও একটা খুশির খরচ দিয়ে অভ্যর্থনা করতে রাজি আছে তাপস। এখনই বের হয়ে গেলে আর একটা ট্যাক্সি ধরে নিতে পারলে ছ'টার আগেই সেই সিনেমা ভবনের কাছে পৌঁছে যেতে পারা যাবে। ছবিটাকে শুরু থেকেই দেখতে পাওয়া যাবে।

কিন্তু মানসী কোথায়?

ঝি ভানুর মা বলে—বউদি কোথায় গেলেন, আমাকে কিছু বলে যাননি। আমাকে শুধু বলে গেছেন, —ঘর পাহারা দাও, আর দাদাবাবু এলে পাশের বাড়ি থেকে চা এনে দিও। পাশের বাড়ির রানুদিকেও বলে গেছে।

তাপসের চোখে বেশ কঠোর একটা ভ্রূকুটি শিউরে ওঠে—কখন বেরিয়েছে তোমার বউদি?

ভানুর মা—আপনি অফিস যাবার একটু পরেই।

তাপস—প্রায়ই এভাবে বেরিয়ে যায় বোধহয়?

ভানুর মা—তা আমি কি করে বলব গো দাদাবাবু? আমি তো সেই সকালে বাসন মেজে চলে যাই, আসি আবার বিকেলে।

তাপস সেইরকমই কঠোর গম্ভীর ও অপ্রসন্ন একটা মুখ নিয়ে যেন আনমনার মত বিড়বিড় করে।—তার মানে, প্রায়ই বেরিয়ে যায়, আর আমি অফিস থেকে আসবার আগেই ফিরে আসে। আজ বোধহয় সন্ধ্যার পরে কিংবা রাত করে ফিরবে বলেই....।

হ্যাঁ, একটা ব্যবস্থা করে গেছে মানসী। ঘর পাহারা দেবার জন্য ভানুর মাকে রেখে গেছে; তাপসের চা-এর জন্য পাশের বাড়িতে বলে গেছে। চমৎকার থিয়েটার করতে পারে মানসী। তাপসের চোখের কাছে বেশ চতুর আর কপট একটা মায়ার আবরণ ঝুলিয়ে রেখে দিয়ে ভয়ানক একটা ইচ্ছার অভিসারে বের হয়ে গিয়েছে।

তিন বছর হল বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর সেই যে এই বাড়িতে এসে ঠাঁই নিয়েছে মানসী, তারপর আর একটি দিনের জন্যও এলগিন রোডের বাড়িতে যায়নি। দমদমের এক নিভৃতে তাপসের এই বাসাবাড়িটাকে একেবারে চিরকালের ঠাঁই মনে করে সুখী হয়ে গিয়েছে মানসীর অন্তরাত্মা। মানসীর চোখে মুখে যেন সেই রকমের একটা তৃপ্তির

স্বীকৃতি ঝকঝক করে বাড়ির অন্তঃপুরে গিয়ে ঠাঁই নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। পুলক বিশ্বাসের মত বড়লোক ছেলের সঙ্গে বিয়ে প্রায় অবধারিত ছিল, তাকেই দমদমের এই আশি টাকার ভাড়ার বাড়িতে উঠে আসতে হয়েছে।

এলগিন রোডের জ্যাঠামশায়ের বাড়ি, যে বাড়ি পুলক বিশ্বাসের সঙ্গে মানসীর বিয়ে দেবার জন্য অনেক আশা আর চেষ্টা করেছিল, সে বাড়ির বিরুদ্ধে যেন একটা অভিমান আছে মানসীর মনে। তা না হলে এই তিন বছরের মধ্যে একদিনের জন্যও এলগিন রোডের জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে যায়নি কেন মানসী?

মানসীকে হেসে হেসে কতবার প্রশ্ন করেছে তাপস—ব্যাপারটা কি হয়েছিল লজ্জা না করে বলেই ফেল না, সে বিয়ের চেষ্টা ভেঙে গেল কেন?

মানসী—আমি কি করে বলব?

তাপস—তুমি কিছুই জান না?

মানসী—না।

তাপস—পুলক বিশ্বাসের বাবা তোমার জ্যাঠামশাইয়ের কাছে অনেক টাকার পণ দাবি করেছিলেন?

—জানি না।

—পুলক বিশ্বাস রাজি হয়নি?

—জানি না।

—তুমি রাজি ছিলে কিনা সেটা তো জানো?

—জানি বৈকি।

—তবে তো মনে হচ্ছে, তোমার মনে বেশ একটা...।

—কি?

—একটা আক্ষেপ আছে।

—ছাই আছে।

—তবে এলগিন রোডের জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে যাও না কেন?

—একদিন হয়তো যাবো। কিন্তু এখন যেতে ইচ্ছে করে না।

—কেন? ও বাড়িতে গেলে পুলক বিশ্বাসের বাড়িটা দেখতে পাওয়া যায় বলে?

—সেটাও একটা কারণ বটে।

—আর কি কারণ থাকতে পারে?

—কত কারণ থাকতে পারে। সে সব জেনেই বা তোমার লাভ কি?

—আমি তো বুঝতে পারছি না, আর কি কারণ থাকতে পারে?

মানসী হাসে—তোমাকে বিয়ে করতে আমি রাজি হয়ে গেলাম কেন, এরকম একটা প্রশ্ন তো সে-বাড়িতে থাকতে পারে?

তাপসের মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়। —এইবার খাঁটি কথাটা বলেছ।

কথাটা একটু বিস্ময়ের প্রশ্ন বটে। এলগিন রোডের এত বড় ঐশ্বর্যের একটা বাড়ির

জ্যাঠামশায়ের ভাইঝি কেন যে তাপসের মত অবস্থার মানুষকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেল, এই প্রশ্নের বিস্ময় এখনো শান্তভাবে সহ্য করতে পারেনি। এলগিন রোডের জ্যাঠামশাই আর জেঠিমা। জেঠিমারই আত্মীয় হলেন এক মহিলা যিনি হলেন তাপসের বন্ধু মিহিরের মা, তাঁকে একদিন এলগিন রোডের বাড়িতে পৌঁছে দিতে গিয়েছিল তাপস। মাত্র আধ ঘন্টা সে বাড়ির বারান্দার চেয়ারে বসেছিল আর চা খেয়েছিল তাপস। চা এনে দিয়েছিল মানসী।

তারপরেই একদিন মিহিরের কাছ থেকে একটা বিস্ময়ের খবর শুনতে পেয়েছিল তাপস। মিহিরের মা তাপসের সঙ্গে মানসীর বিয়ের কথা তুলেছিলেন। মানসীর জেঠিমা বলেছিলেন—তা হয় না। মাত্র আড়াইশো টাকা মাইনে পায় ছেলে, তার সঙ্গে—না—মানসীর মত মেয়ের বিয়ে একেবারে অসম্ভব। কিন্তু মানসীই নাকি বলেছিল, খুব সম্ভব। তারপরেই একদিন বিয়ে হয়ে গেল।

মনে হয়েছিল তাপসের, মানসী যেন কারও উপর রাগ করে কিংবা ভাগ্যটারই উপর রুষ্ট হয়ে আত্মহত্যার মত একটা কাণ্ড করবার জন্য তাপসকে বিয়ে করবার জেদ ধরেছিল।

যাই হোক, আজ কোথায় গেল মানসী? সারদা পিসিমার বাড়িতে? ভোলাকাকার বাড়িতে? শাড়ী কিনতে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে? চিড়িয়াখানাতে? জাদুঘরে?

তাপসের বিশ্বাসের মধ্যে ধিকধিক করে সন্দেহটা জ্বলতে থাকে। ওসব জায়গায় যেতে হলে এমন একটা গোপনতার খেলা খেলবে কেন মানসী? তাহলে তো আগেই বলে রাখত। ওসব জায়গায় যেতে হলে তাপসকে এড়িয়ে যাবারও কোন দরকার হয় না। বরং এটাই স্বাভাবিক যে, ওসব জায়গায় যেতে হলে স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গে যেতে চাইবে; একা যেতে চাইবে না; একা যেতে ভাল লাগবে না।

—আমি চা খাব না, ভানুর মা।

বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় তাপস। আর, বুকের মধ্যে সেই সন্দেহময় কৌতূহলটা যেন হিংস্র হয়ে জ্বলতে থাকে। কোথায় গেল মানসী?

দুই

না, মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের সারদা পিসিমার বাড়িতে আসেনি মানসী। পিসিমা বললেন—তোমাকে না বলে-কয়ে হঠাৎ এখানে চলে আসবে কেন মানসী? মানসী তো এমন ভুলোমনের মেয়ে নয়।

আমহার্স্ট স্ট্রীটের ভোলাকাকার বাড়িতেও আসেনি মানসী। ভোলাকাকা বাড়িতে নেই। কাকিমা বললেন—সনৎ বললে....।

—কি বললে সনৎ?

—ওরে সনৎ, এদিকে আয় দেখি। তাপসদা কি বলছেন শোন।

সনৎ এসে বলে—হ্যাঁ, বউদিকে দেখেছি।

—কোথায়?

—ট্রামে।

—কোথাকার ট্রামে?

—ভবানীপুরের দিকে যাচ্ছিল যে ট্রাম, সেই ট্রামে।

ঠিকই দেখেছে সনৎ। ভবানীপুরের দিকে যাবার ট্রাম যে এলগিন রোড পার হয়ে যায়। ঐ এলগিন রোডেই যে পুলক বিশ্বাসের সেই বাড়ি; যে বাড়ি একদিন মানসীর আশার স্বপ্ন হয়ে উঠেছিল। সাহেবী সাজে সেজে আর জামার বুকের বোতামে লাল গোলাপের কুঁড়ি লাগিয়ে লনের উপর পায়চারি করে বেড়ায় যে পুলক বিশ্বাস, তাকে মানসী আজও দু'চোখের পিপাসা নিয়ে দেখে দেখে তার অশান্ত স্বপ্নটাকে শান্ত করতে চায়।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠেছে। এলগিন রোডের পথের আলো ঝলমল করছে। এই তো জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িটা, আর তারই পাশে এক তরুণীর মূর্তি।

বুঝতে অসুবিধা নেই, কে এই তরুণী, যার বিহ্বল শরীরটা হেলেদুলে পুলক বিশ্বাসের পাশে পাশে হেঁটে গল্প করছে। মানসীর মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় না; যেন ভয়ানক এক আবছাময়ী মায়াবিনীর মত মূর্তি ধরে গোপনে প্রেমিকের সঙ্গে স্বপ্নের কথা বলাবলি করছে মানসী।

আর দেখবার কিছু নেই। আর জানবারও কিছু নেই। শুধু তাপসের নিঃশ্বাসের বাতাসটা যেন কথা বলছে—এবার বুঝলে তো অন্ধ, কত বড় এক কৌতুকিনী নারী দমদমের এক আশি টাকার ভাড়ার বাড়িতে এক ভদ্রলোকের স্ত্রী সেজে স্বামীর আত্মাটাকে ঠকিয়ে ঠকিয়ে দিন পার করে দিচ্ছে।

ব্যস্, আর তো কিছু ভাববারও দরকার নেই। চিরকালের মত ঐ লনের উপরে পুলক বিশ্বাসের ইচ্ছার সঙ্গিনী হয়ে ঘুরে বেড়াক মানসী। দমদমের বাড়ির দরজাতে আজই যে-খিল পড়বে সে-খিল আর কোনদিন খুলবে না। মানসী যদি ফিরে যায়, তবু মানসীর ছায়াও আর সে-বাড়ির দরজা পার হয়ে ভিতরে ঢুকবার সুযোগ পাবে না।

ট্যাক্সি ধরে তাপস। তারপর সোজা দমদম; কোথায় থামবার দরকার নেই। তাপসের আহত আত্মাটা যেন মানসী নামে একটা অভিশাপের ভয় চিরকালের মত নিশ্চিহ্ন করে দেবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ছুটে চলে যায়।

তিন

ট্যাক্সির পাওনা মিটিয়ে দিয়ে আর ঘরে ঢুকেই চমকে ওঠে তাপস। পাশের ঘরে যেন চুড়ির শব্দ বাজছে। স্টোভটাও শব্দ করে জ্বলছে। আর আলনার কাছে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে রয়েছে একটা শাড়ি। তাপসের দুরন্ত সন্দেহের চোখ দুটো যেন স্তব্ধ হয়ে থাকে,—সত্যিই একটা প্রহেলিকা এসে ঘরের ভিতর ঢুকেছে। সত্যিই যে মানসী।

মানসী বলে—কোথায় গিয়েছিলে? ভানুর মা বললে, তুমি চা না খেয়ে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গিয়েছ।

তাপস—আমি তো হন্তদন্ত হয়ে ছুটেছিলাম; কিন্তু তুমি আমাকে না বলে-কয়ে সকাল দশটায় কোথায় গিয়েছিলে?

মানসী হাসে—তাতে কোন অপরাধ হয়েছে?

তাপস—এতক্ষণ ছিলেই বা কোথায়?

মানসী এক পেয়ালা চা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসে—কোথায় ছিলাম বলে তোমার মনে হয়?

তাপস—তুমি আগে জবাব দাও।

মানসী—চা খাবার আগে হাত ধুয়ে এটা খেয়ে নাও।

তাপস—কি এটা?

মানসী—দেখতে পাচ্ছ না? সন্দেশ চেন না নাকি?

তাপস—দেখতে পাচ্ছি, সন্দেশও চিনি, কিন্তু বুঝতে পারছি না।

মানসী—কালীঘাটের প্রসাদ।

তাপস—কালীঘাটের প্রসাদ কেমন করে এখানে এল?

মানসী—কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিয়ে এলাম।

তাপস—কি বললে? পুজো দিয়ে এলে?

মানসী—মানত করেছিলাম।

তাপস—কিসের মানত?

মানসী—তোমার চাকরির উন্নতির মানত।

তাপস—একাই গিয়েছিলে নাকি?

মানসী—একা যাব কেন? পাশের বাড়ির হিরণদি সঙ্গে ছিলেন।

তাপস—তাহলে....

অদ্ভুতভাবে হাসতে হাসতে মাথা হেঁট করে ফেলে তাপস। আর মানসীর হাত ধরে কি যেন বলতে চায়।

মানসী—কি হল? হাসছ কেন?

তাপস—এবার তাহলে তোমাকে আরও একটা মানত করতে হয় মানসী।

মানসী—আবার কিসের মানত?

তাপস—মানত্ করো, আমার মাথাটার যেন একটু উন্নতি হয়।

রূপো ঠাকরুনের ভিটে

খিদিরপুরের সঙ্গে এই ছোট জগৎপুরের কোন মিল নেই। জায়গাটাকে সত্যিই ছোট-খাট একটা ভিন্ন জগৎ বলেই মনে হয়েছে শুক্তির। পাঁচ ক্রোশ দূরে রেললাইন, আর তিন ক্রোশ দূরে টেলিগ্রাফের লাইন। তবুও ভাল।

এই তো মাত্র তিনটি দিন পার হয়েছে। মস্ত বড় একটা পালকি রেলস্টেশন থেকে

খিদিরপুরের মেয়ে শুক্তিকে তুলে নিয়ে চলে এসেছে এখানে। আট জোড়া বেহারার পা তিন কাঁচা সড়কের ধুলো আর দু'ক্রোশ ডাঙ্গা আর জাঙ্গালের ধুলো মাখতে মাখতে ছোট জগৎপুরের ভিতর ঢুকতেই চাষীদের ঘরের আঙিনা থেকে চিৎকার করে ছুটে এল এক পাল ছোট ছেলেমেয়ে—বউরানী বউরানী। চলন্ত পালকির দরজার কাছে এগিয়ে এসে উঁকিঝুঁকি দিয়ে ছোট জগৎপুরের বউরানীকে দেখতে থাকে ছেলেমেয়ের দল। তারপরেই ব্যস্তভাবে পথের একপাশে সরে গিয়ে দাঁড়াল। কারণ, পালকির ঠিক পিছনেই ঘোড়ায় চড়ে আসছেন রাজাবাবু। ঘোড়ার গলার ঘুঙুর বাজে ঝুম্‌ঝুম্ করে। বিয়ে হয়ে গিয়েছে রাজাবাবুর, বউরানীকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা থেকে ফিরছেন।

এরই মধ্যে একদিন বৌ-কথা কও এর ডাক শুনেছে শুক্তি। অনেক চেষ্টা করেছে পাখিটাকে দেখবার জন্য, কিন্তু দেখতে পায়নি। ঠিক বুঝতে পারা যায় না, কোন্ গাছের আড়ালে কোথায় বসে পাখিটা ডাকছে। মনে হয়, শুধু একটা ডাক এই বাতাসের মধ্যেই গা-ঢাকা দিয়ে আকাশের এদিকে-ওদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে। তিন দিনের মধ্যেই শুক্তির বড় বেশি ভালো লেগে গিয়েছে ছোট জগৎপুরের পাখির ডাক।

তিন দিন ধরে নহবতের স্বর অশ্রান্তভাবে বেজে বেজে আজ থেমেছে। কুটম্ব-আত্মীয়রা যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরাও সবাই বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন। প্রজাবাড়ির যত ছেলেমেয়ে এসেছিল মেঠাই নেবার জন্য, তাদেরও হুল্লোড় থেমেছে, চলে গিয়েছে সবাই। বিকাল হবার আগে একদল চাষী-মেয়েও এসেছিল বউরানীর মুখ দেখবার জন্য। মুখ দেখে খুশি হয়েছে তারা, তারপর আধ সের করে চিঁড়ে পেয়ে আরও খুশি হয়ে সবাই চলে গিয়েছে।

তিন দিন ধরে মুখ দেখাতে দেখাতে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল শুক্তি। অমুক পণ্ডিতমশাই, অমুক গুরুঠাকুর, আর অমুক বড়ঠাকুর, দূরের এই গ্রাম আর সেই গ্রাম থেকে নানা ধরনের মানুষ এসেছে আশীর্বাদ করতে। শুধু মুখ দেখাতে দেখাতে নয়, প্রণাম করতে করতেও ঘাড়ে যেন ব্যথা ধরে গিয়েছে। তবুও ভালো, একটুও খারাপ লাগে না শুক্তির।

একটু হাঁফ ছাড়বার জন্যই, অথবা ছোট-জগৎপুরের আকাশটাকে একটু ভালো করে দেখবার জন্যই বাড়ির ছাদের উপর এসে দাঁড়ায় শুক্তি। যতদূর দেখা যায়, দূরের ও নিকটের সব দৃশ্যগুলিকেই দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখতে থাকে।

হঠাৎ চমকে ওঠে শুক্তি। দূরের ঐ নদীর পাশে গাছের ভিড়ের ভিতর থেকে সেই রকমের একটা মন্দির মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখা যায়। চূড়ার উপর আবার ঠিক সেই রকমই একটা ত্রিশূলও যে রয়েছে। অন্য দিকে চোখ ঘুরিয়ে আর মুখ কালো-কালো করে দাঁড়িয়ে থাকে শুক্তি।

একটা অশান্ত হয়ে ওঠে শুক্তির মন। একটা অস্বস্তি কাঁটার মতো মনের ভিতর বিঁধতে থাকে। ঐ দুঃসহ দৃশ্যটা যে চার বছর আগের একটা আর্তনাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শুক্তির এই নতুন জীবনের শান্তি ও আনন্দকে বিদ্রূপ করার জন্যই দৃশ্যটা

যেন একটা হিংসুক চোরা দৃষ্টির মতো দূর খিদিরপুরের গাছপালার ভিতর থেকে বের হয়ে, আর আড়ালে পা টিপে-টিপে এগিয়ে এসে ঠাঁই নিয়েছে। খিদিরপুরে আর ছোট-জগৎপুরে কোথাও কোন মিল নেই। সেকেলে দুর্গের মতো গড়ন এই বাড়িটার সঙ্গে খিদিরপুরের একেলে বাড়িগুলির কোন মিল নেই, তবে এক জায়গায় এই মিল আর এত কুৎসিত মিল কেন?

চার বছর আগের একটি সায়াহ্নের একটা ঘটনা মাত্র,বুদ্ধিহীন কয়েকটা মুহূর্তের ভুল মাত্র। খিদিরপুরের বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে যেন দৃশ্যটার দিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে আর পাশের একটা পরিচিত মুখের কাছ থেকে গল্প শুনতে শুনতে হঠাৎ চমকে উঠেছিল শুক্তি, সেই ধরনের একটা দৃশ্যকে যে এখানেও তৈরি করে রেখেছে ঐ নদীর তীর, গাছের ভিড়, মন্দিরের চূড়া আর ত্রিশূল। হাতধরা একটা লুব্ধ ও উন্মাদ অনুরোধের কাছ থেকে সরে যেতে পারেনি শুক্তি, যে ঘটনা মনে পড়তে কতবার মুখ কালো করেছে, আর সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে কতদিন কেঁদেও ফেলেছে শুক্তি, যে ঘটনার কথা স্মরণ করে আজ চার বছর ধরে নিজেকে ঘৃণা করেছে, অশুচি বোধ করেছে , আর হঠাৎ আতঙ্কে সুস্বপ্নও ভেঙে গিয়েছে শুক্তির, সেই ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য ঠিক সেই ধরনের একটা দৃশ্য এখানে আবার কেন?

কিন্তু এটা খিদিরপুরের বাড়ির ছাদ নয়, ছোট-জগৎপুরের রাজবাড়ির ছাদ। তবে আর কিসের ভয়? মিথ্যা আর অকারণ ভয়ে আনমনার মতো কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল শুক্তি, তা সে জানে না। হঠাৎ চোখে পড়ে, পুবের দিকের আকাশটা সত্যিই মেঘলা হয়ে উঠেছে। সেই রকমই একটা মেঘ ভেসে আসছে ঐ মন্দিরের দিকে। সূর্য প্রায় ডুবে এসেছে। পশ্চিমের আকাশ সেই রকমের লাল আর পুবের আকাশটা সেই রকমের কালো। ঐ মেঘটা মন্দিরের ত্রিশূলকে তো এইবার ছুঁয়েই ফেলবে। সঙ্গে সঙ্গে হয়তো ঝিলিক দিয়ে উঠবে সেই চার বছর আগের দিনটার মতো ও সেই রকমেরই একটা বিদ্যুৎ। সেই মুহূর্তে কানের কাছে বেজে উঠবে একটা ভয়ংকর অনুরোধ। তারপর...সে ঘটনার কথা মনে পড়লে এখনো শিউরে ওঠে শুক্তি। মনে পড়ে, তার কিছুক্ষণ পরেই তৃপ্ত ও সফলকাম একটা সর্বনেশে পায়ের শব্দ আস্তে আস্তে সিঁড়ি ধরে নিচে চলে গিয়েছিল। মাগো!

চোখের উপর আঁচল চেপে ছটফট করে, ঠিক চার বছর আগে খিদিরপুরের বাড়ির ছাদে যেভাবে চোখে আঁচল দিয়ে একটা ভুলের জ্বালা চাপা দেবার চেষ্টা করেছিল শুক্তি।

আস্তে আস্তে একটা পায়ের শব্দ সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে থাকে, তারপরেই ব্যস্তভাবে যেন ছুটে এসে শুক্তির কাছে দাঁড়ায়।

শুভেন্দু বিস্মিত ও ব্যথিত হয়েই বলে—একি, তুমি কাঁদছো শুক্তি?

চোখের উপর থেকে আঁচল তুলে নিয়ে হেসে ওঠে শুক্তি—কে বললে কাঁদছি? চোখে জল দেখছো?

শুভেন্দু হাসে—না। তবে চোখে আঁচল চেপে কি করছিলে?

শুক্তি—তোমার পায়ের শব্দ শুনছিলাম।

শুভেন্দু—কি করে বুঝলে আমার পায়ের শব্দ? অন্য কারও পায়ের শব্দও তো হতে পারতো?

শুক্তির মুখের হাসি হঠাৎ নিষ্প্রভ হয়ে যায়। চোখের দৃষ্টিটাও কেমন করুণ হয়ে ওঠে। কিন্তু পরমুহূর্তেই হেসে অস্থির হয়ে মুখের উপর আঁচল চাপে শুক্তি—ধেৎ।

শুভেন্দু—কি হলো?

শুক্তি—যা খুশি তাই বলা হচ্ছে, মুখে একটু বাঁধছে না।

হাসিয়ে দেবার আর ভুলিয়ে দেবার ক্ষমতা আছে শুক্তির। শুভেন্দু সত্যিই প্রসন্নভাবে হাসতে থাকে। সে-হাসির ছোঁয়া লেগে শুক্তির এতক্ষণের যন্ত্রণাটাও যেন নিঃশেষে মুছে যেতে থাকে। ও ছাই একটা দৃশ্য দেখে এত বিচলিত হবার কোনই দরকার ছিল না। কবেকার কোন এক অন্ধকারের দাগ, পৃথিবীর কারও চোখে ধরা পড়েনি, কোনদিন কেউ জানতেও পারবে না। তবে বৃথা আর মনটাকে এত ভাবিয়ে তুলে লাভ কি? শুক্তির মুখের হাসি দেখে যে ছোট জগৎপুরের মন এরই মধ্যে ভুলে গেছে, সেই ছোট-জগৎপুরকে চিরকাল এমনি করেই হাসিয়ে ও ভুলিয়ে রাখলেই তো হলো। শুক্তি জানে, সে ক্ষমতা তার আছে।

শুভেন্দুরও ভাবতে একটু আশ্চর্য লাগে, এই যে এত সুন্দর দেখতে একটি মানুষ—যার সঙ্গে জীবনে কোনদিন পরিচয় ছিল না, সে কি করে মাত্র সাতটা দিনের মধ্যে শুভেন্দুর সঙ্গে এত আপন হয়ে যেতে আর শুভেন্দুকে এত আপন করে নিতে পারল? অন্য মেয়ে হলে কি করত বলা যায় না, কিন্তু শুক্তি আশ্চর্য করেছে, এই ক'দিনের মধ্যে এই গেঁয়ো ছোট-জগৎপুরকেই ভালোবেসে ফেলেছে শুক্তি। ঝিঁ ঝিঁ ডাকা সন্ধ্যা আর ফেউ-ডাকা রাত্রিকেও অবাক করে জানালার ধারে বসে, চোখ মেলে দেখেছে শুক্তি। এতটা আশা করেনি শুভেন্দু। বরং একটু আশঙ্কাই ছিল, শহরের শিক্ষিতা মেয়ে ছোট-জগৎপুরের মতো এমন একটা জগৎছাড়া গ্রামকে ভাল লাগিয়ে নিতে পারবে কি না। কিন্তু সে আশঙ্কা মিথ্যা করে দিয়েছে শুক্তি। আজই সকালে, একটা বাচাল বউ-কথা-কওকে দেখবার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে একেবারে দেউড়ির বাইরে গিয়ে, গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল শুক্তি, অনেকক্ষণ। ভুলেই গিয়েছিল শুক্তি, সে হলো এ বাড়ির বউ, নতুন বউ, আর জগৎপুরের বউরানী। তা ছাড়া, বাড়িতে এতগুলি কুটুম মানুষ যখন রয়েছে তখন কিন্তু এই ছোট-জগৎপুরের আলোছায়া তার শব্দকে আপন করে নেবার টানে সে-সব ঘোমটা ঢাকা নিয়মও ভুলে গিয়েছে শুক্তি।

আরও সুখের কথা, শুক্তিকে দেখে, তার চেয়ে বেশি শুক্তির ব্যবহার দেখে কুটুমেরা একটু মুগ্ধ হয়েই গিয়েছে। এই তো চাই! এরই মধ্যে যে-মেয়ে এত আপন করে নিয়েছে শ্বশুরবাড়ির জীবনকে, সে মেয়ে সুখী হবেই।

সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছেন শুভেন্দুর মা। তাঁর ইচ্ছা, নতুন বউ যেন এক মুহূর্তের জন্যও মনে না করতে পারে যে সে পরের বাড়িতে আছে। এরই মধ্যে শুভেন্দুকে

সাবধান করে দিয়েছেন মা। —বউ আমার হাসবে খেলবে আর ঘুরে বেড়াবে। বাড়ির মেয়ের মতো থাকবে। যা, কালই সকালে দু'জনে গিয়ে জগৎপুরের লক্ষ্মীর মন্দিরে পুজো দিয়ে আয়।

শুক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে শুভেন্দু বলে—কাল তোমার একটা পরীক্ষা আছে।

শুক্তি—পরীক্ষা? কিসের?

শুভেন্দু হাসে—তুমি কত বড় লক্ষ্মী সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে।

চুপ করে কিছুক্ষণ কি-যেন ভাবে শুক্তি। শুভেন্দু ঠাট্টা করে—কি, ভয় পেয়ে গেলে নাকি?

শুক্তি—ভয়? ভয় করবার কি আছে?

শুভেন্দু—না করলেই হলো।

শুক্তি—অমি ভয় করবার মানুষ নই। নইলে এখানে আসতাম না।

শুভেন্দুর হাত ধরে টান দেয় শুক্তি। —চল কোথায় যাবে? কোথায় তোমার পরীক্ষা?

শুভেন্দু হাসে—আজ নয়, কাল সকালে।

এখন তো কোন ভয় নেই শুক্তির মনে, এখানে আসবার আগেও খুব বেশি কিছু ছিল না। বরং ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন বাড়ির আর সবাই। স্টেশন থেকে দশ মাইল ধুলো আর চোরকাঁটা ডিঙিয়ে তবে পৌছতে পারা যাবে ছোট-জগৎপুরে, চিঠি পৌছয় তিন দিনে। এ তো প্রায় জগৎছাড়া একটা জায়গা।

মনের মধ্যে একটু কিন্তু-কিন্তু ভাব নিয়েই ছোট-জগৎপুরের পাত্র সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন বাড়ির সকলেই। পাত্র ভালই, ছোট-জগৎপুরের ষোল-আনার মালিক। বয়স আর চেহারার দিক দিয়ে পাত্র ভালই। লেখাপড়ার দিক দিয়েও। ঐ জেলারই সদর কলেজে পড়ত, বি-এ পাশ করেছে আজ চার বছর হলো। তবে এটা বোঝা যায়, শহরের জীবন আর চালচলন থেকে ছেলেটি যেন একটু দূরেই সরে থাকতে চায়। কলকাতায় একটা ভালো চাকরি পেয়েও নেয়নি। দুটো ট্র্যাক্টর কিনেছে এবং মাইনে দিয়ে একজন পাশ-করা কৃষি ওভারশিয়ারকেও রেখেছে। ছেলেটির মতিগতি দেখে মনে হয়, নিজের রাজ্যে রাজাবাবু হয়ে আর ছোট-জগৎপুরের মাটি ঘেঁটে ঘেঁটেই সে তার জীবন কাটিয়ে দিতে চায়। ভালই তো।

কিন্তু ভয় ছিল, শুক্তি পছন্দ করবে কি না এই বিয়ের প্রস্তাব। যে-রকম মুখচোরা মেয়ে, মনে আপত্তি থাকলেও কিছু বলবে না। আজ চার বছর ধরে কত প্রস্তাবই তো এল আর গেল, কিন্তু শুক্তির মুখ থেকে পছন্দ-অপছন্দের একটা সামান্য হাঁ বা না, মুখের ভাবে আগ্রহ বা অনিচ্ছার সামান্য একটু ইঙ্গিতও কোনদিন দেখা গেল না। এই সম্বন্ধটা আবার একটু অন্য রকমের। একেবারে গাঁ-দেশের চেহারা সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই শুক্তির। সুতরাং শুক্তির মনে আপত্তি থাকলে, এই বিয়ের অর্থ হবে মেয়েটাকে জোর করে বনবাসে পাঠানো।

কিন্তু মুখচোরা মেয়েই সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে মুখ খুলল। —এখানেই ভাল। হোক না গাঁ-দেশ, শহরের চেয়ে আর কত বেশি খারাপ হবে?

এমনিতে দেখে মনে হয়, যেন কিসের একটা ঘেন্নায় গাড়ি-ঘোড়ার শব্দে অশান্ত ও জনতাপীড়িত এই শহুরে জীবনের স্পর্শ থেকে বনবাসে চলে যাবার জন্যই একটা জেদ মনের মধ্যে পুষে নিয়ে চারটা বছর অপেক্ষা করছিল শুক্তি। যেই সুযোগ এল অমনি চলে গেল।

ছোট-জগৎপুরকে এত ভাল লেগে যাবে, এটাও কল্পনা করতে পারেনি শুক্তি। ভাবতে গিয়ে আরও আশ্চর্য হয় শুক্তি, ছোট-জগৎপুরকে চোখে দেখার আগেই যেন জায়গাটাকে ভাল লেগে গিয়েছিল। কবে, কোনদিন থেকে, তাও মনে করতে পারে শুক্তি। ছোট-জগৎপুরের মানুষটির সঙ্গে পাঁচ মিনিটের আলাপের পরেই, এই তো মাত্র পাঁচ দিন আগে, মাঝ-রাতের বাসরঘর যখন নিরালা হলো, তখন। বলেছিল—আমি তো ভেবেছিলাম, শহরের মেয়েকে দেখেই কে-জানে কি মনে করে তুমি চমকে উঠবে।

শক্তি—আমি চমকে উঠেছিলাম ঠিকই, আমার এত সুন্দর ভাগ্য দেখে।

ছোট-জগৎপুরের একটা কৃতার্থ ও প্রসন্ন প্রাণ সেই যে শুক্তির হাত ধরল, কোথায় রইল শুক্তির ভয়। না-দেখা গাঁ-দেশ ছোট-জগৎপুরকে যেন সেই মুহূর্তে ভালবেসে ফেলেছিল শুক্তি।

ছোট-জগৎপুরই একটা ছোট জগৎ এবং বাড়ি বলতে এই একটি মাত্র বাড়ি, যার নাম রাজবাড়ি। আর সবই কুঁড়েঘর। পথে বের হয়ে শুক্তি অবাক হয়ে যায় গাঁয়ের চেহারা দেখে। এখানে-সেখানে ডোবা, এদিকে-ওদিকে কাঁটার ঝোপ। এক জায়গায় ঘন সবুজ পাতায় ঠাসা হাজার হাজার বুনো লতা সাপের মতো দেহ জড়াজড়ি করে ছোট একটা ঘাট-বাঁধানো পুকুরকে একেবারে ঢেকে ফেলেছে। বুঝতে পারা যায় না, সাপগুলিই লতার মতো হয়ে গিয়েছে, না লতাগুলি সাপের মতো হয়ে গিয়েছে।

—ওটা কি? দূরে উঁচু ইঁটের ঢিবির মতো একটা জায়গা, তার সারা গায়ে জংলা গাছের সাজ। শুক্তির প্রশ্ন শুনে উত্তর দেন শুভেন্দু—ওটা একটা রাসমঞ্চ।

রাসমঞ্চের রূপ দেখে চক্ষু স্থির হয়ে যায় শুক্তির। হঠাৎ কতগুলি শালিক কর্কশ স্বরে ডেকে ডেকে উড়তে থাকে, আর রাসমঞ্চের জংলা ঝোপের মধ্যে নড়াচড়া করে সাদা-কালো একটা জীব।

শুক্তি—ওটা আবার কি?

শুভেন্দু—বাঘডাঁস।

শুক্তি—অ্যাঁ?

শুভেন্দু হাসে—বাঘ নয়।

হেসে হেসেই পথ চলতে থাকে শুক্তি। হঠাৎ চমকে উঠলেও এরকমের ভয়কে একটুও ভয়াল বলে মনে হয় না শুক্তির, বরং ভালোই তো লাগে।

ছোট-জগৎপুরের রূপ আর প্রাণের পরিচয় বর্ণনা করতে থাকে শুভেন্দু। যেন এক

আশ্চর্য দেশের মেয়েকে এক অদ্ভুত দেশের পরিচয় শোনাচ্ছে। শুনতে শুনতে কখনো চক্ষুস্থির হয়, কখনো বা হেসে ফেলে শুক্তি।

শুভেন্দু বলে—ঐ মৌজাটার অর্ধেকটাই হলো চাকরান, আর তার বাঁয়ে যেসব ক্ষেত দেখছো, ওর বেশির ভাগ হলো মহাত্রাণ। এদিকের সবই ব্রহ্মোত্তর আর মৌরসী-মোকররী। সবচেয়ে ভাল হলো ঐ যে, ঐ মেটে সড়কের দু'পাশে.....

হাত তুলে যেন পৃথিবীর চারদিকে ছড়ানো মাটি জল ও বাতাসের উপর কতগুলি অদ্ভুত ও বিচিত্র স্বত্বের আর স্বামিত্বের গর্ব বর্ণনা করে শোনাতে থাকে শুভেন্দু। শুনতে মন্দ লাগে না, যদিও একবিন্দু অর্থ বোঝা যায় না, নীরবে শুধু হাসতে থাকে শুক্তি। শুভেন্দু নিজের মনের উৎসাহেই বলতে থাকে—সবচেয়ে ভাল উসুল আর আদায় হয় ঐ দুটো বাজেয়াপ্ত আর খারিজ মহল থেকে।

শুক্তি তার ধুলোমাখা পায়ের চেহারার দিকে তাকিয়ে বলে—ধুলোও লাল রঙের হয় নাকি?

শুভেন্দু—হয় বৈকি। বাঘা-এঁটেলের রঙই হলো লালচে, কোনমতেই রবি ফলানো যায় না। তবে নদীর দিকে দু'হাজার বিঘের ওপর বেলে আর দোঁআশ আছে। ধান ফলে চমৎকার। এ ছাড়া ভাল মাটী বলতে ছোট-জগৎপুরে আর বিশেষ কিছু নেই। উত্তরে ওগুলি সবই হলো সাবেক পতিত, যত সব ঘাসি, কাঁকরে আর....।

হাসি থামতে গিয়ে থেমে যায় শুক্তি। শাড়ির আঁচলটা শুভেন্দুর চোখের সামনে তুলে ধরেই শিউরে উঠতে থাকে—ইস্ কি বিশ্রী কতগুলো পোকা কাপড়টাকে কি-ভয়ানক কামড়ে ধরেছে দেখ।

শুভেন্দু বলে—পোকা নয়, চিড়-চিড়ে ফল।

শুক্তি অপ্রস্তুত হয়ে হাসতে থাকে—বেশ সুন্দর ফল তো, নামটা আরও সুন্দর।

সত্যিই, এই ঝোপঝাড় গাছপালা আর লতাপাতার নামগুলিই বা কি অদ্ভুত! চলতে চলতে শুভেন্দু আরও নাম শোনাতে থাকে। এগুলি হলো হাড়জোড়া লতা, ভাঙ্গা হাড় জুড়ে দেয়। ওটা হলো একটা মাকড়া গাব। ঐ দেখ কাঁঠালের গাছটাকে কি ভয়ানক বাঁদরায় ছেয়ে ফেলেছে। আর ঐ যে একটা কাকডুমুরের জঙ্গল দেখছো, তার ওপাশেই হলো দীঘি। এগুলিকে বলে হাতিশুঁড়ো, ওগুলি শেয়ালকাঁটা। একটা কুকসীমের ঝাড় আর দুটো কেওঠেঙার ঝোপের পাশ দিয়ে আঁচল বাঁচিয়ে সাবধানে হাঁটতে হাঁটতে হেসে ফেলে শুক্তি—থাক্, এত সুন্দর সুন্দর নামগুলি আর শুনিও না, মনে রাখতে পারব না।

শুভেন্দু বলে—ঐ যে জগৎলক্ষ্মীর মন্দির।

ভাঙাচোরা আর বট-অশ্বত্থের শিকড়ে জড়ানো একটা শীর্ণকায় পঞ্চরত্ন মন্দির। চারদিকের বনবাদাড়ে এখনো যেন অন্ধকার লুকিয়ে রয়েছে। মশার এক একটা ঝাঁক উড়ে যায় শব্দ করে। কি অদ্ভুত শব্দ। দিনের আলোকে চামচিকে ওড়ে অন্ধের মতো দিগ্বিদিক বোধ হারিয়ে। শুক্তি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে, এই কি জগৎলক্ষ্মীর মন্দিরের চেহারা?

মন্দিরের দরজা খুলে দিল পৈতে গলায় যে লোকটা, তার দিকেও হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকে শুক্তি। লোকটা যেন এই কাঁটা লতার ঝোপে পালিত একটা পাখির মতোই দেখতে। রোগা এইটুকু জীর্ণশীর্ণ দেহ নিয়ে, জগৎলক্ষ্মীর পূজারী দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকে, বুকের পাঁজরাগুলি হাঁপায়।

মন্দিরের ভিতরে কোন মূর্তি নেই। শুধু পাথরের উপর একটা ধুনুচি রয়েছে, তার মধ্যে ধুনো পুড়ছে অল্প অল্প ধোঁয়া ছড়িয়ে। পূজোর ডালা থেকে ফুল আর সিঁদুরের কৌটো তুলে ধুনুচির সামনে রাখে শুক্তি। পূজারী লোকটা ধুনুচির গায়ে সিঁদুরের কৌটোটা একবার ছুঁইয়ে আবার ডালার ভিতর রেখে দেয়। তার পরেই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। পকেট থেকে একটা টাকা বের করে শুক্তির হাতে তুলে দেয় শুভেন্দু। টাকাটা ধুনুচির কাছে রেখে একটা প্রণাম করে শুক্তি। পূজারী অস্ফুটস্বরে আর হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে কি যেন বলতে থাকে।

জগৎলক্ষ্মীর কাছ থেকে সরে এসে বাইরে দাঁড়িয়েই হাঁফ ছাড়ে শুক্তি।

—এ কি রকমের জগৎলক্ষ্মী, বুঝলাম না কিছু।

শুভেন্দু বলে—ঐ দীঘিটার ওপরে আরও মাইল দুয়েক উত্তরে যে গ্রামটা রয়েছে, তার নাম হলো বড়-জগৎপুর। সে গ্রামের কিছু আর এখন নেই। পুষ্করা লেগে সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

শুক্তির স্থিরচক্ষুর কৌতূহল লক্ষ্য করে, আর শুভেন্দু কাহিনীটাকে আরও তাড়াতাড়ি সারতে থাকে। এ সব অনেক দিন আগের কথা। ছোট-জগৎপুরের পুষ্করা লাগাতে মড়ক আর মরণ আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছিল বড়-জগৎপুরের দিক থেকে এই দিকে। এই মন্দিরে কোন বিগ্রহ ছিল না, তবু এখানেই এসে ছোট জগৎপুরের সব মানুষ দিনরাত পুজো দিত আর প্রার্থনা করত, পুষ্করার কোপ থেকে বাঁচবার জন্য।

পাশেই ঝোপের ভিতর কিরকম একটা ঝনঝনে শব্দ বেজে ওঠে। শুক্তি চমকে ওঠে—কিসের শব্দ?

শুভেন্দু বলে—বোধহয় সজারু। ....যাক, একদিন মাঝ রাতে, সেদিন পূর্ণিমা, দেখা গেল লালপেড়ে শাড়ি পরে এক মেয়ে, একটা ধুনুচি নিয়ে ছোট-জগৎপুরের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধুনুচি থেকে ধোঁড়া উড়ছে। ধুনোর গন্ধে ভরে উঠল গ্রাম। তারপরের দিনই দেখা গেল, এই মন্দিরের ভিতরে একটা ধুনুচি রয়েছে এবং তার মধ্যে ধুনো পুড়ছে।

শুক্তি—তার মানে কি হলো?

শুভেন্দু—তার মানে এই যে, স্বয়ং লক্ষ্মী নিজে এসে ধুনোর ধোঁয়া ছড়িয়ে ছোট-জগৎপুরকে পুষ্করার কোপ থেকে বাঁচিয়ে দিলেন।

শুক্তি—ও তুমি বিশ্বাস কর?

শুভেন্দু হাসে—বিশ্বাস করতে তো ভালোই লাগে।

শুক্তি—সত্যি হলে তো ভালোই ছিল।

শুভেন্দু—তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?

শুক্তি—না।

শুভেন্দু—যাক, কিন্তু মনে রেখো, তোমার একটা পরীক্ষা আরম্ভ হলো।

শুক্তি—কি?

শুভেন্দু—ক'দিনের মধ্যেই এমন একটা কোন ঘটনা ঘটা চাই, যাতে বোঝা যাবে যে তুমি একটি খাঁটি লক্ষ্মী।

চমকে ওঠে শুক্তি। —আমি কি করে ঘটনা ঘটাবো?

শুভেন্দু—তোমার পূজোর ফলেই ঘটনা ঘটবে। যদি ছোট-জগৎপুরের মানুষ আর রাজবাড়ির জীবনে কোন নতুন সৌভাগ্য দেখা দেয়, তবে বুঝতে হবে যে, তুমি সত্যিই লক্ষ্মী।

শুক্তির কণ্ঠস্বরে হঠাৎ বিরক্তির ভাব ফুটে ওঠে—এ রকম কোন শর্ত আমি করেছিলাম নাকি?

শুভেন্দু হাসে—তুমি শর্ত করবে কেন? এটা হলো এই ছোট-জগৎপুরের শর্ত? চিরকাল এখানে এই শর্তেই রাজবাড়ির নতুন বউরানীরা পরীক্ষা দিয়েছে।

শুক্তি—সবাই পাশও করেছে নিশ্চয়?

শুভেন্দু—হ্যাঁ, সে ইতিহাস মা'র কাছেই শুনতে পাবে।

কোন উত্তর দেয় না শুক্তি। ছোট জগৎপুরের এই সব কাঁটাভরা ঝোপ, সাপের মতো হিংস্র লতা, পোকার মতো ফল, জন্তুর মতো গাছপালা, বিদঘুটে শব্দ আর নানা রকমের অন্ধকারের মধ্যে কোনই ভয় ছিল না। হঠাৎ কোথা থেকে এক অদ্ভুত গা-ছমছম করা কাহিনীটা এসেই যেন এই প্রথম ভয় পাইয়ে দিল শুক্তিকে।

গম্ভীর মুখে চলতে চলতে হঠাৎ থেমে দাঁড়ায় শুক্তি। এক মুহূর্ত কি যেন ভাবে। তারপরেই হেসে ওঠে—আমার একটু দরকার আছে। আর একবার মন্দিরে চল।

একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না শুভেন্দু। —এখনই।

শুক্তি — হ্যাঁ।

চামচিকার দল আবার কিচমিচ শব্দ করে উড়তে থাকে। ধুনোর গন্ধেভরা মন্দিরের ভিতরে ঢুকে ধুনুচির কাছে মাথা উপুড় করে অনেকক্ষণ পড়ে থাকে শুক্তি। শুক্তির কাণ্ড দেখে হতভম্বের মতোই দাঁড়িয়ে থাকে শুভেন্দু। যেন এক অজ-পাড়াগাঁয়েরই অসহায় ও দুর্বল একটা মেয়ের বিপন্ন আত্মার কাতর আবেদনের মতো পড়ে রয়েছে শুক্তি। কে জানে, কি প্রার্থনা করছে শুক্তি, দু'ঠোঁটের কাঁপুনিতে অতি ক্ষীণস্বরে ফিসফিস করছে যে ভাষা, তার একটা কথাও শুনতে পায় না শুভেন্দু।

উঠে এসে শুভেন্দুর কাছে দাঁড়ায় শুক্তি—চল এবার।

আরও বিস্মিত হয়ে বেদনার্ত চোখে তাকিয়ে থাকে শুভেন্দু। ভেজা ভেজা মনে হচ্ছে শুক্তির চোখ।

শুভেন্দু বলে—গল্পটা বলে তোমাকে কষ্ট দিলাম মনে হচ্ছে।

শুক্তি হাসে—একটুও না।

একটা সাড়াই পড়ে গেল ছোট-জগৎপুরে। বউরানী লক্ষ্মী, বউরানী লক্ষ্মী। দু'পশলা জোর বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। জগৎপুরের শক্ত এঁটেল মাটির ক্ষেত ভিজে নরম হয়ে গিয়েছে। এবার লাঙ্গল আর রোপাই আরম্ভ করে দিলেই হলো, আর কোন অসুবিধে নেই।

সদর থেকে খবর নিয়ে এসেছে উকিলের মহুরী, তিন বছর ধরে ঝুলছিল যে মামলাটা, কাল তার রায় বের হয়েছে এতদিনে। ষাট হাজার টাকার ডিক্রি পেয়েছে শুভেন্দু।

শাশুড়ী ডাক দিয়ে বলেন—বউমা, আজ হলো চতুর্দশী। আজই একবার গিয়ে হর্ষমতীর জল ছুঁয়ে এস। ...ও শুভেন্দু, শুনেছিস।

শুভেন্দু বলে—হ্যাঁ শুনেছি, আজই যাব।

শুক্তি হাসি বন্ধ করে। হঠাৎ গম্ভীর হয়—হর্ষমতীর জল মানে?

শুভেন্দু—ঐ সেই দীঘিটা। ওর নাম হলো হর্ষমতীর সাগর।

শুক্তি—ওর জল ছুঁলে কি হয়?

হাসতে থাকে শুভেন্দু। শুক্তি তেমনি গম্ভীরভাবে বলে—আর একটা গল্প আছে বোধহয়?

শুভেন্দু—হ্যাঁ।

শুক্তি—আর একটা পরীক্ষা দিতে হবে নিশ্চয়?

শুভেন্দু—নিশ্চয়।

শুক্তি—আর পারি না। অপ্রস্তুতভাবেই আক্ষেপ করে অন্যদিকে মুখ লুকিয়ে বসে থাকে শুক্তি। এইভাবেই কি অনন্তকাল এখানে শুধু পরীক্ষা দিতে হবে? ছোট-জগৎপুরের নামে এই রাজ্যিছাড়া রাজ্যিটা তো দেখতে বড় নিরীহ। আসা মাত্র, একেবারে বউরানী বলে আদর করে আর মাথায় তুলে রাখতে চায়। কিন্তু এত অভ্যর্থনার ভিতরে আবার এইসব পরীক্ষা করার ষড়যন্ত্র কেন?

শুভেন্দু সান্ত্বনার সুরে বলে—কি হয়েছে, কতটুকুই বা হাঁটতে হবে? বরং একবার বেড়িয়ে এলে ভালই লাগবে তোমার।

শুক্তি—হাঁটতে ভয় পাই না। বেড়ানোও অভ্যেস আছে।

শুভেন্দু—তবে কিসের ভয়?

শুক্তি ভ্রূকুঞ্চিত করে—ভয়? ভয় কেন করব? কি পাপ করেছি যে একটা দীঘির জল ছুঁতে ভয় করব?

খুশি হয়ে শুক্তির হাত চেপে ধরে শুভেন্দু বলে—চলো, পথে অনেক নতুন জিনিস দেখাব তোমাকে।

দ্বিধা করে বা দেরী করে কোনও লাভ নেই। পরীক্ষাটার সম্মুখীন হবার জন্যই প্রস্তুত হয়ে শুক্তি বলে—চলো।

মস্ত বড় একটা ডাঙ্গার উপর দিয়ে চলতে চলতে শুক্তির মনের ভার আস্তে আস্তে মিটে যেতে থাকে। ডাঙ্গার মাটি শক্ত, কিন্তু নরম ঘাসে ঢাকা। কাঁটার ঝোপ-ঝাপ সরিয়ে ছোট-জগৎপুরের মনটা যেন বেশ খোলামেলা হয়ে উঠছে। মস্ত বড় একটা গাছের মৃতদেহ পাথরের মতো শক্ত ও মসৃণ হয়ে পড়ে রয়েছে ডাঙ্গার এক জায়গায়। শ্রান্ত হয়ে গাছের উপর বসে শুভেন্দু ও শুক্তি।

গল্প করে শুভেন্দু। —এটা কি বলতে পার?

—গাছ বলেই তো মনে হচ্ছে।

—গাছ কি এরকম পাথরের মতো হয়?

—তবে কি এটা?

—এটা হলো বকরাক্ষসের লাঠি। সেই যে ভীমের হাতে মার খেয়ে মরে গেল বক, সেই দিন থেকে তার লাঠিটা পড়ে আছে এখানে।

হেসে ওঠে শুক্তি। শুনতে ভালই লাগে। এ রকম হাজার গল্প হাজার মনের ভিতরে পুষে রাখুক না ছোট-জগৎপুর। কিন্তু...। কিন্তু হর্ষমতীর গল্পটাও কি এই রকমের?

হর্ষমতীর সাগরের কাছে পৌঁছবার পর গল্পটা শুরু করে শুভেন্দু। দাম আর টোপা পানায় ভরা প্রকাণ্ড সাগর। ভাঙা ভাঙা এক-একটা ঘাটের শ্যাওলা মাখা ইঁট ছড়িয়ে আছে এলোমেলোভাবে। তালগাছের উপর এই ভরা দুপুর অলস হাড়গিলা নিঃস্পন্দ হয়ে ঘুমোয়। যেমন নির্জন জায়গাটা, তেমনি একটা নিস্তব্ধতা যেন থমকে রয়েছে।

শুভেন্দু বলে—সে অনেক দিন আগেকার কথা। এই যে কলাইয়ের ক্ষেতটা দেখছো, এখানেই ছিল এক রাজার বাড়ি। রাজার বড় দুঃখ ছিল, কারণ রাণী হর্ষমতী ছিলেন বন্ধ্যা।

শুক্তি হাসে—থাক, আর শুনতে চাই না। এ গল্প না শুনলেও চলবে।

শুভেন্দু—সাগরের জল ছুঁয়ে এই চতুর্দশীতে একবার মাথায় হাত না দিলে তো চলবে না।

শুক্তি—কেন?

শুভেন্দু—এখানকার নিয়ম।

শুক্তি হাসে—অদ্ভুত নিয়ম, বেহায়া নিয়ম। ....তুমি ওদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াও।

ঘাটের দিকে এগিয়ে যায় শুক্তি। শুভেন্দু বলে—গল্পটা আগে শুনে নাও। ....একদিন স্বপ্নে শুনতে পেলেন হর্ষমতী....।

থেমে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করে শুক্তি—কি শুনতে পেলেন?

—চোখ বুঁজে শুধু স্বামীর মুখ মনে করতে করতে এক চতুর্দশীর দুপুরে এই সাগরের জলে বার বার তিনবার ডুব দিয়ে পদ্মের শিকড় স্পর্শ করবি। তাহলেই তোর কোল-আলো-করা...

শুক্তি মুখ কালো করে তাকায়—এটাও দেখছি একটা পরীক্ষা। বার বার তিনবার স্বামীর মুখ স্মরণ করে জল ছুঁতে হবে। এই তো?

শুভেন্দু—হ্যাঁ।

শুক্তি—যেন অন্য কোন মুখ ভুলেও মনে না আসে, এই তো?

শুভেন্দু হাসে—হ্যাঁ।

শুক্তি মুখ ভার করে বলে—চলো বাড়ি যাই।

শুভেন্দু বিষণ্নভাবে বলে—সামান্য একটা গল্পের উপর এত রাগ করছ কেন তুমি?

চুপ করে ভাঙা ঘাটের হিংস্র দাঁতের মতো শ্যাওলা-মাখা ইঁটগুলির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শুক্তি।

শুভেন্দুও আনমনার মতো দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে। চুপ করে যেন শুক্তির এই আপত্তির আঘাতটাকে সহ্য করবার চেষ্টা করছে শুভেন্দু। কিসের জন্য, কেন এ রকম করছে শুক্তি! কি বলতে চায় শুক্তি?

শুক্তি ডাকে—শুনছ?

শুভেন্দু—কি?

শুক্তি—আমার কেমন ভয় ভয় করছে।

শুভেন্দু—কেন, কিসের এত ভয়?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে হঠাৎ শুভেন্দুর হাত ধরে সাগ্রহে অনুনয়ের সুরে শুক্তি বলে—কিছু মনে করো না। তুমি এস, আমার মাথা ছুঁয়ে আমার কাছে দাঁড়াও, তবে আমি তিনবার জলস্পর্শ করতে পারব।

শুভেন্দুর মুখের বিষণ্নতা কেটে যায়। —তাই বলো, এ তো রানী হর্ষমতীর চেয়েও এক ডিগ্রি বেশী চলে গেল। ...চলো।

লক্ষ্য করে শুভেন্দু, সাগরের জল তিনবার মাথায় ছোঁয়ানো হয়ে যাবার পরেও আর একবার জল তুলে চোখ দুটোকে ধুয়ে ফেলে শুক্তি।

ফেরবার পথে শুভেন্দু আর একবার জিজ্ঞাসা করে—এসব গেঁয়ো নিয়ম-টিয়ম পালন করতে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, শুক্তি?

শুক্তি বলে—না, তুমি যতক্ষণ সঙ্গে আছ, কোন কষ্টই হবে না।

ছোট-জগৎপুরকে ভাল লাগে, ভাল লাগে ছোট-জগৎপুরের এই মানুষটিকে, কিন্তু ভয় করে ছোট-জগৎপুরের এই কাহিনীগুলিকে। কি ভয়ানক এক-একটা কাহিনী, যেন বুক চিরে পরীক্ষা করে দেখতে চায়, ভিতরে কিছু লুকোনো আছে কিনা।

কিন্তু শুক্তির ক্ষুব্ধ মনের যত অভিযোগ আর আশঙ্কা শান্ত করে দিয়ে, আর শুক্তির জীবনে একটা নতুন ঘটনার সূচনা স-রবে ঘোষণা করে দিয়ে শাশুড়ির কণ্ঠস্বরের হর্ষ একদিন ধ্বনিত হয়, কারণ কৃপা করেছে হর্ষমতীর সায়র। —বউমা, এবার একদিন নাগেশ্বরতলায় গিয়ে ভয়নাশন করে এস। ...ওরে শুভেন্দু, শুনেছিস্।

ছোট-জগৎপুরের গো-চর মাঠের পশ্চিমে মস্ত বড় একটা বৃদ্ধ অশ্বত্থ, তার গোড়ার দিকে একটা ফোঁকর। ফোঁকরের ভিতরে আছেন এক অতিবৃদ্ধ নাগ। সে নাগকে কিন্তু

আজ পর্যন্ত কেউ চোখে দেখেনি, তবুও তিনি আছেন, দ্বিতীয় এক অনন্ত নাগের মতো চিরকাল এখানে আছেন। ছোট-জগৎপুরের একশো বছর আগের বউরানীরও প্রথম সন্তানের সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে এই নাগেশ্বরতলায় এসে ভয়নাশন করে গিয়েছেন। এ অবস্থায় মনে কোন ভয় রাখতে নেই। ভয় থাকলে সন্তান ভীরু হয়।

শুক্তি একটু উৎসাহিতভাবেই প্রশ্ন করে—ভয়নাশনটা আবার কি?

শুভেন্দু—ভয়নাশন পুজো। যে ভয়কে সবেচেয়ে বেশি ভয় হয়, সেই ভয়ের কথা জানিয়ে দিতে হবে নাগেশ্বরকে। তাহলে জীবনে আর সে ভয় থাকবে না।

শুক্তি বলে—চলো।

চলতে দেরি হয়নি, পৌঁছতেও দেরি হয়নি। নাগেশ্বরতলায় এসে বুড়ো অশ্বত্থের গোড়ায় মাটির ভাঁড়ে দুধ রেখে দিয়ে প্রণাম করে শুক্তি।

অশ্বত্থতলার ধুলো লাগে কপালে, শুক্তি যেন কৃতার্থভাবে উঠে দাঁড়ায়। জিজ্ঞাসা করে—নাগেশ্বর কৃপা করলেন কিনা কি করে বুঝব?

শুভেন্দু—সূর্য ডুববার পরেই ফিরে এসে যদি দেখতে পাও যে, ভাঁড়ের সব দুধ খেয়ে চলে গিয়েছেন নাগেশ্বর, তবেই বুঝবে যে....

শুক্তি—সূর্য তো ডুবতে চলল।

শুভেন্দু—তাহলে চলো, একটু ঘুরে ফিরে তারপর এসে দেখবে।

ঘুরে ফিরে বিকেলের শেষটা পার করে দিয়ে প্রথম সন্ধ্যার ছায়ান্ধকারে বুড়ো অশ্বত্থের কাছে ফিরে আসে শুভেন্দু আর শুক্তি। শুভেন্দু বলে—ঐ দেখ।

আনন্দে শুভেন্দুর হাত ধরে হাসতে থাকে শুক্তি। প্রার্থনা গ্রহণ করেছেন নাগেশ্বর। ভাঁড়ে এক ফোঁটা দুধ নেই, কখন এসে নিঃশেষে সব দুধ পান করে অশ্বত্থের গহ্বরে আবার অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন।

ফেরবার পথে শুভেন্দু জিজ্ঞাসা করে — কোন্ ভয়ের কথা নাগেশ্বরকে জানালে?

শুক্তি হাসে—তা কেন বলব?

শুভেন্দু—আমিও একদিন নাগেশ্বরের কাছে এসে ভয়নাশন করে গিয়েছি।

শুক্তি হেসে লুটিয়ে পড়তে চায়—তোমার আবার ভয়নাশন কিসের? তোমারও কি....।

শুভেন্দু—হ্যাঁ, পুরুষরাও এসে এখানে ভয়নাশন করে। ছোট-জগৎপুরের নিয়ম আছে বিয়ে করতে যাবার আগে নাগেশ্বরের কাছে মনের ভয়ের কথা বলে দূর করে নিতে হয়।

শুক্তি—তুমি কোন্ ভয়ের কথা বলেছিলে?

শুভেন্দু—তা বলব কেন?

শুক্তি—বলো না, আমি শুনলে দোষ কি?

শুভেন্দু—গেঁয়ো মানুষের মনের একটা বাজে ভয়ের কথা, সে কথা শুনে তোমারই বা লাভ কি?

সন্ধ্যার ছায়ান্ধকারেই শুক্তি দেখতে পায়, শুভেন্দুর চোখ দুটো কেমন অদ্ভুত একটা দৃষ্টি দিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

শুক্তি বলে—নাগেশ্বর তোমার প্রার্থনা গ্রহণ করেছিলেন তো?

শুভেন্দু—ভাঁড়ের দুধ তো সব চেটেপুটে খেয়ে চলে গিয়েছিলেন।

শুক্তি—তবে আর ভাবনা কিসের?

শুভেন্দু—তবুও ভাবনা হয়। সন্দেহ হয়, নাগেশ্বর আমাকে ঠকালেন না তো?

শুভেন্দুর চোখে সেই অদ্ভুত ভঙ্গি, আর দৃষ্টিটাও তেমনি। শুক্তি বলে—তোমার সন্দেহের কোন অর্থ-ই হয় না। নাগেশ্বর কাউকে ঠকাতে পারেন না।

শুক্তি সান্ত্বনার ভাষা ও ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলে শুভেন্দু। —তুমি যখন বলছ, তখন বিশ্বাস করছি নাগেশ্বর আমাকে ঠকায়নি।

পথ চলার ছন্দ যেন দুজনেই আবার ফিরে পায়। আকাশে সন্ধ্যা-তারা একটু দূরে চাষীদের আঙিনায় ঘরে-ফেরা গরুর ডাক বাতাসে সাড়া জাগিয়ে তোলে। একটা মাটির দীপ জ্বলছে একেবারে নিকটেই। ঢিপির মতো একটা জায়গা, জংলা লতাপাতায় ঢাকা।

শুক্তি প্রশ্ন করে—এখানে আবার প্রদীপ জ্বলে কেন?

শুভেন্দু—এই মাসটা প্রতি সন্ধ্যাতেই এখানে প্রদীপ জ্বলবে।

শুক্তি—কেন?

শুভেন্দু—এটা হলো রূপো ঠাকরুনের ভিটা।

শুক্তি —এটাও গল্প বোধহয়?

শুভেন্দু—হ্যাঁ। রূপো ঠাকরুন ছিলেন একজন সতীসাধ্বী...।

পায়ে যেন হঠাৎ কি একটা ফুটেছে। বেদনার্তের মতো মুখ করে অন্য দিকে তাকিয়ে শুক্তি বলে—চলো, রাত হয়ে আসছে।

চলতে থাকে শুভেন্দু, কিন্তু রূপো ঠাকরুনের গল্পটা না বলে থাকতে পারে না। —রুপো ঠাকরুন ছিলেন গরীব বামুনের বউ। দেখতে পরমা সুন্দরী। এত গরীব যে দু'কড়ি খরচ করে সধবার সাধ একটু আলতা কেনবারও উপায় ছিল না রুপো ঠাকরুনের। একদিন কোথা থেকে অচেনা-অজানা একটি মেয়ে এসে বলল, দুঃখ করো না রুপো ঠাকরুন, তুমি জল দিয়েই আলতা পরো। যদি সতী হয়ে থাক, তবে তোমার পায়ে লেগে জলই আলতা হয়ে যাবে।

শুক্তি—তাই হলো নিশ্চয়?

শুভেন্দু—হ্যাঁ, যতদিন বেঁচে ছিলেন রূপো ঠাকরুন, ততদিন জলের আলতাই পরতেন। জলের দাগ আলতার চেয়েও বেশি রাঙা হয়ে উঠত রুপো ঠাকরুনের পায়ে।

শুক্তি বলে—বাঃ, চমৎকার গল্প।

শাশুড়ী ডাক দিলেন—ও বৌমা, প্রজাবাড়ির মেয়েরা এসেছে তোমার কাছে। শুনে-নাও কি বলছে ওরা?

আশ্বিন মাস, ছোট-জগৎপুর এই মাসে একটা ব্রত করে, তার নাম সতী-সোহাগ। এ বছর নতুন বউরানীর পায়ে আলতা পরিয়ে সতীসোহাগ করবে প্রজাবাড়ির মেয়েরা, সেই কথা জানাতে এসে টগর কালী খাঁদি পটলী সীতা ফুলকুঁড়ি ধবধবী বুড়ি আর চন্দনা। ছেঁড়া ময়লা কাপড়-পরা অস্থিসার কতগুলি রোগা-রোগা মেয়ে। আজ ওরা সিধে নিয়ে যাবে, কাল এসে আলতা পরিয়ে সতীসোহাগ করে যাবে।

প্রজাবাড়ির মেয়েদের প্রস্তাবটা চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনল শুক্তি। আড়ালে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসল শুভেন্দু। আধ সের করে চিঁড়ে সিধে নিয়ে চলে গেল প্রজাবাড়ির মেয়ের দল।

সন্ধ্যা হতেই শুভেন্দুর সঙ্গে একটা ঝগড়ার মতোই ব্যাপার করে ফেলল শুক্তি। —তোমাদের এই রাজ্যিছাড়া গ্রামটা কি কতকগুলি গল্প দিয়ে তৈরি?

শুভেন্দু বলে—তাই তো দেখছি।

শুক্তি—পৃথিবীর কোথাও এমন সৃষ্টিছাড়া ব্রত আছে বলে তো শুনিনি।

শুভেন্দু—তাও সত্যি।

শুক্তি—সতীসোহাগে ব্রতটার অর্থ কি?

শুভেন্দু—ঐ রুপো ঠাকরুনের ভিটার মাটি আলতার সঙ্গে গুলে পায়ে পরিয়ে দেবে।

শুক্তি—তাতে কি হয়?

শুভেন্দু—অনেক কিছু ভাল হয়। আবার উল্টোটাও হয়। সে গল্প যদি শুনতে চাও তো বলি।

জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়ে অনেক দূরের একটা অন্ধকারের দিকে তাকায় শুভেন্দু—ঐ বড়-জগৎপুরের ডাঙ্গাটা যেখানে আরম্ভ হয়েছে, তারই পূবে আছে চোখটেরির খাল। এক চোখটেরি একবার গাঁয়ের একশো মেয়েকে মেঠাই মণ্ডা খাইয়ে খুব ঘটা করে সতীসোহাগ করিয়েছিল। চোখটেরির পায়ে টুকটুকে লাল আলতা পরানো মাত্রই আলতা জল হয়ে গেল। লোকে বললে, একি ব্যাপার? একটু পরেই খবর এল, চোখটেরির স্বামী সাপের কামড়ে মরে গিয়েছে। ধরা পড়ে গেল চোখটেরির জীবনের লুকানো দোষ। আর সেই লজ্জা সহ্য করতে না পেরে শেষে ঐ খালের জলে ডুবে মরে গেল চোখটেরি।

শুক্তি—গল্পটা মোটেই ভাল নয়। চোখটেরির পাপে চোখটেরি মরল, ভালই হলো। কিন্তু চোখটেরির স্বামী বেচারা মরবে কেন?

শুভেন্দু হাসে—মরে তো গেল, কি আর করা যাবে?

কিছুক্ষণ পরে রাতটাও যেন কেমন-কেমন হয়ে গেল। কিছুতেই ঘুম আসে না শুক্তির। শুভেন্দুকেও ঘুমোতে দেয় না শুক্তি। ছোট-জগৎপুরের আজকের রাত্রিটাকে বড় ভয় করছে শুক্তির। এই রাতটা তো আর কিছুক্ষণ পরে ফুরিয়েই যাবে, তার পরেই সতীসোহাগের আলতা নিয়ে দেখা দেবে কি-ভয়ানক একটা সকালবেলা। শুক্তির সমস্ত আত্মাটাই যেন কিসের একটা ভয়ে ধুকপুক করছে।

শুভেন্দু বলে—আর কত গল্প শুনবে? এবার ঘুমিয়ে পড়।

শুক্তি—কি করে ঘুম হবে? একটা গল্পেরও কি মাথামুণ্ডু কিছু আছে! যত সব ভয়-দেখানো বিদঘুটে গল্প।

বাস্তবিক, ছোট-জগৎপুরের প্রত্যেকটা ছায়া আর শব্দেরও যেন ইতিহাস আছে। যত সব অনুতাপের প্রায়শ্চিত্তের শাস্তির আর প্রতিশোধের ইতিহাস।

হুম্ হুম্ করে একটা পেঁচা ডাকছিল এতক্ষণ। কিন্তু ওটা ঠিক পেঁচার ডাক নয়। শুভেন্দু বলে—অনেকদিন আগে এক ঘুমন্ত গেরস্থকে হত্যা করেছিল এক ডাকাত, তার নাম কেন্দা। সেই গেরস্থের বউয়ের অভিশাপে চিরকালের মতো পেঁচা হয়ে গিয়েছে কেন্দা ডাকাত। ঘুম নেই কেন্দার চোখে। আশ্বিনের এই দিনটিতেই একবার ছোট-জগৎপুরের অন্ধকারে উড়ে উড়ে চোখের জ্বালায় ডাকতে থাকে কেন্দা—ঘুমো ঘুমো। চাষী ছেলেরা জেগে উঠে একটা আমগাছের গায়ে জল ছিটিয়ে দেয়, তারপরেই আর পেঁচার ডাক শোনা যায় না।

এখানেই বসে দেখা যায়, শ্মশানের মাঠের দিকে একটা আলেয়া এগিয়ে চলেছে। কিন্তু ওটা তো ঠিক আলেয়া নয়। শুভেন্দু বলে—ওঠা হলো চিন্তেমনির জ্বালা। রোগী স্বামীর উপর রাগ করে চিন্তেমনি একদিন বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল। যেদিন ফিরল সেদিন স্বামীর চিতা জ্বলছে শ্মশানে। সেই যে চিন্তেমণি ঘর ছেড়ে চলে গেল, আর তাকে কোথাও দেখা গেল না। শুধু মাঝে মাঝে অনেক রাতে দেখা যায়, আলেয়া হয়ে শ্মশানের মাঠে স্বামীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে চিন্তেমণি।

অন্ধকার ছাপিয়ে কান্না মেশানো দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা ঝড়ের শব্দ অনেকদূর থেকে ভেসে এসে আবার মিলিয়ে যায়, কিন্তু ঝড় নয় ওটা। শুভেন্দু বলে—ওটা হলো ভোলা বেদের দীর্ঘশ্বাস। যখ হয়ে মাটির নীচে গুপ্তধন আঁকড়ে পড়ে আছে ভোলা। এক দেবমন্দির থেকে বিগ্রহের গায়ের সোনা চুরি করে ভোলা বেদে কুয়োর নিচে নেমেছিল লুকিয়ে রাখার জন্য, হঠাৎ কুয়ো ধসে সেই যে মাটি চাপা পড়ল তো পড়লই।

শুক্তি বলে—রক্ষে করো। আর গল্প শুনতে চাই না।

শুক্তির মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে শুভেন্দু সমবেদনার সুরে বলে—ছিঃ, এত ভয় করতে হয়?

শান্ত হয় শুক্তি।

—কই গো বউরানী? বউরানী কই?

আঙিনার উপর একপাল মেয়ের উল্লাস সকালবেলাটাকে চমকে দিয়ে বেজে উঠল। রুপো ঠাকরুনের ভিটার মাটি নিয়ে সতীসোহাগ করতে এসেছে চন্দনা খাঁদি সীতা কালী পটলী ধবধবী টগর আর বুড়ি।

ও-ঘর থেকে সন্ত্রস্তের মতো ছুটে এসে এঘরে শুভেন্দুর কাছে দাঁড়ায় শুক্তি।

—ওদের চলে যেতে বলো লক্ষ্মীটি, পায়ে পড়ি তোমার।

শুভেন্দু—ছিঃ, সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে এরকম করছ কেন? মা শুনলে বড় রাগ করবেন।

অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকে শুক্তি। চোখের দৃষ্টি একটা আতঙ্কে অস্থির হয়ে কাঁপছে। যেন কোন কথাই শুনতে পাচ্ছে না শুক্তি।

চুপ করে অনেকক্ষণ শুক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে শুভেন্দু। তারপর শুক্তির একটা হাত ধরে আস্তে আস্তে শুক্তিকে কাছে টেনে নিয়ে একেবারে চোখের উপর চোখ তুলে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করে—কেন এত ভয়?

শুক্তির সব চঞ্চলতা যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। ধীর ও শান্ত, গলার স্বর একটু বিচলিত না করে শুক্তি আস্তে আস্তে বলে—তুমি তো সবই বুঝতে পার।

—ঠিক বুঝতে পারি না। কিন্তু...।

—কিন্তু নয়, সত্যি।

—কবে?

—চার বছর আগে।

শুক্তির হাত ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ায় শুভেন্দু। ঘরের ভিতর পায়চারি করে বেড়াতে থাকে।

হঠাৎ একবার থামে শুভেন্দু, শুক্তির মুখের দিকে একটা কঠিন ও উদাস দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে বলে ওঠে—নাগেশ্বরের কাছে আমি এই ভয়ের কথাই বলেছিলাম শুক্তি।

এক একটা মুহূর্ত যেন ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতার মধ্যে মরে চলেছে। শুক্তি দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনি ধীর স্থির ও শান্ত। এই রাজ্যিছাড়া ছোট-জগৎপুরের সব কাহিনীর ভ্রূকুটি-ভরা চোখগুলিকে আজ বুক চিরে দেখিয়ে দিতে পেরেছে শুক্তি। আর অস্থির হয়ে উঠবার, মুখ লুকোবার, আর চোখ ফিরিয়ে নেবার তো দরকার নেই।

শুভেন্দু বলে—যাও, ওরা ডাকছে, দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে শুক্তি। শুভেন্দু আবার অনুরোধ করে—মাত্র একটা অভিনয় তো। যাও, সেরে দিয়েই চলে এসো, দেরি করে লাভ কি?

ভাঙা ভাঙা নিশ্বাসের মতো স্বরে শুক্তি বলে—পারব না।

শুভেন্দু—কেন?

শুক্তি—রুপো ঠাকরুনের ভিটার মাটি আমি সহ্য করতে পারব না।

শুভেন্দু—হর্ষমতীর জল সহ্য করতে পারলে, জগৎলক্ষ্মীর সিঁদুর সহ্য করতে পারলে, এটা আর সহ্য করতে পারবে না কেন?

শুক্তি—না, আর পারব না।

দু'হাতে চোখ ঢাকা দিয়ে ঘরের মেঝের উপরেই বসে পড়ে শুক্তি।

শুভেন্দু এগিয়ে এসে কাছে দাঁড়ায়। জিজ্ঞাসা করে—কেন পারবে না?

চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে শুভেন্দুর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ বন্ধ করে ফেলে শুক্তি।—তোমার অমঙ্গল হবে।

চমকে ওঠে শুভেন্দু, ঠিক যেমন হঠাৎ আলোর ঝলক লাগলে চমকে ওঠে মানুষের চোখ।

শুভেন্দু—এই তোমার ভয়?

শুক্তি—ঐ একটি ভয়।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়ায় শুভেন্দু। শুক্তির চোখ-বোঁজা মুখের দিকে বার বার তাকিয়ে দেখতে থাকে। ছোট-জগৎপুরের অমঙ্গলের জন্য যার এত ভয়, আর একমাত্র ভয়, সে বেচারারই চোখের ঘুম কেড়ে নিয়ে শাস্তি দিচ্ছে ছোট-জগৎপুরের কতকগুলি নির্মম গল্প।

আর একবার তাকায় শুভেন্দু। শুক্তির কাছে এসে দাঁড়ায়। দেখতে অদ্ভুত লাগছে শুক্তির মুখটা। যেন শান্ত হয়ে আর মন ভরে ছোট জগৎপুরের জন্য মঙ্গলের স্বপ্ন দেখছে দুটি ঘুমন্ত চক্ষু। না, কথাটা ঠিকই। নাগেশ্বর কখনো কাউকে ঠকাতে পারেন না।

হঠাৎ শুভেন্দুর সারা মুখে যেন একটা কৃতার্থ কামনার হাসি ঝক করে ফুটে ওঠে। পা টিপে টিপে জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে আঙিনার উপর প্রজাবাড়ির মেয়েগুলির দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় কি যেন একটা কৌতুকের নির্দেশ জানায়। পা টিপে টিপে ফিরে এসে শুক্তির নীরব নিঃস্পন্দ ও চোখ বোঁজা শান্ত মূর্তিটার পিছনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে।

হুড়মুড় করে ছড়া গাইতে গাইতে ঘরের ভিতর এসে ঢুকে পড়ে মেয়ের পাল। টগর চন্দনা খাঁদি আর ধবধবী বুড়ি সীতা ফুলকুঁড়ি আর কালী।

—রক্ষে করো। তুমি কোথায়? ভয়ার্ত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে শুক্তি।

শুক্তির মাথার উপর হাত রেখে শুভেন্দু হাসতে হাসতে বলে—এই তো। পালিয়ে যাইনি।

ততক্ষণে দশ-বারোটা হাত একসঙ্গে হুটোপুটি করে রূপো ঠাকরুনের ভিটার মাটি আলতার সঙ্গে মিশিয়ে শুক্তির দু'পায়ে মাখাতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে আর শরীরটাকে যেন প্রাণপণে কঠিন করে নিয়ে নিঃশব্দে বসে থাকে শুক্তি। সতীসোহাগের ছড়া আরও জোর গলায় বেজে উঠতে থাকে—

রূপো ঠাকরুনের পা গো
কি আশ্চর্যি মা গো।
জল হলো আলতে,
পা হলো লালতে।
কড়ি তুলসী কচি দুব্‌বো ধন্যি।
পতিসোহাগী সোনাপুতী কন্যি।

অন্য ঘর থেকে শাশুড়ীর ডাক শোনা যায়—থাম্‌লি এবার, ওরে ও মেয়ের দল, বউমাকে আর বিরক্ত করিস নি, সিধে নিয়ে ঘরে যা এখন।

চতুর্ভূজ ক্লাব

তারকবাবু এসেই বললেন—আপনাদের চেংড়া বয়েসের সেই গল্পটা আর একবার বলুন ভবানীবাবু, বসে বসে শুনি।

অর্থাৎ আমাদের ছেলেবেলার সেই চতুর্ভূজ ক্লাবের গল্প। বিনু দীপু নরু আর আমি, মাত্র এই চারজন ছিলাম সেই ক্লাবের মেম্বার। ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়ছি, গরমের ছুটি শেষ হয়ে বর্ষা নেমেছে, ঝিলের জল বাঁধ ছাপিয়ে গোর্খা পুলিশের প্যারেডের মাঠে গড়িয়ে পড়েছে। প্যারেড হয় না, গোর্খা পুলিশ মাঠের এক হাঁটু জলের মধ্যে সঙ্গীন তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বড় বড় শোল চেতল আর ফলুইগুলিকে চার্জ করে। সেই সময়।

তারকবাবুকে এর আগে বলেছি এবং আজও বললাম—গল্পটাকে আমাদের চেংড়া বয়েসের নিছক একটা গল্প মনে করবেন না মশাই। ওটা যে আসলে মানুষজাতির চেংড়া বয়েসের গল্প, অন্তত এটুকু আপনার বোঝা উচিত।

তারকবাবু বললেন—বুঝেছি মশাই, খুব বুঝেছি, বুঝিনি আবার। ছেলেবেলার যত ইয়ের দোষ বেমালুম মানুষজাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে যদি সারতে চান তো সেরে যান। আমার কোন আপত্তি নেই।

আমি বলি—আরে মশাই, প্রত্যেক ঘটনা বা গল্পের এক একটা সিরিয়াস তত্ত্বের দিক আছে, সেটা যদি না বোঝেন তবে .....।

তারকবাবু বলেন—তত্ত্বটা বোঝাবেন গৃহিণীকে, যেখানে আসল ভয় সেখানে। আর গল্পটা বলুন আমাকে, একেবারে নির্ভয়ে।

বিনু দীপু নরু এখন কোথায় আছে জানি না। বেঁচে আছে কিনা, কে জানে। আমিও তো আজ এসে ঠেকেছি একেবারে ভিন্ন রকমের একটা ক্লাবের জীবনে। মাথাভরা পাকা চুল নিয়ে যে ক'জন রোটারিয়ান আছেন, তার মধ্যে আমি একজন এবং তারকবাবুও একজন। তবু তারকবাবুর মত মানুষ, জীবনটা যার এরকম পাক-দশায় পৌঁছে গেছে, তিনিও যখন ঘটনার পাকাটুকু বাদ দিয়ে শুধু কাঁচাটুকু শুনতে চাইছেন, তখন আর উপায় কি?

তাই বলছি।

চতুর্ভূজ ক্লাবের ছোট ইতিহাসের কয়েকটি দিনের ঘটনা আজও বেশ বড় হয়ে মনের মধ্যে রয়েছে। আশ্চর্য, মহাসাগরের বুকে কুয়াশায় হারিয়ে যাওয়া দ্বীপের মত বহুদূর অতীতের ঘটনা, তবু স্মরণ করলেই মনে হয়, এই তো সেদিনের ব্যাপার।

এই তো সেদিন বিনুর বাড়িতে বাইরের ঘরে বসে মেঝের ওপর ঘরজোড়া ধবধবে একটা চাদর পাতা ছিল। তার ওপর বসেছিলাম আমি দীপু আর নরু। আর ছিল গন্ধরাজের একটা মস্ত বড় স্তূপ। রায়সাহেবের মালী আর কুকুরের ভয় তুচ্ছ করে, বাগানের সব গন্ধরাজ প্রায় উজাড় করে আমরা নিয়ে এসেছিলাম।

হঠাৎ ভেতরের ঘরের দিক থেকে একজনকে হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে

এল বিনু। নিয়ে এসেই তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে আমাদের গায়ের ওপর ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে হেসে উঠলো—এই নে, চতুর্ভূজ ক্লাবের একটা নতুন জিনিস এলো এবার।

জিনিসটা অসহায়ভাবে হুমড়ি খেয়ে আমাদের গায়ের ওপর পড়েই লজ্জায় ছটফট করে উঠলো। মাথার কাপড় নেমে গেল, আঁচলটা কাঁধ থেকে সরে গেল। লতার জালে আটকে পড়া পাখি যেমন ছাড়া পাওয়ার জন্যে ডানা ফরফর করে, জিনিসটাও তেমনি দু'হাতের ঝাপটা দিয়ে সরে গেল, আঁচল তুলে মুখ ঢাকলো; তারপরেই পালিয়ে যাবার জন্যে দরজার দিকে দৌড় দিল।

কিন্তু পারলো না। বিনু দু'হাত তুলে পথরোধ ক'রে ভয় দেখাল—হেই হেই।

ধপ করে বসে পড়লো জিনিসটা এবং গন্ধরাজের স্তূপের মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে রইলো।

দেখলাম গন্ধরাজের স্তূপের ওপর একটা মস্ত বড় খোঁপা নিঃশব্দে পড়ে রয়েছে। খোঁপার ওপর একটা সোনালী রঙের টিনের প্রজাপতি। কচি কলাগাছের টুকরোর মত সুগোল ও মসৃণ একটা গলা, তার ওপর মিছরির ছোট ছোট কণিকার মত কাঁচের দানার একটা মালা। বিলিতী আমড়ার মত ফিকে সবুজ রঙের একটা শাড়ি, তার ওপর ভোরের তারার মত দেখতে সাদা ও ছোট ছোট পুতির বুটি। গন্ধরাজের স্তূপটাকে জড়িয়ে ধরে পড়েছিল দুটো হাত, হাতে একটা করে লাল রঙের গালার বালা ও একটা করে সাদা ফুটফুটে শাঁখা। একটা হাতে লোহার তৈরি একটা চুড়িও ছিল।

কি অদ্ভুত। আমরা এসেছি বিনুর বউ দেখতে, কিন্তু বউ দেখতে এসে এরকম একটা অদ্ভুত জিনিস দেখবো, এটা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি।

কিন্তু বউয়ের মুখ তখনো ভাল করে দেখা হয়নি। বেচারা ভয়ে ও লজ্জায় মুখ লুকিয়ে পড়ে রয়েছে, কে জানে হয়তো কেঁদেই ফেলেছে। বিনুটার বুদ্ধি-সুদ্ধি বরাবর কেমন একটু কর্কশ, পাহাড়ী জমিদারদের টাট্টু ঘোড়ার মত। দৌড়য় ভাল, কিন্তু দৌড়ের মধ্যে ফূর্তির মাথায় চাট ছুঁড়ে এমন এক-একটা টাল খায় যে সওয়ারের পিলে চম্‌কে ওঠে। কি দরকার ছিল বউটাকে এরকম ধাক্কাটাক্কা দিয়ে একেবারে নাজেহাল করে....।

গন্ধরাজের কাছে এগিয়ে এল বিনু, আর গালার বালা পরা একটা হাত ধরে বললো—টুকু, এই টুকু বৌ, উঠে বসো।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলো টুকু বৌ। দেখলাম টুকু বৌ হাসছে, কিন্তু চোখ্ বন্ধ করে রয়েছে।

বিনু বলে—তাকাও। নইলে লোকে মনে করবে কোত্থেকে একটা অন্ধ মেয়ে এসে....।

টুকু বৌ আবার মুখ নীচু করার চেষ্টা করতেই বিনু টুকুবৌ এর ভুরু চিমটি দিয়ে ধরল—তাকাও, ভাল করে তাকিয়ে একবার চতুর্ভূজ ক্লাবকে দেখে নাও।

তাকালো টুকু বৌ, এবং আমরা ঝটপট এক-একটা উপহার টুকু-বৌ এর হাতের কাছে এগিয়ে দিলাম। রঙীন মলাটে বাঁধানো এক-একটি বই—মধুসূদন হেমচন্দ্র আর রঙ্গলাল।

উপহার দেখে বিনু হেসে গড়িয়ে পড়ে। —এই সেরেছে! ভাল জিনিস উপহার দিলি।

দীপু প্রশ্ন করে—কেন, কি হলো?

দেখে বুঝলাম, দীপু রাগ করেছে। রাগ করবারই কথা। বিনুর কথাবার্তা বরাবর একটু রাফ। ফুটবলেও রাফ খেলার জন্য ওর কুখ্যাতি আছে। তবু তার জন্যে বিনুর ওপর সত্যি করে আমাদের রাগ হয়েছে কোনদিন, এ রকম ব্যাপার ঘটেছে বলে তো মনে হয় না। কিন্তু আজ বেশ রাগ হলো। আমি বললাম—তুই একটা....।

বিনু হেসে হেসে চোখ পাকিয়ে বলে—বড় রাগ করছিস যে, চতুর্ভূজ ক্লাবের নিয়ম মনে নেই?

দীপু—কি?

বিনু—কেউ কারও ওপর রাগ করতে পারবে না।

সবাই হেসে উঠলাম একসঙ্গে, আমরা চারজন, চতুর্ভূজ ক্লাবের চারজন সদস্য।

কিন্তু প্রশ্নটা মনের মধ্যে রয়েই গেল। উপহারগুলি পছন্দ হলো না কেন বিনুর? রঙীন মলাটে বাঁধানো এক-একটি মধুসূদন, হেমচন্দ্র আর রঙ্গলাল, এ যদি ভাল জিনিস না হয় তবে....তবে কি হলে ভাল জিনিস হতো?

টুকু বৌ-এর দিকে তাকিয়ে বিনু বললো—যাও, এবার ভাল মানুষটির মত তোমার উপহার নিয়ে এস। ক্ষিধেয় চতুর্ভূজ ক্লাবের পেটে ইঁদুর দৌড়চ্ছে।

পেটের ওপর হাত চাপড়ে বিনু তখনি আবার ব্যস্ত স্বরে তাড়া দেয়—যাও, যাও, খাবার নিয়ে এস। তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে কারও ক্ষিদে মিটবে না।

দীপু বিরক্ত হয়ে বলে—আঃ এত বাজে কথা বকছিস কেন বিনু?

নরু বলে —তুই কি ওকেও পণ্ডিত মনে করেছিস যে, যা মুখে আসে তাই বলে নিচ্ছিস?

আমি বলি—চতুর্ভূজ ক্লাবের নিয়ম তুমিও ভুলে যাচ্ছ বিন্ধ্যেশ্বরবাবু!

বিনু প্রশ্ন করে—কি নিয়ম?

বললাম—সবাই একমত না হলে কারও শত্রুতা করতে, নিন্দে করতে বা পেছু লাগতে পারবে না।

আবার হেসে উঠলাম, এক সঙ্গে, চতুর্ভূজ ক্লাবের চার জন্য সদস্য।

আরও খুশি হয়ে দেখলাম, টুকু বৌ রঙীন মলাটে বাঁধানো তিনটি উপহার এক সঙ্গে হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। খাবার আনতে ভেতর ঘরের দিকে চলে গেল টুকু বৌ।

চতুর্ভূজ ক্লাবের হাসিখুশিতে কোন বৈষম্য নেই। সবারই সমান শেয়ার। আমরা ক্লাসের পেছনের বেঞ্চিতে সবাই একসঙ্গে সমান শেয়ার নিয়ে বসি। হেড পণ্ডিতের ধাতুরূপ আর শব্দরূপের প্রশ্নে ব্যাকরণহীন দীপু যদি নিরুত্তর হয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে আমাদেরও তাই করতে হবে। উত্তর জানা থাকলেও উত্তর দেবার নিয়ম

নেই, হেড পণ্ডিত যতই গর্জন করুন আর গালাগালি দিন না কেন। এ নিয়মের রচয়িতা বিনুই। বিনু বলেছিল—যাই হোক না কেন, যতই বিপদ-আপদ আসুক না কেন, ইউনিটি নষ্ট করো না ভাই।

বিনু এমন কথাও মাঝে মাঝে বলে—যদি আমি টেস্ট-এ গাব্বু মারি, তাহলে তোরাও গাব্বু মেরে ইউনিটি রাখতে পারবি তো? বুকে হাত দিয়ে বল?

আমি বলি—তুই বুকে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করে বল্ তো পড়াশুনায় ইউনিটি রাখবি? মন দিয়ে পড়াশুনার বেলায় যদি আমাদের সঙ্গে ইউনিটি না রাখিস তবে টেস্ট পাস করার বেলায় কি করে....।

বিনু বলতো—বুকে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে পারবো না মাইরি। তবে কথা দিচ্ছি, পড়াশুনায় মন দিতে যতদূর সাধ্যি চেষ্টা করবো।

কথা দেবার মাত্র সাতদিন পরেই বিনু বলেছিল—ওরে শুনছিস?

নরু বলে—কি?

বিনু—চললুম বিয়ে করতে।

দীপু—তার মানে?

বিনু—বউ আনতে।

আমি আশ্চর্য হই—তোর একটুও লজ্জা করছে না বিনু?

বিনু—কেন করবে? বাপ নেই, মা নেই; ভাই নেই, বোন নেই যার, তার আবার লজ্জা কিসের?

সত্যিই কেউ নেই, আপন বলতে কেউ ছিল না বিনুর। যদি কেউ থেকেও থাকে, তবে কোথায় আছে, বিনু তা জানে না। বিনুর বাবা দীনুবন্ধুবাবুকে অবিশ্যি আমরা দেখেছি। গত বছরের আগের পুজোর সময় তিনি মারা গেলেন। ইয়া মস্ত বড় এক জোড়া গোঁফ, মোটাসোটা কালো চেহারার মানুষটি। দাবা খেলায় সুনাম বেশ ছিল, তার চেয়ে বেশি নাম ছিল তবলায়।

বিনুর বাবা চলে যাবার পর রয়ে গেল শুধু বিনু, আর খোলার চালা, কাঁচা ইটের দেয়াল ও মস্ত বড় উঠোন নিয়ে এই বাড়িটা। আর ছিল শহর থেকে বাইশ মাইল দূরে কিছু জমি, কতখানি কে জানে, আর খামার। অনেকবার দেখেছি, বাইশ মাইল দূর থেকে মাঝে মাঝে এক-একটা ক্লান্ত গরুরগাড়ির ধুলোমাখা চাকা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে বাজতে বাজতে বিনু বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। ভাগচাষীরা ধান পাঠিয়েছে। শুধু ধান নয়, খড়ও আছে। আছে কয়েক বস্তা মসুরি, কিছু গুড় আর সরষে। ভুট্টাও আসে। মাঝে মাঝে এক একটা কালো পাঁঠা এবং ছোট হাঁড়িতে সামান্য কিছু ঘি। বছরের সারা মাস ধরে এইরকম কিছু না কিছু সামগ্রী বাইশ মাইল দূরের চাষীদের ঘর থেকে খামার থেকে আসতেই থাকে। এর বেশির ভাগই বেচে দেয় বিনু এবং তাতে টাকা-পয়সা যা আসে, তাইতেই তো বিনুর বেশ চলে যায় দেখেছি। ইস্কুলের মাইনে-কড়িও নিয়মমত দিয়ে যায়, আর বিড়িটিড়িও খায়।

আমাদের কারও বয়স তখন পনের পার হয়নি, শুধু বিনু বোধহয়, বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে অন্তত দু'তিন বছরের বড় ছিল। কারণ, যেভাবে বিড়ি টানতো এবং মাঝে মাঝে যে-ভাষায় কথা বলতো বিনু, সেইসব ভাব ও ভাষার বয়স পনর বছর হতেই পারে না। বিনু অবিশ্যি আমাদের সাবধান করে দিত—তোরা এখনি এসব ধোঁয়া-টোয়া ধরিসনি রে, আমার সমান বয়স হোক, তারপর।

যেমন বিড়ি খেতে লজ্জা নেই বিনুর, তেমনি বিয়ের কথা বলতেও কোনো লজ্জা হলো না। বিনু বললো—বিয়েতে লজ্জা করার বয়স আমার পার হয়ে গেছে রে দীপু। আমাদের জাতে এই বয়সেই বিয়ে হয়।

হ্যাঁ, শুনেছিলাম, বিনুদের জাতটাও একটু যেন কি রকমের। মুন্সেফ আদালতের ঘরে পেছনের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ঝালর-ওয়ালা পাংখার দড়ি টানে যে বুড়ো, তাকে মামা বলতো বিনু। ঐ বুড়ো বিনুরই দেশের লোক বোধহয়।

বিনু বললো—হ্যাঁ, ঐ পাংখা-মামাই এই বিয়ের সম্বন্ধটা এনেছে। অনেকদিন থেকে খোঁজ করছিল পাংখা-মামা, এতদিনের একটি জাতের মেয়ের খোঁজ পাওয়া গেছে, পুরুলিয়ার কাছে কোন্ এক গাঁয়ে।

ঐ মেয়েকেই বিয়ে করে এনেছে বিনু। আমরা এসেছি বিনুর বউ দেখতে। দেখা হয়েছে। এখন বসে আছি হাঁ করে, আর একবার দেখার আশায়।

না, ঠিক তা নয়। খাবার খাওয়ার আশা নিয়েই বসে আছি। খাবার আনতে গেছে টুকু বৌ।

নরু বলে—উপহারগুলো তোর বুঝি পছন্দ হলো না বিনু?

দীপু বলে—বিনুর পছন্দ হলো না তো বয়ে গেল। যাকে উপহার দেওয়া হয়েছে সে যদি পছন্দ করে তো, ব্যস।

আমি বলি—পছন্দ তো করেইছে, দেখতেই তো পেলুম।

বিনু—কি দেখতে পেলি?

আমি—কত আগ্রহ করে আর কেমন যত্ন করে বইগুলি নিয়ে গেল টুকু বৌ...কি যেন বলতে হয়...টুকু বৌদি।

বিনু—তিনটি বই জোড়া দিয়ে মাথার বালিশ করবে তোর টুকু বৌদি।

আমরা একটু আশ্চর্য হলাম এবং মনে হলো, এইবার বিনুর হাসি ও ইয়ার্কির অর্থটাও বুঝতে পারছি।

দীপু লজ্জিতভাবে প্রশ্ন করে—কেন রে? টুকু বৌ বুঝি কিছু....

বিনু—কিচ্ছু না, ক অক্ষরও চেনে না। আস্ত আকাট।

শুনে একটু দুঃখ হলো। জিজ্ঞাসা করলাম—কেন, একটুও লেখাপড়া শিখলো না কেন টুকু বৌ?

বিনু—কেন শিখবে? কিসের ভয়ে? যার বাপ নেই, মা নেই, ভাই নেই, বোন নেই, তার আবার ভয় কিসের?

নরু—কি বলছিস তুই? টুকু বৌ-এর কেউ নেই?

বিনু—কেউ নেই। আরে তা না হলে আমার মত লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়?

শুনে মনটা আরও কেমন যেন হয়ে গেল। দীপু আর নরুর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, ওরা মনমরার মত তাকিয়ে কি যেন ভাবছে। কেউ আর কোন কথা বলছে না দেখে আমিই শেষে আমতা-আমতা করে আস্তে প্রশ্ন করলাম—তাহলে?

জানতে ইচ্ছে করছিল, তাহলে কোথায় পেল, কোত্থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এল বিনু, গন্ধরাজের রাণীর মত এই একটা মেয়েকে? কেমন করে এতদিন বেঁচেছিল টুকু বৌ? কেউ নেই টুকু বৌ-এর, তবে কি মানুষের বিনা আদরে বড় হয়ে উঠলো এরকম একটা আদরের মানুষ? রাগ করলে কি কেউ ওকে সেধে-সেধে খাওয়ায়নি? বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জন দেখে ঘরে যখন ফিরে এসেছে, কে তখন টুকু বৌ-এর থুতনি ছুঁয়ে কপালের ওপর একটি...।

কে জানে কেমন করে এতদিন ধরে বেঁচে রইল টুকু বৌ।

বিনু একটা বিড়ি ধরায়, আর গাল ফুলিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে নিয়ে বলে—ঐ, কি সম্পর্কে যেন পিসি হয়, তাদেরই কাছে এতদিন ছিল। বড় কষ্ট দিত পিসি। শীতের রাতেও মাটিতে শুয়ে থাকতে হয়েছে, একটা কাঁথাও পায়নি টুকু বৌ।

দীপুর চোখ দুটো বড় হয়ে ওঠে, যেন ভয় পেয়েছে। এবং নরু চেঁচিয়ে ওঠে—কে? কার কথা বলছিস?

বিনু—টুকু বৌ-এর কথা বলছি। কি অবস্থায় ছিল তার সব খবর যদি শুনিস তো একেবারে কাদা হয়ে যাবি।

আমি বললাম—খেতে-টেতে দিত তো?

বিনু ধমক দেয়—রাখ ওসব কথা, ও সব তোদের শোনবার দরকার কি?

দীপু বিরক্ত হয়ে পাল্টা ধমক দেয়—এখন ইউনিটি নষ্ট করছে কে, শুনি?

বিনু হাসে—কে?

দীপু—শুধু তুমিই সব জানবে, আর আমরা জানবো না, চতুর্ভূজ ক্লাবের এটা নিয়ম নয়।

হো হো করে হেসে উঠলাম সবাই এক সঙ্গে, চতুর্ভূজ ক্লাবের চারজন মেম্বার।

বিনু বলে—সত্যই, শুনে আমারও মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সবার পাতের এঁটো ভাত জমা করে রাখতো পিসি, আর টুকু বেচারা তাই খেত।

নরু—পিসি রাস্কেলটার সঙ্গে কথা বলেছিস তুই?

বিনু—না বলে উপায় আছে? তবু থ্যাঙ্কস্ পিসিকে, আমাকে আর এঁটো খাওয়ায়নি। বরং নিজের হাতে দই-মুড়কি নিয়ে এসে খাইয়েছে আমাকে।

দীপু—ঝাঁটা মেরেছে তোকে।

বিনু বলে—মারতো ঠিকই, কিন্তু ভাগ্যিস্.....।

কি যেন বলতে গিয়ে চেপে গেল বিনু। আমিও বিরক্ত হয়ে বলি—তুই হঠাৎ এ রকম করে কথা চেপে দিচ্ছিস কেন বল তো?

বিনু—তাহলে বলেই ফেলি, যাঃ। বিয়ের সব খরচ পিসি আমার কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে।

নরু—কত খরচ হলো?

বিনু—দু'শো টাকার ওপর।

দীপু—এত টাকা কোথায় পেলি তুই?

বিনু—গুড় বেচে যা পেয়েছিলাম সব দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তাতেও কুলোয়নি। উঠোনে দাঁড়িয়ে বুড়ির সে কি চিৎকার! ঠক জোচ্চোর, যা মুখে এল সবই বললে পিসি। তখুনি বেরিয়ে স্যাকরা বাড়িতে গিয়ে আংটিটা বেচে দিয়ে টাকা নিয়ে এলাম। পিসির পাওনা বাকি সাড়ে ছাব্বিশ টাকা নগদ নগদ মিটিয়ে দিলাম।

দীপু ভ্রুকুটি করে বলে—এতগুলি টাকা দিয়ে ফেললি তুই? ঐরকম একটা পিসির ভয়ে? শেম!

বিনু—রেখে দে তোর শেম। টুকুকে ঘরে পুরে দরজায় তালা লাগিয়ে আটকে রেখেছিল, জানিস? টাকা দিয়ে পিসিকে খুশি না করলে কোত্থেকে আসতো ঐরকম একটি জিনিস চতুর্ভূজ ক্লাবের ঘরে।

মুখভরা হাসি, একটা চোখ আহ্লাদে নিুব নিবু, ভুরু নাচিয়ে বিনু আমাদের ইশারা করে দরজার দিকে তাকাতে বলে—ঐ যে এসে গেছে।

দরজার দিকে তাকালাম। হ্যাঁ, চতুর্ভূজ ক্লাবের ঘরে সেই নতুন আবির্ভাব আস্তে আস্তে আর হাসতে হাসতে আসছে। হাতে একটা মস্ত বড় থালা আর তার ওপর রসবড়ার একটা স্তূপ।

এতদিনে সত্যিই মিষ্টি হয়ে উঠলো চতুর্ভূজ ক্লাবের বাতাস। ভাগ্যিস বিনুটার লজ্জা-টজ্জা নেই, তা না হলে পাংখা-মামার ঠেলায় পড়েও হয়তো বিয়ে করতে যেত না। ভাগ্যিস্ বিনু কিপটেমি করে নি, পিসি যত টাকা চেয়েছে, সব দিয়ে দিয়েছে। খুব ত্যাগ স্বীকার করেছে বিনু, চতুর্ভূজ ক্লাবের সব আনন্দ এভাবে মিষ্টি করে তোলবার জন্যই তো হাসিমুখে ফতুর হয়েছে, তার পিসির গালাগালি সহ্য করেছে বিনু।

বরাবর দেখেছি, চতুর্ভূজ ক্লাবের ওপর বড্ড দরদ আর ভালবাসা আছে বিনুর। ফুটবলে অন্য সবার সঙ্গে যতই রাফ খেলা আর সেলফিশ খেলা খেলুক না বিনু, আমাদের চারজনকে বল পাস দিয়েই খেলে।

চতুর্ভূজ ক্লাবের সম্পত্তি বলতে তিনটে জিনিস ছিল। আমার একটা গ্রামোফোন, দীপুর একটা সাইকেল আর নরুর একটা ক্যামেরা। বিনুর বাড়িতে অর্থাৎ আমাদের চতুর্ভূজ ক্লাবের সদরে এই জিনিসগুলি সদাসর্বদা পড়ে থাকতো। যার যেমন খুশি এবং যখনই প্রয়োজন তখনই ব্যবহার করতে কোন বাধা ছিল না। সেদিনও বাইরের ঘরে গন্ধরাজের পাশে বসে দেখছিলাম, ভেতর ঘরে একটা চৌকির ওপর পড়ে রয়েছে গ্রামোফোন আর ক্যামেরাটা, এবং সাইকেলটা দাঁড়িয়ে আছে খোঁড়ার মত হেলান দিয়ে দেয়ালের গায়ে। ক্লাবের জিনিস, সুতরাং জিনিসগুলিকে অযত্ন করবার সমান অধিকার

সবারই ছিল। তবুও জিনিসগুলি তখনো টিকে ছিল। তখনো সাইকেলটার চাকা চলে, গ্রামোফোনের গলা গান করে এবং ক্যামেরার চোখ অন্ধ হয়ে যায়নি। এতদিন ধরে এই জিনিসগুলো তো আমাদের ক্লাবের ইচ্ছা আর আনন্দগুলিকে দিগ্বিদিকে ছুটতে, সুরের হুল্লোড় করতে, আর বন পাহাড় ও ঝিলের যত দৃশ্য ধরে আনতে সাহায্য করেছে।

এবার এসেছে টুকু বৌ। চতুর্ভুজ ক্লাবের নতুন সম্পদ। ঠিক গ্রামোফোন সাইকেল আর ক্যামেরার মত জিনিস অবিশ্যি নয়, কিন্তু প্রাণের মত জিনিস তো বটে। রসবড়ার থালা গন্ধরাজের পাশে রেখে দিয়ে কোমরে আঁচল জড়াচ্ছিল টুকু বৌ। চতুর্ভূজ ক্লাবের কর্কশ হুল্লোড়ের মধ্যে হঠাৎ যেন কোথা থেকে একটি রূপকথার মিষ্টিহাসির মেয়ে এসে পৌঁছে গেছে। এই মিষ্টি হাসিকে কোন্ এক ভুতুড়ে উপকথার ভয়ংকরী পিসি ঘরের অন্ধকারে তালাবন্ধ করে রেখেছিল। কিন্তু সে ভয় আর নেই। টুকু বৌ এখন আর কারও ভয়ের দাসী নয়। টুকু বৌ এখন আমাদের চতুর্ভূজ ক্লাবের টুকু বৌ।

বিনু তার আস্তিন গুটিয়ে রসবড়ার থালার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ডাক দেয়—এগিয়ে আয় সবাই, হাত চালিয়ে সাবাড় কর।

টুকু বৌ রসবড়ার থালাকে দু'হাত দিয়ে আলগোছে আটক করে রাখে। বাধা দিয়ে বলে—থাবাথাবি করে অনাসৃষ্টি করতে দেব না। হাত পাত সবাই, আমি ভাগ করে দিচ্ছি।

কথা বললো টুকু বৌ, এবং বলামাত্র চতুর্ভূজ ক্লাবের এতক্ষণের সঙ্কোচ আর ধৈর্যের প্রাচীর যেন তোপের মুখে ধূলো হয়ে উড়ে গেল। চতুর্ভূজ ক্লাবের এতক্ষণের বেরিয়ে পড়লো আসল আত্মাটা। একসঙ্গে চারজন লাফ দিয়ে উঠে টুকু বৌ-এর সামনে গিয়ে হাত পাতলাম। গুণে গুণে দুটো এবং কখনো বা তিনটে করে রসবড়া সবারই হাতে দেয় টুকু বৌ। হিসেব ভুল করে না টুকু বৌ, যদিও হিসেব করতে বেশ সময় নেয়। হিসেব ভুল করিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা করে দীপু—আমি পাইনি, আমার একটা কম হয়ে গেল টুকু বৌ।

টুকু বৌ কিছুক্ষণ মুখের দিকে তাকায়। যেন মনে মনে একটা হিসাব করে, তার পরেই বেশ গম্ভীরভাবে বলে—না, ঠিক দিয়েছি, মিথ্যে কথা বলো না।

দীপু তৎক্ষণাৎ নরুকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়ে বুকের ওপর চড়ে বসে এবং নরুর হাত থেকে একটা রসবড়া কেড়ে নিয়ে খেতে থাকে।

বিনু চিৎকার করে, আমি হাসি। নরু এক ধাক্কায় দীপুকে উল্টে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, টুকু বৌ-এর কাছে গিয়ে হাত পাতে—আমাকে একটা বেশি দিতে হবে।

টুকু বৌ বিরক্ত হয়—আঃ, এরকম করে হিসেব গোলমাল করে দিও না ভাই।

বিনু হাত পাতে—আমার একটা দানই বাদ পড়ে গেছে। হিসেব করছো না কচু করছো।

টুকু বৌ বিস্মিত হয়—কখন বাদ পড়লো?

বিনু—শেষ দানটা আমি পাইনি।

ভ্রূকুটি করতে গিয়ে হেসে ফেলে টুকু বৌ, আর বিনুর হাত ঠেলে সরিয়ে দেয়—জোচ্চুরি করবার জায়গা পাওনি?

থালা যখন শূন্য হলো তখন আমি চেঁচিয়ে উঠি—একি, তোমার জন্যে রাখলে না টুকু বৌ?

টুকু বৌ হাসে—উঃ কি দয়ার মানুষ! এতক্ষণে চোখে পড়েছে.....।

কথা শেষ না করে টুকু বৌ শূন্য থালা হাতে নিয়ে ভেতরে চলে গেল এবং তখুনি ফিরে এল, একটা জলের কুঁজো আর গেলাস নিয়ে।

জলের গেলাসের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সকলে একসঙ্গে দু'হাতে আঁজলা করে টুকু বৌ-এর সামনে দাঁড়ালাম। নরু মাথা নেড়ে ইশারায় বিনুকে কি যেন বললো।

জল ঢালবার জন্যে কুঁজো তোলে টুকু বৌ, কিন্তু ঢালে না। সবার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একটু সাবধান হয়ে দাঁড়ায়।

টুকু বৌ বলে—মতলব তো ভালো মনে হচ্ছে না। জলটল আমার গায়ে ছিটিয়েছ কি আমিও তোমাদের মাথায় কুঁজো উপুড় করে দেব। সাবধান!

এক লাফে পিছিয়ে আসে সবাই। নরু ও বিনুর মতলব ফেঁসে যায়। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোকের মত জল খেলাম আমরা।

ভেবেছিলাম, বিনুর বউ দেখেই আমরা বাড়ি চলে যাব। দেখা হয়ে গেল, কিন্তু বাড়ি যেতে দেরি হলো অনেক।

টুকু বৌ বললো—খিচুড়ি রাঁধছি, না খেয়ে কেউ বাড়ি যেতে পারবে না।

যতক্ষণ খিচুড়ি রাঁধলো টুকু বৌ ততক্ষণ আমরাও চুপ করে বসে না থেকে অনেক কাজ করলাম। চতুর্ভুজ ক্লাবের কাজ।

আমি গ্রামোফোনটাকে হাতের কাছে টেনে মেরামত করতে বসলাম। ভাল ভাল কয়েকটা ভজন শোনাতে হবে টুকু বৌকে।

নরু তার ক্যামেরাটার চোখ-মুখ খুলে পরীক্ষা করতে থাকে। দীপু জিজ্ঞাসা করে—ক্যামেরার ওপর হঠাৎ এত যত্ন কেন নরু? মতলব কি?

নরু বলে—টুকু বৌ-এর একটা ফটো তুলবো।

দীপু কিছুক্ষণ কি যেন ভাবে; তারপরেই তার লক্কড় সাইকেলটাকে মেঝের উপর পাট করে ফেলে ঘষা-মোছা শুরু করে দেয়।

আমি আর নরু প্রায় একসঙ্গেই প্রশ্ন করি—সাইকেলটাকে এত যত্ন করছিস কেন দীপু?

দীপু আমাদের দিকে তাকিয়ে রেগে ওঠে—টুকু বৌকে সাইকেল চড়া শেখাবো।

বিনু এসে বলে—আমি কি করি বল্ দেখি? আমাকে তো রান্নাঘর থেকে দূর দূর করে ভাগিয়ে দিলে।

আমি বলি—তুই আপাতত দীপুকে একটু ঠাণ্ডা কর, বিনু।

বিনু—দীপু গরম হলো কেন?

নরু—টুকু বৌকে সাইকেল চড়া শেখাতে চায় দীপু।

বিনু উৎসাহিত হয়ে হাসে—তা মন্দ বলিসনি দীপু। যে রকম স্মার্ট মেয়ে, দু'দিনেই নির্ঘাৎ শিখে ফেলবে।

দীপু উল্লসিত হয়ে বলে—তা ছাড়া, কত বড় উঠোন, আর কত জায়গা। সাইকেল শিখতে কোন অসুবিধে নেই এখানে।

যতক্ষণ না টুকু বৌ-এর খিচুড়ি রাঁধা শেষ হলো, ততক্ষণ কাজ করলাম আমরা।

তারপর রান্নাঘরের দাওয়ার ওপর একটা পেতলের গামলাকে ঘিরে চারজনে একসঙ্গে বসলাম। গামলাভরা খিচুড়ি শেষ করলাম। টুকু বৌ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো।

তারপর খেতে বসলো টুকু বৌ। আমরা টুকু-বৌ এর সামনে বসে খাওয়া দেখলাম, আর যত খুশি হৈ-চৈ করলাম—চেঁচিয়ে ছটফট করে শিস্ দিয়ে, গান গেয়ে গল্প করে, পাঞ্জা লড়ে, হরবোলা শুনিয়ে ধাক্কাধাক্কি আর ঠেলাঠেলি করে।

খাওয়া শেষ হয় টুকু বৌ-এর, এইবার বাড়ি যাবার জন্য মনটাকে তৈরি করবার চেষ্টা করি আমরা। এখানে আর কত দেরি করবো? স্কুল কামাই তো হলো, তার ওপর যদি সন্ধ্যেবেলা টিউটর এসে ফিরে যান, তাহলে সেজকাকার সেই বিশ্রী মুখ ভেংচানি থেকে আর রক্ষে আছে?

টুকু বৌ বলে—কি হবে বাড়ি গিয়ে? বসো, কোথাও যেতে হবে না।

আমি বলি—পড়াশোনা আছে টুকু বৌ।

বিনু বলে—আরে রাখ তোর পড়াশোনা। আজকের দিনটাও যদি একটু নষ্ট না করিস তবে...।

ঠিকই বলেছে বিনু। আজকের দিনটাকে, চতুর্ভূজ ক্লাবের মনের আকাশে এমন একটা রামধনু আঁকা রঙীন দিনটাকে হেসেখেলে নষ্ট করতেই তো ইচ্ছে করছে।

নরু একটু দ্বিধা করে বলে—শুধু চুপ করে বসে লাভ কি?

টুকু বৌ হেসে ওঠে—তবে চেঁচাও আর লাফাও।

বিনু বলে—আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে।

সবাই বিনুর মাথার দিকে কৌতূহলী হয়ে তাকাই।

বিনু টুকু বৌ-এর দিকে তাকিয়ে বলে—তোমাকে জ্বালিয়ে আর জব্দ করে আজকের দিনটা নষ্ট করবো টুকু বৌ। বলো, রাজি আছ?

টুকু বৌ বলে—খুব রাজি—দেখি কার সাধ্যি আমাকে জব্দ করে?

টুকু বৌকে উঠোনের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করানো হল। গামছা দিয়ে চোখ বেঁধে দেওয়া হলো। বিনু বললো—এইবার শোন আমাদের কানা গুড়গুড়, এক একটা চিমটির জ্বালা বুঝে বলে দিতে হবে কার চিমটি। যতক্ষণ না ঠিক বলতে পারবে, ততক্ষণ উদ্ধার নেই। যার চিমটি ধরা পড়বে, তাকেই আবার কানা গুড়গুড় হতে হবে।

বিকেলের সূর্য তখন আর দেখা যাচ্ছিল না, কারণ বিনুদের উঠোনের পশ্চিম জুড়ে রায়সাহেবের তিনতলা বাড়িটা সটান দাঁড়িয়ে আছে। ছায়া পড়েছে উঠোনে। উঠোনের এক পাশে খড়ের মাচানের উপর এসে বসেছে চড়াই আর কাকের দল, এক-একটা খড়ের কুটো মুখে তুলে নিয়েই উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

প্রথমে বিনু নিঃশব্দে পা টিপে-টিপে এগিয়ে টুকু বৌ-এর পিঠে একটা চিমটি কেটে সরে এল। টুকু বৌ বলে—ভবানী ঠাকুরপো।

ভুল। সবাই একসঙ্গে হেসে জানিয়ে দিলাম, ভুল হয়েছে, টুকু বৌ-এর।

টুকু বৌ এর হাতের উপর আমি একটা চিমটি দিয়ে সরে গেলাম। টুকু বৌ চেঁচিয়ে ওঠে—দীপু ঠাকরুপো।

ভুল হয়েছে আবার। এইবার দীপু আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে টুকু বৌ-এর পায়ের পাতায় চিমটি কেটে পালিয়ে আসে। টুকু বৌ পায়ের পাতা হাত দিয়ে চেপে চেঁচিয়ে ওঠে—উঃ এটা নিশ্চয় নরু ঠাকুরপো।

ভুল, ভুল, হলো না। টুকু বৌ-এর সব অনুমান ভুল হয়ে যাচ্ছে। এরপর নরু চিমটি কাটলো টুকু বৌ-এর ঠিক ঘাড়ের ওপর। চেঁচিয়ে ওঠে টুকু বৌ—এটা, এটা হলো তোমাদের বন্ধুটি।

একেবারে ভুল। আমরা হেসে উঠতেই টুকু বৌ ফস্ করে চোখের গামছাটা এক টানে নামিয়ে দিয়ে বলে—একটুও ভুল হয়নি। হিসেব করে দেখ, আমার কোন ভুল হয়নি।

জিজ্ঞেস করি—হিসেব আবার কি?

টুকু বৌ—হিসেব করে বলো, তোমরা চারজনেই একটা করে চিমটি কেটেছ কিনা।

বিনু বলে—হ্যাঁ, তাতো কেটেছি। কিন্তু তাতে কি হলো?

টুকু বৌ—আমিও চারজনের নাম বলেছি। কেউ দু'বার কেটেছে, আর কেউ একবারও কাটেনি, এমন তো হয়নি। আমি তো দু'বার কারো নাম বলিনি।

ওরে বাবা! কি চালাক মেয়ে, আর কি ভয়ঙ্কর হিসেব করার বুদ্ধি। আমরা যত হাসছিলাম আর চেঁচাচ্ছিলাম, আশ্চর্য হচ্ছিলাম তার চেয়ে বেশি। টুকু বৌ কি একদিনের মধ্যেই আমাদের এই চতুর্ভূজ ক্লাবের মন আর মনের নিয়মগুলি বুঝে ফেলেছে? হেড পণ্ডিতের গালাগালি আর পিকনিকের খিচুড়ি আমরা সমান শেয়ারে করে থাকি। টুকু বৌকে চিমটি কেটে জ্বালাবার আনন্দও আমরা সমান শেয়ারে ভাগ করে নিয়েছি, এটাও ধরে ফেলেছে টুকু বৌ। আশ্চর্য, এ তো সত্যি কানা গুড়গুড় নয়।

বিনু আবার টুকু বৌ-এর চোখ বাঁধতে যাচ্ছিল। টুকু বৌ এক লাফে সরে গিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই আমরা তিন দিক থেকে ঘিরে ধরলাম। চেঁচিয়ে উঠলো টুকু বৌ—ডাকাত! ডাকাত!

মাথার ওপর অনেক উঁচুতে আকাশের দিক থেকে ঘড়াং করে একটা শব্দ বেজে উঠলো।

রায়সাহেবের বাড়ির দোতালার জানালা ঘড়াং করে খুলে গেছে, আর উঁকি দিয়েছে এক জোড়া গোল গোল চোখ আর এক জোড়া ড্যাবা-ড্যাবা চোখ।

এই দু'জোড়া চোখ প্রায়ই ক্লাবের হুল্লোড় আর হুটোপুটি আনন্দগুলির দিকে ক্ষুব্ধভাবে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে থাকে, যদিও আমরা ঐ চোখ আর চোখের কটমটানিকে কোনদিন একটুও পরোয়া করিনি, করিও না।

গোল-গোল চোখ দুটো হলো রায়সাহেবের মেয়ের। ইয়া মোটা চেহারা। দু'পায়ে বাত। সব সময় মোজা পরে থাকেন। আমরা নাম দিয়েছি বাতুলদি।

আর ড্যাবা-ড্যাবা চোখ দুটো হলো রায়সাহেবের শালির। শুকনো ঝিরকুট দেখতে, হাতে সব সময় একটা না একটা কাপড়ের টুকরো আর একটা সূচ। আমরা নাম দিয়েছি বিসূচিকা মাসি।

বাতুলদির গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম—কি হয়েছে মাসিমা? ব্যাপার কি?

বিসূচিকা মাসি গলা ঘড় ঘড় করে বলেন—চারটে বাঁদর আর একটা বাঁদরী।

আবার ঘড়াং করে সশব্দে দোতালার জানালা বন্ধ হয়ে গেল।

খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ওঠে টুকু বৌ। তারপরেই মুখের ওপর আঁচল চাপা দিয়ে বলে—এবার তোমরা চারটে মানুষ একটু জিরিয়ে নিয়ে সরবত খাও। কেমন? আমি এখুনি তৈরি করে দিচ্ছি।

যখন সন্ধ্যে সত্যিই হয়ে গেল এবং টুকু বৌ আলো জ্বাললো, তখন আমরা বিদায় নিলাম।

টুকু বৌ বলে—পড়াশোনা যতই থাক, রোজ একবার আসা চাই কিন্তু। আমরা বললাম—নিশ্চয়।

চতুর্ভূজ ক্লাবের জীবন চলছিল বেশ। স্কুলের ছুটির পর রোজই বিকেলে বিনুর বাড়িতে আমরা না এসে থাকতে পারতাম না। গ্রামোফোন সাইকেল আর ক্যামেরা মেরামত করে ফেলেছি। অনেক ভজন শুনেছে টুকু বৌ। প্রায় সাত-আটটা ফটো তোলা হয়েছে টুকু বৌ-এর এবং সাইকেল শিখতে গিয়ে দু'বার আছাড় খেয়েছে টুকু-বৌ।

সেদিন একটা ছুটির দিন ছিল এবং বৃষ্টিও ছিল না। টুকু বৌকে নিয়ে আমরা বের হলাম দুপুরবেলা এবং শহর থেকে তিন মাইল দূরে একটা পাহাড়ের মাথায় উঠে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা চারজন, আমাদের মাঝখানে টুকু বৌ। নীচে শালবনের সবুজ ঢেউ. রোদে ঝলমল সীমাহীন ধানক্ষেত আর লাল কাঁকড়ের মাঠ, তার মাঝে মাঝে জংলী নদী নালা আর ঝিল, গলানো-রূপোর মত জল চিকচিক করছে। টুকু বৌ অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিল। আর আমাদের মনে হচ্ছিল, টুকু বৌকে নিয়ে আমরা চারজন যেন পৃথিবী থেকে পালিয়ে একটা নীল আকাশের দেশে এসে পড়েছি।

পাহাড় থেকে নেমে, ঝিলটাকে দু'বার চক্কর দিয়ে ঘুরে, মাঠের ঘাস থেকে মখমল পোকা কুড়িয়ে এবং এক গাদা বুনো ঝুমকো আর টিয়ের পালক কুড়িয়ে নিয়ে যখন চতুর্ভূজ ক্লাবের উঠোনে এসে পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যে গভীর হয়ে গেছে। উঠোনের ওপর খড় বিছিয়ে একেবারে গড়িয়ে পড়লাম আমরা। খুব ক্লান্ত হয়েছিলাম।

চাঁদ উঠেছিল পূবদিকে, তাই রায়সাহেবের বাড়ির দেয়াল আমাদের উঠোনের জ্যোৎস্না বন্ধ করতে পারল না। টুকু বৌ বলে—এখন আমাদের কি ইচ্ছে বলবো?

বললাম—বলো।

টুকু বৌ—ইচ্ছে করছে এখন চারজনের কাঁধে চেপে শ্মশানে চলে যাই। তোমরা চারজনে মিলে আমাকে ছাই করে দিয়ে হাত ধুয়ে ঘরে ফিরে আসবে, ব্যস্। এর চেয়ে বেশি সুখ চাই না।

শুনে বুক কেঁপে উঠলো। টুকু বৌ আজকের উঠোনের এই জ্যোৎস্নার মধ্যেই তার সুখের শেষ দেখতে পেয়েছে। যেন এর পরই কালো-ছায়া নেমে আসবে। এবং সেই ছায়ার ভয়ে আগেভাগেই.... কি যে বলতে চাইছে টুকু বৌ, কিছুই বুঝতে পারছি না।

রাগ হলো টুকু বৌ-এর ওপর। আমি দীপু আর নরু তিনজনেই আচ্ছা বকুনি দিলাম টুকু বৌকে—ফের যদি এরকম কথা বলেছ তো ভাল হবে না।

শুধু কোন কথা বললো না বিনু।

চতুর্ভূজ ক্লাব থেকে সেই সন্ধ্যায় ফেরার সময় মনে একটা খট্‌কা নিয়ে এলাম। এরকম কোনদিনই হয়নি।

পরের দিনই চতুর্ভূজ ক্লাবের বৈঠকে মনের খটকা আর একবার খট্ করে মনের ভেতর বেজে উঠলো।

বিনুর বাড়ির বাইরের ঘরে বসে গ্রামোফোন বাজাচ্ছিলাম আমরা চারজন। বিনু বেশ ফূর্তি করেই মাথা দুলিয়ে মিষ্টি মিষ্টি সুরেলা ভজনগুলিকে দোলাচ্ছিল। টুকু বৌ এল একটা থালায় কুমড়ো ফুলের বড়া নিয়ে। গান শুনতে বসলো টুকু বৌ।

কুমড়ো ফুলের বড়ার উপর চিলের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো আমাদের এক একটা হাত। আমার, দীপুর আর নরুর হাত। শুধু হাত গুটিয়ে বসে রইল বিনু।

টুকু বৌ একটু গম্ভীরভাবে বিনুর দিকে তাকায়—তোমার হাতে কি হলো?

বিনু—এরকম বড়া খেতে আমার লোভ হচ্ছে না। আমার জন্যে মচমচে করে কয়েকটা বড়া ভেজে এনে দাও।

টুকু বৌ থালা ধরে টান দেয়—বেশ, সবই মচমচে করে আনছি।

থালা নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে চলেই যাচ্ছিল টুকু বৌ। বিনুর চোখের তারা যেন ধক্ করে জ্বলে উঠলো মনে হলো। —শোন।

টুকু বৌ মুখ ফিরিয়ে তাকায়—বলো।

বিনু বলে—একটা প্লেটে গোটা চারেক বড়া ভিন্ন করে, তার সঙ্গে কিছু আদা কুচিয়ে আনবে।

টুকু বৌ—কার জন্যে?

বিনু—আমার জন্যে, ঐ থালাটালা আমার ভাল লাগে না।

টুকু বৌ চোখদুটোকে কেমন যেন শুকনো খট্‌খটে করে আর শক্ত করে নিয়ে তাকায়—বেশ তো, একটা প্লেটে কেন, চারটে প্লেটেই ভিন্ন করে তোমাদের জন্যে মচমচে বড়া এনে দিচ্ছি। তাহলেই তো হলো।

আমি বললাম—আমাদের ঐ এক থালাতেই হয়ে যাবে টুকু বৌ, প্লেটে আনতে হবে না।

দীপু বলে—মচমচে করতে হবে না, ওতেই হবে।

নরু বলে—আদা-টাদার কোন দরকার নেই।

টুকু বৌ আবার থালা নামায়। আমরা তিনজন একসঙ্গে সমান হাত চালিয়ে বড়া খাই। শুধু বিনু আমাদের এই কুমড়ো ফুলের বড়ার উৎসব থেকে একটু আলগা হয়ে আর ভিন্ন হয়ে বসে থাকে, আর হেসে হেসে বিড়ি টানতে থাকে।

কিন্তু এ তো ঠিক চতুর্ভূজের ক্লাবের নিয়মমত উৎসব হচ্ছে না। চারজনের মধ্যে একজন যে আলগা হয়ে আর ভিন্ন হয়ে দূরে সরে রয়েছে। আর কেউ নয়—বিনু, যে বিনু চতুর্ভূজ ক্লাবের ইউনিটির জন্যে কি না করেছে। কি হয়েছে বিনুর? আমাদের সঙ্গে বসেও নিজেকে এরকম একটা স্পেশাল করে তুলতে চাইছে কেন বিনু?

হুল্লোড় করে কুমড়ো ফুলের বড়া খাচ্ছি। মীরার ভজনও গলা ছেড়ে বাজছে। তবু মনে হলো, চতুর্ভূজ ক্লাবের আত্মাটা যেন হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে উঠেছে ভেতরে ভেতরে, বাইরে থেকে যদিও কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

দুঃখ হচ্ছিল বিনুর জন্য। এভাবে ভিন্ন হয়ে থেকে কি সুখ পাচ্ছে বিনু? কিসের স্বপ্ন ওকে এভাবে আমাদের কাছ থেকে আলগা করে দিচ্ছে? বুঝতে পারি না কিছুই।

কিন্তু টুকু বৌকে খুব ভাল করেই বুঝতে পারছি। বিনু যেমন অযথা একটা আঘাত দিয়ে চতুর্ভূজ ক্লাবকে মনমরা করে দিয়েছে, টুকু বৌ তেমনি যেন দু'হাতে শক্ত করে চতুর্ভূজ ক্লাবের মনটাকে জড়িয়ে ধরেছে আঘাত থেকে বাঁচাবার জন্য।

টুকু বৌ-এর চোখের আর মনের হিসেব দেখে এর আগে অনেকবার আশ্চর্য হয়েছিলাম। আজও আবার আশ্চর্য হলাম। আজ টুকু বৌ আমাদের সঙ্গে বসে এক থালাতেই হাত চালিয়ে কুমড়ো ফুলের বড়া খেল। এই প্রথম। যেন আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমাদের মুখঢাকা দুঃখ আর ভয়গুলিকে দেখতে পেয়েছে টুকু বৌ। যেন হিসেব করে বুঝে ফেলেছে টুকু বৌ, একজনের মনের তুলনায় তিনজনের মনের দাম অনেক বেশি। একজনকে বড় করতে গিয়ে তিনজনকে ছোট করে দিতে চায় না, হিসেবে কমবেশী করতে জানে না টুকু বৌ।

হঠাৎ পোড়া বিড়ি ছুঁড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো বিনু, আর দরজা পার হয়ে চলে গেল। টুকু বৌ মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকায় আর ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে—যাক্‌গে, একজন পাগল হলে সবাই পাগল হতে পারবে না।

তবু কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে চুপ করে বসে থাকে টুকু বৌ। তারপর নিজের মনেই বলতে থাকে—এ রকম যে করে, তাকে বিশ্বাস করি না, তাকে আমার বড্ড ভয় করে। সেদিনই বুঝেছিলাম।

চুপ করে টুকু বৌ। মুখটা বড় গম্ভীর দেখায়। যেন অনেক সাহস করে তার মনের মধ্যে একটা চাঁদের দেশ তৈরি করে নিয়েছে টুকু বৌ, যেখানে সবার ওপর সমান মায়া নিয়ে সবার সঙ্গে সে বসে আছে। তাই রাগ করেছে, একটা ছায়ার অভিমান কেন হিংসে ঢুকিয়ে তার এই চাঁদের দেশ কালো করে দিতে চাইছে?

বাড়ি ফেরার সময় টুকু বৌ আবার বলে—আমরা যেমনটি আছি, তেমনটি থাকবো। আমরা তো আর পাগল হইনি।

যতটা ভয় পেয়েছিলাম, টুকু বৌ-এর কথা শোনার পর বুঝলাম, এতটা ভয় করার কোন দরকার নেই। শুধু বিনুর ওপর বিশ্বাস হারিয়েছে টুকু বৌ, কিন্তু আমাদের ওপর অগাধ বিশ্বাস। বিনুকে ভয় করতে আরম্ভ করেছে টুকু বৌ, আমাদের নিয়ে কোন ভয় নেই টুকু বৌ-এর মনে। চতুর্ভূজ ক্লাবের ওপর যেন নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে বিনু, টুকু বৌ তেমনি আরও বেশি মায়া দিয়ে ক্লাবকে বাঁচাবার জন্যে তৈরি হয়েছে। খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি আমাদের টুকু বৌ-এর মন। বিনুর ওপর একটু রাগ না করেও পারছিলাম না আমরা।

চতুর্ভূজ ক্লাব ভাঙেনি, ভাঙবার আর কোন লক্ষণও দেখা দিল না। বরং রবিবার সকালবেলায় আরও ভাল করে জমে উঠতো ক্লাব। উঠোনে আমরা ক্রিকেট খেলতাম—আমি, দীপু, নরু, আর টুকু বৌ। শুধু বিনু দাওয়ার ওপর বসে গ্রামোফোন বাজাতো আর একমনে গান শুনতো। ক্রিকেট খেলার হুল্লোড় আর হাসাহাসির আওয়াজ ওর কানেই যেন পৌঁছতো না।

আরও দেখেছি, কোন রাগ-টাগ নেই বিনুর মনে। চতুর্ভূজ ক্লাবের আনন্দে কোন বাধা দেয় না বিনু। শুধু নিজে আলগা হয়ে থাকে। চতুর্ভূজ ক্লাবকে কোন দুঃখ না দেবার জন্যই যেন বিনু নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। বসে আছে একলা হয়ে, ওর নিজের মনের সব পাগলামিকে কেমন যেন একটা উদাস স্বপ্নের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে।

থেমে গেল বিনু, কিন্তু চতুর্ভূজ ক্লাব চলছিল। চালাচ্ছিল টুকু বৌ। চলতে চলতে এল পূজোর ছুটির প্রথম দিনটা।

টুকু বৌ নেমন্তন্ন করেছিল। নারকেল দিয়ে খিচুড়ি রাঁধবে টুকু বৌ। পূজোর ছুটির প্রথম দিনে সকাল বেলা থেকেই জোর উৎসব জেগে উঠলো চতুর্ভূজ ক্লাবে।

টুকু বৌ আজ পরেছে সেই শাড়িটা, সেই ফিকে সবুজ রঙ আর তারার মত সাদা সাদা বুটি। গলায় নয়, খোঁপার ওপর একটা সাদা ফুলের মালা জড়িয়েছে। শরৎকালের ঝিলের মত টুকু বৌ-এর চোখ দুটো আজ যেন কানায় কানায় ভরা মায়ায় টলমল করছিল। এ ঘর থেকে ও-ঘর, উঠোন আর দাওয়ার ওপর দিয়ে ছুটোছুটি করছিল টুকু বৌ। আর খড়ের মাচানের ওপর বসে গল্প করছিলাম আমরা। আমি, দীপু আর নরু। দেখছিলাম, টুকু বৌ-এর আল্‌তা-মাখা পা দুটো যেন একজোড়া পদ্মফুলের মত মাটির ওপর দিয়ে ছুটোছুটি করে যাওয়া-আসা করছে।

বিনু কোথায়? বিনু শুয়ে আছে এই ছুটির দিনের উৎসবটাকে একেবারে তুচ্ছ করে ভেতর ঘরের তক্তপোষে, গল্পের বই পড়ছে। চতুর্ভূজ ক্লাবকে উপেক্ষা করতে

গিয়ে এই পৃথিবীটাকেই উপেক্ষা করে বসলো বিনু। নইলে এই খড়ের মাচানের ওপর বসে দেখতে পেত—আকাশ কত নীল, আর টুকু বৌ-এর মুখটা কত সুন্দর হয়ে উঠেছে।

আমরা তিনজন এখানে মাচানের ওপর, টুকু বৌ ওখানে রান্নাঘরে। আমাদের গল্পগুলি তেমন করে জমে উঠছিল না, ছটফট করছিল।

টুকু বৌ মাঝে মাঝে রান্নাঘরের বাইরে এসে আর উঠোন দিয়ে যেতে যেতে বলে যায়—আসছি, আসছি। খুব বেশি দেরী হবে না।

বলতে বলতে এই শরতের রোদের মত হাসি ছড়ায় টুকু-বৌ এর মুখ।

আমাদের গল্পগুলিও অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করে শেষে যেন নিঝুম হয়ে গেল। খড়ের গাদার ওপর চুপ করে শুয়ে পড়ে রইলাম আমরা, এলোমেলো হয়ে আর নিজের নিজের মন নিয়ে।

হঠাৎ দীপু উঠে বসে। —এক্ষুনি আসছি।

দীপু চলে যাবার পর আমি আর নরু চুপ করে বসে রইলাম। গল্প করার মত গল্প খুঁজে আর পাচ্ছিলাম না।

অনেকক্ষণ পরে ফিরে এল দীপু। গম্ভীর হয়ে দৃষ্টি তুলে রায়সাহেবের বাগানের চালতে গাছের দিকে তাকিয়ে রইলো। দীপুর মুখটা ভয়ংকর রকমের শুকনো, চোখে একটা ভয়-ভয় ছায়া কাঁপছে।

জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় গিয়েছিলি দীপু?

দীপু হাসতে চেষ্টা করে—ঐ ওখানে।

—কোথায়?

—টুকু বৌকে একটু জ্বালিয়ে এলাম।

দীপুর কথায় হাসতে ইচ্ছে করলো না। রান্না কত দূর?

দীপু বলে—কে জানে, হয়ে এসেছে বোধহয়।

নরু লাফ দিয়ে উঠেই বলে—দাঁড়া, আমি একবার তাড়া দিয়ে আসি।

নরু চলে যাবার পর আমি চোখ বুঁজে পড়ে রইলাম। ভাল লাগছিল না কিছু। যেন ছুটির দিনের এত ভাল উৎসবটার প্রাণ থেকে আল্‌গা হয়ে খড়ের গাদায় পড়ে আছে। টুকু বৌ-এর কখন যে খিচুড়ি রান্না শেষ হবে, কে জানে!

নরু ফিরে এল। আমি উঠে বসেই জিজ্ঞাসা করলাম—কতদূর রান্নার?

নরু ফ্যাকাশে মুখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে আমতা আমতা করে বলে—কি বললি!

আমি—রান্নার কতদূর?

নরু বিরক্ত হয়ে বলে—তা আমি কি করে বলবো।

আমি বললাম—তবে যাই আমি, টুকু বৌকে একটু সাহায্য করে আসি।

দীপু ও নরুকে খড়ের মাচানে রেখে আমি এসে ঢুকলাম টুকু বৌ-এর রান্নাঘরে।

উনুনের ওপর খিচুড়ির হাঁড়ি, হাঁড়িতে খিচুড়ি পুড়ছে, পোড়া গন্ধে ঘর ভরে উঠেছে। টুকু বৌ বসেছিল পিঁড়ির ওপর, দুহাঁটুর ওপর মাথা রেখে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে। যেন অন্ধ হয়ে বসে রয়েছে টুকু বৌ, পোড়া খিচুড়ির ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছে না। নাকটাও কি অন্ধ হয়ে গেল, নইলে পোড়া গন্ধও টের পায় না কেন?

—টুকু বৌ?

আমি যে ডাকলাম, তাও শুনতে পেল না টুকু বৌ। বধির হলো, না ঘুমিয়ে পড়লো?

টুকু বৌ-এর মাথায় হাত দিয়ে ঠেলা দিলাম—টুকু বৌ?

টুকু বৌ মুখ তুলে তাকায়। দেখলাম কপালের কুমকুমের টিপ থেবড়ে গেছে। হাসতে চেষ্টা করলো টুকু বৌ, কিন্তু পারলো না। চোখের চাউনিতে কিরকম একটা ভয় থমকে রয়েছে।

আমি বললাম—খিচুড়ি পুড়ছে।

আমার কথা শুনে খিচুড়ির দিকে তাকিয়েও চমকে উঠলো না টুকু বৌ, যেন হাত-পা থেকে সব ব্যস্ততা মুছে গিয়েছে।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো টুকু বৌ এবং হাঁড়িটাকে উনুন থেকে নামালো। কিন্তু এইটুকুতেই যেন ক্লান্ত হয়ে হাঁপাতে থাকে টুকু বৌ, সরে গিয়ে দরজার কাছে কপাট ধরে দাঁড়ায়।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে টুকু বৌ বলে—কি বলছিলে বলে ফেল—বানী ঠাকুরপো।

আমি—কই, কিছু তো বলছিলাম না।

টুকু বৌ—দীপু ঠাকুরপো বলে গেল, নরু ঠাকুরপো বলে গেল, আর তুমি বলবে না।

আমি—কিসের জন্য কি বলবো?

টুকু বৌ—দীপু ঠাকুরপো আর নরু ঠাকুরপো যেজন্যে যা বলে গেল। এমন মনের মত ছুটির দিনে, যখন আমার খোঁপার ফুলের মালাটা এত মনের মত হয়েছে, আর এত মনের মত করে খিচুড়ি রাঁধা হয়েছে, তখন মনের মত করে খেতে ইচ্ছে করছে না?

আমি হেসে ফেলি—করছে বৈ কি।

টুকু বৌ—তাই তো জিজ্ঞেস করছি, মনে মত ইচ্ছেটা বলে ফেল।

টুকু বৌ-এর কাছে এগিয়ে, ওর চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। তারপর বললাম—বড় ইচ্ছে করছে টুকু বৌ, আজ শুধু আমি আর তুমি দু'জনে এঘরে বসে একসঙ্গে খিচুড়ি খাই। ওদের সবাইকে খেতে দিও দাওয়ার ওপর। এখানে শুধু তুমি আর আমি, আর কেউ নয়।

টুকু বৌ—এই তো, এতক্ষণে বলতে পেরেছ। দীপু ঠাকুরপো যা বললে, নরু ঠাকুরপো তাই বললে, তুমিও তাই বললে।

চুপ করে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে টুকু বৌ। যেন অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি হারিয়ে একা থমকে দাঁড়িয়ে আছে। সেই জ্যোৎস্নার আড়ালে যে কালোছায়াটা ছিল, সেটাকে

এতদিনে স্পষ্ট ক'রে দেখতে পেয়েছে টুকু বৌ। যেন টুকু বৌ-এর আত্মাটাকে চার টুকরো করে সমান সমান ভাগ করতে চাইছে কালো-ছায়া।

আতঙ্কিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে টুকু বৌ—যাও, যাও ভবানী ঠাকুরপো, সবাই গিয়ে একসঙ্গে দাওয়াতে বসো, এক্ষুনি খেতে দিচ্ছি। সবাই যখন পাগল, তখন এক পাগলই...।

শুনতে পেলাম না টুকু বৌ-এর শেষ কথাটা। ছুটে গেল টুকু বৌ। এক দৌড় দিয়ে দাওয়া আর উঠোন পার হয়ে একেবারে ভেতর ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকলো, যেখানে বিনু একমনে গল্পের বই পড়ছে।

দাওয়ার ওপর একসঙ্গে বসে আমরা খিচুড়ি খেলাম। আমি দীপু আর নরু। খিচুড়িটা একটু ধরে গিয়েছিল ঠিকই, তবু খারাপ হয়নি খেতে। কিন্তু খাওয়াটা একেবারেই ভাল লাগলো না।

বিনু এসে বসলো একটা মোড়ার ওপর, এবং বসে বসে আমাদের খাওয়া দেখলো। দীপু ধীরে সুস্থে অলসভাবে খাচ্ছে দেখে বিনু চেঁচিয়ে উৎসাহ জানায়—গোগ্রাসে হুস্ হুস্ করে খা দীপু, নইলে তোর পেট ভরবে কি করে?

দীপু কোন কথা বললো না।

টুকু বৌ জিজ্ঞাসা করে—আর এক হাতা দিই নরু ঠাকুরপো?

নরু কথা না বলে নিঃশব্দে মাথা নেড়ে জানায়—না।

আমার দিকে তাকিয়ে বিনু বলে—ভবানীর কি হয়ে গেল নাকি?

আমিও কোন কথা বলতে পারলাম না। মাথা নেড়ে জানাই—হ্যাঁ।

একটিও কথা বলিনি আমরা, বলতে পারিনি। চতুর্ভূজ ক্লাব নয়!, আমরা যেন তিনটি নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক স্বর্গীয় দীনবন্ধুর বাড়িতে বসে রয়েছি। বিনু আর টুকু বৌ, দীনবন্ধুবাবুর পুত্র আর পুত্রবধূ যেন বাইরের তিন জন ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রতা করছেন। এই মাত্র।

টুকু বৌ বিনুকে বলে—তুমি চান করে এস। আর দেরি করছো কেন?

বিনু বলে—তুমি আগে চান করে এস, আমি বইটা ততক্ষণ শেষ করে নি, তারপর....

তারপর বিনু আর টুকু একসঙ্গে খেতে বসবে, এই তো ব্যাপার। বিনু মুখ খুলে না বললেও ওর চোখ দেখে সেটুকু বুঝতে পারছিলাম, সহ্য করতেও পারছিলাম। শুধু পারছিলাম না কোন কথা বলতে, কেউ যেন গলা টিপে হঠাৎ আমাদের সব কথার আবেগ বন্ধ করে দিয়েছে।

খাওয়া শেষ হওয়া মাত্র, চটপট আঁচিয়ে নিয়ে তিনজনে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি দীপু আর নরু।

বিনু বলে—এখন তোরা তাহলে....।

বুঝলাম, বিনু আমাদের পা গুলিকে আর দাঁড়িয়ে থাকতে দিতে চাইছে না, এই

মুহূর্তেই চালিয়ে দিতে চাইছে। সুতরাং কোন কথা না বলে আমরা দরজার দিকে পা বাড়ালাম। —চললাম।

টুকু বৌ পেছু থেকে হঠাৎ ডাক দেয়—ভবানী ঠাকুরপো।

মুখ ফিরিয়ে তাকাই। টুকু বৌ বলে—তোমাদের জিনিসগুলি নিয়ে যাও ভাই, এখানে মিছিমিছি ফেলে রেখে নষ্ট করে লাভ নেই।

বুকের ভেতর কি যেন একটা চুরমার হয়ে ভেঙ্গে গেল, তারই শব্দ শুনে থমকে রইলাম আমরা। বোধহয় এতদিনে চূর্ণ হলো চতুর্ভূজ ক্লাব, তারই শব্দ। চূর্ণ করে দিল টুকু বৌ।

আমাদের জিনিস? হ্যাঁ, মনে পড়লো, এখানে আমাদের তিনটে জিনিস আছে। গ্রামোফোনটা, সাইকেলটা আর ক্যামেরাটা। তাছাড়া আর কিছুই না।

ঘরের ভেতর থেকে টানা-হ্যাঁচড়া করে বের করলাম জিনিসগুলিকে। নিজের নিজের জিনিস নিজের হাতে তুলে নিলাম। চললাম। উঠোনের ওপর বিনু আর বিনুর পাশে টুকু বৌ নিঃশব্দে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত ঘটনাটা দেখলো। চতুর্ভূজ ক্লাব মরে গেল, তার জন্যে কি একটুও ব্যথা লাগলো না কারো চোখে?

না মিথ্যে নয়, দেখতে ভুল হয়নি আমার। উঠোন পার হয়ে খিড়কির দরজার কাছে এসে একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। স্পষ্টই দেখতে পেলাম, বিনুর চোখ চিকচিক করছে, আর টুকু বৌ-এর চোখ থেকে জল পড়ছে ঝর-ঝর করে।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দরজা পার হয়ে আমরা চলে গেলাম। পেছনে কিছু আর নেই। নেই চতুর্ভূজ ক্লাব, নেই আমাদের ফেলে আসা কোন জিনিস। চতুর্ভূজ ক্লাব ভেঙেই যায়, পৃথিবীতে চতুর্ভূজ ক্লাব বোধহয় হতেই পারে না। তবে আর কি?

আর কিছুই নয়; ঘড়াং করে রায়সাহেবের দোতলার জানালা খুলে গেল। দেখতে পেলাম, একজোড়া ড্যাবা ড্যাবা চোখ বিনুদের বাড়ির উঠোনের দিকে উঁকি দিয়ে তাকিয়ে আছে।

বিসূচিকা মাসি ঘড় ঘড় স্বরে যেন মাথার ওপরে শুকনো ও কঠোর আকাশটাকে প্রশ্ন করেন—কি রে, কি রে?

বাতুলদি উত্তর দেন—একটা বাঁদর আর একটা বাঁদরী।

সবলা

গাঁয়ের ডোমদের বড় মোড়ল এলাচি ডোম। যৌবনের জলুস উবে গেছে কবে, ছুরির মত সে-জীবনের ধার গেছে ক্ষয়ে, পরমায়ুর প্রান্তে এসে ঠেকেছে আজ। জরা আর ভীমরতির পাকে পড়ে জীবনটা ধুকপুক করছে শুধু। যাই যাই করেও যেন আর যেতে চায় না।

মোরগের ডাকের সঙ্গে এলাচির ঘুম ভাঙে। জেগে উঠেই পরিত্রাহি চেঁচাতে থাকে—টুকিয়া, ওরে টুকিয়া, শিগগির ভাত দে।

—এক লাথি মেরে সব গলাবাজি বন্ধ করে দেব বুড়ো। শুধু খাই আর খাই। নিজের গায়ের মাংস ছিঁড়ে খা না।

টুকিয়াও ঘুম ছেড়ে রাগে গরগর করে বেরিয়ে যায়। মোড়ল এলাচি তার অষ্টাবক্র গ্রন্থিল দেহভার তুলে দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে। কঞ্চি দিয়ে গা চুলকোয়। মাথাটা ঘড়ির কাঁটার মত প্রতি সেকেণ্ডে টক টক করে কাঁপে। গাল দেয় টুকিয়াকে, গাল দেয় টুকিয়ার মৃতা মাকে, যার চরিত্র নাকি কোন্ এক কোলিয়ারির সাহেবের কাছে বাধা ছিল। নিশ্চয়, এ মেয়ে নিশ্চয়ই বেজন্মা, নইলে বুড়ো বাপকে এত অবহেলা।

এলাচির গালাগালি আর অভিশাপের প্রবাহ অবিরল ধারায় গড়িয়ে চলে দুপুর পর্যন্ত। শ্রান্তিতে ঘুণধরা ধড়টা ক্রমে নিশ্চল হয়ে আসে। ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খায়।

এমনি সময় ঘরে ফিরে আসে টুকিয়া। বুড়ো সুমুখে ঠেলে দেয় এক থালা ভাত আর এক হাঁড়ি তাড়ি বা মদ। বুড়ো জুত করে উঠে বসে। শীর্ণ ঘাড়টা সারসের মত ঝুঁকিয়ে অনুভব করে, এক হাঁড়ি তরল প্রাণের গন্ধ। এই জন্যেই তার বেঁচে থাকা।

—জিতা রহো বেটি। বুড়ো টুকিয়াকে আশীর্বাদ করে! —তুই আছিস বলেই তোর বুড়ো বাপটা বেঁচে আছে। বুড়ো ডুকরে কেঁদে ফেলে—আর তোর মা। অমন বউ দেবতারও হয় না রে টুকিয়া! বুড়ো ভাতের থালা সামনে টেনে নেয়।

দু'তিন মুঠো ভাত গিলে ক্লান্ত ঘোড়ার মত তাড়ির হাঁড়িতে ঠোঁট নামিয়ে দেয়। ঢকঢক করে খেয়ে ফেলে। থেমে নিয়ে তামাক টানে।

তাড়ি ভেজা নোংরা দাড়িতে মাছি উড়ে এসে বসে ঝাঁকে ঝাঁকে। ঠাণ্ডা ভাতের থালার গা বেয়ে পিঁপড়ের সারি উঠতে থাকে। বুড়ো বুঁদ হয়ে ঝিমোয়। তার সাদা ভুরু দুটো চোখের কোটরের ওপর পর্দার মত ঝুলে পড়ে।

এত দীনতা এলাচির সংসারে আজই দেখা দিয়েছে, চিরটা কাল এমন ছিল না। সেন্ট্রাল জেলের জল্লাদ ছিল এলাচী। মাইনে ছিল ভাল, উপরি আয়ও মন্দ হত না। সবচেয়ে মোটা দক্ষিণা আদায় হত ফাঁসির আসামীর মায়েদের কাছ থেকে।

মায়েরা বলত, দোহাই বাবা জমাদার। টানা-হ্যাঁচড়া করে ছেলেটাকে শেষ সময়ে আর কষ্ট দিস্‌নি বাবা।

—তা একটু করতে হবে বৈকি। সহজে কি আর কেউ তক্তায় উঠতে চায় মায়িজী।

—না রে বাবা জমাদার। নে বিশটা টাকা রাখ, এই রূপোটা নে। কিন্তু কথা রাখিস।

এলাচি খুশি হয়ে আশ্বাস দিত। —বেশ, বেশ, দড়িটা না হয় চর্বিতে ভিজিয়ে নেব

ভাল করে, যাতে গলার চামটাম ছড়ে না যায়। তবে আরও দুটো টাকা দাও, আমার মেয়ে মেঠাই খাবে।

এ-সব অনেকদিন আগেকার কথা। টুকিয়া তখন দু'বছরের মা-মরা শিশু।

ভাত আর তাড়ি। এই সামান্য অন্নপানটুকু মোড়ল হিসেবে তার প্রাপ্য দক্ষিণা। কিন্তু কেই বা আর শ্রদ্ধা করে খুশী মনে দেয়। ডোম গৃহস্থদের দ্বার হতে দ্বারে ঘুরে, অনুনয় করে, চোখ রাঙিয়ে, ঝগড়া করে টুকিয়া আদায় করে আনে মোড়লের এই সম্মানী।

ভিক্ষাজীবী ডোম মেয়েরাও টুকিয়াকে অনুকম্পার চোখে দেখে। তাদের বরাতেও ডালরুটি জোটে। টুকিয়া সম্মানী যা পায় তা দেখে তারাও লজ্জা পায়।

সমবয়সী ভিখিরী মেয়েরা ঠাট্টা করে বলে—বুড়োকে এবার একটি জামাই আনতে বল না টুকিয়া। তা হলেই তো তোর এ মেহন্নতের জ্বালা দূর হয়।

টুকিয়া তাদের গালে ঠোনা মেরে জানিয়ে দেয়—বুড়োর দেওয়া জামাই আমি নেব কেন? আমার বর বাছব আমি।

টুকিয়া চলে গেলে ভিখারী মেয়েরা আলোচনা করে। তারাও সে কথাটা শুনেছে। টুকিয়া জাতের বাইরে কার সঙ্গে ফেঁসেছে। পঞ্চের বৈঠকে এর নিষ্পত্তি হবে। টুকিয়াকে শাস্তি পেতে হবে।

গাঁয়ের সবারই চোখে টুকিয়া সুন্দর। পরবের দিনে খোলা মাঠে নৃত্যপরা টুকিয়ার তনুশোভা আড্ডার চোখে চোখে শোভার কুহকবাষ্প বুলিয়ে দেয়। বয়োবৃদ্ধেরাও আফসোস করে—ভাল লাচনী হত হে মেয়েটা, চাল-চলন যদি একটু নরম-সরম হত। ঠিক কথা, সব মাটি করেছে ওর ঐ রুদ্র স্বভাব, কনকধুতুরার মত। দূরে দাঁড়িয়ে শুধু তাকিয়ে থাকা যায়।

নতুন এক জোয়ান এসেছে এ গাঁয়ে। মঙ্গল তাঁর নাম। গাঁয়ের ওঝা তাকে আশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু ধরা পড়ে গেল মঙ্গল। আসলে সে ডোম নয়, জংলী মুণ্ডা। তার ওপর আরও খবর পাওয়া গেছে, সে হলো ডাইনীর ছেলে। দেশ ছেড়ে এসে এখানে ডোম সেজে রয়েছে; চাকরি জোটাবার ফন্দিতে।

এ হঠকারিতার যথোচিত শাস্তি পেতে হল মঙ্গলকে। ডোমেরা নিদারুণভাবে পিটিয়ে তাকে গাঁয়ের বার করে দিল। ডাইনীর ছেলে বটে, কিন্তু যাবার আগে তুক্ করে রেখে গেল গাঁয়ের সেরা জিনিসটিকে, যুবক-ডোমদের কামনার ধন এই টুকিয়াকে। এ ব্যাপারে সমস্ত গাঁ জুড়ে যে বিক্ষোভের ঝড় উঠল, তার জের আজও মেটেনি, মিটছেও না।

গাঁয়ের সীমানার বাইরে, নালার ওপারে এক শিমূলগাছের তলায় কুঁড়ে বাঁধলো মঙ্গল। নড়বার নাম নেই, মঙ্গল যেন দুষ্টগ্রহের মত ঝুলে রইল ডোমগাঁয়ের দিগন্তে। কুকুর-মারা ঠ্যাঙা হাতে ডোমেরা ক'দিন রইল তাকে-তাকে। বাগে পেলে এক বাড়িতে মঙ্গলের প্রণয়কলাপ আর ইহলীলা একই সঙ্গে ঘুচিয়ে দেবে। কিন্তু বেটা জংলী বড় জবরদস্ত, তার ওপর সর্বদা খোঁপায় ঝোলানো একগোছা বিষ-মাখানো তীর। উড়ন্ত

সাপের মত অলক্ষ্যে কখন কাকে এসে ছোবল দেবে কে জানে! কাজেই সংঘর্ষটা তেমন জমে উঠল না। ওঝার বহুদিনের মন্তরবন্দী অশরীরী পিশাচটাও জংলীকে ঘায়েল করতে পারল না।

প্রতিবেশীরা দলে দলে এসে বুড়ো এলাচিকে শুনিয়ে দিয়ে বলে গেল—ও মোড়ল, হয় মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও, নয় মেয়েকে সামলাও। নইলে তোমাকে জাতে রাখা আর সম্ভব হবে না। আমাদের অন্য মোড়ল দেখতে হবে।

প্রতিবেশীদের হাত ধরে সকাতর বুড়া বলে—কেন বেরাদার, তোমরা এত চটছ কেন? কি করেছে মেয়েটা?

—কি করেছে? রাত বেরাতে মঙ্গলের সঙ্গে ঘুর ঘুর করছে। ওকে ভাত পৌছয়, শলা-পরামর্শ দেয়, সমস্ত পঞ্চ বিগড়ে উঠেছে এসব কুকাণ্ড দেখে। জাতের বাইরে .....ছি ছি।

পঞ্চের গুপ্তবৈঠকে সিদ্ধান্ত হল, মঙ্গলকে জব্দ করা হোক। টুকিয়া ওকে ভাত পৌছতে পারবে না। বুড়ো মোড়লকে জানিয়ে দেওয়া হোক যে, এর ব্যতিক্রম হলে তারা একজোটে সম্মানী দেওয়া বন্ধ করবে।

মোড়ল এলাচিও ক্ষেপে গেছে। গেল গেল, সব গেল। বন্ধ হল তার ভাত আর মদ। ওঝার হাত ধরে মিনতি করে বলে—সবুর কর দোস্ত। সব ঠিক হয়ে যাবে। বুড়াকে পেটে মেরো না বেরাদার। ধর্ম ভুলে যেও না।

প্রত্যুত্তরে ওঝা আশ্বাস দিয়ে জানায়—সে ধর্মজ্ঞান আমাদের আছে। কিন্তু বেটিকে বুঝিয়ে দাও, জংলী শালা যেন মোটা না হতে থাকে, আমাদেরই ভাত মেরে।

—টুকিয়া, শোন্ বেটি। এলাচি আদর করে ডাকল—পঞ্চের সভা এল বলে। তোর বর বাছাই হবে সেদিন। ওঝার ছেলের সঙ্গেই ঠিক করেছি। পঞ্চের সামনে গিয়ে কবুল করে নিবি। বুঝলি?

টুকিয়া সংক্ষেপে জানিয়ে দিল—সে আমি পারব না।

—কি পারব না? বুড়ো দারোগাই মেজাজে গলার স্বর চড়িয়ে প্রশ্ন করে।

—কি আবার রে বুড়া? যেন জানিস না কিছু? আমি মঙ্গলকে কথা দিয়েছি।

—কি? মঙ্গল? জাতের বাইরে? হুঁশিয়ার হো যাও হারামজাদী। নইলে এই বেত দিয়ে ফাঁসিয়ে ঘাড়টা একেবারে মুচড়ে দেব।

নিমীলিত চক্ষু বুড়োর মুখের সামনে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলে টুকিয়া বলে—এই দেখ, হেই বুড়া! এই করবি তুই।

বুড়ো অবশ হাতে তার দু'পাশে হাতড়ে খুঁজতে থাকে, চেলাকাঠ, লাঠি বা ইঁট-পাটকেল। ততক্ষণে টুকিয়া ঘরের বাইরে।

সমস্তদিন মাঠে মাঠে ঘুরেছে মঙ্গল। গেরুয়া ধুলোয় শরীর ছেয়ে গেছে। মাটিতে

একেবারে লুটিয়ে শুয়ে সে টুকিয়ার কথাগুলো গিলছিল। সামন পলাশের একটা নীচু ডাল ধরে টুকিয়া হেলেদুলে বকে চলেছে।

—কাল থেকে তোর ভাত বন্ধ।

—বেশ তো, জঙ্গলের ডুমুর খাব।

—হ্যাঁ, তাই খাবি।

—বলছি তো, তাই খাব। রোজ ডুমুর খাব। কিন্তু একদিন এসে দেখবি আমি মঙ্গল নই। ভালুক হয়ে ঝুলছি ডুমুরের ডালে। এই রোঁয়া, এই নখ, এই থাবা....

মঙ্গলের করুণ হাসি আর অভিমানের প্রলাপ থামিয়ে দিল টুকিয়া। পায়ের চেটো দিয়ে মঙ্গলের ধুলো ছাওয়া পিঠটা আস্তে আস্তে ঘষে দিয়ে বলল—বড় ঘাবড়ে গিয়েছিস, না রে মঙ্গল? ভয় কি তোর? আমি আছি। তবে তোকে কাজ করতে হবে।

চারদিকে সাবধানী দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে আর গলার স্বর নামিয়ে টুকিয়া বলে—রোজ রাত্তিরে একটু দৌড়াদৌড়ি করতে হবে। বল, রাজি আছিস?

—হ্যাঁ।

—মাঠে মাঠে যাবি। খবরদার, সড়ক ছুঁস না যেন। লোহার পুলটা পেরিয়ে দেখবি ফুলের বাগিচা। পেছনের ঘেরান ভেঙে আস্তে আস্তে ঢুকে পরবি। বেছে বেছে লাক্ষার গুটিভরা একবোঝা ডাঁটা নিয়ে আসবি। মারোয়াড়ী ঠিক করেছি। এক-এক বোঝা পাঁচ-পাঁচ টাকা।

মাঝরাত্রে মঙ্গল ফিরে এল হাঁপাতে হাঁপাতে। তার রক্তমাখা দেহটা পলাশতলায় কাঁটাগাছের মত লুটিয়ে পড়ল। পিঠে বল্লমের খোঁচা লাগা একটা সুগভীর ক্ষত। —দারোয়ানে ঘিরেছিল রে টুকিয়া। উঃ, কোন মতে পালিয়ে এসেছি।

চালে ভুল হয়েছে। টুকিয়া ভাবনায় ডুবে রইল অনেকক্ষণ। এ পথে চলবে না রোজগার। প্রতিপদে মরণ আর জেল। জংলীর ওপর এতটা নিষ্ঠুর সে হতে পারবে না।

নতুন রোজগারের হদিস দিল টুকিয়া। —রিজার্ভ জঙ্গল থেকে মরা জানোয়ারের হাড় কুড়িয়ে নিয়ে শহরে গিয়ে বেচে আয়।

ভোর থেকে বিকেল পর্যন্ত তন্নতন্ন করে অরণ্যের জঠর হাতড়ে বেড়ালো মঙ্গল। একটা পুরনো উইঢিবি খুঁড়ে বার করল গোটা চারেক পাহাড়ী ডোমনার মেরুদণ্ড। মবা কেঁদগাছের ঝোপে পেল দু'ঝাড় হরিণের শিং। স্রোতের ধারে বালিতে আধপোঁতা নীলগাইয়ের পাঁজরাও পেল একটা।

হাড়ের বোঝা মাথায় নিয়ে জঙ্গলের গাছের ভিড় ঠেলে খোলা জমিতে পা দিতেই মঙ্গলের একেবারে মুখের ওপর এসে ঠেকল ফেনসিক্ত ঘোড়ার মুখ। অশ্বারূঢ় জঙ্গল-দারোগা।

—লাইসেন্স?

হতভম্ব মঙ্গল হাড়ের প্রকাণ্ড বোঝাটা মাথায় নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

—কি রে শ্বশুরকা নাতি? এটা তোর বাপের জঙ্গল?

মঙ্গলকে সদরে চালান করা হল। সপ্তাহ পরে খবর এল, কয়েদ, ছ'মাসের জন্য।

মঙ্গলের কুঁড়ের খুঁটি ধরে টুকিয়া কাঁদল। —বড় বেইজ্জত হল বেচারা। আর হয়তো আসবে না। বয়েই গেল তাতে। ডোমগাঁয়ে কি আর জোয়ান নেই? সূর্য, বংশী, বিদেশী....।

মঙ্গল জেলে। ডোমগাঁয়ের প্রজ্জ্বলিত সামাজিক উষ্মা ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসে। টুকিয়ার পাণিপ্রার্থী ডোমমহলে সুপ্তভরসা আবার চাড়া দিয়ে ওঠে। সাপ সরে গেছে মালঞ্চ ছেড়ে। ফুল ধরতে অনেকগুলো হাত এগিয়ে এল এক সঙ্গে।

এল ওঝার ছেলে সূর্য ডোম। হাসপাতালের টি.বি. ওয়ার্ডের জমাদার। মোড়লের পা টিপে দিয়ে নিবেদন করলো—বাবা, এইবার ব্যাপারটা চুকে যাক্। আর দেরী নয়।

এল মশান মজুর বিদেশী ডোম। মড়ার লেপ-তোষকের তুলো আর নেবানো-চিতের কাঠকয়লা বেচে পয়সা জমেছে কিছু। ঘরে বসে রেজগি-ভরা পেতলের ঘটি ক'টার দিকে তাকায় আর একটি গৃহলক্ষ্মীর জন্যে মন আনচান করে। বুড়োকে এক বোতল বিলিতী মদ প্রণামী দিল। —এইবার মন্তর পড়ে, টুকিয়ার সঙ্গে আমার হাত মিলিয়ে দাও, বাবা।

ময়নাঘরের দারোয়ান বংশী ডোমও এল। কত কচি ছেলেমেয়ে, মাগী-মরদ, ইংরেজ বাঙালীর লাশ পার হয়েছে তার হাত দিয়ে। বেওয়ারিশ লাশের গা থেকে খুলে নেওয়া হাঁসুলি, চুড়ি, তাগা, হার—কত সামগ্রী। জমা হতে হতে তার তামার গাগরিটা প্রায় ভরে এসেছে। সটান বুড়োর পা জড়িয়ে ধরে প্রস্তাব জানাল। —একটু তাড়াতাড়ি কর বাবা।

বুড়ো এলাচিও মর্মে মর্মে বুঝে নিয়েছে যে তার বার্ধক্যের একমাত্র নির্ভর একজন সুযোগ্য জামাই। নইলে, মদের অভাবে তার সুমুখের এই এমন সরস পৃথিবীটা শুকিয়ে গুঁড়ো হয়ে যাবে। কাউকেই হাতছাড়া করতে চায় না বুড়ো। সবাইকে সাগ্রহে আশ্বাস দেয়—সবুর সবুর, সব ঠিক হয়ে যাবে।

মঙ্গলের মুক্তির দিন এগিয়ে এল। ডোমগাঁয়ের প্রসুপ্ত বিক্ষোভ আবার শতশিখায় জ্বলে উঠল। পঞ্চের বড় বৈঠক হবে। চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে এইবার।

এলাচির যুক্তি যেটুকু ছিল তাও এল ঘোলা হয়ে। চোখের সামনে জাত ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে মেয়েটা। তাও কিনা আবার একটা জংলী শেয়ালের সঙ্গে। হায় পরমাত্মা। কোন কাজেই আসবে না। মোড়লীর আসন এবার সত্যিই টলে উঠল।

নেশাতে আজকাল আর সে আমেজ আসে না। মাথায় কেমন জ্বালা ধরে।—ভেজাল মেরেছে শালারা সব। জল মিশিয়েছে। বুড়ো মদের ভাঁড় লাথি মেরে হটিয়ে দেয়।

আগামী পঞ্চের বৈঠকেই হবে তার মৃত্যু। গত্যন্তর নেই। ঘরে একটা চণ্ডা মেয়ে আর বাইরে ক্ষমাহীন পঞ্চ।

এলাচির মনে পড়লো, হিজরে কাশী ডোমের পরামর্শটা। হ্যাঁ, কাশী কথাটা মন্দ বলেনি।

—টুকিয়া, টুকিয়া, টুকিয়া! বুড়ো গলা চিরে ডেকে ডেকে কেঁদে ফেলল। —জাত ছাড়বি তুই?

—হ্যাঁ।

—আমি খাব কি?

—তা আমি কি জানি? মরিস না কেন?

—অবুঝ হোস না বেটি। যদি জাতই ছাড়বি তো জংলীটার জন্যে কেন?

—কার জন্যে ছাড়ি বল্‌তো?

—কাশী একটা খবর দিচ্ছিল। শুনবি? বুড়ো যথাসাধ্য তার গলার স্বর কোমল করে নিয়ে বলল—ব্যানার্জী ডাক্তারের বাড়ী কাজ করবি? টাকা পয়সা ভালই পাবি। সামান্য ঝাড়ু-টাড়ু দিতে হবে।

—ওসব আমি পারব না বুড়া। মঙ্গলের ছেলে রয়েছে আমার পেটে।

আহত নেকড়ের মত বুড়ো বিশ্রী চিৎকার ছাড়ে —কি? কি বললি রে ধর্মহারা মেয়ে?

এবার টুকিয়া হেসে বলল। —নে বুড়ো, খুব হয়েছে, থাম এবার। যত মদ খাবি, যত তামাকু খাবি সব দেব। তোর আর পঞ্চকে অত ভয় করতে হবে না। কিছু ভাবতে হবে না তোকে। ওদের জবাব দিয়ে দে।

—জিতা রহো বেটি। বুড়ো টুকিয়াকে আশীর্বাদ করে। অবসন্ন বুড়ো ক্রমে ঘুমের ঘোরে নেতিয়ে আসে। টুকিয়া এক টুকরো চট পাকিয়ে এলাচির মাথার তলায় গুঁজে দেয়। গামছা দিয়ে বুড়োর গা মুছে হাত পায়ের আঙ্গুল টেনে বাজিয়ে দেয়। —ঘুমো বুড়ো, ঘুমো। দুটো ভাত আর মদ, এই তো? এইটুকু যদি না করতে পারি তবে আমি ডোমিন নই।

টুকিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে। যেন তার চেতনা ছাপিয়ে হঠাৎ জেগে উঠেছে পুরামানবী প্রাণের সেই কঠোর গর্ব।

গাঁয়ের সীমানা ছাড়িয়ে টুকিয়া মাঠের ধারে এসে দাঁড়াল। আজই তো তার খালাস হবার কথা।

সূর্য ডুবেছে অনেকক্ষণ। ধানকাটা ক্ষেত ছেড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে তিতির উড়ে চলেছে। হায় হায়, পলাশতলার কুঁড়েটা একেবারে ধসে গেছে।

মৌরীবনের কিনারায় দাঁড়িয়ে গুল্‌তি ছুঁড়ছে কে? হ্যাঁ, সেই তো।

—আর বসে বসে গুল্‌তি ছুঁড়লে চলবে না। রোজগার করবি তো কর। নইলে আমার আশা ছাড়।

এতদিনের অদেখার পর এই রূঢ় সম্ভাষণ। মঙ্গল টুকিয়ার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো।

—আচ্ছা, ভাবিস না। কাল আমার সঙ্গে শহরে যাবি। হাসপাতালে পাংখা কুলির দরকার।

সদর শহর। জংলীর মুখে শব্দ নেই। সব ঝঞ্ঝাট টুকিয়াকেই একা ভুগতে হল। —যা, ঐ যে বাবুটি বসে আছে দোকানে, তাকে গিয়ে একটা দরখাস্ত লিখে দিতে বল। এমনি করে হাত তুলে আদাব জানাবি।

টুকিয়া সবই শাসিয়ে শিখিয়ে দেয়, মঙ্গল এগিয়ে যায় আর বিমুখ হয়ে ফিরে আসে। —অপদার্থ জংলী কোথাকার? আয় আমার সঙ্গে।

—বাবুজী! ঠোঁট দুটো পাতলা হাসিতে রাঙিয়ে নিয়ে, কালো চোখের তারা দুটো নাচিয়ে বাবুটির প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে টুকিয়া বলে—বাবুজী! একটা দরখাস্ত লিখে দাও।

লেখা দরখাস্তটা নিয়ে টুকিয়া মঙ্গলের হাতে দিল—এই নে, এবার হাসপাতালে চল।

হাসপাতালের কেরানীবাবুর সামনে দরখাস্তটা সঁপে দিয়ে মঙ্গল দাঁড়াল।

—অ্যাঁ, মুণ্ডা? তোম্ মুণ্ডা হ্যায়?

—হুজুর।

—যাও, থানাসে সার্টিফিকেট লে আও। আচ্ছা দাঁড়াও।

টেলিফোনের চোঙটা তুলে নিয়ে কেরানীবাবু ডাকলেন—হ্যালো সাব্ইনস্পেক্টর! একবার রেজিস্টারটা দেখুন তো। নাম মঙ্গল মুণ্ডা; কোন বাজে ক্যারেক্টর কিনা।

—ওরে বাবা। এ যে দেখছি সর্বগুণাধার নরোত্তম। সি ক্লাস দাগী। সাব্ইনস্পেক্টরের প্রত্যুত্তর এল। —বাঘ ভালুকের মতিগতি তবু বোঝা যায় মশাই, কিন্তু এসব জংলী ফংলী....

ফোন নামিয়ে কেরানীবাবু বললেন—এই মঙ্গল মুণ্ডা, কেটে পড় বাবা। তোম দাগী হ্যায়। নোকরি নেহি হোগা।

মঙ্গলের বর্বর মস্তিষ্কে বোধগম্য হল না কিছু। টেলিফোনের চোঙটার দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত শরীর ভয়ে ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল। প্রেতের ভোঁতা মুখের মত ঐ বস্তুটা এখনি এক ফুঁয়ে যেন তার চোখের সব আলোটুকু নিবিয়ে দেবে।

অন্তরালবর্তিনী টুকিয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল। আচমকা এসে রূঢ়দৃষ্টিতে মঙ্গলের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল বাইরে—চল্ বন বিড়ালের বেটা। তোকে আর চাকরি করতে হবে না।

নিঃশঙ্কিনীর প্রত্যেকটি অভিযান নিদারুণ নিষ্ফলতায় একে একে লুটিয়ে পড়ছে ধুলোয়। টুকিয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অনেকক্ষণ কেঁদে গুম হয়ে বসে রইল।

মঙ্গল হঠাৎ টুকিয়ার হাত ধরে বলে উঠল—এবার আমায় ছাড় টুকিয়া। তুই আর কাউকে বিয়ে কর। যাবার আগে তোদের ওঝা আর ঐ কেরানিবাবুটাকে আমি বিঁধে দিয়ে সরে পড়ি।

—না, তোকে যেতে হবে না কোথাও। চল ঘরে, একটা কথা আছে।

বুড়ো এলাচি সগর্বে ও সহুঙ্কারে পঞ্চের হুকুম প্রত্যাখ্যান করেছে। মোড়লের পদ সে পরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছেড়ে দিয়েছে। সে ও তার মেয়ের ওপর পঞ্চের কোন নির্দেশ চলবে না।

ওঝা শাসিয়ে গেছে—এবার ভূত লেলিয়ে তোদের কল্‌জে চুরি করাব।

বুড়ো বেঁচেছে। খুশী হয়ে কন্যাটিকে আশীর্বাদ করে আর দিনরাত স্বচ্ছ সুগন্ধ মদ খায়। কোথা থেকে আসে, কেমন করে আসে, সে খবরে তার তিলমাত্র ঔৎসুক্য নেই।

টুকিয়া আর মঙ্গলের ব্যস্ত সংসারযাত্রা শুরু হয়েছে এদিকে। ভোরে উঠেই মঙ্গল একবোঝা শাল আর নিমের দাঁতন মাথায় নিয়ে শহরে যায়। অত বড় জোয়ানের ঘাড়টাও দাঁতনের ভাড়ে বেঁকে যায়। এর একটু রহস্য আছে। বোঝার ভেতরে প্রচ্ছন্ন থাকে কমপক্ষে দশটি বোতল মদ—বাড়িতে লুকিয়ে চোলাই করা। শহরের একটা আড্ডায় এগুলির গতি করে মঙ্গল ট্যাঁক ভারী করে ফিরে আসে।

সিকি আধুলি টাকা। মঙ্গল জীবনে এই প্রথম নিজ হাতে রূপো ছুঁয়ে দেখলো। অপূর্ব এর স্পর্শসুখ, এ এক ধাতুময়ী মায়া। একটা নতুন নেশা। জংলীও আজকাল গোলাপী গেঞ্জী গায় দেয়। টুকিয়া সাবান দিয়ে গা ধোয় আর চুমকি বসানো কালো কালো শাড়ী পরে।

চন্দ্রগ্রহণের দিন। আজ সন্ধ্যে থেকেই ডোম-গাঁ প্রায় জনশূন্য। সবাই গিয়ে জড়ো হয়েছে শহরে। গ্রহণ লাগলেই গৃহস্থদের ঘরে ঘরে তারা দান কুড়িয়ে ফিরবে।

রাত্রিকালে বুড়ো এলাচিকে খাইয়ে শুইয়ে টুকিয়া মঙ্গলের ঘরে এল। দুজনে একসঙ্গে খেতে বসল—ভাত মাংস মদ। চোলান মদের জ্বালাটা আর গোটা কয়েক বোতল সম্মুখে রাখা। আগামীকালের পণ্যসম্ভার আজ রাত্রেই গুছিয়ে রাখতে হবে।

পাহাড়ী ঝর্ণার মত কল কল করে হেসে টুকিয়া মঙ্গলের মাথা জড়িয়ে ধরে। একান্তভাবে তারই দাক্ষিণ্যের ওপর যাদের নির্ভর, এমন দুজনকে সে দুর্গতির হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছে। ভাঙা সংসারকে সে আবার নিজের মহিমায় জুড়ে দিয়েছে। বুড়ো সুখী, মঙ্গল সুখী, সে সুখী, আরও একজন—সেও আজ তার রক্তের অন্ধকারে সুখসুপ্ত।

মঙ্গল বলে—মাঝে মাঝে আমার ভয় করে রে টুকিয়া। কখন আবার ধরা পড়ে যাই। বাঁচাবি তো?

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ, বাঁচাব।

—তা তুই পারিস। তুই জাদু জানিস টুকিয়া। মঙ্গলের মনের মেঘ কেটে যায়, ও হাসতে থাকে।

—মঙ্গল মুণ্ডা হাজির হ্যায়। ঘরের বাইরে দরজার কাছে কনস্টেবলের গলার হাঁক শোনা গেল। মঙ্গলের চোখ থেকে মুহূর্তপূর্বের নির্ভরতার আভাটুকু নিবে গেল। টুকিয়া মুখে আঙুল ছুঁইয়ে জানিয়ে দিল—চুপ।

দেয়াল ধরে আস্তে আস্তে দাঁড়ালো টুকিয়া। নেশায় পা বেসামাল। বিশ্রস্ত শাড়ীটাকে

একটু গুছিয়ে জড়িয়ে নিয়ে দুয়ার খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালো। কপাটের শেকলটা তুলে দিল।

গ্রহণের অন্ধকারে ছেয়ে রয়েছে পৃথিবী, বাইরের কিছু স্পষ্ট ঠাহর হয় না। টুকিয়া ডাকলো—কে?

—সতের নম্বরের বদমাস মঙ্গল মুণ্ডার ঘর এইটা না?

—হ্যাঁ।

—তুই কে? একজন কনস্টেবল এগিয়ে এসে টুকিয়ার মুখের ওপর লণ্ঠনটা তুলে ধরলো।

—আমি মঙ্গলের জরু।

—মঙ্গলকে বাইরে আসতে বল।

—সে তো ঘরে নেই, শিকারে গেছে।

—বেশ, তাহলে তুই সরে যা, ঘরের ভেতরটা দেখে রিপোর্ট লিখেনি!

—ঘরের ভিতর কেন যাবি? আমি যা বলছি, তোরা তাই লিখে নে।

—ও বুঝেছি। একজন কনস্টেবল পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকতে উদ্যত হল।

টুকিয়া বললো—দাঁড়া সিপাহিজী, একটা কথা আছে। কনস্টেবলটা টুকিয়ার মুখের দিকে জিজ্ঞাসুভাবে তাকিয়ে রইল।

—এঃ, নেশাতে যে একেবারে গলে রয়েছে গো। অপর কনস্টেবলটাও এগিয়ে এল।

চালার খুঁটোতে বিলোল দেহভার দিয়ে চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে রইল টুকিয়া। ঠোঁটে সূক্ষ্ম শ্লেষলিখা, দুর্বোধ্য হাসির একটু ছায়া। বললো—বড় মেহেরবান আপনি সিপাহিজী। গরীবকে একটা বিড়ি খাওয়ান দেখি।

বিশ্লথ শাড়ীর আঁচলটায় হঠাৎ একসঙ্গে দুটো প্রলুব্ধ হাতের ক্রূর আকর্ষণ। টুকিয়া অনুভব করলো শুধু। প্রতিরোধের দুরাশায় তার অবশ হাতটা মাত্র একবার চমকে উঠেই স্থির হয়ে রইল।

ঘরের ভেতর একটা শব্দ। পাথুরে মেজেতে ঠোকর-লাগা শানিত টাঙির হিংস্র নিক্কণ।

টুকিয়া হঠাৎ অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে কনস্টেবল দুজনের হাত দুটো ধরে বললো—শীগ্‌গির চলো এখান থেকে। একটু দূরে, আরো অন্ধকারে।

শান্ত রাত্রির বাতাসে শহরের দিক থেকে ভেসে আসছে ভিক্ষার্থী ডোমদের কলরব। গ্রহণকা দান! গ্রহণকা দান!

গ্রহণ ছেড়ে গেছে অনেকক্ষণ। আবার চঁাদের মুখ খুলেছে। চারদিকে ফুটে উঠেছে নতুন শুক্লিমার স্ফূর্ত শোভা।

একদল বনশুয়োর নামলো আলুর ক্ষেতের ওপর। হুঁস হলো টুকিয়ার। তাড়াতাড়ি নালার জলে স্নান সেরে নিয়ে ক্ষেতের আল ধরে হেঁটে হেঁটে ঘরের দিকে চলল।

ভেজা কাপড়ে আস্তে আস্তে ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখতে পায়, মঙ্গল অঘোরে ঘুমোচ্ছে। টুকিয়া ঠেলে ঠেলে তার ঘুম ভাঙালো।

ফসিল

নেটিভ স্টেট অঞ্জনগড়; আয়তন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে-আটষট্টি বর্গমাইল। তবুও নেটিভ স্টেট, বাঘের বাচ্চা বাঘই। মহারাজ আছেন; ফৌজ, ফৌজদার, সেরেস্তা, নাজারৎ সব আছে। এককুড়ির উপর মহারাজের উপাধি। তিনি ত্রিভুবনপতি; তিনি নরপাল, ধর্মপাল ও অরাতিদমনৎ। চারপুরুষ আগে এ রাজ্যে বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রথায় অপরাধীকে শূলে চড়ানো হতো; এখন সেটা আর সম্ভব নয়। তার বদলে অপরাধীকে শুধু উলঙ্গ করে নিয়ে মৌমাছি লেলিয়ে দেওয়া হয়।

সাবেক কালের কেল্লাটা যদিও লুপ্তশ্রী, তার পাথরের গাঁথুনিটা আজও অটুট। কেল্লার ফটকে বুনো হাতীর জীর্ণ কঙ্কালের মত দুটো মরচে-পড়া কামান। তার নলের ভেতরে পায়রার দল স্বচ্ছন্দে ডিম পাড়ে; তার ছায়ায় বসে ক্লান্ত কুকুরেরা ঝিমোয়। দপ্তরে দপ্তরে শুধু পাগড়ি আর তরবারির ঘটা; দেয়ালে দেয়ালে ঘুঁটের মত তামা আর লোহার ঢাল।

সচিব আছে, সেরেস্তাদারও আছে। ক্ষত্রিয় তিলক আর মোগল তকমার অদ্ভুত মিলন দেখা যায় দপ্তরে। যেন দুই যুগের জাতের আমলাদের যৌথপ্রতিভার সাহায্যে মহারাজা প্রজারঞ্জন করেন। সেই অপূর্ব অদ্ভুত শাসনের তাপে উত্যক্ত হয়ে রাজ্যের অর্ধেক প্রজা সরে পড়েছে দূর মরিসাসের চিনির কারখানায় কুলির কাজ নিয়ে।

সাড়ে-আটষট্টি বর্গমাইল অঞ্জনগড়—শুধু ঘোড়ানিম আর ফণীমনসায় ছাওয়া রুক্ষ কাঁকরে মাটির ডাঙা নেড়া নেড়া পাহাড়। কুর্মি আর ভীলেরা দু'ক্রোশ দূরের পাহাড়ের গায়ে লুকানো জলকুণ্ড থেকে মোষের চামড়ার থলিতে জল ভরে আনে—জমিতে সেচ দেয়—ভুট্টা যব আর জনার ফলায়।

প্রত্যেক বছর স্টেটের তসিল বিভাগ আর ভীল ও কুর্মি প্রজাদের মধ্যে একটা সংঘর্ষ বাধে। চাষীরা রাজভাণ্ডারের জন্য ফসল ছাড়তে চায় না। কিন্তু অর্ধেক ফসল দিতেই হবে। মহারাজার সুগঠিত পোলো টীম আছে। হয়শ্রেষ্ঠ শতাধিক ওয়েলারের হ্রেষারবে রাজ-আস্তাবল সতত মুখরিত। সিডনির নেটিভ এই দেবতুল্য জীবগুলির ওপর মহারাজার অপার ভক্তি। তাদের তো আর খোল ভুষি খাওয়ানো চলে না। ভুট্টা, যব জনার চাই-ই।

তসিলদার অগত্যা সেপাই ডাকে। রাজপুত বীরের বল্লম আর লাঠির মারে ক্ষাত্রবীর্যের স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি হয়। এক ঘন্টার মধ্যে সব প্রতিবাদ স্তব্ধ, সব বিদ্রোহ প্রশমিত হয়ে যায়।

পরাজিত ভীলদের অপরিমেয় জংলী সহিষ্ণুতাও ভেঙে পড়ে। তারা দলে দলে রাজ্য

ছেড়ে গিয়ে ভর্তি হয় সোজা কোন ধাঙর-রিক্রুটারের ক্যাম্পে। মেয়ে মরদ শিশু নিয়ে কেউ যায় নিউদিল্লী, কেউ কলকাতা, কেউ শিলং। ভীলেরা ভুলেও আর ফিরে আসে না।

শুধু নড়তে চায় না কুর্মি প্রজারা। এ-রাজ্যে তাদের সাতপুরুষের বাস। ঘোড়ানিমের ছায়ায় ছায়ায় ছোট বড় এমন ঠাণ্ডা মাটির ডাঙা, কালমেঘ আর অনন্তমূলের চারার এক একটা ঝোপ; সালসার মত সুগন্ধ মাটিতে। তাদের যে নাড়ীর টানে বেঁধে রেখেছে এই মাটি। বেহায়ার মত চাষ করে, বিদ্রোহ করে আর মারও খায়—ঋতুচক্রের মত এই ত্রিদশার আবর্তনে তাদের দিনসন্ধ্যার সমস্ত মুহূর্তগুলি ঘুরপাক খায়। এদিক ওদিক হবার উপায় নেই।

তবে অঞ্জনগড় থেকে দয়াধর্ম একেবারে নির্বাসিত নয়। প্রতি রবিবারে কেল্লার সামনে সুপ্রশস্ত চবুতরায় হাজারের ওপর দুঃস্থ জমায়েত হয়। দরবার থেকে বিতরণ করা হয় চিঁড়ে আর গুড়। সংক্রান্তির দিনে মহারাজা গায়ে আলপনা আঁকা হাতির পিঠে চড়ে আর জুলুস নিয়ে পথে বার হন—প্রজাদের আশীর্বাদ করতে। তার জন্মদিনের কেল্লার আঙিনায় রামলীলা গান হয়—প্রজারা নিমন্ত্রণ পায়। তবে অতিরিক্ত ক্ষত্রিয়ত্বের প্রকোপে যা হয়—সব ব্যাপারেই লাঠি। যেখানে জনতা আর জয়ধ্বনি, সেখানে লাঠি চলবেই আর দু'চারটে অভাগার মাথা ফাটবেই। চিঁড়ে আশীর্বাদ বা রামলীলা —সবই লাঠির সহযোগে পরিবেশন করা হয়; প্রজারা সেইভাবেই উপভোগ করতে অভ্যস্ত।

লাঠিতন্ত্রের দাপটে স্টেটের শাসন আদায় উসুল আর তসীল চলছিল বটে, কিন্তু যেটুকু হচ্ছিল, তাতে গদির গৌরব অটুট রাখা যায় না। নরেন্দ্রমণ্ডলের চাঁদা আর পোলো টিমের খরচ! রাজবাড়ির সিন্দুকের রূপো আর সোনার গাদিতে হাত দিতে হয়। আর, সিন্দুকও খালি হতে থাকে।

অঞ্জনগড়ের এই উদ্বিগ্ন অদৃষ্টের সন্ধিক্ষণে দরবারের ল-এজেন্ট পদে নিযুক্ত হয়ে এল একজন ইংরেজী আইননবিস উপদেষ্টা। আমাদের মুখার্জীই এল ল-এজেন্ট হয়ে। মুখার্জীর চওড়া বুক—যেমন পোলো ম্যাচে তেমনি স্টেটের কাজে অচিরে মহারাজার বড় সহায় হয়ে দাঁড়ালো। ক্রমে মুখার্জীই হয়ে গেল ডি ফ্যাক্টো সচিবোত্তম, আর সচিবোত্তম রইলেন শুধু সই করতে।

আমাদের মুখার্জী আদর্শবাদী। ছেলেবেলার ইতিহাস-পড়া ডেমোক্রেসীর স্বপ্নটা আজও তার চিন্তার পাকে পাকে জড়িয়ে আছে। বয়সে অপ্রবীণ হলেও সে অত্যন্ত শান্তবুদ্ধি। সে বিশ্বাস করে—যে সৎসাহসী সে কখনো পরাজিত হয় না, যে কল্যাণবৎ তার কখনো দুর্গতি হতে পারে না।

মুখার্জী তার প্রতিভার প্রতিটি পরমাণু উজাড় করে দিল স্টেটের উন্নতির সাধনায়। অঞ্জনগড়ের আবালবৃদ্ধ চিনে ফেলল তাদের এজেন্ট সাহেবকে, একদিকে যেমন কট্টর অন্য দিকে তেমনি হামদরদ। প্রজারা ভয় পায়, ভক্তিও করে। মুখার্জীর নির্দেশে বন্ধ

হলো লাঠিবাজী। সমস্ত দপ্তর চুলচেরা অডিট করে তোলপাড় করা হলো। স্টেটের জরীপ হলো নতুন করে; সেন্সাস নেওয়া হলো। এমন কি মরচে পড়া কামান দুটোকেও পালিস দিয়ে চকচকে করে ফেলা হলো।

ল-এজেন্ট মুখার্জীই একদিন আবিষ্কার করল অঞ্জনগড়ের অন্তর্ভৌম সম্পদ। কলকাতা থেকে জিওলজিস্ট আনিয়ে সার্ভে ও সন্ধান করিয়ে একদিন বুঝতে পারে মুখার্জী—এই অঞ্জনগড় রত্ন, এর গ্রানিটে গড়া পাঁজরের ভাঁজে ভাঁজে অভ্র আর অ্যাসবেস্টসের স্তূপ। কলকাতার মার্চেন্টদের ডাকিয়ে ঐ কাঁকুরে মাটির ডাঙ্গাগুলিই লাখ লাখ টাকায় ইজারা করিয়ে দিল। অঞ্জনগড়ের শ্রী গেল ফিরে।

আজ কেল্লার এক পাশে গড়ে উঠেছে সুবিরাট গোয়ালিয়রী স্টাইলের প্যালেস। মার্বেল, মোজেয়িক, কংক্রীট আর ভেনিসিয়ান সার্সীর বিচিত্র পরিসজ্জা। সরকারী গ্যারেজে দামী দামী জার্মান লিমুজিন সিডার আর টুরার। আস্তাবলে নতুন আমদানী আইরিশ পনির অবিরাম লাথালাথি। প্রকাণ্ড একটা বিদ্যুতের পাওয়ার হাউস —দিবারাত্র ধক্ ধক্ শব্দে অঞ্জনগড়ের নতুন চেতনা আর পরমায়ু ঘোষণা করে।

সত্যই নতুন প্রাণের জোয়ার এসেছে অঞ্জনগড়ে। মার্চেন্টরা একজোট হয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে—মাইনিং সিণ্ডিকেট। খনি অঞ্চলে ধীরে গড়ে উঠেছে খোয়াবাঁধানো বড় বড় সড়ক, কুলির ধাওড়া, পাম্প-বসান ইঁদারা, ক্লাব, বাংলো, কেয়ারী-করা ফুলের বাগিচা আর জিমখানা। কুর্মি কুলিরা দলে দলে ধাওড়া জাঁকিয়ে বসেছে। নগদ মজুরী পায়, মুরগি বলি দেয়, হাঁড়িয়া খায় আর নিত্য সন্ধ্যায় মাদক ঢোলক পিটিয়ে খনি অঞ্চল সরগরম করে রাখে।

মহারাজ এইবার প্ল্যান আঁটছেন—দুটো নতুন পোলো গ্রাউন্ড তৈরি করতে হবে; আরো বাইশ বিঘা জমি যোগ করে প্যালেসের বাগানটাকে বাড়াতে হবে। নহবতের জন্য একজন মাইনে-করা ইটালীয়ান ব্যাণ্ডমাস্টার হলেই ভাল।

অঞ্জনগড়ের মানচিত্রটা টেবিলের ওপর ছড়িয়ে মুখার্জী বিভোর হয়ে ভাবে, তার ইরিগেশন স্কীমটার কথা। উত্তর থেকে দক্ষিণ সমান্তরাল দশটা ক্যানেল। মাঝে মাঝে খিলান-করা কড়া-গাঁথুনির শ্লুস-বসানো বড় বড় ড্যাম। অঞ্জনা নদীর সমস্ত জলের ঢলটা কায়দা করে অঞ্জনগড়ের পাথুরে বুকের ভেতর চালিয়ে দিতে হবে—রক্তবাহী শিরার মত।.প্রত্যেক কুর্মি প্রজাকে মাথা পিছু এক বিঘা জমি দিতে হবে বিনা সেলামিতে, আর পাঁচ বছরের মত বিনা খাজনায়। আউশ আর আমন; তা ছাড়া একটা রবি। বছরে এই তিন কিস্তি ফসল তুলতেই হবে। উত্তরের প্লটের সমস্তটাই নার্সারী, আলু আর তামাক; দক্ষিণেরটায় আখ, যব আর গম। তারপর—

তারপর ধীরে একটা ব্যাঙ্ক, ক্রমে একটা ট্যানারী আর কাগজের মিল। রাজকোষের সে অকিঞ্চনতা আর নেই। এই তো শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ! শিল্পীর তুলির আঁচড়ের মত এক একটি এস্টিমেটে সে অঞ্জনগড়ের রূপ ফিরিয়ে দেবে। সে দেখিয়ে দেবে—রাজ্যশাসন লাঠিবাজি নয়, এও একটা আর্ট।

একটা স্কুল, এইটাতে মহারাজার স্পষ্ট জবাব, কভি নেহি। মুখার্জী উঠলো; দেখা যাক; বুঝিয়ে বাগিয়ে মহারাজার আপত্তি টলাতে পারে কিনা।

মহারাজা তাঁর গালপাট্টা দাড়ির গোছাটাকে একটা নির্মম মোচড় দিয়ে মুখার্জীর সামনে এগিয়ে দিলেন দুটো কাগজ—এই দেখ।

প্রথম পত্র—প্রবলপ্রতাপ দরবার আর দরবারের ঈশ্বর মহারাজ! আপনি প্রজার বাপ। আপনি দেন বলেই আমরা খাই। অতএব এ বছর ভূট্টা জনার যা ফলবে, তার উপর যেন তসিলদারের জুলুম না হয়। আমরা নগদ টাকায় খাজনা দেব। আইনসঙ্গতভাবে সরকারকে যা দেয়, তা আমরা দেব ও রসিদ নেব। ইতি দরবারের অনুগত ভৃত্য : কুর্মি সমাজের তরফে দুলাল মাহাতো, বকলম খাস।

দ্বিতীয় পত্র—মহারাজার পেয়াদা এসে আমাদের খনির ভেতর ঢুকে চারজন কুর্মি কুলিকে ধরে নিয়ে গেছে আর তাদের স্ত্রীদের লাঠি দিয়ে মেরেছে। আমরা একে অধিকারবিরুদ্ধ মনে করি এবং দাবী করি, মহারাজার পক্ষ থেকে শীঘ্রই এ-ব্যাপারের সুমীমাংসা হবে। ইতি সিণ্ডিকেটের চেয়ারম্যান, গিবসন।

মহারাজা বললেন—দেখছ তো মুখার্জী, শালাদের হিম্মৎ।

—হ্যাঁ দেখছি।

টেবিলে ঘুষি মেরে বিকট চিৎকার করে অরাতিদমন প্রায় ফেটে পড়লেন—মুড়ো, শালাদের মুড়ো কেটে এনে ছড়িয়ে দাও আমার সামনে। আমি বসে বসে দেখি ; দুদিন দু'রাত ধরে দেখি।

মুখার্জী মহারাজাকে শান্ত করে—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি একবার ভেতরে ভেতরে অনুসন্ধান করি, আসল ব্যাপার কি।

বৃদ্ধ দুলাল মাহাতো বহুদিন পরে মরিসাস থেকে অঞ্জনগড়ে ফিরেছে। বাকী জীবনটা উপভোগ করার জন্য সঙ্গে নগদ সাতটি টাকা এবং বুকভরা হাঁপানি নিয়ে ফিরেছে। তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কুর্মিদের জীবনেও যেন একটা চঞ্চলতা—একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে।

কুর্মিরা দুলালের কাছে শিখেছে—নগদ মজুরী কি জিনিস। ফয়জাবাদ স্টেশনে কোন বাবুসাহেবের একটা দশসেরী বোঝা ট্রেনের কামরায় তুলে দাও। বাস—নগদ একটি আনা হাতে হাতে!

দুলাল বলেছে—ভাইসব, এই বুড়োর মাথায় য'টা সাদা চুল দেখছ, ঠিক ততবার সে বিশ্বাস করে ঠকেছে। এবার আর কাউকে বিশ্বাস নয়। সব নগদ নগদ। এক হাতে নেবে তবে অন্য হাতে সেলাম করবে।

সিণ্ডিকেটের সাহেবদের সঙ্গে দুলাল সমানে কথা চালায়। কুলিদের মজুরীর রেট, হপ্তা পেমেন্ট ছুটি, ভাতা আর ওষুধের ব্যবস্থা—এ সব সে-ই কুর্মিদের মুখপাত্র হয়ে আলোচনা করেছে; পাকা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে। সিণ্ডিকেটও দুলালকে উঠতে

বসতে তোয়াজ করে—চলে এস দুলাল। বল তো রাতারাতি বিশ ডজন ধাওড়া করে দি। তোমার সব কুর্মিদের ভর্তি করে নেব।

দুলাল জবাব দেয়—আচ্ছা, সে হবে। তবে আপাতত কুলি পিছু কিছু কয়লা আর কেরোসিন তেল মুফতি দেবার অর্ডার হোক।

— আচ্ছা তাই হবে। সিণ্ডিকেটের সাহেবরা তাকে কথা দেয়।

দুলালের আমন্ত্রণ পেয়ে একদিন রাজ্যের কুর্মি একত্রিত হলো ঘোড়ানিমের জঙ্গলে। পাকাচুলে ভরা মাথা থেকে পাগড়িটা খুলে হাতে নিয়ে দুলাল দাঁড়ালো—আজ আমাদের মণ্ডলের প্রতিষ্ঠা হলো। এখন ভাবো কি করা উচিত। চিনে দেখ, কে আমাদের দুশমন আর কেই বা দোস্ত। আর ভয় করলে চলবে না। পেট আর ইজ্জত, এর ওপর যে ছুরি চালাতে আসবে, তাকে কোন মতেই ক্ষমা নয়।

ভাঙা শঙ্খের মত দুলালের স্থবির কণ্ঠনালীটা অতিরিক্ত উৎসাহে কেঁপে কেঁপে আওয়াজ ছাড়ে—ভাই সব, আজ থেকে এ মাহাতোর প্রাণ মণ্ডলের জন্য, আর মণ্ডলের প্রাণ....।

কুর্মি জনতা একসঙ্গে হাজার লাঠি তুলে প্রত্যুত্তর দিল—মাহাতোর জন্য।

ঢাক ঢোল পিটিয়ে একটা নিশান পর্যন্ত উড়িয়ে দিল তারা। তারপর যে যার ঘরে ফিরে গেল।

ঘটনাটি যতই গোপনে ঘটুক না কেন, মুখার্জীর কিছু জানতে বাকি রইল না। এটুকু সে বুঝল—এই মেঘেই বজ্র থাকে। সময় থাকতে চটপট একটা ব্যবস্থা দরকার। কিন্তু মহারাজ যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পান। ফিউডল দেমাকে অন্ধ আর ইজ্জত কমপ্লেক্সে জর্জর এই সব নরপালদের তা হলে সামলানো দুষ্কর হবে। বৃথা একটা রক্তপাতও হয়তো হয়ে যাবে। তার চেয়ে নিজেই একহাত ভদ্রভাবে লড়ে নেওয়া যাক।

পেয়াদারা এসে মহারাজাকে জানালো—কুর্মিরা রাজবাড়ির বাগানে আর পোলো লনে বেগার খাটতে এল না। তারা বলছে—বিনা মজুরিতে খাটলে পাপ হবে; রাজ্যের অমঙ্গল হবে।

ডাক পড়ল মুখার্জীর। দুলাল মাহাতোকে তলব করা হলো। জোড় হাতে দুলাল মাহাতো প্রণিপাত করে দাঁড়ালো। মেষশিশুর মত ভীরু, দুলাল যেন ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে।

—তুমিই এসব শয়তানী করছ? মহারাজ বললেন।

—হুজুরের জুতোর ধুলো আমি।

—চুপ থাক।

—জী সরকার।

—চুপ! মহারাজ জীমূতধ্বনি করলেন। দুলাল কাঠের পুতুলের মত স্থির হয়ে গেল।

মহারাজ বলেন—বিলাতী বেনিয়াদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ছাড়তে হবে। আমার বিনা হুকুমে কোন কুর্মি খনিতে কুলি খাটতে পারবে না।

—জী সরকার। আপনার হুকুম আমার জাতকে জানিয়ে দেবো।

—যাও।

দুলাল দণ্ডবৎ করে চলে গেল। এবার আদেশ হলো মুখার্জীর ওপর। সিণ্ডিকেটকে এখুনি নোটিস দাও, যেন আমার বিনা সুপারিশে আমার কোন কুর্মি প্রজাকে কুলির কাজে ভর্তি না করে।

অবিলম্বে যথাস্থান থেকে উত্তর এল একে একে। দুলাল মাহাতোর স্বাক্ষরিত পত্র। যেহেতু আমরা নগদ মজুরি পাই, না পেলে আমাদের পেট চলবে না, সেই হেতু আমরা খনি সাহেবদের কথা মানতে বাধ্য। আশা করি দরবার এতে বাধা দেবেন না। ...আগামী মাসে আমাদের নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে। রাজ তহবিল থেকে এক হাজার টাকা মঞ্জুর করতে সরকারের হুকুম হয়। ....আগামী শীতের সময়ে বিনা টিকিটে জঙ্গলের ঝুরি আর লকড়ি ব্যবহার করার অনুমতি হয়।

নোটিসের প্রত্যুত্তরে সিণ্ডিকেটেরও একটা জবাব এল—মহারাজার সঙ্গে কোন নতুন শর্তে চুক্তিবদ্ধ হতে আমরা রাজি আছি। তবে আজ নয়। বর্তমান চুক্তির মেয়াদ যখন ফুরোবে—নিরানব্বই বছর পরে।

—কী রকম বুঝছ মুখার্জী? অগত্যা দেখছি ফৌজদারকেই ডাকতে হয়। জিজ্ঞাসা করি, খাল-কাটার স্বপ্নটা ছেড়ে দিয়ে এখন আমার ইজ্জতের কথাটা একবার ভাববে কি না?

মহারাজ আস্তে আস্তে বললেন বটে, কিন্তু মুখ-চোখের চেহারা থেকে বোঝা গেল, একটা আক্রোশ শত ফণা বিস্তার করে তাঁর মনের ভেতর ফুঁসে ফুঁসে ছটফট করছে।

মুখার্জী সবিনয়ে নিবেদন করে—মন খারাপ করবেন না সরকার। আমাকে সময় দিন, সব গুছিয়ে আনছি আমি।

মুখার্জী বুঝেছে দুলালের এই দুঃসাহসের প্রেরণা যোগাচ্ছে কারা। সিণ্ডিকেটের দুষ্ট উৎসাহেই কুর্মিসমাজের এই নাচানাচি। এই অশুভযোগ ছিন্ন না করে দিলে রাজ্যের সমূহ অশান্তি—অমঙ্গলও। কিন্তু কি করা যায়?

দুলাল মাহাতোর কুঁড়ের কাছে মুখার্জী এসে দাঁড়ালো। দুলাল ব্যস্তভাবে বের হয়ে এসে একটা চৌকি এনে মুখার্জীকে বসতে দিল। মাথার পাগড়িটা খুলে মুখার্জীর পায়ের কাছে রেখে দুলালও বসলো মাটির ওপর। মুখার্জী এক এক করে তাকে সব বুঝিয়ে বলে। যেন একটা অভিমানের সুরে মুখার্জীর গলার স্বর ভেঙে পড়ে—একি করছো মাহাতো। দরবারের ছেলে তোমরা, কখনো ছেলে দোষ করে কখনো বাপ। তাই বলে পরকে ডেকে কেউ ঘরের ইজ্জত নষ্ট করে না। সিণ্ডিকেট আজ তোমাদের ভাল খাওয়াচ্ছে, কিন্তু কাল যখন তার কাজ ফুরোবে, তখন তোমাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। এই দরবারই তখন দুমুঠো চিঁড়ে দিয়ে তোমাদের বাঁচাবে।

মুখার্জীর পায়ে হাত রেখে দুলাল বলে—কসম, এজেন্ট বাবা, তোমার কথা রাখব।

বাপের তুল্য মহারাজা, তাঁর জন্য আমরা জান দিতে তৈরি। তবে ঐ দরখাস্তটা একটু জলদি জলদি মঞ্জুর হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন বা উত্তরের অপেক্ষা না করে মুখার্জী দুলালের কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে পড়ে—নাঃ, রোগে তো ধরেই ছিল অনেকদিন; এবার দেখা দিয়েছে বিকারের লক্ষণ।

স্নান আহার আর পোশাক বদলাবার কথা মুখার্জীকে ভুলতে হলো আজ। একটানা ড্রাইভ করে থামলো এসে সিণ্ডিকেটের অফিসে।

—দেখুন মিস্টার গিবসন, রাজা-প্রজা সম্পর্কের ভেতর দয়া করে হস্তক্ষেপ করবেন না আপনারা। আপনাদের কারবারের জন্য যে-কোন সুবিধা দরবারের কাছে আবেদন করলেই তো পেয়ে যাবেন।

গিবসন বললেন—মিস্টার মুখার্জী, আমরা মানিমেকার নেই, আমাদের একটা মিশনও আছে। নির্যাতিত মানুষের পক্ষ নিয়ে আমরা চিরকাল লড়ে এসেছি। দরকার থাকে, আরো লড়বো।

—সব কুর্মি প্রজাদের লোভ দেখিয়ে আপনারা কুলি করে ফেলছেন। স্টেটের এগ্রিকালচার তাহলে কি করে বাঁচে বলুন তো!

ঝোঁকের মাথায় মুখার্জী তার ক্ষোভের আসল কারণটি ব্যক্ত করে ফেললো।

—এগ্রিকালচার না বাঁচুক, ওয়েল্‌থ্‌ তো বাঁচছে। এটা অস্বীকার করতে পারেন? গিবসন বিদ্রূপের স্বরে উত্তর দেয়।

—তর্ক ছেড়ে কো-অপারেশনের কথা ভাবুন, মিস্টার গিবসন। কুলি ভর্তির সময় দরবার থেকে একটু অনুমোদন করিয়ে নেবেন, এই মাত্র। মহারাজাও খুশি হবেন এবং তাতে আপনাদেরও অন্য দিকে নিশ্চয় ভাল হবে।

—সরি মিস্টার মুখার্জী! গিবসন বাঁকা হাসি হেসে চুরুট ধরালেন।

নিদারুণ বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠল মুখার্জীর কর্ণমূল। সজোরে চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে দাঁড়ায় মুখার্জী। আর সেই মুহূর্তে অফিস ছেড়ে চলে যায়।

ম্যাককেনা এসে জিজ্ঞাসা করলেন—কি ব্যাপার গিবসন?

—মুখার্জী, দ্যাট মংকি অব অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, ওকে মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়েছি। কোন টার্মই গ্রাহ্য করিনি।

—ঠিক করেছ। শুনেছ তো ওর ঐ ইরিগেশন স্কিমটার কথা? সময় থাকতে ওই স্কিম ভণ্ডুল করে দিতে হবে, নইলে সাংঘাতিক লেবারের অভাবে পড়তে হবে। কারবার এখন বাড়তির মুখে, খুব সাবধান।

—কোন চিন্তা নেই। পোষা বিড়াল মাহাতো রয়েছে আমাদের হাতে। ওকে দিয়েই স্টেটের সব ডিজাইন ভণ্ডুল করবো।

পরস্পর হাস্য বিনিময় করে ম্যাককেনা বলেন—মাহাতো এসে বসে আছে যে; ওকে ডেকে নিয়ে এস, আর সেই কাজটা এবার সেরেই ফেল।

সিণ্ডিকেটের অফিসের পিছনের দরজার কাছে বসে ছিল মাহাতো। অফিসের একটা নিভৃত কামরায় মাহাতোকে নিয়ে গিয়ে গিবসন বলে—এই যে, দরখাস্ত তৈরি। সব কথা লেখা আছে এতে। সই করে ফেল; আজই দিল্লীর ডাকে পাঠিয়ে দেব।

সই করে মাহাতো। মাহাতার পিঠ থাবড়ে ম্যাককেনা তাকে বিদায় দিল—ডরো মৎ মাহাতো, আমরা আছি। যদি ভিটে-মাটি উৎখাত করে, তবে আমাদের ধাওড়া খোলা থাকবে তোমাদের জন্য সব সময়, ডরো মৎ।

নিজের দপ্তরে বসে মুখার্জী শুধু আকাশপাতাল ভাবে। কলম ধরতে আর মন চায় না। মহারাজাকে আশ্বাস দেবার মত সব কথা ফুরিয়ে গেছে তার। পরের রথের সারথী হওয়া আর বোধহয় চলবে না তার দ্বারা। এইবার রথীর হাতেই তুলে দিতে হবে লাগাম। কিন্তু মানুষগুলির মাথার ঘিলু নিশ্চয়ই শুকিয়ে গেছে সব। সবাই নিজের নিজের মূঢ়তায়—একটা আত্মবিনাশের উৎকট কল্পনাতাণ্ডবে মজে আছে যেন। কিংবা সেই ভুল করেছে কোথাও।

মহারাজার আহ্বান, খাস কামরায়।

সচিবোত্তম ও ফৌজদার শুষ্কমুখে বসে আছেন। মহারাজা কৌচের চারিদিক পায়চারি করছেন ছটফট করে। মুখার্জী ঢুকতেই একেবারে অগ্ন্যুৎগার করলেন।

—নাও, এবার গদিতে থুথু ফেলে আমি চললাম। তুমিই বসো তার ওপর আর স্টেট চালিও।

হতভম্ব মুখার্জী সচিবোত্তমের দিকে তাকায়। মুখার্জীর হাতে সচিবোত্তম তখুনি তুলে দিলেন একটি চিঠি। পলিটিক্যাল এজেন্টের নোট।—স্টেটের ইন্টার্নাল ব্যাপার সম্বন্ধে বহু অভিযোগ এসেছে। দিন দিন আরো নতুন ও গুরুতর অভিযোগ সব আসছে। আমার হস্তক্ষেপের পূর্বে আশা করি, দরবার শীঘ্রই সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবে।

ফৌজদার একটু ভ্রূকুটি করে বলেন—এই সবের জন্য আপনার কনসিলিয়েশন পলিসিই দায়ী, এজেন্ট সাহেব।

ফৌজদারের অভিযোগের সূত্র ধরে মহারাজা চীৎকার করে উঠলেন—নিশ্চয়, খুব সত্যি কথা। আমি সব জানি মুখার্জী। আমি অন্ধ নই।

—সব জানি? এ কি বলছেন সরকার?

—থামো, সব জানি। নইলে আমার রাজ্যের ধূলোমাটি বেচে যে বেনিয়ারা পেট চালায়, তাদের এত সাহস হয় কোথা থেকে! কে তাদের ভেতর ভেতর সাহস দেয়?

মহারাজা যেন দমবন্ধ করে কৌচের উপর এলিয়ে পড়লেন। একটা পেয়াদা ব্যস্তভাবে ব্যঞ্জন করে তাঁকে সুস্থ করতে থাকে। সচিবোত্তম ফৌজদার আর মুখার্জী, ভিন্ন ভিন্ন দিকে মুখ ফিরিয়ে বোবা হয়ে বসে রইল।

গলা ছেড়ে নিয়ে মহারাজা আবার কথা পাড়লেন—ফৌজদার সাহেব, এবার আপনিই আমার ইজ্জত বাঁচান।

সচিবোত্তম বলেন—তাই হোক্, কুর্মিদের আপনি সায়েস্তা করুন ফৌজদার সাহেব,

আর আমি সিণ্ডিকেটকে একটা সিভিল সুটে ফাঁসাচ্ছি। চেষ্টা করলে কন্ট্রাক্টের মধ্যে এমন বহু ফাঁক পাওয়া যাবে।

মহারাজা মুখার্জীর দিকে চকিতে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। কিন্তু মুখার্জী এরই মধ্যে দেখে ফেলেছে, মহারাজার চোখ দুটো ভেজা ভেজা।

সিংহের চোখে জল। এর পেছনে কতখানি অন্তর্দাহ লুকিয়ে আছে, তা স্বভাবত শশক হলেও মুখার্জী আন্দাজ করে নিতে পারে। সত্যিই তো, এ দিকটা তার এতদিন চোখে পড়েনি। তার ভুল হয়েছে। মহারাজার সামনে এগিয়ে গিয়ে সে শান্তভাবে তার শেষ কথাটা জানালো।—আমার ভুল হয়েছে সরকার। এবার আমায় ছুটি দিন। তবে আমায় যদি কখনো ডাকেন, আমি আসবই।

মহারাজা মুহূর্তের মধ্যে একেবারে নরম হয়ে গেলেন—না, না মুখার্জী, কি যে বলো! তুমি আবার যাবে কোথায়? অনেকে অনেক কিছু বলছে বটে, কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। তবে পলিসি বদলাতেই হবে; একটু কড়া হতে হবে। ব্যাঙের লাথি আর সহ্য হয় না, মুখার্জী।

শীতের মরা মেঘের মত একটা রিক্ততা, একটা ক্লান্তি যেন মুখার্জীর হাত পায়ের গাঁটগুলোকে শিথিল করে দিয়েছে। দপ্তরে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। সে শুধু বিকেল হলে, ব্রিচেস চড়িয়ে বয়ের কাঁধে দু'ডজন ম্যালেট চাপিয়ে পোলো লনে উপস্থিত হয়। সমস্তটা সময় পুরো গ্যালপে ক্ষ্যাপা ঝড়ের মত খেলে যায়। ডাইনে বাঁয়ে বেপরোয়া আণ্ডার-নেক হিট চালায়। কড় কড় করে একটা ম্যালেট ভেঙে উড়ে যায় ফালি হয়ে। মুখের ফেনা আর গায়ের ঘামের স্রোতে ভিজে ঢোল হয়ে যায় কালো ওয়েলারের পায়ের ফ্লানেল। তবু স্কোরের নেশায় পাগল হয়ে মুখার্জী চার্জ করে। বিপক্ষদল ভ্যাবাচাকা খেয়ে অতি মন্থর ট্রটে ঘুরে ঘুরে আত্মরক্ষা করে। চক্কর শেষ হবার পরেও বিশ্রাম করার নাম করে না মুখার্জী। ক্যান্টারে ঘোড়া ছুটিয়ে সারা পোলো লনটাকে বিদ্যুৎবেগে পাক দিয়ে বেড়াতে থাকে। রেকাবে ভর দিয়ে মাঝে মাঝে চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে থাকে—বুক ভ'রে যেন স্পীড পান করে।

খেলা শেষে মহারাজা অনুযোগ করেন—বড় রাফ খেলা খেলছো মুখার্জী।

সেদিনও সন্ধ্যের আগে নিয়মিত সূর্যাস্ত হলো অঞ্জনগড়ের পাহাড়ের আড়ালে। মহারাজা সাজগোজ করে খেলার মাঠে যাবার উদ্যোগ করছেন। পেয়াদা একটা খবর নিয়ে এল—চৌদ্দ নম্বরের পীট ধসেছে, এখনো ধসছে। নব্বই জন পুরুষ আর মেয়ে কুর্মি কুলি চাপা পড়েছে।

—অতি সুসংবাদ। মহারাজা গালপাট্টায় হাত বুলিয়ে উৎকট আনন্দের বিস্ফোরণে চেঁচিয়ে উঠলেন। —সচিবোত্তম কোথায়? কোই হ্যায়? শীগগির ডাক, সিণ্ডিকেটের দেমাক এইবার গুঁড়ো করবো।

—হুকুম করুন সরকার; একজন চাপরাশি এসে কাছে দাঁড়ায়।

চেঁচিয়ে ওঠেন মহারাজা। —সচিবোত্তম, তার মানে আমাদের বুড়ো দেওয়ান সাহেব, তাঁকে শীগগির একবার ডাক। সিণ্ডিকেটের দেমাক এইবার গুঁড়ো করবো।

সচিবোত্তম এলেন, কিন্তু মরা কাতলা মাছের মত দৃষ্টি তাঁর চোখে। বললেন—দুঃসংবাদ।

—কিসের দুঃসংবাদ?

—বিনা টিকিটে কুর্মিরা লকড়ি কাটছিল। ফরেস্ট রেঞ্জার বাধা দেয়। তাতে রেঞ্জার আর গার্ডদের কুর্মিরা মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে।

—তারপর? —মহারাজার চোয়াল দুটো কড় কড় করে বেজে উঠল।

—তারপর ফৌজদার গিয়ে গুলি চালিয়েছে। ছর্‌রা ব্যবহার করলেই ভাল ছিল। তা না করে চালিয়েছে মুঙ্গেরী গাদা আর দেড় ছটাকী বুলেট। মরেছে বাইশ জন আর ঘায়েল পঞ্চাশের ওপর। ঘোড়ানিমের জঙ্গলে সব লাশ এখনো ছড়িয়ে পড়ে আছে।

মহারাজা বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তাঁর চোখের সামনে পলিটিক্যাল এজেন্টের নোটটা যেন চকচকে সুচীমুখ বর্শার ফলার মত ভেসে বেড়াতে থাকে।

—খবরটা কি রাষ্ট্র হয়ে গেছে?

—অন্তত সিণ্ডিকেট তো জেনে ফেলেছে। —সচিবোত্তম উত্তর দিলেন।

মুখার্জিকে ডাকলেন মহারাজা। —এই তো ব্যাপার মুখার্জি। এইবার তোমার বাঙালী ইলম্ দেখাও; একটা রাস্তা বাতলাও।

একটু ভেবে নিয়ে মুখার্জী বলে—আর দেরী করবেন না। সব ছেড়ে দিয়ে মাহাতোকে আগে আটক করে ফেলুন।

জন পঞ্চাশ পেয়াদা সড়কি লাঠি লণ্ঠন নিয়ে অন্ধকারে দৌড় দিয়ে দুলালের ঘরের দিকে ছুটে চলে যায়।

মুখার্জী বলে—আমার শরীর ভাল নয় সরকার, কেমন গা বমি-বমি করছে। আমি যাই।

চৌদ্দ নম্বরের পীট ধসেছে। মার্চেন্টরা খুবই ঘাবড়ে গিয়েছে। তৃতীয় সীমের ছাদটা ভাল করে টিম্বার করা ছিল না, তাতেই এই দুর্ঘটনা। ঊর্ধোৎক্ষিপ্ত পাথরের কুচি আর ধূলোর সঙ্গে রসাতল থেকে যে একটা আর্তনাদ থেমে থেমে বেরিয়ে আসছে—বুম্ বুম্ বুম। কোয়ার্টসের পিলারগুলো চাপের চোটে তুবড়ির মত ধুলো হয়ে ফেটে পড়েছে। এরই মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে পীটের মুখটা ঘিরে দেওয়া হয়েছে।

অন্যান্য ধাওড়া থেকে দলে দলে কুলিরা দৌড়ে আসছিল। মাঝ পথেই দারোয়ানরা তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে। —কাজে যাও সব, কিছু হয়নি। কেউ ঘায়েল হয়নি, মরেনি কেউ।

মার্চেন্টরা দল পাকিয়ে অন্ধকারে একটু দূরে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় আলোচনা করছেন। গিবসন বলেন—মাটি দিয়ে ভরাট করবার উপায় নেই, এখনো দু'দিন ধরে ধসবে।

হাজিরা বইটা পুড়িয়ে আজ নতুন একটা তৈরি করে রাখ। অন্তত একশো নাম কমিয়ে দাও।

ম্যাককেনা বলেন—তাতে আর কি লাভ হবে? দি মহারাজার কানে পৌঁছে গেছে সব! তা ছাড়া, দ্যাট মাহাতো, তাকে বোঝাব কি দিয়ে? কালকের সকালেই শহরের কাগজগুলো খবর পেয়ে যাবে আর পাতা ভরে স্ক্যাণ্ডাল ছড়াবে দিনের পর দিন। তারপর আসবেন একটি এনকোয়ারী কমিটি, একটা গান্ধীয়াইট বদমাশও বোধহয় তার মধ্যে থাকবে। বোঝ ব্যাপার?

সে রাতে ক্লাবঘরে আর আলো জ্বললো না। একসঙ্গে একশো ইলেকট্রিক ঝাড়ের আলো জ্বলে উঠল প্যালেসের একটি প্রকোষ্ঠে। আবার ডাক পড়ল মুখার্জীর।

অভূতপূর্ব দৃশ্য। মহারাজা, সচিবোত্তম আর ফৌজদার—গিবসন, ম্যাককেনা, মূর আর প্যাটার্সন। সুদীর্ঘ মেহগনি টেবিলে গেলাস আর ডিকেন্টারের ঠাসাঠাসি।

সুস্মিতবদনে মহারাজা মুখার্জিকে অভ্যর্থনা করলেন—মাহাতো ধরা পড়েছে মুখার্জি। ভাগ্যিস সময় থাকতে বুদ্ধিটা দিয়েছিলে।

গিবসন সায় দিয়ে বলে—নিশ্চয়, অনেক ক্লামজি ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচা গেল। আমাদের উভয়ের ভাগ্য ভাল বলতে হবে।

এ বৈঠকের সিদ্ধান্ত ও আশু কর্তব্য কি নির্ধারিত হয়ে গেছে, ফৌজদার সেটা মুখার্জির কানে কানে সংক্ষেপে শুনিয়ে দিল। নিরুত্তর মুখার্জী চমকে ওঠে, ফ্যাকাশে হয়ে যায় মুখ। তারপর শুধু হাতের চেটোয় মুখ গুঁজে বসে থাকে।

গিবসন মুখার্জির পিঠ ঠুকে বলে—এসব কাজে একটু শক্ত হতে হয় মুখার্জি, নার্ভাস হবেন না।

রাত দুপুরে অন্ধকারের মধ্যে আবার চৌদ্দ নম্বর পীটের কাছে মোটর গাড়ি আর মানুষের একটা ভিড়। ফৌজদারের গাড়ির ভেতর থেকে দারোয়ানেরা কম্বলে মোড়া দুলাল মাহাতোর লাশটা টেনে নামালো। ঘোড়ানিমের জঙ্গল থেকে ট্রাক বোঝাই এল আরো। ক্ষুধার্ত খনির গহ্বরের মুখে লাশগুলি তুলে নিয়ে দারোয়ানেরা ভুজ্যি চড়িয়ে দিল একে একে।

শ্যাম্পেনের পাতলা নেশা আর চুরুটের ধোঁয়ায় ছলছল করছিল মুখার্জির চোখ দুটো। গাড়ির বাম্পারের ওপর এলিয়ে এসে চৌদ্দ নম্বর পীটের দিকে তাকিয়ে সে ভাবছিল অন্য কথা। অনেকদিন পরের একটা কথা।

লক্ষ্য বছর পরে, এই পৃথিবীর কোন একটা জাদুঘরে, জ্ঞানবৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের দল উগ্র কৌতূহলে স্থির দৃষ্টি মেলে দেখছে কতগুলি ফসিল। অর্ধপশুগঠন, অপরিণতমস্তিষ্ক ও আত্মহত্যাপ্রবণ তাদের সাব-হিউম্যান শ্রেণীর পিতৃপুরুষের শিলীভূত অস্থিকঙ্কাল, আর ছেনি হাতুড়ি গাঁইতা; কতগুলি লোহার ক্রুড কিম্ভূত হাতিয়ার। অনুমান করছে তারা, প্রাচীন পৃথিবীর একদল হতভাগ্য মানুষ বোধহয় একদিন আকস্মিক কোন

ভূ-বিপর্যয়ে কোয়ার্টস আর গ্রানিটের গহ্বরে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল। তারা দেখছে, শুধু কতগুলি সাদা সাদা ফসিল, তাতে আজকের এই এত লাল রক্তের কোন দাগ নেই।

কোটেশন

আমরা তিনজনই খুব ভাল করে দেখতে পেয়েছিলাম আর খুব স্পষ্ট করে শুনতে পেয়েছিলাম; তাই যদিও দশটা বছর পার হয়ে গিয়েছে, তবু সেই ঘটনার ছবিটা আজও আমাদের মনে পড়ে যায়। আমাদের ছাত্রজীবনের সেই ছোট শহরটি, যার একদিকে পাহাড় আর বন, আর একদিকে কোলিয়ারি। সেই কলেজটি, যার একপাশে ইউক্যালিপটাস, সামনে একটা লেক— যার কালো জলে পাহাড়ের ছায়াটা টলমল করত। মিশন রোডের ধারে প্রভাদিদের সেই বাড়িটি, যার বারান্দার কাছে তারের জাল জড়িয়ে মাধবীলতা দুলত।

আমাদের কলেজের জন্মদিবসের উৎসবে প্রভাদি গান গাইতে রাজী হবেন কি? রাজী করাতেই হবে।

প্রভাদিকে রাজী করাবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমরা তিনজন একসঙ্গে ব্যস্ত হয়ে প্রভাদিদের সেই বাড়ির গেটের কপাট ঠেলে ভিতরে ঢুকে সেই মাধবীলতার কাছে এসেই থমকে গিয়েছিলাম। মাধবীলতার আড়ালের ওদিকে কে যেন কার কাছে কি যেন বলছে।

—বলতে সাহস পাচ্ছি না, কি বলব তাও বুঝতে পারছি না, কিন্তু তুমি বুঝে নাও—

দমকা বাতাসের একটা ঝড় কোথা থেকে ছুটে এল। মাধবীলতার গা থেকে ছিটকে গিয়ে আর এলোমেলো হয়ে উড়ে চলে গেল। বাতাসের সাঁ-সাঁ শব্দটা যেন আড়ালের সেই কথাগুলির শেষদিকটা ছিঁড়ে নিয়ে উধাও হয়ে গেল। আর কিছু শুনতে পেলাম না।

এইবার খুব সাবধানে মাধবীলতার আড়ালের ওদিকে একটু উঁকি দিতেই দেখতে পেলাম, বিনয়দা আবার কী যেন বলবার চেষ্টা করছেন, আর তাঁর চোখের সামনে একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে ও মাথা নীচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে প্রভাদি কি যেন ভাবছেন।

প্রভাদির মুখটা কী অদ্ভুত রকমের লালচে হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছিল, প্রভাদির খোঁপাটা যেন থর থর করে কাঁপছে। প্রভাদির সারা মুখ জুড়ে একটা নিবিড় তৃপ্তির হাসি বিহ্বল হয়ে রয়েছে। কিন্তু চোখের চাউনিটি করুণ। মাথা হেঁট করে মেঝের দিকে তাকিয়ে যেন দু'চোখের এই করুণতা লুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা করছেন প্রভাদি।

বোধহয় আমাদের দেখতে পেয়েছিলেন বিনয়দা।

—আচ্ছা, আমি এবার যাই। গলার স্বর চেপে খুব আস্তে কথাগুলি বলে, প্রভাদির নীরব মুখের দিকে তাকিয়ে, যেন একটা আশার আনন্দকে নীরবে ভাসিয়ে দিয়ে বিনয়দা

চলে গেলেন। প্রভাদি তেমনিই হেঁটমাথা হয়ে আর চুপ করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন।

তারপর আমাদের হঠাৎ দেখতে পেয়ে চমকে উঠলেন প্রভাদি, কিন্তু বেশ হেসে হেসে আমাদের ডাক দিলেন; কী ব্যাপার! নরেন কী মনে করে? ওকি? অমিয় আর জীবেনও এসেছ দেখছি।

অনেক অনুরোধ করবার পর প্রভাদি শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। আমাদের কলেজের জন্মদিবসের উৎসবে তিনি মাত্র একটি গান গেয়ে চলে আসবেন।

জীবেন বলে,—কিন্তু আপনি খুব ঠকবেন প্রভাদি, যদি—

প্রভাদি—কি?

জীবেন—যদি ভাস্করদার বক্তৃতা না শুনে চলে আসেন।

প্রভাদির চোখ দুটো যেন হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে চমকে ওঠে: তোমাদের ভাস্করদা বুঝি খুব ভাল বক্তৃতা করেন?

অমিয় বলে, অদ্ভুত।

ভাস্করদা আমাদের কলেজের প্রফেসর, তিনি আমাদের শহরের কেউ নন। তিনি কলকাতা থেকে এসেছেন। জীবেনের মামাবাড়ির সম্পর্কে তিনি জীবেনের দাদা হন বলেই আমরা সবাই তাঁকে ভাস্করদা বলে ডাকি। অমিয় অবশ্য এখনও মাঝে মাঝে ভাস্করদাকে সার্ বলে ডেকে ফেলে। দেখেছি, তাতে ভাস্করদা অখুশী না হয়ে বরং একটু খুশীই হন। তিনি শুধু আমাদের মত ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রদের বাংলা আরা ইংরেজী পড়ান। জৈন মহল্লায় ছোট একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে তিনি সেখানে থাকেন। ভাস্করদার বাড়িতে আমাদের আনাগোনা আছে।

কলেজের সে বছরের জন্মদিবসের উৎসবটা পার হয়ে বোধহয় ছ'টা মাসও পার হয়নি, আর একটা ঘটনা দেখে আমরা তিনজনেই একসঙ্গে আশ্চর্য হয়েছিলাম। ভাস্করদার সঙ্গে প্রভাদির বিয়ে হয়ে গেল। মিশন রোডের বাড়ির মাধবীলতার ছায়ার কাছ থেকে সরে এসে প্রভাদি জৈনমহল্লার সেই বাড়ির একটি ঘরের ভিতরে এসে ঢুকলেন, যে ঘরে একটি আলমারিতে গোটা পঞ্চাশ বই আছে।

কিন্তু....তবে....কেন যে প্রভাদি মাধবীলতার আড়ালে দাঁড়িয়ে অমন একটি লালচে মুখ আর অমন একটি নিবিড় হাসি নিয়ে বিনয়দার কথাগুলি চুপ করে শুনছিলেন....যাক্গে, যা হবার তা তো হয়েই গিয়েছে। বিনয়দা এখনও সেইরকম জেলাবোর্ডের অফিসে টাইপিস্টের কাজ করছেন, আর কাকাদের গল্পের বৈঠকের দরজায় আড়ি পেতেও এমন কোন কথা আমরা শুনতে পেলাম না, যাতে মনে হতে পারে, কোথাও কোন গোলমাল হয়েছে, কিংবা কারও মনে কোন খট্কা লেগেছে।

প্রভাদিকে দেখেও বুঝতে পেরেছি, তিনি খুব খুশী হয়েছেন। প্রভাদির বাড়ির মানুষেরাও বেশ খুশী। বিয়ের পর প্রভাদি একদিন আমাদের তিনজনকেই হরিণের মাংস খাবার নেমন্তন্ন করেছিলেন। প্রভাদিকে দেখে মনে হয়েছিল, জৈনমহল্লার এই বাড়িতে গোটা

পঞ্চাশ মোটা-মোটা বইয়ের কাছে বসে-থাকা জীবনটা প্রভাদির কাছে যেন বেশ একটু গর্বের জীবনও হয়ে উঠেছে।

পেট ভরে হরিণের মাংস খাওয়ার তৃপ্তি নিয়ে আর ঢেঁকুর তুলে আমরা যখন চলে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছি, ঠিক তখন প্রভাদি আমাদের কাছে এসে কি-যেন ভেবে আর এদিক-ওদিক তাকিয়ে আমতা-আমতা করে বললেন, কি খবর তোমাদের? কোন নতুন খবর আছে?

অমিয়—না, কোন নতুন খবর নেই।

প্রভাদির চোখ দুটো হঠাৎ উদাস হয়ে যায়। আনমনার মত বিড়বিড় করেন; —কেউ কিছু বলছে না? কিছু শুনতে পাওনি?

আমি প্রশ্ন করি, কিসের কথা বলছেন প্রভাদি?

প্রভাদি।—এই ধর, আমাদের বিয়ের কথা।

জীবেন হেসে ফেলে।—মাসিমা বলছিলেন।

প্রভাদি।—কী?

জীবেন।—মাসিমা বললেন, বাপ রে বাপ, বাসরঘরে জামাই কী ইংরেজী কথাই না গর্জালে।

প্রভাদি হাসতে চেষ্টা করলেন। আমরাও রওনা হলাম। পথে যেতে যেতে জীবেনকে জিজ্ঞাসা করলাম, সত্যি নাকি রে? বাসরঘরেই ভাস্করদা—

জীবেন—হ্যাঁ। আমিও শুনেছি।

—কী বলছিলেন ভাস্করদা?

জীবেন—ওই— যে-সব কথা আমরা ভাস্করদার ক্লাসে রোজই শুনি। রিল্‌কে, কাফ্‌কা, ভেরলাঁ, মায়াকোভস্কি।

অমিয়।—তারপর?

জীবেন।—তারপর আর কি? বাসরঘরে যত মুখ্যুদের ভিড়, ওসব বড় বড় আইডিয়ার কথা ওরা বুঝবেই বা কী? আর ভাস্করদার ভ্যালুই বা বুঝবে কী? সবাই বোবা গবেটের মত শুধু চুপ করে শুনেছে।

শুনে আমরা একটুও আশ্চর্য হইনি। কারণ, ভাস্করদাকে আমরা যতটা চিনতে আর বুঝতে পেরেছি, ততটা চিনতে আর বুঝতে অন্তত এ শহরে আর কেউ পেরেছে কিনা সন্দেহ। ভাস্করদাকেও মাঝে মাঝে বলতে শুনেছি, এই শহরের মানুষগুলো আইডিয়ার দিক দিয়ে অত্যন্ত ব্যাকওয়ার্ড। মিডিয়াভ্যালও নয়, একেবারে স্টোন এজ।

একদিন ক্লাসে সাহিত্য পড়াতে পড়াতে ভাস্করদা একটা অদ্ভুত কথা বলে উঠলেন, নেশন কিংবা সমাজের কালচারে তখনই অবক্ষয় অর্থাৎ ডেক্যাডেন্স দেখা দেয় যখন তাদের রুচি জেলাবোর্ডের কেরানীদের রুচির মত হয়ে যায়।

একদিন কালচার নিয়ে প্রভাদির সঙ্গে তর্ক করতে করতে আমরাও ঠিক এই কথাগুলির

প্রতিধ্বনি করেছিলাম। শুনেই চমকে উঠলেন প্রভাদি : এরকম কথা কে তোমাদের শোনালে?

—ভাস্করদা নিজের মুখে আমাদের কাছে এ কথা বলেছেন।

কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে প্রভাদি হেসে ফেলেন : আমিও একদিন তাই মনে করেছিলাম?

—করেছিলাম। তার মানে? আপনি কি এখনও তাই মনে করেন না?

প্রভাদি আলমারিটার দিকে তাকিয়ে, যেন গোটা পঞ্চাশ বইয়ের ভিতরে গোপন করা একটা প্রচণ্ড শূন্যতার দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করেন : এখন আর মনে না করলেই বা কী আসে যায়!

এর পর কিছুদিন ধরে আমরা প্রভাদিকে দেখতে পাইনি, কারণ দেখা করতে যাবার আর কোন দরকারও হয়নি। কিন্তু আমরা জানতাম যে, প্রভাদি এখন আর জৈনমহল্লার বাড়িতে নেই, মিশন রোডের বাড়িতে আছেন। দূর থেকে দেখেছি, মাধবীলতার ছায়ার কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রভাদি। জীবেনের কাছ থেকেই শুনতে পেয়েছিলাম, ভাস্করদার কাছ থেকে রোজই একটি করে চিঠি আসে প্রভাদির কাছে।

জীবেন বলল, একটা চিঠি আমি তোদের দেখাতেও পারি। ছোড়দি প্রভাদির টেবিল থেকে চুরি করে নিয়ে এসেছে।

—সত্যি! চিঠিটা একবার দেখতে দে মাইরি, তোর পায়ে পড়ি জীবেন।

জীবেন দেখিয়েছিল চিঠিটা। আমরাও দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম। পুরো আট পাতার একটা চিঠি। চিঠি ভরে যত বড় বড় ভালবাসার কবিতা কোটেশন গিজগিজ করছে। তা ছাড়া আরও অনেক কথা। বিয়াত্রিচের উদ্দেশে দান্তে কী লিখেছিলেন। চোখের প্রথম দেখাতেই মেরিকে কেন ফ্যান্টম অব ডিলাইট বলে ওয়ার্ডসোয়ার্থের মনে হয়েছিল। আরও ছিল : ফরাসী ও জার্মান ভাষার কোটেশন। চিঠিটা পড়তে পড়তে হাঁপিয়ে উঠেছিল অমিয়।

আমি বললাম, ভাস্করদা নিজে কী লিখেছেন, সেগুলো আগে পড় অমিয়।

জীবেন বলে, সে-সব কিছু নেই। সবই বড় বড় কবি আর মনীষীদের কথার কোটেশন।

ভাস্করদা নিজের কোন আইডিয়ার কথা কি—

জীবেন—না, ও-রকম একটি কথাও নেই।

যাক গে, শুধু জানতে ইচ্ছে করেছিল, চিঠিগুলি প্রভাদির কেমন লাগছে। আর কারও ভাল লাগুক বা না লাগুক, অন্তত প্রভাদির তো ভাল লাগবে। ভাস্করদার মত মানুষকে বিয়ে করে প্রভাদি যে গর্বিত হয়েছিলেন, সে সত্যের প্রমাণ তো প্রভাদির ঝকঝকে চোখের হাসিতেও একদিন দেখতে পেয়েছিলাম।

কিন্তু অনেকদিন পরে, প্রভাদির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে যখন শুনলাম যে, তিনি আবার জৈনমহল্লার বাড়িতে চলে গিয়েছেন, তখন মাধবীলতার কাছে ছোট ছোট ঘাসের মাথার উপর একটা কাগজের টুকরো পড়ে থাকতে দেখে আমরা আশ্চর্য হয়েছিলাম।

কাগজের টুকরোটা ভাস্করদার লেখা চিঠিরই একটা পাতা। চিঠিতে ল্যাটিনভাষার একটা কবিতার কোটেশন ধেবড়ে রয়েছে, বোধহয় রাতের শিশিরে ভিজে গিয়ে থাকবে।

প্রভাদিকে ঠিক বুঝতে গিয়ে কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভাস্করদাকে দিন দিন আরও ভাল করে বুঝতে পারছি।

প্রভাদির সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করি। প্রশ্ন করি, ভাস্করদা কোথায়?

প্রভাদি—ও ঘরে আছেন।

—কি করছেন?

—বই থেকে কোটেশন টুকছেন।

—কেন?

প্রভাদি—কার যেন আসবার কথা আছে।

—সেজন্য কোটেশন কেন?

প্রভাদি—সেইজন্যেই তো কোটেশন দরকার। কোন কথা উঠলেই উনি ভাল ভাল আইডিয়া' রেফারেন্স দিয়ে অনায়াসে বুঝিয়ে দিতে পারেন যে—

—কী বুঝিয়ে দেন?

প্রভাদি—জানি না। তোমরা আবার আমার সঙ্গে তর্ক বাধিয়ো না।

প্রভাদির সঙ্গে আমরা তর্ক করিনি। দরকারও মনে করিনি। কারণ আমরা নিজেরাই দেখেছি, ভাস্করদা কি-ভাবে শুধু আইডিয়ার মানুষ হয়ে চলতে চান! কারও বাড়িতে নিমন্ত্রণ হলেও ভাস্করদা রওনা হবার আগে কয়েকটা বই না হাতড়ে আরও কিছু-না-কিছু....তার মনস্থ না করে যেতে পারেন না।

দয়ালবাবুর শ্রাদ্ধের উপাসনা শেষ হবার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘরের ভিড় গম্ভীর ও নীরব হয়েছিল। আমরা বাইরের বারান্দায় চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম, কে যেন সেই নীরবতা প্রথম ভেঙে দিয়ে কথা বলে উঠলেন, ডেনিশ ফিলসফার কিয়েরকেগার্ড বলেছেন—

—কে রে? কে রে? মনে হচ্ছে ভাস্করদা কথা বলছেন। জীবেন ঘরের ভিতরে উঁকি দিয়েই দেখতে পায়, হ্যাঁ, এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে ভাস্করদা কথা বলছেন।

ঘরের অনেকেই তখন কথা বলতে শুরু করেছেন, কাজেই আর শুনতে পেলাম না ভাস্করদা আর কী কী কথা বললেন। শুধু শুনতে পেলাম, আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে যেতে হরিশবাবু বললেন, প্রফেসর ভদ্রলোক সত্যিই সাংঘাতিক বিদ্বান। আমরাও প্রভাদির কাছে গিয়ে খবর দিতে দেরি করিনি; সত্যি প্রভাদি, ভাস্করদা যে একজন খাঁটি ইনটেলেকচুয়াল, এ কথা ও শহরে যাদের একটু রুচি-টুচি আছে তারা সবাই স্বীকার করে।

ভাস্করদার ইন্‌টেলেকচুয়াল দুঃসাহস দেখে আমরা মাঝে মাঝে চমকে উঠি। শহরের

লাইব্রেরিতে রবীন্দ্র জন্মোৎসবের সভাতে একদিন সভাপতি হয়ে ভাস্করদা কত সহজে বলে দিলেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষা নিতান্ত রুক্ষ ও শ্রীহীন, শেক্সপীয়ার ড্রামা বুঝতেন না, জহরলালের ইংরেজী শুনলে হাসি পায়, আর মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা মূলত কাউণ্টার রেভল্যুশনারি ক্লৈব্য।

সভার শেষে অমিয় ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি কি করে এত নির্ভয়ে এসব কথা বলে দিতে পারলেন সার্?

ভাস্করদা বললেন, কেন বলে দিতে পারব না? আমার চিন্তার মধ্যে এক ফোঁটা ডগ্‌মা নেই। তাছাড়া খাঁটি ওরিজিন্যাল কিছু বলতে হলে এ সব কথাই বলতে হয়।

পর পর আরও এমন কয়েকটি ঘটনা হয়ে গেল, যার পর বুঝলাম, ভাস্করদা কত অসাধারণ।

আমাদের কলেজের ফটকের সামনে একটা চলন্ত মোটর গাড়ীর ধাক্কা লেগে জটার মা নামে ভিক্ষুক বুড়িটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। বুড়ির মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত উথলে উঠল। কোথা থেকে হঠাৎ বিনয়দা ছুটে এসে জটার মাকে কোলে তুলে নিলেন, আর অপরাধী মোটরগাড়ীটার ভিতরে উঠে চেঁচিয়ে উঠলেন, চল, হাসপাতালে।

আমরাও ছটফট করে বলাবলি করছিলাম, বিনয়দা, বিনয়দা, সত্যিই বিনয়দার মনটা—

ভাস্করদা গম্ভীরভাবে বললেন, রিপ্রেসড ডিজায়ার। নিতান্ত মর্বিডিটি। লোকটা ফ্রয়েডের পেসেন্ট।

অমিয়—এ কথা কেন বলছেন সার্?

ভাস্করদা—একে বলে ঘটনার অবজেক্টিভ ভিউ। ঘটনার মাত্রায় পড়ে যে ধারণা হয়, সেটা ভুল ধারণা।

আমরা দেখেছি, অমিয়র সাত বছর বয়সের ভাগ্নে নেপু প্রায়ই অমিয়কে জড়িয়ে ধরে অনুরোধ করে, সেই কাঠের গল্পটা আর একবার বল না মামা।

কাঠের গল্প আবার কি?

অমিয় বলে—আলিবাবার গল্প।

আলিবাবার গল্পটা কাঠের গল্প হবে কেন?

অমিয়—ওই যে, প্রথমেই আছে, আলিবাবা রোজ কাঠ নিয়ে শহরে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করত। নেপুর গল্পবোধের রকম দেখে আমরা হেসে ফেলেছিলাম।

কিন্তু ভাস্করদার কথা শুনে আমরা একদিন উল্টো লজ্জা পেলাম। পড়াতে গিয়ে সাহিত্যের নানারকম সমালোচনা করছিলেন ভাস্করদা। ভাস্করদা বললেন, মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যের মূল সুর হল যমবাদ।

যমবাদ?

ভাস্কর—হ্যাঁ, যম, অর্থাৎ মৃত্যুর উপাসনা।

অমিয়—কেন এ কথা বলছেন সার্?

ভাস্করদা—সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি বীরবাহু চলি যাবে গেলা যমপুরে। প্রথমেই যমের কথা আছে।

ভাস্করদা—ওটা রাবণের লিবিডো। রামায়ণ না বলে রাবণায়ন বলা উচিত। একটা নন-আরিয়ান পুরুষ একটা আরিয়ান নারীকে জোর করে ইয়ে করতে....এই তো গল্প।

একদিন প্রফেসর মহিমবাবু বার বার তিনবার আমাদের বাংলা ক্লাসের ঘরের কাছে ঘুরঘুর করে চলে গেলেন। ক্লাস শেষ হবার পর ভাস্করদা বললেন, উনি প্রিন্সিপ্যালের কাছে আমার নামে চুগলি করবার চেষ্টা অনেকদিন থেকে করছেন। তা না হলে এভাবে বার বার এখানে এসে উঁকিঝুঁকি দিয়ে—

কিন্তু সেই মুহূর্তে মহিমবাবু আবার ফিরে এসে ভাস্করদাকে বললেন, কাল আমার ছেলের অন্নপ্রাশন। কষ্ট করে অবশ্যই একবার যাবেন।

ভাস্করদা—অ্যাঁ?

মহিমবাবু—এইটুকু বলবার জন্যেই বার বার এসে....আপনি ক্লাস নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তাই ফিরে গিয়েছিলাম।

মহিমবাবু চলে যেতেই অমিয় বলে উঠল, আপনি মিথ্যে মহিমবাবুর নামে একটা অপবাদ দিয়ে—

ভাস্করদা—না, অপবাদ নয়।

অমিয়—তবে কি?

ভাস্করদা—একে বলে ডিট্যাচড্ ভিউ। এই নেমন্তন্ন আমার ক্ষতি করবার চেষ্টা। উনি আমাকে জব্দ করতে চান। উনি জানেন, আমি এ ধরনের নেমন্তন্নে যাই না, যাবও না। কাজেই উনি এই কথা রটাবার সুযোগ পেয়ে যাবেন যে, পাঁচ টাকা আশীর্বাদী দেবার ভয়ে আমি নেমন্তন্নে যাইনি।

একটা সাধুকে ছেলেধরা সন্দেহ করে পাড়ার লোকেরা নির্মম প্রহার দিয়ে সাধুটাকে ভাস্করদার বাড়ির সামনে আধমরা করে রেখে গিয়েছিল। পুলিশ এসে ভাস্করদাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি অন্তত কয়েকটা নাম বলুন, যারা এ কাণ্ড করেছে।

ভাস্করদা বললেন, আমি এ সব মারামারির কিছুই দেখিনি।

প্রভাদিকে আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ভাস্করদা স্বচক্ষে সব দেখেও এ রকম একটা মিথ্যা কথা বলে দিলেন?

প্রভাদি বললেন, তোমাদের ভাস্করদাই জানেন।

—আপনি ভাস্করদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

প্রভাদি—হ্যাঁ।

—কি বললেন ভাস্করদা?

প্রভাদি—তোমাদের ভাস্করদা বললেন, উনি সমাজ-সচেতন মানুষ। তাছাড়া সব ব্যাপারকে তিনি অ্যানালিটিক্যালি বিচার করেন।

কথাগুলি বলতে বলতে প্রভাদি হেসে ফেললেন। আর হাসতে গিয়ে প্রভাদির মুখটাও

শুকনো খটখটে হয়ে গেল। অমন সুন্দর মুখখানা দেখতে কেমন বিশ্রী হয়ে গেল। মনে হল, প্রভাদির চোখের কোণে কী যেন চিকচিক করে জ্বলছে।

ভাস্করদা প্রায়ই বলেন, তিনি চেষ্টা করলেও কখনও কমনপ্লেস হতে পারেন না। কারণ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী, তাঁর ইনটেলেক্ট, তাঁর ইমোশন—সবই তাঁর নিজস্ব, সেন্টপারসেন্ট ওরিজিন্যাল। কলকাতায় বিলিতী সদাগরী অফিসে হাজার টাকা মাইনের চাকরি তিনি নাকি অনেকবার পেয়েছিলেন। কিন্তু টাকাকে ঘৃণা করেন বলেই তিনি মোটা মাইনের সেসব চাকরি নিতে পারেননি। দুশো টাকা মাইনের প্রফেসারী নিয়েও তিনি এই কারণে সুখী যে, তিনি ইচ্ছামত তাঁর আইডিয়ার জীবন যাপন করতে পারছেন, আইডিয়ার কথা বলতে পারছেন। এবং একদিন কথায় কথায় বেফাঁস কথা বলে ফেললেন—অন্তত প্রভার জীবনকে আমি অ্যান্টিইন্টেলেকচুয়াল মতলবের ফাঁদ থেকে, একটা বাজে জীবনের মেডসার্ভেন্টপনা থেকে উদ্ধার করতে পেরেছি, এই আমার সান্ত্বনা—আমার গর্বও বলতে পার।

প্রভাদি তৎক্ষণাৎ ঘর ছেড়ে বারান্দার দিকে চলে গেলেন। আর ভাস্করদাও অদ্ভুত এক গর্বের হাসি হেসে আমাদের দিকে তাকিয়ে একটা হাঁপ ছাড়লেন : তারপর? তোমাদের থিয়েটার কবে?

কিন্তু মাত্র তিন দিন পরে আবার আশ্চর্য হলাম। হরিশের কাকা ছুটিতে কলকাতা থেকে এসে আমাদের কাছে খোঁজ দিলেন : তোমাদের কলেজে ভাস্কর রায় নামে কোন প্রফেসর আছে নাকি হে?

—আছে।

—লোকটা এ রকম চাকরির কাঙাল কেন?

—কি করেছেন ভাস্করদা?

—কি না করেছে? রাসেল অ্যাণ্ড এলগিনের আলকাতরা ডিপার্টমেন্টে তিন শো টাকা মাইনের একটা চাকরির জন্য বার বার সাতবার দরখাস্ত পাঠিয়েছে। তার ওপর, আমি ইংরাজ জাতিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি বলে মনে করি, আমি কোনকালে দেশের স্বাধীনতার হাঙ্গামায় যোগ দিইনি, ইত্যাদি হেন-তেন কত বাজে কথাই না লিখেছে। পড়ে সাহেবগুলো কী ভয়ানক লজ্জাই না পেয়েছে।

খবরটা প্রভাদির কাছে পৌঁছে দিতে আমরা দেরি করিনি। আর প্রভাদিও কয়েকদিন পরে আমাদের বললেন, হ্যাঁ, তোমাদের ভাস্করদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

—সত্যিই কি ভাস্করদা এসব কথা লিখে দরখাস্ত করেছেন?

প্রভাদি—হ্যাঁ।

—কেন?

প্রভাদির গলার স্বর তপ্ত হয়ে উঠল: তা আমি জানি না।

—একবার ভাস্বরদাকে একটু জিজ্ঞাসা করে যদি জানতে পারেন, তবে—

প্রভাদি—বেশ তো, এখনই জিজ্ঞেস করছি।

বারান্দার উপর চুপ করে দাঁড়িয়ে আমরা শুনলাম, প্রভাদি ঘরের ভিতরে ঢুকে

বেশ শান্ত স্বরে কথা বলছেন : এরকম দরখাস্ত করবার কী দরকার ছিল? কেন করলে?

আমরা শুনলাম, ভাস্করদা আস্তে আস্তে হাসছেন আর কথা বলছেন : আমি জেমসের কথা দিয়েই আমার কথা বলছি, এটা হল প্র্যাগমেটিক ভিউ অব লাইফ। যদি বুঝতে না পার, তবে চুপ করে থাক। জেলাবোর্ডের কেরানীরা যে-ভাষায় কথা বলে, আমিও কি—

আর শুনতে পেলাম না। ঘরের ভিতরে ঝন্‌ঝন্‌ করে একটা শব্দ যেন আছাড় খেয়ে পড়েছে।

কি হল? দরজার কাছে এসে খুব সাবধানে উঁকি দিয়ে দেখতে পেলাম, প্রভাদি স্তব্ধ হয়ে টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে বইয়ের আলমারিটার দিকে তাকিয়ে আছেন, আর টেবিলের ফুলদানিটা মেঝের উপর চুরমার হয়ে পড়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে, হঠাৎ প্রভাদির হাতের ঠেলা লেগে ফুলদানিটা পড়ে গিয়েছে।

আর দাঁড়িয়ে থাকবার সাহস ছিল না। তাছাড়া আমাদের যা জানবার ছিল তা তো জানাও হয়ে গেল।

কিন্তু পা টিপে টিপে চলে যাবার সময়, সেদিন প্রায় সারাক্ষণ ধরে, এবং তার পরেও বেশ কিছুদিন ধরে, প্রভাদির এই স্তব্ধ চেহারাটা মনে পড়তেই আমাদের কানের কাছে যেন ফুলদানির আছাড়-খাওয়া শব্দটা ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে উঠত। মনে হত, প্রভাদি যেন এখনও জৈনমহল্লার সেই বাড়ির একটি ঘরে, একটা বইয়ের আলমারির দিকে তাকিয়ে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আর বুকের ভিতরে একটা ভাঙ্গনের ঝন্‌ঝন শব্দ শুনছেন।

ভাস্করদার জন্য অবশ্য আমাদের মনে কোন চিন্তা নেই, দুঃখ নেই। তিনি যেমন ছিলেন, তেমনই আছেন। বড়দিনের ছুটি পার হয়ে যাবার পর প্রথম যেদিন ভাস্করদার বাড়িতে গেলাম, সেদিনও শুনতে পেলাম, ভাস্করদা ঘরের ভিতরে বসে গম্ভীর স্বরে বলছেন, মার্ক্স বলেছেন—

একটা পাল্টা জবাবের স্বরও শোনা গেল : না না, আপনি বলুন আপনি কি বলতে চান?

টুলুর দাদামশাই হন, সেই বুড়ো বেদান্তশাস্ত্রী মশাই এসেছেন। ঘরের ভিতরে ভাস্করদার সঙ্গে কথা বলছেন।

ব্যাপারটা একটু পরে বুঝলাম। বেদান্তশাস্ত্রী মশাই রামানুজ সম্বন্ধে লেখা তাঁর ছোট বইটি প্রায় সারাক্ষণ হাতে নিয়ে বসে থাকেন, আর সুযোগ পেলেই যাকে-তাকে সেই বইটি পড়ে শোনান। সেই বইটি হাতে নিয়ে বেদান্তশাস্ত্রী মশাই আতঙ্কিতের মত ভাস্করদার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন।

ভাস্করদা বললেন : ভূমিকাতে আপনি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা নিতান্ত ভুল। আসল কথাটাই লেখেননি। মার্ক্স বলেছেন—

—কি বলেছেন?

ভাস্করদা—মার্ক্স বলেছেন, হিন্দুধর্মের এসেন্সিয়াল অর্থাৎ সার কথা হল বানরপূজা।

বেদান্তশাস্ত্রীমশাই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বিড়বিড় করেন : আপনি ওভাবে পরের কথা তুলে—

ভাস্করদা—পরের কথা কেন মনে করছেন? মনে করুন না, আমার কথাই মার্ক্স অনেকদিন আগে...হ্যাঁ, আসুন তা হলে।

বেদান্তশাস্ত্রীমশাই চলে গেলেন। আর, অমিয় ভাস্করদার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মেজাজ হারিয়ে কি যেন চেঁচিয়ে বলে ফেলার চেষ্টা করতেই আমরা অমিয়কে এক ঠেলা দিয়ে বারান্দা থেকে নামিয়ে দিলাম। অমিয় কিন্তু শান্ত হয়েও বলতে ছাড়ল না : সার্ মশাই কিন্তু এখনও বুঝতে পারছেন না যে—

—কি? কি বলতে চাস তুই?

অমিয় আবার আস্তে আস্তে গরগর করে: কিচ্ছু বলব না। আমাকে মেরে ফেললেও বলব না।

প্রভাদিকে দেখে মনে মনে চমকে উঠতে হল। রান্নাঘরের দাওয়ার উপর একটা মোড়ার উপর চুপ করে বসে যেন শুধু আকাশটাকে দেখছেন। প্রভাদির হাতের কাছে এক পেয়ালা চা জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে। জট পাকানো উলের একটা দলা প্রভাদির কোলের উপর পড়ে আছে। মনে হচ্ছে, উলের জট খুলতে বৃথা চেষ্টা করছেন প্রভাদি।

অমিয়টা যেন নিষ্ঠুর হিংসুকের মত প্রভাদির চেহারার এই উদাস শান্ততা খুঁচিয়ে ব্যথিত করে দেবার মতলবে প্রভাদির কাছে এসে বলতে থাকে, আপনিও শুনেছেন নাকি প্রভাদি?

প্রভাদি—কি?

—মার্ক্স বলেছেন যে—

প্রভাদি কিন্তু শান্তভাবে হাসতে থাকেন : হ্যাঁ জানি, কাল দেখেছি, ভদ্রলোক একটা বই থেকে কথাগুলো টুকে রাখছেন।

জীবেন তবু বোকার মত প্রশ্ন করে, কে? কে?

প্রভাদি গম্ভীর হয়ে যান : কে আবার? তোমাদের বিদ্বান ভাস্করদা।

প্রভাদি আনমনার মত চুপ করে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। ভাস্করদার ঘরের দরজাটার দিকে তাকালেন। কী আশ্চর্য, প্রভাদির চোখের কোণ দুটো যেন জ্বলছে।

তারপর মোড়া থেকে উঠে ভাস্করদার ঘরের দিকে চললেন প্রভাদি। আমরাও বললাম, আজ তবে আসি প্রভাদি।

প্রভাদি আমাদের কথা শুনতেই পেলেন না বোধ হয়। কোন উত্তর দিলেন না। চলে যাবার রকম দেখিয়েও কিন্তু আমরা চলে যাইনি।

আর, অমিয় তো আমাদের কানের কাছে ফিসফিস করে বলেই ফেলল : শুনতে হবে।

ভাস্করদার ঘরের পিছনে দেয়াল ঘেঁষে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আমরা সবই শুনতে পেলাম।

ভাস্করদা বিস্মিত হয়ে বলছেন, কি বললে?

প্রভাদি—খুব স্পষ্ট করেই তো বলছি, শুনতে পাচ্ছ না কেন? তুমি শুধু একটি কোটেশন।

ভাস্করদা—তার মানে?

প্রভাদি—তুমি বুঝে দেখ।

ভাস্করদা—তুমি বলতে চাও, বই পড়ে আমার মাথা—

প্রভাদি—না, বই তোমার মাথা খায়নি, তুমি বইয়ের মাথা খেয়েছ।

—তার মানে?—ভাস্করদা এইবার চেঁচিয়ে উঠলেন।

প্রভাদি কিন্তু একটুও দমলেন না—বেশ তো, যদি সাধ্যি থাকে তবে বল না কেন, নিজের মন দিয়ে, নিজের কথা দিয়ে বল। এই এক বছরের মধ্যে ঘরের মানুষের কাছে বসেও মনের কোন্ কথাটা বলতে পেরেছ শুনি? তোমার নিজের কি কোন কথা নেই? তোমার নিজের মুখে কি কোন কথা ফোটে না?

ঘরের ভিতরটা বেশ কিছুক্ষণ যেন বোবার ঘরের মত নীরব ও স্তব্ধ হয়ে রইল।

কাজেই ভয়ে ভয়ে আর খুব সাবধানে জানালা দিয়ে উঁকি দিতে হল।

প্রভাদির চোখ থেকে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়ছে। আর ভাস্করদা বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করছেন : টিয়ার্স, আইড্‌ল টিয়ার্স।

প্রভাদির সেই জলভরা চোখও যেন দপ করে জ্বলে উঠল : বা, বেশ সুন্দর কোটেশন, ছিঃ!

ভাস্করদা—কি বললে?

প্রভাদি—আজও পারলে না। ঘরের মানুষকে নিজের ভাষায় একটা সান্ত্বনাও দিতে পারলে না। ছিঃ!

প্রভাদি ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। কোন্ দিকে গেলেন জানি না, বোধহয় রান্নাঘরের দাওয়ার উপরে পড়ে থাকা সেই জট-পাকানো উলের দিকে। আমরাও পা টিপে-টিপে সরে গিয়ে একেবারে গেট পার হয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

এখন আর জৈনমহল্লার বাড়িতে নয়, প্রভাদি অনেক দিন ধরে মিশন রোডের বাড়িতেই আছেন। আমরা পথ দিয়ে যেতে যেতে দেখতে পাই, মাধবীলতার গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে আবার হলুদবরণ প্রজাপতি ফুরফুর করে উড়ছে।

আমাদের উৎসাহও যেন একটা ধাঁধায় পড়ে থিতিয়ে যাচ্ছিল। না জৈনমহল্লার বাড়িতে না মিশন রোডের বাড়িতে, কোথাও যাবার আর কোন তাগিদ ছিল না।

তবু একদিন ভাস্করদার বাড়িতে যেতে হল। কারণ পথ দিয়ে যেতে যেতে ভাস্করদার বাড়ির ফটকের কাছে একটা নতুন দৃশ্য দেখে আমরা একটু আশ্চর্য হয়েছিলাম।

এত বড় বিদ্বান ভাস্করদা, যিনি বুড়ো বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের দিকে তাকিয়ে একটা

নমস্কারের ভঙ্গীও করতে পারেননি, তিনি একেবারে কুঁজো হয়ে একজন ছোকরা-বয়সের ভদ্রলোককে নমস্কার জানাচ্ছেন।

অমিয় বলে, এই ভদ্রলোক হলেন টুলুর জামাইবাবু, ভুলুবাবু। কলকাতার একটা সাপ্তাহিক কাগজের সম্পাদক। টুলু বলেছে, ভুলুবাবুকে নেমন্তন্ন করেছেন ভাস্করদা।

ভুলুবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন ভাস্করদা। আমরাও আমাদের সেই পুরনো চোরা কৌতূহলের অভ্যাসে ভাস্করদার ঘরের জানালার কাছে এসে চোরের মত আড়াল হয়ে দাঁড়ালাম।

ঘরের টেবিলের উপর ভাল ভাল খাবার সাজানো। বুঝতে পারছি, সম্পাদক ভুলুবাবুর জন্যেই টেবিল ভরে সমাদর সাজিয়ে রেখেছেন ভাস্করদা।

তারপরেই দেখলাম, গ্রেট আইডিয়ার আর বিদ্যার একজন সুপারম্যান বলে আমরা যাঁকে এতদিন জেনে এসেছি, সেই ভাস্করদার চোখে মুখে যে কী করুণ আবেদন আর আকুলতা। বার বার বললেন : দয়া করে আমার একটা লেখা ছাপুন সার্।

ভুলুবাবু বলেন, দয়ার প্রশ্ন নয়। কথা হল, ছাপাবার যোগ্য লেখা হলেই ছাপাব। আপনি শুধু বড় বড় পণ্ডিতদের লেখা থেকে একগাদা কোটেশন দিয়ে যে-লেখা লেখেন, সে-লেখা তো ইচ্ছে করলে যে-কোন স্কুল-বয়ও লিখতে পারে।

ভাস্করদা—কিন্তু—

ভুলুবাবু—এর মধ্যে কোন কিন্তু-টিন্তু নেই ভাস্করবাবু। নিজের মনের বাজে কথাও যদি কেউ গুছিয়ে লেখে, তবু সেটা লেখা হয়, আর্ট হয়। আপনি আগে লিখতে শিখুন, তারপর বড় বড় তত্ত্বের কথা লিখুন। তা না হলে মাপ করবেন। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন ভুলুবাবু। এক চুমুকে এক গেলাস জল খেয়ে নিয়ে বললেন, নমস্কার, আসি তা হলে।

ভাস্করদার চোখ-মুখের চেহারা দেখে আমাদের যে লজ্জা হচ্ছিল সেটা বড় কষ্টের লজ্জা। তার উপর অমিয় আবার একটা ঠাট্টার কড়া ফোড়ন দিয়ে সে লজ্জাকে যেন একেবারে তেতো করে দিল : সিংহচর্মে আবৃত.....থাক আর বলে কাজ নেই।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা, অমিয়র অনুরোধের চাপে পড়ে মিশন রোডে প্রভাদির বাড়িতে যেতে হল। কে জানে, অমিয়র কী যেন দেখবার দরকার হয়েছে। মুখ খুলে কিছু বলে না অমিয়, শুধু বলে, চল্ না আজ গেলেই দেখতে পাবি।

—কী দেখতে পাব?

অমিয় বলে, জানি, কিন্তু বলব না।

বেশ গাঢ় অন্ধকারের সন্ধ্যা। তারাভরা আকাশ। শালবনের দিক থেকে যে ঝড়ো বাতাসটা ছুটে আসছে, সেটাও বেশ মিষ্টি। প্রভাদিদের বাড়ির গেটের কাছে এসে আমরা দাঁড়ালাম।

হ্যাঁ, প্রভাদির বারান্দায় আলো জ্বলছে। মাধবীর লতাগুলি যেন উতলা এক কুহকিনীর এলোচুলের মত ছটফটিয়ে দুলছে।

—কি? তোমরা কি মনে করে? —পিছন থেকে গম্ভীর প্রশ্নের বাধা পেয়ে চমকে উঠে দেখলাম, ভাস্করদা এসেছেন।

অগত্যা ভাস্করদার পিছু পিছু হেঁটে আমরা এগিয়ে চললাম। কিন্তু বেশী দূর আর যেতে হল না। মাধবীলতার কাছে এসে ভাস্করদা যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, অগত্যা আমরাও থমকে গেলাম।

সেই সেখানে, যেখানে প্রায় এক বছর আগে প্রভাদিকে হেঁটমাথা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম, ঠিক সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন প্রভাদি। আর সেই বিনয়দা, প্রায় এক বছর আগের সেই দিনে যেখানটিতে দাঁড়িয়ে প্রভাদির সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনিও ঠিক সেখানটিতে দাঁড়িয়ে আছেন।

বিনয়দার মুখের কথাগুলিও শুনতে পেলাম। মনে হল, এই কথাগুলিকে সেদিনও বোধহয় বলেছিলেন বিনয়দা। একটা ঝড়ো বাতাস সোঁ সোঁ করে কথাগুলিকে হঠাৎ ছিঁড়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল বলেই আমরা সেদিন শুনতে পাইনি।

বিনয়দা বলছেন : আমি জানি, তুমি কোন ভুল করনি। যা করা উচিত, তুমি তাই করেছ। আমিও জানি, আমি ঠকিনি। আমার মনে সেদিন যে কথা ছিল, সে আজও আমার মনেই আছে। একটু দূরে চলে যাওয়া, একটু চোখের অদেখা হওয়া, এই তো? সেজন্যে সে আমার পর হয়ে গেছে বলে আমি মনে করি না।

প্রভাদির চোখ দুটো করুণ, কিন্তু মুগ্ধ মুখটা যেন নিবিড় এক তৃপ্তির হাসিতে বিহ্বল হয়ে রয়েছে।

ভাস্করদাও সবই দেখছেন আর শুনছেন। হতভম্ব চোখ দুটোকে একবার কাঁপিয়ে নিয়ে বিড়বিড় করেন ভাস্করদা : আশ্চর্য, তোমাদের প্রভাদি হাসছেন বলে মনে হচ্ছে?

অমিয়—হ্যাঁ সার্।

ভাস্করদা—কিন্তু এ কী ধরনের হাসি?

অমিয়—খুব রি-অ্যাকশনারী হাসি বলে মনে হচ্ছে সার্।

ভারত প্রেমকথা

ভাস্কর ও পৃথা

পৃথা বলে—আমার কোন বর প্রয়োজন নেই বিপ্রর্ষি। আমার আচরণে অতিথিরূপী দেবতা আপনি সুখী হয়েছেন, পিতা কুন্তীভোজও সুখী হয়েছেন, আমার বরলাভ হয়েই গিয়েছে। এর চেয়ে বড় আর কোন উপহারে প্রয়োজন নেই।

বিপ্রর্ষি দুর্বাসা বিদায় নেবার আগে সস্নেহ দৃষ্টি তুলে কুমারী পৃথার দিকে তাকিয়েছিলেন, এইবার হেসে ফেললেন—প্রয়োজন আছে পৃথা।

সত্যই বুঝে উঠতে পারে না পৃথা, তার জীবনে আর কোন বরের কি প্রয়োজন আছে? অনপত্য কুন্তীভোজের পিতৃস্নেহের এই সুখময় নীড়ের বাইরে জীবনের এমন আর কি সুখ থাকতে পারে, বুঝতে পারে না কুন্তীভোজের পালিতা কন্যা পৃথা। বুঝবার মত বয়সও হয়নি। এখন মাত্র কৈশোর, ঊষালোকের স্নিগ্ধতা দিয়ে রচিত এক কন্যকার মূর্তি। পরিপূর্ণ প্রভাতের যে লগ্ন আসন্ন হয়ে উঠেছে, যে লগ্নে মুদ্রিত কলিকার মত এই সুশান্ত রূপ আলোকের পিপাসায় উন্মুখ হয়ে উঠবে, তার আভাস কুমারী পৃথার অঙ্গে অঙ্গে ফুটে উঠলেও এখনও মনের মধ্যে ফুটে ওঠেনি। পিতা কুন্তীভোজের স্নেহে লালিতা ঐ লীলাচপলা মৃগললনার মত এই আলয় ও আঙিনায় ছুটোছুটির খেলা, দেবপূজা আর অতিথিসেবার খেলা, এর চেয়ে বেশি আনন্দের জীবন আর কি আছে? কুঞ্জলতিকার সাথে ক্ষণে ক্ষণে অভিমানের খেলা, সরোবরজলে বিম্বিত ছায়ার খেলা, কৌতূকের খেলা, আর কবরীপুষ্পলুব্ধ দুরন্ত ভ্রমরের সাথে ভ্রূকুটির খেলা, এর চেয়ে বেশি মায়ার খেলা দিয়ে গড়া অন্য কোন জগৎ কি আছে?

ঋষি দুর্বাসা প্রীতস্বরে আবার বলেন—প্রয়োজন আছে পৃথা। আজ না হোক, কাল না হোক, কিন্তু বেশি দিন আর নেই, তোমাকে জীবনসঙ্গী বরণ করতে হবে। আশীর্বাদ করি, প্রিয়দর্শিনী পৃথা প্রিয়দর্শন সঙ্গী লাভ করুক।

মানুষের আচরণে কোন না কোন ত্রুটি দেখতে পেয়েই থাকেন দুর্বাসা। সে ত্রুটি সহ্য করতে পারেন না দুর্বাসা। অসুখী হন এবং অভিশাপ দিয়ে থাকেন। সংসারের রীতিনীতির কোন দুর্বলতাকে ক্ষমার চক্ষু নিয়ে দেখতে পারেন না দুর্বাসা, কারণ সাংসারিকতার জন্য কোন মমতাও তাঁর নেই।

কিন্তু এতদিন কুন্তীভোজের আলয়ে থেকে একটি দিনের জন্যও অসুখী বোধ করেননি ঋষি দুর্বাসা। কুমারী পৃথা অহর্নিশ অতিথি দুর্বাসার সেবা করেছে। পৃথার আচরণে কোন ত্রুটি দেখতে পাননি দুর্বাসা।

মানুষের সামান্য ত্রুটিতে ঋষি দুর্বাসা ক্ষুব্ধ হন বড় বেশি এবং তাঁর অভিশাপও হয় মাত্রাছাড়া। কিন্তু জীবনে আজ এই প্রথম প্রীত হয়েছেন দুর্বাসা, তাই পৃথাকে আশীর্বাদ করছেন। জীবনে বোধহয় মানুষকে এই প্রথম আশীর্বাদ করলেন দুর্বাসা।

এই আশীর্বাদের অর্থ বুঝতে পারে না পৃথা। কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে পৃথা—সে প্রিয়দর্শন কোথায় আছেন ঋষি?

দুর্বাসা—তোমার মনে। মন যাকে চাইবে, তাকেই আহ্বান করো।

চলে গেলেন বিপ্রর্ষি দুর্বাসা। যাবার আগে এক কুমারী কিশোরিকার মনে কি মন্ত্র তিনি দিয়ে গেলেন, তার পরিণাম কি হতে পারে, দুর্বাসার পক্ষে কল্পনা দিয়ে অনুভব করাও সম্ভব নয়। কারণ, তিনি সংসার ও সমাজকে দূর থেকে দেখেছেন। তাঁর অভিশাপ যেমন মাত্রাছাড়া, আশীর্বাদ বা বরদানও তেমনি মাত্রাছাড়া। মন থেকে যাকে চাইবে তাকেই জীবনে আহ্বান করা, এত বড় ইচ্ছাবিলাসের মন্ত্র পার্থিব দুর্বলতা দিয়ে রচিত মানুষের সমাজ সহ্য করতে পারে কিনা, সেটুকুও বিচার করলেন না, এবং কুমারী পৃথা এই মন্ত্রের কি অর্থ বুঝল, তাও জানবার প্রয়োজন বোধ করলেন না দুর্বাসা।

বিস্মিত কুন্তীভোজ শুধু জেনে সুখী হলেন যে, দুর্বাসার মত রোষপ্রবণ ঋষি প্রসন্নচিত্তে পৃথাকে আশীর্বাদ করে বিদায় নিয়েছেন। পৃথা জেনে সুখী হলো, তারই কৃতিত্বের গুণে দুর্বাসা তুষ্ট হয়েছেন, পিতার সম্মান রক্ষা পেয়েছে। এই আনন্দেই পিতা কুন্তীভোজের লীলাচঞ্চল কুরঙ্গীর জীবনের মত কিশোরিকা পৃথারও জীবনের মুহূর্তগুলি চাঞ্চল্যে লীলায়িত হতে থাকে।

এই চঞ্চলতা ধীরে ধীরে তার নিজেরই অগোচরে যৌবনভারে মন্দীভূত হয়ে এসেছে, নিজেই অনুভব করতে পারেনি পৃথা। শুধু সরোবরনীরে মৃদুকম্পিত প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে চকিতপ্রেক্ষনা পৃথা তার মনের নিভৃতে অভিনব এক বেদনা অনুভব করে। মনে হয়, এই পৃথিবীর আলোছায়ার খেলা শুধুই খেলা নয়, যেন এক সুন্দরের অন্বেষণ। এই শিশির রৌদ্র জ্যোৎস্না, তৃণ পুষ্প লতা, কেউ যেন একলা পড়ে থাকতে চায় না। জগতে যেন শব্দ কর্ণ ও সৌরভ শিহরিত ক'রে জীবনের সঙ্গী অন্বেষণের এক অহরহ খেলা চলেছে। নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে আরও বিস্মিত হয় পৃথা। মনের গভীরে যেন এক স্বপ্ন নীহারনদের মত ঘুমিয়ে ছিল, সেই স্বপ্ন আজ তার শোণিতের উত্তাপে তরলিত স্রোতের মত জেগে উঠে সারা অঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। কেন, কিসের জন্য?

জীবনে এই প্রথম ভাবনার ভার অনুভব করে পৃথা। নিজেরই নিঃশ্বাসের শব্দে অকারণে চমকে ওঠে। নিশীথসমীরণের মৃদুলতাও উপদ্রব বলে মনে হয়, সুখতন্দ্রা ভেঙে যায়। আকাশের তারার মত রাত জাগে পৃথা। ভোর হয়। সেদিনও ভোর হলো। তখনও নভঃপটের শেষ তারকা বিদায় নেয়নি, প্রাচী মূলে ঊষারাগ যেন প্রথম লজ্জায় কুণ্ঠিত হয়ে আছে। তেমনই নিজ দেহের প্রথম লজ্জায় বিব্রত পুষ্পবতী পৃথা ছায়াচ্ছন্ন নিশান্তের মুহূর্তে শেষ হবার আগেই উদ্যান-সরোবরের জলে স্নান সমাপন করে।

পূর্ব গগনের দিকে একবার নয়ন সম্পাত করতেই পৃথার মনে হয়, যেন নবোদিত দিবাকরের মত রশ্মিমান এক দিব্যকায় পুরুষপ্রবর তরুবীথিকার মধ্যে দাঁড়িয়ে তারই দিকে তাকিয়ে আছে। কি নয়নাভিরাম মুখচ্ছবি! তারুণ্যে মণ্ডিত এক প্রিয়দর্শন। ঐ

চিবুক যেন উষালোকে জাগ্রত সমস্ত সংসারের চুম্বনে রঞ্জিত হয়ে রয়েছে। ওষ্ঠাধরে সমুদ্রের কামনা স্পন্দিত, নয়ন আকাশের নীলিমায় প্লাবিত।

কে ইনি? প্রশ্ন মনে জাগলেও তার পরিচয় অনুমান করতে পারে না পৃথা। এক প্রিয়দর্শন বিস্ময় যেন আজিকার প্রভাতে পৃথার হৃদয়কুটিরের সম্মুখপথে ক্ষণিকের জন্য এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আর কতক্ষণ? হয়তো এখনি চলে যাবে, এই ভূলোকের অপার রহস্যের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে ঐ রূপ।

মন চায় একবার কাছে ডাকি, কিন্তু লজ্জা বলে—ডেকো না। চক্ষু চায় অনেকক্ষণ দেখি, কিন্তু ভয় বলে—দেখো না। এই অদ্ভুত লজ্জা ও ভয়ের মধ্যেও যেন রহস্যময় এক মধুরতা লুকিয়ে আছে। এই লজ্জা রাখতে ইচ্ছা করে, ভাঙতেও ইচ্ছা করে।

অকস্মাৎ, যেন এক খরকিরণের স্পর্শে পৃথার নয়ন-মনের সকল কুণ্ঠা দীপ্ত হয়ে ওঠে। সুগীত মন্ত্রের মত এক আশীর্বাণীর ধ্বনি যেন পৃথার অন্তরে হর্ষের কল্লোল জাগিয়ে তুলেছে। মনে পড়েছে ঋষি দুর্বাসার উপদেশ।

মন যাকে চায় তাকেই তো আহ্বান করতে হবে, এই প্রগল্ভ মুহূর্তে দুর্বাসার উপদেশ সবচেয়ে বড় সত্য বলে মনে হয় পৃথার। হোক না অপরিচিত, এই তো জীবনের প্রথম প্রিয়দর্শন, মণিদীপ্ত কুণ্ডলে আর রত্নখচিত কবচে শোভিত এক নয়নমোহন তনুধর।

যেন এক কৌতূহলের খেলার আবেগে সব ভয় ও লজ্জা সরিয়ে কুমারী পৃথা তার জীবনের প্রথম প্রিয়দর্শনের প্রতি আহ্বান জানায়—এস।

সে আসে, সম্মুখে দাঁড়ায়, অংশপুঞ্জে রচিত সেই যৌবনবান অপরিচিতের বদনপ্রভার দিকে বিস্ময়ভরে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে পৃথা। তার পর প্রশ্ন করে —কে আপনি?

—আমি দেবসমাজের ভাস্কর। তুমি কে?

—আমি মর্ত্যের মেয়ে পৃথা। কুন্তীভোজের কন্যা।

—কাছে ডেকেছ কেন?

—ইচ্ছা হলো।

—কেন ইচ্ছা হলো?

—কাছে ডাকবার জন্য।

পৃথার কথায় ভাস্করের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। ইচ্ছার অর্থ জানে না, ইচ্ছার অর্থ বলতে পারে না, অথচ ইচ্ছার হাতেই আপন সত্তাকে সঁপে দিয়ে ফেলেছে নবোদ্ভিন্নযৌবনা এই মর্ত্যকুমারী। শুক্তির তৃষ্ণা যদি স্বাতীসলিলের হর্ষ নিকটে আহ্বান করে, জলকুমুদিনীর আকুলতা যদি পূর্ণ শশধরের রশ্মিধারা নিকটে আহ্বান করে, এলালতা যদি চন্দনতরুকে কাছে ডাকে, পরাগবিধূরা পদ্মিনা যদি মত্ত ভ্রমরের সান্নিধ্য আহ্বান করে, তবে তার কি পরিণাম হতে পারে, কল্পনা করতে পারেনি পৃথা। তবু আহ্বান করেছে পৃথা।

ভাস্করের স্মিতমুখের বিচ্ছুরিত মায়া অপার্থিব আলোকের মালিকার মত পৃথার চেতনার চারিদিকে এক মেখলা সৃষ্টি করে, তারই মধ্যে যেন এক রমণীয় মূর্চ্ছায় অভিভূত

হয় পৃথার সব কৌতূহল আর আগ্রহ। প্রতিদিনের নিয়ম থেকে কতগুলি মুহূর্ত হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে সমাজ ও সংসারের অগোচরে এক গোপনমিলনের লগ্ন রচনা করে।

ভাস্কর বলে—চপল কিশোরিকা, তুমি কেন আমাকে কাছে ডেকেছ, তার অর্থ তুমি জান না, কিন্তু আমি জানি।

মুহূর্তের জন্য সন্ত্রস্ত হয় পৃথা—আপনি এইবার চলে যান দেব ভাস্কর, আমার দেখা হয়ে গিয়েছে।

—কি?

—দেখেছি আপনি প্রিয়দর্শন। মন চেয়েছিল আপনাকে কাছে ডাকি। কাছে ডেকেছি, আপনি কাছে এসেছেন, আমার কৌতূহল মিটে গিয়েছে।

—কিন্তু আমার নয়নের পিপাসা মিটে যায়নি পৃথা।

সুভীরু বাসনার শিহরের মত যেন এক অবশ ও অসহায় আপত্তির ভাষা পৃথার আবেদনে শিহরিত হয়—ক্ষমা করুন, চলে যান ভাস্কর।

—চলে যেতে পারি না প্রিয়দর্শিনী।

দক্ষিণ বাহু প্রসারিত ক'রে নিবিড় সমাদরে পৃথার চিবুক স্পর্শ করে ভাস্কর। দক্ষিণসমীর চঞ্চল হয়, পুঞ্জ পুঞ্জ লবঙ্গকেশর সৌরভ ছড়িয়ে উড়ে যায়। ক্রৌঞ্চনিনাদিত সরোবরতট অকস্মাৎ নিস্তব্ধ হয়। ভাস্করের আলিঙ্গনে সমর্পিততনু কুমারী পৃথার সত্তা এক পরম স্পর্শমহোৎসবে নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

ভাস্কর বিদায় নিয়ে চলে যান।

রাজা কুন্তীভোজের আলয়ে আর একটি প্রভাত বেলা। কর্ণে নবকর্ণিকার, নয়নে কৃষ্ণাঞ্জন, কালাগুরুধূপিত কেশস্তবকে কবরীছন্দ রচনা করেছিল কুমারী পৃথা। পৃথাকে দেখতে পেয়ে সহাস্যমুখে সম্মুখে এসে দাঁড়ায় ধাত্রেয়িকা।

পৃথা বলে—স্বপ্নের অর্থ বলতে পার ধাত্রেয়িকা?

ধাত্রেয়িকা—পারি।

পৃথা—অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখেছি ধাত্রেয়িকা, কিন্তু তার অর্থ বুঝতে পারছি না।

ধাত্রেয়িকা—বল, কি স্বপ্ন দেখেছ?

পৃথা—দেখলাম, রাত্রির আকাশ থেকে প্রতিপদের চন্দ্রলেখা এসে আমার বুকের ভিতর মিলিয়ে গেল। জেগে উঠেও কেমন ভার ভার মনে হচ্ছে, যেন সে আমার বুকের ভিতরেই রয়েছে, আর প্রতিমুহূর্তে বড় হয়ে উঠছে।

ধাত্রেয়িকার হাস্যময় মুখে সংশয়ের বিষণ্ণ ছায়া পড়ে। পৃথার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর আতঙ্কিতের মত চমকে ওঠে—এ কি পৃথা?

পৃথা বিরক্তিভরে বলে—কি হয়েছে?

ধাত্রেয়িকা—গোপনে কাকে বরণ করেছ, বল?

পৃথা—দেব ভাস্করকে।

ধাত্রেয়িকা অসহায়ভাবে আক্ষেপ করে—মন্দভাগিনী কন্যা, কোন্ এক অধম প্রণয়ীর ছলনায় ভুলে নিজের সর্বনাশ করে বসে আছ।

পৃথা—তাঁর নিন্দা করো না ধাত্রেয়িকা। মন যাকে চেয়েছে, তাকেই বরণ করেছি, কোন ভুল করিনি।

—এই মন্ত্র কোথায় শিখলে পৃথা?

—তোমার চেয়ে যিনি শতগুণে জ্ঞানী, তাঁর কাছে শিখেছি।

—কে তিনি?

—বিপ্রর্ষি দুর্বাসা। তিনি আমাকে আশীর্বাদ ক'রে এই মন্ত্র দিয়ে গিয়েছেন।

—বড় ভয়ানক মন্ত্র পৃথা। তুমি ভুল বুঝেছ পৃথা। মানুষের সমাজ এই মন্ত্র সহ্য করতে পারে না। তুমি কুমারী অনূঢ়া অসীমন্তিনী, নিজের ইচ্ছায় অথবা গোপনে কিংবা মন যাকে চায় তাকে আত্মদান ক'রে সন্তানবতী হওয়ার অধিকার তোমার নেই।

—কেন?

—তুমি গোপনের প্রাণী নও পৃথা, তুমি সমাজের মেয়ে। তোমার জন্ম মুহূর্তে শঙ্খধ্বনি হয়েছে, সংসারকে সাক্ষী করবার জন্য। তুমি প্রথম অন্ন গ্রহণ করেছ মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে, সংসারকে সাক্ষী রেখে। সকলের সাক্ষ্যে, সবাকার স্নেহ ও আশীর্বাদের স্বীকৃতিরূপে তুমি বড় হয়ে উঠেছ। তোমার ভাল-লাগা ভাল-বাসা ও প্রিয়-সহবাস, সবই যে সংসারের আশীর্বাদ নিয়ে সার্থক করতে হবে, সংসারকে গোপন ক'রে নয় পৃথা।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে ধাত্রেয়িকা, তারপর শোকার্তের মত ক্রন্দনের সুরে বলে—কিন্তু এ কি ভয়ংকর ভুল করেছ পৃথা। সে আশীর্বাদের অপেক্ষা না ক'রে স্বেচ্ছায় ও গোপনে নির্বোধের মত এক খেলার আবেগে তোমার কুমারী জীবনের সম্মান, পিতার সম্মান, নিজ সমাজের সম্মান নাশ করে দিলে!

পৃথা—এত ধিক্কার দিও না ধাত্রেয়িকা। আমার ভালবাসার সত্যকেও অসম্মান করবার অধিকার কারও নেই। তবে আমি যখন তোমাদের ঘরের মেয়ে, তখন তোমাদের ঘরের সম্মান একটুও মলিন হতে দেব না।

ধাত্রেয়িকা রূঢ় অথচ বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করে—কি করে?

পৃথা—আমার গোপন প্রণয়ের পরিণাম আমিই-গোপনে ভাসিয়ে দেব।

ধাত্রেয়িকা—কেমন করে?

পৃথা—তাকে শুধু পরিচয়হীন করে এই পৃথিবীর কোলে ছেড়ে দেব। এই পৃথিবীর কোন না কোন ঘরে নতুন পরিচয় নিয়ে সে বেঁচে থাকবে। তার জন্য আমার এতটুকু দুঃখ হবে না ধাত্রেয়িকা।

ধাত্রেয়িকা ভ্রুকুটি করে ওঠে—সে কাজ কি এতই সহজ পৃথা? তাও কি গোপন প্রণয়ের মত একটা খেলা?

ধাত্রেয়িকা আর কিছু বলতে পারে না। পৃথাও কোন উত্তর দেয় না। হয়তো

খেলাই মনে করে পৃথা। প্রিয়সঙ্গীর সাথে খেলার আনন্দে বনতলে কুড়িয়ে পাওয়া একটি ফুলের কুঁড়িকে শুধু ইচ্ছা ক'রে হারিয়ে ফেলতে হবে। এর চেয়ে বেশি কঠিন কিছু নয়। এর চেয়ে বেশি দুঃখের কিছু নয়। ধাত্রেয়িকার এত বড় ভ্রূকুটির কোন অর্থ হয় না।

রাত্রিশেষের অন্ধকার। শুকতারার আলোক। কুন্তীভোজের প্রাসাদ হতে বহু দূর। নদীর কিনারায় জলপদ্মের বন। জলের উপর ক্ষুদ্র একটি নৌকা। নৌকার ভিতরে অনাবৃত একটি পেটিকা। পেটিকার মধ্যে ঘুমন্ত কুসুমকোরকের মত সদ্যোজাত এক শিশুর ঘুমন্ত মুখের কাছে মুখ নামিয়ে দেখতে থাকে পৃথা। একটি ক্ষুদ্র হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক শব্দ শোনা যায়, ক্ষুদ্র ছন্দের স্পন্দিত ছোট ছোট শ্বাসবায়ুর মৃদু উত্তাপ পৃথার মুখে এসে লাগে।

নদীর তরঙ্গস্রোতে কলরোল জাগে। তটরজ্জু ছিন্ন ক'রে এই মুহূর্তে এই নৌকা ভাসিয়ে দিতে হবে। রজ্জু ছিন্ন করবার জন্য হাত তোলে ধাত্রেয়িকা। আর্তনাদ করে ধাত্রেয়িকার হাত চেপে ধরে পৃথা। ধাত্রেয়িকা ভ্রূকুটি করে—এ কি?

পৃথা—এ কি সর্বনাশ করছ ধাত্রেয়িকা!

ধাত্রেয়িকার মুখে শ্লেষাক্ত হাসির রেখা ফুটে ওঠে—তোমার গোপন প্রেমের পরিণাম গোপনে ভাসিয়ে দিচ্ছি, এর জন্য আবার আর্তনাদ কেন পৃথা?

ধাত্রেয়িকার হাত আরও কঠিন আগ্রহে চেপে ধরে রাখে পৃথা। নইলে তার বক্ষঃপঞ্জর যেন বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

করুণ হয়ে ওঠে ধাত্রেয়িকার মুখ। সান্ত্বনার স্বরে বলে—দুঃখ করো না পৃথা, তোমার কলঙ্ক এইভাবে গোপনে ভাসিয়ে না দিয়ে তো উপায় নেই।

কলঙ্ক? পৃথার যৌবনের শোণিতে প্রথম মধুরতার পুলকে স্ফুটিত করুণার এক রক্তকমল, যার স্পর্শে পীযূষধন্য হয়েছে পৃথার কুমারীদেহ, সে কি আজ এইভাবে ভেসে চলে যাবে লক্ষ্যহীন ভবিষ্যতে, এই অন্ধকারে, তরঙ্গের ক্রীড়নকের মত দূর হতে দূরান্তরে? এই তো জীবনের প্রথম প্রিয়দর্শন, মন যাকে কাছে চায় সে তো এই, যাকে বিদায় দিতে পৃথার ইহকালের সমস্ত অদৃষ্ট কেঁদে উঠেছে।

পৃথা বলে—কলঙ্ক বলো না ধাত্রেয়িকা, ও আমার সন্তান।

দুর্দম ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস রোধ করে পৃথা। কিন্তু রোধ করতে পারে না দুর্বার এক স্পৃহা। দুর্বহ বেদনারসভারে বিহ্বল বক্ষের কলিকা নিদ্রিত শিশুর স্পন্দিত অধরে অর্পণ করিবার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে পৃথা। বাধা দেয় ধাত্রেয়িকা। —না, কাছে যেও না পৃথা। শান্ত হও পৃথা।

শান্ত হয় পৃথা।

ধাত্রেয়িকার চক্ষু বাষ্পায়িত হয়ে ওঠে। দেখতে পেয়েছে, আর দেখে বিস্মিত হয়েছে ধাত্রেয়িকা, এতদিনে যেন পৃথা তার নারীজীবনের ইচ্ছার অর্থটুকু বুঝতে পেরেছে।

প্রগল্‌ভা কৌতুকিনী নয়, আজ নিশান্তের অন্ধকারে বসে আছে এক মমতার মাতৃকা, যার শূন্যবক্ষের যাতনা অশ্রুস্রোত হয়ে জলপদ্মের বনে ঝরে পড়ছে।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে থাকে পৃথা। তারপর যেন উৎকর্ণ হয়ে দূরান্তের জলরোলের মূর্চ্ছনা শুনতে থাকে।

—শুনতে পাচ্ছ ধাত্রেয়িকা?

পৃথার প্রশ্নে ধাত্রেয়িকা বিস্মিত হয়—কি পৃথা?

পৃথা — নুপুরের শব্দ। এই পৃথিবীর কোন মানুষের ঘরের আঙিনায় ক্রীড়াচঞ্চল এক শিশুর ছুটাছুটি, তার পায়ের ছোট ছোট নুপুরের ঝংকারে সে আঙিনার বাতাস মধুর হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে তো আমার ঘরের আঙিনা নয়।

ধাত্রেয়িকা উত্তর দেয় না।

দূরান্তের ঘন অন্ধকারের দিকে স্থিরদৃষ্টি তুলে কি-যেন দেখতে থাকে পৃথা। ধাত্রেয়িকা বলে—অমন করে কি দেখছ পৃথা?

পৃথা—দেখছি, এই পৃথিবীর কোন গৃহে, প্রাসাদে কিংবা কুটীরে, এক নারীর কোলে পরিচয়হীন এক শিশু বড় হয়ে উঠছে, দু'হাতে গলা জড়িয়ে তাকে মা বলে ডাকছে। সে মা কিন্তু আমি নই ধাত্রেয়িকা।

পৃথার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে ব্যথিতা ধাত্রেয়িকার দুই বাষ্পায়িত চক্ষু।

হঠাৎ চমকে ওঠে পৃথা। ধাত্রেয়িকা ভয়ার্ত স্বরে বলে—কি হলো পৃথা?

পৃথা—উৎসবের শঙ্খ বাজছে ধাত্রেয়িকা। এখান থেকে বহু দূরে বহু বৎসর পরে, এই রাত্রি যেন ভোর হয়ে গিয়েছে। সুন্দরতনু এক যুবক বরবেশে চন্দ্রমুখী বধূ সঙ্গে নিয়ে মঙ্গলকলসে সজ্জিত এক ভবনের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে। ধান্যদূর্বা হাতে নিয়ে এক মাতা এসে বরবধূকে আশীর্বাদ করছে। পুত্র নত হয়ে মাতার পদধূলি নিয়ে শিরে ধারণ করছে। সুন্দর হাস্যে প্রসন্ন হয়ে উঠছে মাতার আনন। সে মাতা কিন্তু আমি নই ধাত্রেয়িকা।

পৃথার সজল দৃষ্টি কিছুক্ষণের মত যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মনে হয়। ধাত্রেয়িকা অনুযোগের সুরে বলে—এখনও দূরের দিকে তাকিয়ে বৃথা আর কি দেখছ পৃথা?

পৃথা বলে—দেখছি ধাত্রেয়িকা, দীপাবলীর শোভা জেগেছে এক নগরে। উৎসবের হর্ষে আকুল পথজনতার মাঝখান দিয়ে কে আসছে দেখ ধাত্রেয়িকা। তেজোদৃপ্ত এক শত্রুঞ্জয় বীর রথযাত্রা সমাপ্ত ক'রে ঘরে ফিরে আসছে। পুত্রগর্বে গরীয়সী মাতা এসে সেই বীর পুত্রের ললাটে জয়তিলক এঁকে দিলেন। সে বীরমাতা কিন্তু আমি নই ধাত্রেয়িকা।

চুপ করে পৃথা। নিস্তব্ধ অন্ধকারের বাতাস হঠাৎ বীতনিদ্র বিহগের রবে যেন সাড়া দিয়ে শিউরে ওঠে। ধাত্রেয়িকা ব্যস্তভাবে বলে—ভোর হয়ে এল পৃথা।

ধাত্রেয়িকার হাত ছেড়ে দিয়ে পৃথা নিজেরই দুই চক্ষু দুই হাতে আবৃত করে। নৌকার রজ্জু ছিন্ন করে ধাত্রেয়িকা। এক পরিচয়হীন শিশুর জীবনস্পন্দন বহন ক'রে একটি তরণী নিশান্তের নদীস্রোতে দূরান্তরে চলে যায়।

ধাত্রেয়িকার ছায়া অনুসরণ ক'রে অবসন্ন দেহ নিয়ে ধীরে ধীরে রাজপ্রাসাদের দিকে ফিরে যেতে থাকে পৃথা। পূর্ব দিগন্তে তখন নবারুণের উদয়চ্ছটা নয়নহরণ শোভা ছড়িয়ে দিয়েছে। পৃথা মুহূর্তের মত সেদিকে একবার শুধু তাকিয়ে যেন অভিমানভরে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। এই তো সেই ভয়ংকর ভুলের সুন্দর লগ্ন, যে লগ্নে মন যাকে চায় তাকেই গোপনে কাছে ডেকেছিল পৃথা। তার পরিণাম এই নিঃশব্দ ভার, চিরজীবন গোপনে বহন করে ফিরতে হবে, অতি সাবধানে, যেন কেউ শুনতে না পায়।

পৃথা বলে—বুঝতে পেরেছি ধাত্রেয়িকা।

ধাত্রেয়িকা—কি?

পৃথা—ঋষি দুর্বাসা আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন।

সংবরণ ও তপতী

তাঁর নাম ভগবান আদিত্য, লোকে তাঁকে বলে লোকপ্রদীপ। সমাজকল্যাণই তাঁর জীবনের ব্রত।

সমাজকল্যাণ কোন নূতন কথা নয়, নূতন আদর্শও নয়। বহু আদর্শবাদী আছেন, যাঁরা সমাজের কল্যাণসাধনার কাজকেই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেছেন।

এই জন্য নয়; ভগবান আদিত্য সমাজকল্যাণের এমন একটি নীতি প্রচার করেন, যা তাঁর আগে কেউ করেননি। সমদর্শিতার নীতি। পাত্র ও অপাত্র বিচার নেই; সকলের প্রতি তাঁর সমান মমতা, সমান সম্মান। নিতান্ত পাপাচারীর প্রতি তাঁর যে আচরণ, সদাচারীর প্রতিও তাই।

শাস্ত্রজ্ঞানীরা মনে করেন, এই আদর্শে ভুল আছে। —আপনি যে আলোক দিয়ে নিশান্তের অন্ধকার দূর করে তৃষ্ণার্ত হরিণশিশুকে নির্ঝরের সন্ধান দেন, সেই আলোকেই আবার ক্ষুধার্ত সিংহ হরিণশিশুকে দেখতে পায়। যে আলোক দিয়ে হরিণশিশুকে পথ দেখালেন, সেই আলোক দিয়ে হরিণশিশুর মৃত্যুকেও পথ দেখালেন, কি অদ্ভুত আপনার সমদর্শিতা?

আদিত্য বলেন—আবার সেই আলোকেই সন্ধানী ব্যাধ সিংহকে দেখতে পায়।

শাস্ত্রীজ্ঞানীরা তবু তর্ক করেন—কিন্তু এমন সমদর্শিতায় কা'র কি লাভ হলো? হরিণশিশুর প্রাণ গেল সিংহের কাছে, সিংহের প্রাণ গেল ব্যাধের কাছে। আবার ব্যাধের প্রাণ হয়তো.....।

আদিত্য—হ্যাঁ, সেই আলোকে ব্যাধের শত্রুও ব্যাধকে দেখতে পেয়ে হয়তো সংহার করবে। এই তো সংসারের একদিকের রূপ, এক পরম সমদর্শীয় নীতি সকল জীবের পরিণাম শাসন ক'রে চলেছে। আমি সেই নীতিকেই সেবা করি।

শাস্ত্রজ্ঞানীরা আদিত্যের এই মীমাংসায় সন্তুষ্ট হন না। তর্কের ক্ষণিক বিরামের মধ্যে হঠাৎ উপস্থিত হয় ভগবান আদিত্যের কন্যা তপতী।

তপতী বলে—যে আলোকে নিশান্তের অন্ধকার দূর হয়, সেই আলোকেই মুদ্রিত কমলকলিকা স্ফুটিত হয়, সেই আলোকেই সন্ধান পেয়ে অলিদল কমলের মধু আহরণ ক'রে নিয়ে যায়, সেই মধুই আবার ওষধিরূপে প্রাণকে পুষ্টি দান করে। শুধু সংহার কেন, সৃষ্টির লীলাও যে এক পরম সমদর্শীর সমান করুণার আলোকে চলছে।

শাস্ত্রজ্ঞানীরা অপ্রস্তুত হন। আদিত্য সস্নেহ দৃষ্টি তুলে তপতীর দিকে তাকান। শুধু আদিত্যের স্নেহে নয়, আদিত্যের শিক্ষায় লালিত হয়ে তপতীও আজ সিদ্ধসাধিকার মত তার অন্তরে এক আলোকের সন্ধান পেয়েছে। বহু অধ্যয়নেও শাস্ত্রজ্ঞানীরা যে সহজ সত্যের রূপটুকু ধরতে পারেন না, পিতা আদিত্যের প্রেরণায় শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে সেই সত্যের রূপ উপলব্ধি করেছে তপতী। ঐ জ্যোতিরাধার সূর্য, ঊর্ধ্বলোক হতে মর্ত্যের সকল সৃষ্টির উপর আলোকের করুণা বর্ষণ করছেন, যেন এক বিরাট কল্যাণের যাজ্ঞিক। কিন্তু কারও প্রতি বিশেষ কৃপণতা নেই, কারও প্রতি বিশেষ উদারতাও নেই। সমভাবে বিতরিত এই কল্যাণই নিখিলের আনন্দ হয়ে ফুটে ওঠে।

কল্যাণী হও! এ ছাড়া তপতীকে আর কোন আশীর্ব্বাদ করেন না আদিত্য। রূপ যৌবন অনুরাগ বিবাহ পাতিব্রত্য ও মাতৃত্ব, সবই সমাজকল্যাণের জন্য, আত্মসুখের জন্য নয়। এই নিখিলরাজিত কল্যাণধর্ম্মের সঙ্গে ছন্দ রেখে যে জীবন চলে, তারই জীবনে আনন্দ থাকে। যে চলে না, তার জীবনে আনন্দ নেই।

পিতা আদিত্যের এই শিক্ষা ও আশীর্বাদ কতখানি সার্থক হয়েছে, কুমারী তপতীর মুখের দিকে তাকালেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। মন্ত্রবারিসিক্ত পুষ্পস্তবকের মত স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে রচিত একখানি মুখ। এই রূপ প্রভা আছে, জ্বালা নেই। এই চক্ষুর দৃষ্টি নক্ষত্রের মত করুণামধুর, দ্যুতির মত খরপ্রভ নয়। সত্যই এক কুমারিকা কল্যাণী যেন অন্তরের শুচিতা দিয়ে তার যৌবনের অঙ্গশোভাকে মধুচ্ছন্দা কবিতার মত সংযত ক'রে রেখেছে।

শাস্ত্রজ্ঞানীরা যা-ই বলুন, আর যতই বিরোধিতা করুন, আদিত্যের প্রচারিত সমাজকল্যাণ ও সমদর্শিতার নীতিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন আর একজন, নৃপতি সংবরণ। সংবরণের সেবিত প্রজাসাধারণ নূতন এক সুখী ও সম্মানময় জীবনের অধিকার পেয়েছে।

রাজ্য বিত্ত রূপ ও যৌবনের অধিকার পেয়েও রাজা সংবরণ এখনও অবিবাহিত। আত্মসুখের সকল বিষয় কঠোরভাবে বর্জন করেছেন সংবরণ। সংবরণ বিশ্বাস করেন, কল্যাণব্রত মানুষের ধর্ম হবে ঐ জ্যোতিরাধার সূর্যের ব্রতের মত, যার পুণ্যরশ্মি ভূলোকের সর্ব প্রাণীকে সমান পরিমাণ আলোক দান করে। উচ্চনীচ ভেদ নেই, পাত্রবিশেষে

তারতম্য নেই। সমগ্র চরাচর যেন এই সূর্যের সমান স্নেহে লালিত এক কল্যাণের রাজ্য। যখন অদৃশ্য হন সূর্য, তখনও সর্বজীবকে সমভাবেই অন্ধকারে রাখেন। এই সমদর্শিতার নীতি নিয়ে নৃপতি সংবরণ তাঁর রাজ্যের কল্যাণ করেন।

সংবরণ বিবাহ করেননি, বিবাহের জন্য কোন ঈপ্সা নেই। সংবরণের ধারণা, তিনি বিবাহিত হলে তাঁর সমদর্শিতার নীতি ক্ষুণ্ণ হবে, লোকহিতের ব্রত বাধা পাবে। ভয় হয়, সংসারের সকলের মধ্যে বিশেষভাবে শুধু একটি নারীকে দয়িতারূপে আপন করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সকলকে পর মনে করতে হবে।

সেদিন ছিল সংবরণের জন্মতিথি। যে মহাপ্রাণ শিক্ষকের কাছে জীবনের সবচেয়ে বড় আদর্শের পাঠ গ্রহণ করেছেন, তাঁরই কাছে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য অর্ঘ্য মাল্য ধূপ ও দীপের উপহার নিয়ে আদিত্যের কুটীরে সংবরণ উপস্থিত হলেন। উপবাসশুদ্ধ স্নানস্নিগ্ধ ও সুকঠোরব্রত তরুণ সংবরণের মুখের উপর নবোদিত সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। আদিত্য মুগ্ধভাবে ও সস্নেহে প্রিয় শিষ্য সংবরণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর দুই চক্ষুর দৃষ্টি আশীর্বাদের আবেগে স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে।

তবু আজ আদিত্যের মন যেন এক বিষণ্ণতার স্পর্শে প্রলিপ্ত হয়ে রয়েছে। মনে হয়েছে আদিত্যের, শিষ্য সংবরণ যেন তার জীবনের কি-এক ভুল বিশ্বাসের আবেগে ভুল ক'রে চলেছে। এই তারুণ্যলালিত জীবনকে এত কঠোর কৃচ্ছ্র ক্লিষ্ট ক'রে রাখবার কোন প্রয়োজন ছিল না। সমদর্শিতার জন্য, সমাজকল্যাণের জন্য, এই কৃচ্ছ্রের কোন প্রয়োজন নেই। এই ব্রত বনবাসী যোগীর উপযোগী ব্রত, প্রজাহিতব্রত রাজন্যের জীবনে এমন ব্রত শোভা পায় না।

আশীর্বাদের পর আদিত্য বলেন—একটি অনুরোধ ছিল সংবরণ।

—বলুন।

—তোমার সমদর্শিতায় প্রজার জীবন কল্যাণে ভরে উঠেছে। কিন্তু তুমি বিবাহিত হলে তোমার ব্রতের সাধনায় বাধা আসবে, এমন সন্দেহের কোন অর্থ নেই।

—অর্থ আছে ভগবান আদিত্য।

সংবরণের কথায় চমকে ওঠেন আদিত্য। শিষ্য সংবরণ গুরু আদিত্যের উপদেশের ভুল ধরেছে।

সংবরণ বলেন—আত্মসুখের যে-কোন বিষয়কে জীবনে প্রশ্রয় দিলে স্বার্থবোধ বড় হয়ে ওঠে।

আদিত্য বলেন—আত্মসুখের জন্য নয় সংবরণ, সমাজের কল্যাণের জন্যই বিবাহ। বৈরাগ্য তোমার ব্রত নয়। সমাজে সবাকার মাঝখানে থেকে সমাজের সকল হিতের সাধক হবে তুমি; যাঁরা আদর্শবান, তাঁরা সমাজকল্যাণের জন্যই বিবাহ করেন। এক পুরুষ ও এক নারীর মিলিত জীবন সমাজকল্যাণের একটি প্রতিজ্ঞা মাত্র। এ ছাড়া

বিবাহের আর কোন তাৎপর্য নেই। তুমি জান সংবরণ, আমি সমদর্শী, কিন্তু আমিও বিবাহিত। আমিও পুত্রকন্যা নিয়ে সংসারজীবন যাপন করি। এমন কি, কুমারী কন্যার বিবাহের জন্য অনেক ভাবনাও সহ্য করি।

সংবরণ কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করেন—আপনার কুমারী কন্যা?

আদিত্য—হ্যাঁ, আমার কন্যা তপতী। তাকে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হই।

সংবরণ আরও কৌতূহলী হন—আপনি কি বলতে চাইছেন ভগবান আদিত্য?

আদিত্য—তুমি বিবাহিত হও।

সংবরণ—কাকে বিবাহ করব?

আদিত্য সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারেন না। সংবরণের প্রশ্নে একটু বিব্রত হয়ে পড়েন।

সংবরণ বলেন—আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি ভগবান আদিত্য। আপনার কাছ থেকেই আমি সমদর্শিতার জ্ঞান লাভ করেছি। আপনি আমার শিক্ষাগুরু। তাই অনুরোধ করি, এমন কিছু বলবেন না, যার ফলে আপনার প্রতি আমার বিশুদ্ধ শ্রদ্ধা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়।

আদিত্য জিজ্ঞাসুভাবে তাকান—আমার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা ক্ষুণ্ণ হবে, আমার উপদেশের মধ্যে এমন কোন গর্হণীয় আগ্রহের আভাস কি তুমি পেয়েছ?

সংবরণ—হ্যাঁ গুরু। মনে হয়, আপনার কুমারী কন্যার বিবাহের জন্য আপনার যে ভাবনা, এবং আমাকে বিবাহিত জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখবার জন্য আপনার যে অনুরোধ, এই দু'য়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে।

ভগবান আদিত্য নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। মিথ্যা বলেনি সংবরণ। কন্যা তপতীর জন্য যোগ্য পাত্র খুঁজছেন ভগবান আদিত্য। তাঁর মনে হয়েছে, কুমার নৃপতি সংবরণই তপতীর মত মেয়ের স্বামী হওয়ার যোগ্য। নিজের মনের ইচ্ছাকে আর এক যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখেছেন এবং বুঝেছেন আদিত্য, তাঁর পুত্রবৎ এই তরুণ সংবরণ, তাঁরই শিক্ষা ও দীক্ষায় লালিত ও সমদর্শিতার আদর্শে ব্রতী এই সংবরণের জীবনে তপতীর মত মেয়েই সহধর্মিণী হওয়ার যোগ্য।

আদিত্য তাঁর অন্তর অন্বেষণ ক'রে আর একবার বুঝতে চেষ্টা করেন, সত্যই কি তিনি শুধু তাঁর আত্মজা তপতীর সৌভাগ্যের জন্য সংবরণকে পাত্ররূপে পেতে প্রলুব্ধ হয়েছেন? নিজের মনকে প্রশ্ন করে কোথাও সে-রকম কোন স্বার্থতন্ত্রের কলুষ আবিষ্কার করতে পারেন না ভগবান আদিত্য। কিন্তু কি ভয়ঙ্কর অভিযোগ করেছে সংবরণ!

আদিত্য শান্তভাবে বলেন—যদি এই দু'য়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকে, তাতে অন্যায় কিছু হয়েছে কি সংবরণ?

সংবরণ—যদি সে-রকম কোন ইচ্ছা আপনার থাকে, তবে আপনাকে সমদর্শী বলতে আমার দ্বিধা হবে ভগবান আদিত্য। আপনার কন্যাকে পাত্রস্থ করবার জন্যই আপনার আগ্রহ, সমদর্শিতা ও সমাজকল্যাণের আদর্শের জন্য নয়।

আদিত্য শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বলেন—ভুল করছ সংবরণ। আমি সমদর্শী। তপতী

আমার কন্যা হয়েও যতটা আপন, তুমি আমার পুত্র না হয়েও পুত্রের মতই ততটা আপন। শুধু তপতীকে পাত্রস্থ করবার জন্যই আমার চিন্তা নয়, সংবরণের জন্য যোগ্য পাত্রী পাওয়ার সমস্যাও আমার চিন্তার বিষয়। এক কুমার ও এক কুমারীর জীবন দাম্পত্য লাভ ক'রে সমাজের কল্যাণে নূতন মন্ত্ররূপে সংকল্পরূপে ব্রতরূপে ও যজ্ঞরূপে সার্থক হয়ে উঠবে, এই আমার আশা। এর মধ্যে স্বার্থ নেই, অসমদর্শিতাও ছিল না সংবরণ।

আদিত্য নীরব হন। কিন্তু সংসারের আত্মত্যাগের গর্ব যেন আর একটু মুখর হয়ে ওঠে—ক্ষমা করবেন, আপনার সমদর্শিতার এই ব্যাখ্যা আমি গ্রহণ করতে পারছি না গুরু। আপনি ভুল করছেন ভগবান আদিত্য। আমি শুদ্ধাচারী ও সংযতেন্দ্রিয়, আমি আত্মবর্জিত সমাজসেবার ব্রত গ্রহণ করেছি। বিবাহিত হলে আমার জীবন স্বার্থের বন্ধনে জড়িয়ে পড়বে। এক নারীর প্রতি প্রেমের পরীক্ষা দিতে গিয়ে আমার জীবনে মানবসেবা সর্বকল্যাণের ও সমদর্শনের পরীক্ষা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আদিত্য আর কোন কথা বললেন না। শিক্ষাগুরুর কাছ থেকে নূতন শিক্ষা নিয়ে, শিক্ষার আতিশয্যে শিক্ষাগুরুকে হারিয়ে দিয়ে প্রাসাদে ফিরে গেলেন সুপ্রসন্ন সংবরণ।

বনপ্রদেশে একাকী ভ্রমণে বের হয়েছেন সংবরণ। কোথায় কোন্ বনবাসী যোগী একান্তে দিন যাপন করছেন, কোন্ নিষাদ ও কুটীরে দুঃখ আছে, সবই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবেন সংবরণ এবং দুঃখ দূর করবেন। সমদর্শী সংবরণের অনুগ্রহ কারও জন্য কম বা বেশী নয়। যেমন রাজধানীর প্রজা, তেমনি বনবাসী প্রজা, সর্বপ্রজার সুখ ও শুভের প্রতি স্বচক্ষুর কৌতূহল নিয়ে সর্বদা লক্ষ্য রাখেন সংবরণ, দূতবার্তার উপর নির্ভর ক'রে থাকেন না।

ভ্রমণ শেষ ক'রে বনপ্রান্তে এসে একবার দাঁড়ালেন সংবরণ। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন, কি সুন্দর ও শোভাময় হয়ে রয়েছে পৃথিবী। নীলিমার শান্ত সমুদ্রের মত আকাশে হীরকপ্রভ সূর্যের গায়ে অপরাহ্নের রক্তিমা; নিম্নে বিপুলবিসর্পিত অরণ্যানীর নিবিড় শ্যামলতা। নিকটে অল্পোচ্চ মেঘবর্ণ শৈলগিরি, যার পদপ্রান্তে পুষ্পময় বনলতার কুঞ্জ। একটি দীর্ঘায়ত পথরেখা বনের বক্ষ ধরে ভেদ ক'রে এসে শৈলগিরির ক্রোড়ে উঠে, তারপর প্রান্তরের বক্ষে নেমে গিয়েছে। কিঞ্চিৎ দূরে এক জনপদের কুটীরপংক্তি দেখা যায়।

চলে যাচ্ছিলেন সংবরণ, কিন্তু যেতে পারলেন না। গিরিপথ ধ'রে কেউ একজন আসছে। যোগী নয়, নিষাদ নয়, কিরাত নয়, কোন দস্যুর মূর্তিও নয়। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে যে, তার দেহের ভঙ্গী ও পদক্ষেপে অদ্ভুত এক ছন্দ যেন স্পন্দিত হচ্ছে। মঞ্জীর নেই, তাই তার মধুর ধ্বনি শোনা যায় না।

সেই মূর্তি কিছুদূর এগিয়ে এসে হঠাৎ থেমে গেল। সংবরণ এতক্ষণে দেখতে পেলেন, এক তরুণী নারীর মূর্তি।

পথের উপর দাঁড়িয়ে আছেন সংবরণ। তরুণীর মূর্তিও আর অগ্রসর হয় না। তীব্র কৌতূহলে বিচলিত সংবরণ আগন্তুকার দিকে এগিয়ে যান, এবং বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। এই শোভাময় পৃথিবীর রূপে কোথায় যেন একটু শূন্যতা ছিল, এই বিচিত্র নিসর্গচিত্রের মধ্যে কোথায় যেন একটি বর্ণচ্ছটার অভাব ছিল, এই তরুণী পৃথিবীর সেই অসমাপ্ত শোভাকে পূর্ণ করে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পরমুহূর্তে মনে হয়, শুধু তাই নয়, এই নিভৃতচারিণী রূপমতী যেন এই ধরণীর সকল রূপের সত্তা। পুষ্পে সুরভি দিয়ে, লতিকায় হিল্লোল দিয়ে, কিশলয়ে কোমলতা দিয়ে, পল্লবে শ্যামলতা দিয়ে এবং স্রোতের জলে কলনাদ জাগিয়ে এই রূপের সত্তা অলক্ষ্যে ভূলোকের সকল সৃষ্টির পথে বিচরণ করে। সংবরণের সৌভাগ্য, আজ তার চক্ষুর সম্মুখে সেই রূপের সত্তা পথ ভুল ক'রে দেখা দিয়ে ফেলেছে।

অনেকক্ষণ দেখা হয়ে গেল। এতক্ষণে পথ ছেড়ে পাশে সরে যাবার কথা। কিন্তু নৃপতি সংবরণ এই শিষ্টতার কর্তব্যটুকুও যেন এই মোহময় মুহূর্তে বিস্মৃত হয়েছেন।

সংবরণের এই বিস্ময়নিবিড় অপলক দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়িয়ে থেকে তরুণীর মূর্তিও ধীরে ধীরে ব্রীড়ানত হয়ে আসে। কিন্তু এই অক্ষান্ত পল্লবমর্মর, চঞ্চল সমীরের অশান্ত আবেগ, অবারিত মিলন ও আকাঙ্ক্ষার জগৎ এই বনময় নিভৃতে তরুণীর এই ক্রীড়ানত দৃষ্টির সংযম যেন নিতান্ত অবান্তর বলে মনে হয়।

সংবরণ বলেন—শোভান্বিতা, তোমার পরিচয় জানি না, কিন্তু মনে হয় তোমার পরিচয় নেই।

তরুণীর আয়ত নয়নের দৃষ্টি ক্ষণিকের মত বিহ্বল হয়ে ওঠে। এই সুন্দর পুরুষের মূর্তি যেন সব অন্বেষণের শেষে তারই জীবনের পথে এসে দাঁড়িয়েছে। এই পল্লবের সঙ্গীত, এই বনতরুর শিহরণ, এই গিরিক্রোড়ের নিভৃত এবং এই লগ্ন, সবই যেন এই দুই জীবনের দৃষ্টিবিনিময় সফল করবার জন্য পার্থিব কালের প্রথম মুহূর্তে রচিত হয়েছিল। মনে হয়, এই মর্ত্যভূমির সঙ্গে আর এই বর্তমানের সঙ্গে এই বরতনু পুরুষের কোন সম্পর্ক নেই। যেন দেশকালের পরিচয়ের অতীত এক চিরন্তন দয়িত, যার বাহুবন্ধন বরণ করবার জন্য নিখিলনারীর যৌবন আপনি স্বপ্নায়িত হয়। ঐ কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণের জন্য কামিনীর করলতা আপনি আন্দোলিত হয়।

মাত্র ক্ষণিকের বিহ্বলতা, পরমুহূর্তেই তরুণীর মূর্তি যেন সতর্ক হয়ে ওঠে।

তরুণী প্রশ্ন করে—আপনার পরিচয়?

—আমি দেশপ্রধান সংবরণ।

আকস্মিক ও রূঢ় এক বিস্ময়ের আঘাতে তরুণী চমকে ওঠে, পিছনে সরে যায়। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দূরান্তের দিগ্বলয়ের দিকে নিষ্কম্প দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বিলোল স্বর্ণাঞ্চল দু'হাতে টেনে নিয়ে যেন তার বিপন্ন যৌবনের সংকোচ কবচিত করে। যেন এক অপমানের স্পর্শ থেকে আত্মরক্ষা করতে চাইছে অনাম্নী এই নারী।

সংবরণ বিচলিত হয়ে ওঠেন—মনে হয়, তুমি যেন এক কল্পলোকের কামনা।

—না রাজা সংবরণ, আমি এই ধূলিমলিন মর্ত্যলোকেরই সেবা।

—তুমি মূর্তিমতী প্রভা, তোমার পরিচয় তুমিই।

—না, দিবাকর তার পরিচয়।

—তুমি স্ফুটকুসুমের মত সুরুচিরা।

—পুষ্পদ্রুম তার পরিচয়।

—তুমি তরঙ্গের মত ছন্দোময়।

—সমুদ্র তার পরিচয়। আমার পরিচয় আছে রাজা সংবরণ। আমি সাধারণী, সংসারের নারী, কুমারী।

সংবরণ—যে-ই হও তুমি, মনে হয়, তুমি আমারই জীবনের আকাঙ্ক্ষা। আমার এই কণ্ঠমাল্য গ্রহণ কর।

তরুণীর অধরে মৃদু হাসি রেখায়িত হয়ে ওঠে। —আমি মানুষের ঘরের মেয়ে, পিতৃস্নেহে লালিতা কন্যা। আমি সমাজে বাস করি রাজা সংবরণ। স্বেচ্ছায় বা যথেচ্ছায় কোন পুরুষের কণ্ঠমাল্য গ্রহণ করতে পারি না, পারি সমাজের ইচ্ছায়।

—তার অর্থ?

—সমাজকুমারী কোন পুরুষকে স্বামীরূপে ছাড়া অন্য কোনরূপে আহ্বান করতে পারে না।

সংবরণের সকল আকুলতায় যেন হঠাৎ এক কঠোর বাস্তব সত্যের আঘাত লাগে। তৃষ্ণাতুরের মুখের কাছ থেকে যেন পানপাত্র দূরে চলে যাচ্ছে। সংবরণ বলেন—মনোলোভা, তোমার স্বামীরূপেই আমাকে গ্রহণ কর।

—আমি নিজের ইচ্ছায় আপনাকে গ্রহণ করতে পারি না রাজা সংবরণ। আপনি আমার পিতার অনুমতি গ্রহণ করুন।

—কেন?

—আমি সমাজের মেয়ে। পিতা আমার অভিভাবক।

—কোথায় তোমার সমাজ?

—ঐ যেখানে কুটীরপংক্তি দেখা যায়।

—এখানে এসেছ কেন?

—এসেছি, সকল কল্যাণের আধার সমদর্শী সূর্যকে দিনান্তের প্রণাম জানাতে, এই আমার প্রতিদিনের ব্রত।

সংবরণ যেন দুঃসহ বিস্ময়ে হঠাৎ চিৎকার ক'রে ওঠেন—কে তুমি?

তরুণী বলে—আমি কল্পনা নই, কল্পলোকের সৃষ্টিও নই, আমি লোকপ্রদীপ আদিত্যের কন্যা তপতী।

দুই চক্ষুর উপর যেন তপ্ত বালুকার দংশন ছুটে এসে লেগেছে, চকিতে মাথা হেঁট করেন সংবরণ। শিশির ঋতুর হিমপীড়িত বনস্পতির মত স্তব্ধ সংবরণ নীরবে দাঁড়িয়ে

শুধু তাঁর বক্ষঃপঞ্জরের একটি কাতরতার ধ্বনি শুনতে থাকেন। যখন মুখ তোলেন, তখন বুঝতে পারেন, তরুণী তপতীর তনুচ্ছবি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

সূর্যও অস্তাচলে অদৃশ্য, বনের বুকে অন্ধকার, তপতী নেই, শুধু একা দাঁড়িয়ে থাকেন সংবরণ। সারা জগতের সত্যমিথ্যার রূপে যেন এক বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে। তাঁর আদর্শের অহংকার এবং তাঁর ত্যাগের দর্প এক নিষ্ঠুর বিদ্রূপের আঘাতে ধূলি হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু সব স্বীকার করে নিয়েও এই মুহূর্তে মর্মে মর্মে অনুভব করেন সংবরণ, ঐ মূর্তিকে ভুলে যাবার শক্তি তাঁর নেই। কোথায় তাঁর সমদর্শিতা আর চিরকৌমার্যের সংকল্প! কোথাও নেই। তপতী ছাড়া এ বিশ্বে আর কোন সত্য আছে বলে মনে হয় না।

সংবরণের সত্তা যেন এই অন্ধকারে তার সকল মিথ্যা গর্বের মূঢ়তা ও লজ্জা থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। কোথাও চলে যাবার অথবা ফিরে যাবার সাধ্য নেই। সংসারের ঘটনার কাছে আজ হাতে হাতে ধরা পড়ে গিয়েছেন সংবরণ। কিন্তু যে স্বপ্নকে কাছে পাওয়ার জন্য তাঁর প্রতিটি নিশ্বাস আজ কামনাময় হয়ে উঠেছে, সেই স্বপ্নকে নিজেই বহুদিন আগে নিজের অহংকারে অপ্রাপ্য করে রেখে দিয়েছেন। আজ তাকে ফিরে চাইবার অধিকার কই?

সংবরণ আজ নিজ ভবনে ফিরলেন না।

সংবরণের এই আত্মনির্বাসনে সারা দেশে ও সমাজে বিস্ময়ের সীমা রইল না। কেন, কোন্ দুঃখে আর কিসের শোকে সংবরণ তাঁর এত প্রিয় সেবার রাজ্য ও কল্যাণের সমাজ ছেড়ে দিলেন? এ কি বৈরাগ্যের প্রেরণা?

সকলেই তাই মনে করেন। ভগবান আদিত্যেরও তাই ধারণা। শুধু একমাত্র যে এই ঘটনার সকল রহস্য জানে, সে-ও নীরব।

তপতীকে নীরব হয়েই থাকতে হবে। বনপ্রান্তের অপরাহ্ণবেলার আলোকে যার মুখের দিকে তাকিয়ে তপতী তার অন্তরের নিভৃতে প্রেমিকের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছে, তাকে ভুলতে পারা যাবে না। কিন্তু সেকথা এই জীবনের ইহকালের কানে কানে কখনও বলাও যাবে না। সেই সুতরুণ কুমারের অভ্যর্থনাকে চিরকাল এক প্রহেলিকার আহ্বান বলে মনে করতে হবে। তপতী জানে, সংবরণ তাঁর হৃতদর্প জীবনের লজ্জা অতিক্রম করে সমাজে আর ফিরে আসবেন না, কেউ জানবে না, বন্যপ্রান্তের এক অপরাহ্ণবেলায় এক পুরুষ ও এক নারীর সম্মুখ-সাক্ষাৎ শুধু চিরবিরহের বেদনা সৃষ্টি করে রেখে গিয়েছে।

শুধু নীরব থাকতে পারলেন না কুলগুরু বশিষ্ঠ। রাজ্যহীন রাজ্যে অশাসন দুঃখ অশান্তি ও উপদ্রব আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। চারিদিকে অবহেলা ও বিশৃঙ্খলা। বশিষ্ঠ একদিন সংবরণের কাছে উপস্থিত হলেন।

বশিষ্ঠ বেদনার্তভাবে বলেন—হঠাৎ এ কি করলে সংবরণ?

—হঠাৎ ভুল ভেঙে গেল গুরু।

—কিসের ভুল?

উত্তর দেন না সংবরণ। বশিষ্ঠ আবার প্রশ্ন করেন—জানি না, কোন্ ভুলের কথা তুমি বলছ। কিন্তু ভুলের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তোমাকে এখানে থাকতে হবে কেন?

—হ্যাঁ, এখানেই। এই বনপ্রান্তের গিরিশিখর আমার মন্দির। কল্যাণাধার সূর্যের উদয়াস্তের পথের দিকে তাকিয়ে এখানেই আমাকে জীবনের শান্তি ফিরে পেতে হবে।

হেসে ফেলেন বশিষ্ঠ—ভুল করো না সংবরণ। তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারি, তোমার এই তপস্যা নিশ্চয় এক অভিমানের তপস্যা। তোমার মনে পূজাচারীর আনন্দ নেই। তুমি তোমার এক আহত স্বপ্নের বেদনা ঢাকবার জন্য মিথ্যা বৈরাগ্য নিয়ে নিষ্ঠাহীন পূজায় ব্যস্ত হয়ে রয়েছ।

সংবরণ চুপ করে থাকেন, আত্মদীনতায় কুণ্ঠিত অপরাধীর নীরবতার মত। কিন্তু অতি স্পষ্ট ও কঠিন এক প্রশ্নের মূর্তির মত বশিষ্ঠ জিজ্ঞাসুভাবে সংবরণের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

সংবরণ বলেন—ভগবান আদিত্যকে আমি মিথ্যা গর্বের ভুলে অশ্রদ্ধা করেছি, এই প্রায়শ্চিত্ত তারই জন্য গুরু।

কৌতূহলী বশিষ্ঠের দুই চক্ষুর দৃষ্টি নিশ্চিত প্রশ্নের মত তেমনি উদ্যত হয়ে থাকে, যেন আরও কিছু তাঁর জানবার আছে।

সংবরণ বলেন—ভগবান আদিত্যের কন্যা তপতী আমার কামনার স্বপ্ন; কিন্তু সেই স্বপ্নকে আমার জীবনে আহ্বান করবার অধিকার আমি হারিয়েছি গুরু।

স্নেহপূর্ণ এবং সহাস্য স্বরে বশিষ্ঠ বলেন—সেই অধিকার তুমি পেয়েছ সংবরণ। সমাজহীন এই অরণ্যময় নিভৃত তোমার জীবনের অধিষ্ঠান নয়; ফিরে চল তোমার রাজ্যে, তোমার কর্তব্যের সংসারে ও সমাজে, এবং আদিত্যের কন্যা তপতীর পাণিগ্রহণ করে সুখী হও।

বনপ্রান্তের নিভৃত হতে প্রাসাদে ফিরে এলেন সংবরণ এবং আদিত্যের ভবনে ফিরে এলেন বশিষ্ঠ। ঘটনার রহস্য এতদিনে জানতে পেরে আদিত্যও বিস্মিত হলেন। এবং তপতী এসে বশিষ্ঠ ও আদিত্যকে প্রণাম করতেই দুজনে তপতীর সুস্মিত ও সলজ্জ মুখের দিকে তাকিয়ে আনন্দিত হলেন। আশীর্বাদ করলেন বশিষ্ঠ ও আদিত্য—তোমার অনুরাগ সফল হোক, তোমার জীবনে সূর্যারতির পুণ্য সফল হোক সুস্মিতা।

পতিগৃহে চলে গিয়েছে তপতী। কল্যাণাধার সূর্যের উপাসক সংবরণ ও উপাসিকা তপতীর মিলিত জীবন সংসারে নূতন কল্যাণের আলোক হয়ে উঠবে, এই আশায় প্রসন্ন ছিলেন আদিত্য। কিন্তু দেখা দিল আশাভঙ্গের মেঘ। আবার বিষণ্ণ হলেন আদিত্য। বেদনাহত চিত্তে তিনি নির্মম সংবাদ শুনলেন, প্রজাসেবার সকল ভার অমাত্যের উপর ছেড়ে দিয়ে তপতীকে নিয়ে দূর উপবনভবনে চলে গিয়েছেন সংবরণ।

এমন বেদনা জীবনে পাননি আদিত্য। তাঁর আদর্শ যাদের জীবনে সবচেয়ে বেশি

প্রতিষ্ঠা লাভ করবে বলে তিনি আশা করেছিলেন তারাই দু'জন যেন সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সমাজের জন্য নয়, সংসারের জন্য নয়, যেন বিবাহের জন্যই এই বিবাহ হয়েছে। কোথা থেকে যেন এক জান্তব রীতির অভিশাপ এসে দুটি জীবনের সৌন্দর্য ছিন্ন-ভিন্ন করে দিল। গুরু বশিষ্ঠও এসে আদিত্যের সম্মুখে অনুতপ্তের মত বিষণ্ণ মুখে বসে থাকেন।

সংসার সমাজ ও রাজনিকেতন হতে বহুদূরের এক উপবনভবনের নিভৃতে যেন এক স্বপ্নের নীড় রচনা করেছেন সংবরণ। এখানে তপতী ছাড়া কোন সত্যই সত্য নয়। এই যৌবনধন্যা রূপাধিকা নারীর কুন্তলসৌরভের চেয়ে বেশি সৌরভ পৃথিবীর কোন পুষ্পকুঞ্জে নেই। এই নারীর কম্র নয়নের কনীনিকার কাছে আকাশের সব তারা নিষ্প্রভ। ভূলোকললামা এই ললনার চুম্বনে যেন ঊষা জাগে, আর নিশা নামে আলিঙ্গনে। বরাঙ্গনা তপতীর যেন এক অন্তহীন কামনার পুষ্পময় উপবন, যার অফুরান পরিমল প্রতি মুহূর্তে লুণ্ঠন করে জীবন তৃপ্ত করতে চান সংবরণ।

কিন্তু হাঁপিয়ে ওঠে তপতী। উপবনের মৃদুল অনিলের স্পর্শও জ্বালাময় মনে হয়। কোথায় রইল সমাজ আর সমাজের কল্যাণ? কোথায় সূর্যারতির পুণ্য? কোথায় আদিত্যের সমদর্শিতার দীক্ষা? পতি-পত্নীর জীবন নয়, শুধু এক নর ও এক নারীর কামনাকূল মিলন।

সংবাদ আসে—আদিত্য বিষণ্ণ হয়ে রয়েছেন, বশিষ্ঠ দুঃখিত হয়েছেন, রাজপ্রাসাদে আতঙ্ক, প্রজাসমাজে বিদ্রোহ অশান্তি ও অনাচার। শত্রু ইন্দ্র সুযোগ বুঝে রাজ্যের শস্য ধ্বংস করেছে, দুর্ভিক্ষপীড়িতের আর্তরবে জাতির প্রাণ চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সংবরণ বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন না। ওসব যেন এক ভিন্ন পৃথিবীর দুঃখের ঝড়, এই উপবনভবনের নিভৃতে ও সুখলালস জীবনে তার স্পর্শ লাগে না। সংবরণের দিকে তাকিয়ে তপতীর দৃষ্টি ব্যথিত হয়ে ওঠে। সমদর্শী প্রজাসেবক সংবরণের এমন পরিণাম তপতী কল্পনা করতে পারেনি।

তপতীর দুঃখ চরম হয়ে উঠল সেদিন, গুরু বশিষ্ঠ যেদিন আবার সংবরণের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে উপবনভবনের দ্বারে উপস্থিত হলেন। গুরু বশিষ্ঠ এসেছেন, এই সংবাদ শুনেও সংবরণ গুরুদর্শনের জন্য উৎসাহিত হলেন না। উপবনভবনের বহির্দ্বারেই দাঁড়িয়ে রইলেন বশিষ্ঠ।

সংবরণের মূঢ়তার রূপ দেখে আতঙ্কিত হয় তপতী। নিজেকেও নিতান্ত অপরাধিনী বলে মনে হয়। কিন্তু আর নয়। নিজেকে যেন আজই এক চরম পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করতে চায় তপতী। নতমুখে এবং সাশ্রুনয়নে এবং নীরবে এক মধুরায়িত মোহের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে মনে মনে সংগ্রাম করে।

উপরে মধ্যাহ্নসূর্য, গুরু বাইরে দাঁড়িয়ে, এদিকে উপবনভবনের অভ্যন্তরে লতাবিতানে আচ্ছন্ন এক আলোকভীরু ছায়াকুঞ্জে গন্ধতৈলের প্রদীপ জ্বলে। তারই মধ্যে সাধের স্বপ্ন নিয়ে লীলাবিভোর সংবরণ, দুই বাহু দিয়ে তপতীর কণ্ঠদেশ ভুজঙ্গের মত জড়িয়ে ধরে রেখেছেন। লুব্ধ ভৃঙ্গের ব্যগ্রতা নিয়ে সংবরণের সুন্দর মুখ তপতীর অধর অন্বেষণ করে।

হঠাৎ অশান্ত হয় তপতী। মুখ ফিরিয়ে নেয় তপতী, এবং দুই হস্তে আপত্তির আঘাতে রূঢ়ভাবে সংবরণের বাহুবন্ধন ছিন্ন করে সরে দাঁড়ায়।

সংবরণ বিস্মিত হন—এ কি তপতী?

—আমি তপতী নই।

—এই কথার অর্থ?

—তপতী কোন পুরুষের শুধু উপবননিভৃতের প্রমোদসঙ্গিনী হতে পারে না।

বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে সংবরণ, তপতীর এই অদ্ভুত ধিক্কারের অর্থ বুঝবার চেষ্টা করে। কয়েক মুহূর্তের জন্য সত্যই মনে হয় সংবরণের, তপতীর ছদ্মরূপে যেন অন্য কোন নারী তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। দুই চক্ষুতে মূর্খের বিস্ময় দিয়ে প্রশ্ন করেন সংবরণ—তবে তুমি কে?

—আমি এক নারীর দেহমাত্র।

শঙ্কিতের মত চমকে ওঠেন সংবরণ। তপতীর কথাগুলি যেন শাণিত ছুরিকার মত নির্মম; নিজেরই মায়াময় রূপের নির্মোক মুহূর্তের মধ্যে ছিন্ন করে দেখিয়ে দিচ্ছে ভিতরে তপতী নামে কোন সত্তা নেই। সংবরণ অসহায়ের মত প্রশ্ন করেন—তবে তপতী কে?

—তপতী হলো এক নারীর মন, যে মন পিতা আদিত্যের কাছে দীক্ষালাভ করেছে, কল্যাণাধার সূর্যের আরতি ক'রে জীবনের একমাত্র পুণ্য লাভ করেছে; যে মন সংসারের মধ্যে প্রিয়তমরূপে এক স্বামীর মন খুঁজছে; যে মন স্বামীর মনের সাথে মিলিত হয়ে সমাজে-সংসারে সবাকার প্রিয় হয়ে উঠতে চাইছে। সেই শিক্ষিতা সুরুচি কল্যাণী ও প্রিয়া তপতীর মন তুমি কোনদিন চাওনি, পাওনি।

—তবে এতদিন কি পেয়েছি?

—এতদিন যা পেয়েছ তার মধ্যে তপতীর এতটুকু আগ্রহ ছিল না।

—সতনু তপতীর কোন অনুভব কোন আনন্দে ধন্য হয়নি?

—এতটুকুও না।

উপবনভবনের স্বপ্ন যেন চূর্ণ হয়ে যায়। সংবরণের মনে হয়, ধূলিময় এক জনহীন মরুস্থলীতে একা দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তপতী এত নিকটে দাঁড়িয়ে, কিন্তু সুদূরের মরীচিকা বলে মনে হয়। রূপ নয়, রূপের শব নিয়ে এতদিন শুধু বিলাস করেছেন সংবরণ।

সংবরণ—এই শাস্তি তুমি আমায় কেন দিলে তপতী? তুমি যে নিতান্ত আমার, আমারই বিবাহিতা নারী তুমি।

তপতী—সত্য, কিন্তু শুধু বিবাহের জন্য তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়নি সংবরণ।

সংবরণ—তবে কিসের জন্য?

তপতী—জগতের জন্য। শুধু তোমার ও আমার আনন্দের জন্য নয়, জগতের আনন্দের জন্য।

জগতের জন্য? জগতের আনন্দের জন্য? তপতীর উত্তর যেন মন্ত্রধ্বনির মত উপবনভবনের বাতাসে এক নূতন হর্ষ সৃষ্টি করে।

গন্ধতৈলের প্রদীপ হঠাৎ নিভে যায়। উপবনের তরুবীথিকার শীর্ষ চুম্বন ক'রে এবং বল্লীবিতানের বাধা ভেদ ক'রে ছায়াকুঞ্জের অভ্যন্তরে সূর্যনিঃসৃত রশ্মিধারা এসে ছড়িয়ে পড়ে। এক অভিশপ্ত বিস্মৃতির দীর্ঘ অবরোধ ভেদ করে বহুদিন আগে শোনা এই ধ্বনি যেন নূতন ক'রে শুনতে পেয়েছেন সংবরণ—জগতের জন্য। সংসারের মানব ও মানবীর জীবন মিলিত হয় সমাজকল্যাণের নূতন মন্ত্ররূপে, সংকল্পরূপে, ব্রতরূপে, যজ্ঞরূপে! তারই নাম বিবাহ। শুধু নিজের জন্য নয়, নিভৃতের জন্যও নয়, জগতের জন্য।

বাষ্পায়িত হয় সংবরণের দুই চক্ষু। অবহেলিত রাজ্য সমাজ ও সংসারের দুঃখ যেন ঐ সূর্যরশ্মির সঙ্গে এসে তাঁর হৃদয় স্পর্শ করেছে। এই দৃশ্য দেখতে করুণ হলেও তপতী যেন এক পাষাণীর মূর্তির মত অবিচল ও অবিকার দুটি চক্ষুর শান্তকঠোর দৃষ্টি তুলে দেখতে থাকে।

সংবরণ শান্তভাবে বলেন—বার বার তিনবার আমার ভুল হয়েছে তপতী, কিন্তু তুমিই চরম শাস্তি দিয়ে শেষ ভুল ভেঙে দিলে।

উত্তর দেয় না তপতী। চরম শাস্তি গ্রহণের জন্য তপতীও আজ প্রস্তুত হয়েছে।

সংবরণ ধীরস্বরে বলেন—সত্যই তোমাকে আমি আজও আমার জীবনে পাইনি তপতী, কিন্তু এইবার পেতে হবে।

চমকে ওঠে তপতীর শান্তকঠোর চক্ষুর দৃষ্টি।

তপতীর হাত ধরবার জন্য এক হাত এগিয়ে দিয়ে সংবরণ বলেন—চল।

তপতী—কোথায়?

সংবরণ—ঘরে, সমাজে, জগতে।

তপতী বিস্মিত হয়। সংবরণ যেন সে বিস্ময়কে চরম চমকে চকিত করে দিয়ে বলেন—চল তপতী; গুরু বশিষ্ঠ আমাদের অপেক্ষায় বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

লুব্ধা লুণ্ঠকীর মত তপতী তার দুই বাহু সাগ্রহে নিক্ষেপ করে সংবরণের কণ্ঠ নিবিড় আলিঙ্গনে আপন করে নিয়ে বক্ষে ধারণ করে। জীবনের আনন্দের সঙ্গীকে এতদিনে খুঁজে পেয়েছে তপতী।

হ্যাঁ, সারা জীবনের তৃষ্ণা যেন এতদিন সত্যই তৃপ্তি খুঁজে পেয়েছে। সংবরণের মুখেও সেই তৃপ্তির সুস্মিত আভাস ফুটে ওঠে।

লতাবিতানের ছায়াচ্ছন্ন নিভৃত হতে বের হয়ে অবারিত সূর্যালোকে আপ্লুত তৃণপথভূমির উপর দুজনে দাঁড়ায়। মনে হয় সংবরণের, মনে হয় তপতীর, যেন ক্ষুদ্র এক কারাগারের গ্রাস হতে মুক্ত হয়ে এইবার সত্যই জীবনের পথে এসে দুজনে দাঁড়াতে পেরেছে।

তরুপল্লবের অন্তরাল হতে অকস্মাৎ পিকস্বর ধ্বনিত হয়। স্মিত সলজ্জ ও মুগ্ধ দৃষ্টি তুলে সংবরণ ও তপতী পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়, যেন নব পরিণয়ে প্রীতমানস এক প্রেমিক ও এক প্রেমিকা।

সংবরণ হাসেন—তুমি শাস্তি দিয়ে আমাকে ভালবেসেছ তপতী।

তপতী লজ্জিত হয়—তুমি ভালবেসে আমাকে শাস্তি দিয়েছিলে সংবরণ।

একটি বুলবুলের শিস

শাহজাদী আমিনা বুলবুলের শিস শুনতে ভালোবাসেন। দিল্লীর বাদশাহ্ মহম্মদ শাহের কন্যা আমিনা।

প্রতি অপরাহ্নে দেওয়ান-ই-খাসের মর্মর-মসৃণ হর্ম্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে রত্নখচিত তক্ত-ই-তাউসের উপর যখন আসন গ্রহণ করেন মহম্মদ শাহ্, আর কোহিনূর ঝক ঝক করে তাঁর উষ্ণীষে, তখন শাহজাদী আমিনা তাঁর পান্না-হাজারো জামদানীর ওড়না সবুজ ঘাসের উপর লুটিয়ে দিয়ে হাওয়া মহলের নিকটে এক গুলবাগের নিভৃতে বসে থাকেন। বাতাসে ফুরফুর করে উড়তে থাকে তাঁর বিনুনীতে জড়ানো বফত-হানা মসলিন। আর বেণীপ্রান্তে দোলে অর্ধস্ফুট দুটি নার্গিসের কোরক, যার স্পর্শ পেয়ে সুরভিত হয়ে ওঠে অপরাহ্নের মৃদু নসীম। গুলবাগের নিভৃতে বসে শাহজাদী আমিনা উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকেন রহস্যময় এক বুলবুলের শিস, সুর্মা-আঁকা চোখের দৃষ্টি ঘুরিয়ে খুঁজতে থাকেন, দেওদারের পাতার আড়ালে লুকিয়ে কোথায় রয়েছে সে বুলবুল।

লুণ্ঠনলিপ্সু, নিষ্ঠুর পারসীক নাদির শাহের বাহিনীও তখন লাহোর অধিকার ক'রে ফেলেছে। পথ শোণিতলিপ্ত করে সেই অভিযান এগিয়ে আসছে দিল্লীর দিকে। কিন্তু, তবুও যেন এক বিচিত্র বিভ্রমের স্বপ্নে অভিভূত হয়ে রয়েছেন বাদশাহ্ মহম্মদ শাহ্। কল্পনাও করতে পারেন না যে, আর ক'দিন পরেই টুকরো টুকরো হয়ে বিলীন হয়ে যাবে তাঁর এই তক্ত-ই-তাউস, আর অন্ধ হয়ে যাবে এই বাদশাহী উষ্ণীষ। পারসিক নাদিরের লুব্ধ বাহু উপড়ে নিয়ে চলে যাবে এই উজ্জ্বল কোহিনূর। দেওয়ান-ই-খাসের মর্মরসোপান যে শত্রুর পদপীড়নে আর্তনাদ করে উঠবে, সেই শত্রুর ছায়া দেখতে পেয়েও চমকে উঠতে পারছেন না মহম্মদ শাহ্, দুর্বল মোগলশক্তির তরবারি এমনই এক অদৃষ্টবাদের তন্দ্রায় অলস হয়ে রয়েছে।

ম্রিয়মান বাদশাহ্ মহম্মদ শাহ্ সমাগত আমীর ও ওমরাহদের দিকে তাকিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্নের মত মৃদুস্বরে একবার আবেদন করেন —প্রচণ্ড পারসিক নাদিরের তরবারির আঘাত হতে দিল্লীকে রক্ষা করবার জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে, আর যে সময় নেই!

বাদশাহের আবেদন শুনে চঞ্চল হয়ে ওঠেন আমীর ও ওমরাহেরা। কিন্তু সবচেয়ে বেশি আশা নিয়ে, যাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলেন বাদশাহ্ মহম্মদ শাহ্, তাঁর আচরণে কোন চাঞ্চল্য দেখা যায় না। মীর আতশ আমীর হুসেন খাঁ যেন বাদশাহের এই আবেদন শুনতেই পাননি। বাদশাহেরই আত্মীয় পুত্র এবং গোলন্দাজ ফৌজের প্রধান নায়ক আমীর হুসেন খাঁ'র মন তখন আর এক কল্পনার মধ্যে বন্দী হয়ে ছটফট করছিল।

দেওয়ান-ই-খাসের মর্মর-মসৃণ হর্ম্যতলে বসে আমীর হুসেন খাঁ তখন বাইরের সেই সুন্দর অপরাহ্নকেই ধ্বংস করার জন্য মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। আজই জানতে পেরেছেন আমীর হুসেন খাঁ, হাওয়া-মহলের নিকটে ঐ গুলবাগের নিভৃতে বসে শাহজাদী আমিনা এখন কা'র প্রণয়ের দূত এক বুলবুলের শিস শুনে মনপ্রাণ মুগ্ধ ক'রে তুলেছে। সে রহস্যময় বুলবুলের পরিচয় আজই জানতে পেরেছেন হুসেন খাঁ। মনসবদার ওসমানের পোষা বুলবুল। সেই সুন্দর জওয়ান মনসবদার ওসমান, এই বাদশাহী কেল্লামহলের পথঘাট পাহারা দেবার কাজে নিযুক্ত তুচ্ছ এক সামান্যবৃত্তিভুক মনসবদার।

এ চিন্তা সহ্য করতে পারেন না হুসেন খাঁ। সমস্ত দিল্লী জানে, আর ক'দিন পরেই সুন্দরী শাহজাদী আমিনা আমীর হুসেন খাঁ'রই পরিণয় বরণ করবেন। শুভ চাঁদ ও তারিখ দেখে বিবাহের দিন পর্যন্ত সুস্থির করা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু দুর্বিনীতা শাহজাদী আজও মুগ্ধ হয়ে শুনছে সেই বুলবুলের শিস, তাকিয়ে আছে এক দেওদারের মাথার দিকে।

আজ বুঝতে পারেন হুসেন খাঁ, কেন এতদিনের মধ্যে একটিবারের মতও তাঁর প্রণয়লিপির কোন উত্তর দেয়নি শাহজাদী আমিনা। এতদিন ঐ বুলবুলের শিসকে কোন সন্দেহও করেননি হুসেন খাঁ। বরং তাঁর নিজেরই মহলের বাতায়নপথে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে দেখেছেন, তাঁরই আকাঙ্ক্ষিতা নারী স্বপ্নলোকের পরীর মত রূপ নিয়ে বসে আছে গুলবাগের নিভৃতে? কল্পনা করতেন, বোধহয় তাঁরই মনের কামনার মত সন্ধ্যার বাতাস ঐ বেণীপ্রান্তের নার্গিস চুম্বন ক'রে পাগল হয়ে উঠছে। কিন্তু বন্য আগুনের মত কি-এক দুঃসহ সংবাদ আজ তাঁর স্বপ্ন পুড়িয়ে দিয়েছে! শাহজাদী আমিনা ভালোবেসেছে মনসবদার ওসমানকে, তুচ্ছ সামান্যবৃত্তিভুক সেই মনসবদার ওসমানকে।

মনসবদার ওসমানের দুঃসাহসও সহ্য করতে পারেন না আমীর হুসেন খাঁ। ঘাসের ফুল হয়ে আসমানের তারা ধরবার দুঃসাহস! দুরন্ত এক প্রতিশোধের স্পৃহা জ্বলতে থাকে হুসেন খাঁ'র মনের ভিতর।

দেওয়ান-ই-খাসের অপরাহ্নের মজলিস সমাপ্ত হবার পর আপন মহলে এসে প্রবেশ করেন আমীর হুসেন খাঁ। বন্দুক হাতে নিয়ে বাতায়নের কাছে এসে কঠোর প্রতিশোধের প্রতিমূর্তির মত কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। দেখতে পান, প্রতিদিনের মত আজও সেই স্নিগ্ধ বৈকালের বাতাসে ফুরফুর ক'রে উড়ছে শাহজাদী আমিণার বেণীর মসলিন। দেওদারের মাথায় পাতার আড়ালে গোপন বুলবুলের কণ্ঠ হতে ঝরে পড়ছে মধুর শব্দের শিহর। হঠাৎ বিকট শব্দ ক'রে হুসেন খাঁ'র বন্দুক হতে দেওদারের মাথা লক্ষ্য ক'রে ছুটে গেল ক্ষুদ্র একটি অগ্নিপিণ্ড। সে হিংস্র আঘাতে মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেল বুলবুলের শিস। দেওদারের পায়ের কাছে ঝুপ ক'রে ঝরে পড়লো একটি ক্ষুদ্র পাখির মৃতদেহ।

চমকে, মুখ ফিরিয়ে আর ভয়ার্ত চক্ষু নিয়ে তাকিয়ে রইলেন আমিণা, আমীর হুসেনের

অট্টালিকার বাতায়নের দিকে। কিন্তু কেউ নেই বাতায়নের কাছে। শুধু একটি ধূম্রপুঞ্জ ভাসছে বাতায়নের কাছে, এক তপ্ত হিংসার নীরব ও মন্থর উল্লাসের মত।

জ্বলে ওঠে শাহজাদী আমিণার সুর্মা-আঁকা চোখের তারকা। যেন ঐ ধূম্রপুঞ্জের উত্তর দেবার জন্য কঠিন এক প্রতিজ্ঞা সে মুহূর্তে শিখায়িত হয়ে উঠেছে আমিনার চোখের দৃষ্টিতে।

পরদিনের অপরাহ্ন। নিশ্চিন্ত হলেন আমীর হুসেন খাঁ, ফুলবাগের বাতাস যতই উতলা হয়ে উঠুক, আজ আর কোন বুলবুলের শিস বেজে উঠবে না। কল্পনা করেন হুসেন, নিশ্চয়ই এইবার বুঝতে পেরেছে দুর্বিনীতা শাহজাদী, ঐ বন্দুকের গর্জনে যে শাসনের ইঙ্গিত ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুর্নিবার এক কৌতূহলও চঞ্চল হয়ে ওঠে হুসেন খাঁর মন। দেখতে ইচ্ছা করে, পান্না-হাজারোয় জড়ানো সেই রূপ ও যৌবনের নারী আজও যদি আবার ফুলবাগের নিভৃতে গিয়ে দাঁড়ায়, তবে সেই দেওদারের মাথার দিকে তাকিয়ে থাকবার দুঃসাহস আবার দেখা দেয় কিনা তার সুর্মা-আঁকা চোখে।

দেখতে পেলেন হুসেন খাঁ, প্রতিদিনের মত আজও চলেছে শাহজাদী আমিনা সেই ফুলবাগের নিভৃতের দিকে। তেমনি ফুরফুর ক'রে উড়ছে সেই বেণীজড়ানো মসলিন। কিন্তু এ কি? হুসেন খাঁ'র নিষ্পলক চক্ষু হঠাৎ চমকে ওঠে। ফুলবাগের নিভৃতে এসেও আর থমকে দাঁড়াচ্ছে না আমিনা। যেন লঘু মেঘদণ্ডের মত উতলা বাতাসের সঙ্গে দেহ মিলিয়ে দিয়ে তরতর ক'রে ফুলবাগ পার হয়ে যাচ্ছে আমিনা। বিস্মিত ও বিভ্রান্ত হুসেন শুধু তাকিয়ে দেখতে থাকেন, শাহজাদী আমিনা যেন সেই দেওদারের ছায়া লক্ষ্য ক'রে ছুটে চলে যাচ্ছে।

গর্জন করে উঠলেন হুসেন। দেখতে পেয়েছেন হুসেন, দেওদারের ছায়ার সঙ্গে ছায়াময় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অশ্বারোহী এক যুবকের মূর্তি। সেই তুচ্ছ সামান্যবৃত্তিভুক মনসবদার ওসমান।

বন্দুক আনবার জন্য কক্ষের অভ্যন্তরে ছুটে যান হুসেন খাঁ। ফিরে এসে বাতায়নপথে দাঁড়িয়ে দেখতে পান, কেউ নেই আর, একাকী পড়ে আছে শুধু দেওদারের ছায়া। মুহূর্তের মধ্যে যেন এই পৃথিবীর মাটি থেকেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে সেই দুরন্ত মনসবদার আর দুর্বিনীতা শাহজাদীর মূর্তি। মীর আতশ হুসেনের অগ্নিগর্ভ ভ্রূকুটির ধূম্রপুঞ্জকে ধিক্কার দেবার জন্য দেওদারের কাছে ঘোড়ার ঘুরের আঘাতে উৎক্ষিপ্ত ধূলিপুঞ্জ শুধু বাতাসে ভাসছে।

লুণ্ঠক নাদিরের পদধ্বনি এগিয়ে আসছে প্রান্তরের পর প্রান্তর পার হয়ে। আতঙ্কিত দিল্লীকে পিছনে ফেলে রেখে বের হয়ে গেলেন মীর আতশ আমীর হুসেন খাঁ। সারা হিন্দুস্তানের নদী পাহাড় ও বন তন্ন তন্ন ক'রে সন্ধান করবেন হুসেন। খুঁজে বের করবেন, যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন শাহজাদী আমিণা ও তার প্রেমিক। তরবারী ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন হুসেন, নিতে হবে প্রতিশোধ। মনসবদারের প্রেমে উদ্‌ভ্রান্ত ঐ শাহজাদীর

রক্তিম দুই অধরকে এই হুসেন খাঁরই মুখের কাছে এনে প্রণয়-ভাষা উচ্চারণে বাধ্য করতে হবে। এই প্রতিশোধ চরিতার্থ না হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হবেন না আমীর হুসেন খাঁ। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, তারপর বৎসরও অতিক্রান্ত হয়। ছদ্মবেশে সারা হিন্দুস্থান অন্বেষণ ক'রে ফিরতে থাকেন হুসেন খাঁ, ক্রুদ্ধ ব্যাধ যেমন প্রচণ্ড আক্রোশে জাল ছিঁড়ে পালিয়ে যাওয়া হরিণ-দম্পতিকে অন্বেষণ ক'রে ফিরতে থাকে।

নাদিরের অস্ত্রাঘাতে শোণিতাক্ত হয়েছে দিল্লী। চূর্ণ হয়েছে তক্ত-ই-তাউসের গর্ব। অন্ধ হয়েছে কোহিনুর-হারা বাদশাহী উষ্ণীষ। সেই সময়, দূর বাংলারই এক পল্লীজনপদের নিকটে সুরম্য এক দুর্গ নিকেতনের ছায়ায় এসে দাঁড়ালেন এক পরিব্রাজক ফকির। চমকে উঠলেন ফকির, উৎকীর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বুলবুলের শিস শোনা যায়।

যদিও এই দুর্গ-নিকেতনের কোন পরিচয় জানেন না ফকির, কিন্তু না জেনেও তিনি ঠিক জায়গাতেই এসে দাঁড়িয়েছেন। ফকিরবেশী হুসেন তখনো জানেন না, শাহজাদী আমিনারই প্রেমের বুলবুল বাংলাদেশের এ নিভৃতকে শিস শোনাচ্ছে আজ তিন বছর ধ'রে।

বীরভূমের হেতমপুর নামে জনপদ স্থাপন করেছিলেন যিনি, সেই হেতম খাঁই আশ্রয় দিয়েছিলেন শাহজাদী আমিণা আর তাঁর প্রেমিক মনসবদার ওসমানকে। স্নেহপরবশ হেতম খাঁ শাহজাদী আমিণাকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছিলেন। শাহজাদী আমিনা এখন ওসমানেরই পরিণীতা স্ত্রী। আমিনার নামও এখন আর আমিনা নয় এবং ওসমানও আর ওসমান নন। আমিনার নাম শেরিনা, আর ওসমানের নাম হাফেজ খাঁ। শেরিনা ও হাফেজের বিবাহের পর হেতম খাঁ'র মৃত্যু হয়েছে। হেতম খাঁ'র সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করেছেন শেরিনা ও হাফেজ।

বাংলার নবাব আলিবর্দীর বিশ্বস্ত সামন্ত হয়ে পরগণা শাসন করেন হাফেজ খাঁ। হেতমপুরের পূর্ব প্রান্তে নতুন গড় প্রাসাদ আর উদ্যান রচনা করেছেন হাফেজ খাঁ। হাফেজ খাঁ'র নতুন বুলবুল নির্ভয়ে আর অবাধ স্বাচ্ছন্দে তার মিঠা শিসের সঙ্গীত শোনায় সে উদ্যানের ছায়াকে। শুধু ছায়া নয়, সুন্দরী শেরিনা আজও মুগ্ধ হয়ে শোনেন এই বুলবুলের শিস। ঐ শিস যেন শেরিনার প্রেমিক পতি হাফেজেরই অন্তরের সঙ্গীত। রাজকার্য্যে যখন বাইরে যান হাফেজ, তখন সেই ক্ষণবিরহও যেন সহ্য করতে পারেন না শেরিনা। হাফেজ যখন শেরিনার কাছে থাকেন না, তখন শেরিনার চোখের কাছে থাকে হাফেজেরই প্রিয় বুলবুল। আশ্বস্ত হন শেরিনা, ঐ বুলবুলের সঙ্গীত ব্যাকুলা শেরিনাকে সান্ত্বনা দেয়।

বুলবুলের শিস শুনে সন্দেহ জ্বলে উঠেছে যে আগন্তুক ফকিরের মনে, সেই ফকির তীব্র এক কৌতূহল তার চক্ষের গভীরে লুকিয়ে রেখে হাফেজ খাঁ'র গড়ের আশেপাশে পরিভ্রমণ করে ফিরতে থাকেন। শুনেছেন ফকির, পরগনাইৎ হাফেজ ও তাঁর বিবি শেরিনা থাকেন এই দুর্গভবনে। কিন্তু কে এই হাফেজ, আর কে এই শেরিনা?

বেশিক্ষণ আর এই কৌতূহলের জ্বালা সহ্য করতে হয়নি ফকিরবেশী হুসেনকে। দেখলেন হুসেন, সেই মনসবদার ওসমানই প্রবেশ করছেন দুর্গভবনের অভ্যন্তরে।

কি গরবে আর কি আনন্দে ধন্য হয়ে রয়েছে, আর ছদ্মনামের আড়ালে নিরাপদ হয়ে রয়েছে সেই পলাতক ওসমান, তুচ্ছ সামান্যবৃত্তিভুক মনসবদার ওসমান! মোগল উদ্যানের হরিণীকে অপহরণ ক'রে নিয়ে এসেছে এই বন্য কুক্কুর। মীর আতশ আমীর হুসেন খাঁ'র তৃষ্ণার্ত চোখের উপর এক মুঠো বিদ্রূপের ধূলি নিক্ষেপ ক'রে শাহজাদী আমিনা এক মনসবদারের প্রেমের আহ্বানে উধাও হয়ে হিন্দুস্থানের দূরপ্রান্তে এসে যেন এক প্রণয়কুঞ্জের নিভৃতে পরম সুন্দর জীবন যাপন করছে। হাফেজ খাঁ'র দুর্গভবনের দিকে তাকিয়ে থাকেন ফকিরবেশী হুসেন, ফণায়িত বিষধর যেন পক্ষি দম্পতির নীড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

প্রতিশোধের উপায় সন্ধান করেন হুসেন। চূর্ণ করতে হবে হাফেজ খাঁ'র এই গড়, ঐ মুখর বুলবুলের সঙ্গীতকে চিরকালের মত নীরব ক'রে দিতে হবে। হিংস্র অভিসন্ধির শ্বাপদের মত বীরভূমের প্রতি পল্লী ও জনপদে সন্ধান ক'রে ফিরতে থাকেন হুসেন খাঁ, হাফেজ খাঁর কোন শত্রু আছে কিনা। হাফেজ খাঁ'র ঐ গর্বের গড় ধ্বংস করতে সাহায্য করবে হুসেনকে, হাফেজ খাঁ'র একশত বৈরীও কি পাওয়া যাবে না এই দেশে?

দিন যায়, রাত্রি ফুরায়, মাসের পর মাস শেষ হয়, নিরুপায় হুসেন হতাশ হয়ে পড়েন। হাফেজ খাঁ'র কোন শত্রু খুঁজে পান না হুসেন। পল্লী-মসজিদের দ্বারপ্রান্তে ক্লান্ত হয়ে ব'সে শুনতে পান ফকিরবেশী হুসেন, হাফেজ ও শেরিনা বিবির নামে ছড়া গান ক'রে গাছের ছায়ায় খেলা করছে ছেলের দল। ভালোবাসার শুক-সারীর মত হাফেজ ও শেরিনা নামে দুটি প্রাণ বাস করে ঐ গড়ে। অনেক রাতে, সব পাখি যখন ঘুমিয়ে পড়ে, আর আকাশের চাঁদ একা একা হাসে, তখন শুক-সারী জল খেতে আসে নতুন বাঁধের জলে। দেখতে পান হুসেন, ঐ যে, হাফেজ খাঁ'র তৈরি নতুন বাঁধের জল চিকচিক করছে।

এইভাবেই একদিন এই বীরভূমির এক পল্লীর আর্তনাদ শুনে হুসেন খাঁ'র হতাশ মনের উৎসাহ চঞ্চল হয়ে উঠলো। তপ্ত অঙ্গার যেমন শিখায়িত হয়ে ওঠে নতুন বাতাসের ছোঁয়া লেগে। নিষ্ঠুর পারসীক সেই নাদির শাহের আঘাতে ব্যথিত দিল্লীর মত এই দূর বাংলার বীরভূমিও আর্তনাদ ক'রে উঠেছে বর্গী ভাস্কর পণ্ডিতের আঘাতে। পুড়ছে গ্রাম, লুণ্ঠিত হচ্ছে কৃষকের শস্য ও তৈজস, বিগ্রহ জলে নিক্ষেপ ক'রে আর দেউলের দ্বার বন্ধ ক'রে পালিয়ে যাচ্ছে পূজারী।

আর দেরি করেননি অভিসন্ধি-পরায়ণ হুসেন। বর্গীর শিবিরে এসে তাঁর সংকল্প নিবেদন ক'রে বললেন—অনেক সম্পদে সম্পন্ন হয়ে উঠেছে আলিবর্দীর ঐ বিশ্বস্ত পরগনাইৎ হাফেজ খাঁ। আমি সাহায্য করতে পারি, যদি হাফেজ খাঁর গড় ধ্বংস আর লুণ্ঠন করবার আজ্ঞা হয়।

আজ্ঞা দিলেন বর্গী ভাস্কর; বর্গী ফৌজের তোপের ভার নিয়ে হাফেজ খাঁ'র গড় আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলেন হুসেন।

হুসেন বলেন—আমার আর একটি আরজি আছে মারাঠা সেনাপতি।

ভাস্কর—বলুন।

হুসেন—হাফেজ খাঁ'র দুর্গভবন লুণ্ঠনের আগে আমাকে একটি কাজের অধিকার দিতে হবে।

ভাস্কর—কি কাজ?

হুসেন—হাফেজ খাঁ'র গড়ে প্রথম প্রবেশ করবার অধিকার থাকবে আমার।

ভাস্কর—আপনার উদ্দেশ্য?

হুসেন—আমার জীবনের এক ভয়ংকর অভিশাপকে নিজের হাতের আঘাতে নীরব ক'রে দিতে চাই। কোন ধনরত্ন আমি স্পর্শ করতেও চাই না।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন ভাস্কর—জানতে চাই, কে আপনার জীবনের অভিশাপ?

কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকেন হুসেন। তারপরেই বিষধরের চোখের মতই হুসেনের দুই চোখ যেন দপ করে জ্বলে ওঠে। হুসেন বলেন—একটি বুলবুলের শিস।

সেই রাতেই বর্গীর তোপে চূর্ণ হলো হাফেজ খাঁর গড়ের দরজা। মুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে হাফেজ খাঁ এবং তাঁর ক্ষুদ্র সৈন্যদল গড়ের ভিতর থেকে বের হয়ে সেই বিধ্বস্ত ও জ্বলন্ত দুর্গদ্বারের সম্মুখে দাঁড়ালেন লুণ্ঠনোন্মুখ বর্গী সওয়ারের গতি রোধ করার জন্য। মারাঠা তোপের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে আহত হলেন হাফেজ। সেই মুহূর্তে এক বর্গী সওয়ারের শাণিত তরবারি ঝলক দিয়ে উঠলো আহত হাফেজের উপর। সেই সওয়ারের মুখ চিনতে পারলেন হাফেজ। বুঝলাম হাফেজ, ঐ মুখ কোন বর্গী সওয়ারের মুখ নয়; দিল্লীর মীর আতশ আমীর হুসেন খাঁর মুখ, তাঁর হাতের ঐ তৃষ্ণার্ত তরবারির মতই শাণিত হাসি হাসছে।

তৃপ্ত হলো হুসেনের তরবারি, নিহত হাফেজের রক্তাক্ত মৃতদেহের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে গড়ের ভিতরে প্রবেশ করলেন হুসেন।

নির্জন ও নিস্তব্ধ দুর্গভবন। ভবনের কক্ষ হ'তে কক্ষান্তরে সন্ধান ক'রে ফিরতে থাকেন হুসেন। কোথায় শেরিনা? শূন্যভবনের কোন কক্ষে একটি নিঃশ্বাসও লুকিয়ে আছে ব'লে মনে হয় না। হুসেনের চোখের দৃষ্টিও যেন ধীরে ধীরে হতাশায় শূন্য হয়ে যেতে থাকে। তবে কি শেরিনা শুধু একটা নামের ছলনা মাত্র? মনসবদারের প্রেমিকা সেই শাহজাদী আমিনার বেণীর নার্গিস কি এই দুনিয়ার আলো-বাতাস থেকে বিদায় নিয়ে কোন কবরের মাটির আড়ালে চিরঘুমে ঘুমিয়ে আছে?

অকস্মাৎ একটি বুলবুলের শিসে শিউরে ওঠে নীরব গড়ের বাতাস। গড়ের উদ্যানে প্রবেশ করেন হুসেন। আছে, নিশ্চয়ই আছে, শাহজাদী আমিনা এ গড়ের বাতাসের মধ্যেই লুকিয়ে আছে, আর মুগ্ধ হয়ে আজও শুনছে তার প্রেমিকের বুলবুলের শিস।

মিথ্যা হয়নি হুসেনের মনের সন্দেহ। দেখতে পেলেন হুসেন, গড়েরই উদ্যানের নিভৃতে এক পুষ্করিণীর কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে শেরিনা।

হুসেন বলেন—তোমার ওসমান বিদায় নিয়েছে চিরকালের মত, শাহজাদী আমিনা।

উত্তর দেন না শেরিনা বিবি। যেন সঙ্গীতমুখর ঐ বুলবুলের স্বর ছাড়া আর কোন শব্দই তাঁর কানে এসে বাজতে পারছে না।

হুসেন বলেন—ঐ বুলবুলের শিস চিরকালের মত নীরব ক'রে দিতে এসেছি আমিনা।

ফুরফুর ক'রে উড়তে থাকে শেরিনার বেণীজড়ানো মসলিন। শেরিনা বিবির মন যেন এই দুনিয়ার সব শাসন আর হুংকারের বাইরে চলে গিয়ে চিরকালের এক বুলবুলের শিস মুগ্ধ হয়ে শুনছে। কোন উত্তর দেন না শেরিনা বিবি।

হুসেন বলেন—তোমার অপরাধ ক্ষমা করলাম আমিনা।

কথা বলেন না শেরিনা। যেন জীবনের এই অপরাধের আনন্দেই নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দিয়ে চির শান্ত হয়ে গিয়েছেন শেরিনা।

একটি হাত ব্যগ্রভাবে প্রসারিত ক'রে হুসেন বললেন—আমীর হুসেন খাঁ'র হাতে হাত রাখ শাহজাদী আমিনা।

ঝুপ ক'রে একটা শব্দ হয়। বুলবুলের শিসও যেন নতুন এক আনন্দের চমক লেগে কেঁপে ওঠে। আমীর হুসেন খাঁ'র স্বপ্ন মুহূর্তের মধ্যে চূর্ণ ক'রে দিয়ে শেরিনা বিবি সেই পুষ্করিণীর জলে ঝাঁপ দিয়েছেন। দেখতে পেলেন হুসেন, সুন্দরী শেরিনা আর শেরিনার বেণীবদ্ধ নার্গিস চকিতে একবার দেখা দিয়ে জলের গভীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আজ আর কেউ বলতে পারে না, আমীর হুসেন খাঁ আবার ফকিরের বেশ ধারণ ক'রে হেতমপুর হতে বিদায় নিয়েছিলেন কিনা। আজ শুধু দেখা যায়, হাফেজ খাঁ'র বিধ্বস্ত গড় ও ভবন হেতমপুরের মাটির উপর জংলা গাছ ও কাঁটার মধ্যে মুখ লুকিয়ে পড়ে রয়েছে। কিন্তু সেই গড়ের বুকের কাছে আজও রয়েছে শেরিনা বিবির কবর। আর, তার নিকটেই হাফেজ খাঁ'র বাঁধ।

লোকে বলে, হাপুস খাঁ'য়ের বাঁধ, যে বাঁধের জল আজও সূর্যালোকে চিকচিক করে। অনেক রাতের জ্যোৎস্নায় কোন রূপকথার শুক-শারী হয়তো এই বাঁধের জলে আজ আর তৃষ্ণা মেটাবার জন্য আসে না। কিন্তু শেরিনা বিবির কবর যেন আজও উৎকীর্ণ হয়ে শুনছে এক বুলবুলের শিস। মাঝে মাঝে সত্যই শুনতে পাওয়া যায়, পল্লীর কোন এক নীরব অপরাহ্নে কবরভূমির নিকটে শাল মহুয়া আর বটের পাতার আড়াল হতে হঠাৎ শিউরে উঠছে এক বুলবুলের শিস। শুনে মনে হয়, বৃথাই চেষ্টা করেছিলেন আমীর হুসেন খাঁ। তরবারির জোরে বুলবুলের শিসকে হত্যা করা যায় না।

ডুমনীতলার মা

কে বলবে এখানে একদিন সমৃদ্ধ এক জনপদ ছিল? এই মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গার কাছে ন'পুকুর গ্রামের দিকে তাকালে সেই প্রাচীন সমৃদ্ধির কোন চিহ্নই আজ আর দেখতে

পাওয়া যায় না। কোন ধ্বংসোন্মাদ কালাপাহাড়ের আঘাতে নয়, কালের প্রকোপে চূর্ণ হয়ে আর ধূলি হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে সেই জনপদের জীবন। কদাচিৎ কোনদিন চাষীর লাঙলের ফলার আঘাতে মাটির আড়ালে লুকানো একটি প্রাচীন ইষ্টক-খণ্ড হয়তো খট্ করে বেজে ওঠে পুরাতনের অস্থিখণ্ডের মত।

গঙ্গার প্রবাহও দূরে সরে গিয়েছে। ন'পুকুরের উত্তরে সুবিস্তীর্ণ একটি বিল আজও গঙ্গার সেই প্রাচীন প্রবাহপথের স্মৃতি ধারণ ক'রে রেখেছে। বিলের নলখাগড়ার বনে ডাহুক ডাকে, আর দহের কলমীদলের উপর জলপিপি ঘুরে বেড়ায়। নিকটের গাঁয়ের মানুষ কূপ খনন করতে গিয়ে মাটির গভীরে হঠাৎ একটি কাঠের টুকরো দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয়। সন্দেহ হয়, একি সেই অতীতের কোন এক ধনপতি সাধুর নিমজ্জিত তরণীর ভগ্নাংশ?

সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয়, এই মহালুপ্তির মধ্যে অতীতের একটি বিস্ময় আজও তার পুরাকালীন মায়ামূর্তি অক্ষয় ক'রে রাখতে পেরেছে। ন'পুকুরের 'ডুমনীতলার মা।'

শিলাময়ী এই দেবীর অর্চনার জন্য আগত নরনারীর চোখের দৃষ্টিতে আজও সেই পুরাতন বিস্ময় ও বিশ্বাস উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দেবীস্থানের নানা প্রস্তরমূর্তির মধ্যে বৌদ্ধ যুগের ভাস্কর্যের আভাস অবশ্য পাওয়া যায়। কিন্তু ডুমনীতলার শিলাময়ী দেবী যে ঘটনার বিস্ময়কে আজও জাগ্রত ক'রে রেখেছেন, সে ঘটনার ঐতিহাসিক বয়স নির্ণয় করা যায় না। নির্ণয় করার চেষ্টা বৃথা। ন'পুকুরের যে প্রাচীন জনপদ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, সে জনপদও তখনো ভূমিষ্ঠ হয়নি। আজকের ন'পুকুর তখন ছিল ভাগীরথী তীরের গভীর এক অরণ্য মাত্র।

দেশ পর্যটনে বের হয়েছিলেন এক ব্রাহ্মণ ভূস্বামী যুবক। কত গ্রামের ঘাটে তাঁর নৌকা এসে থেমেছে। গ্রামের রূপ দেখেছেন, গ্রামের দেবালয়ে পূজো দিয়েছেন, আর দীন-দুঃখীকে বস্ত্রদান করেছেন তিনি। মধ্যাহ্নে গ্রামের ঘাটে তাঁর নৌকা লেগেছে, আর সন্ধ্যা হবার আগেই সে গ্রামের ঘাট থেকে তাঁর নৌকা চলে গিয়েছে দূরের আর এক গ্রামের অভিমুখে। এমনিভাবেই শরৎকালের এক সকাল বেলায় এমন একটি পল্লীর ঘাটে তাঁর নৌকা এসে লাগলো, যেখানে নৌকা বাঁধা পড়ে গেল কয়েকদিনের জন্য, কারণ তাঁর হৃদয়ই বাঁধা পড়ে গিয়েছিল ঐ ঘাটের উপর একটি সুন্দর মুখচ্ছবির কাছে।

পূর্ণ কলসী এক হাতে স্পর্শ ক'রে পল্লীর ঘাটে দাঁড়িয়েছিল সুন্দরী এক কুমারী। কলসী কাঁখে তোলবার আগে বিস্মিত হয়ে দূরদেশের সেই নৌকার দিকে কুমারী তার কালো চোখের দৃষ্টি তুলে একবার তাকালো। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে লজ্জিত হয়ে উঠলো সেই দৃষ্টি। নৌকার কক্ষদ্বারে দাঁড়িয়ে ভূস্বামী যুবক মুগ্ধের মতন তরুণীর মুখের দিকেই তাকিয়েছিলেন।

রূপের কোন ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যায় না। কত দেশের কত মেয়ে দেখেছেন, কিন্তু সর্বসুলক্ষণা এমন মেয়ে কোনদিন ভূস্বামী যুবকের চোখে পড়েনি। আরও বিস্মিত হয়ে

দেখলেন ভূস্বামী যুবক, পূর্ণ কলসী কক্ষে নিয়ে সেই রূপবতী তরুণী ধীরে ধীরে চলতে চলতে অদূরে জীর্ণ কুটীরের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পিতা নেই, মাতা নেই, যেন এই নদীর জলের স্নেহে পালিতা মরালীর মত তটভূমির ঐ ক্ষুদ্র ও জীর্ণ কুটীরের ভিতরে তার রূপ লুকিয়ে একাকিনী বাস করে তরুণী। ভূস্বামী যুবক এসে দাঁড়ালেন কুটীরের দ্বারে। বিবাহের প্রস্তাব জানালেন। লজ্জিতা হয় তরুণী, তার পরেই, কে জানে কিসের ভাবনায় ব্যথিত হয়ে ওঠে তার দুই চক্ষু।

ভূস্বামী যুবক বলেন—ভালোবেসেছি তোমাকে, সর্বসুলক্ষণা তুমি, মনে হয় তুমি এক রাজার ঘরের হারিয়ে যাওয়া মেয়ে। বধূ হয়ে এসো তুমি আমার জীবনে।

যুবকের প্রস্তাবে আর আপত্তি করে না কুমারী। অগ্নি সাক্ষী ক'রে, মালা বদল ক'রে আর সীমন্তে সিঁদুর চিহ্ন এঁকে দিয়ে সেই সন্ধ্যাতেই অপরিচিতা পল্লীকুমারীর পাণি গ্রহণ করলেন ব্রাহ্মণ যুবক।

আমের পাতা দিয়ে নৌকাকে উৎসবের সাজ পরানো হলো। নৌকার কক্ষের কপাটে কুমকুম লেপে দেওয়া হলো। গন্ধতৈলের প্রদীপে আলোকিত নৌকার কক্ষের ভিতরে বসলো বর ও বধূ।

যুবক জিজ্ঞাসা করেন—কোন দুঃখ নেই তো মনে?

বধূ বলে—না।

যুবক—সুখী হয়েছো?

বধূ বলে—না।

যুবক বিষণ্ণ হয়—কেন?

বধূ বলে—যেদিন তোমার সন্তানকে কোলে নিয়ে তোমার সামনে বসতে পারবো, সেদিন আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হবে।

প্রসন্ন হয়ে ওঠেন ভূস্বামী যুবক। বুঝতে পারেন এবং বিস্মিত হন, রূপ আর যৌবনের দুর্লভ এক শোভা শুধু নয়, সুন্দর এক সন্তানবাসনা যেন জীর্ণ কুটীরের অমমতা ও অবহেলার মধ্যে মুখ লুকিয়ে এতদিন পড়ে ছিল। দৈবের অনুগ্রহে সেই অবহেলিতাকে তিনি আজ উদ্ধার করতে পেরেছেন। সেই সন্ধ্যাতেই দুটি মিলিত জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে যেন নবপল্লবে সাজিয়ে নিয়ে নৌকা আবার যাত্রা শুরু করে।

উৎসবের আনন্দ বহন ক'রে নিয়ে চলেছে নৌকা। রাত্রির অন্ধকার ঘনতর হয়। ঊর্ধ্বের আকাশগঙ্গায় মৃদু জ্যোতির বাষ্প ভাসে। মাঝিমাল্লারা গান গায়। বিশ দাঁড়ীর উল্লাসে নৌকা তর তর ক'রে এগিয়ে চলে। ভোর হয়। মধ্যাহ্নের অনুকূল বাতাসে নৌকা আরও বেগাকুল হয়ে চলতে থাকে। কিন্তু সন্ধ্যা হতেই দেখা দিলো দুর্যোগ।

আকস্মিক এক ঝঞ্ঝার আক্রমণে শঙ্কিত হয়ে উঠলো নৌকার সন্ধ্যা-প্রদীপ। প্রবল বারিপাতে সিক্ত ও ব্যথিত হয়ে উঠলো নৌকার নবপল্লবের সাজ! মুছে যায় কক্ষ-কপাটের কুমকুম চিহ্ন। ক্ষুব্ধ ঢেউ, বিদ্যুতের ঝলক আর বজ্রনাদের ভয়াল স্পর্শে সন্ত্রস্ত

সেই নৌকা নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় অরণ্যে আচ্ছন্ন তটভূমির গায়ে এসে লাগলো। আজ যেখানে ন'পুকুর গ্রাম, ঠিক সেখানে।

নৌকার মাঝিমাল্লা আর ভৃত্যের দল উদ্বিগ্ন হয়েছে। কিন্তু একটুও উদ্বিগ্ন হয়নি বর আর বধূ। গলায় ফুলের মালা বাসি হয়ে গেলেও তার মধ্যে গত সন্ধ্যার মিলন-লগ্নের আনন্দ যেন এখনো সুরভিত হয়ে রয়েছে। নবদম্পতির চোখের দৃষ্টি আর মুখের হাসিকে একটুও ম্লান করে দিতে পারে না এই সন্ধ্যার দুর্যোগ।

খাদ্যসামগ্রী আর রন্ধনের সব উপকরণ ছিল নৌকায়। ছিল না শুধু শুকনো কাঠ। কিন্তু ঝড় ও বৃষ্টি থামে না এবং মাঝি ও ভৃত্যেরা কাঠ সংগ্রহও করতে পারে না। নদীর কিনারায় শুধু ঘন বাঁশবন। জলে-ভেজা সেই কাঁচা বাঁশ ইন্ধন হতে পারে না। ক্ষুধাক্লিষ্ট নৌকাযাত্রী সকলেই চিন্তিত হয়ে শেষে বিমর্ষ ও নিরাশ হয়ে পড়লো।

নববধূ বলে—আমি ইন্ধন তৈরি ক'রে দিতে পারি।

যুবক—কেমন করে?

নববধূ বলে—জলে-ভেজা ঐ কাঁচা বাঁশ কয়েকটি আনতে বল।

ভূস্বামী যুবকের আদেশে ভৃত্যেরা তখনই তীরে নেমে কাঁচা বাঁশ কেটে নিয়ে আসে। ভূস্বামী যুবক, মাঝিমাল্লা আর ভৃত্যেরা দেখে বিস্মিত হয়, নববধূ তার কটিবস্ত্র হতে তীক্ষ্ণধার একটি অস্ত্র বের ক'রে তার সাহায্যে সেই কাঁচ বাশের খণ্ড খণ্ড দেহ অতি নিপুণভাবে পাতলা পাতলা চটা তুলছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই কাঁচা বাঁশের এই সূক্ষ্ম ও হালকা চটার একটা স্তূপ তৈরী হলো। এইভাবে সহজদাহ্য ইন্ধন তৈরি ক'রে দিলো নববধূ। আর, আগুন দেওয়া মাত্র সেই ইন্ধন জ্বলে উঠলো। ভৃত্যেরা নিশ্চিন্ত মনে সেই ইন্ধনের সাহায্যে রন্ধনের কাজ সুসম্পন্ন করলো।

কিন্তু বিস্মিতভাবে দেখতে দেখতে বিমূঢ়ের মত হয়ে গেলেন ভূস্মামী যুবক। তীব্র একটা সন্দেহের ছায়া যেন মলিন ক'রে তুলেছে তাঁর চোখের দৃষ্টিকে। কে এই মেয়ে? কোন্ জাতের মেয়ে? কটিবস্ত্রের আড়ালে অস্ত্র থাকে, আর কাঁচা বাঁশের ছিলকা তুলে ফেলতে দুই হাতে কী অদ্ভুত নিপুণতা।

ব্রাহ্মণ ভূস্বামীর মন হঠাৎ দুঃসহ যন্ত্রণায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। তবে কি ভুল ক'রে আর সুন্দর মুখের ছলনায় মুগ্ধ তাঁর দৃষ্টির ভুলে এক নীচজাতীয়াকে বিবাহ ক'রে ফেলেছেন তিনি?

সন্দেহ তীব্রতর হয় এবং নৌকাযাত্রী সকলের সঙ্গে তাঁর এই সন্দেহের কথাটি আলোচনা করেন বংশগৌরবে গরবী সেই ভূস্বামী যুবক। সন্দেহ করেন যুবক, এ নিশ্চয় ডোমের মেয়ে। নৌকাযাত্রী সকলেই নিঃসংশয় হয়ে একবাক্যে সমর্থন করে—নিশ্চয়ই ডোমের মেয়ে।

নববধূর কাছে এসে যুবক বললেন—এসো, প্রদীপ হাতে নিয়ে আমার আগে চলো।

নববধূ—কোথায়?

যুবক—আমার সন্ধ্যাপূজার জন্য ফুল চাই। ডাঙ্গায় নেমে ফুল খুঁজতে হবে।

প্রদীপ হাতে নিয়ে নৌকা থেকে মাটিতে নামতেই নববধূর হাতের প্রদীপ ঝড়ের বাতাসে নিভে গেল। চমকে ওঠে নববধূ। পিছনে তাকিয়ে দেখতে পায়, স্বামী নৌকার উপরেই দাঁড়িয়ে আছেন, মাটিতে নামেননি। পরক্ষণেই আর্তনাদ ক'রে ওঠে নববধূ। সেই নৌকাও আর নেই। নৌকা তার নোঙর তুলে নিয়ে, আর বাঁধন খুলে দিয়ে নিষ্ঠুর জলচর জন্তুর মত দ্রুত সাঁতার দিয়ে ততক্ষণে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। এক উচ্চবংশের গৌরবকে অস্পৃশ্যার কলুষ হতে রক্ষা করার জন্য নৌকা তখন পিছনের সেই আর্তনাদকে অরণ্যের কোলে ফেলে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে।

প্রবল বর্ষণ ও উদ্দাম ঝঞ্ঝায় পীড়িত সেই বনের প্রান্তে একাকিনী দাঁড়িয়ে রইল নববধূ। রাত্রির সব অন্ধকার, আর ভয়াল ঝড়ের সব আক্রোশ যেন বিরাট পাষাণভারের মত তার বক্ষের স্পন্দন স্তব্ধ ক'রে আনছে। কেন এত ঘৃণা, আর এমন নির্মম ভাবে ফেলে রেখে চলে যাওয়া? চিৎকার ক'রেই ডাকতে ইচ্ছা করে। —ওগো শুনে যাও। নিজে ভুল ক'রে জাতের কথা ভেবে চলে যেও না। তোমারই ছেলেকে কোলে পাবো ব'লে যে আশা পেয়েছি মনে, সে আশা এমন ক'রে ভেঙে দিও না। আমার মুখের হাসিতে জাত দেখতে পাওনি, দেখে যাও আমার চোখের জলেও জাত নেই।

কিন্তু অনুভব করে নববধূ, কণ্ঠ তার ধীরে ধীরে ভাষা হারিয়ে যেন মূক হয়ে আসছে। গভীর ঘুম নেমে আসছে চোখে। মৃদুতর হয়ে আসছে নিঃশ্বাস। কিন্তু কি আশ্চর্য, কোন্ এক অদৃশ্য হস্তের শান্তিময় পরশ যেন সান্ত্বনা বুলিয়ে তার মনের সকল বেদনা দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

ধীরে ধীরে বধূর সেই কনকচাঁপার মত কোমল দেহ কঠিন পাষাণে পরিণত হয়ে গেল।

সেই রাত্রেই নিকটের এক পল্লীর ডোম গৃহস্থের কন্যা স্বপ্নে দেখতে পায়, মহাদেবী বলছেন—ওঠ রে মেয়ে, বনের শেষে নদীর ধারে গিয়ে দেখ, শিলাময়ী দেবী রয়েছেন সেখানে, তাঁর পূজোর ব্যবস্থা কর।

সেই শিলাময়ী দেবীই হলেন আজকের ন'পুকুরের ডুমনীতলার মা'। বংশ গরবীর সকল ঘৃণার বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিবাদ আজও যেন শিলীভূত হয়ে রয়েছে এই মূর্তিতে। সেই বংশগর্ব ও উদ্ধত ঘৃণা আজ কোথায়? সেই ভীরুর বংশগর্ব চিতাভস্ম হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেছে কে জানে। কিন্তু সেই অস্পৃশ্যার শরীর দেবীর মূর্তিতে পরিণত হয়ে আজও রয়েছে সংসারের চোখের সম্মুখে। আজ শত শত নরনারী ডুমনীতলার মায়ের সম্মুখে নৈবেদ্য রেখে দাঁড়ায়। পূজিতা দেবীর প্রসাদান্ন গ্রহণ করে সকলে। বাৎসরিক মেলা বসে এখানে।

সন্তান লাভের বাসনায় পল্লী নারীদের ভিড় হয় এখানে। আর আসে মৃতবৎসা জননীর দল।

পূজোর নৈবেদ্য সম্মুখে রেখে মৃতবৎসা জননী ও নিঃসন্তান বধূ মাথা নত করে। দেবীর কাছে মনের অভিলাষ নিবেদন করে। প্রণাম করার পর মুখ তুলতেই দেখতে

পায়, শিলামূর্তির সুস্মিত একটি মুখে দুটি ঠোঁট যেন নড়ে উঠলো। সন্তান আসবে, সন্তান বাঁচবে, আশ্বাস দিচ্ছেন দেবী। হৃষ্ট মনে ঘরে ফিরে যায় গ্রামের বধূ। গ্রাম্যনারীর এই বিশ্বাসে মহিমান্বিতা হয়ে রয়েছেন ডুমনীতলার শিলাময়ী মা।

তাই কল্পনা করলে বিস্মিত হতে হয় এবং আরও প্রশ্ন জাগে মনে, বহু যুগের আগের কোন এক নববধূ-হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা কি সত্যই আজও জেগে রয়েছে ঐ পাষাণীর বক্ষে? শত গ্রাম-বধূর সন্তানবাসনা সফল ক'রে দিয়ে আজও কি তৃপ্তি লাভ করছে পুরাকালীন এক মাতৃত্বের সাধ?

মেহের হামারা

দুটি করুণ শব্দ, হয়তো বাতাসেরই কোন রহস্যের সৃষ্টি দুটি প্রতিধ্বনি মাত্র। আর একটি ব্যথিত মূর্তি, হয়তো আলোছায়ারই কোন রহস্যের সৃষ্টি একটি দৃশ্য মাত্র। কিন্তু এই দুই করুণ শব্দ, আর ঐ এক ব্যথিত মূর্তি যেন সাড়ে তিনশত বৎসর আগেকার এক বেদনার্ত ঘটনার নাটক আজও অভিনয় ক'রে চলেছে। ঐ শব্দ দুটিকে শোনা মাত্র চমকে উঠেছে পথের পথিক, আর ঐ মূর্তিকে দেখা মাত্র বিস্ময়ে ধন্য হয়ে ঘরে ফিরে গিয়েছে দর্শক।

একটা চাপা কান্না, একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস, আর একটা সুন্দর মুখ যেন এই বাতাস ও আলো-ছায়ার এক অদৃশ্য নিভৃতে বাস করে। হঠাৎ তাদের শোনা যায়, আর দেখা যায়। কিন্তু একই সঙ্গে নয়, আর, এক জায়গাতেও নয়।

বর্ধমানের পীর বহরাম মহল্লা থেকে শুরু ক'রে মঙ্গলকোটের ভাঙা মসজিদ পর্যন্ত, তারপর আর নয়। এই দুই জনপদের মধ্যে যে প্রাচীন বাদশাহী সড়কের অবশেষ আজও এখানে-ওখানে জেগে রয়েছে, সেই সড়কই হলো এ-রহস্যের আশ্রয়ভূমি।

প্রথমে ঐ চাপা কান্নার শব্দ শুনে এই পথের মানুষ একদিন চমকে ওঠে এবং তারপর থেকে মাঝে মাঝে শুনতেই থাকে, যতদিন না ঠিক এই রকমই আকস্মিকভাবে গভীর এক দীর্ঘশ্বাসের শব্দ এসে সে পথিককে আর একবার আরও বেশ ক'রে চমকে দেয়।

কিন্তু এখানেই এক রহস্য-নাটকের শেষ নয়। শেষ দেখবার জন্য বিহ্বল পথিকের কৌতূহল তাকে একদিন টেনে নিয়ে আসে বর্ধমান শহরের এক অতি সাধারণ পুরনো কবরের কাছে। কবরের কাছে একটি প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে পথিক চলে যায়। তার সকল কৌতূহলের ক্ষান্তি হয় তখনই, রাত্রির মাঝ প্রহরে অথবা শেষ যামে পথিক যখন সেই কবরখানার প্রাচীরের কাছে এসে নীরবে আর ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকায়। কবরের কাছে যেতে নেই, দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়।

কবরের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে পথিক। জানবার আর বুঝবার মত আর কিছুই বাকি থাকে না। দর্শকের সব কৌতূহলের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে তবে এই

নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে। সে পথিককে আর কোনদিন সেই চাপা কান্নার আর সেই দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে হয় না।

সেই বাদশাহী সড়কের বিস্তৃত দেহ আজ টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। কোথাও ধানের ক্ষেত এসে গ্রাস করেছে সে সড়কের শেষ চিহ্ন। কোথাও জেলাবোর্ডের রাস্তা এসে তারই উপর নতুন ধুলো ছড়িয়ে দিয়েছে। আবার কোন কোন অংশকে একেবারে আপন ক'রে নিয়েছে আধুনিক ট্রাঙ্ক রোড তার পিচ আর আসফল্টের নতুন গৌরবে ও গুণে।

এই ট্রাঙ্ক রোডেরই মন্থরগতি গো-শকটের গাড়োয়ান তার মধ্যাহ্নের তন্দ্রা থেকে এক-একদিন চমকে জেগে ওঠে। চোখ মুছে তাকায়, আর উৎকর্ণ হয়ে আবার শোনবার চেষ্টা করে, সেই ক্ষীণ চাপা কান্নার শব্দটাই কি আর একবার ছুটে চলে গেল? জেলাবোর্ডের সড়কে ও গাছের ছায়ায় বিশ্রামরত শান্ত পথিক হঠাৎ অশান্ত হয়ে এদিক-ওদিক তাকায়। এ কার কান্নার শব্দ? ধানক্ষেতের আলের উপর বসে বৃদ্ধ চাষী অপর চাষীদের ডাক দিয়ে বলে—শুনলে তো?

হ্যাঁ, সবাই শুনেছে। অদ্ভুত একটা শব্দ। এ-শব্দ ধানক্ষেতের বাতাস থেকে ওঠে না। এ-শব্দ কোন পাখির পাখার শব্দ হতে পারে না। ঐ তালবনের মাথায় যখন দুপুরের বাতাস ছটফট করে, তখন একটা অদ্ভুত শব্দ শোনা যায় বটে, কিন্তু সে-শব্দ তো এত করুণ হতে পারে না। এ যে দুঃসহ শোক অভিমান আর আক্ষেপে অভিভূত একটা জীবনের কান্না। যেন মুখের উপর আঁচল চাপা রয়েছে, তাই স্পষ্ট ফুটে উঠতে পারছে না সেই কান্নার মুখরতা। পৃথিবীর এক পরম অসহায়তা আর অনিচ্ছাকে যেন কেউ জোর ক'রে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

চাষীরা প্রশ্ন করে—এ কিসের শব্দ?

বৃদ্ধ চাষী উত্তর দেয়—মেহের বিবির কান্না।

হ্যাঁ, মেহের বিবির কান্নাই ভেসে চলেছে। না, ঠিক সেই কান্না নয়, সেই কান্নার নিরবয়ব একটা আত্মা যেন ভেসে যায় বাতাসে। স্মরণ করিয়ে দেয় সেই ঘটনা, বাদশাহী সড়কের দু'পাশের গাছের ছায়াকে বেদনায় বিচলিত ক'রে বর্ধমানের ফৌজদার শের আফগানের পত্নী বন্দিনী হয়ে চলেছেন। একটি পালকি, তার সম্মুখে বল্লম দুলিয়ে চলেছে খাস মোগল দরবারের এক হাজার সিপাহী সওয়ার। তার পিছনে সুবেদারের পদাতিকের কাতার। খুরের আঘাতে সড়কের বুক পিটিয়ে শব্দ তুলে বিচিত্র এক উল্লাসে এগিয়ে চলেছে শত শত আরবী খোরাসানী আর কান্দাহারী তেজী। দিল্লীশ্বর নুরুদ্দীন মহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ গাজী এতদিনের তাঁর প্রণয়াকাঙ্ক্ষার এক বিঘ্ন অপসারিত করেছেন। বাদশাহের পরিকল্পনা সফল হয়েছে। তাঁরই আদেশে অনুপ্রাণিত হয়ে মেহের উন্নিসার স্বামী আলিকুলি শের আফগানকে হত্যা করেছে ঘাতক।

শের আফগানের কবরের কাঁচা মাটি তখনো শুকিয়ে যায়নি। নিহত স্বামীর মুখ

শেষবারের মত দেখবার সুযোগও দেওয়া হয়নি মেহের উন্নিসাকে। একটি অনুরোধ করেছিলেন মেহের উন্নিসা, বর্ধমান থেকে চলে যাবার আগে স্বামীর কবরে অন্তত একটি প্রদীপ দিতে চাই।

সে সুযোগও পেলেন না মেহের উন্নিসা। বাদশার জাহাঙ্গীরের প্রাসাদে অন্তঃপুরের এক কক্ষে তখন মেহের উন্নিসার জন্য সুখ ও সমাদরের আয়োজন শুরু হয়ে গিয়েছে। হামামের চৌবাচ্চায় নতুন আতর ঢেলে জল সুবাসিত করছে পরিচারিকার দল। নতুন এক শিশমহল নির্মাণের কথা ভাবছেন বাদশাহ নুরুদ্দীন জাহাঙ্গীর। যেখানে তার আকাঙ্ক্ষিতা মেহের অচিরে নুরমহল হয়ে লক্ষ আরশির বুক রূপের প্রভায় চঞ্চল ক'রে তুলবেন। কল্পনায় এক নতুন খোয়াবগাহ রচনা করছেন শাহেনশাহ জাহাঙ্গীর, যেখানে তাঁর স্বপ্নচারিণী এক সুন্দরী নারী এসে তার রক্তিম অধরের মদির ইঙ্গিতে নতুন তন্দ্রা ডেকে আনবে নিশীথ-প্রহরের ক্লান্ত চোখের কাছে। জাহাঙ্গীরের বহুদিনের কামনা এতদিনে বর্ধমানের এক ভূমিখণ্ডকে শোণিতে রঞ্জিত ক'রে এক সুখী স্বামীর বুক থেকে পত্নীকে কেড়ে নিয়ে চলেছে দূর আগ্রার দিকে।

কাঁদছেন মেহের বিবি। চলেছে রক্ষী সওয়ারের দল। চলেছে পালকি। দেখা যায় মঙ্গলকোটের মসজিদ। অপরাহ্নের রক্তাভ আলোকও ধীরে ধীরে মুছে যায়। মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে, যেন প্রার্থনা করছে সন্ধ্যার বাতাস। কান্না বন্ধ করলেন মেহের বিবি। মসজিদের দ্বারে এসে একবার থামলো তাঁর পালকি।

কে জানে কা'র সান্ত্বনার স্পর্শ পেয়ে কান্না থামিয়েছিলেন মেহের বিবি। আল্লাহ রহমানের রহিম! ফরিয়াদ করতে গিয়ে হয়তো আর ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেননি মেহের উন্নিসা। ভেজা চোখের দৃষ্টি তুলে বর্ধমানের সন্ধ্যাকে শেষবারের মত নীরবে বিদায়বেদনা জ্ঞাপন করেছিলেন। শান্ত করেছিলেন নিজেকে, হয়তো এই নতুন অদৃষ্টের সম্মুখীন হবার জন্য নতুন এক প্রতিজ্ঞায় মন তৈরি ক'রে নিয়ে।

আজ জীর্ণ হয়ে গিয়েছে মঙ্গলকোটের মসজিদের সেই গম্বুজ; বহু শতাব্দীর জরা ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে তার মেহরবে আর মিমবারে। ভেঙে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে তার মিনারের সেই প্রাচীন সৌষ্ঠব। কিন্তু জীর্ণদেহ এই মসজিদ যেন আজও নীরবে সান্ত্বনা দিয়ে এই পথের অশরীরী কান্নাকে চুপ করিয়ে দেয়। মঙ্গলকোটের পর আর কোথাও সেই কান্নার শব্দ তখনো কেউ শুনতে পেয়েছে ব'লে শোনা যায় না।

সন্ধ্যা ফুরিয়ে যায়। মেহের উন্নিসার পালকি তখন মঙ্গলকোট ছেড়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছে। বর্ধমান হতে মঙ্গলকোট পর্যন্ত বাদশাহী সড়কে সেদিন যে সন্ধ্যা নেমেছিল, আজও নামে সেই সন্ধ্যা। সেই রকমই রাত্রি আজও দেখা দেয়। মাঠ ঘুমিয়ে পড়ে, গাছের মাথায় জোনাকী জ্বলে, নীরবে রাত্রির স্তব্ধতাকে শুধু মথিত করে ঝিল্লীর রব। তারপর রাত্রি যখন গভীর হয়, তখন একাকী পথিক আর একবার চমকে ওঠে, ঝড়ো বাতাসের আক্ষেপের মত শব্দ ক'রে কে যেন কি-জানি বলে গেল। নিকটের গ্রামের চাষীও এই

স্তব্ধ রাত্রির মাঠে তার হারানো গরুর সন্ধান করতে এসে চমকে ওঠে। এ আবার কিসের শব্দ? যেন মানুষেরই একটা দীর্ঘশ্বাস ছুটে চলে গেল। হ্যাঁ দীর্ঘশ্বাস, কিন্তু এক অপরাহত দর্প যেন মিশে রয়েছে এই শব্দের মধ্যে। শাহী সওয়ার দলের হাতের বল্লম চূর্ণ ক'রে ঐ পালকিকে ফিরিয়ে আনবার জন্যই কি দুর্মর একটা সংকল্প তার নিঃশ্বাসের জোরে ঝড়ের মত ছুটে চলেছে?

বহুদিন আগে বিস্মিত ও কৌতূহলী গ্রামের মানুষ বৃদ্ধ হাজী সাহেবের কাছে প্রশ্ন ক'রে যে উত্তর শুনেছিল, সেই উত্তর আজও এই নৈশ দীর্ঘশ্বাসের ব্যাখ্যা হয়ে রয়েছে। মেহের হামারা! এই ধ্বনিই দীর্ঘশ্বাসের মত শব্দ ক'রে নিস্তব্ধ নিশীথে বর্ধমান হতে মঙ্গলকোটের দিকে এক-একদিন ছুটে যায়।

মেহের হামারা! আলিকুলি শের আফগানের শেষ নিঃশ্বাস বাদশাহী প্রণয়কলাপের সীমাহীন ঔদ্ধত্যকে ছিন্নভিন্ন করবার জন্য আজও ছুটাছুটি করছে। মেহের হামারা! জাহাঙ্গীরের হুকুমের অনুচর সুবেদার কুতুব উদ্দীনের তরবারির আঘাতে ছিন্ন হয়নি পত্নীপ্রেমিক স্বামীর আত্মা। মেহের হামারা! দীর্ঘশ্বাসের মত এই শব্দের মধ্যে এক শেরের গর্জন লুকিয়ে রয়েছে!

কিন্তু এমন ক'রে কাকে ডাকছেন শের আফগান? সে নারী কি আর ফিরে আসতে পারে? চলে গিয়েছেন মেহের, তাতার-দম্পতির সেই মেয়ে, যে-মেয়েকে তার শিশুকালে একদিন কান্দাহারের পথে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে এক কৃষ্ণসর্প সস্নেহে জড়িয়ে ধরেছিল। কিন্তু কী কঠোর এই বাদশাহী কামনার নাগপাশ! এই অবরোধ থেকে মুক্ত হবার সাধ্য আছে কি আমির -পত্নী এক বিধবার?

সাধ্য ছিল না। বাদশাহের প্রণয়গরিমায় প্রথমে নুরমহল, তারপর নূরজাহানে পরিণত হলেন মেহের উন্নিসা। মোগল-বৈভবের সম্রাজ্ঞী হয়ে উঠলেন নূরজাহান।

কিন্তু, তারপর আর কোন প্রভাতে দিল্লী ও আগ্রার কোন প্রাসাদের বাতায়নে দাঁড়িয়ে পূর্বাকাশের দিকে তাকাতে গিয়ে ছায়াময় দূর বঙ্গালের এক নিভৃতের একটি কবরের কথা কি মনে পড়েনি সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের? তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী, সোনার কলমে লেখা সম্রাটের আত্মজীবনী! ক্ষণেকের মত উদাসিনী ও অন্যমনা সম্রাজ্ঞীর কবরী হতে সেদিন যে গুলচাঁদনীর স্তবক হঠাৎ স্খলিত হয়ে মর্মর পাষাণের উপর লুটিয়ে পড়েছিল, সে কথা লিখতে ভুলে গেলে কেন? মুখ খুলে তুমি বলতে পারোনি কেন, হে তারিখ-ই-জানজাহান, কেন এক পূর্ণিমা রাতের মাঝ প্রহরে লাহোর কেল্লার হাতিপোল দরজা খুলে গিয়েছিল, আর প্রাসাদকক্ষের রঙীন আলোকের সমারোহ থেকে একাকিনী চুপি চুপি বের হয়ে সম্রাজ্ঞী নুরজাহান এসে রাভি নদীর কিনারায় মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়িয়েছিলেন গ্রাম-নারীর ছদ্মবেশে, কিসের জন্য, কার কথা ভেবে, কোন বেদনার ভার হতে মুক্ত হবার আশায়? কাশ্মীরের সুরম্য শালিমার বাগে এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় বিরামকুঞ্জের নিভৃতে কালোপাথরের বেদিকার উপর সম্রাটের পাশেই বসে পীর পঞ্জালের হিমানীমাখা চূড়ার

দিকে তাকিয়ে সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের দুই চোখ কেন যে ঝাপসা হয়ে উঠেছিল, সে কথা লিখতে এত ভয় পেলে কেন ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরী?

থাক লিখিত ইতিহাসের কথা। সে যতই নীরব হয়ে থাকুক, বর্ধমানের বাতাস কিন্তু নীরব হয়ে থাকেনি। এ বাতাস আজও এক অদ্ভুত শব্দের রহস্য সৃষ্টি ক'রে ডাকছে তার মেহেরকে। কেউ শুনতে পায়, কেউ শুনতে পায় না। যে শুনতে পায়, তারই মনে প্রশ্ন দেখা দেয়—এ আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারবেন কি মেহের বিবি? মানত করে বিশ্বাসী মানুষ। বর্ধমানে এসে পীর বহরামে শের আফগানের কবরে একটি প্রদীপ জ্বেলে দেয়।

ঘুমিয়ে আছেন শের। মোগল-ইতিহাসের কি বিচিত্র এক ঘটনার নির্মমতা ও মমতার স্মৃতি ধারণ ক'রে রয়েছে এই কবর। শেরের পাসেই সুবেদার কুতব উদ্দীনের কবর। ঘাতক ও হত, উভয়েরই পরিণাম আজ একই মাটির আশ্রয় নিয়েছে। আক্রান্ত শের আফগানের শমশের চিরকালের মত স্তব্ধ হবার আগে একটি শানিত আঘাতে কুতব উদ্দীনকেও শোণিতে রাঙিয়ে দিয়ে নিষ্প্রাণ ক'রে রেখে গিয়েছিল। দুই বৈরীর, পরস্পরের প্রাণহন্তা দুই মানুষের পাশাপাশি কবর আজ চিরকালীন দুই সুহৃদের মত বসে আছে। মেহের হামারা, শের আফগানের এই দাবির বিরুদ্ধে তলোয়ার তোলবার মত আজ আর কেউ নেই। শান্ত কবরে মানতকারীর প্রদীপ জ্বলে কখনো মাঝরাত আর কখনো বা শেষরাত পর্যন্ত।

সত্যিই কি মেহের এল? কৌতূহল সহ্য করতে না পেরে ঘুম হয় না যে মানতকারীর, সেই-ই ফিরে এসে কবর থেকে কিছু দূরে অন্তরালে দাঁড়িয়ে থাকে, নীরবে ও নিষ্পলক চক্ষে। হঠাৎ দেখতে পায়, প্রদীপের মৃদু আলোকে যেন চিকমিক করছে এক রেশমী ওড়নার সোনালি চুমকি। যেন বাতাসের তন্তু দিয়ে তৈরী একটি স্বচ্ছ জালিতে জড়ানো রয়েছে একটি সুন্দর মুখ। মাথা হেঁট ক'রে কপাল দিয়ে কবর ছুঁয়ে বসে রয়েছে শোকভারে ভগ্ন এক নারীর শরীর, যেন চির-মহবুবের বুকের কাছে এক অনন্ত তসলীম পুষ্পিত হয়ে পড়ে আছে। মুহূর্তের মধ্যেই মিলিয়ে যায় সে ছবি।

এসেছিলেন মেহের বিবি। মানতকারীর কথা লোকে বিশ্বাসও করে। বিশ্বাস করবার মত আরও প্রমাণ লোকে স্বচক্ষেই দেখতে পায়। সকাল হলেই দেখা যায়, কবরের উপর ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে এক রাশ গোলাপের পাপড়ি। মেহের বিবিই আসেন, নইলে আর কে এসে এত গোলাপের পাপড়ি ঠিক এই কবরের উপরেই এমন ক'রে ছড়িয়ে রেখে যাবে?

দেবী উত্তরবাহিনী

ভক্ত সুরদাস অন্ধ হয়েও তাঁর মনের চোখ দিয়েই জীবনদেবতার সকল লীলার রূপ দেখতে পেতেন এবং দেখে মুগ্ধ হতেন। চক্ষু নয়, চিত্ত যার অন্ধ, সে-ই হলো প্রকৃত

অন্ধ। চিত্ত অন্ধ হয় অহংকারে, আর ধনের অহংকারে সে চিত্ত বোধ হয় একেবারে অন্ধকারই হয়ে যায়।

এক ধনগর্বান্ধেরই পরিণামের পরিচয় আজও অংকিত হয়েছে কৌশিকী নদীর তীরে হাওড়াঘাট থেকে মাত্র দশ ক্রোশ দূরে হুগলী জেলার শিয়াখালা নামে এক গ্রামের মাটিতে, যে গ্রামের প্রাচীন নাম হলো শিবাক্ষেত্র।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম বলেন, তাঁর কাব্যের শ্রীমন্ত সদাগর একদিন এই কৌশিকীরই জলতরঙ্গের উপর দিয়ে তাঁর বাণিজ্য তরণী ভাসিয়ে চলে গিয়েছিলেন সুদূরের দ্বীপ সিংহলে। সরিদ্বরা সে কৌশিকী আজ পঙ্কভারে ম্রিয়মান ও শীর্ণ। শিবাক্ষেত্রের ঐতিহাসিক স্মৃতির চিহ্ন সবই প্রায় মুছে গিয়েছে। আরব বংশীয় গৌড়াধিপ হুসেন শাহের মন্ত্রী পুরন্দর খাঁর প্রাসাদ ছিল যেখানে, সেই পুরন্দরগড়ের শেষ চিহ্নও শেষ হয়ে গিয়েছে অনেকদিন আগে। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের বিবিধ কুলবিধির প্রবর্তক, সমাজ-সংস্কারক, কৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতা কবি এবং রণপারদর্শী যে গোপীনাথ বসু গৌড়াধিপ হুসেন শাহের প্রদত্ত উপাধি গ্রহণ ক'রে পুরন্দর খাঁ নামে গৌড়বঙ্গের সর্বত্র সুখ্যাত হয়েছিলেন, তাঁরই স্থাপিত পুরন্দরপুর সাড়ে চারশত বছরের রৌদ্রে ও বর্ষায় জীর্ণ হয়ে আজ শুধু কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয়ে পড়ে আছে। বেঁচে আছে শুধু পুরন্দরপুর নামটি।

সেদিনের সেই কৌশিকীর তীরে বাস করতেন এক বিত্তবান ভৌমিক। লোকে বলতো, বড়-ভৌমিক। ঐশ্বর্যে খুবই অন্ধ ছিলেন তিনি। কিন্তু তার জন্য নয়, লোকে তাঁকে বড় বলতো এই কারণে যে, বড় ছাড়া অন্য কাউকে তিনি মান্য করতে পারতেন না এবং তার চোখে সে-ই ছিল বড়, যে ছিল ঐশ্বর্যে বড়। ধনগর্বান্ধতা চরম হয়ে উঠেছিল সেই ধনিক বড়-ভৌমিকের চিন্তায় ও আচরণে।

যে মানুষের আগে সোনা-রূপোর চিহ্ন নেই, সে মানুষকে দেখে প্রীতি লাভ করতে পারতেন না বড়-ভৌমিক। নির্ধন রূপবানের মুখের দিকে তাকিয়ে কোন রূপ দেখতে পেতেন না তিনি। দরিদ্র বিদ্বানের বিদ্যার কোন মূল্য বুঝতে পারতেন না। বনের কোকিলের ডাক শুনে মুগ্ধ হতো না তাঁর মন, মুগ্ধ হয়ে শুনতেন তাঁর সোনার খাঁচার কোকিলের রব।

উৎসবের দিনে তাঁর সভায় আগত সেই ব্রাহ্মণকেই প্রণাম করতেন তিনি, যাঁর গলায় স্বর্ণসূত্রের উপবীত তিনি দেখতে পেতেন। সম্মান দিতেন এবং পারিতোষিকে তুষ্ট করতেন সেই গায়ককে, যে গায়কের কণ্ঠে স্বর্ণহার শোভা পেতো। যে বীণাবাদকের করাঙ্গুলিতে হীরকের অঙ্গুরীয় ঝক ঝক করতো, তাকেই শ্রেষ্ঠ বাদক বলে ঘোষণা করতেন। মনুষ্যত্বকে এবং মানুষের বড়ত্বকে এইভাবেই বিচার করতেন বড়-ভৌমিক।

সত্যিই চরম হয়ে উঠেছিল সেই বড়-ভৌমিকের অন্ধতা। শুধু সোনা-রূপোর চিহ্ন দেখে মানুষকে সম্মানিত করতে গিয়ে কত শত মহৎ গুণীকে তিনি কত অসম্মানে আহত করেছেন, সেটুকু বুঝবার মত বোধশক্তিও ছিল না সেই ধনিক বড়-ভৌমিকের।

সে মূঢ়ের মূঢ়তা চরমেরও অধিক হয়ে উঠলো তারপর। দরিদ্রকে অপমানিত ক'রে

ধনীকে আর নিজেকে আনন্দিত করার অদ্ভুত এক বিলাসে মত্ত হয়ে উঠলেন বড়-ভৌমিক। নির্মাণ করলেন সুবৃহৎ এক দীর্ঘিকা। দীর্ঘিকার শিলা-বাঁধানো ঘাটে স্নান করার অধিকার রইল সেই সব অতিথিদের, যাঁরা পালকি চড়ে আগমন করেন। নগ্নপদ ধূলিতে ধূসরিত ক'রে যেসব অতিথি আসেন, তাঁদের স্নান করতে হয় দীর্ঘিকার অপর তটে যেখানে কোন ঘাট নেই আর সোপানও নেই। পঙ্কে মলিন ও পিচ্ছিল সেই তটে স্নান করতে গিয়ে বিব্রত হয় যত দীন ও দরিদ্র অতিথি। ঘাটের সোপানে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখে আনন্দ ও কৌতুক অনুভব করেন বড়-ভৌমিক। দারিদ্রের মনুষ্যত্বকে এইভাবে একেবারে পৃথক ক'রে দিয়ে, অস্বীকার ক'রে আর অসম্মান ক'রে নিজের ধনিকতার আনন্দ উপভোগ করেন এবং ধনিক বন্ধু অতিথি ও অভ্যাগতের সম্মান-বৃদ্ধি করেন, বিচিত্র ধনগর্বান্ধতার সেই বড়-ভৌমিক।

সেদিন খুবই প্রীতচিত্তে তাঁর ভবনের প্রধান কক্ষে বসেছিলেন বড়-ভৌমিক। চৌদ্দ বেহারার বাহিত পালকির আরোহী হয়ে এক পণ্ডিত এসে বড়-ভৌমিকের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন সেদিন। পণ্ডিতের কণ্ঠে স্বর্ণসূত্রের উপবীত। শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি এবং বিনয়নম্র ভাষায় আগন্তুক পণ্ডিতকে আপ্যায়িত করেছেন বড়-ভৌমিক। আগন্তুক পণ্ডিতও সেই সম্মানপূর্ণ আচরণে প্রীত হয়ে বলেন—আমি আশা করি, আপনার নিকট হতে আমি শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ ব'লে স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ ক'রে বিদায় নিতে পারবো।

বড়-ভৌমিক উল্লসিত হয়ে বলেন—অবশ্যই পারবেন মহানুভব। আপনি যে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ, সে বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

পণ্ডিত—আমাকে চতুঃসহস্র প্রজা কর দান ক'রে থাকে।

বড়-ভৌমিক—আপনিই যথার্থ বিদ্বান।

পণ্ডিত বললেন—আমি স্বর্ণ নির্মিত উপকরণ ছাড়া অন্য কোন ধাতুর উপকরণ দেবপূজায় ব্যবহার করি না।

বড়-ভৌমিক—আপনিই প্রকৃত সাধক। সার্থক আপনার পূজা।

দুই ধনাঢ্যের বার্তালাপের আনন্দে যেন বাধা দিয়ে উপদ্রবের মতই হঠাৎ প্রবেশ করেন এক ব্যক্তি। উপবাসখিন্ন কলেবর, ধূলিধূসরিত নগ্নপদ, সেই আগন্তুকের জীর্ণ উত্তরীয়ের দিকে ভ্রূক্ষেপ করতেই বিরক্তি ফুটে ওঠে ধনাঢ্য বড়-ভৌমিকের এতক্ষণের প্রসন্ন মুখে।

—কে আপনি? প্রশ্ন করেন বড়-ভৌমিক।

আগন্তুক বলেন—আমি মহাশয়ের সাহায্যপ্রার্থী।

—কেন?

—আমি একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করতে চাই মহাশয়। শাস্ত্রচর্চায় জীবনের এতকাল অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, এক্ষণে নবীন শিক্ষার্থীকে বিদ্যা দান ক'রে জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করতে চাই। কিন্তু আমি নিঃস্ব, মহাশয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে আমার মত নিঃস্বের পক্ষে চতুষ্পাঠীর স্থাপনা সম্ভব নয়।

আরও বিরক্ত হয়ে ভ্রূকুটি করেন সেই ঐশ্বর্যের বড়-ভৌমিক—কোন্ শাস্ত্র চর্চা করেছেন আপনি?

আগন্তুক বলেন—ষড়দর্শন।

হাসি ফুটে ওঠে বড়-ভৌমিকের মুখে। বলেন—হ্যাঁ, সাহায্য করতে পারি আপনাকে, কিন্তু তার আগে আপনাকে ঐ মহানুভব শাস্ত্রজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব নতমস্তকে স্বীকার ক'রে নিতে হবে।

আগন্তুক দরিদ্র বলেন—অবশ্যই স্বীকার ক'রে নেবো, যদি তর্কে পরাজিত হই।

বড়-ভৌমিক ভ্রূকুটি করেন—ধিক্ আপনার দুঃসাহসকে।

আগন্তুক—অকারণ কেন ধিক্কার দিচ্ছেন মহাশয়?

বড়-ভৌমিক—পৃথিবীর কোন জীর্ণ উত্তরীয়ের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হবার ইচ্ছা কোন স্বর্ণসূত্রের থাকতে পারে না।

আগন্তুক বলেন—তবে বলুন, কিভাবে মীমাংসা হবে?

বড় ভৌমিক—আপনি ঐ পাত্র হতে জল নিয়ে আজকের সভায় সবার সম্মুখে ঐ মহানুভব সাধক শাস্ত্রজ্ঞের পদ প্রক্ষালন করবেন, তাহ'লেই আপনাকে আমি অর্থদান করতে পারি।

আগন্তুক শাস্ত্রীর উপবাসখিন্ন শরীর থর থর ক'রে কাঁপতে থাকে। যেন সমস্ত মনুষ্যত্ব আর মানুষী হৃদয়কে ঘৃণায় আর অবহেলায় হত্যা করার এক বধ্যভূমির মাঝখানে তিনি ভুল ক'রে এসে পড়েছেন। দাবানলের কাছেও শীতলতা প্রার্থনা করা যায়, মরুভূমির কাছেও বারি আশা করা যায়, কিন্তু এই ধনগর্বান্ধের কাছ হতে বিদ্যা আর চরিত্রের কোন সম্মান আশা করা যায় না।

আর একটিও বাক্য উচ্চারণ না করে চলে গেলেন সেই অপমানিত শাস্ত্রী। ফিরে এসে দাঁড়ালেন সুসলিলা কৌশিকীর তটে। মধ্যাহ্ন সূর্যের জ্বালায় জ্বলছিল নদীতটের বালুকা। কিন্তু তার চেয়ে বেশি জ্বালায় পুড়ছিল সেই নিঃস্ব দার্শনিকের মন। নদীর তটপথ ধরে ধীরে ধীরে হেঁটে চললেন দার্শনিক। জানেন না, কোথায় কোন্ আশ্রমের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালে এই অপমানের জ্বালা শান্ত হয়ে যাবে।

নদী-সলিলের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হন দরিদ্র শাস্ত্রী। কিন্তু হঠাৎ অনুভব করেন, অদৃশ্য একটি হাত যেন স্পর্শ করেছে তাঁর জীর্ণ উত্তরীয়। বাতাস হঠাৎ শীতল হয়ে আর মৃদু ঝড়ের মত আকুল হয়ে ছুটাছুটি করে। অনুভব করেন দরিদ্র শাস্ত্রী, অশ্রুজলে প্লাবিত হয়ে গিয়েছে তাঁর চক্ষু এবং সেই অশ্রু মুছে ফেলতেই দেখতে পান, নদী-সলিলে স্বল্প নিমজ্জিত এক শিলাময়ী দেবীমূর্তি তাকিয়ে আছেন তাঁরই দিকে। সুহাস্যমণ্ডিতা ত্রিনয়না দেবী।

শান্ত হয়ে গেল কণ্ঠের সব পিপাসা, মিলিয়ে গেল অপমানিত জীবনের মনোজ্বালা। মহামাতা স্বয়ং তাঁর করুণা ও প্রসন্নতা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন এক দরিদ্র শাস্ত্রীর চোখের সম্মুখে। এই তো পরম ঐশ্বর্য।

নদী-সলিলের নিকটে এসে দেবীমূর্তিকে বক্ষে তুলে ধরলেন দরিদ্র শাস্ত্রী। তাঁর শাস্ত্রজ্ঞানও যেন তৃষ্ণার্ত হয়েছিল এতদিন ধ'রে, আজ মিটে গেল সেই তৃষ্ণা।

নদীতটেই এক পর্ণকুটীরে দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করলেন দরিদ্র শাস্ত্রী। শাস্ত্রজ্ঞানের বৃথা অভিমান মুছে গেল চিরকালের মত। আরম্ভ হলো পূজারীর জীবন।

সেদিন শারদীয়া শুক্লা একাদশী। শোনা যায়, নদীবক্ষ হতে মধুর সঙ্গীত ও বাদ্যের রোল ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তটভূমির দিকে। দেখা যায়, ভেসে আসছে একটি উৎসব-তরণী। পত্রে ও পুষ্পে সজ্জিত সেই তরণী কোন ধনাঢ্যের উৎসবের আনন্দ বহন ক'রে নিয়ে চলেছে।

সেই ধনাঢ্য বড়-ভৌমিকই নতুন এক আনন্দের অভিযানে যাত্রা করেছেন। নদীর দুই তটের যত ধনাঢ্যের বিশ্রামঘাটের নিকটে গিয়ে আনন্দ বিতরণের জন্য ভেসে চলেছে নৌকা। দরিদ্রের পল্লী আর পঙ্কিল তটের দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না সেই নৌকা।

অকস্মাৎ অদ্ভুত এক আহ্বানের স্বর শুনে নদীতটের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকায় নৌকার মাঝিরা। যেন নদীর কিনারার মাটির বুকের ভিতর থেকেই ছুটে আসছে সেই কণ্ঠস্বর—নৌকা থামাও মাঝি, আমি শুনবো গান।

—কে ডাকে? প্রশ্ন করেন ধনাঢ্য বড়-ভৌমিক।

মাঝিরা উত্তর দেয়—একটি মেয়ে।

বড়-ভৌমিক—কার মেয়ে?

মাঝিরা বলে—বোধ হয় চাষীদের মেয়ে।

হ্যাঁ, চাষীর মেয়ের মতই দেখতে সে মেয়ে। নদীর তটে দাঁড়িয়ে নৌকার দিকে তাকিয়ে ডাকছে ডাগর চক্ষু এক ছোট্ট মেয়ে। হাতে পায়ে ধুলো, এলোমেলো কেশ। হাত তুলে ডাকছে সেই মেয়ে—নৌকা থামাও মাঝি, আমি শুনবো গান।

বিচলিত হয় মাঝিদের মন। মন্থর হয় তাদের হাতের দাঁড়। কিন্তু গর্জন করেন বড়-ভৌমিক—কি করিস মূর্খ।

না, আর ভুল করেনি মাঝিরা। ঢেউ ভেঙে তরতর করে এগিয়ে চললো বড়-ভৌমিকের উৎসবের নৌকা। নদীতটের সেই মাটি-মাখা চাষীমেয়ের মূর্তির দিকে একবার ঘৃণাভরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন বড়-ভৌমিক। তারপরেই যেন শখের করুণায় একটি মুদ্রা নিক্ষেপ করেন মেয়েটির দিকে।

ধনাঢ্যের উদ্ধত হাতের দান সেই মুদ্রা গায়ের উপর এসে পড়তেই কোপভরে বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো মেয়ে। নৌকার দিকে আর তাকালো না।

সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিলো আকাশে। মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়ে ফেলে অপরাহ্নের আলো। উঠলো তুফান। কৌশিকীর ক্ষুব্ধ তরঙ্গে যেন ফুঁসে উঠতে থাকে সহস্র কালনাগিনীর আক্রোশ। মুহুর্মুহু বজ্র নির্ঘোষের মধ্যে শোনা যায় বড়-ভৌমিকের উৎসব-তরণীর সঙ্গীত-মুখরতা যেন আতঙ্কিতের আর্তনাদে পরিণত হয়েছে। পরমুহূর্তে

সে হাহাকারও যেন ক্ষুব্ধ জলের গভীরে তলিয়ে গেল। বজ্রপাতে আর ঝঞ্ঝার আঘাতে দীর্ণ উৎসব-তরণীর কোন চিহ্ন রইল না নদীর বুকে।

শান্ত আকাশে শুক্লা একাদশীর চাঁদ উঠলো যখন, তখন দেবীর পর্ণকুটীরের অভ্যন্তরে জ্বলে উঠলো আরতির দীপ। পূজারী আর পল্লীবাসী জনতা বিস্মিত হয়ে দেখতে পায়, দক্ষিণমুখিনী দেবী উত্তরমুখিনী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নদীর দিক থেকে বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন দেবী।

লোকে বলে, সেই ধনাঢ্যেরই ঔদ্ধত্যে কুপিত হয়ে দেবী মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। লোকে বলে, দেবীই দরিদ্রা মানবীর রূপ ধ'রে সেই গর্বিত উৎসব-তরণীকে একবার সেই মাটির ঘাটে আসবার জন্য বলেছিলেন।

এই দেবীরই নাম উত্তরবাহিনী। উত্তরাস্যা সেই দেবীর পর্ণকুটীরের সুন্দর এক শিলাগঠিত মন্দিরে পরিণত করেছিলেন গৌড়খ্যাত পুরন্দর খাঁ।

সেই পুরাতন প্রথম মন্দির আর দেবীমূর্তিকে আজ অবশ্য দেখতে পাওয়া যাবে না। পুরাতন সেই মন্দিরভূমির উপরেই উঠেছে নতুন মন্দির, আর স্থাপিত হয়েছে উত্তরবাহিনী দেবীর নতুন বিগ্রহ। শিবহৃদিবিহারিণী, ত্রিনেত্রা, দ্বিভূজা ও লোহিতবরণী দেবী খড়্গ ও খর্পর ধারণ ক'রে আজও উত্তরাস্যা হয়ে রয়েছেন। আজও শারদীয়া শুক্লা একাদশীতে দেবী উত্তরবাহিনীর নবঘট পূজা উপলক্ষ্যে বহু মানুষের মেলায় মুখর হয়ে ওঠে শিয়াখালা গ্রাম।

আর দেখা যায়, সেই ধনাঢ্য গর্বান্ধের পরিণামের পরিচয়ও মাটিতে আঁকা রয়েছে। মন্দিরের সম্মুখেই প্রাচীন কৌশিকীর প্রবাহপথের চিহ্ন। তারই নাম 'ডিঙি ডোবার খাত।' ঐ সেই স্থান, যেখানে সাড়ে চারশত বছর আগে এক শারদীয়া শুক্লা একাদশীতে এক ঝঞ্ঝার আঘাতে নদীজলে নিমজ্জিত হয়েছিল গর্বিত ধনাঢ্যের উৎসব-তরণী।

কহ কৌশিকী

কহ কৌশিকী, ঐ অরাতিবাহিনীর বিকট রণোল্লাস আর অস্ত্রঘটার মধ্যেই ঝাঁপ দিয়ে এখন এই প্রাণ যদি শেষ ক'রে দিই, তবে কি কোন ভুল হবে?

যে কৌশিকী নদীর তরঙ্গভঙ্গিমার দিকে তাকিয়ে প্রিয়দর্শিনী এক রাজকুমারী এই কথা বলেছিলেন, সেই কৌশিকী আজও আছে, কিন্তু সেই তরঙ্গভঙ্গিমা আজ আর নেই আজকের কৌশিকীর দিকে তাকিয়ে কল্পনা করতেও সাহস হয় না যে, রূপকথার ঘটনার চেয়েও বিস্ময়বিধুর একটি ঘটনার রূপচ্ছায়া একদিন বিম্বিত হয়েছিল এই কৌশিকীরই জলে। নবম শতাব্দীর কৌশিকী, আর আজকের কৌশিকী, উভয়ে একই সলিলের ধারা হয়েও রূপের দিক দিয়ে একেবারে ভিন্ন হয়ে গিয়েছে। নবম শতাব্দীতে এই কৌশিকীর যে জলে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এক সুরম্য রাজধানীর জীবনের ছায়া কাঁপতো

আজ সেখানে কাঁপে জলজ গুল্মের অরণ্য। আজকের কৌশিকী যেন সেই প্রাচীন কৌশিকীর এক পঙ্কিল সমাধি।

নবম শতাব্দীর সূর্যালোকিত এক প্রভাতে এই কৌশিকীর তটভূমির এক নিভৃতে দাঁড়িয়ে মনে মনে দুরন্ত এক সংকল্প ঘোষণা ক'রে অরাতিসৈন্যকে আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন রাজা হরিপালের কন্যা কুমারী কানেড়া।

রাজার নাম হরিপাল। তাঁর রাজধানীর নামও হরিপাল। নবম শতাব্দীর মাত্র সেই স্মৃতিটুকুর সাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে হুগলী জেলার হরিপাল, হাওড়া থেকে মাত্র আঠাশ মাইল। এই তো সেই হরিপাল, কবিরামের 'দিগ্বিজয় প্রকাশ'-এর স্তুতিবচনে অভিনন্দিত সেই 'হরিপালো মহাগ্রাম হট্টবাপী সমন্বিত'। রেণু রেণু হয়ে ভূগর্ভের রহস্যালোকে বিলীন হয়ে গিয়েছে সেই রাজকীয় ঐশ্বর্যের হরিপাল, আর ভূস্তরের উপর শুধু নামটি জেগে আছে—হরিপাল।

পরাক্রান্ত এক গৌড়েশ্বরের বাহিনী কৌশিকী পার হয়ে রাজা হরিপালের রাজধানীকে আক্রমণ করার জন্য রণোল্লাসে দিক্ প্রকম্পিত ক'রে এগিয়ে এসেছে; সন্ত্রস্ত হরিপাল রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছেন। হরিপালের বাহিনী বিষণ্ণ। হতাশ বলাধ্যক্ষ আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু যার জন্য গৌড়েশ্বরের এই বলদৃপ্ত অভিযান দুর্বার বেগে ছুটে এসেছে, হট্টবাপীসমন্বিত মহাগ্রাম হরিপালের এই ভাগ্যসঙ্কটের হেতু হয়েছে যে, সে কিন্তু আজ কৌশিকীর তরঙ্গভঙ্গিমার দিকে তাকিয়ে আছে নিঃশঙ্কিনীর মত। যেন উৎকর্ণ হয়ে কৌশিকীর জলরোলের ভাষা বুঝবার চেষ্টা করছে। গৌড়েশ্বরের সশস্ত্র অহঙ্কারকে একটি প্রত্যাঘাতেও অপমানিত না ক'রে, আক্রান্ত এই মহাগ্রামকে বিনা প্রতিবাদে শত্রুর পদপীড়নের দুর্ভাগ্যে সঁপে দিয়ে, যদি রাজকুমারী কানেড়া মরণ বরণ করার জন্য এই কৌশিকীর বুকে এখনই ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, তবে সেই আত্মঘাতিনীকে সস্নেহে ঠাঁই দিতে পারবে কি এই কৌশিকীর জল? তার চেয়ে, অরাতিবাহিনীর ঐ অস্ত্রঘটার মধ্যেই ঝাঁপ দিয়ে, গৌড়েশ্বরের নির্বোধ ঔদ্ধত্যকে অস্ত্রাঘাতে তুচ্ছ করতে করতে এই প্রাণ শেষ ক'রে দেওয়াই কি শ্রেয় নয়?

এ কোন্ গৌড়েশ্বর? ধর্মমঙ্গল বলে, মহাগ্রাম হরিপালের প্রাণের উপর আক্রমণ করেছিল গৌড়েশ্বর ধর্মপালের বাহিনী। এই মহাসংগ্রামেরই এক রূপের কথা শুনতে পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন গৌড়েশ্বর। শুনেছিলেন ধর্মপাল, সুযৌবনা কানেড়া যখন তার রূপের শোভা নিয়ে কৌশিকীর তটে লতাগৃহের ধারে এসে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন পদ্মবনের ভৃঙ্গও উদ্ভ্রান্ত হয়; ভুল ক'রে ছুটে আসে কুমারী কানেড়ারই মুখের দিকে।

বৃদ্ধ হয়েছেন গৌড়েশ্বর ধর্মপাল। তবু কৌশিকীতটের এই রূপের কুসুম তুলে নিয়ে গৌড়ের রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুর সুশোভিত করতে চান তিনি। কুমারী কানেড়ার পাণি প্রার্থনা ক'রে রাজা হরিপালের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন ধর্মপাল। গৌড়েশ্বরের পরাক্রম স্মরণ ক'রে এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করতে প্রস্তুতও হয়েছিলেন রাজা হরিপাল। কিন্তু আপত্তি করেছিলেন কুমারী কানেড়া। আর, প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে গৌড়েশ্বরের দূতকে

বিদায়ও ক'রে দিয়েছিলেন। রাজা হরিপালের কন্যা, নিতান্তই এক মণ্ডলাধীশের কন্যা কোন্ দুঃসাহসে প্রত্যাখ্যান করে মহাপ্রতাপ গৌড়েশ্বরের প্রস্তাব? এ অপমান সহ্য করতে পারেন না ধর্মপাল। পাঠিয়েছেন সৈন্য, মহাগ্রাম হরিপালের জীবন শঙ্কিত ক'রে তাঁর আকাঙ্ক্ষিতা নারীকে বন্দিনী ক'রে নিয়ে যাবার জন্য। ধর্মপালের এক রণকুশল তরুণ সেনাপতি এসেছেন এই অভিযানের নায়ক হয়ে। কৌশিকীর অপর তটে তাঁর শিবির দেখা যায়।

কিন্তু এই কি 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ' ধর্মপাল, খালিমপুরের তাম্রশাসনে যে দিগ্বিজয়ীর উদার প্রশস্তি উৎকীর্ণ হ'য়ে রয়েছে? বিক্রমশিলা আর সোমপুর বিহারের প্রতিষ্ঠাতা ধর্মপাল? পিঞ্জরের পাখী যার গুণ গান ক'রে শোনাতো, মাঠের রাখাল যার মহিমা গান ক'রে গরু চরাতো, আর নৃত্যপর শিশু করতালি দিয়ে যাঁর যশোগাথা গাইতো, এই কি সেই ধর্মপাল? গুর্জরের কবি তাঁর চম্পুকাব্যে যে উত্তরাপথস্বামী ধর্মপালের বীরকীর্তির স্তুতি করেছেন, সেই ধর্মপাল তাঁর বৃদ্ধজীবনে প্রগল্‌ভ কামনাবিভ্রমের বশে এক সুযৌবনা কুমারীকে হরণ ক'রে নিয়ে যাবার জন্য নব লক্ষ সৈন্য নিয়োগ করেছিলেন, এমন কোন ঘটনার কথা জানে না লিখিত ইতিহাস। কোন শিলালিপি আর তাম্রলেখ্য এমন কথা বলে না। 'কিন্তু শ্রীধর্ম চরণ করিয়া স্মরণ' দ্বিজ শ্রীমাণিক গাঙ্গুলী আর ঘনরাম চক্রবর্তীর কল্পনা বলে, গৌড়েশ্বর এক ধর্মপাল রাজা হরিপালের কন্যা কুমারী কানেড়ার পাণি প্রার্থনা ক'রে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন, আর সেই প্রত্যাখ্যানে ক্ষুব্ধ হয়ে সেনাপতি লাউসেনকে পাঠিয়েছিলেন হরিপালকে পরাভূত করবার জন্য। সেনাবলের সাহায্যে প্রণয়কল্পনা চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন, সে গৌড়েশ্বর আর সে ধর্মপালের সঠিক পরিচয় হয়তো জানে একমাত্র এই কৌশিকী। কিন্তু কৌশিকীরও সেই স্মৃতিটুকু তার প্রবাহহীন জীবনের পঙ্কের মধ্যেই তলিয়ে রয়েছে। আজ আর জানবার ও বুঝবার কোন উপায় নেই, কে কেমন গৌড়েশ্বর আর কোন্ ধর্মপাল কিংবা সত্যিই কোন গৌড়েশ্বর আর কোন ধর্মপাল কি না?

যিনিই হ'ন, তিনি লিখিত ইতিহাস আর কাব্যের কাহিনীতে আর একটু রূপ মিশিয়ে দিয়ে অতি পুরাতন এক জনশ্রুতি দু'শত বছর আগেও এই অঞ্চলের কানে কানে এই কথাই বলেছে বহুকাল আগে, এই কৌশিকীর তটাশ্রিত রাজ্যের এক রূপবতী কুমারীর জীবনে যে নির্মম সংকট ডেকে এনেছিলেন এক প্রতাপী, সেই সংকট থেকে মুক্তির পথ চিন্তা করতে গিয়ে এক প্রভাতে সুসলিলা কৌশিকীর কাছেই তার মনের আবেদন জানিয়ে প্রশ্ন করেছিল সেই নারী। কহ কৌশিকী, অরাতিবাহিনীর এই অস্ত্রঝনৎকারের সঙ্গে যে এক মূঢ়ের লালসা হুংকার দিয়ে বাতাস কলুষিত ক'রে তুলছে, সেই মূঢ়ের কাছেই কি আজ পরাভব স্বীকার ক'রে নেবে কুমারী কানেড়া?

কখনই না। কুমারী হৃদয়ের ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকে সম্মান দান করবার হৃদয় নেই যার, এমনই এক মূঢ় পৌরুষের শ্বাপদ আজ কুমারী কানেড়ার এক সুন্দর দেহ লুণ্ঠন করার জন্য হিংস্র আবেগে ছুটে এসেছে। কিন্তু সেই প্রতাপীর এই সাধের কল্পনাকে চূর্ণ করবে

আজ কুমারী কানেড়া। রণসাজে সজ্জিত হয়ে ঐ অরাতিবাহিনীরই বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে মূর্তিমতী এক প্রতিশোধ-স্পৃহা। পরাক্রান্ত শত্রুর আয়ুধের আঘাতে খণ্ড খণ্ড হয়ে যাক কুমারী কানেড়ার দেহ। লালসার সম্রাটকে উপহার দেবার জন্য অরাতি-সৈনিক রণক্ষেত্র থেকে কুড়িয়ে নিয়ে যাবে শোণিতলিপ্ত কতগুলি খণ্ড খণ্ড মাংস ও অস্থি। দেখে শিহরিত হবে নারীলোলুপ সম্রাটের চক্ষু। কহ কৌশিকী, এ ছাড়া হঠকারী সম্রাটকে সমুচিত শিক্ষা দেবার, আর তাঁর হঠকারিতার প্রতিশোধ নেবার অন্য কোন উপায় আছে কিনা?

না, আর কোন উপায় নেই। প্রস্তুত হলেন রাজকুমারী কানেড়া। হরিপালরাজের শঙ্কিত ও বিষণ্ণ সেনাশিবিরে আবার নতুন ক'রে বেজে উঠলো দুন্দুভির নাদ। রাজকুমারী কানেড়ার আহ্বানে নতুন ক'রে সঞ্জীবিত ও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো সৈনিকের ম্রিয়মান মন। রণাশ্বের পৃষ্ঠাসীন হয়ে মুক্ত তরবারি আন্দোলিত ক'রে রাজকুমারী কানেড়া তাঁর সেই ক্ষুদ্র সৈন্যবল নিয়েই বিপুল গৌড়সৈন্যের উপর উল্কাযুথের মত ঝাঁপ দিলেন।

মৃত্যু মানে, কিন্তু হার মানে না হরিপালের সৈন্য। দাবাগ্নি শিখার মত এক রণরঙ্গিনীকে দেখতে পেয়ে বিস্ময় মানে অরাতিসৈনিক। কিন্তু সব চেয়ে বেশি বিস্মিত হয়েছিলেন যিনি, গৌড়বাহিনীর সেই সৈনিকোত্তম লাউসেন দ্রুতবেগে অশ্বচালনা ক'রে আর খরশাণিত খড়্গ উত্তোলিত ক'রে এই প্রমত্তা দাবাগ্নি শিখার গতিরোধ করবার জন্য ছুটে এলেন।

আরও বিস্মিত হলেন সেনাপতি লাউসেন। দেখলেন, সত্যই দাবাগ্নি শিখার মত নয়, যেন কোমল ফুলদল দিয়ে গঠিত এক সুতনুকা কুমারী ভুল ক'রে রণনায়িকার বেশ ধারণ করেছে। ও হাতে কঠিন তরবারির আস্ফালন নিতান্তই বিসদৃশ। সেনাপতি লাউসেনের তরবারির একটি আঘাতে কুমারী কানেড়ার দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ তরবারি স্খলিত হয়ে রণক্ষেত্রের মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। কুমারী কানেড়া তাকিয়ে রইলেন তরুণ সেনাপতি লাউসেনের সুদৃপ্ত ও সুন্দর মুখের দিকে।

কোন রূপমান পুরুষের মুখের দিকে এমন ক'রে কোনদিন তাকাননি কুমারী কানেড়া। ক্ষুব্ধ রণক্ষেত্রের সকল হুঙ্কার আর আর্তনাদ যেন ক্ষণিকের মত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। দূরে কৌশিকীতটের আম্রবনে লুটিয়ে পড়েছে অপরাহ্নের আলোক। মৃদু বাতাসের স্পর্শে কুমারী কানেড়ার চূর্ণ অলক শুধু চঞ্চল হয়ে কাঁপে। কিন্তু দুই চোখের দৃষ্টি একেবারে শান্ত। তরুণ সেনাপতি লাউসেনের গলায় যে রক্তপলাশের মালা দুলছে, তারই দিকে চোখ পড়তেই মাথা হেঁট করলেন কুমারী কানেড়া।

কহ কৌশিকী, কুমারী কানেড়ার এই মুগ্ধচক্ষুর ভাষা কি কিছুই বুঝতে পারছেন না তরুণ সেনাপতি, রক্ত পলাশের মালা এত সুন্দর হয়ে উঠেছে যার কণ্ঠের স্পর্শ পেয়ে? সেদিন সেই রণক্ষেত্রের অপরাহ্নে শত্রু-সেনাপতি লাউসেনের সম্মুখে অশ্বারূঢ়া রণনায়িকা কানেড়ার মনে এই প্রশ্নই নীরবে ধ্বনিত হয়েছিল। ভয়াল রণভূমিতে প্রাণ দান করতে এসে এক রক্তপলাশের মালার কাছে হৃদয় দান ক'রে ফেলেছেন কানেড়া। কহ কৌশিকী,

ভুল করেনি কুমারী কানেড়া, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছে কুমারী কানেড়া। তরুণ গৌড়-সেনাপতিকে হৃদয় দান ক'রে বৃদ্ধ গৌড়েশ্বরের হঠকারিতার প্রতিশোধ নিতে পেরেছে কুমারী কানেড়া।

হয় রক্তপলাশের মালা, নয় মৃত্যুদণ্ড। সেনাপতি লাউসেনের কাছ থেকে যেন এই দুই উপহারের যে-কোন একটি বরণ করার জন্য মাথা হেঁট করে রয়েছেন কানেড়া। দুই-ই সমান সুখের উপহার। আর কোন খেদ নেই মনে। এই মুহূর্তে, শোণিতসিক্ত এই রণ-ভূমিতেই লুটিয়ে পড়ুক কুমারী কানেড়ার জীবন তারই খড়্গের আঘাতে, যার গলায় মনে মনে বরমাল্য দান ক'রে ফেলেছেন কুমারী কানেড়া।

কিন্তু বৃথা এই মোহমধুর কল্পনা। সেনাপতি লাউসেনের একটি রূঢ় গম্ভীর সম্ভাষণে চমকে উঠলেন কুমারী কানেড়া। —বন্দিনী তুমি! গৌড়েশ্বরের বিশ্বস্ত সেনাপতির কণ্ঠস্বর, নিতান্তই আজ্ঞাবহ এক অনুচরের কণ্ঠস্বর। ঐ রক্তপলাশের হৃদয় নেই। কুমারী কানেড়ার মুগ্ধ চক্ষুর ভাষা বুঝবার ক্ষমতা নেই এই সেনাপতির, বহু রণজয়ের গর্বে পাথর হয়ে গিয়েছে যার হৃদয়।

সেনাপতি লাউসেনের নির্দেশে শিবিরের সন্নিকটে বন্দীপুরে প্রেরিত হলেন কুমারী কানেড়া। স্তব্ধ হলো রণস্থল। তারা ফুটে উঠলো শান্ত সন্ধ্যার আকাশে। আর, বন্দীপুরের এক কক্ষের নিভৃতে দাঁড়িয়ে কৌশিকীর দিকে তাকাতে গিয়ে অশ্রু ফুটে ওঠে কুমারী কানেড়ার চোখে। অন্ধকারে মুখ লুকিয়েছে কৌশিকীর জল। এই নতুন অপমানের বেদনা সহ্য করতে না পেরে শিউরে ওঠে কানেড়ার ভ্রূরেখা। কহ কৌশিকী, সত্যিই কি ঐ রক্তপলাশের হৃদয় নেই?

নেই নিশ্চয়। কল্পনা করতে পারেন কুমারী কানেড়া, হরিপালরাজের শূন্য প্রাসাদের অভ্যন্তরে রাজাসনে বসে সেনাপতি লাউসেন এখন তাঁর রণজয়ের বার্তা লিখে দূতের হাতে পত্র দান করছেন। বন্দিনী রয়েছে গরবিনী কানেড়া, বৃদ্ধ গৌড়েশ্বরকে হরষিত করার জন্য এই শুভ বার্তা নিয়ে দূতের দল ছুটে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে এতক্ষণে। নতুন শিবিকাও বোধহয় তৈরি হয়ে গিয়েছে এতক্ষণে, যে শিবিকা কানেড়াকে নিয়ে সগর্বে যাত্রা শুরু করবে, গৌড়েশ্বরের অন্তঃপুরের জন্য এক নতুন উপঢৌকন নিয়ে। বাধা দেবার, প্রতিবাদ করবার আর কেউ নেই। কী গভীর দুর্ভাগ্যের রাত্রি ঘনিয়ে উঠেছে এই মহাগ্রামের আকাশে! শোকার্তের মত অপেক্ষা করেন কুমারী কানেড়া, কহ কৌশিকী, তোমার বুকে ঝাঁপ দেবার কি আর কোন সুযোগ পাবো না? এমন ক'রে একেবারে মিথ্যে হয়ে যাবে কি কুমারী কানেড়ার জীবনের সব সম্মান?

সেদিন বন্দীপুরের কক্ষের বাতায়নে দাঁড়িয়ে বিনিদ্রা বন্দিনী দেখতে পেয়েছিলেন, আকাশের তারা একে একে নিভে যায়, আর পূর্বাকাশে আলো জাগে ধীরে ধীরে। বুঝতে পারেন কানেড়া, নিতান্তই মিথ্যা এই অরুণোদয়, হৃদয়হীন এক বিদ্রূপের ছটা ফুটে উঠেছে আকাশে। মিথ্যা অনুমান করেননি কানেড়া। প্রভাত হতেই সেনাপতির অনুচর এসে জানায়—আসুন রাজকুমারী, গৌড়ভূজদর্প বলীন্দ্র সেনাপতি লাউসেনের নির্দেশ।

মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত চুপ ক'রে চিন্তা করলেন কুমারী কানেড়া। মনে মনে এক নতুন সংকল্প যেন রচনা ক'রে নিলেন। সেনাপতি লাউসেনের কাছে একটি অনুরোধ করবেন কানেড়া—বিদ্রোহিনীকে কৌশিকীর জলে আত্মবিসর্জনের সুযোগ দান করুন সেনাপতি। কহ কৌশিকী, ভুজদর্পের প্রতিমূর্তি ঐ বলীন্দ্রের বক্ষ কি ভুল ক'রেও এক মুহূর্তের জন্য বিচলিত হ'য়ে কুমারী কানেড়ার এই অনুরোধের সম্মান রক্ষা করবে না?

বন্দীপুরের কক্ষ থেকে বের হয়ে সেনাপতির অনুচরকে অনুসরণ ক'রে চললেন বন্দিনী কানেড়া। কিন্তু কি আশ্চর্য, গৌড় সেনাপতির শিবিরের দিকে নয়, হরিপালরাজের পরিত্যক্ত প্রাসাদের দিকেও নয়, সেনাপতির অনুচর এসে থামলো হরিপালরাজেরই প্রতিষ্ঠিত চিত্রশালার ভবনদ্বারে যেখানে স্থাপিত হয়েছে অভ্যর্থনার মঙ্গলকলস। কে যেন পুষ্প ও পল্লব দিয়ে চিত্রশালাকে উৎসবের সাজ পরিয়ে দিয়েছে।

চিত্রশালার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন কুমারী কানেড়া। কিন্তু এই রহস্যের অর্থ বুঝতে পারেন না। তবে কি এই চিত্রশালার মধ্যেই বন্দিনীকে ঠাঁই দেবার জন্য নতুন নির্দেশ দিয়েছেন সেনাপতি? তবে উৎসবের সাজ পরেছে কেন এই চিত্রশালা? এ কোন্ বিদ্রূপ?

বিদ্রূপ নয়। বন্দিনী কানেড়া চমকিত নেত্রে তাকিয়ে থাকেন শ্রেণীবদ্ধ সুচিত্রাবলীর মধ্যে একটি চিত্রের দিকে, তাঁরই নিজের প্রতিকৃতির দিকে। একটি রক্তপলাশের মালা দুলছে সেই প্রতিকৃতির কণ্ঠে।

ধীরে ধীরে মাথা হেঁট ক'রে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন কুমারী কানেড়া, যেন এতক্ষণে প্রেমিকের দুই বাহুর আলিঙ্গনের স্পর্শ লাভ ক'রে ধন্য হয়ে গিয়েছে কুমারী কানেড়ার কণ্ঠ। বুঝতে পারেননি কানেড়া, সেনাপতি লাউসেন কখন এসে বন্দিনীর হাতের বন্ধন নিজের হাতে খুলে দিয়ে তাঁরই সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন।

তারপর, আর একদিন, আর এক শুভলগ্নে এই চিত্রশালাতেই এক মিলন-উৎসব সাঙ্গ হবার পর শঙ্খধ্বনির সঙ্গে বধূবেশে বের হয়েছিলেন কুমারী কানেড়া। কহ কৌশিকী, সেনাপতি লাউসেনের সহধর্মিণী কানেড়া সেই মধুর অপরাহ্নে শিবিকায় আরোহণ করার সময় তোমার তরঙ্গভঙ্গিমার দিকে তাকিয়ে কি-কথা ব'লে তাঁর কৃতার্থ জীবনের আনন্দ নিবেদন করেছিলেন?

আজ আর এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না কৌশিকী। নবম শতাব্দীর স্মৃতি আর ভাষা আজ নিঃস্রোতা কৌশিকীর পঙ্কভারে একেবারে মূক হয়ে তলিয়ে পড়ে আছে। শুধু নামগুলি জেগে আছে কৌশিকীর দুই তীরে। হুগলী জেলার ঐ 'চিত্রশালি' গ্রামই তো সেই চিত্রশালার কথা, আর ঐ 'বন্দীপুর' গ্রাম সেই বন্দিনী রাজকুমারীর জীবনের একটি দুঃসহ রাত্রির আক্ষেপ ও বেদনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কৌশিকীই বলতে পারে, আজও হরিপালের যে প্রান্তরে ফাল্গুনের প্রথম বাতাসে আম্রতরুর শাখাপল্লবের আড়ালে গোপন হয়ে কোকিল ডেকে ওঠে, সেই প্রান্তরেই কি রণক্ষুব্ধ একটি অপরাহ্ন এক নারীর প্রণয়রাগে রঞ্জিত হয়ে বিচিত্র গোধূলিমায়া সৃষ্টি করেছিল?

ক্যাকটাস

জগমোতির পাহাড়ি ময়না

কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে বাঁধি নীড়, থাকে সুখে। মাইকেল মধুসূদনের কাব্য পড়াতে গিয়ে প্রফেসর চারুবাবু এই পংক্তিটাকে অদ্ভুতরকমের বিহ্বল স্বরে বার বার আবৃত্তি করেছিলেন। ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে রূঢ় স্বভাবের মানুষ বলে যার দুর্নাম ছিল, সেই বিষ্ণুচরণ তখন গলা খাঁকারি দিয়ে চারুবাবুর গলার স্বরের সেই বিহ্বলতার খুব চটুল রকমের একটা অর্থের সঙ্কেত বাজিয়েছিল। ক্লাসের ছাত্রদের অনেকে সেদিন বিষ্ণুচরণের গলা খাঁকারির অর্থ বুঝতে পেরে হেসেছিল, অনেকে না বুঝেই হেসেছিল। আজ মনে পড়তেই বেশ লজ্জা পায় রামতনু; সেও হেসেছিল। আরও মনে পড়ে কবিতার কথার মর্ম ব্যাখ্যা করে বোঝাতে গিয়ে চারুবাবু সেদিন অদ্ভুত একটা কথা বলেছিলেন, পাখিরা আর্ট ভালবাসে। কপোত ও কপোতী যে উচ্চ বৃক্ষচূড়াতে নীড় বেঁধে থাকে, সেটা ওদের জীবনের একটা প্রিয় ও পছন্দসই আর্ট। আমি একবার একগাছা কচি ভূট্টার দানা শান-বাঁধানো আঙিনার ওপর ছড়িয়ে রেখেছিলাম। আশা ছিল, ভূট্টার দানা দেখতে পেয়ে পাহাড়ী ময়নার ঝাঁক থেকে অন্তত দু-চারটে ময়না নামবেই নামবে। কিন্তু না, কেউ নামেনি। যেদিন সবুজ ঘাসের ওপর হলদে হলদে ভূট্টাদানা ছড়িয়ে দিলাম, সেদিন পাহাড়ী ময়নার একটা ঝাঁকের প্রায় সবাই নেমে এসে আর হুটোপুটি করে ভূট্টার দানা খেয়েছিল। তোমরা বুঝতেই পারছো, যে সবুজ ঘাসের ওপর ছড়ানো হলদে ভূট্টাদানা কী চমৎকার একটা রূপের দৃশ্য। তোমার-আমার কাছে হয়তো খুব বেশী চমৎকার রূপের দৃশ্য নয়। কিন্তু পাখিদের কাছে খুব চমৎকার।

দু-বছর পর আবার ভেলাডিহির ঠাকুর-সাহেব চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, খুব সাবধানে রামতনু, এ বছর আমার ভেলাডিহির জঙ্গলের যেন এক ছটাক মহুয়াও কেউ চুরি করতে না পারে। তোমার আগে ভেলাডিহিতে আমার কাছারির কাজ দেখতো যে তসীলদার, যার নাম রামসিংহাসন, সে পরপর দু'বছর আমাকে আধসের মহুয়ার বিক্রিও দেখায়নি। সব মহুয়া নাকি পাহাড়ী ময়নারা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে খেয়ে গিয়েছিল। আমি জিজ্ঞেস করি, পাহাড়ী ময়না কি মহুয়া খায়? খেলেও কি পাঁচ-দশটা ঝাঁক এসে সাড়ে সাতশো গাছের মহুয়া খেয়ে ফেলতে পারে?

কুচকুচে কালো পালকে ছাওয়া নরম-সরম ছোট্ট দেহটি, গেটের দু-পাশে ধবধবে সাদার একরত্তি ছোপ, ঠোঁট আর দুই পায়ে সোনালী হলদের প্রলেপ। পাহাড়ী ময়নার জীবনতত্ত্বের শুধু একটি কথা জানা আছে রামতনুর, চোখে দেখা একটি তথ্য। পাহাড়ী ময়না ডুমুর খেতে ভালবাসে।

দু'বছর পরে ভেলাডিহি ফিরে আসবার পথে রামতনুর চোখে পড়েছে, সেই ডুমুর

গাছটা আজও আছে, যার গা-ভরা লালচে রঙের পাকা ফল উজাড় করে খেয়ে চলে যেতো পাহাড়ী ময়নার ঝাঁক। রেল-লাইনের লেবেল ক্রসিংয়ের কাছে সেই ডুমুর গাছ। লাতেহার যাবার সড়কটা যেন জঙ্গলের নিরালার ভিতরে চলতে চলতে এখানে এসে হঠাৎ কাটা পড়েছে। কাছেই আছে কৈরি মাহাতোদের গাঁ ধাউলিয়া, যেখানে কলকাতা থেকে পাখি কেনবার পাইকার মহাজনের দল প্রতি বছর এসে অন্তত তিন-চারটে মাস থাকে। তাই জঙ্গলের নিরালার মধ্যে হলেও এই লেবেল-ক্রসিং খুব বেশী শূন্যতার চেহারা নয়। বাউহিয়ার লোকজনের যাওয়া আসার সাড়া আছে, সড়কের দুদিকের গো গাড়ির চাকার শব্দের সাড়া আছে। তসীলদার রামতনুর টাট্টু ঘোড়াও ভিন ডিহি থেকে ফিরে আসবার সময় এখানে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে, ডুমুরতলায় কুঁয়োর গায়ের লাগোয়া জলের হাওদাটার দিকে তাকিয়ে ঘড়ঘড় করে উল্লাসে হ্রেষা ছেড়েছে।

দু'বছর আগে এখানেই দাঁড়িয়ে অদ্ভুত উল্লাসের আর-একটা দৃশ্য দেখেছিল রামতনু। একটি রূপসী মেয়ের গোলাপী রংয়ের শাড়ির আঁচলটা গা থেকে খসে পড়ে মাটিতে লোটাচ্ছে। মেয়েটির চোখে মুখে ঝিকমিক করছে একটা দুরন্ত ইচ্ছের হাসি। ইচ্ছে এই যে, ডুমুরগাছের ডাল থেকে বার বার উড়ে এসে ঘরের চালার লাল রঙের নতুন টালির ওপর বসছে যে পাহাড়ী ময়নাটা, তাকে ধরতে হবে। মেয়েটি ছটফট করে ঘরের চারদিকে একবার একটা দৌড় দিয়েই থেমে গেল। ময়নাটার দিকে তাকিয়ে হাততালি দিল—আয় আয় আয়। আশ্চর্যের ব্যাপার বলতে হবে, আর প্রফেসর চারুবাবুর সেই কথাটা যেন ঝংকার দিয়ে মনের ভিতরে বেজে ওঠে। পাখিরা আর্ট ভালবাসে। প্রিয় পছন্দসই কোন রং দেখতে পেলে, কিংবা পছন্দসই মধুরতার সাড়া পেলে পাহাড়ী ময়নাও ঝাঁপ দিয়ে যেন একটা মায়ার কোলের ওপর লুটিয়ে পড়ে। শোনা কথা নয়, রামতনু নিজের চোখে দেখেছিল সেই চমৎকার দৃশ্য। পাহাড়ী ময়নাটা যেন সাধ করে নিজেরই প্রাণের একটা ব্যাকুলতার তাগিদে টালির চালা ছেড়ে দিয়ে একেবারে মেয়েটির আগবাড়ানো দুই হাতের চেটোর ওপর এসে বসে পড়লো। পাখিটাকে দুই হাতের একটা আদুরে চাপ দিয়ে বুকের সঙ্গে যেন সাঁটিয়ে দেয় মেয়েটি। কপালের মাঝখানে সোনালী গুঁড়োর মস্ত বড় একটা টিপ, সিঁথিতে ছড়ানো সিঁদূর আর ছেঁড়া শাড়ির লাল পাড়ের ফালি দিয়ে বাঁধা মস্ত বড় একটা বিনুনি খোঁপা করে জড়ানো, মেয়েটিকে রাত্রিকালের জ্যোৎস্নার মধ্যে দেখতে পেলে কেউ না কেউ, অন্তত ভাণ্ডারীজি বিশ্বাস করে ফেলবেন যে মায়াশরীর আর মায়াহাসি নিয়ে কোন পরী দাঁড়িয়ে আছে।

—কোথায় গিয়েছিলেন, তসীলদারবাবু?

হঠাৎ এরকম একটা জিজ্ঞাসার কণ্ঠস্বর কানে বেজে উঠতেই সেদিন দেখতে পেয়েছিল রামতনু, নবলবাবু তাঁর ঘোড়ার রাশ টেনে ধরেছেন, থমকে দাঁড়িয়েছে ঘোড়া। নবলবাবু, বাবু নবলকিশোর সিং, বয়স ত্রিশ-বত্রিশের বেশী নয়। সত্যি ইনি যেমন জাতে রাজপুত, তেমনই চেহারাতেও ও মেজাজেও রাজপুত। সুঠাম সুদর্শন নবলবাবুর কথায় সাড়া দিয়ে রামতনু যে-সব কথা বলেছিল, সেগুলি নবলবাবুর কান স্পর্শ করেছিল বলে মনে হয়

না। ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে সাত বছর ধরে তিনটে ফৌজদারী মামলা লড়েছেন যিনি, সেই জমিদার ভরত সিং-এর একমাত্র ছেলে নবলবাবুর দুই চোখ তখন লেবেল ক্রসিং-এর কাছে চৌকিদারের সেই ছোট্ট গুমটি ঘরের দিকে অপলক হয়ে তাকিয়েছিল, যে-ঘরের চালাতে তখন নতুন টালির লালচে রং হাসছে, ছোট একটি উচ্ছে-লতার ফুলের ওপর হলদে ফড়িং ফর্‌ফর্‌ করছে, ঘরের ভিতরে রূপসী মেয়েটির লালচে ঠোঁটও ফুল্ল হয়ে হাসছে। আর পাহাড়ী ময়নাটা সেই মেয়ের খোঁপার ওপর যেন আরামে গদগদ হয়ে বসে আছে।

নবলবাবু ডাকলেন—ভাইয়া কাশীলাল। এ ভাই কাশী, একবার বাইরে এস।

গুমটিঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এল রেলের লেবেল ক্রসিং-এর চৌকিদার কাশীলাল।

বেশ একটু আশ্চর্যের দৃশ্য বলতে হবে, নবলবাবু দুই হাত বাড়িয়ে চৌকিদার কাশীলালকে জড়িয়ে ধরলেন। সত্যিই বুকে বুক লাগানো বন্ধুত্বের দৃশ্য। নবলবাবু ভুলেই গিয়েছেন যে, তিনি সেই কিসুনগড়ের ডাকসাইটে জমিদার ভরত সিং-এর একমাত্র ছেলে, যে কিসুনগড়ের সাবাই ঘাসের আয় প্রতি বছরে দশ হাজার টাকারও বেশী।

ভেলাডিহির বাইরে সাহেবের খয়েরের কাজ দেখবার জন্য দূরের জঙ্গলে চলে যাবার আগে তসীলের কাজে ছুটোছুটি করতে গিয়ে এই লেবেল ক্রসিংয়ের কাছে এসে ক্লান্ত টাট্টুকে থামিয়ে দিয়ে যে-কদিন রামতনুকে এক-আধ ঘন্টা জিরিয়ে নিতে হয়েছিল, সেই ক'দিনই চোখে পড়েছিল, লেবেল-ক্রসিংয়ের গুমটিঘরের দরজার কাছে এই রকম অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের দৃশ্য। ভাণ্ডারীজী আরও অনেক রকমের কথা বলেছিলেন, যা থেকে এই দুই বিষম মানুষের সুষম বন্ধুত্বের একটা কারণ কিছুটা বুঝতে পেরেছিল রামতনু। নবলবাবু যেমন জাত-রাজপুত, চৌকিদার কাশীলালও তেমনই জাত-রাজপুত। ভাণ্ডারীজী বলেছিলেন, ওরা যেমন জাতিভাই, তেমনই দেশ-তুতো ভাইও বটে। সাসারামের কাছে সুধারপুর নামের রাজপুত গ্রামটি এই দুজনেরই পিতৃপুরুষের দেশ। কথা বলতে গিয়ে ভাণ্ডারীজীর গলার স্বরে নিবিড় শ্রদ্ধার আবেগ উথলে উঠেছিল ঃ নবলবাবুর মতো উদার মনের মানুষ এই কলিযুগেও যে জন্ম নিতে পারে, সেটা নবলবাবুকে দেখবার ও চেনবার আগে আমিও বিশ্বাস করতাম না। চৌকিদার কাশীলালের ভাগ্য ভাল, নবলবাবুর মতো মহৎ মানুষের সব রকম সাহায্য উপকার ও বন্ধুত্ব পেয়েছে। নইলে একুশ টাকা মাইনের চৌকিদারকে এই জংলী রেল লাইনের লেবেল ক্রসিংয়ের ছোট্ট একটা গুমটিঘরের ভিতরে শুধু মকাই পুড়িয়ে খেতে হতো, আর ভাল ঘরের ওরকম সুন্দর একটি মেয়েকে খাইয়ে পরিয়ে খুশি করতে আর জংলী রাজ্যেরই ভিতরে ওরকম একটা ছোট্ট কুঠুরীর মধ্যে পুষে রাখতে হতো না। কাশীলালের শ্বশুর বার বার তিনবার এসেছিল, কাশীলালের নিদারুণ গরীবী ভাগ্যের ঘর থেকে তাঁর আদরের মেয়েকে নিয়ে যাবার জন্য তিনি অনেক পীড়াপীড়ি করেছিলেন। কাশীলাল তাঁর ক্রুদ্ধ শ্বশুরের ইচ্ছার কথায় কোন আপত্তির টু-শব্দও করেনি। কিন্তু আপত্তি করেছিল তাঁর মেয়ে চৌকিদার কাশীলালের

বউ জগমতি। রাগ করে বেশ কড়া-কড়া কথা বাপকে শুনিয়ে দিয়েছিল জগমোতি ঃ আজ তোমার জামাইকে একটা বাজে লোক বলে নিন্দে করছো কেন? আগে সাবধান হওনি কেন? মেয়েকে বিয়ে দেবার আগে কেন খোঁজ নিয়ে দেখনি যে পাত্র হলো রেললাইনের গুমটিঘরের একজন চৌকিদার?

বুঝতে অসুবিধা নেই, বুঝতে দেরিও হয়নি রামতনুর, জমিদার-কুমার নবলবাবুর কাছে রেল-লাইনের লেবেল-ক্রসিংয়ের এই ছোট্ট গুমটিঘরটা যেন সুন্দর একটা মনোরম ও প্রাণারাম ঠাঁই। খুব সম্ভব রোজই একবার না একবার এখানে আসেন নবলবাবু। লাতেহার যাবার সড়কের ধুলো উড়িয়ে জংলী নীরবতার মধ্যে চমৎকার শব্দ তুলে নবলবাবুর ব্যস্ত-ব্যাকুল আবির্ভাব যেন তাঁর তেজী ঘোড়ার দুলকি চালের সঙ্গে নেচে-নেচে প্রায়ই এখানে এসে একটা স্বস্তির ও পরিতৃপ্তির ডাক ছাড়ে—এ ভাই কাশী, একবার বাইরে এস।

দু'বছর পরে ভেলাডিহিতে ফিরে আসবার পথে যখন এই পুরনো বিরামের জায়গাটিতে এসে ঘোড়া থামায় তসীলদার রামতনু, তখন চকিতে একবার গুমটি ঘরের দিকে তাকিয়ে নিয়েই মুখ ফিরিয়ে নেয়। সেই গুমটিঘর বটে, কিন্তু সেই মানুষটা আর নেই, সেই চৌকিদার কাশীলাল। সেই সব দৃশ্য চিরকালের মতো ফুরিয়ে গিয়েছে। নবলবাবু আর কখনও তাঁর তেজী ঘোড়ার রাশ টেনে নিয়ে এখানে থামবেন না। গোলাপী শাড়ির আঁচল লুটিয়ে দিয়ে ঘরের চারদিকে হুটোপুটি ও ছুটোছুটি করে, আর হাততালি বাজিয়ে ময়না ধরেছিল যে সুন্দরী মেয়েটি, তাকেও আর এখানে কোনদিন দেখতে পাওয়া যাবে না। সেদিন এই গুমটিঘরের চালাতে যে নতুন টালির লাল রং জ্বলজ্বল করেছিল, আজ আর নতুন টালির সেই নিবিড় লালচে আবেদন নেই। শেওলার ছোপ-লাগা ময়লা চেহারার টালি। জগমোতির খোঁপার ওপর বসে থাকতো যে পাহাড়ী ময়নাটা, সেটাও নেই।

রামতনু মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকলেও নতুন চৌকিদার রামটহল একটা সেলাম ঠুকে রামতনুর চোখের কাছে এসে দাঁড়ায়। দেখে বুঝতে পারে, কী যেন বলতে চায় লোকটা। রামতনু কোন কথা না বললেও চৌকিদার রামটহল নিজেই যেন ভয়াতুর একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে চেপে কথা বলতে থাকে। —আমাকে বদলি করিয়ে দিন বাবু, এখানে থাকলে আমি একদিন ভয়ের মারে মরেই যাব হুজুর।

—কিসের ভয়?

—রাত হলে আর ঘরের ভিতরে থাকতে পারি না, ঘুমোতে পারি না। উঁ উঁ উঁ.... কে যেন কেঁদে কেঁদে ঘরের মেঝের ওপর বেড়ায় আর হেঁচকি তোলে। আমি দৌড়ে ঘরের দরজা খুলে আর বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। শীতের চোটে ঠক-ঠক করে কাঁপি, তবু ঘরের ভিতরে ঢুকতে সাহস পাই না।

নতুন চৌকিদারের ছিঁচকাঁদুনে ফুসফুসটা যেন ঢিপ ঢিপ করছে, নিঃশ্বাসের বাতাস হাঁসফাঁস করছে। কী আশ্চর্য, লোকটা সত্যিই যে ভয় পেয়ে এরই মধ্যে আধমরা হয়ে

গিয়েছে। কিন্তু চৌকিদার কাশীলাল চলে গেল কেন? বদলির অর্ডার হয়েছিল? না, ইচ্ছে করে কাজটাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে গেল?

চৌকিদার কাশীলাল সব সময় হাসতো। ওর চেহারা দেখে কখনও কারও মনে হতো না যে, ওর জীবনে কোন দুঃখ আছে। সারা দিনের মধ্যে মাত্র দুবার ট্রেন চলবার সাড়া জাগে। লেবেল-ক্রসিংয়ের দু'দিকের দুই গেট দিনে দুবার কাঁপে। ব্যস, তারপর এই গুমটিঘর যেন নীরবে নিরেট এক জংলী জেলখানার একটা কুঠুরী। চৌকিদার কাশীলালের বউ জগমোতিকে শুধু ওই একটি দিনই পাখি ধরবার জন্য ঘরের বাইরে হুটোপুটি করতে দেখেছিল রামতনু। চৌকিদারের বউ হলেও জগমোতি যেন পর্দার আড়ালে থাকতে ভালবাসে। সত্যিই আগে একটা চটের পর্দা দরজার ওপর ঝুলতো। তারপর রঙীন ছিট কাপড়ের একটি পর্দা। যা-ই হোক, ওদের দুজনের কেউই যখন এখানে নেই, তখন রঙীন ছিট কাপড়ের পর্দা কিংবা চটের পর্দাই বা থাকবে কেন? আজ ওই গুমটি ঘরের খোলা দরজা দিয়ে ভিতরের চেহারা বেশ স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যায়। একটা ভাঙ্গা উনুনের ওপর চৌকিদার রামটহলের ভাতের হাঁড়িটাকে দেখতে পাওয়া যায়।

কোথায় গেল কাশীলাল? বেশ তো ছিল কাশীলাল। পোষা ময়নাটাকে কাঁধের ওপর বসিয়ে রেখে নবলবাবুর সঙ্গে কথা বলছে কাশীলাল, এই দৃশ্যটা একদিন রামতনুকে হাসিয়ে দিয়েছিল। ময়নাটা বলছেঃ বন্দেগী বাবু নবলকিশোর, বহুত দয়া তোর। বুঝতে অসুবিধে নেই, এটা একটা শেখানো বুলি। হয় কাশীলাল, নয় কাশীলালের বউ জগমোতি ময়নাটাকে এই বুলি শিখিয়েছে। যা-ই হোক, শেখানো বুলিটা যে কাশীলাল আর জগমোতির কৃতজ্ঞতার প্রকাশ, তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। ময়নাটার গলার স্বর খুবই মিষ্টি। কোন সন্দেহ নেই, এতটা মিষ্টি না হলে ওই বুলিটা নিছক একটা তোষামোদের চিৎকারের মতো শোনাতো।

ছোট্ট কালো পাহাড়ী ময়না, কিন্তু ক'মাসের মধ্যে কত রকমের বুলি বলতে ও গাইতে শিখে ফেললো। কাশীলালের ঘরের পোষমানা এই ময়না বুলবুলের মতো শিস দেয়, চিলের ডাকের কাঁপা-কাঁপা স্বরের নকল করে, কোকিলকে ভেংচায়, বুড়ো মানুষকে ডুমুরতলার ছায়ায় শুয়ে পড়ে থাকতে দেখলে করুণ-গম্ভীর স্বরের বুলি ছাড়ে—রাম রাম সৎ হ্যায়! তসীলদার রামতনুকে একদিন তড়বড় করে টাট্টু ছুটিয়ে চলে যেতে দেখে চমৎকার ফূর্তির বুলি ছেড়েছিল ময়নাটা—হিপ-হিপ-হুররে।

এই ভাল। চৌকিদার কাশীলাল আর ওর বউ জগমোতির রুচিটা ভাল। পোষমানা ময়নাটা সব সময় ছাড়া থাকে। ওর জন্যে কোন দাঁড় নেই, খাঁচাও নেই। ওর পায়ে ছোট্ট এক টুকরো শিকলও নেই। খাঁচায় পুরে আর বন্ধ করেই যদি রাখা হলো, তবে আর পোষ-মানানো হলো কোথায়? সেকেলে নবাবদের ছবিতে দেখা যায়, একটা বুলবুলকে নিয়ে ভারিক্কি রকমের ঢং করে বসে আছেন নবাব, কিন্তু বুলবুলটার পায়ে শিকলি। বেচারা কাশীলাল, সামান্য একজন চৌকিদার, সে নিশ্চয় নবাবী রীতির কোন খবর

রাখে না। তাই পোষমানা ময়নাটাকে সব সময় ছাড়া রাখতো। দেখেছে রামতনু, ময়নাটা একদিন জগমোতির খোঁপা থেকে উড়ে গিয়ে কাছাকাছি একটা গাছের মাথার ডালের ওপর বসে পড়ে আর গো-গাড়ির বলদ হাঁকাবার গাড়োয়ানী স্বরের বুলি বাজাতে থাকে। হো হো হো, হেই হেই ধীরি ধীরি! সত্যি দেখা যায়, তেঁতুলের বস্তায় বোঝাই হয়ে একটা গো-গাড়ি আসছে, কিন্তু দুই রোগা বলদ গাড়িটাকে আর টানতে না পেরে হাঁপাচ্ছে গাড়োয়ান, ওই রকম ভাষায় হাঁকের বুলি ছাড়ছে।

আবার সেই এক প্রশ্ন। কোথায় গেল সেই চমৎকার বুলিবাজ চালাক ও রসিক ময়নাটা? তার মানে, কোথায় গেল কাশীলাল আর তার বউ জগমোতি?

চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ভীরু চেহারা ও ছিচকাঁদুনে ফুসফুসের যে মানুষটা, চৌকিদার রামটহল, তাকে সাহস দেবার জন্য দু-চারটে কথা মুখে মুখে বলতেই হয়। না বললে ভাল দেখায় না। লোকটাকে বদলি করে দেবার মতো কোন উপায় তসীলদার রামতনুর নেই। কিন্তু লোকটার ভয় ভেঙ্গে দিতে পারা যাবে না কেন? লোকটাকে বুঝিয়ে বললেই তো হয় যে, ভয় করলেই ভয়, ভয় না করলে ভয় থাকে না। মিথ্যে ভয়ের চাপে পড়ে দুর্বল মনের লোক নিজের চেনা ঘরের ভিতরেই নানারকম বিদঘুটে কান্না-টান্নার শব্দ শুনতে পায়। সামনেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে বাঁশঝাড়, তার মধ্যে ফাটা-ফাটা গিঁটভাঙ্গা বাঁশগুলো নিশ্চয় রাতের বাতাসে দুলে দুলে উঁ উঁ উঁ কান্নাস্বরের আওয়াজ ছাড়ে।

না, চৌকিদার রামটহলকে নির্ভয় হবার একটা প্রেরণা দেবার জন্য রামতনু তৈরী হয়েই বাধা পেল। চমকে ওঠে রামতনু। ঠিকই তো, আর কেউ নয়, ভাণ্ডারীজী আসছেন, এসে পড়েছেন। ভাণ্ডারীজীর টাট্টুর চার পা ধূলোয় ছেয়ে গিয়েছে।

চেঁচিয়ে কথা বলেন ভাণ্ডারীজী। —আপনি আজ আসবেন জেনে আপনাকে পথের কোথাও ধরবার জন্য আমি ইচ্ছে করেই এগিয়ে এসেছি। এঃ রামতনুবাবু, আপনি চলে যাবার পর থেকে আমার সন্ধ্যাবেলার প্রাণটা আপনাকে ধরবার জন্য বড়ই ছটফট করছে, উপোষী শিয়াল যেমন মুর্গীর বাচ্চা ধরবার জন্য ছটফট করে।

এই চৌকিদার রামটহল আর সেই চৌকিদার কাশীলাল, দুজনের প্রাণের স্বভাবের মধ্যে কত তফাত। ভূতের ভয়ে চিঁ চিঁ করছে রোগা হাড়সার চেহারার রামটহল। আর মজবুত চেহারার সেই চৌকিদার কাশীলালের প্রাণ যেন কৃতার্থতায় ধন্য হয়ে সব সময় হাসতো। কিন্তু ওটা যে একটা বিশ্বাসের হাসি, একটা গর্বের হাসি, সেটা ধারণা করতে পারেনি রামতনু। ধারণা করবার কোন দরকারও ছিল না। একদিন, যেদিন সন্ধ্যা হবার আগেই বাঘের ডাক শুনে ধাউলিয়ার জঙ্গলের সব হরিণ এলো-মেলো হয়ে এদিকে-ওদিকে ছুটে পালাতে থাকে, সেদিন রামতনুকে রেল-লাইনের এই লেবেল-ক্রসিংয়ের গেটের কাছে থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল। ছটফট করছে, দৌড়ে পালিয়ে যেতে চাইছে রামতনুর টাট্টু ঘোড়া। শক্ত করে রাশ টেনে ধরেও ঘোড়াটাকে শান্ত করতে পারা যাচ্ছে না। সেদিন সেই উদ্বিগ্ন অবস্থার মধ্যেই রামতনুকে হেসে ফেলতে হয়েছিল। জগমোতির

খোঁপা থেকে উড়ে এসে চৌকিদার কাশীলালের কাঁধের ওপর বসে পড়ে ময়না পাখিটা। বুলি ছাড়ে পাখিটা—ডরো মত্! ডরো মত্!

কাশীলাল হাসে। —রাম রাম তসীলদারজী।

রামতনু—রাম রাম।

কাশীলাল—ডরিয়ে মত, তসীলদারজী। বাঘ ডাকছে ধাউলিয়ার পশ্চিমের জঙ্গলে। এই বাঘটার নিয়ম হলো ডাকতে ডাকতে ধাউলিয়ার পশ্চিমের জঙ্গল থেকে আরও পশ্চিমে চলে গিয়ে, ছুটোছুটি করে দু-একটা রাত-কানা গরুকে মেরে আর দামোদরের জল খেয়ে আবার ধাউলিয়ার জঙ্গলেই ফিরে যাবে। এদিকে আসবে না ওই বাঘ। তিন দিন হলো সেন সাহেব শিকার করতে বের হয়েছেন, তিনিও বললেন, ধাউলিয়ার জঙ্গলে কোথাও বাঘের পায়ের ছাপ তিনি দেখতে পাননি।

রামতনু হাসে—পাখিটাকে ডরো মত্ বুলি কে শিখিয়েছে?

—শিখিয়েছেন ওই সেন সাহেব। উনি আমাকে অভয় দিয়ে বললেন, বাঘ এদিকে আসবে না, ডরো মত্, ডরো মত্। ব্যাস্ পাখিটা সঙ্গে সঙ্গে বুলি ধরে ফেলেছে, ডরো মত্, ডরো মত্।

সেদিন ঘোড়ার লাগাম একটু দুলিয়ে দিয়ে রওনা হবার ইশারা দিতেই সেই কাশীলাল যেন গায়ে পড়ে রামতনুকে একটা বিশ্বাসের কথা শুনিয়ে দিয়েছিল, যেটা একটা গর্বের কথাও বটে।

কাশীলাল বলেছিল—একুশ টাকা মাইনের চৌকিদার হলেও আমার কোন অভাব নেই তসীলদারজী। নবলের মতো বন্ধু পেলে কারও জীবনে অভাবের দুঃখ থাকতে পারে না। নবলের মতো বন্ধু পেতে হলে অনেক সৌভাগ্যের জোর, অনেক পুণ্যের জোর থাকা চাই।

রামতনুর বুকের ভিতরে যেন একটা ঘুমন্ত দুঃখ হঠাৎ খোঁচা লেগে চমকে ওঠে। রামতনুর জীবনটা তার চিরপ্রিয় যে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে, সেই বিশ্বাস পেয়ে এই চৌকিদার কাশীলালের বুকটা ভরাট হয়ে রয়েছে। যে ভয়ানক শিক্ষা পেয়ে গিয়েছে রামতনুর এই বাইশ বছর বয়সের জীবনটা, সেটা এই যে, মানুষ বন্ধুকে বিশ্বাস নেই। বরং জঙ্গল বন্ধুকে, জঙ্গলের পাখি জানোয়ার সাপ আর পোকামাকড়কেও বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু শহর-মার্কা কলেজ-মার্কা ও ভদ্রলোক-মার্কা কোন মানুষের বন্ধুত্বকে বিশ্বাস করতে নেই।

কাশীলাল হঠাৎ বলে ওঠে। —আমি বাঘের ডাকের ভয়ে এই চাকরি ছেড়ে কবেই পালিয়ে যেতাম, যদি নবলের মতো মানুষের বন্ধুত্ব না পেতাম। ভেবে দেখুন তসীলদারজী। কোথায় আমি একুশ টাকা মাইনের একজন চৌকিদার, আর কোথায় নবলকিশোর সিং কিসুনগড়ের জমিদারীর একমাত্র মালিকের একমাত্র ছেলে। আপনি কি জানেন যে নবলের বিয়েতে হাতির মিছিল বের হয়েছিল?

রামতনু—না।

চৌকিদার রামটহলের ভীরু প্রাণের চিঠি বিলাপ, আর ভাণ্ডারীজীর গলা-ফাটানো শব্দের ডাক, দুই শব্দের ধাক্কা খেয়ে রামতনুর মনের চিন্তাটা যেন পুরনো স্মৃতির বেড়া ভেঙ্গে বর্তমানের আলো-ছায়ার মধ্যে ফিরে আসে। না, সেই খাঁটি বন্ধু পাওয়া সৌভাগ্যের মানুষটা, সর্বদা হাসি-হাসি মুখ সেই চৌকিদার কাশীলাল এখানে আর নেই।

রামতনুর আরও কাছে এগিয়ে এসে ভাণ্ডারীজী তাঁর ঘোড়ার রাশ টানলেন। চৌকিদার রামটহলের দিকে তাকিয়ে বেশ বিরক্ত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—অ্যাঁ, মানুষকে মিছিমিছি বিরক্ত করবার অভ্যাস এখনও ছাড়তে পারলে না। যাও, সরে যাও, তসীলদারজীকে তোমার নাকি সুরের যত আবোল তাবোল মিথ্যে গল্প শোনাতে হবে না।

রামতনু—সেই চৌকিদার কাশীলাল কবে চলে গেল?

প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলেন ভাণ্ডারীজী। দুই চোখের ভুরু যেন হঠাৎ নিঝুম হয়ে ঝুলে পড়লো। ভাণ্ডারীজী বিড়বিড় স্বরে কথা বলেন—হ্যাঁ, আপনি তো প্রায় দু'বছর হলো এই তল্লাট ছেড়ে একেবারে ওই তল্লাটে চলে গিয়ে দিন কাটিয়েছেন, তাই খবরটা জানেন না। চৌকিদার কাশীলাল কাজ ছেড়ে চলে যায়নি, কাশীলাল খুন হয়েছে।

রামতনু—অ্যাঁ, কেন?

ভাণ্ডারীজী করুণ ভঙ্গিতে হাসেন—কেন, সে প্রশ্নের জবাব ভগবান জানেন। এখানে আমরা কেউ শত সন্দেহ করেও বুঝতে পারিনি কাশীলালকে খুন করতে পারে কে বা কারা?

তসীলদার রামতনু ও ভাণ্ডারীজী দুই সওয়ারের দুই টাট্টু পাশাপাশি চলতে থাকে। ধাউলিয়ার লেবেল ক্রসিং থেকে ভেলাডিহি পৌঁছতে বেলা শেষ হয়ে যায়। শেষ রোদের আভার চেহারাটাকে তালবনের মাথার ওপর যেন আকাশ থেকে ঝরে পড়া একটা রক্ত-ধারার আভার মতো দেখায়। হাত দিয়ে খুব জোরে রগড়ে রগড়ে চোখ মোছে রামতনু। ভেলাডিহিতে পৌঁছবার আগের সারাটা পথ শুধু কাশীলালের কথাই মনে পড়ে।

॥ দুই॥

ভেলাডিহির তসীলদারী কাছারির বারান্দায় একটা চৌকির ওপর বসে আকাশে ও বনের গাছপালার মাথায় পাখির আনা-গোনার দৃশ্য দেখতে খুব ভাল লাগে। টিয়ে পাখির ঝাঁক এসে কাছারিবাড়ির আঙিনার জামগাছের পাতার ওপর ঠোকর দিয়ে খেলা করে। কাকের আর্তনাদ শুনেই বুঝতে পারে রামতনু, দেখতেও পায় যে, তাল গাছের মাথার ওপর বসে আছে একটা শিকারী বাজ। পাহাড়ী ময়নার একটা ঝাঁক উড়তে উড়তে কাছারিবাড়ির কাছে এসে পড়েছিল, কিন্তু হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে আর গতির মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে লুটুয়া পাহাড়ের জঙ্গলের দিকে চলে গেল। বোধ হয় তালগাছের মাথায় শিকারী বাজটাকে দেখতে পেয়েছে পাহাড়ী ময়নার এই ঝাঁকটা। কিন্তু আবার পাহাড়ী ময়নারই একটা ঝাঁক আসছে। উড়ে এসে কাছারিবাড়ির আঙিনার জামগাছের উপর বসেছে। না,

তালগাছের মাথার ওপর সেই বাজটা আর নেই। তবু কে জানে কেন, পাহাড়ী ময়নার ঝাঁক যেন এক পলকের কোন ঈশারায় উড়ে চলে গেল। প্রফেসর চারুবাবুর পক্ষিতত্ত্বের কথাগুলিকে আর নিতান্ত অতিভাবুকের কল্পনার কথা বলে মনে হয় না। কাছারি বাড়ির ঘরগুলির পুরনো টিনের চালা, নতুন লাল টালির চালা নয়। তার ওপর কোন রং নেই। লতা নেই ফুল নেই, ফড়িং-প্রজাপতি নেই। রূপ নেই। তবে পাহাড়ী ময়নার চোখ আর প্রাণ কিসের টানে নেমে আসবে আর চালার উপর বসবে?

একদিন ভোরবেলাতেই ভাণ্ডারীজী হঠাৎ এসে আর চেঁচিয়ে হেসে উঠলেন—নেমন্তন্ন রামতনুবাবু। নবলকিশোরবাবু আপনাকে ও আমাকে নেমন্তন্ন করেছেন। এই যে, এঁরা এসেছেন নেমন্তন্নর চিঠি নিয়ে।

হ্যাঁ, দেখে চিনতেও পারে রামতনু, এই দুজন হলো কিসুনগড় জমিদারীর দুই পেয়াদা। ওরা পেয়াদার চাকরী করে, সেই সঙ্গে আবার পাখির চালানী কারবারও করে। নেমন্তন্নের চিঠিটা রামতনুর হাতের কাছে এগিয়ে দিয়েই পেয়াদা মঙ্গল রায় বলে : আঃ, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হতো না আপনাদের ভেলাডিহিতে পাহাড়ী ময়নার এত আনাগোনা আছে। এক একটা ঝাঁকে কম করেও ত্রিশ চল্লিশটা পাখি। আঃ, দয়া করে হুকুম দিন তসীলদারজী, এই মরসুমে ভেলাডিহির জঙ্গলের সব ময়নার ঝাঁক ধরবার একটা অনুমতি দিয়ে দিন হুজুর।

রামতনু—না। তা হয় না।

পেয়াদা মঙ্গল রায় আবার হাত জোড় করে—আর একবার ভেবে দেখুন, তসীলদারজী। আমরা আবার এসে খোঁজ নেব।

নেমন্তন্নের চিঠিওয়ালা দুই পেয়াদার অন্তর্ধানের পর ভাণ্ডারীজী বললেন—সত্যি, রামতনুবাবু, নবলকিশোরবাবুর মতো সৎ মানুষ, ভদ্র মানুষ আর দয়ার মানুষ হয় না। হলেও খুব কমই হয়। চৌকিদার কাশীলাল খুন হবার পর শোক-দুঃখ সহ্য করতে না পেরে নবলবাবু প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। পুরো একটা মাস দিন-রাত সমানে কেঁদেছিলেন। থানার বড় দারোগা ওঙ্কারবাবুকে বলেছিলেন : আমি আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা ইনাম দেব বড়বাবু, যদি আপনি খুনীকে ধরে ফেলতে পারেন। আমার বন্ধু কাশীলাল, সে একটা চৌকিদার হোক বা যা-ই হোক, তাকে খুন করেছে যে, তার ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত আমার চোখে ঘুম আসবে না।

নবলবাবুর পিতাজীবাবু ভরত সিং রায়সাহেব হয়েছেন। ডেপুটি কমিশনার মিস্টার কলিন্সকে পাঁচ বছর ধরে প্রতি শীতের মরসুমে বড় বড় বাঘ শিকার করিয়ে দিতে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছেন যিনি, তিনি হলেন এই ভরত সিং। ডেপুটি কমিশনারের বাঘ শিকারের আমোদ পূর্ণ করে তোলবার জন্য যা করা দরকার, জঙ্গলে তাঁবু পাতবার, মাচান করবার, আর হুইস্কি-ব্র্যাণ্ডি যোগান দেবার সব দায়িত্ব ও কর্তব্য একা বহন করেছেন বাবু ভরত সিং। কাজেই....।

তাই কিসুনগড়ের জমিদার বাড়িতে উৎসবের ব্যবস্থা হয়েছে। নিমন্ত্রিত সাহেবদের

জন্য শিকারের ও খানাপিনার সুব্যবস্থা হয়েছে। নিমন্ত্রিত দেশী বাবুদের পরিতৃপ্তির জন্য গয়া থেকে রাবড়ি আর বালুসাহি আনা হয়েছে। গাজিপুরী বাঈজীর নাচ-গানও হবে। তা ছাড়া, নবলবাবুর মনের আসল পরিচয় এটাতেই পাওয়া যায়, প্রায় হাজারখানেক গরীব আদিবাসীকে ভাত খাওয়াবার ও হাঁড়িয়া পান করাবার ব্যবস্থা করেছেন নবলবাবু। এর ওপর বাউলিয়া বাজারের যত কানা-খোঁড়া ভিখারীকে পেটভরে খিচুড়ি খাওয়াবার ব্যবস্থাও হয়েছে।

—কিন্তু কী দুঃখের রামতনু, কিছুর মধ্যে কিছু না, কাশীলাল কেন যেন একদিন কাউকে কোন খবর না দিয়ে, কাউকে কিছু জানতে না দিয়ে, একেবারে ওর বউ জগমোতিকে নিয়ে লাতেহারে ওর এক খুড়শ্বশুরের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এল।

—কেন?

—কেন, কে জানে? কী রামতনুবাবু, আপনি ওরকম আনমনা হয়ে কী ভাবছেন বলুন তো। আমার কথাগুলো শুনছেন কি শুনছেন না, বুঝতে পারছি না।

রামতনু—শুনেছি, ভাণ্ডারীজী। শুনে খুব অস্বস্তি বোধ করছি।

ভাণ্ডারীজী—আমারও একটু আশ্চর্য বোধ করতে হয়েছে। নবলবাবুর মতো বন্ধু মানুষ কত চেষ্টা করলো, টাকা খরচ করলো, তবু খুনের কূলকিনারা হলো না।

রামতনু—যা-ই হোক, এসব কথা ছাড়ুন ভাণ্ডারীজী। আমার মোটকথা এই যে, আমি নবলবাবুর বাবার ওই রায়সাহেবী আনন্দের নেমন্তন্নে যাব না।

ভাণ্ডারীজী—অ্যাঁ; হ্যাঁ, বুঝেছি রামতনুবাবু। আমি আগেও দেখেছি ছোকরা বাঙালীবাবুরা বড়ই স্বদেশী মেজাজের মানুষ, ওরা রায়সাহেবী নেমন্তন্ন একটুও পছন্দ করে না।

কথা বন্ধ করতে গিয়েও বন্ধ করেন না ভাণ্ডারীজী। চেঁচিয়ে কেঁপে ওঠেন আর কথা বলেন—ওঃ, হায় ভগবান, সে কী নিষ্ঠুর দৃশ্য।

যেন ভাণ্ডারীজীর মনের ভিতরে ভয়ানক একটা স্মৃতির ছবি শিউরে উঠেছেঃ লাতেহারে খুড়শ্বশুরের বাড়িতে জগমোতিকে রেখে দিয়ে সেই রাতেই ফিরে এসেছিল কাশীলাল। কেউ জানে না, কেউ বলতে পারে না, সে রাত্রে ঠিক কখন ফিরে এসে এই গুমটি ঘরের ভিতরে ঢুকেছিল। সকালবেলা একটা ভাট-ভিক্ষুক দৌড়ে এসে ধাউলিয়া বাজারের পুলিশ চৌকিতে খবর দিয়েছিল ঃ কাশীলাল খুন হয়েছে। গুমটি ঘরের দরজা খোলা, বাইরে থেকেই দেখতে পাওয়া যায়; কাশীলালের রক্তমাখা লাস পড়ে রয়েছে।

কী আশ্চর্য; ভোজালির এক কোপে গলাটা কেটে না ফেলে খুনী কেন যে কাশীলালের বুকের ওপর ভোজালির দশটা কোপ বসিয়েছে, সেটা বুঝতে না পেরে আশ্চর্য হয়েছেন থানার বড় দারোগা ওঙ্কারবাবু। খুনীর সব আক্রোশ যেন কাশীলালের বুকটারই ওপর। খুনী লোকটার আশার স্বপ্নটাকে ছোবল দিয়ে মেরে ফেলে দশটা সাপ কাশীলালের বুকের ভিতরে লুকিয়েছিল। কাশীলালের ঘরে পেতল-কাঁসার কিছু বাসন ছিল, আধসের ঘি ছিল, রবারের একটা বর্ষাতি জামা ছিল, আর একটা পিতলের ঝাঁপির মধ্যে একটা

সোনার হার; খোঁপায় পরবার সোনার দুটো ফুল আর একটা রূপো-বাঁধানো চিরুণীও ছিল। কিন্তু কই, কী আশ্চর্য, খুনী তো এসব জিনিসের কিছুই স্পর্শ করেনি। সবই ঘরের দেয়ালের তাক আর মেঝের ওপর পড়েছিল, খুনীর কোন লোভ সে সব জিনিসের সামান্য নড়চড়ও করেনি। সত্যিই তো একটা অদ্ভুত নির্লোভ খুনের কাণ্ড বলে মনে হয়।

রামতনু—কাশীলাল হঠাৎ-ওর বউকে লাতেহারে খুড়শ্বশুরের বাড়িতে কেন রেখে এসেছিল, সেটা কি কারও কাছ থেকে কখনও জানতে পেরেছেন?

ভাণ্ডারীজী দুই চোখ বড় করে হাই তোলেন। —হ্যাঁ, মনে পড়েছে, কথাটা বলতে ভুলে গিয়েছি, রামতনু বাবু! আমাদের এই ভেলাডিহির জঙ্গলের হাড়কুড়ুনী বুড়িকে আপনি তো দেখেছেন?

—হ্যাঁ।

—ওই বুড়ি হলো এই নতুন চৌকিদার রামটহলের মা। বুড়ির সঙ্গে কাশীলালের বউ জগমোতির খুব ভাব-সাব ছিল। বুড়ির মুখ থেকে আমরা শুধু এইটুকুই শুনতে পেয়েছিলাম যে জগমোতিই হঠাৎ সেদিন খুব উতলা হয়ে বায়না ধরেছিল ঃ আমাকে এখনই লাতেহারে চাচাজীর বাড়িতে রেখে এসো, আমি আর একটা দিনও এখানো থাকবো না। এখানে থাকলে বাঘ আমাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়ে ফেলবে।

ভোরের ট্রেন পাস করিয়ে দিয়েই নুন কেনবার জন্যে ধাউলিয়া বাজারে চলে গিয়েছিল চৌকিদার কাশীলাল। ফিরে এসে দেখে, ঘরের ভিতরে ছটফট করছে জগমোতি। ভয়ে উতলা হয়ে যেন একটা দুঃস্বপ্নের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে, নেহি, কভি নেহি, হঠ যাও, জলদি যাও। হাড়কুড়ুনী বুড়িও ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের দরজার কাছে এসে হাঁউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে, হায়রে হায়, বউটাকে ডাইনে ছুঁয়েছে, কী হবে উপায়?

জগমোতির মাথায় জল ছিটিয়ে সান্ত্বনা দেয় কাশীলাল। খুব গম্ভীর কাশীলাল। তারপরেই বলে ওঠে—চলো মোতি, এখনই চলো।

হাড়কুড়ুনী বুড়িকে দুটো রুটি খেতে দিয়ে তখনি চলে গেল বউটা। কাশীলালের সঙ্গে রেললাইনের কিনারা ধরে ওরা হেঁটেছিল। বুঝতে পারা যায়, প্রথমে ধাউলিয়া বাজার, তারপর সেখান থেকে মোটরবাসে চড়ে ওরা লাতেহারে পৌঁছে গিয়েছিল সেদিনের সন্ধ্যা হবার অনেক আগে। পরদিন দুপুরবেলা আমি যখন ঘোড়া থামিয়ে এখানে গুমটিঘরের চৌকিদার কাশীলালকে ডাক দিয়ে কোন সাড়া পেলাম না, তখন দেখলাম বন্ধ দরজার কড়াতে তালা ঝুলছে।

রামতনু—আপনি এসব কথা থানার বড় দারোগাকে বলেননি?

হেসে ফেলেন ভাণ্ডারীজী—বলেছি, যা জানি, যতটুকু জানি, সবই বলেছি।

ভাণ্ডারীজীর মুখের ধারাবিবরণীর মাঝখানে বাধা দিয়ে প্রশ্ন করে রামতনু। —কাশীলালের খুনের কোন কুলকিনারা কি এখনও হয়নি?

ভাণ্ডারীজী—না, রামতনু। এখনও চেষ্টা চলছে। থানার বড় দারোগা ওঙ্কারবাবু কথা দিয়েছেন। আমি সহজে ছাড়ছি না, আমার জিউ-জান ভিড়িয়ে দিয়ে খুনীকে ধরবার

চেষ্টা চালিয়ে যাব। কিন্তু বড় দারোগা ওঙ্কারবাবুও খুব একচোট হেসেছিলেন আর বলেছিলেন—ওসব খবরে আমার তদন্তের কোন লাভ নেই, ভাণ্ডারীজী। খুনীর নাম বলুন, তবে বুঝবো খবরের মতো একটা খবর দিয়েছেন।

রামতনু কিছুক্ষণ কী যেন ভাবে, তারপর হঠাৎ ব্যস্ততায় ছটফট করে ওঠে। —চলুন ভাণ্ডারীজী।

—কোথায়?

রামতনু—চলুন কিসুনগড়ের রায়সাহেবী উৎসব দেখে আসি।

ভাণ্ডারীজী খুশি হয়ে হাঁকডাক করেন;—এ ভুলন, এ লছমন, জলদি দুই ঘোড়ার পিঠে গদি চড়াও।

—তুমি আজ নিজের চোখে দেখতে পাবে রামতনু, বন্ধু কাশীলালের জন্য কী দরদ আর কত মায়া যে ছিল নবলবাবুর প্রাণে, তার প্রমাণ আজও তুমি দেখতে পাবে। না, রামতনু, তুমি বিশ্বাস কর বা না কর, নবলবাবুর মতো দিলদার বন্ধু-মানুষ হয় না।

॥ তিন ॥

হ্যাঁ, প্রমাণ দেখতে পেয়েছে রামতনু। দেখতে পেয়ে বেশ একটু আশ্চর্যও হয়েছে। রায়সাহেব ভরত সিং-এর প্রকাণ্ড গড়-বাড়ির ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকে একটা বারান্দায় উঠতেই চোখে পড়েছে রামতনুর, সত্যিই তো দেয়ালের গায়ে নববাবুর গরীব বন্ধু কাশীলালের ফটো ঝুলছে। ফটোটা বড় বড় টাটকা ফুলের মালা দিয়ে জড়ানো। সবাই দেখছে, নেমন্তন্নের সাহেব আর দেশী ভদ্রলোক যাঁরা আসছেন, তাঁদের সবারই চোখে ফুলমালায় জড়ানো কাশীলালের ফটোটা চোখে পড়ছে।

জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে এলেও কিসুনগড়ের এই জমিদারবাড়িতে পৌঁছতে প্রায় দুপুর হয়ে গিয়েছে। গড়-বাড়ির প্রকাণ্ড আঙিনার ওপর মখমলের ছোট একটি সামিয়ানার নীচে শিকারী সাহেবদের খানা-পিনার আসর। এখন পর্যন্ত শুধু দুজন সাহেব এসে পৌঁছেছেন আর হুইস্কি খেতে শুরু করেছেন, দুজন কোলিয়ারি-সাহেব। সন্ধ্যে হবার আগেই সব সাহেবের পৌঁছে যাবার কথা। জঙ্গলে তাঁদের বাঘ-শিকারের ছ'টা মাচান করা হয়েছে। তিনটে মাচানের নীচে তিনটে সাদা ছাগল আর তিনটে মাচানের নীচে রোগা লিকলিকে তিনটে মোষের বাচ্চা বেঁধে রাখা হয়েছে, রাতের বাঘকে ছলিয়ে আর লুভিয়ে আনবার ছ'টা টোপ।

বারান্দার উপরে ঢালাও ফরাসের ওপর বসে আছেন অভ্যাগত মানুষ। তাঁদের মধ্যে যেমন ধাউলিয়ার ডাকবাবু আছেন, তেমনই সুরজপুরের গাঁও পঞ্চায়েতের বড় মাহাতোও আছেন। আছেন গিরিডির নতুন ডি এস পি, গোয়ানিজ সাহেব মিস্টার প্যারেরা। আর, গো-গাড়ি থেকে নামছে গয়ার বালুসাহির যে সব ঝুড়ি সেগুলিকে তুলে নিয়ে আঙ্গিনার এদিকের একটা নতুন ঘরের ভিতর রাখা হচ্ছে। চমকে ওঠে রামতনুর দুই চোখের দৃষ্টি। আশ্চর্য, এই ঘরটার চেহারা যে রেল লাইনের লেবেল-ক্রসিংয়ের কাছে চৌকিদার

কাশীলালের সেই গুমটি ঘরটারই মতো. ওপরে নতুন লালচে টালির চালা, তার ওপর একটি উচ্ছেলতা গড়িয়ে শুয়ে রয়েছে। উচ্ছে ফুলের ওপর ফরফর করে হলদে ফড়িং উড়ছে। সত্যি আশ্চর্য হতে হয়, কেউ কি ভুল করে কিংবা ইচ্ছে করেই এই কাণ্ড করেছে?

নবলবাবুর সহাস্য মূর্তিটা হাতজোড় করে নমস্তে জানিয়ে অভ্যাগত জনতার সামনে এসে দাঁড়াল। ভাণ্ডারীজীকে দেখতে পেয়েই এগিয়ে এলেন নবলবাবু। ছোট ঘরটার দিকে তাকিয়ে কথা বলেন নবলবাবু, আমাদের নায়েববাবুর বুদ্ধি-সুদ্ধির অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছে।

ভাণ্ডারীজী—কী ব্যাপার, নবলবাবু?

নবলবাবু—নতুন একটা লম্বা চওড়া আলু গুদামের ঘর তৈরী করতে বলেছিলাম নায়েবাবুকে, একবারও সন্দেহ হয়নি যে উনি ওঁর মাথার ভুলে ওরকম ছোট্ট একটা নতুন টালির চালাওয়ালা ঘর তৈরী করে ফেলবেন। আবার শখ করে একটা উচ্ছেলতাকে চালার ওপর চড়িয়ে দেবেন।

সেই মুহূর্তে চমকে ওঠেন নবলবাবু; চমকে ওঠে ভেলাডিহির তসীলদার রামতনুও।

ঠিক ঠিক ঠিক, প্রফেসর চারুবাবুর সেই ধারণার কথাগুলি একটুও বেঠিক কল্পনার কথা নয়। একেবারে বাস্তব সত্যের কথা। পাখিরা আর্ট বোঝে, ওরা ওদের পছন্দসই রূপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর খুশি হয়। ঠিক ঠিক ঠিক, ওই তো কে জানে কোথাকার কোন্ ঝাঁক থেকে ছাড়া পেয়ে একটা পাহাড়ী ময়না ওই নতুন লালচে টালির চালার ওপর উচ্ছেলতার কাছে ফড়িং ধরবার জন্যে লাফালাফি করছে। যেমন সেই চৌকিদার কাশীলালের ছোট্ট গুমটি ঘরের নতুন লালচে টালির চালার ওপর, তেমনই এখানে এই.....।

আরও আশ্চর্য হয়ে চমকে ওঠে রামতনু, চমকে ওঠেন ভাণ্ডারীজী, চমকে ওঠেন রায়সাহেবী নেমন্তন্নের দেড়শো অভ্যাগত জনের সবাই। এ কী, এ কথার মানে কী, টালির চালার ওপর বসে একটা পাহাড়ী ময়না এ কিসের বুলি বলছে? —এ নবল ভাই, মত্ মারো, মত্ মারো। পাখির বুলি আর গলাবাজির স্বরটা যেন একটা ভয়ানক যন্ত্রণাব আর্তস্বর।

ভাণ্ডারীজীকে আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে সরিয়ে রামতনু এইবার নিজে এগিয়ে যায় আর নবলবাবুর চোখের সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

দুই চোখ বন্ধ করে আর থর থর করে কাঁপতে থাকেন সুঠাম সুদর্শন রাজপুত, বাবু নবলকিশোর সিং। চুপসে গিয়েছে নবলবাবুর চওড়া বুকটা। হাতদুটো যেন বাতাসটাকে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করছে। টলছে নবলবাবু। চোখ মেলে চারদিকে তাকায়। কটকটে লাল দুই চোখ থেকে যেন এইবার রক্ত ঝরে পড়বে। আশ্চর্য, কট্টর রাজপুত নবলবাবুর এই লাল চোখ দুটো আতঙ্কে ভরে গিয়ে নতুন টালির চালার দিকে তাকিয়ে থাকে।

তখনো বুলি ছাড়ছে সেই অদ্ভুত পাহাড়ী ময়না, জগমোতির আদরের পোষা ময়না—এই নবল ভাই, মত্ মারো, মত্ মারো।

সবার আগে উঠে দাঁড়ালেন নতুন ডি এস পি কালো গোয়ানিজ সাহেব, মিস্টার প্যারেরা। পকেটের ভিতর থেকে পিস্তল বের করে আর নবলবাবুর দিকে তাকিয়ে হাঁক দিলেন, খবরদার। চুপসে খাড়া রহো।

নেমন্তন্নের দেড়শো অভ্যাগত মানুষের আর একটি মানুষ একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ছুটে এসে নবলবাবুর চুলের ঝুঁটি দুই হাতে শক্ত করে চেপে ধরলেন। খুনী ধরা পড়েছে। ভাই সব, দেখুন দেখুন, চৌকিদার কাশীলালকে খুন করেছে যে, তাকে একবার দেখুন।

উন্মত্ত হয়ে খুনী নবলবাবুর চুলের ঝুঁটি চেপে ধরেছেন যিনি, তিনি হলেন জগমোতির চাচাজী, লাতেহারের বাবু বৃন্দাবন সিং।

ঘটনার বিস্ময় সহ্য করতে না পেরে শুধু ফ্যালফ্যাল করে রামতনুর দিকে তাকিয়ে থাকেন ভাণ্ডারীজী। তারপর বিড়বিড় করে কথা বলেন—এ কী রামতনু? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

রামতনু—ব্যাপার এই যে, পাহাড়ী ময়নাটা ওঙ্কারবাবুর মতো মানুষ—প্রাণী নয়। পাহাড়ী ময়নারা ঘুষ খায় না, আর খুনীকে রেহাইও দেয় না।

নবলবাবু গ্রেপ্তার হয়ে সদরের জেল হাজতে চালান হবার ক'দিন পরে ধাউলিয়ার রেললাইনের লেবেল ক্রসিংয়ের চৌকিদার রামটহলকে নিশান দোলাতে দেখে ঘোড়া থামিয়েছিল তসীলদার রামতনু। জিজ্ঞেস করেছিল—কী রামটহল, মাঝরাতে তোমার ঘরে কি আর বোবার কান্নার মতো কোন গোঙানির শব্দ শুনতে পাও?

হেসে ফেলে রামটহল—না বাবু না। ও সব খারাপ শব্দ-টব্দ আর শুনতে পাই না। আমিই আজকাল মাঝরাতে গলা ছেড়ে গান করি।

—কিসের গান? রামনামের গান?

—না বাবু, এই মামুলি একটা গান। চুপকি চুপকি বোল ময়না, চুপকি চুপকি বোল।

মধুগঞ্জের সুমতি

কুব্জদেহ ন্যুব্জদেহ একটি উট। তার চলবার ও তাকাবার দৃপ্ত রকমের ভঙ্গী দেখে মনে হবে যে, সে যেন বিকানীরের উট রেজিমেন্ট গঙ্গা রিসালাতে ছিল আর মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধে অনেক মরুভূমির ওপর ছুটোছুটি করে তুর্কী শিবিরের অনেক তাঁবু গুঁতিয়ে ভূমিসাৎ করেছিল। রামতনু হঠাৎ দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছে, তসীল কাছারির পুব দিকের জঙ্গলের বড়-বড় কোনার গাছের ডাল গুঁতিয়ে ভেঙে দিচ্ছে একটা উট, আর সেই ঝুলে পড়া ভাঙা ডালের কচিপাতা খাচ্ছে। খেতে খেতে ঘাড় তুলে তসীল কাছারির বারান্দার দিকে তাকিয়ে রামতনুকেই দেখছে। উটটার চোখে যেন একটা

কড়া রকমের জিজ্ঞাসা ভাসছে, কে আপনি? হঠাৎ কোথা থেকে মধুগঞ্জের এই জঙ্গলে এসে ঠাঁই নিলেন?

উটটার ভঙ্গী দেখে বেশ কৌতুক বোধ করে রামতনু। দেখে মনে হয়, জঙ্গলের প্রাণী না হয়েও এই উট যেন জঙ্গলকে ভালবাসে। উটের গলাতে মস্ত বড় একটা কড়ির মালা ঝুলছে, হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে, ওটা বুঝি সাদা বনফুলের একটা মালা।

শুনতে পায় রামতনু, কাছারিঘরের পিছনে একজোড়া হায়েনা খ্যাক-খ্যাক করে কেশে কেশে দৌড়াদৌড়ি করছে। বেচারা উট এইবার নিশ্চয় উদ্বিগ্ন হয়ে আর একছুট দিয়ে পালিয়ে যাবে। কিন্তু কী আশ্চর্য, কোনার গাছের ভিড়ের ভিতর থেকে অবিচল উটের লম্বা লম্বা গলা বের হয়ে আর উটের নির্ভীক মাথাটাকে উঁচিয়ে তুলতেই হায়েনার কাশির শব্দটাই ভয় পেয়ে থেমে গেল। পালিয়ে গেল দুই হায়েনা। বাঃ, এ তো বেশ জবরদস্ত মেজাজের উট।

জানতে দেরি হয়নি রামতনুর, এই উট সার্কাসের তাঁবু থেকে পলাতক কোন উট নয়। এ হল মানুষের পোষা উট এবং মানুষেরই ঘরে থাকে। মধুগঞ্জ জমিদারীর বারো-আনা মালিক যিনি, রায়সাহেব মহাদেব চৌধুরীর কারবারের কাজে সব রকমের দৌড়াদৌড়ির খাটুনি খাটে এই উট, যার ডাক নাম বাহাদুর। রায়সাহেবের বাঙালী গোমস্তা, গোরাবাবু যাঁর নাম, তিনি নিজে এসে সেদিন আলাপ করে অনেক কথা বললেন। তাই জানতে পেরেছে রামতনু গত পাঁচ বছরের মধ্যে চারবার লাট সাহেবের শিকার খেলবার দরকারে সবরকম ব্যবস্থা করে দেবার কৃতিত্বে মহাদেব চৌধুরী রায় সাহেব খেতাব পেয়েছেন। মধুগঞ্জ জমিদারীর বাকি চার-আনা মালিক যাঁরা, সেই ঠাকুরসাহেবদের তসীলদার হয়ে এই মধুগঞ্জের ঘোর জঙ্গলের ভিতরে যে কাছারি ঘরে আজ বসে আছে রামতনু, সেটা নিতান্ত দীনহীন চেহারার একটা কুঁড়েঘরের চেয়ে বেশি শোভাময় কোন অস্তিত্ব নয়।

তসীল কাছারির এই ঘরটা মধুগঞ্জ জঙ্গলের মধ্যে কেমন একটা দীনহীন চেহারার কুঁড়েঘর, বারো আনা জমিদারীর মহাদেব চৌধুরীর বাড়িটা তেমনই মাটির তৈরী বিশালকায় এক প্রাসাদের মতো চেহারার বাড়ি। প্রতি গুরুবারে মহাদেব চৌধুরীর বিরাট বাড়ির অঙিনাতে ঘট বসিয়ে পূজো আর ভজন হয়। দশ সের আটার হালুয়া প্রসাদ বিতরণ করা হয়। লোক পাঠিয়ে রামতনুকে একদিন নেমন্তন্ন করলেন রায়সাহেব মহাদেব চৌধুরী, তাই রামতনু এক গুরুবারে এসে হালুয়া প্রসাদ খেয়ে গেল।

আগে কখনও চোখে পড়েনি, তাই ধারণা করতে পারেনি রামতনু, ঘোর জঙ্গলের ভিতরে এত বড় একটা বাড়ি থাকতে পারে। পুরনো কালের বড় বড় গড়-বাড়ির ধ্বংসের অবশেষ অনেক জঙ্গলের ভিতরে দেখতে পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু এরকমের এতবড় চেহারার জীবন্ত কোন বাড়ি কখনও চোখে পড়েনি। বাড়িতে অনেক লোক। ছোট ছোট অনেক ছেলে ও মেয়ে বিরাট আঙিনার ওপর ছুটোছুটি করে খেলা করছে, চিৎকার করছে, কাঁদছে হাসছে আর মারামারিও করছে। আর, ভারিক্কি ভঙ্গীর চেহারা

নিয়ে উটটা আঙিনার একপাশে মাটির ওপর এলিয়ে বসে বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের এই খেলা দেখছে।

রায়সাহেব মহাদেব চৌধুরী বললেন—আমার এই উট নামেও বাহাদুর কাজেও বাহাদুর।

উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়েছে। মহাদেব চৌধুরীর উট এই বাহাদুরকে তাই জঙ্গলের হাওয়া-গাড়ি বলতে হয়। সারা দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নানা রকমের বস্তুসম্ভারের বোঝা পিঠে নিয়ে বাহাদুর এই জঙ্গলের পথে যাওয়া-আসা করে। কাঠের বোঝা, মকাইয়ের বোঝা, ঘিয়ের টিন তেলের টিন আর চাল-ডাল মশলার বোঝা। এখান থেকে তিন মাইল দূরে জঙ্গলের ভিতরে মহাদেব চৌধুরীর খনিজ সম্পত্তির যে বিরাট সমাবেশ আছে, সে জায়গাটার একটা নতুন নাম দিয়েছেন মহাদেব চৌধুরী—লছমিপুরা। সেখানে একটি বাজারও বসিয়েছেন মহাদেব চৌধুরী, সেই বাজারের চাহিদা হলো এই সব বস্তু। সব চেয়ে বেশি বইতে হয় বস্তাবন্দী যত খনিজ বস্তুর বোঝা। সোপস্টোন, ডোলোমাইট, অ্যাসবেসটস আর সিলিকেট। খনিজ মাল পিঠের উপর চাপিয়ে নিয়ে লছমিপুরা থেকে গুমিয়াতে ডেভিড ব্রাদার্সের ডিপোতে পৌঁছে দেওয়াও বাহাদুরের প্রায় নিত্যদিনের কাজ। তাছাড়া দেশী মদের তিন-চারটে ড্রামও প্রতি সপ্তাহে অন্তত দুবার গুমিয়ার আবগারী ডিপো থেকে বয়ে নিয়ে জঙ্গলের ভিতরে লছমিপুরার ওই নতুন বাজারের তিনটে লাইসেন্সওয়ালা কালালী দোকানে পৌঁছে দেবার কাজও আছে।

তসীলদার রামতনুর দীনহীন চেহারার কাছারিঘর মহাদেব চৌধুরীর এই বিরাট চেঁচামিচি আর হাঁকডাকের বিরাট বাড়ি থেকে মাত্র আধ মাইল দূরে, তবু এ-বাড়ির জীবনের কোন ব্যস্ততার শব্দ রামতনুর তসীল কাছারির ঘরে পৌঁছয় না, কারণ জঙ্গল এখানে খুবই ঠাসা। আর আনাগোনার যে-সড়ক মহাদেব চৌধুরীর লছমিপুরা থেকে শুরু করে আর মধুগঞ্জ হয়ে গুমিয়া পর্যন্ত চলে গিয়েছে, সেটা খুবই সরু। এই সড়কের গোরুর গাড়ির ভয়ানক ক্যাঁচকেচে শব্দ যেন অচল হয়ে জঙ্গলের এই সরু পথের গায়ের উপরেই পড়ে থাকে। আধমাইল দূরের কোন জংলী বাড়ির কানে পৌঁছয় না।

মহাদেব চৌধুরী হেসে হেসে বলেন—ওই বাজে আর বিশ্রী জংলী সড়কে গোরু-গাড়ি চালিয়ে গুমিয়া পৌঁছতে দশ ঘন্টা সময় লাগে। কিন্তু আমার এই বাহাদুরের লাগে দু ঘন্টা। কেন বলুন তো?

রামতনু হাসে—আমি বলতে পারি না।

মহাদেব চৌধুরী—এক নম্বর কারণ, আমার উট এই বাহাদুর একটি তেজী দৌড়নেওয়ালা। দু'নম্বর কারণ, বাহাদুর কখনও ওই সরু সড়ক ধরে যাওয়া আসা করে না। জঙ্গলের ভিতরের যত নদীর গায়ের শুকনো বালিয়াড়ির ওপর দিকে একটানা দৌড় দিয়ে গুমিয়া চলে যায় বাহাদুর। নদীগুলির চেহারা খুব আঁকাবাঁকা হলেও নদীর শুকনো

বালিয়াড়ির ওপর দৌড়তে বাহাদুরের যেমন সময় কম লাগে, তেমনই দূরও কম পড়ে। এখন বুঝলেন তো তসীলদারজী, কেন আমি উট পুষেছি।

হাজারিবাগে ক্যারিং কোম্পানী নামে এক কোম্পানির অনেক উটগাড়ির মধ্যে একটি উটগাড়ির উট ছিল এই বাহাদুর। কোম্পানির উটগাড়ির যাত্রী আর মাল বহন করবার নিয়মিত সার্ভিস পালন করতো। চাতরা গিরিডি রাঁচি গুমলা লোহারডাঙ্গা, কোথায় না যেত ক্যারিং কোম্পানীর উটগাড়ি। সড়কের পাশে রাতের অন্ধকারের মধ্যে ডোরাকাটা বাঘের চেহারার কালো পিণ্ডটাকে যাত্রীদের কেউ দেখতে না পেলেও, উটগাড়ির উট খুব সহজেই দেখে ফেলতো। সড়কের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আর গলা দুলিয়ে ডাক ছাড়তো গাড়ি টানা নির্ভীক উট। যাত্রীরা হল্লা শুরু করলেই পালিয়ে যেত বাঘ। সেইরকমই একটা উট গাড়ির নির্ভীক উট হলো এই বাহাদুর।

উটগাড়ির সার্ভিস নবাগন্তুক মোটরবাসের প্রতিযোগিতা সহ্য করতে না পেরে একেবারে স্তব্ধ হয়েই গেল। উঠে গেল কোম্পানি। সব উট বিক্রি করে দিলেন ক্যারিং কোম্পানির মালিক স্যামসুল সাহেব। বাহাদুরকে কিনে নিলেন মহাদেব চৌধুরী। কিন্তু কী অদ্ভুত সমস্যা, বিক্রী হওয়া উট এই বাহাদুর এক পা-ও নড়তে চায় না। মহাদেব চৌধুরী তিন চাকর একে একে এগিয়ে এসে বাহাদুরের গলার দড়ি ধরে টান দেয়, কিন্তু বাহাদুর নড়ে না।

সামসুল সাহেব বলেন, বুঝলেন তো সমস্যা? উটগাড়ির চাল্‌কি যে লোকটি, যার নাম মোহনরাম, যে এতদিন এখানে বাহাদুর নামে এই উটের হেফাজত করেছে, তাকে চাইছে বাহাদুর। সে যদি বাহাদুরের গলার দড়ি ধরে, তবেই নড়বে আর চলবে বাহাদুর। নইলে নয়।

তাই, নইলে অন্য কোন কারণ ছিল না, বাহাদুরের এতদিনের চাল্‌কি, রোগা পটকা আর একচোখ কানা মোহনকেও নিয়ে এলাম। কিন্তু সত্যি, স্বীকার করতে হয়, কী চমৎকার কাজ করছে মোহন আর বাহাদুর। এই মোহন, ইধর আও।

খুব রোগা-পটকা আর ছোটখাটো এইটুকু একটি মানুষ মোহন এগিয়ে এসে আর হাত তুলে রামতনুকে সেলাম জানায়। এই মোহন কেমন করে আর কোন্ গুণে অত বড় একটা প্রাণীকে চালনা করে, কে জানে? হাঁটু পর্যন্ত লম্বা একটা খাকি রঙের ছেঁড়া কোট, ছোট বহরের একটা ময়লা ধুতি আর মাথাতে শক্ত করে জড়ানো বেশ পরিষ্কার একটা লাল রঙের গামছা। মুখের হাসিটা কিন্তু বেশ মিষ্টি। রামতনুকে আবার একটা সেলাম জানিয়ে নিজের কাজে চলে যায় চাল্‌কি মোহনরাম।

মহাদেব চৌধুরী এইবার বেশ একটু দৃপ্ত ভঙ্গীতে মাথা দুলিয়ে হেসে ফেলেন ও কথা বলেন। ভাগবতের অবধূতের সাতাশ জন গুরুর মধ্যে কয়েকজন প্রাণীও ছিল। তার মধ্যে বক একজন। বকের কাছ থেকে ধৈর্য শিক্ষা করেছিল অবধূত। আপনিও ইচ্ছে করলে আমার উট এই বাহাদুরের কাছ থেকে প্রেম শিক্ষা করতে পারেন।

রামতনু—কী বললেন, প্রেম?

মহাদেব চৌধুরী—হ্যাঁ প্রেম কী বলবো তসীলদারজী, বিশ্বাস করুন উটটা ওর চাল্‌কি মোহনরামকে ওর নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসে।

দেখতে পেয়েছে রামতনু, পুজোর প্রসাদ নেবার জন্য আঙিনার একদিকে বাড়ির মেয়েদের ভিড়ের সঙ্গে এমন এক তরুণী দাঁড়িয়ে আছে, যাকে এই মহাদেব চৌধুরীর গেঁয়ো বনেদিপনার মধ্যে একটি বেমানান রূপ বলে মনে হয়। বাড়ির অন্য যে-সব মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের সবারই মাথায় ছোট-বড় ঘোমটা। কিন্তু ওই তরুণীর মাথায় ছোট বা বড় কোন রকমেরই ঘোমটা নেই। চোখ-মুখ খুবই সুন্দর, কিন্তু তার মধ্যে হাসিখুশির সামান্য চিহ্নও নেই। তরুণী যেন নিরেট বিষাদের একটি রূপসী মূর্তি।

মহাদেব চৌধুরী বললেন—এই যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দেখছেন, এরা হলো আমার তিন ভাইয়ের ছেলে আর মেয়ে। তিন ভাই লছমিপুরাতে থেকে খনির কাজ দেখাশোনা করে। আর, ওই যে দাঁড়িয়ে আছে গম্ভীর মেয়েটি, ওটি আমারই মেয়ে সুমতি। মনে শান্তি নেই, তাই গম্ভীর। কী দুর্ভাগ্য মশাই, মেয়ে আমার সধবা হয়েও একরকমের বিধবা। জামাই হলো ঘরজামাই, তার ওপর যক্ষ্মারোগী। লেখা-পড়ায় খুব ভাল দেখে পাটনা কলেজের বি-এ ক্লাসের ছাত্র, যে ছাত্র আই-এ পরীক্ষাতে ফার্স্ট হয়েছিল, গরীবের ছেলে গরীব সেই শশিনাথের সঙ্গে এই বিশ্বাসে আমার একমাত্র সন্তান সুমতির বিয়ে দিয়েছিলেম যে, শশিনাথ নিশ্চয় এক দিন মস্ত বড় পদের কেউ-একজন হবেই হবে। হয় জজ, না হয় হাকিম। জানতাম না, ভাগ্যের ঠাট্টা এত কসাই হতে পারে। সেই শশিনাথ এখন যক্ষ্মারোগী হয়ে আমার এখানে, ওই যে কেষ্টচূড়া গাছটার কাছে ছোট একটা ঘর দেখছেন, সেই ঘরে একটি খাটের ওপর পড়ে আছে। তবে আমার কর্তব্য আমি করেছি। যক্ষ্মারোগী শশিনাথেব চিকিৎসার জন্য গুমিয়ার বাঙালী কবিরাজ, বৈদ্যজী বিজয়বাবুকে মাসিক একশো টাকা দিয়ে ব্যবস্থা করেছি, প্রতি সপ্তাহে দুটি দিন গুমিয়া থেকে তিনি এখানে এসে শশিনাথকে দেখে যাবেন আর ওষুধ দেবেন। যক্ষ্মারোগীর ঘরের অন্য সব কাজের জন্য একটা দাইও আছে, এক বুড়ি, সিধুয়া ডোমের মা।

চলে যাবার জন্য রামতনু উঠে দাঁড়াতেই মহাদেব চৌধুরী বলেন—আবার আসবেন। আমার পূর্বপুরুষ আপনারই মতো বাঙালি ছিল, দেশ ছিল বরধোমান।

।। দুই ।।

মহাদেব চৌধুরীর এই বড় বাড়ি থেকে একটু বিচ্ছিন্ন হয়েও অনেক ঘর নিয়ে ফাটল-ধরা চেহারার যে বাড়িটার দেয়ালের গায়ে কয়েক হাজার কাঁচা ঘুঁটে সব সময় লেগে থাকে আর শুকোয়, সেটা যেন আদিবাসী গাঁয়ের ধুমকুড়িয়ার মতো ভিন্নতর অবস্থা ব্যবস্থা ও নিয়মের বাড়ি। বাইরের সব মানুষ চাকর-বাকর, মুন্সী-মুনিম আর গোমস্তা, সবাই এই বাড়িটার ভিন্ন-ভিন্ন ঘরে থাকে আর ভিন্ন ভিন্ন উনানের আগুনে রান্না করে। এই বাড়িটারই কাছে একটা কেষ্টচূড়া গাছের পাশে যে ঘরের ভিতরে ঘুঁটে মজুত করা

হতো, আজ সেটা হলো ঘরজামাই শশিনাথের থাকবার ঘর। এই ঘরের খোলা জানালার দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যায়, যক্ষ্মারোগী শশিনাথ একটা খাটিয়ার ওপর বসে আছে আর মাঝে মাঝে বুকে হাত রেখে কাশছে।

ঘরজামাই শশিনাথ সব সময় যার আসার আশায় দুই চোখ মেলে তার ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে, সে হলো মহাদেব চৌধুরীর ওই মেয়ে সুমতি, যার মুখে হাসি নেই, চোখে কাজল নেই, পায়ে আলতা নেই। সুমতি রোজই একবার ওর মন-প্রাণ আর তার আত্মার কঠোর অনিচ্ছাকে কোন মতে ঠেলে সরিয়ে, আস্তে আস্তে হেঁটে এই ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। মহাদেব চৌধুরীর নির্দেশ, সুমতি, যেন রোজই একবার শশিনাথকে শুধু একটু চোখের দেখা দিয়ে চলে আসে। লোকে যেন তাঁর মেয়ের নামে কোন নিন্দে রটাবার ছুতো না পায়, তাই এই নির্দেশ। তাই নিজের ইচ্ছা ও আগ্রহের কোন তাগিদে নয়, নিতান্ত নিরর্থক একটা নিয়মরক্ষার জন্য সুমতি রোজই একবার শশিনাথের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলে—কেমন আছ? যক্ষ্মারোগী শশিনাথ হেসে-হেসে ডাকে—বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে এস।

সুমতি মাথা নাড়ে—না।

শশিনাথ—একটিবার, এক মিনিটের জন্য এস।

সুমতি—কেন?

শশিনাথ—তুমি বুঝতেই পারছো কেন তোমাকে একবার কছে এসে দাঁড়াতে বলছি।

সুমতি—না। একটুও বুঝতে পারছি না।

শশিনাথ—আমি তো আর বেশিদিন নেই, তাই খুব ইচ্ছে করছে....।

দেখতে কী বিশ্রী রকমের অদ্ভুত শশিনাথের এই তৃষ্ণাতুর মূর্তি। এই তৃষ্ণাটাই যে শশিনাথের জীবনে আজ অবৈধ ও গর্হিত একটা অনাচার। সুমতির দুই চোখের কালো তারা যেন রাগ চাপতে গিয়ে সাদা হয়ে যায়—কী ইচ্ছে? কিসের ইচ্ছে?

শশিনাথ—শেষবারের মতো তোমাকে একটা চুমা খেতে ইচ্ছে করছে।

সুমতির দুই চোখের দৃষ্টি এবার যেন দপ্ করে জ্বলে ওঠে।—বলতে লজা করে না? আয়নাটা হাতে তুলে নিয়ে একবার নিজের মুখটাকে দেখ।

শশিনাথ—অ্যাঁ? কী হয়েছে আমার মুখে?

সুমতি—তোমার ঠোঁটের ওপর তোমার বমির রক্তের দাগ লেগে রয়েছে।

শশিনাথের গলার স্বর করুণ হয়ে যায়, —ও হ্যাঁ হ্যাঁ। মাঝ রাত্রিতে এক ঝলক রক্ত বমি করেছিলাম, সে কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

সুমতি—আমি যাই।

শশিনাথ—আবার এস কিন্তু।

যক্ষ্মারোগী ঘরজামাই শশিনাথের এই ঘর থেকে একটু দূরে বিশাল চেহারার দুই যজ্ঞডুমুর গাছের কাছে, মস্ত উঁচু আর বেশ চওড়া একটা একচালা ঘর। দেখতে একটু অদ্ভুত রকমের চমৎকার বলে বোধ করতে হয়, এই একচালা ঘরের পূর্বদিকের বেড়া

ঘেঁষে রয়েছে একটি উট, যার নাম বাহাদুর। আর পশ্চিম দিকের বেড়া ঘেঁষে বসে আছে উটের চাল্‌কি, যার নাম মোহনরাম। বাহাদুর বারবার গলা টান করে মোহনের রোগা শরীরটাকে শুঁকতে আর চাটতে চেষ্টা করছে।

মহাদেব চৌধুরীর এই বাড়ির জীবনের ছবিটা এইরকম এক-একটি বিচিত্র অবস্থা ও ঘটনার দৃশ্যপট দিয়ে সাজানো। কিন্তু মাস দুই পরে মহাদেব চৌধুরীর অনুরোধের বার্তা পেয়ে আবার যেদিন গণেশ পুজোর হালুয়া প্রসাদ নেবার জন্য এই বাড়ির বড় দুয়ারের সামনের মণ্ডপের একটা চৌকির ওপর এসে বসলো রামতনু, সেদিন প্রসাদপ্রার্থীর সমাবেশের দিকে চোখ পড়তেই বুঝতে পারে, একটা দৃশ্যপটের রূপ খুবই বেশি বদলে গিয়েছে।

পুজো দেখবার আর প্রসাদ নেবার জন্য অন্তঃপুরের সব প্রৌঢ়া ও বয়স্কাদের ছোট ভিড়ের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে সুমতি, কিন্তু এই সুমতি আর সেই বিষাদময়ী সুমতি নয়। সুমতির চোখে কাজল, মাথার চমৎকার ঢঙের খোঁপা আর পায়ে আলতা। হাসছে সুমতি। সুমতির চাঁপা রং-এর শাড়ির আঁচলে রূপালি জরির বলাকা উড়ছে। আর ওদিকে, প্রসাদপ্রার্থী পুরুষদের বড় ভিড়ের মধ্যে হাসিমুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নতুন এক আগন্তুক। মহাদেব চৌধুরী বলেন—ওই ছেলেটি হলো জয়দেব রায়, আমার বাড়ির ছেলেমেয়েদের পড়াবার মাস্টার। মাস-মাইনে পনেরো টাকা আর খাওয়া ও থাকা, এই সর্তে এখানে ছেলে-মেয়েদের দুবেলা পড়াবে। বছরে আধ মাসের ছুটি। মনে হচ্ছে, ঝোঁকের মাথায় একটু বেশি দিয়ে ফেলেছি। তাই না? আপনি কী মনে করেন?

হেসে ফেলে রামতনু। —যদি মাস্টার জয়দেব মনে করেন যে, আপনি একটু বেশি দিয়ে ফেলেছেন, তবে ঠিকই, একটু বেশি দেওয়া হয়েছে।

মাস্টার জয়দেব রায় গণেশ বন্দনার স্তব গাইছে। বেশ ভালো সুরেলা গলা। কিন্তু দুই চোখ অপলক করে সুমতির দিকে তাকিয়ে আছে জয়দেব। দেখে মনে হয়, জয়দেবের প্রাণটাই যেন সুরেলা হয়ে সুমতির বন্দনা গাইছে।

কে জানে কেন, বেশ অস্বস্তি বোধ করে রামতনু। মনে হয়, মহাদেব চৌধুরীর এই বাড়ির জীবনে একটা নতুন অশান্তির সঞ্চার হয়েছে।

নিজের অফিস-কাছারির কুঁড়ে ঘরে ফিরে এসে আরও একটা অস্বস্তি বোধ করে। অস্বস্তিটা এই যে, মহাদেব চৌধুরীর বাড়িতে যে মানুষটাকে চোখেই দেখতে পেল না রামতনু তারই জন্য সবচেয়ে বেশি দুঃখ বোধ করতে হচ্ছে। ঘরজামাই শশিনাথের জীবনটা কী ভয়ানক দুঃখের জীবন।

নিজের কাজে, সাতটা ডিহির প্রজাদের বকেয়া খাজনা উসুল করবার কাজে ব্যস্ত থেকে পুরো দুটো মাস পার হয়ে যায়—মহাদেব চৌধুরীর বাড়ির বিচিত্র দৃশ্যপটের কোন বিচিত্র পরিবর্তনের চেহারা নিজের চোখে দেখতে না পেলেও অনেক খবর রামতনুর কানে পৌঁছেই যায়।

সে-বাড়ির জীবনের সব রকমের খবর জানবার দেখবার ও শোনবার সুযোগ আছে যার, সেই মানুষটিই অর্থাৎ বিশ বছর ধরে সে-বাড়ির প্রকাণ্ড গেরস্থালীর জমা খরচের

হিসাব লিখছেন যিনি, সেই গোমস্তা গোরাবাবু মাঝে-মাঝে রামবাবুর অফিস কাছারিতে এসে নানা গল্প শুনিয়ে যান। মাস্টারজী জয়দেব রায় কুঁয়োর কাছে সবুজ ঘাসের ওপর বসে যখন বাঁশি বাজায়, তখন সুমতি যেন উতলা হরিণীর মতো বাড়ির ভিতর থেকে বের হয়ে আসে আর মণ্ডপের খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সে দৃশ্য দেখে কারও বুঝতে অসুবিধে হবে না যে, চুপ করে দাঁড়িয়ে আর মন প্রাণ ও কান দিয়ে জয়দেবের বাঁশির সুরেলা শব্দটাকেই শুনছে সুমতি।

সকালবেলা বাগানের জবার ভিড়ের মধ্যে ঢুকে যখন ফুল তোলে সুমতি, তখন দেখতে পায়, বাগানের বেড়ার ওপাশ ধরে, যেন জঙ্গলের প্রথম বসন্তদিনের মিষ্টি হাওয়ার লোভে হেঁটে বেড়াচ্ছে জয়দেব। এই রকমের এক-একটি ঘটনার ছবি রোজই ফুটে উঠছে ঠিকই, যদিও ঘটনার মুখে কোন ভাষা নেই, বিহ্বল হয়ে খুব কাছাকাছি হয়ে যাওয়া নেই, কিংবা অপলক চোখ তুলে মুখোমুখি তাকিয়ে থাকা নেই। তবু মুন্সী মুনিম আর মালীদের সবারই ধারণা, ঘটনা বোধহয় ভয়ানক একটা সমস্যার দিকে গড়িয়ে চলেছে।

গোমস্তা গোরাবাবু বলেন—পাখি যেমন রাজসাপের ফণা আর জ্বলজ্বলে চোখের সামনে পড়লে আর নড়তে পারে না, আরও কাছে এগিয়ে যেতে থাকে, তেমনই দশা হয়েছে মেয়েটার। মাস্টার ছোকরার মতলবের কাছে এগিয়েই চলেছে। পরিণাম বুঝতে পারছে না।

ভুল ধারণা নয়, মাস্টার জয়দেব একদিন ফুলবাগানের বেড়ার কাছে, সুমতির একেবারে চোখের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়, আর কী একটা কথা বলতে চেষ্টা করে। কিন্তু সুমতি যেন জয়দেবের এই না বলা কথাটাকে খুব স্পষ্ট করে শুনতে পেয়েছে। তাই মুখ ঘুরিয়ে বোধ হয় লালচে মুখের ও ভীরু বুকের একটা লজ্জাকে লুকোবার আর সহ্য করতে গিয়ে কাঁপতে থাকে।

কে জানে সুমতি কী বুঝেছে আর জয়দেবই বা কী বলতে চেয়েছিল। কিন্তু দুজনেই যেন একটা বিহ্বল স্বস্তির সুখে সুখী হয়ে আর নিশ্চিন্ত হয়ে দুদিকে চলে গেল।

এসব তো কারও বানানো কথা কিংবা ওই দু'জনের বদনাম রটাবার জন্য চুগলি বাজির মিথ্যে কথা নয়। ওরা দেখতে পায়নি যে, মালী কাছেই ফুলবাগানের বেড়ার ওদিকে বসে আছে। সব দেখেছে মালী। গোমস্তা গোরাবাবুও ভোরবেলার হাওয়া গায়ে লাগাবার জন্য একটু বেড়াতে বের হয়েই একদিন দেখতে পেলেন, শিশির-মাখা ঘেসো মাঠের এদিকে দাঁড়িয়ে, টুটুন পাহাড়ের মাথার দিকে তাকিয়ে সূর্যোদয় দেখছে জয়দেব মাস্টার। আর মাঠের ওদিকে দাঁড়িয়ে সুমতিও দেখছে, টুটুন পাহাড়ের মাথায় কুয়াশা গলে গিয়ে লালচে আলোর আভা জেগে উঠেছে। সুমতির দুই অপলক চোখে কী উজ্জ্বল ও মুগ্ধ একটা দৃষ্টি।

রায় সাহেব মহাদেব চৌধুরী কি তাঁর মেয়ের চোখে নতুন সূর্যোদয়ের আভার কোন খবর রাখেন না? তিনি তো নিজের চোখেই দেখেছেন, জয়দেব মাস্টার এখানে আসবার

পরে সুমতির প্রাণের সব বিষাদ দূর হয়ে গিয়েছে। সুমতির মুখের হাসিটা যেন টাটকা—নতুন গোলাপফুলের হাসির মতো রঙীন হয়ে উঠেছে। কিন্তু কী করবেন রায়সাহেব? তিনি তাঁর এই অত্যন্ত আদুরে মেয়েকে যে অত্যন্ত রকমের ভয়ও করেন। বাপের মুখে কোনরকম শাসনের কথা শুনলে যদি অপমানিত বোধ করে মেয়ে? যদি রাগ করে বিষ-টিষ খেয়ে একটা সাংঘাতিক কাণ্ড করে ফেলে, তবে? গোমস্তা গোরাবাবু বলেন—এই অবস্থায় আমরা আর কী করতে পারি, তুমিই বল না তসীলদার।

সর্বনাশ, সর্বনাশ—মনে মনে, তার মানে নীরবে এই কথা বলে ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন গোমস্তা গোরাবাবু। তিনি দেখতে পেয়েছেন, ভোরের কুয়াশার মধ্যে বাগানের কাছে দাঁড়িয়ে দুজনে একটা গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে পাখির ডাক শুনছে, সুমতি এখানে, জয়দেব সেখানে। মত্ত হয়ে একটা পাপিয়া ডাকছে, পিউ কাঁহা।

না, হাত ধরাধরি করে নয়। ওরা দুজনে দু জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ওদের দু'জনের কেউ কি দেখতে পাচ্ছে না যে, কেষ্টচূড়া গাছটা এমন কিছু বেশী দূরে নয়। সেই গাছের কাছে যক্ষ্মারোগী শশিনাথের ঘরের জানালাটাও বন্ধ নয়। ভোরের কুয়াশাটা তো এমন কিছু ঘন আবরণ নয় যে যক্ষ্মারোগীর ঘরের খোলা জানালাটার চোখে ওদের দু'জনের পাখির ডাক শোনবার দৃশ্যটা ধরা পড়ে যাবে না?

সেদিনই আর-একটা দৃশ্য দেখে আরও উদ্বিগ্ন হলেন গোমস্তা গোরাবাবু। বিকেল হতেই তিনি দেখতে পেলেন, জয়দেব মাস্টার তার ঘরটাকে ঝাড়া-মোছা করে নিচে দরজার চৌকাঠের মাথার দুদিকে দুটো বাহারে ফুলের তোড়া ঝুলিয়ে দিল। মুনিমজী জিজ্ঞেসা করলেন—কী ব্যাপার মাস্টারজী?

কথা বলতে গিয়ে জয়দেব মাস্টারের মুখের হাসিটা বিহ্বল হয়ে যায়—আমার মনে হচ্ছে, আজ সন্ধ্যায় আমার ঘরে কোন মেহমান আসবে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে থাকলেও জয়দেব মাস্টারের কথাগুলি শুনতে পেলেন গোমস্তা গোরাবাবু। তাঁর বুকের ভিতরে একটা বোবা আর্তনাদ ছুটোছুটি করতে থাকে। আজ সন্ধ্যায় মেহমান আসবে জয়দেবের ঘরে? রায়সাহেব মহাদেব চৌধুরীর মেয়ে সুমতির ভাগ্যটা কি আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে অভিসারিকার মতো চুপি চুপি এসে এই সর্বনেশে মতলবে ঘরে ঢুকবে?

গোমস্তা গোরাবাবু নিজেকে সান্ত্বনা দেন, এটা একটা সন্দেহ মাত্র। সুমতি ভুল করলেও এতটা ভয়ানক ভুল করবে না। কিন্তু হায় ভগবান, বুঝিয়ে সুঝিয়ে সুমতির ভুল ভেঙে দিতে পারে, এমন কেউ কি এই সংসারে নেই?

সন্ধ্যা হতেই ঝড় উঠলো। সারা জঙ্গলের গাছপালার প্রাণ যেন হায়-হায় রব তুলে ছটফট করছে। মালী চেঁচিয়ে উঠলো—হায় হায়। মোহনরাম মরে গেল।

উটের ঘরের দাওয়াতে জল দিতে আর লণ্ঠন রাখতে এসে দেখতে পেয়েছে মালী, নীরব নিথর মোহনরামের বুকটা একটুও কাঁপছে না। দুই চোখ বন্ধ, নিঃশ্বাস চলছে না। তবে তো মরেই গিয়েছে মোহনরাম। মালীর ডাক শুনে সবাই ছুটে আসে, মহাদেব

চৌধুরীও আসেন। সবাই দুঃখ করেন, কী আশ্চর্য, সত্যিই যে মরে গিয়েছে মোহন।

ছুটে আসে না শুধু একজন। মাস্টারজী জয়দেব। জয়দেব তার ঘরের খোলা দরজার কছে দাঁড়িয়ে আর উটের একচালা ঘরের কাছে লণ্ঠনের দৌড়াদৌড়ির দৃশ্যটার দিবে তাকিয়ে বেশ বিরক্ত হয়। হঠাৎ ঝড় উঠলো, সন্ধ্যার শান্ত অন্ধকার যেন ভয় পেয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল। উটওয়ালা মোহরামের মৃত্যুর এই হল্লা যেন ক্ষেপা উটেরই মতো একটা গুঁতো দিয়ে জয়দেবের প্রিয় অপেক্ষার প্রাণটাকে থেঁতলে দিয়েছে। না, আজ আর সাহস করে এই ঘরের এখানে এসে দাঁড়াতে পারবে না সুমতি।

মোহনরামের মরা শরীরটাকে সে রাতেই তুলে নিয়ে জঙ্গলের ভিতরে ছোট স্রোতের কিনারাতে বালুর ওপরে দাহ করা হলো। কিন্তু মহাদেব চৌধুরীর মনে একটা কঠিন সমস্যার প্রশ্ন সবল হয়ে ওঠে, মোহনরামের শিষ্য রামনাথ কি বাহাদুরের মত জবরদস্ত উটকে চালিয়ে নিয়ে কাজ করতে পারবে? রামনাথ তো বিশ বছর বয়সের একটা ছেলেমানুষ, বাহাদুরের গলা ধরে ঝুলতে জানে, কিন্তু বাহাদুরের শখের আর খেয়ালের চোট সামলাতে পারবে কি?

॥ তিন ॥

সমস্যার সুরাহা করতে গিয়ে সবাই হয়রান হয়। সমস্যা সৃষ্টি করেছে বাহাদুর উট। রামনাথ শত চেষ্টা করে বাহাদুরের গলার দড়ি ধরে টানাটানি করে আর বাহাদুরের গলায় হাত বুলিয়ে শতবার আদব করেও বাহাদুরকে একচালা ঘরের বাইরে নিয়ে আসতে পারলো না। নড়তেই চাইছে না বাহাদুর। কচি কোনার গাছের পাতায় ঢাকা মস্ত বড় একটা ডাল বাহাদুরের মুখের কাছে এগিয়ে দিয়েছে রামনাথ, কিন্তু মুখ সরিয়ে নিয়েছে বাহাদুর, একটি পাতাও খায়নি। বাহাদুর ওর লম্বা গলাটাকে টান করে মেজের সেই জায়গার ওপর এলিয়ে দিয়েছে, যেখানে পাতা ছিল মোহনরামের ছেঁড়া কম্বলের বিছানাটা। যেন ওই শূন্য মেঝের ধুলো গলাতে আর মাথাতে মেখে আরাম পাচ্ছে আর শান্তি বোধ করছে বাহাদুর, কুব্জপৃষ্ঠ ও ন্যুব্জদেহ এই উট।

রামনাথ বলে—আমি আর কী করতে পারি বলুন? মোহন ওস্তাদ সামনে থাকলে আমি বাহাদুরকে যেমন ইচ্ছা তেমন করে খাটাতে আর চালাতে পারতাম।

মহাদেব চৌধুরী—কিন্তু তোমার মোহন ওস্তাদকে তো আর পাওয়া যাবে না।

রামনাথ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে আর মাথা চুলকোয়। মহাদেব চৌধুরী চেঁচিয়ে ধমক ছাড়েন। —তবে কি বুঝতে হবে যে, এইরকম জ্যান্ত ও প্রকাণ্ড একটা পোষা প্রাণীকে দিয়ে কোন কাজই করানো আর সম্ভব হবে না?

রামনাথ—যদি খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে মরেই যায় উটটা, তবে আর কেমন করে কী উপায় করবেন হুজুর?

মহাদেব চৌধুরী—অ্যাঁ? জন্তুটা সত্যিই মরে যাবে নাকি? এতই কি শোক হয়েছে যে, নিজের প্রাণটা ধরে রাখবারও ইচ্ছে আর নেই?

রামনাথ—আমি একটা উপায় বলে দিতে পারি হুজুর।

মহাদেব চৌধুরী—বল।

রামনাথ—খড় আর ন্যাকড়া দিয়ে একটা রোগা-পাতলা মানুষের চেহারা তৈরী করে সেই চেহারার গায়ে লম্বা একটা কোট আর মাথায় লাল গামছার ফেটি বেঁধে দিয়ে যদি এখানে বসিয়ে কিংবা শুইয়ে রাখেন, তবে বোধহয়.....

কী আশ্চর্য, খড় দিয়ে তৈরী একটা রোগাপট্কা মানুষের নকল শরীরের গায়ে লম্বা কোট আর মাথায় লাল গামছার ফেটি এঁটে দিয়ে আর ন্যাকড়া দিয়ে তৈরী কপালের নীচে একটা কানা চোখ আর মুখ এঁকে দিয়ে বাহাদুরের পাশে মেঝের ওপর বসিয়ে দিতেই ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়ালো উট, বাহাদুর। সঙ্গে সঙ্গে বাহাদুরের গলার দড়ি ধরে টান দিল রামনাথ। সেই মুহূর্তে একচালা আস্তানার বাইরে এসে দাঁড়াল বাহাদুর। বাইরে যেতে একটুও আপত্তির ভাব আর নেই। গলার দড়ি খুলে দিতেই দৌড়ে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে পড়লো সাতদিনের উপোষী প্রাণীটা। তিন চার ঘন্টা পরে জঙ্গল থেকে ফিরে এসেই একচালা ঘরের ভিতরে খড়ের মোহনরামের পেটের ওপর গলাটাকে একেবারে অলস করে শুইয়ে দিয়ে বসে পড়ে বাহাদুর। আরামের ঘোরে বাহাদুরের চোখ বুজে যায়। আস্তে আস্তে দুই পাটি দাঁত দিয়ে ঘষে-পিষে জাবর কাটতে থাকে।

নিজের ঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে পায় জয়দেব, উটের একচালা আস্তানার কাছে দাঁড়িয়ে কী যেন দেখছে সুমতি। কেন? রামনাথকে কী কথা বলছে আর হাসছে সুমতি?

সুমতি চলে যাবার পর জয়দেব ব্যস্ত হয়ে উটের ঘরের কাছে এসে দাঁড়ায়। —কী রামনাথ, কী ব্যাপার, কী কথা বলে গেল তোমাদের দিদি?

রামনাথ—উটের কাণ্ড দেখে দিদি খুব হাসলেন আর বললেন, কী ভয়ানক বোকা বুদ্ধির উট!

শুনে নিশ্চিন্ত হয় জয়দেব। উটের বোকাবুদ্ধির কাণ্ডটাকে চমৎকার একটা প্রেমময় মায়ার খেলা বলে বোধ করেনি সুমতি। .....কিন্তু কবে থামবে বাহাদুর নামে একটা জানোয়ারের ব্যাপার নিয়ে এত চিন্তার সোরগোল আর হল্লা?

না, থামছে না। কেনই বা থামবে? এক-একটা নতুন ঘটনা আসছে, বাহাদুর নামে এই উটের এক-একটা অদ্ভুত মায়ার খেলা সকলকে আশ্চর্য করে দিচ্ছে, খুবই করুণ রকমের আশ্চর্য।

মাঝরাতে একটা নেকড়ে এসে উট ঘরের মধ্যে ঢুকে খড়ের তৈরী মোহনরামের শরীরটাকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। নেকড়েটাকে বাধা দিয়ে আর মরিয়া হয়ে লড়াই করেছে বাহাদুর। শেষে খড়ের মোহনরামকে ছেড়ে দিয়ে বাহাদুরের একটা পা থেকে ছোট্ট এক খাবলা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে নেকড়েটা। খবর শুনে জয়দেব আবার খুশি হয়ে ছুটে আসে। বাহাদুরের পায়ের রক্তমাখা জখমটার দিকে

তাকিয়ে রামনাথকে বলে—তোমাদের এই জানোয়ার আর বাঁচবে না, এইবার মরবে, নিশ্চয় মরবে।

কে জানে কী ভেবে বাহাদুরের মরণ আসন্ন বলে মনে করলো জয়দেব। জয়দেবের আশার স্বপ্নটা কি তাড়াতাড়ি সফল হবে, যদি উটটা তাড়াতাড়ি মরে যায়?

সেই থেকেই একটা সন্দেহ জয়দেবের মনে দেখা দিয়েছে?

এই ক'দিনের মধ্যে একটা দিনও ভোরবেলায় সুমতিকে কোন ফুলগাছের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে আর দেখা গেল না।

দেখতে পায় জয়দেব, সুমতি আজকাল রোজই দুই বেলা উটঘরের কাছে এসে দাঁড়ায়। অনেকক্ষণ ধরে উটঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। কেন? বোকাবুদ্ধির একটা উটের দিকে তাকিয়ে এত আশ্চর্য হবার আর এতক্ষণ তাকিয়ে দেখবার কী আছে?

ঠিকই সন্দেহ করেছে জয়দেব। বাহাদুরের দিকে তাকিয়ে সুমতি বেশ আশ্চর্য হয়, মুগ্ধ হয়, আর চোখ দুটো কেন যেন বেশ ছলছল করে। রামনাথকে দিয়ে একদিন খড়ের মোহনরামের গায়ের সব ছেঁড়া সেলাই করিয়েছে সুমতি। উট যে সত্যিই মোহনরামের খড়ের চেহারার ছেঁড়াগুলির ওপর মুখ ঘষে দিনরাতের সময় পার করে দেয়। মোহনরামের গায়ে যেন ব্যাকুল রকমের একটা যত্নের ছোঁয়া ছুঁইয়ে দেয়। ঘুমোয় না বাহাদুর।

এক একটি দিন যায়, জয়দেবের প্রাণের উদ্বেগ বাড়তেই থাকে। কী হলো সুমতির? সকালবেলায় বাগানের ফুল তুলতে আর সুমতিকে দেখা যায় না। জয়দেবের বাঁশির সুর উথলে উঠলেও সুমতির কোন সাড়া পাওয়া যায় না। যেন জয়দেবের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যাবার আনন্দটাকেই ভয় পেয়ে দূরে-দূরে সরে থাকছে সুমতি। কী আশ্চর্য, উট বাহাদুরের যত মায়ার খেলা দেখবার জন্য সুমতির প্রাণটাই যেন একটা নেশায় পেয়েছে। খড়ের মোহনরামের বুকের ওপর লম্বা গলাটাকে পেতে দিয়ে বসে রয়েছে বাহাদুর, অনেকক্ষণ ধরে অপলক চোখে দেখতে থাকে সুমতি। কিন্তু বুঝতে পারে না, উটের এই কাণ্ডটা কেন এত করুণ বলে মনে হয়। কেন নিজেরই নিঃশ্বাসের বাতাস করুণ হয়ে ছটফট করে?

প্রতিদিন অন্তত একবার বাহাদুরকে দেখতে আসে সুমতি। সেদিন, যেদিন বিকালের আলো বেশ রঙীন হয়ে যজ্ঞডুমুর গাছের মাথার ওপর ছড়িয়ে পড়ে, আর সামনের জমির উপর একজোড়া ঘুঘু ফিরে ঘাসের বীজ খায়, সেদিন উটের একচালা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াতেই সুমতির পা টলতে থাকে, একচালার খুঁটি দুহাতে আঁকড়ে ধরে সুমতি যেন ওর হঠাৎ অলস প্রাণটাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। চেঁচিয়ে ডাক দেয় সুমতি—রামনাথ, তুমি কোথায়?

—এই যে আমি। বলতে বলতে ছুটে আসে রামনাথ। —আমি বাহাদুরের পায়ের ঘা সারাবার লতা খুঁজছিলাম, দিদি।

সুমতি—কিন্তু বাহাদুরের মুখে এত রক্ত কেন?

রামনাথ হাসে—আজ জঙ্গলের ভিতরে কন্টিকারীর একটা ঝোপকেই খেয়ে ফেলেছে বাহাদুর। কন্টিকারীর কাঁটা চিবিয়ে খেয়েছে, তাই ওর মুখে রক্ত ঝরছে।

এটা তো জানা কথা। সবাই জানে উটেরা কাঁটা খেতে ভালবাসে। কিন্তু সে জন্যে নয়, খড়ের মোহনরামের মুখে রক্তের ছোপ কেন? রহস্যের প্রশ্নটার জবাব রামনাথই দিয়ে দেয়। বাহাদুর অনেকক্ষণ ধরে মোহন ওস্তাদের খড়ের তৈরী মুখের ওপর মুখ ঘষেছে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে সুমতি। খড়ের মোহনরামের মুখের ওপর বাহাদুর উটের রক্তাক্ত মুখের ছোপ লেগে রয়েছে। চোখ মুছে নিয়ে তাকালে রক্তমাখা চুমোর ছাপ বলে মনে হয়। কিন্তু....কিন্তু এ দৃশ্য তো আর সহ্য হয় না। বুকের ভিতরে দুঃসহ একটা ব্যথার ভার টলমল করে নড়ছে। একচালা ঘরের খুঁটির গায়ে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুমতি।

জানে না সুমতি, কখন জয়দেব এসে সুমতির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। —কী ব্যাপার তোমার?

জয়দেবের প্রশ্নের ডাক শুনে চমকে ওঠে সুমতি। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলতে থাকে। পিছন থেকে বার বার ডাকতে থাকে জয়দেব—কী হলো? কী হলো?

যেন একটা ভয়ের চিতাবাঘ সুমতির পিছন থেকে ডাক ছাড়ছে। শিউরে ওঠে হৃৎপিণ্ডটা। ছুটে চলে যায় সুমতি।

বুকের ভিতরে দুঃসহ একটা সন্দেহের জ্বালা নিয়ে সেই মুহূর্ত থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেষ্টচূড়ার তলার ছোট ঘরটার দিকে তাকিয়ে নিজের ঘরের দাওয়ার ওপর বসে থাকে জয়দেব। সন্ধ্যা হয়। উতলা ঝিঁঝির ডাকের সঙ্গে মিশে ঘন অন্ধকারটাও যেন মুখর হয়ে উঠেছে। কান পেতে আর চোখ মেলে বসে থাকে জয়দেব। আজ রাতে সুমতিকে নিশ্চয় দেখতে পাওয়া যাবে। দেখতে হবে, কার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে সুমতি। শুনতে হবে কী কথা বলছে সুমতি।

মাথাভরা সন্দেহের জ্বালা নিয়েই একটু যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল জয়দেব। তাই দেখতে পায়নি, বুঝতে পারেনি, অভিসারিকা যে এই পথ ধরেই ওদিকে চলে গেল। বাতাসে চামেলী ফুলের গন্ধ উড়ছে। এ তো সুমতিরই খোঁপার চামেলী তেলের গন্ধ।

দেখতে পায় জয়দেব, যক্ষ্মারোগীর ঘরের ভিতরে একটা জ্বলন্ত লণ্ঠনের আলো দুলে উঠেছে। সেই মুহূর্তে দৌড়ে গিয়ে যক্ষ্মারোগী শশিনাথের ঘরের খোলা দরজার কাছে এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে জয়দেব।

ঠিকই, যক্ষ্মারোগী ঘরজামাইয়ের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে যেমন দেখতে পায় তেমনি শুনতে পায় জয়দেব, যক্ষ্মারোগী শশিনাথের খাটের কাছে এগিয়ে কথা বলছে সুমতি। —আমি ডোমবুড়ি সিধুয়ার মা'কে বলে দিয়েছি, তোমার ঘরের কোন কাজ তাকে আর করতে হবে না।

শশিনাথ—কেন? কেন?

সুমতি—এই ঘরের সব কাজ এবার থেকে আমিই করবো।

শশিনাথের দুই চোখের তারা থেকে দুরন্ত একটা বিস্ময় যেন ঠিকরে বের হয়ে পড়ে। — তুমি? কী অদ্ভুত কথা বলছো, সুমতি?

শশিনাথের খাটের আরও কাছে এগিয়ে, শশিনাথের কাঁধের শুকনো দুই কাঠের টুকরোর মতো খটখটে দুই হাড়ের ওপর হাত রেখে কথা বলে সুমতি। —সেদিন আমার কাছ থেকে কী যেন চেয়েছিলে?

শশিনাথ —হ্যাঁ, ভুল করে চেয়েছিলাম। আর চাইবো না। যতদিন আছি ততদিন তুমি শুধু একবার এই ঘরে এসে আমাকে দেখে যেও, তাহলেই হবে।

শশিনাথের মুখের ওপর মুখ নামিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে সুমতি।

শশিনাথের যে মুখটা কাগজের মতো সাদাটে, সেই মুখের ওপর উচ্ছল রক্তের আভা চমকে ওঠে। দুই হাতে সুমতিকে জড়িয়ে ধরে চুমো দিতে গিয়ে শশিনাথের দুই শুকনো ঠোঁট যেন দুরন্ত এক তৃপ্তির স্বাদ পেয়ে শিউরে ওঠে।

সুমতি—বল এবার, আমার ওপর কোন রাগ তোমার মনে আর রইল না তো?

—না, একটুও না। কথা বলতে গিয়ে ধড়ফড় করে শশিনাথের বুকটা। পাখা হাতে নিয়ে শশিনাথের মাথায় বাতাস দিতে থাকে সুমতি।

ঘরে বাইরের অন্ধকারের সব ঝিল্লি স্বর হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। দরজার কাছ থেকে ভয়ানক আশার একটা আহত শরীর যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে, আর দুড়দাড় করে পা চালিয়ে ছুটে চলে গেল।

শেষ রাতের সব তারা যখন নিবে গেল, টুটুন পাহাড়ের মাথায় কুয়াশা ভোরের প্রথম আলোর আভা লেগে রঙীন হয়ে উঠলো, ঠিক সেই সময় চেঁচিয়ে ওঠে মালী—এ কী! মাস্টারজীর ঘরের দরজা খোলা কেন? মাস্টারজী ঘরের ভিতরে নেই কেন?

মালীর চেঁচামেচির শব্দ শুনতে পেয়ে, ঘুমভাঙা চোখের ওপর শক্ত দুটি ভ্রূকুটি নিয়ে সবার আগে ছুটে আসেন গোমস্তা গোরাবাবু। এসেই যেন মস্ত একটা স্বস্তির হাঁপ ছেড়ে হেসেই ফেলেন। —মাস্টার পালিয়েছে।

তেমনই হাসিমুখ নিয়ে গোরাবাবু উৎসাহের আবেগে তখনই জঙ্গলের আধ মাইল পথ হন্‌হন্‌ করে হেঁটে পার হয়ে রামতনুর তসীল কাছারিতে এসে ডাক দেন। —ওহে, তসীলদার, শুনছো।

রামতনু সাড়া দেয়—আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনছি।

গোরাবাবু—সুখবর, ও বাড়ির ভাগ্যের সেই বিপদ কেটে গিয়েছে। মাস্টার সরে পড়েছে।

রামতনু—কে সরিয়ে দিল, জানেন কি?

গোরাবাবু—না, সেটা একটু খোঁজ করে জানতে হবে।

রামতনু—কিন্তু আমি জানি।

গোরাবাবু—আঁা? তুমি জান? কে সে? কে সে?

রামতনু—আপনাদের উট, যার নাম বাহাদুর।

চেঁচিয়ে ওঠেন গোরাবাবু—সে কী? তুমি কি ভয়ানক একটা আশ্চর্যের কথা বলছো হে তসীলদার?

বাবু রতন রায়ের ঘোড়া

মণিপুরী টাট্টুর চেয়ে একটু বড়, আর মূলতানী টাট্টুর চেয়ে একটু ছোট, বাবু রতন রায়ের যে ঘোড়াটার নাম দলপৎ, তার গায়ের কালো রং-এর চেকনাই দেখে পুলিশ সুপার রবার্টসনের দুই চোখের বিস্ময় কিছুক্ষণের জন্য নিষ্পলক হয়ে গিয়েছিল। রবার্টসনের কালো ওয়েলার, যার নাম ব্ল্যাক জুয়েল, তার গায়ের চকচকে কালো রং দেখতে চমৎকার বটে, কিন্তু বাবু রতন রায়ের দলপৎ এর গায়ের রং আরও চমৎকার।

দলপৎ-এর নানা গুণের কথা শুনে রবার্টসন সাহেব বেশ একটু অখুশিই হয়েছেন। তাঁর কালো ওয়েলার, তাঁর এত সাধের ও যত্নের ওই বনেদী বিদেশী প্রাণীটির যে-সব গুণের কথা বলে রবার্টসন স্বয়ং গর্ব বোধ করেন, সে-সব কথা বাবু রতন রায়ের দলপতের অপূর্ব-অদ্ভুত গুণগ্রামের তুলনায় নিতান্ত কয়েকটা সামান্যতার ফিরিস্তি। হাজারিবাগের পুলিশ ট্রেনিং কলেজের ময়দানে, হাজার দর্শকের চোখের সামনে বড়দিনের ছুটির আগের দিনের সেই দৌড়বাজির অনুষ্ঠানে বাবু রতন রায়ের দলপৎ রবার্টসনের ব্ল্যাক জুয়েলকে দশ গজ পিছনে রেখে শেষ ঘড়ির দাগ পার হয়ে গিয়েছিল। টাট্টি জাম্প লাফিয়ে বেড়া ডিঙোবার বাজিতে দলপৎ যে বেড়া অনায়াসে পার হয়ে গিয়েছিল, ব্ল্যাক জুয়েল সেই বেড়াকে লাফিয়ে ডিঙোতে গিয়ে থতমত খেয়ে নিছক শূন্যেতে একটা লাফ দিল আর বেড়াটাকে চারপায়ে মাড়িয়ে চলে গেল। দর্শকেরা হেসে হেসে দুয়ো দিয়েছিল।

বাবু রতন রায় তাঁর বিয়ের বছরখানেক আগে শোনপুর মেলা থেকে কালো টাট্টু ঘোড়া এই দলপৎকে কিনেছিলেন। ঘোড়াওয়ালা বলেছিল, মাহিদপুরার পরগনাইত চেতন সিংয়ের আদরিণী ঘোড়ী বাহাদুরী হলো দলপৎ-এর মা, আর বাপ হলো রাজা মহাদেব সিং-এর আস্তাবলের সবচেয়ে আদুরে ঘোড়া কালাবাবা। ঘোড়াওয়ালা বেশ উত্তেজিত স্বরে আর একটা গল্প শুনিয়েছিল, এই দলপতের বাবা সেই কালাবাবা একবার বনের ভিতরে একটা বাঘকে তাড়া করেছিল। সেদিন তার পিঠে সওয়ার ছিল রাজারই বড় ছেলে। বাঘটা বার-বার তাক্ করে লেজ আছড়ালেও শেষ পর্যন্ত ভয় পেয়ে আর ঘোড়াটার তাড়া খেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সেদিন থেকেই রাজা মহাদেব সিং তাঁর ঘোড়াকে নাম দিলেন কালাবাবা। তার আগে নাম ছিল পচুয়া।

বাবু রতন রায়ের বাপের কালের গড়বাড়ির যে বিধ্বস্ত চেহারাটা আজও সবারই চোখে পড়ে, সেটা সেকালের বনেদী বৈভবের একটা করুণ স্মৃতির স্তূপ বলে মনে হয়। এ জায়গাটার নাম কিসুনগড়। চারদিকেই জঙ্গল। সে জঙ্গলের বেশির ভাগ সরকারের

রিজার্ভ, বাকিটা রাজপুরা এস্টেটের ঠাকুর সাহেবদের সম্পত্তি। তাই এ বছর তসীলদার রামতনুকে এখানে এসে সেগুন বিক্রীর সব দায়িত্ব নিতে হয়েছে।

এখানেই আছে ফরেস্ট রেঞ্জারের ডেরা। রেঞ্জার বদলি হয়ে চলে গিয়েছেন, নতুন রেঞ্জার আজ পর্যন্ত আসেননি, কবে আসবেন তাও বলতে পারছেন না কেরানী জপেশ্বর। এখন ফরেস্ট অফিসে গোটা দশেক গার্ড আছে, আছে ওই কেরানী জপেশ্বর, যার মাথার সব চুল সাদা, যদিও বয়স ত্রিশ-বত্রিশের বেশী নয়। জপেশ্বর বলছে—আমারও আপনার মতো কালো চুল ছিল, রামতনুবাবু। হঠাৎ একদিন তার মানে এক রাতের মধ্যেই মাথার সব কালো চুল সাদা হয়ে গেল। কেন, জানেন?

রামতনু—না।

জপেশ্বর—বাবু রতন রায়ের ঘোড়া ওই দলপতের একটা দুর্বুদ্ধির কাণ্ড আমার এই ক্ষতি করে দিয়েছে। আমি একদিন শখ করে ওর পিঠে সওয়ার হয়েছিলাম। ঘোড়াটা হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে, আর লাফ দিয়ে-দিয়ে এক-একটা ঝোপ আর খাদ ডিঙোতে ডিঙোতে, ছুটে চললো। সে যে কী ভয়ানক ব্যাপার কী করে আপনাকে বোঝাবো। যেন একটা যমের খেলা। যাই হোক, এই রকম যমের খেলা খেলতে খেলতে ঘোড়াটা শেষ পর্যন্ত আবার ফিরে এল। আমি প্রাণে বেঁচে গেলাম বটে, কিন্তু সকালবেলা আয়নাতে মাথার দশা দেখে চমকে উঠলাম। সব চুল সাদা হয়ে গিয়েছে।

—কেন?

—ভয়ে। ভয়ে মশাই ভয়ে। ওই ঘোড়ার পিঠে চড়লে সে ব্যাটা আপনাকেও নিয়ে যমের খেলা খেলবে, আর ভয় পেয়ে আপনার ওই কালো চুল এক রাতেই সাদা হয়ে যাবে।

কেরানী জপেশ্বর যে গল্পটাকে বাড়িয়ে বলেনি, সেটা স্বয়ং বাবু রতন রায়ের কথা শুনেই বুঝতে পারে রামতনু। তিনি একদিন ফরেস্ট অফিসে এসে আর বেশ গর্ব করে অনেক কথা বললেন ঃ আমার চাকর বিল্টুরামকে দুটো বিড়ি খাইয়ে ফুসলিয়ে আমার সাধের ঘোড়া দলপতের পিঠে চেপেছিলেন এই জপেশ্বর। ব্যাস, দলপৎ ওকে হাতে-হাতে জব্দ করে ছেড়ে দিয়েছে। ব্যাপার কী জানেন? দলপৎ আমি ছাড়া অন্য কাউকে পিঠে নিতে পছন্দ করে না, ঘেন্না করে, রাগও করে। দলপৎ আমার ইজ্জতের ভাল-মন্দ সব একেবারে ঠিক ঠিক বুঝতে পারে। হ্যাঁ, আপনাদের ওই রাজপুরা-এস্টেটের ঠাকুর সাহেব, ওরা তো সেদিনের, এই এক পুরুষের রইস। আমরা আকবর শা'র আমল থেকে। ঠাকুরসাহেবের এক খুড়ো আমার বাবার হুঁকাবরদার ছিলেন।

এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে এসে আরও অনেক কথা বলেন বাবু রতন রায়। সবই তাঁর নিজের আর তাঁর প্রিয় ঘোড়া ওই দলপতের গর্ব দিয়ে তৈরী যত চমকদার কাহিনী। —শুনেছি আপনাদের ঠাকুরসাহেব এই মহকুমার সদর রাণীবাজারে যায়, দেখি কে ওকে দেখে কটা সেলাম দেয়? আপনি চলুন, যদি দেখতে চান, রাণীবাজারে আমার ইজ্জতের চেহারা। আমাকে দেখলেই রাস্তার দু'পাশের যারা দাঁড়িয়ে থাকে—তারা এগিয়ে

এসে সেলাম করে, যারা বসে থাকে, তারা উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করে। এমন কি অন্ধ ভিক্ষুকও সেলাম দিতে ভুলে যায় না।

সেগুন বিক্রীর কাজ নিয়ে কিসুনগড়ে এসে বাবু রতন রায়ের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ হবার পর মাত্র দশ দিনের মধ্যে রামতনুর মন এবং প্রাণটাও যেন স্বস্তি হারিয়ে ফেলেছে। বাবু রতন রায় নামে বনেদীপনার এই মহাজন কেন যে জঙ্গলের মধ্যে একটা পুরনো গড়বাড়ির ধ্বংসস্তূপের কাছে মাটির একটা কোঠাবাড়িকে তার জীবনের আশ্রয় করেছে, সেটা জানতে পেরে সাবধান হয়েছে রামতনু। যথাসম্ভব ও যথাসাধ্য এই অদ্ভুত চরিত্র ও মেজাজের লোকটাকে এড়িয়ে যায়। এহেন বনেদী মনুষ্যত্বের একটি অদ্ভুত মহাজনকে এই জঙ্গলের মধ্যে একটুও মানায় না। মনে হয়, জঙ্গলের শাল দেওদার মহুয়া আর ডুমুরগুলিও যেন স্বস্তি ও শান্তি বোধ করতে পারছে না।

প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় বাবু রতন রায়ের কোঠাবাড়ির অন্দর থেকে একটা করুণ কান্নার স্বর মাটির পাঁচিল পার হয়ে চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে ভেসে বেড়ায়। ফরেস্ট রেঞ্জারের এই অফিসবাড়ির আঙ্গিনার অন্ধকারেও সে কান্নার স্বর ভেসে আসে। যদি অন্য কোথাও জঙ্গলের আরও ভিতরে একটা একেবারে নির্জন জায়গাতে, তালপাতায় ছাওয়া একটা কুঁড়ে ঘরের মধ্যে থাকতে পেত রামতনু, তবে ওই কান্নার শব্দ শুনতে হতো না, অস্বস্তি আর অশান্তিও ভোগ করতে হতো না। এস্টেটের সেগুন অঞ্চলটা বেশ একটু দূরে হলে বাবু রতন রায়ের কোঠাবাড়ির প্রতি সন্ধ্যার এই কান্নার ছোঁয়াচ হতে মুক্ত থেকে কাজ করতে পারা যেত। কিন্তু তা তো হবার নয়, ঠাকুর সাহেবের চিঠির আদেশ মতো সরকারী জঙ্গল-কাছারির আঙিনার এক পাশের একটি মাটির ঘরে ঠাঁই নিতে হয়েছে।

এখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে রাণীবাজারে পৌঁছতে হলে জঙ্গলের তিন মাইল পথ পার হতে হয়। জঙ্গলের পথের দু'পাশে ময়াল সাপের ভয়ে খরগোসের দল ছুটোছুটি করে। ডুমুর গাছের মৌচাকের দিকে তাকিয়ে জোড়া ভালুক হাঁটাহাঁটি করে। তাছাড়া অত্যন্ত ধূর্ত ও হিংস্র হুঁড়ার হায়েনার আনাগোনা তো লেগেই আছে। কিন্তু ঘোড়া দলপতের জোড়া পায়ের লাথি খেয়ে ধূর্ত ও হিংস্র হায়েনার কলজে ফেটে যায়। এই রকমই অবস্থা ও ঘটনার ভিতর দিয়ে বাবু রতন রায় প্রতি সপ্তাহে একবার রাণীবাজার যান। পর দিন ফিরে আসেন। তাই সপ্তাহে মাত্র একটি সন্ধ্যায় কিসুনগড়ের ওই কোঠাবাড়ির অন্দর থেকে কোন কান্নার স্বর ভেসে আসে না।

এর মানে, সেই সন্ধ্যায় বাবু রতন রায়ের স্ত্রী ফুলেশ্বরীর ভাগ্যটা কোঠাবাড়ির বড় ঘরের দরজার কাছে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় না। নিশ্চিন্ত মনে চুপ করে দরজার কাছে বসে আকাশের সন্ধ্যাতারার দিকে তাকিয়ে থাকবার একটা শান্ত সুযোগ পান ফুলেশ্বরী। কারণ, বড় ঘরের দরজা পার হয়ে ফুলেশ্বরীকে ভিতরে ঢুকতে বাধা দেয় না বাবু রতন রায়ের প্রিয় বেতের লাঠিটা। বাবু রতন রায়ের ইচ্ছে নয়, ফুলেশ্বরী কোন সময়ে বড় ঘরের ভিতরে তাঁর কাছে, তাঁর বিছানার কাছে, কিংবা তাঁর আরামের চার-

পায়াটার কাছে এসে দাঁড়ায়। ফুলেশ্বরী আজ রতন রায়ের জীবনে একটা দুঃসহ অসহনীয় একটা অস্তিত্ব।

প্রতি রবিবারের সন্ধ্যায় জরির টুপি মাথায় চড়িয়ে আতরের ডিবা হাতে নিয়ে সিল্কের কামিজ আর চুড়িদার পায়জামা পরে অভিসারে বের হন রতন রায়। তাঁর অগাধ আদরের ও গর্বের আর বিশ্বাসের প্রাণী দলপতের পিঠে সওয়ার হয়ে তিনি রাণীবাজার চলে যান।

রাণীবাজারে যতজন বনেদী রেইসের ফূর্তির আস্তানা আছে, তাঁদের সবার মধ্যে বাবু রতন রায়েরই বাড়িতে বাঈজীদের আগমন ও অবস্থান সবচেয়ে বেশী। নতুন নতুন রূপসী বাঈজী যারা বছরের প্রায় প্রতি মাসে রাণীবাজারে এসে ধর্মশালার ঘরে ঠাঁই নেয়, সবার আগে তাদের বায়না করে বেঁধে রাখেন এই বাবু রতন রায়। দ্বিতীয় কোন ফূর্তিবিলাসী ব্যক্তি রাণীবাজারে নেই, যিনি বাবু রতন রায়ের মতো অকৃপণ ও মুক্তহস্ত হয়ে টাকা খরচ করতে এবং বাঈজীদের খুশি করতে পারেন। তেজারতী মহাজন রাণীবাজারে অনেক আছে। যখনই দরকার হয়, তখনই জমি আর জমিদারীর কিছুটা তাদের কাছে বেচে কয়েক হাজার টাকা পেয়ে যেতে বাবু রতন রায়ের কোন অসুবিধে নেই। বাঈজীর গান, কটাক্ষ আর ফূর্তির সরাবের কাছে জীবনটাকে উৎসর্গ করবার পর জমিজমার সবই একে একে বিকিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সর্বস্বান্ত হতে এখনও কিছু দেরি আছে।

রাণীবাজারের এই বাড়িটাই বাবু রতন রায়ের বর্তমান জীবনের খাস বাড়ি। রতন রায়ের বাবা যতন রায় এই বাড়ি তৈরী করেছিলেন। বউ হয়ে এই বাড়িতেই প্রথম উঠেছিলেন ফুলেশ্বরী, নিস্তারনগরের জমিদার আনন্দ চৌধুরীর মেয়ে। বিয়ের শুভদিনে রাণীবাজারের এই বাড়ি থেকে বরবেশ ধারণ করে এই টাট্টু ঘোড়া দলপতেরই পিঠে সওয়ার হয়ে চার ক্রোশ দূরের নিস্তারনগরে গিয়েছিলেন রতন রায়। সে আজ দশ বছর আগের ঘটনার কথা।

ফুলেশ্বরীর কাছে সেটা আজ দশ বছর আগের এক শুভ আনন্দের শত দীপে উজ্জ্বলিত একটি স্মৃতির কথা। রাণীবাজারে স্বামীর ঘরে এসে মাত্র দু'টি বছর থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল ফুলেশ্বরীর। শ্বশুর মারা গেলেন, তারপর তিনটে মাসের মধ্যেই স্বামী রতন রায় খুব ব্যস্ত হয়ে আর বিরক্ত হয়ে ফুলেশ্বরীকে সঙ্গে নিয়ে কিসুনগড়ের জঙ্গলের পুরনো গড়বাড়ির কাছে একটি নতুন মাটির বাড়িতে চলে এসেছিলেন।

সেইদিন প্রথম বাবু রতন রায়ের বেতের লাঠির আঘাতের স্বাদ পেয়েছিল ফুলেশ্বরী। ফুলেশ্বরীর অপরাধ, সে শুধু জিজ্ঞেস করেছিল যে, হঠাৎ রাণীবাজারের এত ভাল বাড়ি ছেড়ে এই জঙ্গলের এত কষ্টের একটা কোঠাবাড়িতে কেন চলে এলে? কী দরকার ছিল? এই জিজ্ঞাসার জবাব হিসাবে ফুলেশ্বরীর গায়ে রতন রায়ের বেতের লাঠির তিনটে আঘাত পড়েছিল। যেন ভয়ানক বিরক্ত ভ্রূকুটিগ্রস্ত এবং বেশ হিংস্র একটা মেজাজের বেত সপাং সপাং করে ফুলেশ্বরীর পিঠের ওপর আছাড় দিয়ে পড়ে শাসিয়েছিল—সাবধান, আর কখনও এরকম কোন কথা জিজ্ঞেস করবে না।

কেরানী জপেশ্বরের কাছ থেকে বাবু রতন রায়ের জীবনের এই ক্লিন্ন ইতিবৃত্ত শুনে শুনে রামতনুর অন্তরাত্মা যেন যন্ত্রণাক্ত হয়ে ছটফট করে। সেগুন বিক্রী করবার কর্তব্য ছেড়ে দিয়ে এখনই ভেলাডিহির কাছারিতে গিয়ে আবার নিশ্চিন্ত মনে তসীলদারী করতে ইচ্ছে করে। ভাণ্ডারীজীকে চিঠি দেয় রামতনু, আমার এখানে আর এক-মুহূর্তও থাকতে মন চাইছে না। বুঝতে পারছি না, জঙ্গলের সুন্দর স্বস্তি আর শান্তির ভিতরে মানুষী পাপের একটা ডেরা কেন এবং কেমন করে আজও টিকে আছে?

সন্ধ্যা হয়েছে, সেগুন বিক্রীর হিসাব লেখা শেষ হতেই শুনতে পায় রামতনু, বাবু রতন রায়ের বউ ফুলেশ্বরী কাঁদছে। একটা করুণ গানের খুব মিহি স্বর ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে অন্ধকারের বুকে ঝরে পড়ছে।

রামতনু জানতে চায়, রতন রায়ের জীবনের এত সব হাঁড়ির খবর জপেশ্বর কোথা থেকে পেল? এগুলি সত্যিই কি সত্যি খবর? না, বদনাম রটাবার যত বানানো মতলবী খবর? প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলে জপেশ্বর। —সবই খাঁটি খবর, সবই একজন খাঁটি মানুষের কাছ থেকে শোনা।

রামতনু—খাঁটি মানুষ।

জপেশ্বর—হ্যাঁ, বাবু রতন রায়ের বাড়ির বুড়ি চাকরানী হলো মনুয়া কি মাইয়া, অর্থাৎ মনুয়ার মা। ফুলেশ্বরীর দুঃখের সব কথা আমাদের কাছে বলে আর কেঁদে ফেলে মনুয়ার মা।

রামতনু বলে—আমি ভাবছি, ঘোড়া দলপৎ কেন এত বোকার মতো একটা বাজে লোকের ভক্ত হয়ে খাটছে?

জপেশ্বর—ঘোড়া হলো পশু এবং পশু হলো পশু। প্রভুর চরিত্র নীচ কি উঁচু সেটা বুঝবার মতো ব্রেন তো পশুদের নেই।

রামতনু—আমার বিশ্বাস, আছে।

জপেশ্বর—আমারও মাঝে মাঝে মনে হয়, পশুরা পাপ-পুণ্য ভাল মন্দ সবই কিছু-কিছু বুঝতে পারে। যেমন ধরুন...।

কেরানী জপেশ্বর উঠে দাঁড়ায়—চলুন আমার সঙ্গে। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, স্বচক্ষেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পাবেন আর বুঝবেন যে, হ্যাঁ সত্যিই।

রামতনু—কোথায় যাব?

জপেশ্বর—বাবু রতন রায়ের কোঠাবাড়ির পিছনে আস্তাবলের কাছে। গেলেই দেখতে পাবেন, ঘোড়া দলপৎ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ছটফট করছে।

—কিসের যন্ত্রণা?

—ফুলেশ্বরীর কান্নার শব্দ শুনলে ছটফট করে ওঠে দলপৎ। বুড়ি মনুয়ার মার কথা শুনে আমি নিজে গিয়ে এক সন্ধ্যায় দেখে এসেছি। ঘোড়া দলপতের দুই-কান থেকে থেকে থরথর করে কেঁপে উঠছে। চার পা চালিয়ে মাটি ঘষছে দলপৎ। ঘাড় তুলে

বারবার কোঠাবাড়ির বড়ঘরের দরজাটার দিকে তাকিয়ে যেন ফুলেশ্বরীর করুণ কান্নার অর্থটা বুঝতে চেষ্টা করছে দলপৎ—একটা ঘোড়া, একটা পশু।

রামতনু—না, আমি ওখানে যাব না।

দেখা যায়, বাবু রতন রায়ের কোঠা বাড়ির দিক থেকে একটা লণ্ঠন নিয়ে কে যেন এগিয়ে আসছে। জপেশ্বর বলে—সর্বনাশ, বাবু রতন রায় আসছেন।

রামতনু—তাতে সর্বনাশ কিসের? বাবু রতন রায়ের মতো একটা বাজে মানুষকে ভয় করবার কি আছে?

জপেশ্বর—মদ খেয়ে মাতাল হয়ে একটা কট্টর লোক যদি এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে টলতে টলতে কাছে এসে দাঁড়ায়, আর জিজ্ঞেস করে, মদ আছে? অন্তত এক বোতল তিন নম্বর স্পিরিটের মদ? তবে ভয় না পেয়ে কি পারা যায়?

রামতনু—না, ভয় করবার কিছু নেই।

জপেশ্বর—রেঞ্জারবাবু থাকলে এত ভয় পেতাম না। রেঞ্জারবাবুর রাইফেল ছিল, আপনার নেই।

জপেশ্বর ভয় পেয়ে ছটফট করে উঠতেই বাবু রতন রায় এসে সরকারী জঙ্গল কাছারির দাওয়ার ওপর উঠলেন। ভীতু জপেশ্বরের দিকে তিনি তাকালেন না, তিন নম্বর সরকারী স্পিরিটের এক বোতল মদ চাইলেন না, রামতনুর দিকে আঙুল তুলে একটা বাঘ-ডাক ছাড়লেন।

—আপনাকে আমি হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, যদি কোন দিন ভুলেও আমার বাড়ির অন্দরমহলের দিকে উঁকি-ঝুঁকি দেন, তবে আপনাকে এমন শিক্ষা পাইয়ে দেব...।

—চুপ করুন। ধমক দিয়ে, প্রায় কঠোর একটা গর্জনের মতো স্বরে কথা বলে রামতনু।

স্তব্ধ হয়ে, রামতনুর মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন বাবু রতন রায়। তারপর আর একটিও কথা না বলে আবার টলতে টলতে চলে যান।

হাঁফ ছাড়ে জপেশ্বর হেসে ফেলে। —উনি আমাকে এরকম হুঁশিয়ারী এই এক বছরে অন্তত পাঁচবার দিয়ে গিয়েছেন। লোকটার মনে সব সময় সন্দেহ গিজগিজ করছে যে, এখানে ছোকরা বয়সের সবাই তাঁর সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে মেশামিশি করবার সুযোগ খুঁজছে। আমি কিন্তু...।

—কী?

—আমি কিন্তু ওরকমের কোন বদ মতলবে নয়, শুধু একটি ইচ্ছের টানে কয়েকবার আড়ালে দাঁড়িয়ে রতন রায়ের বউ ফুলেশ্বরীকে দেখেছি।

রোজ খুব ভোরবেলায় দেখা যাব; পূজোর জন্য ফুল তুলছেন ফুলেশ্বরী। কতই বা বয়স।

চল্লিশ বছর বয়সের রতন রায়ের বউ ফুলেশ্বরীর বয়স ত্রিশ বছরের বেশী হবে না। তা না হোক, পঁয়ত্রিশ বছরই হোক। তার বেশী নয়। কী সুন্দর সুগৌর চেহারা। নাক-

চোখ তো নিখুঁত। খুব রোগা, ভয়ানক রোগা ফুলেশ্বরী। দু'হাতে দুটো রূপোর কাঁকন ছাড়া ফুলেশ্বরীর গায়ে অন্য কোন গয়না নেই। আর পরনের মধ্যে ওই এক লালপেড়ে শাড়ি। ভোরে উঠেই স্নান করবেন আর ভেজা শাড়িকে শুকোবার জন্য বাঁশের একটা বেড়ার ওপর মেলে দেবেন। আঙিনার এদিক ওদিকের গাছ থেকে কিছু ফুল তুলবেন। গোয়ালের গরুটার শিং-এ সিঁদুর মাখাবেন। কোঁচড়ের ভিতর থেকে ছোট একটা লাউ কিংবা দু'চারটে মুলো আর ধুঁদুল বের করে ঘোড়াটাকে খাওয়াবেন, আর....একটা অদ্ভুত ভক্তির কাণ্ড, ঘোড়া দলপতের মাথাটাকে একবার ছুঁয়ে নিয়ে নিজের কপালে হাত ঠেকাবেন। ঘোড়া দলপতের প্রাণটা যেন ভাবাবেগে বিনম্র হয়ে মাথাটাকে নামিয়ে দেয়। ফুলেশ্বরী চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ ধরে দূরের বেড়াটার ওপর ফুলেশ্বরীর মেলে দেওয়া লালপেড়ে শাড়িটার দিকে ঘোড়াটা তাকিয়ে থাকে।

—কেন? কেন?

জপেশ্বর হাসে। —বুড়ি বলেছে তাই জানতে পেরেছি কেন। বাবু রতন রায় এই দলপতের পিঠে চড়ে, বরবেশে সুন্দর হয়ে নিস্তারনগরে গিয়ে ফুলেশ্বরীকে বিয়ে করেছিলেন। ফুলেশ্বরীর কাছে দলপৎ তাই যেমন-তেমন সামান্য জীব নয়, একটি চমৎকার ভক্তির জীব।

রামতনু—তিনি কি তাঁর স্বামী নামক লোকটাকেও ভক্তি-টক্তি করেন?

জপেশ্বর—নিশ্চয় নিশ্চয়। ওই যে ভোরবেলায় ফুল তোলেন, সেটা কার জন্য? পতি পরম গুরু ওই রতন রায়ের জন্য। বড় ঘরে ঢোকবার তো উপায় নেই, দরজা বন্ধ। তাই রোজ ভোরে বড় ঘরের দরজার কাছে, পরম গুরু পতিদেবের চরণের উদ্দেশ্যে ফুল রেখে দেন ফুলেশ্বরী।

ঠিকই, ফুলেশ্বরী নামে এক নারীর জীবনের সুখ-দুঃখের কোন্ ভাষার শব্দ কেউ এখানে শুনতে পায় না। শুধু এক বুড়ি চাকরানী ওই মনুয়ার মা ছাড়া বাইরের আর কেউ ফুলেশ্বরীকে ভোরবেলার পর দেখতে পায় না। সূর্য ওঠবার পর ফুলেশ্বরীর পক্ষে তার ছোট ঘরটার ভিতর থেকে বাইরে এসে খোলা আঙিনার ওপর দাঁড়াবার অধিকার নেই। বাবু রতন রায় চান না যে, বাইরের কোন পুরুষ ব্যক্তি ফুলেশ্বরীর চোখে পড়ুক কিংবা ফুলেশ্বরী বাইরের কোন পুরুষকে চোখে দেখবার সুযোগ পেয়ে যাক।

এমনি এক অদ্ভুত নিয়মের শাসনে থেকে জীবন চলছে যে নারীর, সে নারীর প্রাণটা একদিন যেন এক আকস্মিক করুণার ইঙ্গিতে একবার হেসে উঠেই চিরকালের মতো নীরব হয়ে গেল। সেই একটি চৈতী রবিবারের সন্ধ্যা। জঙ্গলের পলাশের গায়ে যখন ফোটা ফুলের লাল শোভার ওপর আবছায়ার ঢাকা পড়েছে; ভালুকের আঁচড় খেয়ে চাকের মৌমাছি যখন দিগ্বিদিক ভুলে গিয়ে আবছা অন্ধকারের আকাশে উড়োউড়ি করছে, পুরনো গড়বাড়ির ধ্বসস্তূপের কাছে ছোট পিয়ালবনের ভিড়ের মধ্যে উসখুস করছে বনময়ূরের একটা দল আর ওই দিকে চার ক্রোশ দূরের রাণীবাজারের এক বাড়িতে সারেঙ্গীর বাজনা আর বাঈজীর গলার ঠুংরি গান চমৎকার ঝংকার তুলে

বাজতে শুরু করেছে, ঠিক সেই সময় মনুয়ার মাকে ডাক দিলেন ফুলেশ্বরী। —বুকের ভিতরে একটা ব্যথা, মনুয়ার মা। আমি আর কথা বলতে পারছি না।

বলতে বলতে চোখ বন্ধ করলেন ফুলেশ্বরী। সারা রাত আর পরদিন দুপুর পর্যন্ত ফুলেশ্বরীর মাথা ছুঁয়ে বসে রইল মনুয়ার মা। যখন বাইরের আঙিনাতে ঘোড়া দলপতের হ্রেষা রব শুনে ভীরু চড়াই ফুরুৎ-ফুরুৎ করে উড়ে পালাতে থাকে, তখন চেঁচিয়ে ডুকরে ওঠে মনুয়ার মা। ফুলেশ্বরীর পতি পরম গুরু গৃহাগত রতন রায় বিরক্ত হয়ে ভ্রূকুটি করে আর আস্তে আস্তে হেঁটে এসে দেখতে পান ও এক নিমেষে বুঝতে পারেন, ফুলেশ্বরী আর নেই।

পরের দিন রাণীবাজার থেকে বাবু রতন রায়ের জাতের বিশ জন, আর নিস্তারনগর থেকে কুটুম্ব পাঁচজন এসে জঙ্গলের ভিতরে একটা ঝর্ণা নদীর পাশে চিতে সাজিয়ে ফেললো। লালপেড়ে শাড়িতে ফুলেশ্বরীকে মুড়ে নিয়ে আর খাটিয়াতে চড়িয়ে জাতের দল আর কুটুম্বের দল হন হন করে হেঁটে ঠিক আস্তাবলের সামনে এসে পৌঁছতেই যেন একটা হোঁচট খায় আর থমকে দাঁড়ায়। বিশ্রী রকমের একটা ডাক ছেড়েছে ঘোড়া দলপৎ। মটাস করে একটা শব্দ হলো। সকলে দেখে একটু আশ্চর্য হয়, আস্তাবলের সামনের বাঁশের আড়াটাকে ঘাড়ের একটা ধাক্কা দিয়ে ফেঙে ফেলেছে দলপৎ। তার পর আর একটা মুহূর্তও নয়, ছুটে পালিয়ে গেল দলপৎ, কে জানে কোন্ দিকে চলে গেল।

॥ দুই॥

এক মাসের মধ্যে নয়, দু'মাসের মধ্যেও নয়; পলাতক দলপৎ-এর কোন খোঁজ পেলেন না বাবু রতন রায়। জঙ্গল-কাছারিতে এসে জপেশ্বরের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রতন রায়ের কণ্ঠস্বরের অভ্যস্ত গর্বটা যেন বার বার থতমত খায় আর বিড়বিড় করে। —বুঝতে পারছি না, আমার দলপৎ কোথায় চলে গেল? কেন চলে গেল? চলে গেল তো এতদিনে ফিরে এল না কেন? সন্দেহ হয়েছিল দলপৎকে বাঘে মেরেছে, জঙ্গলের ভিতরে কোথাও দলপৎ-এর শুকনো হাড্ডি বোধহয় এখনও ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। কিন্তু জঙ্গলের ভিতরেও তো অনেক খোঁজ-খবর করা হয়েছে। আপনার গার্ডদের সবাইকে টাকা দিয়েছি, ওরা অনেক চেষ্টা করেও দলপৎ-এর কোন খোঁজ পায়নি। তিন থানায় ডায়েরী করিয়েছি, পুলিশ খোঁজ করছে, ঘোড়াটাকে কেউ ধরে রেখে নিজের কাজে খাটাচ্ছে কি না? কেউ না, কোথাও দলপৎ-এর কোন খবর পাওয়া গেল না। হ্যাঁ, আপনার এখানে যে ছোকরা তসীলদারটা ছিল, সেগুন বিক্রীর কাজ করতো, সে লোকটা কি এখনও এখানে আছে?

—আছে।

—এই লোকটাকে আমার খুব সন্দেহ হয়।

—কেন রায়জী? ও বেচারাকে আপনি কেন সন্দেহ করেন? রামতনু যে....।

—থাক্, কথা আর বাড়িয়ে লাভ নেই। মোট কথা, ওই লোকটা এখান থেকে চলে গেলেই ভাল হয়।

কেন যে ভাল হয়, কিসের ভাল হয়, এবং কার ভাল হয়, সেসব যুক্তি জিজ্ঞাসার কোন জবাব রতন রায়ের কথার মধ্যে পাওয়া যায় না। কী আশ্চর্য, বাবু রতন রায়ের আদরের ঘোড়া দলপৎ তো সবারই চোখের সামনে আস্তাবলের আড়া ভেঙে পালিয়ে গিয়েছে। তবে বেচারা রামতনুকে সন্দেহ করা কেন?

দলপৎ নেই, তাই এখন পাল্কিতে চড়ে রাণীবাজারে যাবার তিন ক্রোশ পথ পার হতে হয়। গরুর গাড়িতে যাওয়া-আসা করা সম্ভব নয়, ইজ্জতে বাধে। পাল্কিতে যেতে সময় বেশী লাগে, বেশ একটু কষ্টও হয়। কিন্তু না যেতে তো পারেন না। সপ্তাহে অন্তত একটা দিনে মিঠে সারেঙ্গীর আওয়াজ না শুনে, বাঈজীর গলার মিঠে ঠুংরি না শুনে আর তাদের ভুরু-নাচানো ভাবের লীলাকলা না দেখতে পেলে কী শুনে আর কী দেখে বেঁচে থাকবেন রতন রায়? জানতে পেরেছে জপেশ্বর, পাল্কিতে চড়তে গিয়ে বিড়-বিড় করেন রতন রায়—বেইমান! বেইমান!

যারা পাল্কি বইবার চাকর, শুধু তারা নয়, আস্তাবলের কাজের চাকর বিল্টুরামও মুখ ফিরিয়ে হাসি লুকোয়। সবাই বুঝতে পারে, কাকে বেইমান বলে গালি দিচ্ছেন হুজুর রায়জী। যে দলপৎকে দুনিয়ার সবচেয়ে ইমানদার ঘোড়া বলে গর্ব করতেন রায়জী, আজ তাকেই বলছেন—বেইমান। কেন? কী বেইমানি ও কিসের বেইমানি করেছে দলপৎ?

বড়-বড় সেগুনের দো-কাটা কিংবা তিন-কাটা ধড় নিয়ে যে দুটো গো-গাড়ি সপ্তাহের দুটো তিনটে দিন রাণীবাজারে যায়, সেই দুটো গো-গাড়ি একদিন একটা তাঁবু, বড়-বড় চারটে বাস্কেট নিয়ে ফিরে এল। সঙ্গে একজন বাবুর্চি, একজন চাপরাসী, আর শিকারের মাচান বাঁধবার দশজন কুলি। জেলা পুলিসের বড় সাহেব রবার্টসন তাঁর শিকার-সফর শেষ করে ভিন পথে হাজারিবাগ চলে গিয়েছেন। তাঁর এই সব লটবহর আর লোকজন এখন জঙ্গলের রাস্তা ধরে কুসুমডি সার্কেলের চৌকিদারী ফাঁড়ি পর্যন্ত যাবে।

রবার্টসনের বাবুর্চির মুখ থেকে একটা খবরের কথা শুনেই চেঁচিয়ে ওঠে জপেশ্বর—আমি ঠিকই শুনেছিলাম। আপনিও কি শুনেছিলেন, রামতনু বাবু?

রামতনু—কী ব্যাপার? কী খবর শুনে এত খুশি হলেন?

জপেশ্বর—রবার্টসন সাহেব একটা অদ্ভুত জানোয়ারকে মারবার জন্যে জঙ্গল ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছেন। সাহেবের বাবুর্চি বলছে, একদিন বড়কা গাঁওয়ের জঙ্গলে রাতের জ্যোৎস্নার মধ্যে একদল নীলগাইয়ের সঙ্গে একটা অদ্ভুত জানোয়ারকে চরতে দেখে বাঘ-মারা মস্ত সাহসী সাহেবও কেন যেন ভয় পেলেন। গুলি চালালেন বটে, কিন্তু আজব জানোয়ারটার গায়ে গুলি লাগলো না। ছুটে পালিয়ে গেল সব নীল গাই আর সেই আজব জানোয়ার। কে জানে কেন মাচানের একটা খুঁটো হঠাৎ হেলে পড়লো, মাচানটা হুড়মুড় করে নীচে পড়ে গেল। সাহেবের হাতে-পায়ে-বুকে ভয়ানক চোট লাগলো। আরও ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন সাহেব—না না, আর কোন দিনও এখানে আসবো না। অত্যন্ত অপয়া জঙ্গল, আর নিতান্ত অপয়া জানোয়ার।

জপেশ্বর বলে—আমি ঠিকই বুঝেছি, রামতনুবাবু। রবার্টসন যে আজ জানোয়ারের

জঙ্গলের ভিতরে নীলগাইয়ের দলের সঙ্গে চলতে দেখেছেন, সেটা বাবু রতন রায়ের পলাতক ঘোড়া দলপৎ। নিশ্চয় দলপৎ। তার মানে মানুষের ঘরের পোষ-মানা প্রাণীটা পলাতক হয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে আর জংলী হয়ে গিয়েছে। চাতরা রেঞ্জের জঙ্গল অফিসে থেকে কাজ করবার সময়, সে আজ পাঁচ বছর হলো, জঙ্গলের ভিতরে পাঁচটা সম্বরের একটা দলের সঙ্গে একটা গরুকে ঘুরতে ফিরতে দেখেছিলাম। একটা ফেরাল গরু। কে জানে কেন, কিসের দুঃখে গরুটা কোন্ মানুষের ঘর ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল।

জপেশ্বরের মুখ থেকে তার চোখে দেখা অভিজ্ঞতার গল্প শুনে রামতনুর বুকের ভিতরটা যেন একটা বিস্ময়ের শিহরে ভরে যায়। ঠিকই তো, মানুষের সংসারের যত নীচতা হীনতার ছোঁয়া থেকে মুক্তি পেতে চাও তো পালিয়ে গিয়ে গম্ভীর জঙ্গলের বুকের ভিতরে গিয়ে ঠাঁই নাও। খুব ভাল হয়েছে, ফেরাল হয়েছে ভয়ানক বাবু ওই রতন রায়ের ঘোড়া। দেখতে ইচ্ছে করে, ফেরাল ঘোড়া দলপৎকে এখন নিবিড় জঙ্গলের শাল-মহুয়ার ছায়ার মধ্যে কেমনতর আশ্চর্যের প্রাণী বলে মনে হচ্ছে।

সে রাতেই জপেশ্বরের চাপা-গলার হাঁকডাক শুনে জেগে ওঠে রামতনু। জপেশ্বর বলে—দেখবেন তো শিগগির উঠুন আর আসুন।

আগে দেখতে পেয়েছে গার্ড মনুয়া, তারপর অন্য অন্য গার্ডেরা, তারপর গার্ডদের ডাকাডাকির আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে যাবার পর জপেশ্বর ঘরের বাইরে গিয়ে দেখেছে, ওই যে পুরনো গড়বাড়ির ধ্বংসস্তূপের কাছে, বাবু রতন রায়ের নতুন কোঠাবাড়িটার কত কাছে হিমেল কুয়াশা আর শেষ রাতের ফালি চাঁদের ফিকে জ্যোৎস্না গায়ে মেখে চরে বেড়াচ্ছে চারটে নীল গাই আর ফেরাল ঘোড়া দলপৎ। সে দৃশ্য দেখে রামতনুর বুকের ভিতরে বিস্ময়ের শিহরণ যেন একটা মায়াময় আনন্দের ফোয়ারা হয়ে উথলে ওঠে। ওটা যে জঙ্গলেরই বুকের একটা মায়ামধুর সংসারের ছবি। জঙ্গলের নীলাগাইয়ের দল যেন ঘোড়া দলপৎকে তাদের নতুন আদরের একটি ভাই বলে বুঝেছে।

আর কতক্ষণ? ফালি চাঁদের গা সাদা হয়ে এসেছে, ফিকে জ্যোৎস্না ফুরিয়ে এসেছে, এই মায়ার ছবি তো আর দু'চার মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে। যাক্, খুব খুশি হয়ে বেঁচে থাকুক ফেরাল দলপৎ, জংলী দলপৎ।

চমকে ওঠে রামতনু। গার্ড মনুয়ার হাঁকের সঙ্গে গলার স্বর মিলিয়ে দিয়ে একটা হাঁক ছেড়েছে গার্ডের দল। ওদের ইচ্ছে নীলগাইয়ের দল ভয় পেয়ে পালিয়ে যাক, আর দলপৎ ছুটে গিয়ে একেবারে কোঠাবাড়ির আঙিনাতে ঢুকে ধরা দিয়ে ফেলুক।

ঘোড়া দলপৎ যে সত্যিই কোঠাবাড়ির আঙিনার খুব কাছে এসে ছোট ক্ষেতের ছোলা গাছের গুচ্ছ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে শুরু করেছে।

ঠিকই, এক মুহূর্তের মধ্যে জঙ্গলের ভিতরে উধাও হয়ে গেল নীলগাইয়ের দল। আর মানুযের হাঁকডাকের ভয়ানক শব্দে যেন বিভ্রান্ত হয়ে দলপৎ ছুটে এসে কোঠা বাড়ির আঙিনাতে দাঁড়ায়। কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে থাকে না। একবার এদিক থেকে ওদিকে তারপর আবার ওদিক থেকে সেদিকে ছুটতেই থাকে।

জেগে উঠেছে বাবু রতন রায়ের আস্তাবলের চাকর বিল্টুরাম। আয় আয় আয়। বার-বার ব্যাকুল স্বরে ডাক দিয়ে দলপৎকে থামাবার চেষ্টা করে। কিন্তু বৃথা দলপৎ থামে না।

চাকরানি মনুয়ার মা ঘরের বাইরে এসে ডাক দিল—আয় আয় আয়!

কী আশ্চর্য, থমকে দাঁড়ায় দলপৎ। তারপরেই ছুটে গিয়ে বাঁশের বেড়াটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। বেড়ার গায়ের ওপর একটা ছেঁড়া শাড়ি পড়ে আছে। লালপেড়ে শাড়ি। ফুলেশ্বরী দয়া করে বুড়ি মনুয়ার মাকে যে দুটো লালপেড়ে শাড়ি দিয়েছিল, তারই একটি। লালপেড়ে ছেঁড়া শাড়িটার ওপর গলাটাকে এলিয়ে দিয়ে আর খুব শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ঘোড়া দলপৎ।

গার্ডদের সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে জপেশ্বরও নিজের চোখে এই দৃশ্যটাকে দেখতে পায়। বুড়ি মনুয়ার মা কান্না শুরু করে দিয়েছে—মা তো নেই, কে তোকে ধুঁদুল আর লাউ খাওয়াবে রে দলপৎ?

কিন্তু দলপৎ তো উল্টো রকমের বুঝেছে বলে মনে হয়। বেড়ার ওপর লালপেড়ে শাড়ি দেখে বুঝে ফেলেছে, ফুলেশ্বরী আবার ফিরে এসেছেন। যেন এখনই ঘরের বাইরে এসে নিজের হাতে দলপৎকে লাউ-ধুঁদুল খাওয়াবেন। শান্ত নীরব নিঃস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দলপৎ। সুযোগ বুঝে বিল্টুরাম দলপৎ-এর গলাতে দড়ির ফাঁসটা ফস করে পরিয়ে দেয়। দড়ির টানের সঙ্গে খুট খুট করে হেঁটে এসে আস্তাবলের ভিতরে ঢুকে পড়ে দলপৎ। দড়ির প্রান্তটাকে একটা খুঁটোর সঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে চলে যায় বিল্টুরাম। ডাক দেয়—এ হুজুর, একবার উঠে এসে দেখুন হুজুর।

বাবু রতন রায় উঠে আসেন। দলপৎ-এর চেহারাটার দিকে কটমট করে তাকান। গার্ডদের মুখ থেকে ঘটনার সব কথা শুনে চেঁচিয়ে ওঠেন রতন রায়। —বেইমান, বেইমান। আর তোমাকে একটুও বিশ্বাস করা চলবে না। এই বিল্টু, চার পায়ে খুব শক্ত চার দড়ির টানা বাঁধ, বেঁধে দিয়ে ঘোড়াটাকে একেবারে থিতিয়ে দাও, বদমায়েস কয়েদীকে যেমন ডাণ্ডা-বেড়ি দিয়ে থিতিয়ে রাখা হয়। খুব সাবধান বিল্টু, বেইমান ঘোড়া যেন আর পালিয়ে যেতে না পারে।

।। তিন।।

কিসুনগড়ের জমিদার বাবু রতন রায়ের এই প্রকাণ্ড কোঠাবাড়িতে বড়-ঘরের ভিতরে যেন একটা উৎসবের আমোদ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। রাণীবাজার থেকে রতন রায়ের জন দশেক বন্ধু রেইস এসেছেন। বিলাতী মদের বোতলে ভর্তি করা দুটো বাক্স এসেছে। আজ এই কোঠাবাড়িতে নতুন গৃহিনীর আগমন ও প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান হবে।

নিতান্ত নতুন কেউ নয়, যে নারীকে চিরকালের সঙ্গিনী হিসেবে রক্ষিত করতে চেয়েছেন রতন রায়, সেই নারী এসে গিয়েছে। কোঠাবাড়ির অন্য এক ঘরের ভিতরে সেই নারী, তার এক চাচিজী, একজন সারেঙ্গীওয়ালা, একজন তবলচী, তিন-চারটে পাল্কিতে এরা বাহিত হয়ে রাণীবাজার থেকে কিসুনগড়ে পৌছে গিয়েছে।

রাণীবাজারের প্রতি রবিবারের সান্ধ্য ফূর্তির জীবনে কত নারীই তো এসেছে আর নেচে গেয়ে চলে গিয়েছে। মাঝ রাতে গানের আসরের ভিড় বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর রতন রায়ের কোলের ওপর বসে কত বাঈজীই তো মদের গেলাসে চুমুক দিয়ে বিহ্বল হয়েছে। ভাড়াটিয়া আমোদসঙ্গিনীর সেই বিহ্বল অবস্থার স্বাদ গ্রহণ করে তিনি কতই না পরিতৃপ্তি লাভ করেছেন। কিন্তু সকালবেলা ঘুম ভেঙে যাবার পর সেই বিহ্বলতার কোন স্মৃতির ধার না ধেরে একেবারে নির্মোহ ও নির্বিকার বুদ্ধি দিয়ে হিসাব তৈরী করে রাতের বাঈজীর পাওনা মিটিয়ে দিয়েছেন। এবং নতুন এক বাঈজীর দালালের হাতে নতুন বায়নার টাকা ধরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এই বাঈজী, যার নাম বিদ্যাবাঈ, শুধু তার চমৎকার শরীরটার চমৎকার স্বাদ নয়, তার মনের নিবিড় এক ভালবাসার স্বাদ পেয়েছেন রতন রায়। কথা বলতে গিয়ে বিদ্যাবাঈয়ের দুই চোখ অন্তত দশবার জলে ভেসে গিয়েছে। বারবার কথা বলেছে বিদ্যাবাঈ, যার সারমর্ম এই যে, আপনাকে ভালবেসেছি, আমার ইচ্ছা আপনি আমার নথমোচন করুন, আমার এতদিনের নিখুঁত কুমারী শরীরটা আপনার সেবার কাজে উৎসর্গ হোক।

নথভূষিতা কুমারী বাঈজী এই বিদ্যাধরী শুধু নয়, তার চাচিজীও কেঁদে ফেলেছে— আপনাকে তো প্রাণ সঁপে দিয়েই বসে আছে বিদ্যা, ওর নথমোচন করে ওকে আপনার কাছে রাখুন। যতদিন ভাল লাগবে ততদিন কাছে রাখবেন। যেদিন ইচ্ছে হয় সরিয়ে দেবেন। বেনারসের ঠিকানাতে আমাকে চিঠি দেবেন। আমরা নিজেরাই এসে বিদ্যাকে নিয়ে চলে যাব। আপনাকে কোন বিড়ম্বনা ভুগতে হবে না। শুধু দুই থান সিল্ক, নগদ পাঁচ হাজার টাকা আর মিঠাই খেতে আর এক হাজার, ব্যস, এর বেশি আর একটিও পয়সা আমার দাবি নয়। বুঝে দেখুন, আমি বিদ্যাকে কত সস্তায় আপনার কাছে ছেড়ে দিচ্ছি। মনে পড়ছে, সেই বলভদ্রবাবুর সেই কথাটা, বিদ্যাকে দেখতে পেলে দেবতারাও ওকে কাছে ধরে রাখবার জন্য ছটফট করবে।

ঠিক কথা, খুব ঠিক কথা। বিনা নেশার মন আর যুক্তি দিয়ে বুঝতে পেরেছেন বাবু রতন রায়, বিদ্যাবাঈকে ছেড়ে দিলে জীবনের একটা মুহূর্তকেও তিনি আর সহ্য করতে পারবেন না। আর বিদ্যাবাঈ তো তার বুকভরা ভালবাসার অপমান সহ্য করতে না পেরে বিষ খেয়েই ফেলবে। তাই বিদ্যাবাঈয়ের ভালবাসা নিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবার সংকল্প করেছেন।

বিদ্যার বেনারসওয়ালী এই চাচিজী বলেছে—এই তো সেদিন গত মাঘ মাসে আমার বিদ্যাধরীর আঙ্গিয়া হয়েছে। চোলি পরবার মতো বয়স আর শরীর হয়েছে।

নিখুঁত কুমারী বিশুদ্ধ কুমারী এই বিদ্যাবাঈয়ের নথমোচন করে বাবু রতন রায় তাঁর ঘরের জীবনের শূন্যতাকে অজস্র প্রীতি আর তৃপ্তি দিয়ে ভরাট করে রাখবেন। বাবু রতন রায়ের জীবনের চিরসঙ্গিনী হবার অঙ্গীকার দিয়েই ফেলেছে বিদ্যাবাঈ।

আর শুনেছে কেরানী জপেশ্বর, শুনেছে তসীলদার রামতনু। সারেঙ্গীর আওয়াজ আর নারীকণ্ঠের গানের আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারা যায়, বাঈজীর নথমোচনের

অনুষ্ঠান শেষ হয়ে এখন শুধু আমোদের হল্লার মধ্যে ঠুংরির বাণী বাজছে—সচি কহো মোকে বাতিয়া। তারপর আবার—পিয়া পরদেশিয়া মোরা মনোহারা।

নতুন রেঞ্জার বাবু শ্রীসুখলাল সিংহ আজই এসে পৌঁছেছেন, আর খাতাপত্র ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করেছেন। কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেললেন সুখলাল। —খবর শুনে রাণীবাজারে অনেকে হাসাহাসি শুরু করেছে। ওই যে বিদ্যাবাঈ যিনি নথ পরে বিশুদ্ধ কুমারীর ভেক নিয়ে এই দুটো মাস রাণীবাজারের বাঈজীগিরি করছিলেন, তিনি এর আগে কত জায়গাতে কতবার যে নথমোচন করিয়েছেন, তার হিসাব রাণীবাজারের অনেকেই জানে। শুধু জানেন না কিসুনগড়ের এই বাবু রতন রায়।

আজ থেকে এই বাঈজী থাকবে এই বাড়ির বড়ঘরে, যে বড়ঘরে বিয়ে-করা বউ ফুলেশ্বরীকে কোনদিনও ঢুকতে দেননি রতন রায়। এই দৃশ্যটাকে দুচোখে দেখবার আগেই, আজ সূর্য ওঠবার আগেই বেড়ার ওপর থেকে ছেঁড়া লাল শাড়িটাকে তুলে নিয়ে নিজের গাঁয়ের বাড়িতে চলে গিয়েছে বুড়ি চাকরানী মনুয়ার মা। আর সেই মুহূর্ত থেকে দলপৎ কী যেন সন্দেহ করে ছটফট করতে শুরু করেছে। বেড়ার ওপর লালপেড়ে শাড়িটা নেই, অতএব ফুলেশ্বরী নেই, বোধহয় এই সন্দেহ দলপৎ-এর প্রাণটাকে ভয়ানক বিচলিত করেছে। চার পায়ে শক্ত দড়ির টানা বাঁধন, তাই পা ছুঁড়তে পারছে না দলপৎ। শরীরটা শুধু কাঁপছে, ঘাম ঝরে পড়ছে, যেন ডাণ্ডা-বেড়ি পরানো এক কয়েদি বিছার কামড়ের যন্ত্রণা সহ্য করছে, কিন্তু ছুটে পালিয়ে যেতে পারছে না।

বিকেল হতেই অভ্যাগত রেইসের সবাই আবার রাণীবাজারে ফিরে গেল। শুধু থেকে গেল বিদ্যাবাঈয়ের বেনারসওয়ালী চাচিজী, সারেঙ্গীওয়ালা ও তবলচী আর সরাব-সরবতের দুই চাকর। ওরা আগামীকাল বিকেলবেলা বিদায় নেবে। ভাল বকসিস দিয়ে ডবল মজুরী দেবার পাকা কথা দিয়ে পাল্কিবহা দুটি দলকে বসিয়ে রেখেছে বুদ্ধিমতী চাচিজী। আর আসন্ন বিদায় কল্পনা করে অনবরত কাঁদছে।

সন্ধ্যা হতেই পূবদিকের আকাশে নিটোল এক চাঁদের চেহারা সোনার থালার মতো ফুটে উঠলো। আর শেষ রাতের জ্যোৎস্না যখন ফিকে হয়ে এসেছে, তখন গার্ড মনুরাম জেগে উঠেই ব্যস্ত হয়ে ডাকতে থাকে—উঠুন বাবু, শিগগির উঠুন।

ডাক শুনে সাড়া দিয়ে জপেশ্বর ও রামতনু দুজনেই ঘরের বাইরে আসে আর দেখতে পায়, জ্যোৎস্নার প্রলেপ গায়ে মেখে যেন এক স্বপ্নলোপের তিনটে নীল গাই আস্তে আস্তে হেঁটে কোঠাবাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনজোড়া চোখ চিকচিক করছে। জপেশ্বর বলে—বুঝেছি, বুঝেছি, আমার ধারণা মিথ্যে হবার নয়।

রামতনু—কী ধারণা করেছেন?

জপেশ্বর—বললে বিশ্বাস করবেন না। আর দশ-বিশটা মিনিট অপেক্ষা করুন।

দশ মিনিটও পার হয়নি। ফিকে জ্যোৎস্নার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বনচ্ছায়ার স্তব্ধতাকে হঠাৎ যেন উতলা করে দিয়ে ছুটে চলে গেল সেই তিনটে নীলাগাই, আর রামতনুর দুই চোখ বিস্ময়ে অপলক হয়ে দেখতে থাকে, ওদেরই সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে চলে যাচ্ছে একটা...।

একী? কী ব্যাপার? এটা কী করে সম্ভব হয়? ঘোড়া দলপৎ ছুটে চলে যাচ্ছে?

জপেশ্বর বলে—ওই তিনটে নীলগাই এসে নিশ্চয় একটা কাণ্ড করেছে। মনে হচ্ছে দলপতের চার পায়ের শক্ত দড়িকে ওরা চিবিয়ে ছিঁড়ে দিয়েছে।

জপেশ্বরের অনুমানের কথাগুলি যে নিছক মজাদার একটা কল্পনার কথা নয়, তার প্রমাণ পেতে বেশি দেরি হলো না।

পূবের আকাশে ভোরের আভা স্পষ্ট করে তখনো ফুটে ওঠেনি। ফিকে অন্ধকারের ছায়ামায় ঘোর তখনও জঙ্গলের গায়ে লেগে রয়েছে। ছুটে এসেছে বাবু রতন রায়ের আস্তাবলের চাকর বিল্টুরাম। আতঙ্কিত বিল্টুরাম চেঁচিয়ে ওঠে—আমাকে একটি টাকা দিন কেরানী বাবু, আমি এখনই পালাবো, আমার গাঁয়ের ঘরে চলে যাব।

বিল্টুরামের ভীরু চীৎকারের শব্দ শুনে ছুটে আসেন ঘুম-ভাঙা রেঞ্জার বাবু সুখলাল। চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করেন —কী হয়েছে?

—ঘোড়া পালিয়েছে, রায়জী হুজুর এবার আমাকে চিবিয়ে খাবেন। উনি সন্দেহ করবেন, আমি ঠিক মতো নজর রাখিনি বলে চোর এসে সুবিধে বুঝে ঘোড়াটাকে নিয়ে পালিয়েছে। উনি তো বিশ্বাস করবেন না যে, চোরেরা নয়, জঙ্গলের কয়েকটা নীলগাই মাঝরাতে কিংবা শেষ রাতে এসে ঘোড়াটার চার পায়ের বাঁধন দড়ি চিবিয়ে ছিঁড়ে দিয়েছে, তাই পালিয়ে যেতে পেরেছে ঘোড়া দলপৎ।

রামতনু—কেমন করে বুঝলে যে, সত্যিই জঙ্গলের কয়েকটা নীলগাই এসে এরকমের অদ্ভুত কাণ্ড করেছে?

বিল্টুরাম—একবার গিয়ে দেখেই আসুন না কেন।

রামতনু—কী দেখবো?

বিল্টুরাম—দেখে আসুন, আস্তাবলের এত শক্তা তক্তার ঝাঁপ চিৎপাত হয়ে মাটির ওপর পড়ে আছে। নীলগাইয়ের গুঁতোর চোট তো সামান্য নয়। দলপৎ-এর চার পায়ের বাঁধনদড়ির চারটে টুকরো পড়ে আছে। কাটা দড়ির টুকরো নয়, চিবিয়ে ছেঁড়া দড়ির টুকরো। নীলগাইদের টাটকা ময়লাও ছড়িয়ে রয়েছে। দিন বাবু, একটা টাকা। রায়জীর নেশার ঘুম এখনও ভাঙেনি, এই ফাঁকে আমি পালাই।

টাকা দেয় রামতনু। ভীরু খরগোসের মতো ছোট-ছোট লাফ দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে জঙ্গলের সড়কের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায় বিল্টুরাম।

রেঞ্জার সুখলাল হাসেন।—এবার আমি রিপোর্ট পাঠাবার সময় আমাদের কর্তা টেলর সাহেবকে এই মজার ঘটনার কথা লিখে রগড় করবো। লিখবো—জেলা পুলিশের কর্তা মিস্টার রবার্টসন এবং ডিস্ট্রিক্ট ফরেস্টের কর্তা মিস্টার টেলর, আপনারা দুজনই যখন পৃথিবীর সব চেয়ে মহৎ জাত, ইংরেজ জাতের দুই মানুষ, তখন আপনাদের দুজনের মধ্যে ঝগড়া কেন? একটুও বন্ধুত্ব হয় না কেন? ক্লাবের ঘরের মধ্যেই গেলাস ছোঁড়াছুঁড়ি করে দুজনের মধ্যে এত মারামারি বাধে কেন? অথচ জঙ্গলের নীলগাই আর একটা ফেরাল ঘোড়ার মধ্যে কত সহজে কী চমৎকার বন্ধুত্ব হয়ে যায়।

জঙ্গলের মাথার ওপর রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। তিতির আর বকের ঝাঁক বেঁধে উড়তে শুরু করেছে। রামতনুর প্রাণটা এত দিন পর আজ এই প্রথম স্বস্তি বোধ করছে। জঙ্গলের বুকের একটা নতুন রকমের মায়ার খেলা দেখতে পেয়ে এতদিনের বিষণ্ণ মনটাও যেন হাসছে। জপেশ্বর ও সুখলালের হাসি হল্লার সঙ্গে গলা মিলিয়ে দিয়ে আর গল্প করে সময় পার করে দেয় রামতনু। বেলা বাড়ে, দুপুর হয়।

চমকে ওঠে সবাই। এ কী? কে কাঁদছে? কেমনতর কান্না। যেন বিদ্‌ঘুটে এক ভূতের কান্না। উৎকট কান্নার সঙ্গে বিকট কাশির শব্দ। একবার মনে হয়, কান্নাভরা কাশির শব্দ বার বার মুখ থুবড়ে পড়ছে আর গড়াচ্ছে। আবার মনে হয় কাশিভরা একটা কান্নার শব্দ ঘরের মেঝেতে মুখ ঘষছে। কিন্তু কোন সন্দেহ নেই, ভূতের কান্নাটা বাবু রতন রায়েরই বাড়ির ভিতরের একটা কান্না।

গার্ড মনুয়া ছুটে যায়, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই খবর জেনে ফিরে আসে।—দু'হাত দিয়ে বুক পিটিয়ে কী ভয়ানক কাঁদছেন রায়জী।

—কেন? কী হয়েছে?

—বাঈজী পালিয়েছে। সকাল হবার আগেই বাঈজী আর বাঈজীর দলের সব লোক চুপেচুপে সরে পড়েছে। সকাল হয়ে গেলেও রায়জীর জবর নেশার ঘুম ভাঙেনি, তাই কিছুই টের পায়নি।

সুখলাল বলে—বাঃ।

জপেশ্বর বলে—চমৎকার।

কথা বলতে গিয়ে গার্ড মনুয়া হেসে ফেলে। —উনি আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাইছেন বাঈজীর কোন খবর আপনারা দিতে পারেন কি না।

সুখলাল হো হো করে হেসে ওঠে। —হ্যাঁ পারি। তাঁর সোহাগের বাঈজী এখন আবার সোনার তারের বেনারসী নথ নাকে লাগিয়ে কুমারী বাঈজী সেজেছে আর নাচ গানের নতুন বায়নার টাকা গুনছে। তবে হ্যাঁ, ওই রাণীবাজারে আর নয়, এই পৃথিবীর কোন একটা রাজাবাজারে।

ডায়েনা ও মালতী

কে এল নূপুর পায়?

রতনপুরা রাজ এস্টেটের কুড়ি টাকা মাইনের তসীলদার রামতনু কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি যে, জঙ্গলের জীবনে এরকম কোন প্রশ্ন থাকতে পারে। প্রফেসার চারুবাবু, যিনি কবিতার তাজমহলের প্রশান্ত পাষাণের রূপ আর মর্মকথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বন আর বনমায়ার কথা এনে ফেলতেন, তিনিও কোনদিন বলেননি যে পৃথিবীর কোথাও কোন জঙ্গলের ভিতরে নূপুরের শব্দ ছুটোছুটি করে। রামতনু নিজেও তার তসীলদারী চাকরির এই তিন মাসের মধ্যেও এই ভেলাডিহির জঙ্গলের ভিতরে

অনেক অদ্ভুত শব্দের সাড়া শুনেছে বটে, কিন্তু নূপুরের শব্দের মতো কোন শব্দ কোনদিনও শোনেনি। মাঝরাতের ঝড় একটু বেশী উতলা হয়ে উঠতেই শুনতে পাওয়া গিয়েছে, যেন কারও বাঁশীর করুণ সুর উতলা হয়ে বাতাসে ছুটে বেড়াচ্ছে। ওটা জঙ্গলের একটা বাঁশঝাড়ের কাণ্ড। ফাটা বাঁশগাছের গায়ে ঝড়ের বাতাস লেগেছে। ফট্-ফট্-ফটাস, বনের ভিতরে কোথাও যেন মুঙ্গেরী পিস্তলের ধড়কানো শব্দের মতো একটা কট্টর শব্দ বেজে উঠেছে, ডুমুর গাছের সব ঘুঘু ভয় পেয়ে উড়ছে। ওটা গিলে গাছের পাকা ফলের হঠাৎ ফেটে যাওয়ার শব্দ। কিন্তু মাঝরাতের জ্যোৎস্না যখন শাল শিশু আর সেগুনের কালোছায়ার ফাঁকে ফাঁকে গড়িয়ে-ছড়িয়ে খেলা করে, তখন ভেলাডিহির জঙ্গলকে আধঘুমের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী করা একটা মায়ার রাজ্য বলে মনে হলেও কোন নূপুরের ছুটোছুটির শব্দ কখনও শুনতে পায়নি রামতনু। ভেলাডিহি থেকে সামান্য দূরে, জঙ্গলেরই ভিতরে মিঠুয়া বস্তির ওঁরাওদের মাদলের শব্দ প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়, নাচুনী মেয়েদের গানের স্বরও একটু-একটু শোনা যায়। কিন্তু নূপুরের শব্দ নয়, ওঁরাও মেয়েদের পায়ে ঘুঙুর থাকে না।

ভেলাডিহির জঙ্গলে অপূর্ব-অদ্ভুত নূপুরের ছুটোছুটির বিস্ময় একটা চমৎকার গল্প হয়ে আর রটতে রটতে এই ভেলাডিহিতেও এসে পৌঁছেছে, সেটা হলো হাজারিবাগ জেলারই চাতরা মহকুমার একটা জঙ্গল। পালামৌ জেলার গা-ঘেঁষে চাতরা মহকুমার যে নিবিড় শালজঙ্গলের ভিতরে ছোট-বড় অনেক খয়ের গাছের উপনিবেশ ছড়িয়ে রয়েছে, সেই জঙ্গলের খবর এই যে মাসের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ-সাতটা চাঁদনী রাতে শুনতে পাওয়া যাবেই, ঘুঙুরের শব্দ উদ্দাম হয়ে ছুটোছুটি করছে। এ তো কোন মানুষ-নারীর ঘুঙুরের শব্দ হতে পারে না। তবে কার ঘুঙুরের শব্দ? সকলেরই বিশ্বাস, বনদেবীর পায়ের ঘুঙুরের শব্দ। খুশী বনদেবী চাঁদনী রাতের আলোতে উৎফুল্ল হয়ে সারা বনে এদিকে-ওদিকে ছুটে বেড়ায়।

একথা ঠিক, বনদেবীকে কেউ কখনও চোখে দেখতে পায়নি। কিন্তু তার ঘুঙুরের শব্দ অনেকেই শুনেছে। নুরগঞ্জের সার্কেল অফিসার জগদীশবাবু শুনেছে, ছোট হাটিয়ার দিগোয়ারী ঘাঁটির চৌকিদার বুধন সিং শুনেছে। আর, নূরগঞ্জ সার্কেলেরই মধ্যে ঝুমরাটি নামে পরিচিত জঙ্গলের ভিতরে রতনপুরা রাজ এস্টেটের যে তসীল কাছারি আছে, সেই কাছারির সবাই শুনেছে।

ধরে প্রশ্নটা এই ভেলাডিহির রামতনুর মনেও বেশ উতলা হয়ে উঠেছে—কে এলে নূপুর পায়? জানতে ইচ্ছা করে, জানবার জন্যে মনটা ছটফট করে, খবরটা কি সত্যিই একটা ঘটনার খবর, কিংবা নিতান্ত কাল্পনিক কুহকের চমৎকার প্রলাপ? বনদেবী চাঁদনী রাতের আলোতে উৎফুল্ল হয়ে আর নূপুর পায়ে দিয়ে জঙ্গলের ভিতরে ছুটোছুটি করে, এও কি সম্ভব? প্রফেসার চারুবাবু থাকলে তিনি অবশ্য এক মুহূর্ত না ভেবে বলে দিতেন, হতে পারে, অসম্ভব নয়। সাতদিন ধরে খবরটা শুনতে শুনতে রামতনুর মনটাও যেন বলতে শুরু করেছে, হতে পারে, অসম্ভব নয়।

রতনপুরা রাজ-এস্টেটের ঠাকুর সাহেবকে একটা চিঠি লিখে তো অনুরোধ করা চলে,

আমাকে অন্তত একটা মাসের জন্য ঝুমরাটি তসীল কাছারিতে বদলি করে দিন। শুনেছি, এই মাসেই সেখানে এস্টেটের জঙ্গলে খয়ের ভাঙবার কাজ শুরু হবে। ভাণ্ডারীজী বলছেন, এই কাজটা ভাল করে দেখাশোনা করবার জন্যে আপনি নতুন লোক খুঁজছেন। নতুন লোক কেন ? আমিই যাব। আমাকে একবার সুযোগ দিয়ে দেখুন, খয়ের কাজের ক্ষতি ও চুরি বন্ধ করে আমি এস্টেটের লাভ কিছু বাড়িয়ে দিতে পারি কি না।

কী আশ্চর্য, ভাণ্ডারীজী একটা চিঠি হাতে নিয়ে এসে হেসে ফেললেন আর বললেন—যান রামতনুবাবু, বনদেবীর ঘুঙুরের শব্দ শুনে আসুন।

চমকে ওঠে রামতনু—কী বললেন ?

—ঠাকুর সাহেব চিঠি দিয়েছেন, অন্তত দু'মাসের জন্য আপনাকে ঝুমরাটি কাছারিতে থাকতে হবে। খয়েরের কাজটার দেখাশোনা করতে হবে।

॥ দুই ॥

ঝুমরাটি তসীল-কাছারির কোন ঘরের দরজা ও জানালা সন্ধ্যার পর আর খোলা থাকে না। মাটির দেয়াল আর খাপরার চালা, ঘরগুলি তখন এক-একটা নিরেট খাঁচার মতো দেখায়। দেয়ালের মাথার কাছে দু চারটে ফোকর আছে বলে ঘরগুলি নিঃশ্বাস টানতে পারে। সাত বছর আগে ঝুমরাটির এই তসীল কাছারির একটি ঘুমন্ত ঘরের আধ-খোলা জানালা দিয়ে একটা তেন্দুয়া বাঘ ভিতরে ঢুকেছিল। আর মুহুরী মানকিরামের বোবা চাকরটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে বেচারার রোগা শরীরের প্রায় অর্ধেকটা খেয়ে ফেলেছিল। সকালবেলা মোষের স্নানের কাদাটে ডোবাটার কিনারাতে জংলী কুলের ঝোপের ওপর একটা শুকুনকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে বোবার লাসের বাকি অর্ধেকটার খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। এই ভয়ানক অভিজ্ঞতার শিক্ষায় সাবধান হয়েছে ঝুমরাটি তসীল-কাছারির ঘরগুলি।

শুধু একটি ঘর, যার চার দেয়ালে রঙীন আলপনা, আর বারান্দাতে পাতাবাহারের টবের সারি, তার চেহারাতে কোন সাবধানতা নেই। সন্ধ্যা হলেও ঘরের বড়-বড় জানালা অনেকক্ষণ, কোন কোন দিন মাঝরাত পর্যন্ত খোলা থাকে, ঘরের ভিতরে টেবিলের ওপর ল্যাম্প জ্বলে। আর একটা চেয়ারের ওপর যাকে বসে থাকতে দেখা যায়, তার প্রাণটার ভিতরেও কোন সাবধানতা আছে বলে মনে হয় না। সন্ধ্যা হবার পর গাছের মাথা বাতাস লেগে দুলে উঠতেই অন্য সব ঘরের বন্ধ জানালার গায়ের ওপর যখন এক-একটা ঘুটঘুটে অন্ধকারের পিণ্ড রাতের বাঘের ছায়া-চেহারার মতো নড়চড় করে, তখন এই সুশ্রী কেবিন-ঘরের খোলা জানালাতে জাগা আলোর হাসি থমথম করে। সুশ্রী মানুষটি, যিনি চেহারার ওপর বসে বই পড়েন আর লেখালেখি করেন, তিনি এই তসীল কাছারির কেউ নন। তিনি ঠাকুর সাহেবের বেয়াই-এর মোক্তার নন্দলালবাবুর ভাইপো, জীবনলাল।

বদলী হয়ে ঝুমরাটির তসীল-কাছারিতে এসে প্রথম দিনেই কুড়ি বছর বয়স আর কুড়ি টাকা মাইনের তসীলদার রামতনুর সঙ্গে যে-মানুষটির বেশ একটু কথা কাটাকাটির ব্যাপার

হয়েছে, সে হলো এই জীবনলাল। রামতনুর সঙ্গে দেখা হতেই প্রশ্ন করেছে জীবনলাল—কী মশাই, আপনি এখানে কেন?

রামতনু—আপনি কি আমাকে চেনেন?

—না। দেখে মনে হচ্ছে আপনি একজন এডুকেটেড মানুষ।

—তা, মনে করতে পারেন।

—তাই জিজ্ঞেস করছি পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে এই জঙ্গলে মরতে এলেন কেন?

—আপনিই বা এই জঙ্গলে আছেন কেন?

—আমি এখানে আছি, খুড়োর সম্পত্তি পাব বলে। আমার দেহটা শুধু এখানে পড়ে আছে, আমার প্রাণটা পড়ে আছে সেখানে, শোনপুরের মালতীর কাছে।

দশ মিনিটের মধ্যে অনেক কথা বলে জীবনলাল। তার মুখের ভাষাটা খুবই বেহায়া বটে, কিন্তু বুঝতে দেরি হয় না রামতনুর, ভদ্রলোক মিথ্যে কিছু বলছেন না। ঠিকই, জঙ্গলে থাকেন বটে জীবনলাল কিন্তু জঙ্গলকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করেন।

মোক্তার নন্দলালবাবুর এই ভাইপো জীবনলালই তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে, কারণ নন্দলালবাবুর কোন ছেলে বা মেয়ে নেই। খুড়ো বলেছেন—চাকরি-বাকরি যদি না করতে চাও, করো না। কিন্তু কুঁড়ে হয়ে বসে থাকতে পারবে না। বিষয়সম্পত্তির অন্তত একটু তদারকী কাজ কর, করতে শেখ, নইলে বিশ্বাস করবো কেন যে, তুমি আমার বিষয়-সম্পত্তি ভোগদখল করবার যোগ্য লোক? যদি কাজ করতে আর যোগ্যতার প্রমাণ দিতে না পার, তবে জেনে রাখ, আমার সব বিষয়-সম্পত্তি আর্যসমাজ মিশনকে দান করে দেব।

ঝুমরাটির জঙ্গলের ভিতরে সোপ-স্টোনের দশটা বড় বড় খাদ নন্দলালবাবুরই সম্পত্তি। সম্পত্তির তদারক করবার জন্যে জঙ্গলের ভিতরে একটা ঠাঁই নিয়েছে জীবনলাল। এই হলো ব্যাপার। জীবনলাল বলে—কারবারের তদারকী-ফদারকীর কোন ধার আমি ধারি না। যা করবার সবই করে মুন্সী ত্রিলোচন। আমি আছি শুধু খুড়োর সম্পত্তি পাওয়ার ভাগ্যটাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে। আপনার মতো তসীলদারী করবার জন্য জঙ্গলে আসতে হলে, তাই বা কেন, আসবার আগেই আমি সুইসাইড করতাম। আমার জীবনে শুধু দুটি ইচ্ছা। এক খুড়োর সম্পত্তি চাই। দুই, মালতীকে চাই।

জীবনলালের মুখের ভাষা হঠাৎ আরও বেহায়া হয়ে রামতনুকে বুঝিয়ে দেয়। যেমন আমার স্বপ্ন হলো মালতী, তেমনই মালতীর স্বপ্ন হলো এই জীবনলাল। শোনপুরে আমার মামাবাড়ি, মামাবাড়ির বাগানের একটি চমৎকার নিরালাতে, যেখানে চামেলীর লতাঝাড়ের ওপর জোড়া প্রজাপতি উড়ে বেড়ায় সেখানে আমি মালতীকে প্রথম চুমো খেয়েছিলাম। মালতী আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিল।

এ তো প্রায় পাঁচ বছর আগের কথা। আমি তখন গ্র্যাজুয়েট, মালতী তখন ম্যাট্রিক। আজ মালতী অবশ্য শোনুপরের মেয়ে-স্কুলের টীচার হয়েছে, আর আমি সোপস্টোনের একজন বনবাসী কারবারী হয়েছি, কিন্তু মালতীর কাছে আমি আজও সেই জীবন, আমার

কাছে মালতী আজও সেই মালতী। চলুন রামতনুবাবু, আমার ঘরের ভিতরে এসে একবার মালতীর চিঠিগুলি পড়ুন। তারপর বলবেন এরকম ভালবাসার ব্যাপার আপনি আগে কোথাও দেখেছেন কি দেখেননি। কিন্তু....।

কথা থামিয়ে বুকের ওপর হাত বোলায় জীবনলাল, নিঃশ্বাসটাও হঠাৎ যেন হাঁসফাঁস করতে থাকে। জীবনলাল বলে—কিন্তু এখানে আসবার পর আমার বুকের ভিতরে একটা অদ্ভুত ব্যথার রোগ দেখা দিয়েছে। এই বনবাস আর সহ্য করতে পারছি না। কবে যে খুড়োর সম্পত্তি পাব, বুঝতে পারছি না। কবে যে মালতীর সঙ্গে বিয়ে হবে, তাও বুঝতে পারছি না। একটা সান্ত্বনা এই যে, মালতীর চিঠি পেলে অন্তত দশটা দিন আমার বুকে কোন ব্যথা থাকে না।

রামতনুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থেকে তারপর হেসে ফেলে জীবনলাল—আপনার বুকেও বোধহয় এক-আধটুকু ব্যথা ট্যথা আছে।

রামতনু—না মশাই, না।

—তবে এই জঙ্গলের ভিতরে টিকে থাকবেন কী করে?

—চাকরিটা টিকে থাকলে আমিও টিকে থাকতে পারবো।

—এঃ, আপনি মশাই একেবারে একটি মাথা-খারাপ মানুষ। ভাল চান তো, জঙ্গল ছেড়ে চলে যান, কলকাতায় কিংবা পাটনাতে গিয়ে একটা মেয়ের সঙ্গে ভাবসাব করুন, ভালবাসুন।

—আপাতত যাচ্ছি না।

—তবে থাকুন। দিনের বেলাতে কাঁকড়া বিছার সঙ্গে গল্প করুন, আর রাত্রিতে ফেউয়ের ডাক শুনুন।

—লোকে বলছে, এই জঙ্গলে রাত্রিবেলা ঘুঙুরের শব্দ শোনা যায়।

—এঃ, আপনি শিক্ষিত মানুষ হয়েও বড়ই বাজে বিশ্বাসের মানুষ। ভাং-খেকো চৌকিদার বুধন সিং যা বিশ্বাস করে, আপনিও তাই বিশ্বাস করেছেন? আমি তো মাঝরাত পর্যন্ত জেগে থেকেও কোনদিন এরকম রোমান্টিক কোন শব্দ শুনতে পাইনি।

—লোকে বলছে, বনদেবীর পায়ের ঘুঙুরের শব্দ।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে জীবনলাল। বাঃ, মূর্খদের কী চমৎকার বিশ্বাস। বনদেবী কেন কোন বনবাঈজীও রাত্রিবেলা এই জঙ্গলে ঘুঙুর বাজিয়ে ঘুরে বেড়াতে আসবে না। এই জঙ্গল হলো ন্যাংটো জানোয়ারের রাজ্য।

—কিন্তু...

....না কোন কিন্তু-টিন্তু নেই। আমি বলবো নরক নামে কোন জায়গা যদি থেকে থাকে তবে সেটা নিশ্চয়ই একটা জঙ্গল।

রামতনুর শান্ত চোখের কোণে বেশ দুঃসহ একটা অস্বস্তির ছায়া কাঁপতে থাকে। গলার স্বরও বেশ একটু রুক্ষ হয়ে জীবনলালকে পাল্টা একটা প্রশ্ন করে ফেলে—স্বর্গ নামে যদি কোন জায়গা থেকে থাকে, তবে সেটা বোধহয় একটা শহর?

জীবনলাল বলে—হ্যাঁ, সেটা শোনপুরের মতো একটা শহর।

বুঝতে পারে রামতনু, জীবনলালের সঙ্গে আর তর্ক করে কোন লাভ নেই। বনদেবী কথাটাকেও ঠাট্টা করে বন-বাঈজী বলে যে ব্যক্তি, তার কাছ থেকে বনের জীবনের কোন বিস্ময়ের খবর পাওয়া যেতে পারে না।

কিন্তু ঘুঙুরের শব্দটা কি সত্যিই ভাং-খাওয়া যত গেঁয়ো চৌকিদারের কল্পনার শব্দ? মিথ্যুক গুজবের শব্দ? জীবনলালের কথাগুলি রামতনুর কৌতূহলের আবেগটাকে দমিয়ে দিতে চাইলেও দমিয়ে দিতে পারেনি। একটু অবশ করে দিয়েছে, এই মাত্র। কিন্তু সন্ধ্যে হতেই ঝুমরাটির জঙ্গলের ওপর পূর্ণ চাঁদের কিংবা টুকরো চাঁদের জ্যোৎস্নাময় মায়া যখন ছড়িয়ে পড়ে, তখন রামতনুর প্রাণের ভিতরেও যেন অদ্ভুত এক মায়াময় বিশ্বাসের জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে। একটু চেষ্টা করে দেখাই যাক না রাত জেগে খোলা জানালার কাছে বসে থাকলেই তো হয়। হোরাশিয়োর ফিলসফি যা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না, তেমন ঘটনার সত্য স্বর্গে-মর্ত্যে থাকতেও তো পারে।

কী চমৎকার ঢলঢলে জ্যোৎস্না। ঘুমন্ত শিশু যেমন নীরব নিথর ও শান্ত হয়ে মায়ের বুকের দুধ পান করে, এই ঝুমরাটি জঙ্গলের শান্ত সেগুন আর দেওদার বন তেমনি নিথর নীরব ও শান্ত হয়ে চাঁদের ঢলঢলে আলো পান করছে। ফেউ ডাকে না, একটা ঝিঁঝির শব্দও নেই, গাছের মাথায় কোন পাখির ডানাঝাড়ার শব্দ উসখুস করে না। এরকম একটা শব্দহীন আবেশের মধ্যে বনদেবীর নূপুরের তো শব্দহীন হয়ে যাবার কথা।

রাত বাড়ে, তবু রামতনুর চোখে ঘুম নেই, একটা শব্দ না শোনা পর্যন্ত আজ জেগেই থাকবে রামতনু। অন্তত একটা দুরন্ত শজারুর গায়ের কাঁটা ঝুমঝুম করে বেজে উঠুক। তা হলেই বুঝতে পারবে রামতনু, এই শব্দটাই লোকের মুখে ঘুঙুরের শব্দের গল্প হয়ে রটেছে।

চমকে ওঠে রামতনু। শিউরে ওঠে বুকটা। সত্যিই যে একটা ঘুঙুরের শব্দ ছুটে চলে যাচ্ছে। ছুটে-চলা দুরন্ত শজারুর কাঁটার শব্দ নয়। খাঁটি ঘুঙুরের শব্দ। ঘুঙুরের শব্দটা ছুটে এসে, কাছারিবাড়ির খুব কাছে মোষের স্নানের কাদাটে ডোবাটার ওপারে আলো-ছায়ার মধ্যে পুরো একটা মিনিট ধরে, যেন মত্ত নাচের তালের একটা বোল বাজিয়ে দিয়ে আবার এক মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। শুনতে পায় রামতনু বনের শান্ত বাতাসের গা শিউরে দিয়ে ঘুঙুরের মিষ্টি শব্দটা দূর থেকে আরও দূরে ছুটে যেতে যেতে শেষে একেবারে মিলিয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে, প্রায় আরও দুটি ঘন্টা বিস্ময়ের আবেশে একবারে বিহ্বল হয়ে বসে থাকে রামতনু। বনদেবীকে চোখে দেখতে পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু কেউ একজন তো এল আর চলে গেল। কে সে?

আবার একবার চমকে ওঠে রামতনু। এটাও একটা শব্দ-শোনা চমক। মনে হলো, অনেক দূরে কোথাও কেউ যেন বন্দুকের গুলি ছুঁড়েছে। ভুট্ ভুট্, দুটো ভোঁতা শব্দের আঘাতে শান্ত জ্যোৎস্না আহত হয়েছে। কাছারিবাড়ির আঙিনায় নিমগাছের মাথায় পাতাজড়ানো আবছায়ার মধ্যে কয়েকটা কাক ছটফট করে উঠলো।

।। তিন ।।

একটা সমস্যায় পড়েছে রামতনু। পুরো একটা মাস পার হয়ে গেল, তবু সমস্যাটা মিটছে না। খয়ের গাছ ভাঙবার সব লোক ভিতর-জঙ্গলের ছাউনি ছেড়ে পালিয়ে এসেছে আর দূর গাঁয়ে নিজের নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছে। ছাউনির চারদিকে বাঘের পায়ের বড়-বড় থাবার ছাপ দেখে সবাই ভয় পেয়েছে। চাতরা বাজারের মহাজনের গো-গাড়ি মাঝে মাঝে আসছে। কিন্তু মাল না পেয়ে আবার ফিরে চলে যাচ্ছে। রামতনুর মনের ভয়, ঠাকুরসাহেবের কাছ থেকে একটা বিরক্ত চিঠি এসে পড়লো বলে। কৈফিয়ত দিতে হবে, কাজের এরকম গোলমেলে অবস্থা আর কতদিন চলবে? বাঘের পায়ের ছাপ দেখে ভয় পায়, এমন লোককে খয়ের ভাঙবার কাজে লাগিয়েছো কেন?

এই একটা মাসের কোন রাতের কোন মুহূর্তে ঘুঙুরের শব্দ শুনতে পায়নি রামতনু। তবু মনের ভিতরে প্রশ্নটা যেন একটা তেষ্টার মতো ছটফট করে, সত্যি ওটা কার ঘুঙুরের শব্দ?

রামতনুকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে ডাক দিল জীবনলাল—একবার এসে শুনে যাও ভাই রামতনু। অনেক খবর আছে, ভাল ভাল খবর।

—বলুন, কী খবর।

—প্রথম খবর, মালতী কবিতা করে একটা চিঠি লিখেছে ঃ শীতের এই দুটি মাস ফুরিয়ে গেলেই তো বসন্ত। সেই বসন্তেরই একটি দিনে চামেলী লতায় নতুন ফুল ফুটবে, অলি উড়বে আর কোকিলও ডাকবে।

—ভাল কবিতা।

—কিন্তু কবিতার মানেটা বুঝতে পেরেছো কি? পারনি। মানে হলো আর দুটি মাস পরে ফাল্গুন মাসের কোন একটি শুভ দিনে মালতীর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।

—ভাল, খুব ভাল।

—কে জানে কেমন করে আমার আর মালতীর ভালবাসার কথা জানতে পেরেছেন খুড়ো। তাই মালতীর বাবাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, বিয়েটা আসছে ফাল্গুনেই হয়ে যাক, আর দেরি করবার কোন মানে হয় না। আমাকেও চিঠি লিখেছেন খুড়ো—আর ওই জঙ্গলের মধ্যে পড়ে থাকবার দরকার নেই। আঃ। কী যে আনন্দ বোধ করছি, রামতনু। বলে বোঝাতে পারব না। আগের জন্মে অনেক পুণ্যি করেছিলাম বলে এই জন্মে মালতীর ভালবাসা পেয়েছি।

জীবনলালের ঘরের দরজার বাইরে পথের ওপর একটা আগন্তুক সাইকেলের ঘন্টির শব্দ বেজে উঠছে। দেখতে পায় রামতনু, সার্কেল অফিসার জগদীশবাবু আসছেন। খাতাপত্তর হাতে নিয়ে একজন দফাদার তাঁর সাইকেলের পিছু ধরে দৌড়ে দৌড়ে আসছে।

ঘরে ঢুকলেন আর চেঁচিয়ে হেসে উঠলেন জগদীশবাবু—মিঠাই খাওয়াও জীবনলাল, আমি তোমার জীবনের নতুন খবর শুনেছি।

রামতনু হঠাৎ বলে ওঠে— শুনেছি স্যার, আপনি নাকি জঙ্গলের ভিতরে একটা ঘুঙুরের ছুটোছুটির শব্দ শুনেছেন?

জগদীশবাবু—হ্যাঁ, শুনেছিলাম। আপনিও শুনেছেন নাকি?

রামতনু—হ্যাঁ।

—কবে?

—এক মাস আগে।

—তাই বলুন। আর কখনও শুনতে পাবেন না। সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। এই একটা মাস এই নিয়েই তো ব্যস্ত ছিলাম।

—ওটা কার ঘুঙুরের শব্দ স্যার?

—জানেন না? শোনেননি কিছু?

—না।

—ওটা একটা বাঘিনীর গলায় বাঁধা ঘুঙুর।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে জীবনলাল—এখন বুঝলে তো রামতনু? কোন দেবীর ঘুঙুর নয়, কোন মানবীর ঘুঙুরও নয়, একটা.....যাকে বলে, একটা পাশবীর ঘুঙুর।

সার্কেল অফিসারও হাসেন, কিন্তু অন্যরকমের হাসি। —পাশবী বলুন আর যাই বলুন, এই বাঘিনী কিন্তু বেশ জমিয়ে প্রেম করতে জানে। এই জঙ্গলেরই একটা বাঘের সঙ্গে প্রেম জমিয়ে তুলেছে বাঘিনীটা।

—কী যে বলেন জগদীশবাবু। আবার হেসে ওঠে জীবনলাল। —এসব ভাং-খাওয়া গল্পের কথা আপনিও বিশ্বাস করেন দেখছি, কী আশ্চর্য!

জগদীশবাবু—না হে, না। আমি সব জানি বলেই বলছি। বাঘিনী ডায়েনার গলার ওই ঘুঙুরের শব্দটাকে একজন অভিসারিকার নূপুরের শব্দ বলে মনে করলে একটুও ভুল করা হয় না।

রামতনু—ডায়েনা?

জগদীশবাবু—হ্যাঁ, বাঘিনীটার নাম ডায়েনা। কেন, তুমি কি ডায়েনার কথা কখনও শোননি?

—না।

—তুমি আমাদের এই চাতরার এস-ডি-ও মিস্টার প্রাইসের নাম শুনেছ কি?

—শুনেছি।

—চাতরা বাজার আর থানা থেকে প্রায় এক মাইল দূরে জঙ্গলের গা-ঘেঁষে একটা টিলার ওপর এস-ডি-ও'র চমৎকার বাংলোটাকে কখনও দেখেছো কি?

—না।

—তাই বল, সেই বাংলোর দিকে তাকালেই দেখতে পেতে, প্রাইস সাহেবের পোষা বাঘিনী ডায়েনা বারান্দার কার্পেটের ওপর শুয়ে রয়েছে। পোষা কুকুরের চেয়েও বেশী পোষমানা একটা রয়্যাল টাইগ্রেস। ডায়েনা এই জঙ্গলেরই বাঘ-বাঘিনীর মেয়ে। মাত্র এক মাস বয়সের একটা বাচ্চা বাঘিনীকে একদিন জঙ্গলের একটা মহুয়ার ছায়াতে ঘাসের ওপর পড়ে থাকতে দেখেছিল প্রাইস সাহেবের ঘোড়ার ঘাসকাটা সহিস। বাচ্চা বাঘিনীকে

কুড়িয়ে নিয়ে এসে একেবারে সাহেবের কোলের ওপর বসিয়ে দিয়েছিল। সেই বাচ্চা বাঘিনীটাই হলো আজকের যুবতী-বাঘিনী ডায়েনা। আমি নিজের চোখে দেখেছি আয়ার আঁচল টেনে, মালীর মাথা শুঁকে দুষ্টুমির খেলা খেলছে ডায়েনা। লনের ওপর রঙীন বলের সঙ্গে হুটোপুটি করছে। সাহেবের কুকুর, একটা এইটুকু ভুটিয়া ল্যাপডগ সাহেবের কাঁধের ওপর বসে ধমক ছাড়ছে। ধমক শুনেই পালিয়ে গেল ডায়েনা, দৌড়ে গিয়ে আস্তাবলের ভিতরে ঘোড়াটার পিছনে লুকিয়ে রইল।

রামতনুর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন সার্কেল অফিসার জগদীশবাবু। —এই বাঙালীবাবুর বয়স খুব কম। তাই বলতে একটু লজ্জাবোধ করছি, কিন্তু বলেই ফেলি।

জীবনলাল—বলুন, বলুন! উনি একজন ঝানু তসীলদার, বয়স কম হলেও লজ্জা-টজ্জা হজম করতে জানেন।

জগদীশবাবু—এক মাঝ রাতে হঠাৎ একটা শব্দ শুনে সাহেবের ঘুম ভেঙে গেল। কিচেনের পিছনে একটা খোলা জায়গাতে চাতালের ওপর ডায়েনার স্নানের জন্য তৈরী করা প্রকাণ্ড টবটা থাকে, সেটাকে কে যেন ধাক্কা দিয়েছে। টর্চের আলো ফেলে দেখতে পেলেন সাহেব, টবের কাছে ডায়েনা বসে আছে। পর মুহূর্তে বুঝলেন, না না, ডায়েনা কেন হবে? ডায়েনা ওই তো পাশের ঘরের কার্পেটের ওপর বসে রয়েছে আর ছটফট করছে। ওটা অন্য একটা বাঘ। বাঘের পিঠের মাঝখানে মস্ত বড় একটা কাটা-দাগ।

আবার টর্চের আলো ফেলতেই আগন্তুক বাঘটা লাফ দিয়ে সরে গেল। এক মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। কিন্তু সাহেব আর ঘুমোতে পারলেন না। রাত জেগে অনেক কথা ভাবলেন। ডায়েনাও উঠে এসে সাহেবের পায়ের কাছে চুপ করে বসে রইল। ডায়েনার চোখেও ঘুম নেই। সাহেব বার বার ডায়েনার পিঠে মাথায় ও গলায় হাত বোলালেন।

পর দিন রাতটা একটু ঘনিয়ে উঠতে ফালি চাঁদের ফিকে জ্যোৎস্নাটা যখন একটু নিবিড় হয়ে উঠলো, তখন বাংলোর পিছনের ফটকটা খুলে দিলেন মিস্টার প্রাইস। ডায়েনার গলাতে একটা ঘুঙুর বেঁধে দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে সামনের খেজুর জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল ডায়েনা। পিঠ-কাটা বাঘটার সঙ্গে খেলা করে ফিরে আসুক ডায়েনা।

রামতনু—গলায় ঘুঙুর বেঁধে দিলেন কেন?

জগদীশবাবু—চেনবার জন্যে। ঘুঙুরের শব্দ শুনলেই বুঝতে হবে, মাঝ রাতের জঙ্গলে ছুটোছুটি করবার পর শেষ রাতে সত্যি ডায়েনাই ফিরে এসেছে, অন্য কোন বাঘ নয়। যদি ডায়েনার সঙ্গী হয়ে কোন বাঘ এসে পড়ে, তবে তাকেও চিনতে পারা যাবে। কানেস্তারা বাজিয়ে আওয়াজ করবে খানসামা, বাঘটাও পালিয়ে যাবে।

যাক, সেসব ব্যাপার তো চুকেই গিয়েছে। জঙ্গলের ভিতরে ডায়েনার ঘুঙুর আর কোনদিনও বাজবে না। ডায়েনাকে লণ্ডনের জু'তে চলে যেতে হবে। আমিই ডেপুটি কমিশনারের কাছে বেনামে একটা কমপ্লেনের চিঠি পাঠিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে স্টেপ নিয়েছেন ডিসি।

হেসে ফেলেন সার্কেল অফিসার জগদীশবাবু। —কমপ্লেনের সত্য-মিথ্যা তদন্ত করে রিপোর্ট করবার ভার আমাকেই দিলেন ডেপুটি কমিশনার, জবরদস্ত আই সি এস মিস্টার ব্লেয়ার। বাঘের সায়েন্স তাঁর খুবই ভাল জানা আছে। যা-হোক, তদন্ত করবার ভার পেয়েছিলাম বলেই তো প্রাইস সাহেবকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করবার চান্স পেয়েছিলাম। সাহেবও ডায়েনার পুরো হিস্ট্রি আমাকে শুনিয়েছিলেন। রিপোর্টে আমি সাহেবের ওপর কোন দোষ চাপাইনি। সাহেব নিজে নয়, সাহেবের দুই ছোকরা ছেলে স্কুলের ছুটিতে সিমলা থেকে এখানে আসবার পর পনেরো দিনের মধ্যে তিনটে বাঘকে শিকার করেছে। শিকার তো নয়, মার্ডার। এত সহজে কেউ একটা ফড়িংকেও মারতে পারে না। রাত্রিবেলা খেজুর জঙ্গলের ভিতরে মাচান করে বসে থাকতো দুই ছোকরা, গলার ঘুঙুর বাজিয়ে ডায়েনা ভিতর-জঙ্গল থেকে ছুটে এসে বাংলোর দিকে চলে যেতেই দেখা যেতো, একটা নিরেট কালো ছায়ার পিণ্ড ছুটে এসেছে, তার মানে একটা বোকা বাঘ ছুটে এসে লাফালাফি করে যেন ডায়েনার ঘুঙুরের শব্দটাকে খুঁজছে। বুঝতে পারছো তো, রামতনু? কেন কিসের লোভে এক-একটা নতুন বাঘ উতলা হয়ে ডায়েনার পিছনে ছুটে আসতো।

জীবনলাল—হ্যাঁ হ্যাঁ, সবই বুঝেছি, আমি ওকে এই দু'মাসের মধ্যে অনেক কিছু বুঝিয়ে পাকা করে দিয়েছি।

সার্কেল অফিসার জগদীশবাবুর দুই চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ রাগ করে আর দপ্ করে জ্বলে ওঠে। —এই রকম তিনটে বোকা বাঘকে গুলি করে মেরেছে ওই দুটো চ্যাংড়া ছোকরা। আমি আগে জানতে পারলে ওদের হাত দুটোকে ভেঙে দিয়ে ওদের বন্দুকের সুড়সুড়ির সুখ ভেঙে দিতাম। যাই হোক, প্রাইস সাহেবের কাছে ডেপুটি কমিশনার ব্লেয়ার সাহেবের কড়া ধমকের একটা চিঠি এসে পৌঁছতেই দুই ছোকরা আবার সিমলাতে পালিয়েছে। আর, প্রাইস সাহেবও ভয় পেয়েছেন। ডেপুটি কমিশনারের অর্ডার ঃ পোষা বাঘিনীকে ঘুঙুর পরিয়ে জঙ্গলে ছেড়ে দেবার খেলা বন্ধ করুন। আর, যত তাড়াতাড়ি পারেন, পোষা বাঘিনীকে লণ্ডনের জু'তে পাঠিয়ে দিন। তিন মাস সময় দিলাম।

জোরে একটা হাঁফ ছেড়ে দিয়ে সার্কেল অফিসার জগদীশবাবু আবার হাসতে থাকেন। মৃদু মৃদু মিষ্টি হাসি। —ভাল কথা, বেশ মজার কথাও বটে, ডায়েনার পীরিতের বাঘটা ওই বজ্জাত ছোকরা দুটোর বন্দুকের গুলির মার থেকে বেঁচে গেছে। কে জানে কেন, ওই পিঠকাটা বাঘটা কোন রাতে ওদের মাচানের ছায়ার ধারে-কাছেও আসেনি। কে জানে, হয়তো ঘুঙুরওয়ালী ডায়েনাই ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সাবধান করে দিয়েছিল।

জীবনলাল মুখ বেঁকিয়ে হেসে ওঠে। —আহা উনি তো বাঘিনী নন, উনি একটা লায়লা, একটি শকুন্তলা, নয়তো একটি সাবিত্রী, প্রিয়তম পতির প্রাণ বাঁচাবার আর্ট জানেন।

জগদীশবাবু হাসেন। —না, তা নয়। আমি তা বলছিও না। কিন্তু হতেও তো পারে। ট্রুথ ইজ....কী যেন লাইনটার বাকি কথাগুলি? রামতনু নিশ্চয় বলতে পারবে।

রামতনু—স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন।

জগদীশবাবু—ব্যস্ ব্যস্, ভাই জীবনলাল শুনে রাখুন। আমি এ নিয়ে আর তর্কাতর্কি করতে চাই না।

রামতনু—আমার একটা কথা ছিল।

জগদীশবাবু—বলুন।

—আমার খয়েরের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। খয়ের গাছ ভাঙবার জন্য লোকজন যারা জঙ্গলের ভিতরে ছিল, তারা সবাই পালিয়ে এসেছে।

—কেন?

—ওদের ছাউনির কাছে বাঘের পায়ের অনেক ছাপ ওরা দেখতে পেয়ে ভয় পেয়েছে।

—বলতে পারেন, ছাপগুলি কি সবই একই বাঘের পায়ের?

—সর্দার সিয়ারাম বলছে, দুটো বাঘের পায়ের ছাপ।

দুই চোখ অপলক করে কী যেন ভাবলেন সার্কেল অফিসার জগদীশবাবু। তারপর বিড় বিড় করে কথা বলেন, তাঁর গলার স্বর আর কথা বলবার শক্ত ভঙ্গীটা বেশ ঢিলে হয়ে গিয়েছে। —বুঝেছি। মিস্টার প্রাইস আবার একটা চালাকি চেলেছেন। ডায়েনার গলার ঘুঙুর খুলে নিয়ে ডায়েনাকে রাতের জঙ্গলে ছেড়ে দিচ্ছেন। ডায়েনা ওর পীরিতের সেই পিঠকাটা বাঘটার সঙ্গে খেলা করে আবার চলে যায়। যাক, আমি আর এ নিয়ে কোন কমপ্লেন করবো না। প্রাইস সাহেবকেও কিছু বলবো না। ....কিন্তু আর, কটাই বা দিন বাকি? ডায়েনা লণ্ডন জু'তে চলে গেলেই পিঠ-কাটা বাঘটা আর জঙ্গলের এই তল্লাটে আসবে না, অন্য জঙ্গলের অন্য তল্লাটে চলে যাবে। আর দশ-বারোটা দিন ধৈর্য ধরে থাক, রামতনু। খয়েরের কাজ আবার চালু করতে পারবে।

।। চার ।।

সারা সকাল ধরে বৃষ্টি ঝরছে। ঝুমরাটির জঙ্গল ভিজে গিয়ে অদ্ভুত রকমের একটা চকচকে শোভা ধরেছে। সর্দার সিয়ারামকে সঙ্গে নিয়ে আর ভিতর-জঙ্গলে ঢুকে একবার দেখে এসেছে রামতনু, ছাউনির চারদিকে বাঘের পায়ের সব ছাপ মুছে গিয়েছে। সাতদিন পার হবার পর আবার দেখে এসেছে, ছাউনির চারদিকের এখানে-ওখানে কোথাও নতুন করে বাঘের পায়ের ছাপ পড়েনি। প্রাইস সাহেবের পোষা বাঘিনী ডায়েনা নিশ্চয় খাঁচাবন্দী হয়ে লণ্ডনের জু'তে চলে গিয়েছে।

চাতরা বাজারের খয়ের-কেনা মহাজন হরিরাম সাহু এসে বললেন—হ্যাঁ, বাঘিনীটাকে বিলাতে চালান করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কট্টর মেজাজের প্রাইস সাহেব কি বাঘিনীটাকে বিলাতের চিড়িয়াখানাতে পাঠিয়ে দিতে সহজে রাজি হয়েছেন? না, সহজে রাজি হননি। হাজারিবাগ থেকে ডেপুটি কমিশনার নিজে ছুটে এসে অনেক ধমক-ধামক করেছেন, তবে রাজি হয়েছেন। খুব বাজে একটা ছুতো ধরেছিলেন প্রাইস সাহেব। তাঁর ইচ্ছে, জঙ্গলের বাঘিনীকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হোক। চিড়িয়াখানাতে পাঠালে ভুল করা হবে?

গর্জে উঠেছেন ডেপুটি কমিশনার—কেন? কী ভুল হবে?

প্রাইস সাহেব বললেন—মেলামেশা করবার মতো সঙ্গী পাবে না এই বাঘিনী। কিন্তু এখানে এই জঙ্গলের ভিতরে ভাল সঙ্গী পাবে। এই জঙ্গলের একটা বাঘের সঙ্গে ওর খুব ভাল ভাব সাব হয়েও গিয়েছে। কাজেই আপনার কাছে আমার অনুরোধ...।

আবার রেগে গিয়ে কড়কড় স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন ডেপুটি কমিশনার সাহেব—থামুন; আপনি বোধহয় জানেন না যে, আমি জুলজির ফার্স্ট ক্লাস এম-এ। আমার কাছে এসব বাজে গল্প, মিথ্যে গল্প, একটা অজুহাতের গল্প বলবেন না।

প্রাইস সাহেব—না, একটুও মিথ্যে গল্প নয়।

—মিথ্যে গল্প তো বটেই, তা ছাড়া এটা একটা বিপদের গল্প। আপনার পোষা বাঘিনী ছাড়া পেয়ে জঙ্গলে গেলেও মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই বাজার বস্তি ও গাঁয়ের আনাচে-কানাচে ঢুকে পড়বে। ওর সঙ্গে অন্য বাঘও আসবে। গরু মোষ ও মানুষকে মারবে। বলুন, ভুল বলছি?

—ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু ওর একটা স্বাভাবিক ইচ্ছার ব্যাপারও তো আছে। সঙ্গী না পেলে...।

—লণ্ডনের জু'তে অনেক ভাল সঙ্গী পাবে আপনার পোষা বাঘিনী। ঝুমরাটি জঙ্গলের বাঘের চেয়ে অনেক স্বাস্থ্যবান ভাল জাতের বাঘ।

—হোক ভাল-জাতের বাঘ, তবু তাকে পছন্দ করতে কিংবা মেনে নিতে পারবে না ডায়েনা।

হেসে ফেললেন ডেপুটি কমিশনার।—আপনি বড়ই সরল মনের মানুষ, মিস্টার প্রাইস। ভুল, খুব ভুল ধারণা মনের মধ্যে পুষে রেখে আপনি মিথ্যে সন্দেহের দুঃখ ভোগ করছেন। আমি জোর করে বলছি, এই ডায়েনাকে লণ্ডনের জু'তে পাঠিয়ে দেবার পর চারটে মাস পার হতেই আপনি খবর পাবেন, ডায়েনার চমৎকার একজোড়া বাচ্চা হয়েছে।

মহাজন হরিরাম সাহু হেসে ওঠে।—পাগলা প্রাইস সাহেব এর পর আর কোন কথা বলেননি। ছুতোর ডাকিয়ে খাঁচা তৈরী করিয়েছেন। আর গাঙ্গুলী ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর মোটর লরি এসে খাঁচাবন্দী বাঘিনীটাকে বিলাতী জাহাজের কলকাতা অফিসে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু আমার মাল কই খয়েরবাবু? পাঠাতে আর কত দেরি করবেন?

রামতনু—না, আর দেরি হবে না।

রামতনুর কাজের জীবনটা আবার ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সর্দার সিয়ারাম আবার কাজের লোক যোগাড় করে আনে। পুরো দমে খয়ের ভাঙবার কাজ চলতে থাকে। ধকধকে আগুনে ভরা চিতের মতো বড়-বড় উনুনের ওপর চাপানো বড়-বড় কড়াইয়ের মধ্যে খয়েরের ডালপালা আর ছাল বাকলের কাথ ঘন রক্তের ক্ষীরের মতো চেহারা নিয়ে টগবগ করে। এইসব কাটা-ছাঁটা ও ভাঙ্গা খয়ের গাছে আবার পাতা ধরবে, ফুল ফুটবে, ফিকে হলুদ রঙের হাজার হাজার ফুল। কিন্তু বাঘিনী ডায়েনা তার বন্ধু বাঘের সঙ্গে খেলা করতে এখানে আর আসবে না।

প্রায় রোজই বস্তাবন্দী খয়ের গো-গাড়িতে বোঝাই হয়ে চাতরা বাজারে যায়। ওজন করা, চালান লেখা আর হিসেব করার কাজ শেষ করতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। তখন কিছুক্ষণ ঝুমরাটির ঘন জঙ্গলের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকা রামতনুর একটা অভ্যাস হয়ে উঠেছে। নিরেট অন্ধকার হোক কিংবা নিবিড় কুয়াশা হোক, অথবা ঘোলাটে জ্যোৎস্না হোক, দেখে মনে হয় জঙ্গলের গাছগুলি যেন ডায়েনার কথা ভাবছে।

একটি মাস এইভাবে ফুরিয়ে যাবার পর ঠাকুর সাহেবের চিঠি পেল রামতনু—খুব ভাল কাজ হয়েছে রামতনু। আমি খুব খুশী হয়েছি। হরিরামের হুণ্ডি পেয়েছি। খয়েরের কাজে এতটা লাভ কোন বছরেও আমি পাইনি। কিন্তু আরও দুটো মাস তোমাকে ঝুমরাটিতে থাকতে হবে। সাবাই ঘাসের চালানী কাজটাও তুমি সেরে দিয়ে তারপর আবার ভেলাডিহিতে ফিরে গিয়ে তসীল শুরু করবে।

জীবনলাল রোজই ডাকাডাকি করে, তাই মাঝে মাঝে যেতে হয়। গিয়ে দেখতে হয়, মালতীর চিঠি হাতে নিয়ে গুনগুন করে গান গাইছে জীবনলাল। গান গাইবারই কথা। এই তো এই মাঘ মাসের আর দশটা দিন ফুরোলেই ফাল্গুন এসে পড়বে। দিন গুনছে জীবনলাল। কোকিল ডাকা একটি সন্ধ্যায় মালতীর সঙ্গে জীবনলালের বিয়ে হয়ে যাবে। জীবনলাল বলে—একটা আশ্চর্য ব্যাপার হয়েছে রামতনু। আমি স্বপ্ন দেখলাম, মালতী আমার বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আর এই দেখ, আজই মালতীর এই চিঠিটা পেয়েছি। মালতী লিখছে ঃ আমিই তো তোমার বুকের ব্যথার ওষুধ। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এস ডি ও প্রাইস সাহেবেরও ভাং-খাওয়ার অভ্যাস আছে।

রামতনু—এ আবার কী রকমের কথা?

জীবনলাল—খুব সত্যি রকমের কথা। তুমি তো জান না, ডেপুটি কমিশনার ব্লেয়ার সাহেবকে কীরকম একটা অদ্ভুত বাজে কথা বলেছেন প্রাইস সাহেব। বলেছেন, তাঁর পোষা বাঘিনী ডায়েনা লণ্ডন জু-এর কোন বাঘকে পছন্দ করবে না। কিন্তু খোঁজ নিলে তিনি জানতে পারবেন, ডায়েনা এখন খুব খোশমেজাজে লণ্ডন জু'এর খাঁচার ভিতরে একটা নতুন সঙ্গী বাঘের গা চাটছে। পশুর স্বভাব যাবে কোথায়?

॥ পাঁচ ॥

সাবাই ঘাসের চালানী কাজে প্রায় একটা মাস খুব ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। রোজ যেমন আজও তেমনি, সারা সকালটা সাবাই ঘাসের গাঁট বাঁধার কাজ করেছে রামতনু। সারাটা দুপুর ধরে গাঁট ওজন করার কাজ হয়েছে, আর বিকেল হতেই হিসেব লেখার কাজও শেষ হয়েছে। রোজ যেমন আজও তেমনি, কাজের মধ্যেই এক ফাঁকে স্নান করে মকাইয়ের খিচুড়ি খেয়ে নিয়েছে রামতনু।

শুধু চমকে ওঠে রামতনু, কোকিল ডাকছে। কাছারি ঘরের পিছনে পলাশের পাতার আড়ালে লুকিয়ে কোকিলটা ডাকছে। ফোটা ফুলের শোভায় লাল হয়ে গিয়েছে বিকেলের ঝলমলে রোদ। তাই তো, জীবনলালের স্বপ্নের ফাল্গুন মাসটা এতদিনে এসে পড়েছে। আজ

ফাল্গুনের ক' তারিখ? সত্যিই তো এই সাত-আটটা দিন জীবনলালের কোন হাঁকডাক শুনতে পায়নি রামতনু। জীবনলাল কি তবে চলেই গিয়েছে?

সর্দার সিয়ারাম বলে—আপনি তো এখানে দাঁড়িয়ে আর খুব খুশী হয়ে কোকিলের ডাক শুনছেন। কিন্তু আজই ভোরবেলা ওই টিলার ওপর দাঁড়িয়ে আমি কী শুনেছি আর কী দেখেছি শুনবেন?

—বল।

—একটা ময়ূরের ডাক শুনেছি। ময়ূরটা ডেকে ডেকে গাছের মাথায় বসছে উড়ছে আর চলে যাচ্ছে। ওই ওদিক থেকে, চাতরার খেজুর জঙ্গলের গা-ঘেঁষা কেঁদে-তেঁতুলে ঠাসা জঙ্গলটার দিক থেকে ময়ূরটা উড়ে উড়ে এদিকে এল, আর ওই শিবুয়া পাহাড়ের বাঁশজঙ্গলের দিকে চলে গেল।

রামতনু—তাতে কী হয়েছে?

—আবার বাঘ এসেছে। নীচে বাঘ হাঁটছে, তাই ওপরে উড়ে উড়ে বাঘের টহল ধরা পড়িয়ে দিচ্ছে ময়ূরটা। খুব হুঁশিয়ার বাবু; সন্ধ্যে হলেই ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে দেবেন।

সিয়ারামের চিন্তিত ও ভীরু মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেও রামতনুর মনের মধ্যে কোন ভয় ছমছম করে না, একটা আশ্চর্যের সন্দেহ ছমছম করে। এটা কোন্ বাঘ? কেমন বাঘ? ডায়েনার বন্ধু সেই পিঠকাটা বাঘটা নয় তো?

কিন্তু কোকিলটা হঠাৎ ডাক বন্ধ করে দিল কেন? কোকিলটা আছে, না উড়ে চলে গিয়েছে? পলাশের মাথার দিকে তাকাবার আগেই রামতনুর চোখে পড়ে, সারা আকাশ কালো মেঘে ভরে গিয়েছে। বিকেলের ঝলমলে রোদটাকে কেউ যেন এক মুহূর্তে শুষে নিয়েছে। মজার ব্যাপার! একটা ধূর্ত চাতকই বুঝি কোকিলের স্বর নকল করে এতক্ষণ ডাকছিল। না আর দেরি করা উচিত নয়। এখনই একবার দেখে আসা উচিত, জীবনলাল আছে, না চলে গিয়েছে।

ভয়ানক ঝড় আসছে, প্রায় এসেই পড়েছে। জীবনলালের কেবিন-ঘরের দেয়ালের রঙীন আলপনার ওপর গিরগিটির ভিড় পেট ফুলিয়ে কাঁপছে, চালার ওপর কাঠবিড়ালীর দল ছটফট করে এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছে।

জীবনলালের ঘরে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায় রামতনু। সাইকেল চালিয়ে আর খুব জোরে ঘন্টি বাজিয়ে সার্কেল অফিসার জগদীশবাবু আসছেন। চেঁচিয়ে ডাকছেন—ও রামতনু, ও খয়েরবাবু রামতনু। ফাল্গুন মাসের আকাশে তুমি এরকম একটা ভয়ানক ঝড় ছাড়লে কেন?

সাইকেল থেকে নেমেই হাঁপ ছাড়েন জগদীশবাবু।—আঃ, নিশ্চিন্ত হলাম যাচ্ছিলাম পিটারপুরা, কিন্তু যাওয়া হল না। আকাশের অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গিয়েছি। মনে হচ্ছে, আজকের রাতটা তোমাদের এখানেই পার করতে হবে।

রামতনু আর জগদীশবাবু দুজনে একসঙ্গে ঘরের ভিতরে ঢুকতেই অদ্ভুত রকমের একটা খুব খুশির স্বরে হেসে ওঠে জীবনলাল—আসুন, আসুন।

মাথার বালিশটাকে বুকের ওপর চেপে আর জড়িয়ে ধরে বিছানার ওপর বসে আছে জীবনলাল। জগদীশবাবু ভ্রূকুটি করেন—কী ব্যাপার? বুকের ব্যথাটা বেড়েছে বুঝি?

জীবনলাল হাসে। —ছেড়ে দিন ওসব বাজে ব্যথা-ট্যথার কথা। ওরকম হয়েই থাকে।

জগদীশবাবু—তোমাকে কতবার বলেছি, আজও আবার বলছি। চাতরার কবিরাজ সেনবাবুর কাছ থেকে ওষুধ আনিয়ে খাও।

জীবনলাল—খবর বলুন।

—হ্যাঁ, অনেক খবর আছে। যেমন দুঃখের খবর, তেমনই বেশ মজারও খবর। প্রথম খবর হলো, আমার বদলির অর্ডার এসেছে। আর এক মাস পরে গুমিয়া সার্কেলে চলে যাব। দ্বিতীয় খবর, এস-ডি-ও সাহেব কেঁদে ফেলেছেন।

চমকে ওঠে রামতনু—কেন? কেন?

—আজই সকালবেলা নতুন খাস জঙ্গলের একটা ম্যাপ নিয়ে সাহেবের কাছে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলাম। গিয়েই দেখি, একটা চিঠি হাতে নিয়ে বারান্দার ওপর একটা চেয়ারে একেবারে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন সাহেব। আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন সাহেব, যেন রাগ দিয়ে চাপা একটা দুঃখের চিৎকার।—এই চিঠিটা পরশুদিন এসেছে। লণ্ডনের চিঠি। লণ্ডন জু-এর অফিস থেকে লেখা খুব ভাল একটা খবরের চিঠি। ডায়েনা মরেছে।

বাইরে প্রবল ঝড় আর বৃষ্টির শব্দ, তার সঙ্গে তোলপাড় ঝুমরাটি জঙ্গলের শব্দ যেন ধাক্কা দিয়ে ঘরের ভিতরে জগদীশবাবুর গলার স্বর মিইয়ে দিয়েছে। জগদীশবাবু বলেন ঃ লণ্ডন জু'এর খাঁচার ভিতরে ঢুকেই পোষা বাঘিনী ডায়েনার শান্ত স্বভাবটা একেবারে ক্ষেপে গিয়ে বন্য বাঘিনীর মতো দুরন্ত হয়ে উঠেছিল। দিনরাত শুধু গর্জন করে আর লাফ-ঝাঁপ করে খাঁচার গরাদ ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করেছে ডায়েনা। ডায়েনাকে শান্ত করবার জন্য যে বাঘটাকে একই খাঁচাতে লুকিয়ে ডায়েনার সঙ্গী করে রাখা হয়েছিল, সেই বাঘটাকে একটা মুহূর্তও সহ্য করতে পারেনি ডায়েনা। বাঘটাকে কাছে দেখতে পেয়েই বাঘের টুঁটি কামড়ে ধরেছে, পুরো দুটি ঘন্টা বাঘের সঙ্গে মারামারি করে আর ভয়ানক ঘায়েল হয়ে ডায়েনা শেষে নিজেই মরেছে। প্রাইস সাহেব বললেন ঃ আই সি এস ব্লেয়ারকে আমি এবার জিজ্ঞেস করবো, কী হে জুলজির ফাস্ট ক্লাস এম. এ, বল এবার কার কথা সত্য হলো?

জীবনলাল বলে—আমি ব্লেয়ারকে জিজ্ঞেস করলে অন্য কথা বলতাম?

জগদীশবাবু—কী বলতেন?

জীবনলাল—আমি বলতুম, কী হে মানুষ ব্লেয়ার বল শুনি, তোমাদের মানুষীদের প্রাণ কি বাঘিনী ডায়েনার প্রাণের চেয়ে বড় রকমের কোন জিনিস?

জগদীশবাবু ও রামতনু বেশ আশ্চর্য হয়ে জীবনলালের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আজ এ কী কথা বলছে জীবনলাল?

জীবনলাল—আপনি যে বললেন, প্রাইস সাহেব কেঁদে ফেলেছেন। কেন কাঁদলেন, কখন কাঁদলেন, সে-কথা তো বললেন না।

জগদীশবাবু—হ্যাঁ, বলছি। আজ আমারই সঙ্গে কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছেন।

কাল শেষ রাতে একটা ঝনঝনে শব্দ শুনে জেগে উঠেই দেখতে পেলেন সাহেব, কিচেনের পিছনে চাতালটার ওপর ডায়েনার শূন্য বাথটবের কাছে বসে আছে একটা বাঘ, সেই বাঘটা, যার পিঠের মাঝখানে একটা কাটা দাগ। বলতে বলতে রুমাল তুলে চোখ মুছলেন সাহেব। বললেন ঃ এর কথা ভাবতে গিয়ে আমার সব চেয়ে বেশী কষ্ট হচ্ছে জগদীশবাবু। পশু বেচারা তো জানে না যে, ডায়েনা মরেছে। মনে করেছে, টবটাকে ধাক্কা দিয়ে একটু শব্দ করলেই ওর অনেক দিনের সঙ্গিনী সেই ডায়েনা আবার ঘরের ভিতর থেকে ছুটে বের হয়ে আসবে। আমি ও ঢাউস বাথটবটাকে তিন টুকরো করে ভেঙে বাজারের মিস্তিরী ছবিরামের লোহা-লক্কড়ের দোকানে পাঠিয়ে দিয়েছি। পিঠকাটা পশু বেচারাকে বুঝিয়ে দিতে হবে তো, ডায়েনা এখানে আর নেই।

জীবনলাল চেঁচিয়ে ওঠে—এরকম একটা ভুল কথা বলে ফেললেন কেন প্রাইস সাহেব? পশু বেচারা তো নির্বোধ বেচারা নয়। আমার বিশ্বাস পিঠকাটা বাঘটা সবই জেনেছে, সবই বুঝেছে।

আবার আশ্চর্য হয়ে জীবনলালের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন জগদীশবাবু ও রামতনু। আজ এ কী কথা বলছে, জীবনলাল?

সন্ধ্যেটা পার হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ আগে, তবু ঝড়-বৃষ্টির কোন বিরাম নেই। ঝুমরাটি জঙ্গলের বুকের ওপর ঘন অন্ধকারটাও যেন আছাড় খেয়ে হুটোপুটি করছে। গুমরে উঠছে জঙ্গলের ভয়ানক শব্দ।

গুমরে উঠলো আর একটা ভয়ানক শব্দ। বাঘের ডাক। বাঘের গর্জনের প্রতিধ্বনিটা ঝড়ের বাতাসে ছেঁড়া-ছেঁড়া হয়ে অন্ধকারের বুকের ওপর গড়াচ্ছে।

জগদীশবাবু বলেন—পিঠকাটা বাঘটার ডাক। খুব সম্ভব অন্য জঙ্গলে চলে যাচ্ছে বাঘটা।

—কিন্তু আমি কোথায় যাই? কথাটা বলতে গিয়ে বালিশটাকে শক্ত করে বুকের ওপর চেপে দিয়ে দুই চোখ বন্ধ করে জীবনলাল।

চমকে ওঠেন জগদীশবাবু। চমকে ওঠে রামতনু। —কেন? কী হলো? আজ হঠাৎ ও আবার কী রকম কথা বলছেন আপনি? আপনার তো এই ফাল্গুন মাসেই....।

হেসে ফেলে জীবনলাল—থামুন, থামুন। এই ফাল্গুনেরই পাঁচ তারিখে মালতীর বিয়ে হয়ে গিয়েছে। মালতী এখন সাসারামের ছোকরা কালেক্টর অম্বিকা প্রসাদের বউ।

জগদীশবাবু ভ্রূকুটি করে চেঁচিয়ে ওঠেন। —এ কী অদ্ভুত কথা; আপনার মালতী শেষে এরকম একটা বিশ্রী কাণ্ড করে বসলো কেন?

আবার হেসে ফেলে জীবনলাল—মালতী তো ডায়েনার মতো ঝুমরাটি জঙ্গলের একটা বাঘের মেয়ে নয়। মালতী হলো, শোনপুরের মানুষ রায়বাহাদুর নাগেশ্বরপ্রসাদের মেয়ে।